বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান

ষষ্ঠ খন্ড

সম্পাদনা

মঞ্জু কুমার মজুমদার

মনীষা



প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০০

প্রচ্ছদ : গৌতম আচার্য

সত্য ভট্টাচার্য কর্তৃক মনীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ
৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩ থেকে প্রকাশিত

ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ৭০০১৩২ থেকে মুদ্রিত

সূচিপত্র

মুখবন্ধ

'বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান' গ্রন্থ সিরিজের ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হল। সাধারণত, 'কলকাতা পুস্তক মেলা'র পূর্বেই একটা ক'রে খণ্ড এ-পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে এসেছে। কিন্তু বেশ কয়েকটা কারণের জন্য এই সিরিজ শেষ করার একটা তাগিদ আমাদেরকে মাঝে মাঝেই একটা প্রশ্নের সামনে এনে দাঁড় করাচ্ছিল। এরই প্রতিফলন ঘটেছে পরিকল্পিত সময়ের ৬ মাস আগেই বর্তমান খণ্ডের প্রকাশনায়। এটা কোন সাফল্য বা কৃতিত্বের দিক নয়, বরং বলা চলে এটা হল অনভিজ্ঞতা বা অদূরদর্শিতার পরিণাম। তাই কৈফিয়ত একটা দিতেই হয়, নিজেদের দিক থেকে ত'বটেই, এমনকী শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিবর্গের আগ্রহ নিবৃত্তির জন্যও।

প্রথম খণ্ডে আমরা বলেছিলাম বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধানের কাজ আমরা চারখণ্ডে শেষ করব। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে দেখলাম আমাদের সেদিনের সেই ধারণাটাই ছিল আবেগপ্রসূত। কারণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ব্যাপক কর্মকাণ্ড, মার্ক্সীয় তত্ত্বের আলোয় সেগুলিকে দেখা, ভারতে সমাজ বিকাশের ধারা এবং সামাজিক শক্তি-বিন্যাস চর্চা, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের চিন্তা-ভাবনা প্রভৃতি দিকগুলোর ওপর আমাদের দৃষ্টি দিতে হয়েছে। এক একটা খণ্ড প্রকাশ করতে গিয়ে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা আমরা অর্জন করেছি। প্রাসঙ্গিক তথ্য, কমিউনিস্ট পার্টির দলিল ও পুস্তিকা এবং সংবাদপত্রের সংবাদ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ইতিহাস অনুসন্ধানের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি, লাইব্রেরি, লেখ্যাগার, গোয়েন্দা বিভাগ, সংবাদপত্র-দপ্তর প্রভৃতি স্থানে একাধিকবার গিয়ে বুঝতে পারলাম এ যেন মহাসমুদ্র থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের মণিমুক্তো সন্ধান ও সংগ্রহ করা। সেই কারণে বর্তমান প্রকল্পের পরিকল্পিত সময়কাল ও আনুমানিক খণ্ডরাজি, সংগৃহীত তথ্যাদির প্রাচুর্য এবং আর্থিক বাস্তবায়নযোগ্যতার বিবেচনাবোধ—এই তিনের প্রবল টানাপোড়েনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের সমস্যায় পড়তে হয়েছে। এরই সঙ্গে সমাধানের চেষ্টাও করতে হয়েছে। বলা চলে যে বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে টানাপোড়েনের সব দিকগুলিকে সংশোধন করা ছাড়া কোন উপায়ই ছিল না।

এরই ফলে গ্রন্থ সিরিজের বিভিন্ন খণ্ডের সময়কাল কমাতে বাধ্য হয়েছি; যেমন তৃতীয় খণ্ডের সময়-কাল ১৯৪৩-১৯৪৫ সাল, চতুর্থ খণ্ড ১৯৪৫-১৯৪৭ এবং পঞ্চম খণ্ডও হয়েছে ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সাল কে নিয়ে। ষষ্ঠ খণ্ড, যেটি সদ্য প্রকাশিত হল, তারও কালপর্ব মাত্র দু'বছরের—১৯৫০ ও ১৯৫১ সাল। কাজের ক্ষেত্রে প্রবেশ ক'রে এবং অন্যান্য বহু সজ্জন

ব্যক্তির পরামর্শে এখন আমরা পারছি যে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস সংক্রান্ত সংগৃহীত কোন উপকরণই অনিবার্য কোন কারণেই বর্জন বা বাতিল করা যায় না এবং সে ইচ্ছাও আমাদের নেই। কারণ তাতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অসমাপ্ত থেকে যাবে। ফল দাঁড়াবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস অথবা ভারতের আধুনিক ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ হতে পারবে না। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকের এই দায়কে স্বীকার করা উচিত। একই সঙ্গে অতীতের ত্রুটি বিচ্যুতির মূল সন্ধান করে যথার্থ উপকরণ বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়া উচিত যাতে ইতিহাস রচনার কাজ সহজ হয়।

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন সংক্রান্ত ইতিহাসের উপকরণ অনুসন্ধানের জন্য গবেষণার কাজে একটা ইতিহাসমুখিনতার লক্ষ্য থাকলেও, এর ব্যবহারিক প্রয়োগ-মূল্যের দিকটাও আমরা সযত্নে পোষণ করে এগিয়ে চলেছি। আজকের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সক্রিয় কর্মীদের কাছে এই দিকটি অতি মূল্যবান ও শিক্ষাপ্রদ। যাইহোক এইভাবে এক একটি খণ্ডের সময়-কালকে সংক্ষিপ্ত ক'রে এবং তার ফলে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদির সংখ্যা স্বতঃই কমে যাওয়াতে আমরা পরিকল্পিত সময়ের পূর্বেই এই খণ্ডটি প্রকাশ করতে পেরেছি।

অনেকের মধ্যে একটা জিজ্ঞাসা রয়েছে যে, কোন্ বৎসর পর্যন্ত আমরা এই গ্রন্থ সিরিজ প্রকাশ করব আর সেটা কয়টি খণ্ডে সমাপ্ত হবে? প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা নির্দিষ্ট থাকলে, দ্বিতীয়টার উত্তর আনুমানিকভাবে হলেও দেওয়া যায়। যাইহোক আপাতত ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত লক্ষ্য-সীমা ধরেছি। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত আমাদের গ্রন্থ সিরিজের সমাপ্তি ঘটাব—এই কথার পরেও 'পাঠকদের আগ্রহের কথা' ভেবে একটি কথা জানিয়ে রাখতে চাই। বামঐক্য ও কমিউনিস্ট ঐক্যের ওপর আস্থা রেখে এবং কারো সম্পর্কে কোনরূপ কটাক্ষ, বক্রোক্তি বা বিশেষণ প্রয়োগ না করেও পার্টি বিভাজনের পরবর্তী অধ্যায় একটি খণ্ডের মধ্যে কীভাবে আনা যায় তার একটা চিন্তা আমাদের আছে। ১৯৬৪ সালে উভয় পার্টির তাত্ত্বিক অবস্থান যা ছিল, তার কোন পরিবর্তন হয়ে থাকলে অথবা বর্তমানের প্রয়োগগত দিকগুলি ১৯৬৪ সালের তাত্ত্বিক অবস্থান অনুসারী না হয়ে থাকলে সেগুলিকেই দেখানোর কথা ভাবতে হবে। সেই উপায়-উদ্ভাবনের দায় সম্পাদকদ্বয়, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং বিশিষ্ট কিছু ব্যক্তিবর্গের সমবেত প্রচেষ্টায় সম্ভব হবে বলে আশা রাখি। যদিও কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজনে না হয়েছে পার্টির লাভ, না কমিউনিস্ট আন্দোলনের, না শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী মানুষের কোন লাভ। তাই পারস্পরিক কাদা-ছোঁড়াছুড়িতে লাভটা কার হবে? এটা হল নিজেকে অভ্রান্তরূপে প্রতিষ্ঠা করার একটা অমার্ক্সীয় পদক্ষেপ। যাইহোক আপাতত লক্ষ্য-সীমার বিচারে হয়ত আরও তিন অথবা চারটি খণ্ডের প্রয়োজনীয়তা থাকবে বলে মনে হয়।

বর্তমান খণ্ডের সময়-কাল মাত্র দু'বছর—১৯৫০ এবং ১৯৫১ সাল। দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস। পঞ্চম খণ্ডে বিধৃত ছিল দুটি বৎসর—১৯৪৮ এবং ১৯৪৯ সাল যা ছিল পার্টির অতিবামপন্থী হঠকারি লাইন অনুসরণের পর্ব। ট্রটস্কীপন্থী-টিটোবাদী বামপন্থী সংকীর্ণ নীতির অনুসরণের পর্ব। এই পর্বে পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার মুখপত্র 'স্বাধীনতা' পত্রিকা ছিল বে-আইনি। ষষ্ঠ খণ্ডের সময়কালের দু'টি বছর ১৯৫০ ও ৫১ সাল হল আগের পর্বের বিচ্যুতি থেকে

অন্তঃপার্টি সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসার প্রয়াস-পর্ব। এক্ষেত্রে আরও কয়েকটি বিষয় অন্তঃপার্টি সংগ্রামকে জোরদার করে তুলেছিল এবং মোটামুটি ইতিবাচক দিকে পার্টির লাইনকে ধীরে ধীরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। যেমন : (১) ১৯৫০ সালের ২৭শে জানুয়ারি কমিনফর্মের মুখপত্র 'এল পিপিডি'র সম্পাদকীয়—'উপনিবেশ ও পরাধীন দেশসমূহে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরাট অগ্রগতি'। (২) ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে কেন্দ্রীয় কমিটিতে আলোচনার জন্য পলিটব্যুরোর খসড়া দলিল। (৩) ১৯৫০ সালের মে মাসে প্রকাশিত প্রাদেশিক কমিটির দলিল। (৪) স্বাধীন ও বন্ধনমুক্ত আলোচনার আবহাওয়া তৈরি করার জন্য পার্টি কর্তৃক 'ফোরাম' প্রকাশ। (৫) ১৯৫১ সালের জানুয়ারিতে পার্টি 'আইনি' বলে ঘোষণা। (৬) যুক্ত কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন এবং সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আলোচনার মধ্য দিয়ে পার্টির খসড়া কর্মসূচি ও রণকৌশল প্রণয়ন ও আলোচনা। (৭) ১৯৫১ সালের অক্টোবরে প্রাদেশিক রাজ্য সম্মেলন এবং সারা ভারত পার্টি সম্মেলন। (৮) গৃহীত কর্মসূচি এবং পলিসি স্টেটমেন্ট বা পার্টির নীতি সংক্রান্ত বিবৃতি। এসবই বর্তমান খণ্ডের বিষয়বস্তু।

অন্তঃপার্টি সংগ্রাম এবং তার পরিণতিতে যে দু'টি দলিল আমরা পেলাম, তার ইতিবাচক দিক ছিল দু'টি : (ক) গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজড়নকে বাতিল করা এবং (খ) রাশিয়ার পথ ও চীনের পথকে ভারতে প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাতিল বলে গণ্য করা। এইসব ইতিবাচক দিক ছাড়া কিছু ত্রুটির দিক তখনও ছিল। ভারতের সংবিধান যা চালু হয়েছিল ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি, তার প্রতি সিপিআই-এর বিরূপ মনোভাব ছিল। তবে সেই মনোভাবের দিকটা বজায় রেখেই সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য পার্টির মধ্যে উৎসাহ ও আগ্রহ দেখা গেল। একথা সত্য যে এই সংবিধানের অনেক সীমাবদ্ধতার কথা ড. আম্বেদকর বলেছিলেন। তিনি ছিলেন সংবিধান রচনা কমিটির চেয়ারম্যান। ১৯৪৯ সালের ২৫শে নভেম্বর গণপরিষদের অধিবেশনে তিনি তাঁর সমাপ্তি ভাষণ দিয়েছিলেন, যা ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।[১] কমিউনিস্ট পার্টি এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিল বলেই সংসদকে যেমন ব্যবহার করা মনস্থ করেছিল, তেমনি সংসদ বহির্ভূত সংগ্রামেও নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিল। (সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির অংশগ্রহণ নিয়ে পরের খণ্ডে আমরা আলোচনা করব।)

আমাদের এই খণ্ডে আমরা একটা পরিশিষ্ট অধ্যায় যুক্ত করেছি। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনেক সময় এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট খণ্ডটি প্রকাশিত হওয়ার পর অথবা সেই খণ্ডটির মুদ্রণ কাজের সমাপ্তির পর্যায়ে সেগুলি আমাদের হস্তগত হয়েছে। আমরা আমাদের গ্রন্থ সিরিজের দ্বিতীয় খণ্ডে বলেছিলাম যে 'পরে-পাওয়া' এই রকম তথ্যগুলিকে নিয়ে একটা 'অতিরিক্ত খণ্ড' প্রকাশ করব। কিন্তু দ্বিতীয় চিন্তায় আমাদের সিদ্ধান্তের কিছু পরিবর্তন করতে হল। স্থির করলাম আগামী দিনের প্রকাশিতব্য খণ্ডগুলিতে একটি 'পরিশিষ্ট অধ্যায়' যোগ করে সেখানে 'পরে-পাওয়া' তথ্যগুলিকে অন্তর্ভূক্ত করব। সেই কাজ আমরা বর্তমান খণ্ড থেকেই শুরু করেছি এবং এইরকমই চারটি দলিল এই খণ্ডের 'পরিশিষ্ট অধ্যায়ে' সংযোজিত করেছি।

এই ধরনের আরও কিছু তথ্য আমাদের কাছে আছে। সেগুলিও আমরা আগামী খণ্ডগুলিতে কিছু কিছু ক'রে সংযোজিত করব। এই প্রসঙ্গে একটি মূল্যবান তথ্যের প্রসঙ্গে

আসছি। ১৯৪৬ সালে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে বাংলায় এক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই উপলক্ষ্যে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি Election Manifesto প্রকাশ করেছিল। ইংরাজী ভাষ্যের এই অনুবাদটি আমাদের গ্রন্থ সিরিজের চতুর্থ খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৬নং সহায়ক তথ্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত আছে। বাংলায় অনুবাদটি যদিও অনিল বিশ্বাস সম্পাদিত সংশ্লিষ্ট বইয়ের প্রথম খণ্ডে রয়েছে (পৃ. ৩১৬-৩২), তা সত্ত্বেও সব সময়ের অভ্যাস মতো এটারও মূল পুস্তিকাটি বাংলায় সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত এই ইস্তাহারের ইংরাজী ভাষ্যটি দিল্লীর পার্টি অফিস অজয় ভবনের লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করি। কিন্তু মিলিয়ে দেখতে গিয়ে একটা ধন্দে পড়ে যাই। অনিল বিশ্বাসের বইয়ে এমন কিছু কিছু অংশ আছে, যা ইংরাজী ইস্তাহারে নেই। আবার ইংরাজী ভাষ্যে আছে, অথচ অনিল বিশ্বাসের বইয়ে নেই।[২] এই কাণ্ড কেন ঘটলো, তারই অনুসন্ধানের জন্য বাংলায় অনূদিত ইস্তাহারটির মূল পুস্তিকার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও লাইব্রেরিতে খোঁজ করতে থাকি। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে ইংরাজী ইস্তাহারটি সংযোজিত করতে বাধ্য হয়েছিলাম। যদিও বর্তমানে বাংলা ইস্তাহারটিরও সন্ধান পেলাম বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক অরুণ ঘোষ মহাশয় সংকলিত 'জনযুদ্ধ দেশভাগ ও কমিউনিস্ট পার্টি' বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে। বলা বাহুল্য যে, ইংরাজী ভাষ্যের সঙ্গে অরুণ ঘোষের দেওয়া বাংলা ইস্তাহারটি অনুরূপ, তবে অনিল বিশ্বাসের বইয়ে দেওয়া ইস্তাহারটির অমিল রয়েছে। বাংলা ইস্তাহারটির মূল পুস্তিকাটি সংগ্রহ করতে পারার জন্য অরুণ ঘোষকে ধন্যবাদ জানাতেই হবে। এই ইস্তাহারটির যদিও ইংরাজী ভাষ্য আমরা আমাদের বইয়ে দিয়েছি, তবুও বাংলা অনুবাদ যখন পেয়েই গেলাম, তখন সেটা আগামী কোন খণ্ডে 'প্রাপ্তি স্বীকার' করে পরিশিষ্ট অধ্যায়ে সংযোজিত করব। উদ্দেশ্য হল যতটা সম্ভব একই জায়গায় দলিলগুলিকে গ্রন্থিত করে রাখা।

আমরা বারবার বলেছি এই গ্রন্থ সিরিজের মধ্যে দিয়ে আমরা ইতিহাস রচনা করছিনা, ইতিহাসের উপকরণ অনুসন্ধান করছি মাত্র এবং সেগুলিকে সহায়ক তথ্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করছি। এইসব উপকরণের পটভূমি, তাৎপর্য ও গুরুত্ব আমরা প্রতিটি খণ্ডের প্রতিটি অধ্যায়ের সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয়তে বলবার চেষ্টা করেছি। আর এরই মধ্যে দিয়ে তৈরি হয়ে চলেছে সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও "ইতিহাসের একটা রূপরেখা"। আগামী দিনে যে সমস্ত ইতিহাসবিদ্ ইতিহাস রচনার কাজে হাত দেবেন, তাঁদের কাছে এই গ্রন্থ সিরিজের প্রতিটি খণ্ড যাতে একটা অর্থবহ ভূমিকা পালন করতে পারে সেই চেষ্টাই আমরা করেছি। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ্ গৌতম নিয়োগী তাঁর এক ক্ষুদ্র প্রবন্ধ "ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিবৃত্ত ঃ ঐতিহাসিকের দায়" এতে ইতিহাসবিদেরা কীভাবে এই কর্তব্য পালন করবেন, সেই কথা তুলে ধরেছেন। পার্টি ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে এটিও তাঁদের সাহায্য করতে পারে মনে করেই এটি সহায়ক তথ্য হিসাবে সংযোজিত করলাম।[৩]

তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ইতিহাসবিদ্‌দের উদ্দেশে একটি কথা নিবেদন করতে চাই যে বিভিন্ন ইতিহাসবিদ্, গবেষক প্রমুখেরা এবিষয়ে অনেক প্রবন্ধ, বই, পুস্তিকা লিখেছেন। তাঁরা যেভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়টিকে দেখেছেন, সেটাও বিবেচনার মধ্যে রাখা উচিত। ইতিবাচক ও নেতিবাচক যেদিক থেকেই এগুলি লেখা হোক না কেন সেগুলির একটা চর্চা ভবিষ্যতের ইতিহাসে থাকা উচিত। ইতিবাচক লেখাগুলিকে যেমন আয়ত্ত করতে হবে, তেমনি নেতিবাচক

লেখাগুলিকে যুক্তির জোরে খণ্ডনও করতে হবে। তারজন্য আমরা মনে করি, ভবিষ্যতের ইতিহাসবিদেরা বর্তমান গ্রন্থ সিরিজ, অনিল বিশ্বাস সম্পাদিত গ্রন্থ সিরিজ-এর তথ্যাদি ও উপকরণ ছাড়াও অরুণ ঘোষ সংকলিত একটি তালিকা এবং প্রদোষ কুমার বাগচী সংকলিত 'বাংলা ভাষায় সাম্যবাদ চর্চা' বই থেকেও যথেষ্ট সাহায্য পেতে পারেন।[8]

কোন কোন পাঠক বলেছেন, আমাদের গ্রন্থের দুই সম্পাদকের মধ্যে মঞ্জুকুমার মজুমদার যেহেতু রাজ্যপার্টির সম্পাদক, তাই এই "সংকলনের পিছনে স্বাভাবিকভাবেই [তাঁর] নিজস্ব কিছু নীতির প্রেরণা কাজ করবে, কিছু বক্তব্য থাকবে"। পার্টির নীতি কাজ ত' করবেই, তাই বলে 'নিজস্ব' নীতি কাজ করবে এই কথাটি মন্তব্যকারীর কল্পনাপ্রসূত। গ্রন্থ সিরিজের প্রথম খণ্ডে আমরা জোর দিয়েই বলেছি "কোন বিশিষ্ট ঝোঁক নিয়ে তথ্যের অনুসন্ধান করা ঠিক নয়, আমরা প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সত্যকে অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি"। এর মধ্যে অপেশাদারিত্বের স্পর্শ থাকতে পারে, কিন্তু আন্তরিকতার কোন ঘাটতি নেই। যা আছে, তা হল ইতিহাস রচনার তথ্য অনুসন্ধানের কাজে এগিয়ে আসা দুই সংগ্রামী সংগঠকের এক প্রচেষ্টা মাত্র। এইভাবেই এপর্যন্ত ৬টি খণ্ডের প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। অবশ্য বারবার বলেছি, এখনও বলছি, এসত্ত্বেও এতে ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা নিশ্চয়ই রয়েছে। তাই সকলের কাছে এই নিবেদনই রাখছি যে, আসুন, প্রাপ্তির আনন্দটুকু আমরা সকলে ভাগ ক'রে নিই, ত্রুটির অস্তিত্বও মিলিত প্রচেষ্টায় দূর করি।

একটি প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। এই গ্রন্থ সিরিজের সহায়ক তথ্যের কিছু কিছু ব্যবহার প্রায়ই বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে প্রাপ্তি স্বীকারের সৌজন্যবোধটা থাকছে অনুপস্থিত। ভাবি, যাঁরা এগুলি ব্যবহার করছেন, তাঁরাও কি পরিশ্রম করে তথ্যগুলি উদ্ধার করেছেন? তাই যদি হয়, তাহলে একজন সহকর্মীর প্রতি তাঁর কাজের জন্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ব্যাপারটা যদি তা না হয় এবং আমাদের এই গ্রন্থরাজি থেকে সংগৃহীত করা হয়, তারজন্য কি আমরা তাঁদের মতো বিবেকবান মানুষের কাছ থেকে "উদ্ধৃতি প্রাপ্তি" বা "প্রাপ্তি স্বীকার" এই কথাগুলির ব্যবহার আশা করতে পারিনা? এই প্রসঙ্গে আমাদের একটা অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির সংশোধন করছি। বর্তমান গ্রন্থ সিরিজের তৃতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের ২৮ নং সহায়ক তথ্যে "পাকিস্তান ও জাতীয় ঐক্য" বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত প্লেনামের প্রস্তাব এবং ড. গঙ্গাধর অধিকারির রিপোর্ট এ-দু'টির বাংলা ভাষ্য অন্তর্ভূক্ত করেছিলাম। যেখান থেকে এই পুস্তিকাটি সংগ্রহ করেছিলাম, সেই পুস্তিকার প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা ও টাইটেল পৃষ্ঠা না থাকায়, অনুবাদকের নাম উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। এখন অরুণ ঘোষের 'জনযুদ্ধ দেশভাগ ও কমিউনিস্ট পার্টি' বই থেকে জানতে পারলাম যে এই পুস্তিকাটির অনুবাদ করেছিলেন সত্যশংকর গুপ্ত।

এই খণ্ডের উপকরণ ও পরামর্শদানের পিছনে যাঁরা সাহায্য ও পরামর্শ দিয়েছেন এবং যেসব সংগঠনের কাছ থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি, তাঁদের নামের উল্লেখ করেছি এই খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠায়। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি নরহরি কবিরাজ ও দিলীপ কুমার ব্যানার্জির কাছে। এই গ্রন্থ সিরিজের আগামী খণ্ডগুলিতেও তাঁদের এবং অন্যান্য সহৃদয় পাঠকবর্গের সাহায্য পাব আশা করি। তাছাড়া এই গ্রন্থ সিরিজ প্রকাশে ডি অ্যাণ্ড পি গ্রাফিক্স প্রাঃ লিঃ-এর পরিচালকবৃন্দ ও কর্মীবন্ধুদেরকে আমাদের তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। পেশাদারি ও ব্যবসায়িক মনোভাবের উর্ধে উঠে এই বইয়ের সঙ্গে পরিচালকবৃন্দ একাত্ম হতে পেরেছেন

বলেই সাবলীলভাবেই ও সঠিক সময়ে গ্রন্থ সিরিজের খণ্ডগুলির প্রকাশ সম্ভব হয়ে উঠছে। ভবিষ্যতে এই মনোভাবই তাঁদের কাছ থেকে আশা করি।

পরিশেষে জানাই যে আমরা ষষ্ঠ খণ্ডের অর্থাৎ ১৯৫০ ও ৫১ সাল পর্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান যতটা সম্ভব শেষ করে ১৯৫২ সাল থেকে সপ্তম খণ্ডে প্রবেশ করব। সঙ্গে থাকবে নতুন কর্মসূচি এবং পার্টির নীতি সংক্রান্ত বিবৃতি। এরই ওপর ভিত্তি করে চলবে আমাদের কাজ। এই কাজের মধ্যে থাকবে নানা সমস্যায় জর্জরিত সাধারণ মানুষের পাশে থেকে মাঠে-ময়দানে শ্রেণি সংগ্রামের দিক এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের নতুন আরেকটি দিক।

তথ্যসূত্র :

টিকা : ১) ড. বি. আর. আম্বেদকর ছিলেন সংবিধান রচনা কমিটির চেয়ারম্যান। ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর গণপরিষদ কর্তৃক সংবিধানটি গৃহীত হয়েছিল। এরই পূর্বদিন ২৫শে নভেম্বরে তিনি তাঁর সমাপ্তি ভাষণে নীচের কথাগুলি বলেছিলেন।

"১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি আমরা এক পরস্পরবিরোধী জীবনের সূত্রপাত করতে চলেছি। রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা মেনে নেব সাম্য আর সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে গ্রহণ করব অসাম্যকে। রাজনীতির ক্ষেত্রে এক ব্যক্তি এক ভোট এই নীতিকে আমরা নেব অথচ সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে একটি জীবন, একটি মূল্য এই নীতিকে অস্বীকার করে চলব। এই দ্বন্দ্বকে আর কতদিন পর্যন্ত মেনে নেব? আর কতদিন পর্যন্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যকে আমরা অস্বীকার করব? দীর্ঘদিন ধরে একে অস্বীকার করে চলার অর্থ হবে রাজনীতির ক্ষেত্রে যে গণতন্ত্রকে আমরা গ্রহণ করেছি, তাকেই এক বিপদসংকুল অবস্থার মধ্যে এনে ফেলা। আমরা যদি যতশীঘ্র সম্ভব এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে না পারি, তবে এই অসাম্যের যন্ত্রণায় যারা জর্জরিত একদিন তাঁরাই এই গণপরিষদে গঠিত বহু পরিশ্রমের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামোকে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে।" (উদ্ধৃতি প্রাপ্তি : বর্তমান পরিস্থিতি ও ভারতের সংবিধান : একটি পর্যালোচনা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, শাসনতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান সংকট ও জরুরি অবস্থা ঘোষণা—শোভনলাল দত্তগুপ্ত)

ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিবৃত্ত : ঐতিহাসিকের দায়

গৌতম নিয়োগী

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তথা ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস, যাকে প্রকৃতপক্ষে 'ইতিহাস' পদবাচ্য বলা যেতে পারে, এমন নৈর্ব্যক্তিক ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণাত্মক ইতিহাস, আজ পর্যন্ত লেখা হয়নি। আমাদের দেশের কমিউনিস্ট যে কোনও দলীয় কর্মী কিংবা ইতিহাসমনস্ক সাধারণ বামপন্থী মানুষ সকলেই আশা করেন ভবিষ্যতে কোনও পেশাদার ইতিহাসবিদ একাজে এগিয়ে আসবে। কোনও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন পেশাদার ঐতিহাসিক যখন ইতিহাস রচনা করতে বসেন তখন তার কিছু দায় থাকে, থাকে কর্তব্য ও দায়িত্ব, তাকে মানতে হয় স্বীকৃত কিছু পদ্ধতি ও প্রকরণ, যে বিষয়ে তিনি লিখবেন সে বিষয়ে তন্নিষ্ঠ অনুসন্ধানের মাধ্যমে তাকে সংগ্রহ করতে হয় নানাবিধ উপকরণ থেকে প্রাপ্ত যাবতীয় তথ্য, তারপর নানা আকর-উপাদান থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিচার বিশ্লেষণ করে, তার সত্যাসত্য নির্ণয় করে, সমকালের প্রেক্ষিতে, বিজ্ঞানসম্মত ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে আসতে হয় বা ইতিবৃত্ত রচনা করতে হয়।

একাজ এতদিন খুব সহজ ছিল না। এখনও যে সহজ তাও মোটেই না। ১৯৮১-তে শ্রদ্ধেয় কমরেড ডাঃ রণেন সেনের 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিবৃত্ত' গ্রন্থটি যখন প্রকাশিত হয় তখন তার ভূমিকা লিখতে গিয়ে প্রয়াত কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী লিখেছিলেন : "আমার মনে হয় পার্টির ইতিহাস লেখার সময় এখনো আসেনি। ইতিহাস সৃষ্টি হওয়ার পরই সত্যকার ইতিহাস লিখিত হতে পারে, যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব হতে পারে। আমরা এখনও ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারিনি, তা অকপটেই স্বীকার করা ভাল।" এখানে শ্রদ্ধেয় লাহিড়ীদা একটি খাঁটি কথা বলেছেন, একটি বক্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত নই। তিনি যে অকপট ছিলেন তা তো যাঁরা তাকে জানতেন, সকলেই স্বীকার করবেন। তখনও পর্যন্ত ইতিহাস লেখার সময় আসেনি, একথাও সত্য। তবে একথা ঠিক না যে সত্যকার ইতিহাস, ইতিহাস সৃষ্টি হওয়ার পরই' লিখিত হতে পারে।

কথাটি আরও একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

প্রথমত ইতিহাস সৃষ্টি বলতে তিনি নিশ্চয়ই বুঝিয়েছিলেন 'বিপ্লব' সংঘঠিত হওয়া, সমাজতান্ত্রিকতার পথে অগ্রসর হওয়া। তা কেন হবে? যেসব দেশে বিপ্লব হয়নি, ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেনি, সমাজের রূপান্তর হয়নি, সরকারের বদল হয়নি, সে-সব দেশের কি ইতিহাস লিখিত হবে না? নিশ্চয়ই হবে। হওয়া উচিত। দ্বিতীয়, পার্টির ইতিহাস অবশ্যই লিখিত হওয়া

উচিত তবে তার চেয়ে অনেক জরুরি কাজ দেশের সঠিক অগ্রগতির ইতিহাসে পার্টির ভূমিকা বিচার। অর্থাৎ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস দরকার তার চেয়ে বেশি দরকার, ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস কারণ এটি আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত কাজ। তৃতীয়ত, আমাদের দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস পটভূমি বাদ দিলেও সূত্রপাত ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে। এর মধ্যে স্পষ্টতই দুটি পর্ব, প্রাক্ স্বাধীনতা পর্ব এবং স্বাধীনতার পরবর্তীকাল। ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে এবং স্বাধীনতা উত্তর সামাজিক রূপান্তরের পর্ব পর্বান্তরে বামপন্থী তথা কমিউনিস্ট আন্দোলন এমন অনেক বলিষ্ঠ অবদান রেখেছে যা তাৎপর্যপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী আর সেই কারণেই তা ইতিহাসের অন্তর্গত হওয়া উচিত। চতুর্থত, ঐতিহাসিকের দায় সত্যের প্রতি। তিনি জানেন কাল নিরবধি আর পৃথ্বী বিপুলা, তাকে সৎ এবং পরিশ্রমী হওয়া ছাড়াও দল-মত-বর্ণ-শ্রেণি সম্প্রদায়ের উর্দ্ধে উঠতে হয়, অতীতাশ্রয়ী ব্যাখ্যায় তাকে সাফল্যের সঙ্গে ব্যর্থতা, কৃতিত্ব ও সীমাবদ্ধতা উভয়ই দেখাতে হয়। কাজেই কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে গিয়ে অতীতের দিকে ফিরে বামপন্থী ঐতিহাসিককেও যথাযোগ্য পর্যালোচক হতে হয়, পার্টির ভ্রান্তি বা সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করতে হয়।

এখানে অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, ঐতিহাসিক, ঐতিহাসিক হবেন। তাহলে আবার বামপন্থী ঐতিহাসিক, দক্ষিণপন্থী ঐতিহাসিক কথাটি উঠছে কেন? উঠছে এজন্য যে, আগেই উল্লেখ করেছি ইতিহাসবিদকে ইতিহাস রচনা প্রণালীর কাজে কিছু কিছু পদ্ধতি-প্রকরণ বা মেথডলজি মানতে হয়। প্রকরণ নানা রকম, তার মধ্যে মার্ক্সবাদী পদ্ধতি সমাজ বিশ্লেষণে বিশেষ সহায়ক। মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিক কথাটি বলা হয় এই বিশেষ প্রকরণের জন্য যা ঐতিহাসিকের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। পার্টির ইতিহাস লিখতে হলে তত্ত্ব ও তথ্যের সঠিক প্রয়োগ দরকার। বামপন্থী আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে গেলে দেশের সার্বিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

যে ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় সোমনাথ লাহিড়ী অতি খাঁটি কথা লিখেছিলেন তা হলো, তখনও ভারতে বা বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস লেখার সময় আসেনি। মন্তব্যটি প্রায় ৩০ বছর আগের। ইতিহাস লিখতে গেলে প্রধান অবলম্বন প্রাথমিক উপাদান—আকর ভিত্তিক সংগৃহীত তথ্য। নানা দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে একাজ তখনও পর্যন্ত খুব অগ্রসর হয়েছিল তা বলা যায় না। এখন অবশ্য একাজ অনেকখানি এগিয়েছে।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস জাতীয়স্তরে লিখতে গেলে তা পূর্ণতা পাবে না, যদি না রাজ্য স্তরে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস লিখিত হয়। সে কাজেও ইতিহাস অনুসন্ধান করে দলিল তথা উপকরণ সংগ্রহ প্রয়োজন। ঠিক এই কারণে আমরা অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা জানাবো এবং ধন্যবাদ দেবো কমরেড মঞ্জুকুমার মজুমদার এবং কমরেড ভানুদেব দত্তকে। 'বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান' শিরোনামে গ্রন্থটির জন্য, যার ৫টি খণ্ড ইতিমধ্যেই আমাদের হাতে এসেছে। প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত (নভেম্বর ২০০০) হওয়ার সময় থেকেই অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এই গ্রন্থমালা পড়ছি। উপকরণ সংগ্রহের কাজটি যত ব্যাপকভাবে এবং সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় ততই পার্টির ইতিহাসের রূপরেখা বা আন্দোলনের ইতিহাসের ব্যাপ্তি নির্ণয় করা সহজতর হবে। ইতিহাসবিদ অধ্যাপক নরহরি কবিরাজ যথার্থই প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় আশা প্রকাশ করেছিলেন, "এই বইয়ের লেখক দুজনেই অত্যন্ত নিষ্ঠার

সঙ্গে বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। এর ফলে ভবিষ্যতে বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস লেখার কাজ সহজ হবে।" আমরা আশাকরি এই উপকরণগুলি এবং ভবিষ্যতে আরও যেসব উপকরণ সংগৃহীত হবে সবকিছু সামগ্রিক বিচার বিশ্লেষণের পরই কমিউনিস্ট আন্দোলনের বা পার্টির নিজস্ব ইতিহাস রচনা করা যেতে পারে। সে কাজ করবেন কোনও ইতিহাসবিদ এককভাবে অথবা যৌথভাবে অথবা একটা টিম একাজে ব্রতী হতে পারে। তবে সকলকেই ইতিহাসের দায় স্বীকার করতে হবে, শুধু পার্টির প্রতি অনুগত হলেই হবে না। একদেশদর্শিতা না, চাই সৎ এবং নির্ভীক দৃষ্টিভঙ্গি, সাফল্যের সঙ্গে সীমাবদ্ধতা তুলে ধরতে হবে। উপসংহারে, আরও দুটি কথা বলা দরকার। প্রথমত, এই ধরনের উপকরণ সংগ্রহের কাজের প্রথিকৃৎ বলা যেতে পারে ডঃ গঙ্গাধর অধিকারীকে। এ বিষয়ে সকলেরই মুক্ত কণ্ঠে শ্রদ্ধায় স্মরণে রাখা উচিত। সিপিআই জাতীয় পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁকেই প্রধান সম্পাদক ক'রে এই দলিল সংকলনের কাজ শুরু হয় এবং তার প্রয়াণের (২১/১১/১৯৮২) আগে ৬টি এবং পরে আরো একটি খণ্ড প্রকাশিত হয়, যার সম্পাদনার কাজও তিনি করে যান। এখানেই প্রাসঙ্গিকতার কারণে উল্লেখ করতে হবে যে পরবর্তীকালে ন্যাশানাল বুক এজেন্সি থেকেও ২৬ খণ্ডে 'ডকুমেন্টস্ অফ দ্য কমিউনিস্ট মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া' প্রকাশিত হয়, যার প্রধান সম্পাদক ছিলেন প্রয়াত জ্যোতি বসু। অনুরূপভাবে 'বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন, দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য' শিরোনামেও কয়েক খণ্ড বেরিয়েছে। আমাদের বক্তব্য হলো ভবিষ্যতে কোনও ইতিহাসবিদ যদি প্রকৃত ইতিহাস লেখেন তখন আশা করব সকল সংকলনমালা থেকেই প্রয়োজনীয় উপাদান তিনি পাবেন।

দ্বিতীয়ত, আন্দোলনের ইতিহাস রচনা করতে হলে ইতিহাসবিদ্‌কে তো শুধু পার্টি দলিল, সম্মেলনের দলিল, পার্টির চিঠি, পার্টি-পুস্তিকা বা পার্টি প্রকাশনা দেখলেই হবে না, তাকে সরকারি-বেসরকারি বহু ধরনের উপাদান সংগ্রহ করতে হবে। বিচার বিশ্লেষণ তো পরে, আগে মহাফেজখানার দলিল, পুলিশ রেকর্ডস, সরকারি নথি, সমসাময়িক সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র, স্মৃতিকথা, নানা লেখকদের রচনা, অন্য দলের দলিল, সাক্ষাৎকারভিত্তিক মৌখিক তথ্য, ব্যক্তিগত ডায়েরি-চিঠি-কাগজপত্র ইত্যাদি বহু বহু ধরনের প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি সোর্স ঘাঁটতে হবে। তবে মুখ্য উপাদান প্রাথমিক আকর। গৌণ উপাদান বা সেকেন্ডারি সোর্স সাবধানে ও সতর্কভাবে ব্যবহার করতে হবে কারণ অনেকেই ইতিমধ্যে লিখেছেন কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস, তবে তা ইচ্ছাকৃতভাবে খাটো করে দেখানোর জন্য। স্মৃতিকথাও সর্বদা সব ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য নয়। তাই ঐতিহাসিকের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়েই কাজ এগোতে হবে। ভবিষ্যতে বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস রচনার কাজে মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত সহায়তা করলেন, সেজন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রাপ্তি স্বীকার : 'কমিউনিস্ট' পত্রিকা, মার্চ ২০১০

কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস রচনার নির্বাচিত বই ও পুস্তিকার একটি তালিকা

অরুণ ঘোষ

(১) অবনী লাহিড়ী, *তিরিশ চল্লিশের বাংলা : রাজনীতি ও আন্দোলনের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে*, কলকাতা, সেরিবান, ১৯৯৯।

(২) অমিতাভ চন্দ্র, *অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন : সূচনাপর্ব*, কলকাতা, পুস্তক বিপণী, ১৯৯২। (একজন অধ্যাপক গবেষক-এর রচনা)।

(৩) গৌতম চট্টোপাধ্যায়, *পেশোয়ার থেকে মীরাট : ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বনাম ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন*, কলকাতা, কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশনী, ১৯৮৪।

(৪) গৌতম চট্টোপাধ্যায়, *স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার ছাত্রসমাজ*, কলকাতা, চারুপ্রকাশ, ১৯৮০।

(৫) চিন্মোহন সেহানবীশ, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, কলকাতা, কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশনী, ১৯৮৫।

(৬) চিন্মোহন সেহানবীশ, *রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী*, কলকাতা, মনীষা, ১৯৭৩।

(৭) বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, *ছাত্র আন্দোলনকে বাঁচাতেই হবে*, কলকাতা, 'ছাত্র অভিযান' কার্যালয়, ১৯৪০।

(৮) মুজফ্‌ফর আহমেদ, *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (১৯২০-১৯২৯)*, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৬৯।

(৯) রণেন সেন, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিবৃত্ত*, কলকাতা, নবপত্র, ১৯৯৬।

(১০) রণেন সেন, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কথা (১৯৪৮-১৯৬৪)*, কলকাতা, বিংশ শতাব্দী, ১৯৯২।

(১১) সরোজ মুখোপাধ্যায়, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা*, ১ম খণ্ড (১৯৩০-১৯৪১); ২য় খণ্ড (১৯৪২-১৯৪৭), কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৮৫-১৯৮৬ (২ খণ্ডে)।

(১২) Ahmed, Muzaffar, *Communist Party of India : Years of Formation 1920-33*, Calcutta, National Book Agency, 1959।

(১৩) Balaram, N.E., *A History of the Communist Party of India*, Ernakulam, Prabhat Book House, 1967।

(১৪) Chakrabarty, Renu, *Women in Indian Communist Movement*, New Delhi, PPH, 1980।

(১৫) Chaudhuri, Tridib, *The Swing Back : A Critical Survey of the Devious Zig Zags of CPI Political Line (1947-50)*, Calcutta, Revolutionary Socialist Party of India, 1950।

[আর. এস. পি. দলের বিশিষ্ট নেতার রচনায় কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ সময়ের রাজনৈতিক অবস্থানের মূল্যায়ন হিসেবে এটি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হল।]

(১৬) *Communist Challenge Imperialism from the Dock*, Calcutta, National Book Agency, 1967।

[মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্তদের জবানবন্দী।]

(১৭) Communist Party of India, *Guideline of the History of the Communist Party of India*, New Delhi, CPI, 1974।

(১৮) Dange, S. A., *When Communists Differ*, Bombay, Indian Institute of Socialist Studies, 1970।

(১৯) Datta Gupta, Sobhanlal, *Comintern and the Destiny of Communism in India 1919-1943 : Dialectics of Real and a Possible History*, Calcutta, Seribaan, 2006।

[রাশিয়া, জার্মানি ও গ্রেট ব্রিটেন-এর কমিউনিস্ট পার্টিগুলির Archives-এ রক্ষিত নথিপত্র এবং বহু কমিউনিস্টের ব্যক্তিগত দলিলপত্রের ভিত্তিতে লিখিত ইতিহাস। মূলত কমিন্টার্নের সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সম্পর্কের মূল্যায়নই এ ইতিহাসের উপজীব্য।]

(২০) Desai, A.R. (ed.), *Labour Movements in India : Documents 1918-1920*, New Delhi, Indian Council of Historical Research, 1988।

(২১) Gupta, Prem Sagar, *A Short History of All India Trade Union Congress (1920-1947)*, New Delhi, AITUC Publications, 1980।

(২২) Kaye, Cecil, *Communism in India : With Unpublished Documents from National Archives of India, 1919-1924*, Calcutta, Edition India, 1971।

(২৩) Masani, M.R., *The Communist Party of India : A Short History*, London, Derek Vers Choyle, 1954।

[একজন কমিউনিস্ট বিরোধীর মূল্যায়ন।]

(২৪) Namboodiripad, E.M.S., *A Short History of Peasant Movements in Kerala*, Bombay, Peoples Publishing House, 1943।

(২৫) Overstreet, Gener D. and Windmiller, Marshall, *Communism in India*, Berkeley, University of California Press, 1959।

[আমেরিকায় ফোর্ড ফাউন্ডেশনের গবেষণা প্রকল্পের অধীনে দু'জন মার্কিন গবেষকের গবেষণাকর্ম।]

(২৬) Petric, David, *Communism in India 1924-1927*, Calcutta, Edition India, 1972।

[প্রধানত গোয়েন্দা রিপোর্ট।]

(২৭) Rasul, M.A., *A History of the All India Kisan Sabha*, Calcutta, National Book Agency, 1974।

(২৮) Ray, Subodh (ed.), *Communism in India 1925-1934*, Calcutta, Ganasahitya Prakashan, 1972 এবং *Communism in India 1935-1945*, Calcutta, National Book Agency, 1976।

[মূলত নানা সূত্র থেকে সংকলিত দলিল পত্র।]

(২৯) Sehanobis, Chinmohan, *Fifty Years of Communist Press*, New Delhi, CPI Publications, 1975।

[ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত এই পুস্তিকায় ১৯২০ সাল থেকে প্রকাশিত পার্টি ও পার্টির সঙ্গে সম্পর্কিত ১৭৫টি পত্রপত্রিকার অনেকগুলির প্রকাশনার আরম্ভের বৎসর উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতের প্রায় সব ভাষায় প্রকাশিত ওই পত্রিকাগুলির মধ্যে ১৯৭৫ সালেই ৫০টি প্রকাশিত হচ্ছিল।]

(৩০) Sen, Sukomal, *Working Class Movement in India*, Calcutta, K.P. Bagchi & Co., 1977।

(৩১) Sen, Sunil, *Agrarian Struggle in Bengal, 1946-47*, New Delhi, PPH, 1972।

(৩২) Sundarayya, P., *Telengana Peoples' Struggle and its Lessons*, Calcutta, CPI (M), 1977।

(৩৩) Surjeet, Harkisen Singh, *An Outline History of the Communist Movement in India*, New Delhi, New Book Centre, 1993।

[সিপিআই, কলকাতা জেলা পরিষদের স্মারক পুস্তিকা (২০০৬) লেখকের প্রবন্ধের অংশ বিশেষ]

টিকা : (১) এই তালিকা নিশ্চিতভাবে প্রাথমিক বলে গণ্য করা যেতে পারে। অরুণ ঘোষের কাছেই এটাকে সম্পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করছি। তিনি এই তালিকায় ২৮নং -এ সুবোধ রায়ের দু'টি খণ্ডের কথা উল্লেখ করেছেন— ১৯২৫-১৯৩৪ এবং ১৯৩৫-১৯৪৫, তবে এই দু'টি খণ্ডের পর তিনি ১৯১৯-১৯২৪ পর্বের unpublished documents প্রকাশ করেছিলেন ১৯৯৭ সালে।

(২) আরও কতগুলি বইয়ের নাম দিলাম—CPI কর্তৃক প্রকাশিত ৭ খণ্ডের *History Documents*, (৫টির সম্পাদক ড. গঙ্গাধর অধিকারী, অন্য দু'টি হল এম. বি. রাও ও মোহিত সেন) *Left Wing in India* (1919-1947) by L P Sinha, *Communism and Nationalism in India* (1919-1947) by Shashi Bairathi, বর্তমান গ্রন্থ সিরিজের ৬টি খণ্ড প্রভৃতি।

(৩) গণশক্তি লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক প্রদোষ কুমার বাগচী 'বাংলা ভাষায় সাম্যবাদ চর্চা' এই শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গ্রন্থপঞ্জীর একটি তালিকা সংকলিত করেছেন। এই বইয়ে তিনি ২১৯৭টি বইয়ের নাম এবং সেগুলির এক সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থ সংগ্রহটি সাম্যবাদ চর্চা বিষয়ক হলেও, এর মধ্যে বহু বই রয়েছে যা কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। (—সম্পাদক)

প্রথম অধ্যায়

কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক লাইন পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু

বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির বে-আইনি অবস্থায় পূর্বখণ্ডে বিভিন্ন আন্দোলন বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে যে ধরনের হতাশাজনক চিত্র আমরা পেয়েছি, সেগুলি হল : বিভিন্ন আন্দোলন থেকে গণঅভ্যুত্থানের সৃষ্টি না হওয়া, এই আন্দোলনগুলিতে সদস্যদের ক্রমে ক্রমে অংশগ্রহণের হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটা, সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহের অভাব, পুলিশী নিপীড়ন ইত্যাদি। এসবই হল সিপিআই-এর ১৯৪৮ সালের রাজনৈতিক লাইনের ফল।
এইরকম পরিস্থিতিতে ১৯৫০ সালের ৫ই জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির ৭টি সংগঠনকে বে-আইনি ঘোষণা করা হয়েছিল। এগুলি হল : (১) বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন; (২) মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি; (৩) পিপলস রিলিফ কমিটি; (৪) বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিষাণ সভা; (৫) ক্ষেত মজদুর সমিতি; (৬) মজদুর নওজোয়ান লীগ; (৭) ছাত্রী সংঘ। বে-আইনি ঘোষণার আগে এইসব সংগঠন যে স্বাধীনভাবে কাজ করে যাচ্ছিল, তা কিন্তু নয়। সেসময় তাদের কাজে সবসময় বাধাপ্রাপ্তি ঘটতো পুলিশের তরফ থেকে। এখন তাতে আইনের সিলমোহর লাগিয়ে সংগঠনগুলিকে বে-আইনি করা হল।

এসব সত্ত্বেও পার্টি কিন্তু নিজের ভূমিকা পালন এবং আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করতো।

১৯৫০ সালে পার্টি পরিচালিত আন্দোলন

বিভিন্ন বিষয়ে পার্টির ভূমিকা কালানুক্রমিকভাবে উল্লেখ না ক'রে নির্দিষ্ট বিষয়ে পার্টি কীভাবে এগিয়েছিল, সেটাই উল্লেখ করবো। যেমন :

(ক) ভারতীয় সংবিধান প্রসঙ্গে—১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি ভারতের নিজস্ব সংবিধান বা শাসনতন্ত্র চালু হয়েছিল। এটি গণপরিষদে গৃহীত হয়েছিল ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর। এতে ভারতকে এক সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করা হল।

সংবিধান রচনার জন্য ১৯৪৬ সালে গঠিত হয়েছিল গণপরিষদ। সে বছরের ৯ই ডিসেম্বর থেকে এর কাজ শুরু হয়েছিল। এই সংবিধান রচনার জন্য ২৯-৮-৪৭ তারিখে একটি Drafting Committee তৈরি হয়েছিল। পরদিন এই কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ডঃ আম্বেদকরকে করা হয় এই কমিটির চেয়ারম্যান। এই গণপরিষদে পুরো সময়ের জন্য না হলেও একমাত্র কমিউনিস্ট সদস্য ছিলেন সোমনাথ লাহিড়ী। তিনি গণপরিষদের সদস্য ছিলেন

১৯৪৬ সালের ১৫ জুলাই থেকে। তবে ১৯৪৭ সালের জুন মাসে ভারত-বিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হলে গণপরিষদ বিভক্তিকরণের প্রস্তাব স্বাভাবিকভাবেই উত্থাপিত হয়েছিল। এই প্রস্তাব ভারত-বিভাগের প্রস্তাবিত পাকিস্তান ও ভারতীয় অঞ্চলের আইন সভার সদস্যদের দ্বারা মীমাংসিত হয়েছিল। সেই অনুসারে গঠিত হয়েছিল ভারতীয় গণপরিষদ এবং পাকিস্তান গণপরিষদ। আইনসভার ৩ জন কমিউনিস্ট সদস্যের মধ্যে ১ জনের নির্বাচনকেন্দ্র (রূপনারায়ণ রায়ের দিনাজপুর কেন্দ্র) পাকিস্তান অঞ্চলের মধ্যে পড়ে গেছিল। আর ২ জন ভারতীয় অঞ্চলের আইনসভার সদস্য রয়ে গেলেন। পৃথক পৃথক গণপরিষদের সদস্য নির্বাচনের জন্য ১৯৪৭ সালের জুন মাসে আলোচনা হয়। সেই অনুসারে নতুন ক'রে নির্বাচন হল। তাতে সোমনাথ লাহিড়ীকে তার আসনটি হারাতে হয়েছিল। অর্থাৎ লাহিড়ী এক বছরেরও কম সময় গণপরিষদের সদস্য ছিলেন।

ভারতের নিজস্ব সংবিধান চূড়ান্ত হয়েছিল এরও প্রায় আড়াই বছর পর, যখন কমিউনিস্ট পার্টির কোন প্রতিনিধি গণপরিষদের সদস্য ছিলেন না। এমন কী Constitution Drafting কমিটি যখন থেকে সংবিধানের খসড়া রচনা করতে শুরু করেছিল (৩০-৮-৪৭), তার পূর্বেই সোমনাথ লাহিড়ীর সদস্যপদ চলে গেছিল (১৯৪৭ সালের জুন মাসে)। তবে সংবিধান রচনার খসড়া তৈরির কাজ শুরু হওয়ার পূর্বে গণপরিষদের কয়েকটি অধিবেশনে লাহিড়ী উপস্থিত ছিলেন। এই অধিবেশনগুলি ছিল সংবিধান রচনার প্রাক-আলোচনা পর্ব। অধিবেশনগুলির তারিখ হল ১০-১৩ ডিসেম্বর, ১৯৪৬, ১৬-১৯ ডিসেম্বর, ২১ ডিসেম্বর, ২৩ ডিসেম্বর, ২০-২২ জানুয়ারি, ১৯৪৭, ২৪-২৫ জানুয়ারি, ২৮-৩০ এপ্রিল, ১-২ মে, ১৯৪৭। এই সব অধিবেশনে সংবিধানে কোন্ কোন্ বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া উচিত সে সব বিষয়ে তিনি নিজের চিন্তা ও মত ব্যক্ত করেছিলেন। এ ব্যাপারে গণপরিষদে একটা খসড়াও পেশ করেছিলেন। (দ্রঃ চতুর্থ খণ্ড, পৃ ৩৫৫)

সংবিধান চূড়ান্ত পর্বে প্রায় বেশির ভাগ সদস্যই ছিলেন কংগ্রেস রাজনৈতিক দলের মতাবলম্বী। স্বভাবতই সংবিধানের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল তাদের শ্রেণিগত অবস্থান অনুসারী মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ও মতাদর্শ। এসত্ত্বেও কোন কোন বিষয়ে পার্থক্যও দেখা দিয়েছিল। পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিও সংবিধানে প্রতিফলিত হয়েছিল। স্মরণে রাখতে হবে যে গণপরিষদ জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত কোন পরিষদ ছিল না। নির্বাচিত হয়েছিল বিভিন্ন রাজ্যের আইন সভার সদস্যদের দ্বারা। এমনকী সংবিধানের রূপকার ডঃ আম্বেদকর পর্যন্ত কিছু সতর্কবাণী শুনিয়েছিলেন।[১]

১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর গণপরিষদে সংবিধান বা শাসনতন্ত্র গৃহীত হওয়ার পর এবং ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি থেকে তা চালু হওয়ার আগে, এই জানুয়ারি মাসেই কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করল এবং নতুন শাসনতন্ত্রের প্রতি ধিক্কার জানালো। বলা হল এটি 'দাস শাসনতন্ত্র' বৈ অন্য কিছু নয়। এই শাসনতন্ত্রে ভারতীয় জাতির সার্বভৌমত্ব রূপ পায়নি, পেয়েছে ব্রিটিশ ও আমেরিকান শোষকদের কাছে তার দাসত্ব।[২]

৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০-এর 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হল 'দাস শাসনতন্ত্রের' বিরুদ্ধে মেহনতী জনগণের অভিযানের খবর। জেলায় জেলায় বিপ্লবী অভিযানের মধ্য দিয়ে

কমিউনিস্ট পার্টি 'দাস শাসনতন্ত্রের' বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল।[৩] সংবিধান চালু হওয়ার দিনে কলকাতায় দেশপ্রিয় পার্কের আশেপাশের চেহারা কীরকম ছিল, তারই এক সংবাদ পরিবেশন করেছিলেন 'স্বাধীনতা' পত্রিকার একজন রিপোর্টার।[৪] দাস শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম মেদিনীপুরে ব্যাপকতা লাভ করেছিল সবচাইতে বেশি। কেশপুরের ৭টি গ্রামে কৃষক জনতা গণ-অভ্যুত্থান শুরু করেছিল।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সংবিধান সম্পর্কে মূল্যায়ন ভ্রান্ত হলেও, পার্টি সেদিন সংগ্রামের মধ্যেই ছিল, যদিও সেই সংগ্রাম ছিল হঠকারী। সংবিধান সম্পর্কে এই মূল্যায়নও পরবর্তীকালে পার্টি সংশোধন করে এবং যতখানি সুযোগ এই সংবিধান দিয়েছে তাকে গ্রহণ করেই পার্টি এগিয়েছিল এবং সংগ্রাম করেছিল। যেমন ১৯৫২ সালে এই সংবিধান অনুসারেই পার্টি সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল।

(খ) শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন—১৯৪৯-৫০ সালে পার্টির কাছে আন্দোলন গড়ে তোলার বাস্তব সমস্যা থাকা সত্ত্বেও চটকলের শ্রমিকেরা সাধারণ ধর্মঘটের প্রস্তুতি নিয়েছিল, রেল শ্রমিকেরা মালিকদের ঘেরাও করেছিল, ছাত্রছাত্রীরা ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, ২৬শে জানুয়ারির 'দাস শাসনতন্ত্র' চালু হওয়ার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ক্রোধ উদ্‌গীরণ করেছিল এবং এইভাবে 'খুনী বিধান-নুরুল আমীন' মন্ত্রীসভা সবদিক থেকে আক্রমণের টার্গেট হয়েছিল। সেসময় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বিধান রায় এবং পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নুরুল আমীন। এইরকম এক পটভূমিকায় ধনিক-জমিদার-জোতদারের আজ্ঞাবহ বিধান-নুরুল আমীন সরকারের শত শত পুলিশ ঘাঁটি, হাজার হাজার সেবাদল-আনসার গুণ্ডাবাহিনীকে ভ্রুক্ষেপ না করেই পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার এক বিরাট অঞ্চল জুড়ে লক্ষ লক্ষ ক্ষেতমজুর-গরীব কৃষক ভাগচাষীর ফসল, মজুরি ও জমিদখলের ঐতিহাসিক অভিযান চলেছিল। এই অভিযানকে আরও জঙ্গী ক'রে তোলার জন্য এইসব দাবি নিয়ে "চীনের মত ক্ষমতা দখলের পথে" বিপ্লবী কৌশল গ্রহণের কথা পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির পক্ষ থেকে ২রা জানুয়ারি প্রচারিত হয়েছিল।[৫]

প্রসঙ্গত, এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ময়মনসিংহের টংক এলাকার প্রায় ৪০০ গ্রামে সেখানকার গরীব কৃষক—হাজং-ডালু-গারো-মুসলিম জনতা 'খুনী নুরুল আমীন' মন্ত্রীসভার শাসন অচল করে দিয়েছিল। সারা বাংলা জুড়ে জমি, রুটি, শান্তি ও স্বাধীনতার লড়াইকে তীব্র করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি দুই লক্ষ টাকার সংগ্রামী তহবিল পূর্ণ করার আবেদন জানিয়েছিল।[৬]

সেসময় পার্টির মনোভাবের মধ্যে ছিল "দেশগৃহযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে এগুচ্ছে ও এগোবে। বিপ্লবের জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবিপ্লব ঘোরতর হিংস্র হয়ে উঠছে এবং উঠবে"। তাই কমিউনিস্ট পার্টি এক পার্টি-চিঠি মারফৎ ২৪ পরগণা, কলকাতা, কাকদ্বীপ, মেদিনীপুর জেলার বহু অঞ্চল এবং হুগলী জেলার আরামবাগ জুড়ে সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের ডাক দিয়েছিল। ১ বছরের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গকে এক দুর্জয় ফ্রন্টে পরিণত করতে হবে। গেরিলা কায়দায় সংগ্রাম চালাতে হবে, শত্রুর কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে সশস্ত্র মুক্তিফৌজ গড়তে হবে। পার্টির কাছে দক্ষিণবঙ্গ ছিল মুক্তি সংগ্রামের ফ্রন্ট লাইন আর কলকাতা ছিল মূল শিবির।[৭]

এই সময় পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভার তরফ থেকে দু'টি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল—

'ভাগচাষ' ও 'ঘরশত্রু বিভীষণ' এই নামে। প্রথম বইয়ে বলা হয়েছে সরকার তো তে-ভাগা মেনেই নিয়েছে, আর লড়াই কেন? দ্বিতীয় বইয়ে বলা হয়েছে এত লড়াই ক'রে কংগ্রেস গরীবের রাজ কায়েম করল আর কমিউনিস্টরা অশান্তি ক'রে সেই ক্ষমতা কেড়ে নিতে চাইছে। এই বই তাই কমিউনিস্টদেরকে অভিহিত করেছে 'ঘরশত্রু বিভীষণ' বলে। 'স্বাধীনতা' পত্রিকার ১৯৫০-এর ২রা ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় সম্পাদকীয় লেখা হল 'বিভীষণের ফাঁদ'। এতে বলা হল "বিধান-নুরুল মন্ত্রীসভা বইখানার নাম 'ঘরশত্রু বিভাষণ' দিয়ে ঠিকই করেছে। সত্যি, কৃষকদের লড়াই কংগ্রেসী সরকারের মতো ঘরশত্রু বিভীষণদের বিরুদ্ধেই।"[৮]

সারা পশ্চিমবঙ্গে সুতীব্র খাদ্যসংকটের পটভূমিতে ভাগচাষী ও আধিয়ারদের তে-ভাগার লড়াই জোরদার করার ডাক দিল কমিউনিস্ট পার্টি। পার্টির আশা ছিল যে এই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে কৃষি বিপ্লব শুরু হয়ে যাবে।[৯]

কাকদ্বীপের কৃষক বীরদের সুদীর্ঘ কারাবাস ও প্রাণদণ্ডাদেশের অপচেষ্টাকে প্রতিহত করার জন্য দরকার তাদের নামে মামলার ডিফেন্সে দাঁড়ানো। এই মর্মে পার্টি অর্থসংগ্রহের জন্য সকল সদস্যদের কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছিল। যাদের নামে মামলা চলেছিল তাঁদের অন্যতম ছিলেন কংসারী হালদার।[১০]

শ্রমিকরাও সে সময় সংগ্রাম থেকে কোনভাবেই পেছিয়ে ছিল না। নেহেরু সরকারের 'লেবার রিলেসন্স বিল'-এর বিরুদ্ধে মজুরদের সচেতন করার জন্য সর্বতোভাবে প্রয়াসী ছিল। এই বিলের উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ শ্রমিক-স্বার্থ বিরোধী।[১১]

কমিউনিস্ট পার্টির কৃষক ফ্রাকশন নির্দেশ দিল তেলেঙ্গানার বীর কৃষকদের মৃত্যুদণ্ড রদ করার জন্য জনমত গড়ে তোলা দরকার। দলমত নির্বিশেষে সহি সংগ্রহের কাজেও তারা এগিয়ে এসেছিল।[১২]

১৯৫০ সালের শেষের দিকে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের ক্ষিপ্রতা ক্রমে ক্রমে কমে এসেছিল।

(গ) বাস্তুহারা আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টি—দেশ বিভাজনের পর পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মানুষদের নিয়ে বাস্তুহারা সমস্যা পশ্চিমবঙ্গে এক গুরুতর আকার ধারণ করেছিল। ১৯৫০-এর দাঙ্গার ফলে এই সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করল। এই সমস্যা মোকাবিলার জন্য প্রথমে একটি 'বাস্তুহারা কর্মপরিষদ' গঠিত হয়েছিল। এটি ব্যাপক ভিত্তিতে গঠিত হলেও বামপন্থী হঠকারী লাইনের জন্য এটি কাজের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে। কার্যক্ষমতাও ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। সংগঠনটি নামে মাত্র টিকে থাকে। পরে আরও ব্যাপক ভিত্তিতে আরেকটি সংগঠন গড়ে ওঠে। এটির নাম ছিল 'সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ'। এই সংগঠন যেমন বাস্তুহারাদের সমস্যা সমাধানের জন্য আন্দোলন করেছিল, তেমনি তাদের সেই আন্দোলনকে বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মূলস্রোতের সঙ্গে মেশাবার জন্য তাঁদের মধ্যে পার্টি-ইউনিট গঠনেরও প্রচেষ্টা পার্টি আন্তরিকভাবে করেছিল। এব্যাপারে বাস্তুহারা ফ্রন্টে যত বামপন্থী দল ছিল তাদের একতাকে বাস্তুহারা জনতার একতায় পরিণত করার এক আবেদন জানিয়েছিল পার্টি।

বাস্তুহারাদের পাশে সেসময় কমিউনিস্ট পার্টি এক বলিষ্ঠ ও প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। পার্টির বিভিন্ন গণসংগঠন যেমন : পিপলস্ রিলিফ কমিটি, নিখিল ভারত ছাত্র

ফেডারেশন, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি—এরাও এগিয়ে এসেছিল। এবিষয়ে অন্যান্য বামপন্থী দলগুলিরও অবদান ছিল যথেষ্ট। এছাড়াও ছিল আরও কিছু সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এরই পাশাপাশি ছিল দাঙ্গার আশংকা। ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারিতে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় দাঙ্গা শুরু হয়ে যায় এবং তা পশ্চিমবঙ্গেও ছড়িয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিতে থাকে। এমন অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির সামনে দু'টি কাজ প্রধান হয়ে দাঁড়ায়—(ক) বাস্তুহারাদের সমস্যা নিরসনের সংগ্রাম; (খ) দাঙ্গা যাতে পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে না পড়ে তারজন্য হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখার আন্দোলন চালু করা।

এ দু'টি কাজকে সামনে রেখে পার্টির তরফ থেকে কয়েকটি পার্টি-সার্কুলার পার্টির সর্বত্র পাঠানো হয়েছিল। যেমন : (১) দাঙ্গার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শ্রমিক শ্রেণিকেই নেতৃত্ব দিতে হবে।[১৩] (২) পূর্ব বাংলা থেকে আগত বাস্তুহারাদের প্রতি কমিউনিস্ট পার্টির ডাক।[১৪] (৩) 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সম্পাদকীয় বাস্তুহারাদের ঐক্যবদ্ধ করুন।[১৫] (৪) এছাড়া আরও কয়েকটি সার্কুলার ছিল। যেমন : (ক) বাস্তুহারা পত্রিকা সম্পর্কে পার্টির কর্তব্য, বাস্তুহারা প্রতিনিধি সম্মেলন এবং বাস্তুহারাদিগের সেবার জন্য রিলিফ কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন।[১৬]

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারত ও পাকিস্তান, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তান, এর সংখ্যালঘুদের নিয়ে যে ভূমিকা পালন ক'রে চলছিল, তাকে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা সংগঠিত করার চক্রান্তই বলা যায়। সেসময় কলম্বো সম্মেলনে নেহরু ও লিয়াকৎ আলি খাঁর উপস্থিতিতে এবং তাঁদেরকে রাজী করিয়েই এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল—তা হল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম দমন করার জন্য ভারতে ও পাকিস্তানে ইংরাজ ও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের সামরিক শক্তি মজবুত করতে হবে। কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি থেকে প্রকাশিত হল 'বাংলায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর চক্রান্ত থেকে সংখ্যালঘুদের বাঁচার পথ'।[১৭]

(ঘ) পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলে বিধান রায়ের সরকার কমিউনিস্ট ও গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষদের ১৯৪৯ সালের বিভিন্ন সময়ে বন্দী করে রেখেছিল। এই সংখ্যা কমিউনিস্ট পার্টির মতে ছিল ৭০০-র বেশি। জেলে তাঁদের কোন 'রাজবন্দী'র মর্যাদা ছিল না। একই অবস্থা ছিল পূর্ববঙ্গেও। সেসময় 'রাজবন্দী মুক্তি সংগ্রাম' নামে এক দৈনিক বুলেটিন প্রকাশিত হত। আলিপুর জেল-এ অনশন শুরু হলে তাঁদের ওপর ৫ই জানুয়ারি (১৯৫০) জেল কর্তৃপক্ষ সশস্ত্র সিপাইদের দিয়ে পাশবিকভাবে আক্রমণ চালিয়েছিল। এই আক্রমণে বহু জেলবন্দী আহত হয়েছিলেন। সবচেয়ে বেশি আহত হয়েছিলেন দার্জিলিঙের মজুর নেতা এবং এম.এল.এ. রতনলাল ব্রাহ্মণ। তাঁকে রক্তাক্ত ও অজ্ঞান অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজে আনা হয়েছিল। এই অনশন কর্মসূচি পশ্চিমবাংলার বড় বড় সব জেলে ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকী ঢাকা জেলাতেও তা ছড়িয়ে পড়ে।

বিধান রায় মন্ত্রীসভার নির্দেশে মেদিনীপুর জেল, বহরমপুর জেল, দমদম জেলের রাজবন্দীদের ওপর অত্যাচার চালানো হয়েছিল। দমদম জেলে যাদের অবস্থা আশংকাজনক হয়ে পড়েছিল, তাঁরা হলেন : হুগলীর কানাই চ্যাটার্জি, হাওড়ার কৃষক নেতা শরৎ পণ্ডিত ও শিবপুরের শম্ভু সেন, শিলিগুড়ির নৃপেন বসু ঔ শৈলেন দত্ত প্রমুখ। ৭ই জানুয়ারি কলকাতার বিভিন্ন স্থানে চলেছিল বন্দীমুক্তির লড়াই। বিভিন্ন জেলে শ্রমিক নেতারাও অনশন কর্মসূচিতে

অংশগ্রহণ করেছিল।[১৮] 'স্বাধীনতা' পত্রিকার ৬ই ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় বলা হয়েছে যে ৫২ দিন অনশনের পরও রাজবন্দীদের সংগ্রাম ছিল অব্যাহত। সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হল 'বন্দীদের ওপর অত্যাচারের জবাব দাও'।[১৯]

(ঙ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিপর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকির ওপর আণবিক বোমা বিস্ফোরণ এবং চীন ও এশিয়ার অন্যত্র যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে দেবার চিন্তা পোষণ করার মধ্যে দিয়ে প্রকট হয়ে পড়েছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধবাজনীতি। কমিউনিস্ট পার্টি শান্তি আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে দল, মত ও শ্রেণি নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষকে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে সমাবিষ্ট করার কথা ঘোষণা করেছিল। একাজে সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি এবং চীন-ভারত মৈত্রী সমিতি প্রভৃতি গণসংগঠনগুলি সক্রিয় ও উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি শান্তি আন্দোলনের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিল ১৯৫০ সালের শুরু থেকেই। ঘোষণা করেছিল এবং সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে প্রচার চালিয়েছিল 'সোভিয়েত-চীন-ভারত মৈত্রীর ও সহযোগিতার পথই হল শান্তি, স্বাধীনতা ও প্রগতির পথ'।[২০]

শান্তি আন্দোলনের ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিল নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন। এই সংগঠনের মুখপত্র 'The Student' পত্রিকার ১৯৫০-এর ২২ এপ্রিল সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা হল Peace Movement—A New Stage, এই লেখায় ১৩-১৯শে মার্চে World Peace Committee-র ষ্টকহোম শহরে অনুষ্ঠিত সভায় খবরটি প্রথম পাতায় ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন সুনীল মুন্সী। তিনি তাঁর সম্পাদকীয়তে লিখলেন 'The Nehru-Liaquat Pact.'[২১]

১৯৫০ সালে ১৫-১৯শে মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত ষ্টকহোমে বিশ্বশান্তি সংসদের পক্ষ থেকে এক অধিবেশন হয়েছিল। উদ্দেশ্য হল আণবিক বোমার ভীতির বিরুদ্ধে জনমত সংগ্রহ করার এবং তা নিষিদ্ধ করার দাবি তোলা। প্রসঙ্গত, পাঁচ বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহরে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করেছিল এবং বহু মানুষ সহ শহর দু'টিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। আর এই অভিবেশনেরই কয়েক সপ্তাহ আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাইড্রোজেন বোমার বিকাশ ঘটনার কথাও ঘোষণা করেছিল। এরই বিরুদ্ধে ছিল ষ্টকহোম শহরের এই অধিবেশন। এই অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন ৩৪টি দেশ থেকে ১২০ জন প্রতিনিধি। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী জোলিও কুরী আণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির প্রতি সমর্থন জানিয়ে উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছিলেন। সমাপ্তি দিবসে একটি আবেদন ঘোষণা করা হয়েছিল যা 'ষ্টকহোম আবেদন' নামে পরিচিত ছিল।

এই আবেদন সারা বিশ্বে শান্তি সংসদের সংগঠনের কাছে পৌঁছে গেল স্বাক্ষর সংগ্রহের উদ্দেশে। আট মাসের মধ্যে ৪৫ কোটি মানুষ এতে সই দিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের শান্তি সংসদও এব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। কলকাতার বড় বড় রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে সই সংগ্রহের কাজ চলেছিল। সঙ্গে ছিল এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে পুস্তিকা, ব্যানার ইত্যাদি। কলকাতার কয়েকজন, যার মধ্যে চিত্ত বিশ্বাস অন্যতম, 'Star Collector'-এর সম্মান পেয়েছিলেন।[২২]

পার্টির তরফ থেকে ১৯৫০ সালের নভেম্বর বিপ্লব দিবসে যুদ্ধমত্ত সাম্রাজ্যবাদী

শিবিরের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতা ও শান্তিকামী জনসাধারণের সম্মিলিত ব্যাপক সমাবেশ গড়ার আহ্বান জানানো হয়েছিল।[২৩] তখন ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট নেপালের রাণাশাহীর বিরুদ্ধে নেপালের সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিল প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি। সমর্থন জানিয়েছিল নেপালী কংগ্রেস, নেপালী রাষ্ট্রীয় কংগ্রেস এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগঠনের সঙ্গে সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠনের জন্য নেপালের কমিউনিস্ট পার্টির আবেদনকে।[২৪]

কোরিয়ার ম্যাকআর্থারের সাম্রাজ্যবাদী বাহিনী কোরিয়ার গণমুক্তি ফৌজের কাছে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে বলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এটম বোমা দিয়ে কোরিয়াকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। বাংলার পার্টি সেদিন "অবিলম্বে এটম বোমা বে-আইনি কর, ব্যাপক ধ্বংসের সমস্ত অস্ত্র বে-আইনি কর, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বন্ধ কর, কোরিয়া ও ফরমোসা থেকে বিদেশী সৈন্য সরাও, নেহরু সরকার ইঙ্গ-মার্কিন জোট ছেড়ে দাও" প্রভৃতি দাবি নিয়ে সভ্য সমর্থকদের আন্দোলনে নামার নির্দেশ দিয়েছিল।[২৫] এরই পাশাপাশি আরও দাবি তুলেছিল "ট্রুম্যানের এটম হুমকির জবাব দিন, শান্তি আন্দোলনকে শক্তিশালী করুন"।[২৬]

এইরকম এক পটভূমিকায় স্টালিনকে গণ্য করা হত "শান্তি ও মানবমুক্তির বিশ্বজোড়া সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিনায়ক" হিসাবে এবং সেই বিবেচনার বাংলার পার্টি "মহান স্টালিনের যুগান্তকারী নেতৃত্ব ও ভূমিকার কথা" জনগণের কাছে তুলে ধরার জন্য পার্টি সভ্য ও দরদীদের কাছে তাঁর জন্মদিবস পালনের নির্দেশ দিয়েছিল।[২৭] শান্তি আন্দোলনের নেতৃবর্গের সঙ্গে পাবলো নেরুদার যে কথোপকথন হয়েছিল, তার গুরুত্ব বিবেচনায় বাংলার পার্টি সেটিও প্রকাশ করেছিল।[২৮]

১৯৫০-এর শুরু থেকেই ভারতবর্ষের কেউ কেউ আওয়াজ তুলেছিলেন পূর্ববঙ্গ জয় করতে হবে। এব্যাপারে নেহরু প্যাটেলকে সমর্থনের কথাও শোনা গেছিল। কমিউনিস্টদের কাছে এই ধরনের সমর্থন ছিল ব্রিটিশ কমনওয়েলথের পিছনে এসে দাঁড়ানো। আসলে ভারতের যেকোন সমস্যা, তা সেটা কাশ্মীর হোক, দাঙ্গা হোক বা যুদ্ধ বাধানোর চেষ্টাই হোক, তা কিন্তু কমনওয়েলথে থাকার জন্য সমাধান হয়নি। সুতরাং পার্টির তরফ থেকে আওয়াজ উঠেছিল 'কমনওয়েলথ ছাড়ো'।[২৯]

১৯৫০ সাল জুড়ে পার্টির মধ্যে তিন ধরনের চিত্র পাশাপাশি দেখা গেছিল। একটি হল ১৯৪৮-এর সংকীর্ণতাবাদী ও হঠকারী লাইন অনুসারী সংগ্রামের চিত্র এবং তার ক্রম-ব্যর্থতায় সংগ্রামের স্তিমিত চরিত্র গ্রহণ। অন্যটি হল, পার্টি লাইন পরিবর্তনের তত্ত্বগত প্রক্রিয়া। তৃতীয়টি হল পার্টি সংগঠন পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া। এ নয় যে একটা প্রক্রিয়া শেষ হবার পর আরেকটি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। সংগ্রাম-লাইন পরিবর্তন-সংগঠন পুনর্গঠন—এই তিন প্রক্রিয়াই বিজড়িতভাবে এগিয়ে চলেছিল।

সংকীর্ণতাবাদী লাইন পরিবর্তনের চিন্তা শুরু

কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে বি. টি. রণদীভের নেতৃত্বে বাম সংকীর্ণতাবাদী রাজনৈতিক প্রস্তাব এবং ১৯৪৮ সালের শেষাশেষি অন্ধ্র প্রাদেশিক পার্টির সম্পাদকমণ্ডলীর প্রতিবেদন—এই দু'টি দলিল পার্টির সামনে তিনটি বড় প্রশ্ন হাজির করেছিল। সেগুলি হল :

(ক) ভারতের স্বাধীনতা কি মেকি? (খ) রুশ বিপ্লবের পথ নাকি চীন বিপ্লবের পথ—কোন্‌টা ভারতের ক্ষেত্রে সিপিআই প্রয়োগ করবে? (গ) ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণি কি সাম্রাজ্যবাদের তল্পীবাহক? এগুলি পার্টির জীবনে কেবল তত্ত্বগতভাবে নয়, সাংগঠনিক দিক থেকে সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। তাই দরকার হয়েছিল এগুলির ওপর মনোযোগ দেওয়া এবং সমাধানের রাস্তা বার করা।

কমিনফর্মের লাইন—পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের লাইন নিয়ে যখন সদস্যরা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে হোঁচট খেতে থাকল, বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত আন্দোলন থেকে গণঅভ্যুত্থানের স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হল না, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সদস্যদের মধ্যে নেমে এল হতাশা এবং সর্বোপরি পার্টির সদস্যরা ও সমর্থকেরা পার্টির লাইন সম্পর্কে সংশয়ী হয়ে উঠল, তখনই কমিনফর্মের মুখপত্র 'ফর এ লাস্টিং পীস্ অ্যাণ্ড ফর এ পিপলস্ ডেমোক্রেসী (LPPD)'-র সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হল 'উপনিবেশ ও পরাধীন দেশসমূহে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরাট অগ্রগতি' শীর্ষক প্রতিবেদন। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫০ সালের ২৭শে জানুয়ারি।[৩০]

এখানে আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার। যোগসূত্র আছে কিনা তা নিঃসংশয়ে বলা না গেলেও, বিষয়টির অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক নয়। বিষয়টি হল, কমিউনিস্ট পার্টির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশী ১৯৫০ সালের ১৩ই জানুয়ারি এক দীর্ঘ চিঠি পাঠিয়েছিলেন ভারতের বাইরের ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির কাছে। এই চিঠি Letter to Foreign Comrades নামে পরবর্তীকালে মুদ্রিত হয়েছিল। এই বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেগুলি হল :

(ক) পি. সি. যোশী পার্টি থেকে বহিষ্কারের খবর প্রেস মারফৎ জানতে পারার পর, তিনি 'disturbed emotional state'-এ এই দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন। এই চিঠির সঙ্গে তিনি পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস সংক্রান্ত প্রায় ১০টি দলিলও সংলগ্নীভূত করেছিলেন। এতে তিনি তার আমলের অতীত ভুলগুলিকে তুলে ধরেছিলেন। পাশাপাশি তুলে ধরেছিলেন পরবর্তীকালের অর্থাৎ 'রণদীভের আমলে'র 'ever mounting revolutionary upsurge'-এর নামে কিছু মৌলিক ভুলের কথা। ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলিকে তিনি বলেছিলেন, "The central point that will strike you when you study our party documents and policy is that we have made a swing from Right Reformism to Left Sectarianism."[৩১]

(খ) পি. সি. যোশী উক্ত চিঠির প্রায় ১ মাস পর ১০ই ফেব্রুয়ারি এই 'Letter to Foreign Comrades'টি একটি সহায়ক পত্র সহযোগে পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক বি. টি. রণদীভেকে পাঠান। তাঁর উদ্দেশ্যের কথা তিনি এই সহায়ক তথ্যে ব্যক্ত করেছিলেন এইভাবে—"... if I can contribute something towards correcting the mistakes of today, it will be some concrete atonement for my past sins."

(গ) পি. সি. যোশীর ওপর অভিযোগ আনা হয়েছিল যে তিনি নাকি "পৃথক একটি পার্টি" গঠন করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। এটা যে সম্পূর্ণ অসত্য তার জবাব তিনি দিয়েছিলেন একটি বিবৃতি মারফৎ।[৩২]

কমিনফর্মের সম্পাদকীয়র ওপর পি. সি. যোশী'র "Letter to Foreign Comrades"-এর ছাপ পড়েছিল কিনা সে বিষয়ে অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে। নাকি, এই

সম্পাদকীয়টি ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিদ্যমান পরিস্থিতি বিষয়ে 'কমিনফর্মের মূল্যায়ন'।

কমিনফর্মের এই সম্পাদকীয়তে সাধারণভাবে তিনটি বিষয় তুলে ধরা হয়েছিল। এগুলি হল : (ক) ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে চীন জনগণের সাফল্যের এক বড় অবদান রয়েছে। চীন বিপ্লবের বিজয়লাভের বিশ্লেষণ ক'রে তার অন্যতম নেতা লি সাও চি'র বক্তব্যও সেই কমিনফর্মের সম্পাদকীয়তে তুলে ধরা হয়েছে। চীনের নেতা বলেছিলেন, "চীন যে পথ অনুসরণ করেছে ... সেই পথই জাতীয় মুক্তির জনগণতন্ত্রের সংগ্রামে ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশের জনগণের গ্রহণ করা উচিত। অর্থাৎ চীনের জনগণের পথই হল ভারতের পথ"। (খ) প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে যখন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জনগণের মুক্তিফৌজ গঠন সম্ভব হয়ে ওঠে, তখন সেটাই হয়ে দাঁড়ায় জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের এক নিয়ামক শর্ত। (গ) সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সমস্ত শ্রেণি, পার্টি, গ্রুপ ও সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত মোর্চা তৈরি করতে হবে। এর নেতৃত্বে থাকবে শ্রমিকশ্রেণি ও তাদের অগ্রবাহিনী কমিউনিস্ট পার্টি।

সুনির্দিষ্টভাবে এই সম্পাদকীয়তে ভারত প্রসঙ্গে কয়েকটি কথার উল্লেখ ছিল। যেমন : (ক) ভারতের উপর এক ভুয়া স্বাধীনতা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের 'পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়' স্বার্থ রয়ে গেছে। মাউন্টব্যাটেন বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ রয়ে গেছে এবং ভারতকে সে অক্টোপাসের মতন তাঁর রক্তাক্ত শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে। (খ) এই অবস্থায় ভারতের কমিউনিস্টদের কাজ হল চীন ও অন্যান্য দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অভিজ্ঞতা নিয়ে শ্রমিক শ্রেণির সঙ্গে স্বভাবতই সমস্ত কৃষকের মৈত্রীকে শক্তিশালী করা এবং জরুরি প্রয়োজনীয় কৃষি সংস্কার প্রবর্তনের জন্য লড়াই করা। যারা দেশের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে, সেই ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে এবং তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে সেই প্রতিক্রিয়াশীল বৃহৎ বুর্জোয়া ও সামন্ত রাজাদের বিরুদ্ধে, দেশের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য একই সাধারণ সংগ্রামের ভিত্তিতে সমস্ত শ্রেণি, পার্টি, গ্রুপ ও সংগঠন যারা ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা এবং মুক্তিকে রক্ষা করতে ইচ্ছুক তাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ করাটাই হল অন্যতম কাজ।

এই সম্পাদকীয়র ইতিবাচক দিক হল এতে বিপ্লবের স্তর ও রণকৌশলের উপর একটা বক্তব্য ছিল। যেমন : সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণির বিরুদ্ধে সকলকে নিয়ে একটি যুক্তফ্রন্ট গঠনের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, তাতে শ্রমিক, সমগ্র কৃষক, বৃহৎ বুর্জোয়া নয় এমন জাতীয় বুর্জোয়ার অংশ, মধ্যবিত্ত সকলকে নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠনের কথা ভাবা হয়েছিল। অর্থাৎ বৃহৎ বুর্জোয়া নয় এমন বুর্জোয়াদের এবং ধনী কৃষকদেরও এই যুক্তফ্রন্টে থাকার কথা বলা হল। দ্বিতীয় ইতিবাচক দিক হল এতে সশস্ত্র পথে বিপ্লব করাটাকে বাধ্যতামূলক বলে গণ্য করা হল না।

এই প্রবন্ধের নেতিবাচক দিকও ছিল। বলা হল, ভারতের স্বাধীনতা হল মেকী। চীনের জনগণ যে পথ নিয়েছে সেই পথই হল ভারতের পথ। অন্ধ্র দলিলের রচয়িতারা ভাবতে আরম্ভ করলেন যে কমিনফর্মের লাইন তাদের বক্তব্যকেই সঠিক বলে মনে করছে। এই ব্যাপারে তাঁরা প্রচারও শুরু করে দিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে কমিনফর্ম লাইনের প্রতিক্রিয়া

কমিনফর্মের সম্পাদকীয়তে কয়েকটি ইতিবাচক দিকের জন্য পশ্চিমবঙ্গের পার্টি সদস্যরা যেন কিঞ্চিত আলোর সন্ধান পেলেন। তাঁরা উৎসাহিতও হলেন। তবে পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং প্রাদেশিক নেতৃত্ব এই লাইনকে একেবারেই আমল দিতে চাইলেন না। তাঁরা চেষ্টা করলেন একে-বারে চেপে রাখতে। কিন্তু কমিনফর্মের বক্তব্য শরৎ বসুর 'নেশন' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার দরুন সকলের নজরে পড়ে গিয়েছিল। এই লাইন যেন এক মুক্তির হাওয়া ছড়িয়ে দিল বে-আইনি পার্টির সর্বস্তরে। কমরেডরা সম্পাদকীয়টি গভীরভাবে পড়তে ও পড়াতে শুরু করলেন। বিভিন্নভাবে তা পৌঁছে গেল সকলের কাছে। এমনকি বহিষ্কৃত পার্টি সদস্যরা নতুন করে উৎসাহ দেখাতে শুরু করলেন। পারস্পরিক আলোচনা শুরু হয়ে গেল। চলল আন্তঃ পার্টি সংগ্রাম।

আলোচনার মধ্যে থেকে কিছু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল, আবার অনেক কিছুই অস্পষ্ট থেকে গেল। কোন কোন কমরেড এমনও বললেন যে, পায়ের নীচে জমি পাওয়া গেল। আবার কেউ কেউ বিপ্লব সমাগত বলে তখনও আশায় থেকে গেলেন। এইভাবেই পুরোনো লাইন পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল এবং চলতে থাকল নতুন লাইনের অন্বেষণ। এইভাবেই কমিনফর্মের লাইন পার্টি সদস্যদের চিন্তায় একটা বড় ধরনের নাড়া দিল।

বাম সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় স্তরে আন্তঃ পার্টি সংগ্রামের একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন পি. সি. যোশী। এই সময়ে তাঁর মতো নেতাকেও পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। প্রাদেশিক স্তরে অনেকে বামসংকীর্ণতাবাদী লাইনের পক্ষে ছিলেন, আবার অনেকে বিপক্ষে ছিলেন। সকলেই সম্পাদকীয়কে সামনে রেখে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং পার্টির বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। সেই সময়কার পার্টি সদস্যদের মানসিকতা টের পাওয়া যায় মণিকুন্তলা সেন-এর মানসিকতা থেকে। তিনি তখন প্রেসিডেন্সী জেলে। তিনি বলেছেন, "... দৈনিক কাগজে দেখলাম 'ফর দি লাস্টিং পীস্ এ্যাণ্ড ডেমোক্রেসী'-র একটা উদ্ধৃতি। 'লাস্টিং পীস' বেরুতো বুখারেস্ট থেকে। ঐ কাগজকে আমরা আন্তর্জাতিক পার্টির মুখপত্র বলে জানতাম। ঐ কাগজে লেখা হয়েছে ভারতের গণতান্ত্রিক আন্দোলন হবে জাতীয় বুর্জোয়া দল, শ্রমিক এবং ধনী চাষী আর গরীব চাষী সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে। আগে অলকার চোখেই পড়েছিল খবরটা। সে সবাইকে ডেকে দেখাল। কী কাণ্ড! আমরা তো তখন শ্রেণি সংগ্রাম করছিলাম। সঙ্গী ছিল শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, চাষী ও ক্ষেতমজুর। বাকী সবাই শত্রুপক্ষ। কিন্তু ঐ পত্রিকায় বর্ণিত গোষ্ঠী নিয়েই যদি আবার মিত্রতা গড়তে হয়, তাহলে এতদিন করছিলামটা কি? 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়' বলে জেলেই বা এলাম কেন? আর উপোস করেই বা মরছি কেন? প্রথমে এটা বুর্জোয়া কাগজের মিথ্যে খবর মনে করতেই ইচ্ছে হলো। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মূল দলিল পেয়ে গেলাম। সন্দেহ রইল না—এ নিয়ে পার্টির মধ্যে তোলপাড় হবে।"[৩৩]

যাই হোক, জেলে বসেই শুরু হয়ে গেল সেই দলিলের উপর আন্তঃপার্টি সংগ্রাম। সম্পাদকীয়টি অন্তত একটি কাজ করতে পেরেছিল যে সেটি সকলকে আলোচনায় বসতে বাধ্য করেছিল। পার্টির অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের মুক্ত হাওয়া যেখানে অবরুদ্ধ ছিল, এখন যেন সেই পরিবেশের অবসান ঘটতে শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গের পার্টিতে শ্বাসরোধকারী পরিবেশ তৈরি হওয়ার কারণগুলির মধ্যে ছিল : (ক) পার্টির গণতান্ত্রিক পরিবেশের উপর কেন্দ্রিকতার

আরোপ; (খ) পুরোনো পার্টি কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন পার্টি কমিটি গঠন; (গ) মধ্যবিত্তরা বিপথগামী করে দিতে পারে এই কথা বলে তাঁদেরকে দূরত্বে রাখা; (ঘ) পার্টির মধ্যে শত্রুচরের প্রবেশ সম্পর্কে প্রচার।

এই শ্বাসরোধকারী পরিবেশ অবসানের চেষ্টা সকলেই করতে থাকল কমিনফর্মের সম্পাদকীয় লাইনের মধ্য দিয়ে। ইতিমধ্যেই পার্টির অতিবামপন্থী হঠকারিতার লাইন পার্টির অনেক ক্ষতি করে দিয়েছিল। পার্টির সদস্যপদ সারা ভারতে ১ লক্ষ থেকে কমে দাঁড়িয়েছিল বিশ হাজারে। কমিউনিস্ট প্রভাবান্বিত ট্রেড ইউনিয়নগুলি পঙ্গু ও বদ্ধ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিল। এদেরও সদস্যপদ কমে গেছিল ৮ লক্ষ থেকে ১ লক্ষে এবং পার্টি পরিচালিত কৃষক সভা মোটের উপর উঠেই গেছিল। বাংলা, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের কিছু অঞ্চলে এই সংগঠনের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। আর তেলেঙ্গানা অঞ্চলে বেশ ভালই ছিল। এসময়ে পার্টির তরফ থেকে কোন পত্রিকাও প্রচারিত হত না, যা হত তাও বন্ধ হয়ে গেল।[৩৪] এ.আই.টি.ইউ.সি-তে এই সময়ে যে ভাঙন হয়েছিল, তার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়া

সর্বত্র আন্তঃপার্টি সংগ্রামের আলোচনায় পার্টিসদস্য এবং প্রাক্তন সদস্যদের লিপ্ত হতে দেখে পলিটব্যুরো ১৯৫০ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতি প্রদান করে।[৩৫] এই বিবৃতির মধ্যে দিয়ে পলিটব্যুরো কমিনফর্মের 'লাস্টিং পীস'-এর সম্পাদকীয়র প্রতি মৌখিক সমর্থন জানায়। এই সম্পাদকীয় সহ পলিটব্যুরোর বিবৃতি সমস্ত সদস্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। পলিটব্যুরো এই সম্পাদকীয় সম্পর্কে যা যা বলেন, তা হল : (ক) ভারতের স্বাধীনতা ও জনগণতন্ত্রের সংগ্রামে এই দলিল এক 'চমৎকার অবদান'। (খ) ঔপনিবেশিক দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বিপুল অগ্রগতির কাছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত ভারতীয় জনগণের মুক্তিসংগ্রাম অনেকটা পেছিয়ে আছে। (গ) এটা দূর করার জন্য লেনিন ও স্ট্যালিন অনুসৃত রণনীতি ও রণকৌশল সংক্রান্ত শিক্ষাকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে প্রয়োগ করতে হবে। (ঘ) বিবৃতিতে চীনের অভিজ্ঞতা ও পথের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। (ঙ) যুক্তফ্রন্ট কাদেরকে নিয়ে হবে এবং তা যে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে করতে হবে একথা বলা হয়।

এত কথা বলার পর পলিটব্যুরো পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি যে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এক বড় পদক্ষেপ এই স্বীকৃতিও দেয় ঐ বিবৃতিটি। অর্থাৎ কমিনফর্মের সম্পাদকীয়টিকে মৌখিকভাবে সমর্থন করেও, তার তাৎপর্য বুঝতে ব্যর্থ হল। পার্টির যে মূল রণনীতিতেই ভুল রয়েছে তা স্বীকার করা হল না।

বাংলার প্রাদেশিক কমিটি পলিটব্যুরোর বিবৃতিকে স্বাগতও জানাল এবং সমালোচনাও করল। তবে উভয়েই এক ব্যাপারে সহমত পোষণ করল যে 'লাস্টিং পীস'-এর সম্পাদকীয় পার্টির অভ্যন্তরে আলোচনার যে জোয়ার তুলেছে, তা সবই হল 'যোশীপন্থী'দের কাজ। এই মনোভাব থাকার জন্য আন্তঃপার্টি সংগ্রামে উভয় নেতৃত্বই অনীহা প্রকাশ করল। পার্টি যে সেই সময় কাজকর্ম ও আন্দোলনে পেছিয়ে পড়েছিল তার কারণ হিসাবে বিবৃতিতে বলা হয় যে, "এই পিছিয়ে যাবার কারণ হচ্ছে এই যে শ্রমিক ও মেহনতি জনতার সংগ্রামগুলির অবাধ বিকাশ এবং সাহসী পরিচালনায় যে সংস্কারবাদ বাধা দিচ্ছিল তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময়

পলিটব্যুরো গোঁড়ামি এবং সংকীর্ণতার দিকে কতকগুলি ভুল করে। এই সব ভুল এসমস্ত সংগ্রামের বিস্তার সীমাবদ্ধ করে দেয় এবং তাতে ব্যাপকতম জনতাকে জমায়েত করার কাজে বাধা সৃষ্টি করে।"

প্রাদেশিক পার্টির নেতৃত্ব যাই মনে করুক না কেন "পার্টি র‍্যাঙ্কের মতে পিবি'র বিবৃতি আদৌ অকপট নয়। তাদের মনে হয়েছে, কমিনফর্মের ত্রুটি স্বীকারের আড়ালে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেছেন পিবি। উপরন্তু পিবি-কৃত বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদী বিচ্যুতি ও তার পরিণতিকে লঘু করে দেখানোর উৎকট প্রয়াসের নিদর্শন এই বিবৃতিটি।"[৩৬]

১৯৫০ সালের মার্চ মাসে 'প্রোসেক্ট' পার্টির সমস্ত সভ্য ও দরদীদের জন্যে সার্কুলার নং ১৬ মারফৎ দু'টি আবেদন রাখল, (ক) কমিনফর্ম সম্পাদকীয়র ওপর আলোচনার মধ্য দিয়ে পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করুন এবং (খ) টিটোপন্থী-যোশীবাদীদের বিচ্ছিন্ন করুন। এই সার্কুলারে বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উল্লেখ থাকলেও, কোন বলিষ্ঠ আহ্বান ছিল না। তবে দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদের ভেদনীতির বিরুদ্ধে সমগ্র পার্টিকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল।[৩৭]

এরপর পলিটব্যুরো থেকে আরেকটি দলিল প্রকাশিত হল ১৯৫০ সালেরই ৭ই এপ্রিল তারিখে। পিবি'র পূর্ব দলিলে প্রকৃত কোন আত্মসমালোচনা ছিল না। এই দলিলে তার উল্লেখ পাওয়া গেল। এতেই স্বীকার করে নেওয়া হল "আমাদের বিপ্লবের স্তর, কর্মনীতি এবং শ্রেণি সম্পর্ক নির্ণয় করার ব্যাপারে গুরুতর 'বামপন্থী সুবিধাবাদী' বিচ্যুতি হয়েছিল।" তবে এই দলিলে বলা হয় যে রুশ পথ নয়, চীনের পথেই ভারতের বিপ্লব ঘটাতে হবে। এই দলিলের শিরোনামটি ছিল "ভারতের জনতার গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান কর্তব্য।" পিবি'র এই খসড়াটি ছিল কেন্দ্রীয় কমিটিতে এবং পার্টির সভ্যদের ভিতর আলোচনার জন্য। মোটের ওপর এই দলিলের দু'টি উদ্দেশ্য ছিল—(ক) সঠিক কর্মনীতি ও কৌশল স্থির করা এবং (খ) বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদ ও দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা।[৩৮]

এই কারণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি ৪ঠা মে, ১৯৫০-এ সমস্ত পার্টি সভ্যের প্রতি আবেদন জানিয়েছিল "নতুন লাইন তৈরি করার লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী" করার জন্য। এতে বলা হল সমস্ত পার্টি যেন পলিটব্যুরোর দলিলকে কমিনফর্মের সম্পাদকীয় এবং মার্ক্সবাদ-লেলিনবাদের আলোকে আলোচনা করার চেষ্টা করেন।[৩৯]

কেন্দ্রীয় কমিটির সভাও ডাকা হল। পার্টির সাংগঠনিক অবস্থা বি. টি. রণদীভের আমলে, এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে এর পূর্বে কোন কেন্দ্রীয় কমিটিরে সভাই ডাকা হত না। সব কিছুই চলছিল পিবি'র নামে। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের পর এই প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির সভা আহূত হল—১৯৫০ সালের ২০শে মে থেকে ১লা জুন পর্যন্ত। এই সভা হয়েছিল গোপনে কলকাতায়। "গঙ্গার ধারে হাওড়ার এক বাগানবাড়ীতে মিলিত হলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা। নির্বাচিত মোট ৩১ জন সদস্যের মধ্যে সভায় উপস্থিত ছিলেন ১৯ জন। ইতিমধ্যে কমরেড ভরদ্বাজ প্রয়াত। ছয়জন সদস্য কারাবাস করছেন। দু'জন কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে অপসারিত, একজনকে সভায় বসতে দেওয়া হয়নি এবং দু'জন অজ্ঞাত কারণে অনুপস্থিত।"[৪০]

কেন্দ্রীয় কমিটির এই সভা থেকে এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত পি.বি.'র "ভারতের জনতার

গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান কর্তব্য" শীর্ষক খসড়া দলিলটিকে বাতিল করা হয়। অন্ধ্র কমরেডদের দলিল "পলিটব্যুরোর বাম-সংকীর্ণতাবাদী সাংগঠনিক কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন"-এর ভিত্তিতে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। অন্ধ্র দলিলের মোদ্দা কথা ছিল : (ক) দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের রণদীভের থিসিসকে অস্বীকার; (খ) রণদীভের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের বিজড়ন প্রক্রিয়াকে অস্বীকার; (গ) জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের শত্রুদের মধ্যে ধনী-কৃষকসহ সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণি অন্তর্ভুক্ত—এই ধারণাকে অস্বীকার; (ঘ) ভারতীয় বিপ্লবের জন্য চীনের পথই প্রযোজ্য; (ঙ) তেলেঙ্গানার মতো ব্যাপক কৃষিবিপ্লবের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

এই দলিলের মূল কথাগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাংগঠনিক পরিবর্তনেরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। যেমন : (ক) রণদীভেকে সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল এবং পরিবর্তে সি. রাজেশ্বর রাওকে করা হল সাধারণ সম্পাদক। (খ) ১১ জনকে নিয়ে এক কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হল। এতে ৯ জনের নাম উল্লেখ করা হয় এবং দু'জনের নাম বাকী থাকে। এই ৯ জনের মধ্যে ছিলেন—সি. রাজেশ্বর রাও (সাধারণ সম্পাদক), এম. বাসবপুন্নিয়া, বীরেশ মিশ্র, পি. সুন্দরাইয়া, ডি. ভেঙ্কটেশ্বর রাও, সোমনাথ লাহিড়ী, ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপদ, মণি সিং, এস. ভি. পারুলেকর।[৪১] এদের মধ্যে প্রথম ৩ জনকে নিয়ে গঠিত হয় নতুন পি.বি.। কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে ৪ জনই ছিলেন অন্ধ্রের। পার্টির নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তগুলি একটি দীর্ঘ চিঠি মারফৎ সব পার্টি সদস্য এবং সমর্থকদের কাছে পাঠানো হল।[৪২] সেসময় পার্টির মুখপত্র ছিল 'Communist' যার সম্পাদকমণ্ডলীও পুনর্গঠিত করা হল। কেন্দ্রীয় কমিটি এবং মুখপত্রের পুনর্গঠন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল কারণ নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির মতে রণদীভে ছিলেন "বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদী ট্রটস্কিপন্থী লাইনের উদ্যোক্তা, রূপকার ও গোঁড়া সমর্থক"।[৪৩]

রাজেশ্বর রাও-এর অন্ধ্র লাইনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার আগে থেকেই তা অনেকের কাছেই গ্রহণীয় হয় নি। ডাঙ্গে ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, 'Some Notes on the Roots of Our Mistakes After Calcutta' এতে তিনি অন্ধ্র লাইনের সমালোচনা করেছিলেন। এর পরেই সেপ্টেম্বর মাসে বেরোল অজয় ঘোষ (ছদ্মনাম প্রবোধ চন্দ্র), ডাঙ্গে (ছদ্মনাম প্রভাকর) এবং ঘাটে (ছদ্মনাম পুরুষোত্তম) এই তিন জনের নামে একটি বিবৃতি। এঁদের ছদ্মনামের প্রথম অক্ষর 'P' দিয়ে এই বিবৃতিকে বলা হল 'Three P's Letter.' এতে বলা হল, তাঁরা বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির, যার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন রাজেশ্বর রাও, সেই লাইনের বিরোধী এবং এটি পূর্বতন কেন্দ্রীয় কমিটি, যার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন বি. টি. রণদীভে, তার রকমফের মাত্র। সাংগঠনিকভাবেও এই কমিটির গঠন পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হল। বলা হল এখানে আমলাতান্ত্রিক পুনর্গঠনের নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে। পছন্দ অপছন্দের ভিত্তিতেই গঠন করা হয়েছে এই কেন্দ্রীয় কমিটি। দলিলটির শিরোনাম ছিল Note on the Present Situation.[৪৪]

এর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ পার্টির প্রাদেশিক কমিটি সংকীর্ণতাবাদী হঠকারী লাইনের বিরুদ্ধে এক আত্মসমালোচনামূলক দলিল প্রকাশ করে। এটি ১৯৫০ সালের ১লা জুলাই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সভায় অনুমোদিত হয়েছিল।[৪৫]

পশ্চিমবঙ্গ পার্টির সাংগঠনিক কমিটি গঠন

নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি এবং নতুন পলিটব্যুরো যেমন তৈরি হয়েছিল, তেমনি এই পলিটব্যুরো নতুনভাবে প্রাদেশিক কমিটিও তৈরি করে দিয়েছিল একটি প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি গঠনের মধ্যে দিয়ে। অর্থাৎ পুরোনো পি.বি. মনোনীত প্রাদেশিক কমিটি ভেঙ্গে দেওয়া হল। এই পি.ও.সি. ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে কাজ শুরু করেছিল। এই পুনর্গঠনের উদ্দেশ্য ঐ একই। পার্টিতে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সমালোচনা-আত্মসমালোচনার রেওয়াজ প্রবর্তন। পার্টির পলিটব্যুরো ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০-এ পি.ও.সি. সদস্যদের নাম ঘোষণা করল। এর সম্পাদক নির্বাচিত হলেন রণেন সেন।[৪৬] তবে সদস্যদের নামের ব্যাপারে অন্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের কিছুটা অমিল আছে। তবে একথা বলা হল পার্টির ঐক্যকে ফিরিয়ে আনার জন্য এবং সর্বস্তরে সম্মেলন করার জন্য সব সদস্য যেন এই পি.ও.সি.'কে সাহায্য করে। একই রকমভাবে প্রাদেশিক সাংগঠনিক কমিটিও সচেষ্ট হল জেলা কমিটিগুলিকে পুনর্গঠিত করার জন্য। এই পি.ও.সি.'র সদস্যরা ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত কাজ করেছিলেন। এরপর নতুন এক পি.ও.সি. গঠিত হয় যাঁরা কাজ করেছিলেন ১৯৫১ সালের মে মাস থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

অন্ধ্র লাইন বা ১৯৫০ সালের জুন মাসের কেন্দ্রীয় কমিটির লাইনও পার্টির মধ্যে ঐক্য আনতে পারল না বা সংগঠনকে সতেজ করতে পারল না। ১৯৫০ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর পলিটব্যুরো এক গোপন সার্কুলার মারফৎ এই চরম বিপর্যয়ের কথা সকল পার্টি সদস্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল।[৪৭] এই বিপর্যয় একই রকমভাবে বিদ্যমান ছিল পশ্চিমবঙ্গেও। এই সময় সঠিক লাইনের জন্য পার্টিকংগ্রেস আহ্বানের কথাও কেউ কেউ ভেবেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের চরম অবস্থা থেকে পার্টিকে গণআন্দোলনমুখী করার জন্য পি.ও.সি. ১৯শে সেপ্টেম্বর সমস্ত পার্টি সভ্য ও সমর্থকদের কাছে এক বিবৃতি প্রদান করল।[৪৮] এতে পরিষ্কারভাবে বলা হল পি.ও.সি. পূর্বতন প্রাদেশিক কমিটির কাছ থেকে পেয়েছে ভাঙ্গাচোরা পার্টি সংগঠন, জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন এক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র সংগঠন, কৃষকসভার সংগঠনও প্রায় নেই বললেই চলে। পি.ও.সি. তাই জেলা কমিটিগুলিকে পুনর্গঠন সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা শুরু করে দিল। ১৯৫০-এর ১লা অক্টোবর পি.ও.সি. কলকাতা জেলা কমিটির পুনর্গঠন সম্পর্কে এক প্রস্তাব গ্রহণ করল। সেটা যাতে খুবই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তৈরি হয়, সে পরামর্শও দিল। পি.ও.সি.'র এই প্রস্তাবে কোনরকম ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া ডি.ও.সি. গঠনের কোন প্রচেষ্টা ছিল না। পরামর্শ দেওয়া হল "উৎসাহী ও অভিজ্ঞ পুরাতন কমরেডদের মিলাইয়া ডি.ও.সি. গঠন করা উচিত; ডি.ও.সি. এমন হওয়া উচিত যাহাতে সমবেতভাবে বিভিন্ন ফ্রন্টকে তাহা নেতৃত্ব দিতে পারে। কমপক্ষে ৩ জন উপযুক্ত শ্রমিক কমরেড এবং একজন উপযুক্ত ছাত্র কমরেডকে ডি.ও.সি.'তে লওয়া সম্ভব এবং উচিত বলিয়া পি.ও.সি. মনে করে।"[৪৯]

পি.ও.সি.'র এই বিবৃতি সম্পর্কে সদস্যদের মধ্যে কিছু কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। যেমন : পি.ও.সি.'র বিবৃতিতে রাজনৈতিক 'পলিসি'র উল্লেখ না থাকা; 'পলিসি' ঠিক না ক'রে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব কিনা ইত্যাদি। এই সব প্রশ্নের ওপর আলোচনার জন্য পার্টি

সেসময় "সওয়াল-জবাব" নাম দিয়ে এক প্রচার পত্র প্রকাশ করা শুরু করেছিল। পি.ও.সি.'র প্রথম বিবৃতি সম্পর্কে ২৫শে অক্টোবর 'সওয়াল-জবাব' প্রকাশিত হল।[৫০]

এরপর পি.ও.সি. এক প্রস্তাব গ্রহণ করল। এটি ছিল কেন্দ্রীয় কমিটির ১লা জুন তারিখের চিঠি সম্পর্কে। এই প্রস্তাবটি ১৯৫০ সালের ২রা নভেম্বর পার্টি সদস্যদের নিকট জানানো হল। প্রস্তাবে বলা হল ১লা জুনের চিঠিতে যে লাইন ও সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের মতে এই চিঠি পুরোনো পলিটব্যুরোর ট্রটস্কিবাদ-টিটোবাদের সাথে এক আপস।[৫১] এখানে আমরা আরো কয়েকটি দলিলের উল্লেখ করছি, যেগুলির মধ্যে দিয়ে পার্টির রণনীতি, রণকৌশল ও সাংগঠনিক পুনর্গঠন সংক্রান্ত আলোচনা এগিয়ে চলেছিল। কমিউনিস্ট পার্টির জীবনে সেইসময় আন্তঃপার্টি সংগ্রাম হয়েছিল প্রচুর ও তীব্র। এরকম কয়েকটি দলিল হল : (ক) প্রাদেশিক পার্টি আলোচনা—১৮ই নভেম্বর, ১৯৫০, (খ) কলকাতা জেলা সংগঠনী কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত "পার্টির আভ্যন্তরীণ সংকট ও সমাধানের পথ" সম্পর্কে দু'টি দলিল। প্রথমটি লিখেছেন কমরেড অভয় ও কমরেড সমর এবং দ্বিতীয়টি লিখেছেন কমরেড প্রাণেশ ও কমরেড ইলিয়াস। (গ) প্রাদেশিক পার্টি আলোচনা—১২ই ডিসেম্বর, ১৯৫০।[৫২]

সেই সময়ে পার্টির অবস্থা ছিল অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ, অন্তঃপার্টি বিতর্কে সকলেই ব্যস্ত, মতৈক্যের সম্ভাবনাশূন্য পরিবেশ, হতাশাজনক পটভূমি, পারস্পরিক সন্দেহের বাতাবরণ ইত্যাদি। পি.ও.সি. পার্টির অভ্যন্তরীণ সংগ্রামকে ঠিকমত চালিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তা সত্ত্বেও পার্টির অভ্যন্তরে চলতে থাকল ঐক্য স্থাপনের প্রচেষ্টা। এইরকম এক পরিস্থিতিতে পার্টির সামনে ছিল জুন কেন্দ্রীয় কমিটির বক্তব্য এবং 'থ্রি পি' রচিত আন্তঃপার্টি দলিলের বক্তব্য। ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির একটি চিঠি প্রচারিত হল। সেসম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি ২১শে ডিসেম্বর নিজেদের ধারণার কথা ব্যক্ত করে।[৫৩] এরই কয়েকদিন পরে ২৭শে ডিসেম্বর বিশেষ তদন্ত কমিশন সম্পর্কিত এক সার্কুলার প্রচার করে।[৫৪]

বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে আন্তঃপার্টি সংগ্রামের তীব্রতা ও ব্যাপকতার মধ্যে একটা ইতিবাচক দিক ছিল এই যে, পার্টিকে সঠিক লাইন অবলম্বনের দিকে নিয়ে যেতে হবে এই বোধ। সেসময়কার পার্টি সংগঠনের ও কার্যকলাপের মধ্যে থেকে প্রতিবিপ্লবী ট্রটস্কিবাদ-টিটোপন্থার সম্পূর্ণ নির্মূলীকরণের জন্যই পশ্চিমবাংলার পার্টি ঐ বিশেষ তদন্ত কমিশন বসিয়েছিল। এরও পূর্বে পার্টি নেতৃবর্গের মধ্যে এই উপলব্ধি এসেছিল যে পার্টির সকল সভ্যের জন্য পার্টি শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা যদি না থাকে, তা হলে পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ বা সুসংহত করা সম্ভব নয়। অন্যথায় নানাপ্রকার বিচ্যুতি দেখা দেবে। সেজন্য পার্টি জোর দিল প্রাদেশিক স্কুল সংগঠিত করা, স্থানীয় শিক্ষক তৈরি করা, স্থানীয় পাঠচক্রের ব্যবস্থা করা, শিক্ষার পাঠ্যসূচি স্থির করা প্রভৃতি বিষয়গুলির ওপর। পার্টির ভিতর মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের বুনিয়াদী শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হল। ১৯৫০ সালের ১লা ডিসেম্বর বাংলার পার্টি পার্টি-শিক্ষা সম্পর্কে পি.ও.সি.'র তৈরি করা এক খসড়া দলিল সমস্ত পার্টিসভ্য ও ইউনিটের কাছে পাঠিয়েছিল।[৫৫]

পার্টির মধ্যে নতুন ক'রে উৎসাহ দেখা দিতে শুরু করে। এরই প্রতিফলন ঘটল পার্টির ও তার গণসংগঠনগুলির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বানে। সেসময়কার কিছু বাস্তবতাও ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে অনিবার্য করে তুলেছিল। যেমন : (ক) মাদ্রাজ হাইকোর্টের রায়ের ফলে মাদ্রাজ কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নামে মাত্র

হলেও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত করা হয়েছিল। (খ) বিভিন্ন দাবির সমর্থনে, বিশেষ করে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে, লড়াইয়ের জন্য, স্বাধীন ও ন্যায়সঙ্গত সুযোগের জন্য পার্টি ও অন্যান্য গণসংগঠনের আইনি অস্তিত্ব থাকাটা ছিল অত্যন্ত জরুরি।[৫৬]

এসবেরই ফলশ্রুতিতে পশ্চিমবঙ্গের পার্টি ১৯৫১ সালের ৫ই জানুয়ারি আইনি হল।

তথ্যসূত্র :

১. Dr Babasaheb Ambedkar, Lokvangmay Griha, Bhupesh Gupta Bhaban, Mumbai, Editor Vasanta Abaji Dahake, P 63-64 এবং বি.এ.ডি. ১১শ খণ্ড, পৃঃ ৯৭৯ (সহায়ক তথ্য - ১)
২. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ঘোষণাপত্র—'নতুন শাসনতন্ত্র সম্পর্কে'। জানুয়ারি ১৯৫০ (সহায়ক তথ্য - ২)
৩. 'স্বাধীনতা' ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০— 'দাস শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক কৃষকের বিপ্লবী ঘোষণা'। (সহায়ক তথ্য - ৩)
৪. 'স্বাধীনতা', ২৬শে জানুয়ারি, ১৯৫০— 'দেশপ্রিয় পার্কের আশেপাশে'। (সহায়ক তথ্য - ৪)
৫. পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি, পার্টি সার্কুলার, 'এবারকার ফসল-মজুরী ও জমির সংগ্রামে বিপ্লবী কৌশল', ২রা জানুয়ারি, ১৯৫০। (সহায়ক তথ্য - ৫)
৬. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ কমিটি, 'জমি, রুটি, শান্তি ও স্বাধীনতার লড়াইকে তীব্র করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির দুই লক্ষ টাকার আবেদন, ১লা জানুয়ারি ১৯৫০।' (সহায়ক তথ্য - ৬)
৭. ঐ, পার্টি চিঠি, ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০। (সহায়ক তথ্য - ৭)
৮. 'স্বাধীনতা', ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০ সম্পাদকীয় 'বিভীষণের ফাঁদ'। (সহায়ক তথ্য - ৮)
৯. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি 'আগামী তে-ভাগার লড়াই', ১লা অক্টোবর, ১৯৫০। (সহায়ক তথ্য - ৯)
১০. ঐ, 'কাকদ্বীপ মামলার ডিফেন্স চাই', ৩০শে নভেম্বর, ১৯৫০। (সহায়ক তথ্য - ১০)
১১. বিপিটিইউসি, '৩রা এপ্রিল লেবার-রিলেসন্স-বিল-বিরোধী দিবস পালন করুন', ২৪শে মার্চ, ১৯৫০। (সহায়ক তথ্য - ১১)
১২. পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক ফ্রাকশন, 'তেলেঙ্গানার বীর কৃষক সন্তানদের মৃত্যুদণ্ড রদ করার জন্য প্রবল জনমত গড়ে তুলুন', ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫০। (সহায়ক তথ্য - ১২)
১৩. কমিউনিস্ট পার্টি, 'দাঙ্গার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শ্রমিকশ্রেণিকেই নেতৃত্ব দিতে হবে', ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০। (সহায়ক তথ্য - ১৩)
১৪. ঐ, 'পূর্ব বাংলা থেকে আগত বাস্তুহারাদের প্রতি কমিউনিস্ট পার্টির ডাক', ২২শে মার্চ, ১৯৫০। (সহায়ক তথ্য - ১৪)
১৫. 'স্বাধীনতা', ৬ই এপ্রিল, ১৯৫০, সম্পাদকীয়—বাস্তুহারাদের ঐক্যবদ্ধ করুন। (সহায়ক তথ্য - ১৫)
১৬. প্রাদেশিক বাস্তুহারা কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ৩টি সার্কুলার : (সহায়ক তথ্য - ১৬)
    ক. বাস্তুহারা পত্রিকা সম্পর্কে পার্টির কর্তব্য (১২ই নভেম্বর, ১৯৫০)
    খ. বাস্তুহারা প্রতিনিধি সম্মেলন ও আমাদের শত্রু (৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৫০)
    গ. বাস্তুহারাদের সেবার জন্য প্রত্যেক কলোনীতে রিলিফ কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করুন (১০ই ডিসেম্বর, ১৯৫০)।
১৭. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি, 'বাংলায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর চক্রান্ত থেকে সংখ্যালঘুদের বাঁচার পথ', ১৪ই মার্চ, ১৯৫০। (সহায়ক তথ্য - ১৭)
১৮. রাজবন্দী মুক্তি সংগ্রাম, দৈনিক বুলেটিন, ৮ই জানুয়ারি। (সহায়ক তথ্য - ১৮)
১৯. 'স্বাধীনতা', ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০, সম্পাদকীয় 'বন্দীদের উপর অত্যাচারের জবাব দাও'। (সহায়ক তথ্য - ১৯)

২০. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি, 'মার্কিন যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন গড়িয়া তুলুন', ৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০। (সহায়ক তথ্য - ২০)
২১. 'The Student', 22 4 50, Editor–Sunil Munsi, Editorial "The Nehru—Liaquat Pact." (সহায়ক তথ্য - ২১)
২২. মতামত, ১ম বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ২৪শে জুন, ১৯৫০ এবং New Perspective, Vol V, 1975, No. 1, New Chapter in Peace Movement's History (সহায়ক তথ্য - ২২)
২৩. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি, '১৯৫০-এর নভেম্বর বিপ্লব দিবসে যুদ্ধমত্ত সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের বিরুদ্ধে' ১৪ই অক্টোবর, ১৯৫০। (সহায়ক তথ্য - ২৩)
২৪. ঐ, 'নেপালের মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির ডাক', ১৫ই নভেম্বর, ১৯৫০। (সহায়ক তথ্য ২৪)
২৫. ঐ, 'এটম দস্যুদের শয়তানী চক্রের বিরুদ্ধে শান্তিকামী জনগণ এক হও' ২রা ডিসেম্বর, ১৯৫০। (সহায়ক তথ্য - ২৫)
২৬. ঐ, 'ট্রুম্যানের এটম হুমকির জবাব দিন', ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৫০। (সহায়ক তথ্য - ২৬)
২৭. ঐ, 'মহান স্ট্যালিনের ৭১তম জন্মদিবস পালন করুন', ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৫০। (সহায়ক তথ্য - ২৭)
২৮. ঐ, 'পাবলো নেরুদার কথোপকথন', ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫০। (সহায়ক তথ্য - ২৮)
২৯. 'স্বাধীনতা' ১৮ই মার্চ, ১৯৫০, সম্পাদকীয় 'কমনওয়েলথ ছাড়ো'। (সহায়ক তথ্য - ২৯)
৩০. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত, 'উপনিবেশ ও পরাধীন দেশসমূহে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরাট অগ্রগতি।' (সহায়ক তথ্য - ৩০)
৩১. P C Joshi—Views No 1, To Comrades Abroad & B T Randive
টিকা : এই চিঠিগুলি ১৩ই জানুয়ারি, ১৯৫০-এ যথাস্থানে প্রেরণের পরে উপরোক্ত পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। এটির মুদ্রক ছিলেন এ. কে. বসু, প্রেসের নাম ছিল The Calcutta Printing Company Ltd , of 98/4 Surendranath Banerjee Road, Calcutta–14 এবং প্রকাশক ছিলেন পি. সি. যোশী নিজেই। তাঁর বাসস্থানের ঠিকানা ছিল 11, Dharmatala Lane, Sibpur, Howrah. প্রকাশনের তারিখটি ছিল মে, ১৯৫০। প্রসঙ্গত, এই ঠিকানাটা ছিল হাওড়া জেলার অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির অফিস।
৩২. ঐ, 'On Rival Party', 4.8.1949 (সহায়ক তথ্য - ৩১)
৩৩. মণিকুন্তলা সেন, সেদিনের কথা, পৃ ২১২-১৩
৩৪. CPI—Documents, Vol VII, P955, Ed by M B Rao
৩৫. ঐ, P614-627 (সহায়ক তথ্য - ৩২)
৩৬. অমলেন্দু সেনগুপ্ত, উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব, পৃ ৩২৪
৩৭. প্রোসেন্ট সার্কুলার নং ১৬ টিটোপন্থী-যোশীবাদীদের বিচ্ছিন্ন করুন, ৩০-৩-৫০, (সহায়ক তথ্য - ৩৩)
৩৮. সিসি'র জন্য পিবি'র ৭ই এপ্রিল, ১৯৫০-এর খসড়া এবং পার্টি সভ্যদের ভিতর আলোচনার জন্য, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি কর্তৃক ১৩ই মে, ১৯৫০-এ প্রকাশিত 'ভারতের জনতার গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান কর্তব্য।' (সহায়ক তথ্য - ৩৪)
৩৯. পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি, সার্কুলার নং ১৮, তাং ৪-৫-৫০, 'নতুন লাইন তৈরি করার লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করুন'। (সহায়ক তথ্য - ৩৫)
৪০. তথ্যসূত্র—৩৬, পৃ. ৩২৬
৪১. তথ্যসূত্র—৩৪, পৃ. ৬৫৬
টিকা : (ক) রণেন সেন-এর 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিবৃত্ত' বইয়ে (পৃ ১৩৪) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের মধ্যে সোমনাথ লাহিড়ীর নাম নেই। তাঁর মতে তিনি তখন নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি দ্বারা সাসপেণ্ড ছিলেন, যেমন ছিলেন ভবানী সেন। (পৃ. ১৩৩)
খ. মণি সিংহের নাম ৯জনের মধ্যে থাকলেও, প্রশ্ন ওঠে তখনত' তিনি পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। কিভাবে তাঁর অন্তর্ভুক্তি ঘটল? এই নামটি (CPI-Doc, Vol VII)-এ রয়েছে, তবে রণেন সেনের বইয়ে তাঁর নামের পাশে লেখা রয়েছে আমন্ত্রিত। এ বিষয়ে মণি

সিংহ তাঁর নিজের "জীবন সংগ্রাম" বইয়ে কিছুই উল্লেখ করেন নি—না সিপিআই-এর সিসিতে, না আমন্ত্রিত পদমর্যাদায়।

৪২. তথ্যসূত্র নং ৩৪, পৃ. পৃ. ৬২৮-৬৬৮
৪৩. ঐ, পৃ. ৬৫৪
৪৪. ঐ, পৃ. ৯৪৫-১০৩৯
৪৫. বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, প্রধান সম্পাদক—অনিল বিশ্বাস দ্বিতীয় খণ্ড, সংকীর্ণতা হঠকারী লাইনের বিরুদ্ধে, পৃ. ১৭৯-২২২ (সহায়ক তথ্য - ৩৬)
৪৬. রণেন সেন—ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিবৃত্ত। পৃ. ১৩৬।
টিকা : পিওসি সদস্যদের নাম— (ক) রণেন সেন-এর বই—বিশ্বনাথ মুখার্জি, ভূপেশ গুপ্ত, জ্যোতি বসু, ভূপাল পাণ্ডা, আব্দুল হালিম, প্রমোদ দাশগুপ্ত, সরোজ মুখার্জি এবং রণেন সেন।
খ. অমলেন্দু সেনগুপ্ত'র 'উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব' বইয়ের ৩৩১ পৃষ্ঠায় আছে—রণেন সেন, সরোজ মুখার্জি, আবদুল্লাহ রসুল, ভূপেশ গুপ্ত, বিশ্বনাথ মুখার্জি, ভূপাল পাণ্ডা ও বব্বন প্রসাদ।
গ. গোয়েন্দা দপ্তর থেকে প্রাপ্ত পার্টির ছাপানো চিঠির অনুলিপি; তাং ১৪-৯-৫০ রণেন সেন, বিশ্বনাথ মুখার্জি, ভূপাল পাণ্ডা, বব্বন প্রসাদ, সরোজ মুখার্জি, ভূপেশ গুপ্ত ও আবদুল্লা রসুল।
দেখা যাচ্ছে যে অমলেন্দু সেনগুপ্ত'র এবং গোয়েন্দা বিভাগ থেকে প্রাপ্ত পার্টির দেওয়া তথ্য দু'টিতে নামের পর্যায়ক্রমে ভিন্নতা থাকলেও, নামগুলিতে মিল আছে।
৪৭. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, পি.বি. সার্কুলার ১৬-৯-৫০, তৃতীয় পার্টি কংগ্রেস সম্পর্কে। (সহায়ক তথ্য - ৩৭)
৪৮. তথ্যসূত্র—৪৫, আশুকাজ ও সাংগঠনিক নীতি অনুসরণ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটির বিবৃতি, পৃ. ২৫৩-৫৬। (সহায়ক তথ্য - ৩৮)
৪৯. পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, কলকাতা জেলা কমিটির পুনর্গঠন সম্পর্কে পি.ও.সি.'র প্রস্তাব, ১-১০-৫০। (সহায়ক তথ্য - ৩৯)
৫০. 'সওয়াল-জবাব', প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি, পি.ও.সি.'র প্রথম বিবৃতি সম্পর্কে, ২৫-১০-৫০। (সহায়ক তথ্য - ৪০)
৫১. ১৯৫০ সালের জুন তারিখে প্রদত্ত "সমস্ত পার্টিসভ্য ও সমর্থকদের নিকট নয়া কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠি" সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটির প্রস্তাব, ২রা নভেম্বর, ১৯৫০। (সহায়ক তথ্য - ৪১)
৫২. (ক) প্রাদেশিক পার্টি আলোচনা, নব পর্যায়, ৪র্থ সংখ্যা, ১৮ই নভেম্বর, ১৯৫০। (সহায়ক তথ্য - ৪২)
টিকা :—এতে দমদমের 'প্রাচীর ইউনিট'-এর ১৫-৭-৫০ তারিখের একটি লেখা রয়েছে।
—আরেকটি আলোচনা রয়েছে মঙ্গল ছদ্মনামের একজন সদস্যের।
খ. পার্টির আভ্যন্তরীণ সংকট ও সমাধানের পথ, কলকাতা জেলা সংগঠনী কমিটি; (সহায়ক তথ্য - ৪৩)
টিকা : এতে দু'টি রিপোর্ট রয়েছে ২১-১১-৫০ এবং ৩০-১১-৫০ তারিখের জেলা সংগঠনী সভায় এ দু'টি আলোচনার জন্য পেশ করা হয়েছিল।
—একটি রিপোর্ট ছিল কমরেড অভয় ও কমরেড সমরের।
—অপরটি ছিল প্রাণেশ ও ইলিয়াসের।
গ. প্রাদেশিক পার্টি আলোচনা, ৫ম সংখ্যা, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৫০। কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠির উপর পি-ও-সি'র সভায় প্রদত্ত মতামত। (সহায়ক তথ্য - ৪৪)
৫৩. পশ্চিমবঙ্গ সংগঠনী কমিটি, 'কেন্দ্রীয় কমিটির ডিসেম্বরের অধিবেশন সম্পর্কে' ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৫০। (সহায়ক তথ্য - ৪৫)
৫৪. পশ্চিমবঙ্গ সংগঠনী কমিটি, 'বিশেষ তদন্ত কমিশন সম্পর্কিত সার্কুলার', ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৫০। (সহায়ক তথ্য - ৪৬)
৫৫. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি, 'পার্টি শিক্ষা' সম্পর্কে পি.ও.সি.'র খসড়া দলিল, ১লা ডিসেম্বর, ১৯৫০। (সহায়ক তথ্য - ৪৭)
৫৬. ঐ, 'কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার দাবির সমর্থনে ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলুন'। ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫০। (সহায়ক তথ্য - ৪৮)

ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হওয়ার প্রাক-মুহূর্তে ডঃ বি. আম্বেদকরের ঐতিহাসিক ভাষণ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ

ডঃ আম্বেদকর ১৯৪৭ সালের ২৫ নভেম্বর এই ভাষণটি দিয়েছিলেন, যার শেষ অংশে তিনি বলেছিলেন,

"My mind is so full of the future of our country that I feel I ought to take this occasion to give expression to some of my reflections thereon. On 26th January, 1950 India will be a republic. What would happen to her independence? Will she maintain her independence or will she lose it again? Will history repeat itself? It is this thought which fills me with anxiety. This anxiety is deepened by the realisation of the fact that in addition to our old enemies in the form of castes and creed, we are going to have many political parties with diverse and opposing political creeds. Will Indians place the country above their creeds or will they place creeds above the country? If the parties place creeds above the country, our independence will be put in jeopardy a second time and probably be lost forever." (Moon 1994, Vol 13 : 1213, 1214)

ঐ একই ভাষণে তিনি আরও বলেছেন,

"... If we wish to maintain democracy not merely in form, but also in fact, what must we do? The first thing in my judgement we must do is to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objective. It means that we must abandon the method of civil disobedience, non-cooperation and satyagraha. We must make our political democracy a social democracy as well, as political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy." (Moon 1994, Vol 13 : 1215, 1216)

প্রাপ্তি স্বীকার : Dr. Babasahab Ambedkar, Lokvangmay Griha, Bhupesh Gupta Bhaban, Mumbai, Editor—Vasant Abaji Dahake, P63-64

সহায়ক তথ্য - ২

নূতন শাসনতন্ত্র সম্পর্কে

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির
কেন্দ্রীয় কমিটির
ঘোষণা পত্র

জানুয়ারী, ১৯৫০

দাম ঃ এক আনা

নুতন শাসনতন্ত্র সম্পর্কে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ঘোষণা পত্র জানুয়ারি, ১৯৫০

২৬শে জানুয়ারি থেকে কংগ্রেসী শাসকরা তাদের দাস শাসনতন্ত্র ভারতীয় জনগণের উপর চাপিয়ে দিতে চলেছে।

গত যুদ্ধের ঠিক পরেই, স্বাধীনতার জন্য বৃটিশের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের বিরাট অভ্যুত্থান জেগে উঠেছিল। বৃটিশ এবং ভারতীয় পুঁজিদাররা আতঙ্কে কেঁপে উঠল সেই অভ্যুত্থান দেখে ঃ জনগণকে শোষণ করার সব সুযোগ বুঝি হারাতে হয়। ভারতের পুঁজিদার শ্রেণি তাদের কংগ্রেসী প্রতিনিধিদের মারফত দেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে দিল, ক্যাবিনেট মিশন আর মাউণ্টব্যাটন প্লানের মারফত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চুক্তি করে নিল, এবং উভয়ে মিলে ভারতীয় জনগণের বিরুদ্ধে এক চক্রান্ত ফাঁদল—ইঙ্গ-ভারতীয় পুঁজিদার শ্রেণির স্বার্থে ভারতীয় জনগণের উপর যুক্ত-শাসন চালাবার ষড়যন্ত্র। বর্তমান শাসনতন্ত্র সেই যন্ত্রেরই ফল।

জাতীয় বিশ্বাসঘাতকদের আর সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের মিলনের ফল এই শাসনতন্ত্র, এতে কি ভারতীয় জাতীয় সার্বভৌমত্বের নিশ্চিত ব্যবস্থা আছে?

না, নেই! এ শাসনতন্ত্রে ভারতীয় জাতির সার্বভৌমত্ব রূপ পায় নি। পেয়েছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আর নতুন প্রভু—আমেরিকান শোষকদের কাছে তার দাসত্ব।

সেই জন্যই, জনসাধারণের চোখের উপর, এই শাসনতন্ত্রের প্রতিটি অংশ থেকে, এমনকি ভূমিকা থেকেও, "স্বাধীন ভারত" কথাটি কংগ্রেস নেতারা তুলে দিয়েছে। অথচ দেশের লোককে ভাঁওতা দেবার জন্য তিন বছর আগে এই ভূমিকাতেই তারা লিখেছিল যে, ভারত স্বাধীন সাধারণতন্ত্র হবে।

পুঁজিদারদের যে অনুচরেরা এই শাসনতন্ত্র রচনা করেছে তারা এই ভাবেই প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিল যে, এ শাসনতন্ত্র স্বাধীন ভারতের নয়, পরাধীন, দাস ভারতের।

ভারতকে নেহরু যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী কমনওয়েলথে নিয়ে ঢুকিয়েছে তখনই তার পরাধীনতা এবং দাসত্ব স্পষ্ট হয়ে গেছে।

বৃটেনের কাছে ভারতের অধীনতার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে প্রতিদিন। বৃটিশের অনুমতি ছাড়া নেহরু সরকার বৈদেশিক ব্যাপারে এক পা এগুতেও সাহস করে না। সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত চীনের দুনিয়া কাঁপানো ঘটনাকে স্বীকার করার, চীনা গণরাষ্ট্রের সরকারকে স্বীকার করার সাহস নেহরু সরকারের হয় নি।

ভারতের পরাধীনতার আরও প্রমাণ, ভারতে বৃটিশ পুঁজির বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত অবস্থা এখনও রয়ে গেছে, বিলাতি মুদ্রার দাম কমানোর ব্যাপারে দেখা গেল বৃটিশ আজও ভারত সরকারের অর্থনৈতিক নীতির উপর কর্তৃত্ব করে।

টাকার দাম কমানর ব্যাপারে "ভারতীয় ডোমিনিয়নের" অধীন সরকারের সঙ্গে পরামর্শ পর্যন্ত করা হয় নি; তাকে বিনা প্রতিবাদে এ অবস্থা মেনে নিতে হয়েছে এবং আমেরিকান আর বৃটিশদের মুনাফা-লালসা মেটাবার জন্য নিজের দেশের জনগণের ভারাক্রান্ত পিঠে আরও

বোঝা চাপিয়ে দিতে হয়েছে।

বৃটিশ দাসত্বেও ভারতের শাসক-চক্র সন্তুষ্ট নয়। তারা আমেরিকান দস্যুদের দুহাত বাড়িয়ে ডেকে নিয়ে আসছে, ভারতীয় জনগণকে শোষণের সম্পূর্ণ নিরাপদ ব্যবস্থা করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

আমেরিকান পুঁজিদারদের কাছ থেকে খুঁদ কুঁড়া পাবার আশায়, ভারতীয় জনগণের উপর যুক্তভাবে শোষণে, আর নিজেদের ধ্বংসোন্মুখ রাজত্বকে খাড়া করে রাখার ব্যবস্থায় তাদের সাহায্য পাবার আশায় এই শাসক-চক্র সোভিয়েটের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ-শিবিরকে সমর্থন করছে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের পাহারাদারি করতে রাজি হয়েছে।

বিশ্বাসঘাতকতা করে এই শাসক গোষ্ঠী কাশ্মীরে আমেরিকান হস্তক্ষেপ ডেকে আনছে আর নিজেদের বৈদেশিক নীতিতে ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধবাদীদের কতৃত্ব মেনে নিয়েছে, নিজেদের বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে ভারতের সার্বভৌম অধিকার এরা বিকিয়ে দিয়েছে; এরা সোভিয়েট-বিরোধী ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছে।

এদের শাসনতন্ত্র সমস্ত বিদেশী কায়েমীস্বার্থকে আশ্বাস দিয়েছে, তাদের মুনাফায় হাত দেওয়া হবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এই ভাবেই, এ শাসনতন্ত্রে মূর্ত হয়ে উঠেছে এদের সেই জাতীয় দাসত্বের নীতি—মার্কিন পুঁজির কাছে বেশী বেশী বশ্যতা স্বীকার আর সোভিয়েট বিরোধী যুদ্ধ ষড়যন্ত্রের নীতি।

শত শত বছর ধরে খোলাখুলি দস্যুতা করে বৃটিশ এবং বিদেশী ব্যাংকের মালিকরা, পাটের মুনাফাখোররা, কয়লার ডাকাতরা যত মুনাফা, যত সম্পত্তি, যত অর্থনৈতিক আর শিল্প ক্ষমতা মজুত করেছে, সে সমস্তই রক্ষা করার পাকা ব্যবস্থা এই শাসনতন্ত্রে করা হয়েছে; শুধু তাই নয়, এদের এবং নতুন দেবতা আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদকে এতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, ভারতকে অর্থনৈতিকভাবে অধীন করার পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের থাকবে—নির্লজ্জের মত শাসন-তন্ত্রের মূল বিধান হিসাবেই ঘোষণা করা হয়েছে যে, অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতে কোন মুনাফা-খোরের শিল্প-কারখানা বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকার ভারতীয় জনগণের থাকবে না।

এই শাসনতন্ত্রে কায়েমী স্বার্থের পূজা এতেও শেষ হয় নি। ভারতীয় এবং বিদেশী রেল-বন্ড মালিকদের দেয় ঋণ ও সুদ, পুঁজিবাদী শিল্প এবং আর্থিক ব্যবস্থা আরও জোরদার করার জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশনের মত বিভিন্ন পুঁজিদার প্রতিষ্ঠানের যে মুনাফা সম্পর্কে সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ক্ষতিপূরণের নামে সরকার জমিদার এবং রাজা-মহারাজাদের যে সব কোম্পানীর কাগজ উপহার দেবে, ভারতীয় পুঁজিদারদের শিল্পকে সাহায্য করবার জন্য আমেরিকান আর বৃটিশদের কাছ থেকে যে সব ঋণ নেওয়া হচ্ছে—এই সমস্ত মেটান রাষ্ট্রের প্রথম দায়িত্ব বলে শাসনতন্ত্রে পাকা ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। পার্লামেন্টের পর্যন্ত এ ব্যাপারে ভোট দেবার কোন অধিকার থাকবে না।

এই শাসনতন্ত্রে তাই ভারতের দাসত্বই মূর্ত হয়ে উঠেছে। এ হচ্ছে ভারতীয় জনগণের দাসত্বকে চিরস্থায়ী করার শাসনতন্ত্র, এই শাসনতন্ত্রের সাহায্যে জনগণকে ব্যবহার করা যাবে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে; সোভিয়েত ইউনিয়ন আর এশিয়ার মুক্তিপ্রিয় জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের খোরাক হিসাবে।

ভারতীয় জনগণের, ভারতের কোটি কোটি মেহনতী মানুষের সার্বভৌম অধিকার কি এই শাসনতন্ত্রে রূপ পেয়েছে? এতে কি জনগণকে ক্ষমতার আসনে বসান হয়েছে? যে শোষকরা তাদের দারিদ্র্যের কারণ তাদের বিরুদ্ধে জনগণের লড়াইয়ের সুযোগ কি এতে করে দেওয়া হয়েছে?

না, হয় নি। বরং তার বিপরীতই হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতায় ভারতীয় পুঁজিদার, জমিদার আর রাজ-রাজড়াদের শাসনই এই শাসনতন্ত্রে রূপ পেয়েছে।

এই শাসনতন্ত্রে ভারতের কোটি-কোটি মেহনতী মানুষের চেয়ে, ভারতীয় জনগণের চেয়ে বিদেশী শোষকদের বেশী অধিকার, বেশী সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এই শাসনতন্ত্রে আমাদের দেশী বিদেশী দস্যুদেরই স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

শোষিতদের ভারতের সাধারণ মানুষের, শ্রমিক, কৃষক, খেতমজুর, মধ্যবিত্তদের কোন অধিকার—নিজেদের গরিবী এবং দাসত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করার অধিকার নেই এ শাসনতন্ত্রে।

শাসনতন্ত্রের মধ্যেই দেশী ও বিদেশী শোষকদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, ক্ষতিপূরণ না দিয়ে রাষ্ট্র তাদের সম্পত্তি পর্যন্ত নেবে না। এই গ্যারান্টির অর্থ, জনগণের স্বার্থে জাতীয়করণ করা হবে না; আর শাসনতন্ত্রের মৌলিক ব্যবস্থায় সুরক্ষিত হয়ে পুঁজিদাররা বিনা বাধায় জনগণের উপর শোষণ চালিয়ে যাবে।

ক্ষতিপূরণ দেবার এই প্রতিশ্রুতি জাতীয়করণ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি নাকচ করে দিল আর সাধারণ মানুষের স্বাধীন অর্থনৈতিক জীবন, শোষণ ও দারিদ্র্য-মুক্ত জীবনের সম্ভাবনা নষ্ট করে দিল।

এতে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হল যে, কায়েমীস্বার্থের স্বার্থ রক্ষাই এই শাসনতন্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য।

নেহরু-প্যাটেল কোম্পানীর রচা এই শাসনতন্ত্র—আসলে পুঁজিদার কায়েমীস্বার্থের শাসনতন্ত্র। এতে শুধু আছে টাটা, বিড়লা আর ডালমিয়াদের কলকারখানা আর মুনাফাকে বাজেয়াপ্ত হওয়ার আশংকা থেকে রক্ষা করার নিরাপদ ব্যবস্থা; তাদের শ্রমিকশ্রেণি আর জনগণকে অবাধে শোষণের স্বাধীনতা, নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি।

নিজেদের টলমল রাজ্যকে শক্ত করার জন্য ভারতীয় শাসনতন্ত্রের পুঁজিদার অভিভাবকরা ভারতীয় সমাজের প্রত্যেকটি জঘন্য এবং প্রতিক্রিয়াশীল অংশের সঙ্গে মিতালির চেষ্টা করেছে। যত সামন্ত পরগাছা রাজা-রাজড়া, জমিদার আর জোতদারদের পিছনে খুঁটি জুগিয়েছে এই শাসনতন্ত্র। এতে চাষীকে জমি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে আর রক্ষা করা হয়েছে সামন্ত স্বার্থকে জনগণের কিংবা সরকারের দ্বারা জমিজমা বাজেয়াপ্ত হবার সম্ভাবনা থেকে। নিজাম আর মহারাজ হরিসিংহের মত পরগাছাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে কৃষকদের উপর অত্যাচার চালাবার জন্য নিজেদের সৈন্যদল রাখতে। যে রাজা আর নবাবের দল প্রজাদের বিরুদ্ধে জঘন্যতম অপরাধে অপরাধী তাদেরই রক্ত কলুষিত হাত বন্ধুভাবে চেপে ধরেছে তাদের কংগ্রেসী বন্ধুরা। কংগ্রেসীদের শাসনতন্ত্রে সেই রাজা আর নবাবদেরই আজীবন অধিকার দেওয়া হয়েছে রাজপ্রমুখ উপরাজপ্রমুখ প্রভৃতি হিসাবে জনগণের উপর জুলুম চালাবার; পাকা ব্যবস্থা করা হয়েছে জনগণের টাকায় তাদের কল্পনাতীত পরিমাণে পেনশন, মাহিনা, জমিদারি এবং সম্পত্তি দেবার।

এ শাসনতন্ত্র হচ্ছে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণি, খেতমজুর আর কৃষকদের বিরুদ্ধে, শোষিত মধ্যবিত্ত আর প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে, দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষের বিরুদ্ধে দেশী-বিদেশী স্বার্থের শাসনতন্ত্র।

নির্লজ্জের মত এতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, নাগরিকদের জন্য কাজ এবং জীবিকানির্বাহের উপায় করে দেবার কোন দায়িত্ব রাষ্ট্রের থাকবে না। শাসনতন্ত্র জনসাধারণকে বাঁচার মত মজুরি, বেকার ভাতা, বৃদ্ধবয়সের পেনশন অথবা জীবিকা এবং পুষ্টির উন্নততর ব্যবস্থা করে দেবার দায়িত্ব নির্লজ্জভাবে অস্বীকার করেছে। সংক্ষেপে বলা যায় এ শাসনতন্ত্র ইঙ্গ -ভারতীয় মুনাফাখোরদের দিয়েছে অমানুষিক বর্বর শোষণ চালিয়ে যাবার অবাধ স্বাধীনতা; আর ভারতের সাধারণ মানুষের জন্য এনেছে অসহ্য দারিদ্র্যের অনন্ত যন্ত্রণা। ব্যাপক বেকারী, অপূরণীয় অশিক্ষা, চিরস্থায়ী দুর্ভিক্ষ আর রোগ-মহামারীর প্রতিকারহীন ধ্বংসলীলা।

ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার প্রাথমিক অধিকার থেকে এ শাসনতন্ত্র শ্রমিক আর কর্মচারীদের বঞ্চিত করেছে, বিনা প্রমাণে বিনা সাক্ষ্যে যে কোন সংগঠনকে বে-আইনি ঘোষণা করার অবাধ অধিকার দিয়েছে সরকারি শাসন বিভাগের হাতে। ধর্মঘট এবং পিকেটিং করার অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উল্লেখ পর্যন্ত নেই এই শাসনতন্ত্রে, তার সম্পূর্ণ কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণি এবং জনসাধারণের নিজস্ব কাগজ থাকে, তার মারফত শোষকদের মুখোশ ছিঁড়ে ফেলা হয় বা মেহনতি মানুষের শিক্ষা হয় তা পুঁজিদাররা চায় না। কথা বলার স্বাধীনতাকে জবাই করা হয়েছে। সভা এবং মিছিল করার অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে—তার উপর বর্তমানের সমস্ত বাধানিষেধ মেনে নেওয়া তো হয়েছেই, তাছাড়া ভবিষ্যতেও পুঁজিদার শাসকদের খুশিমত 'আইন' ও অর্ডিনান্স চাপিয়ে দেবারও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। বৃটিশ প্রভুরা যেভাবে ক্রীতদাসদের বেঁধে রাখত এই শাসনতন্ত্রের রচয়িতারাও সেই কৌশলেরই অনুসরণ করেছে। জনসাধারণকে অস্ত্র রাখার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাদের নির্জীব করে রাখার ব্যবস্থা করেছে। ফ্যাশিস্ট পুলিস, মিলিটারী সেবাদল প্রভৃতি পুঁজিদারদের বিশ্বস্ত পাহারাদার সংগঠনেরই শুধু অস্ত্র থাকবে। আর সে অস্ত্র যে ব্যবহৃত হবে নিরস্ত্র জনতার বিরুদ্ধে সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। এবং সর্বশেষে শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তের প্রতিরোধ চূর্ণ করার জন্য, প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক, বিরোধী শক্তির কণ্ঠরোধ করার জন্য পুঁজিদারদের হুকুমমত বিনা বিচারে আটক করার নিরংকুশ ক্ষমতাও এ শাসনতন্ত্রে দেওয়া হয়েছে। শাসনতন্ত্র হচ্ছে ফ্যাশিস্ট জুলুমের শাসনতন্ত্র।

কংগ্রেস নেতাদের এই শাসনতন্ত্র ভারতের বিভিন্ন জাতির জনগণের মধ্যে আরও শত্রুতা সৃষ্টি করবে। বিভিন্ন জাতির পৃথক হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, প্রত্যেক অঞ্চলের স্বাধীন অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিকাশের অধিকার, সমস্ত জাতির ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাধীন বিকাশের অধিকার—এ সমস্ত অধিকার দমন করাই এই শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য।

শাসনতন্ত্রে যে শক্তিশালী কেন্দ্রের কথা বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার নামে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তার একটি মাত্র উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমস্ত জাতির অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনের উপর মারোয়াড়ী গুজরাটি পুঁজিদারদের অবাধ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, অন্ধ্র, তামিলনাদ, কেরালা, কর্নাটক, বাঙলা, মহারাষ্ট্র, আসাম, উড়িষ্যার প্রত্যেকটি জাতির উপর মারোয়াড়ী গুজরাটী পুঁজির জুলুম কায়েম করা।

সমস্ত ভাষার সমান অধিকারের উপর এই জঘন্য আক্রমণ হচ্ছে এই সব অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া অবস্থাকে চিরস্থায়ী করার হাতিয়ার, এই সব অঞ্চলের জনসাধারণকে শিক্ষা ও সংস্কৃতি থেকে বঞ্চিত করার হাতিয়ার। এ হল মারোয়াড়ী গুজরাটীদের প্রভুত্বের ভিৎ শক্ত করার ব্যবস্থা—কারণ জনসাধারণ নিজেদের ভাষা এবং সংস্কৃতির বিকাশ করলে এদের প্রভুত্ব বিপন্ন হয়।

কংগ্রেসী কর্তাদের শোষণ আর প্রভুত্বের লালসা যে কতখানি তা ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রশ্নেই প্রকাশ হয়ে গেছে।

নিজেদের জনগণের শোষণে আরও বেশি বখরা পাবার জন্য অন্ধ্র, কর্নাটক প্রভৃতির স্থানীয় শোষকরা ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবি তুলেছে।

কিন্তু শাসক-গোষ্ঠী একাধিক প্রদেশে এই দাবি স্বীকার করতে অস্বীকার করছে, কারণ এই সব অঞ্চলের শোষণের মুনাফা তারা নিজেরাই রাখতে চায়।

তাই, এ শাসনতন্ত্র হচ্ছে জাতিগত অত্যাচারের শাসনতন্ত্র। এই শাসনতন্ত্রের আমলে বিভিন্ন জাতীয় অঞ্চলের বিরুদ্ধে জুলুম এবং পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা থেকেই যাবে।

এখানেই শেষ নয়। এ শাসনতন্ত্রে আদিবাসী অঞ্চলগুলিতে অবাধ শোষণ অনুমোদন করা হয়েছে। এর রচয়িতারা আসাম সীমান্তে স্বাধীনতা-প্রিয় উপজাতিগুলির উপর নিজেদের নিষ্ঠুর কর্তৃত্ব বাড়িয়ে চলেছে। বিহার এবং উড়িষ্যায় আদিবাসী বিদ্রোহকে তারা নির্মমভাবে দমন করছে।

বহু মূল্যবান খনিজ দ্রব্য এবং অজানা সম্পদে সমৃদ্ধ, আদিবাসী অঞ্চলগুলি এই শাসক-চক্রের কবলে পড়েছে। আদিবাসী শ্রমিকদের এরা অতি নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করছে।

অস্পৃশ্যতা তুলে দেওয়া হল বলে শাসনতন্ত্রে ভণ্ড প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক শোষণ, জমির অভাব আর হিন্দু সামাজিক অত্যাচারে পীড়িত অস্পৃশ্যদের অবস্থা এই প্রতিশ্রুতির ফলে এতটুকুও ভাল হবে না।

এই শাসনতন্ত্র তাদের জমি দেবে না। এ শাসনতন্ত্র তাদের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, কারণ অস্পৃশ্যরাও শ্রমিক কৃষকেরই অংশ। এ শাসনতন্ত্রে শিক্ষা এবং আর্থিক দিক থেকে তাদের পিছিয়ে পড়া অবস্থার অবসান হবে না; বরং বেড়েই যাবে।

সামাজিক অত্যাচারেরও অবসান হবে না, কারণ কংগ্রেসী নেতারা নিজেরাই সবচেয়ে অত্যাচারী জাত-মানা হিন্দু, অস্পৃশ্যদের শত্রু। যে হিন্দু সভা এবং আর-এস-এস প্রাচীন হিন্দু ব্যবস্থাকে আবার পুরোপুরি চালু করতে চায়, সেই জঘন্যতম হিন্দু প্রতিক্রিয়াকেই সমর্থন করছে, উৎসাহ দিচ্ছে এই কংগ্রেসী নেতারা—শ্রমিক কৃষকের লড়াই বানচাল করার জন্য।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করার নামে এই শাসনতন্ত্র সংখ্যালঘুদের অধিকার — বিশেষ করে মুসলমান সংখ্যালঘুদের অধিকার দমন করছে।

যে সব কাপুরুষ স্বল্প-প্রাণ সাম্প্রদায়িক নেতা এতদিন মুসলমান জনসাধারণকে ভুল বুঝিয়ে এসেছে, আজ তাদের সাহস নেই মুসলমান জনগণের ন্যায্য দাবি নিয়ে লড়াই করার, এই নেতারা নিজেদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য সফল করার জন্য সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভর করেছিল, নিজেদের সুখ-সুবিধা বা মুনাফা বিপন্ন করে জনসাধারণের প্রকৃত স্বার্থ-রক্ষা করার কোন মতলবই তাদের ছিল না।

শাসনতন্ত্র চালু হবার আগেই মুসলমানদের অবস্থা দ্রুত নিম্নতর স্তরের মানুষের মত হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

শাসনতন্ত্রে আইনমাফিক লেখা হয়েছে যে, নিজের ধর্ম পালন করার অধিকার, নিজের ধর্মশাস্ত্র এবং সংস্কৃতি অনুযায়ী চলার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের আছে।

এ কথাও বলা হয়েছে, নিজ নিজ ভাষা এবং ধর্মশাস্ত্র রক্ষা করার অধিকারও প্রত্যেকের আছে। কিন্তু কাজের বেলায় সরকারিভাবে উর্দু ভাষাকে সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং বেসরকারিভাবে তাকে দমনের সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে।

শাসনতন্ত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবেকের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছে বটে, কিন্তু অন্য ধর্মের সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীলদের থেকে সংখ্যালঘুদের সত্যিই রক্ষা করার কোন পাকা ব্যবস্থা করা হয় নি।

বরং শাসনতন্ত্রের রচয়িতারা তাঁদের কাজ দিয়ে এই কথাই স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে যে, সংখ্যালঘু জনতার সঙ্গে অসমান ব্যবহার করা, তাদের দমন করাই তাদের উদ্দেশ্য।

মুসলিম লীগের জন্য অবশ্য কেউই চোখের জল ফেলবে না। কিন্তু সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বলে তাকে ভেঙে দেওয়া হোল, অথচ হিন্দু সভা এবং আর-এস-এস'-এর মত হিন্দু সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কংগ্রেস নেতারা ভেঙে তো দেয়ই নি, বরংচ উৎসাহ দিচ্ছে।

একাধিক কংগ্রেস নেতা যে সব কথা বলেছে তার একমাত্র ফল হবে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বমূলক ব্যবস্থা। নাৎসীরা যে ভাবে ইহুদিদের ভয় দেখাত, অনেক কংগ্রেসী মন্ত্রী আইনসভায় সংখ্যালঘু সদস্যদের সেইভাবে প্রকাশ্য ভয় দেখায়, সমস্ত সংখ্যালঘুদের নামে কুৎসা করে, ভয় দেখায়।

এইভাবে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে বেসরকারি পক্ষপাতিত্ব, চাকরিতে তাদের জন্য সমান সুবিধার অভাব, শিক্ষা এবং সংস্কৃতিতে তাদের পশ্চাৎপদ করে রাখা—ঘটনার স্রোত এই দিকেই চলেছে।

এই পরিণতি বন্ধ করার ক্ষমতা এই শাসনতন্ত্রে নেই।

এই নীতির বিরুদ্ধে কোন গ্যারান্টিই শাসনতন্ত্রে নেই, সংখ্যালঘুদের সঁপে দেওয়া হয়েছে পুঁজিদার শাসকদের হাতে।

প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের যে সামান্য ব্যবস্থা এতে হয়েছে তাও একটা জুয়াচুরি। প্রচারের সমস্ত যন্ত্র—নিয়ন্ত্রিত রেডিও, রক্ষিতা সংবাদপত্র, ব্যয়বহুল সভাগৃহ এবং লাউডস্পীকার ব্যবস্থা প্রভৃতি যতক্ষণ পুঁজিদার আর শাসক শ্রেণিদের হাতে এবং বাসস্থান সম্পর্কে শর্ত, প্রার্থীর পক্ষ থেকে বিরাট অঙ্ক জমা দেবার ব্যবস্থা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ পর্যন্ত, প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ফলে গরীব আর বড়লোক শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা লাভের সমান সুযোগ পায়—একথা নির্জলা মিথ্যা।

আর বর্তমান শাসনতন্ত্রের মত যেখানে জনসাধারণের বিপুল সংখ্যাধিককে কেন্দ্রে এবং প্রদেশের উচ্চতর পরিষদে প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, ইউনিয়নের সভাপতির হাতে জনগণের জীবন-মৃত্যুর ক্ষমতা দেওয়া হলেও তাকে নির্বাচন করার কোন অধিকার যেখানে জনসাধারণের থাকে না, যথেচ্ছ ক্ষমতাশালী প্রাদেশিক গভর্নরদের যেখানে উপর থেকে নিয়োগ করে জনগণের উপর চাপিয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়, বিভিন্ন চীফ কমিশনারের

প্রদেশ আর ছোট ছোট দেশীয় রাজ্যের কোটি কোটি মানুষকে যেখানে নিজেদের আইন সভা প্রভৃতি থেকেও বঞ্চিত করা হয়, হিটলারী সভাপতির হাতে তাদের ভাগ্য সঁপে দেওয়া হয়—সেখানে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দ্বিগুণ মিথ্যা হয়ে দাঁড়ায়। এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচন একটা হাসির ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই হবে না।

ভোটের তালিকায় নিতান্ত নির্লজ্জের মত এমন সব কায়দা করা হয় যাতে বিপুল সংখ্যক লোকের পক্ষে ভোট দেওয়া ভীষণ কঠিন হয়ে পড়ে। জনগণকে তাদের ভোটের অধিকার পালন করাতে নির্বাচনী অফিসাররা খোলাখুলি বাধা দেয়। এবং এখানে রাষ্ট্রের শক্তি যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয়।

আর সর্বশেষে জনতার বিচার থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য, একমাত্র যে পার্টি জনতার স্বার্থে দাঁড়ায় সেই কমিউনিস্ট পার্টিকে—শ্রমিক শ্রেণি আর জনগণের পার্টিকে—সরকার অবৈধ ঘোষণা করেছে, শ্রমিক কৃষকদের পিষে মারার জন্য, মধ্যবিত্তদের দমন করার জন্য ব্যাপক দমননীতি চালু করেছে; তেলেঙ্গানায় আর বাঙলায়, কেরালা আর অন্‌ধ্রের গ্রামে গ্রামে ব্যাপক দমন অভিযান সুরু করেছে; কলকাতার পথে পথে, শ্রমিকদের ধর্মঘটে, কৃষকদের সংগ্রামে, ছাত্র ধর্মঘটে, মহিলাদের শোভাযাত্রার উপর গুলি আর লাঠি চালাচ্ছে। এ অবস্থায় স্বাধীন নির্বাচনের কোন্ সুযোগ জনসাধারণের আছে?

এই শাসনতন্ত্রে—

কৃষক জমি দাবি করতে পারে না।

শ্রমিক, খেতমজুর বা কেরানী কাজ বা বাঁচবার মত মজুরি দাবি করতে পারে না।

মধ্যবিত্ত বাঁচবার উপায় দাবি করতে পারে না।

জাতি নাগরিক স্বাধীনতা বা শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার দাবি করতে পারে না।

অস্পৃশ্যতার অবসান হবে না। আদিবাসীদের উপর জুলুম চলতে থাকবে।

জনগণ যদি এসব দাবি তোলে, তাহলে এই শাসনতন্ত্র তাদের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করবে। এতে সভাপতি এবং গভর্নরদের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে অর্ডিনান্স জারি করে জনগণের কণ্ঠরোধ করার এবং শেষ পর্যন্ত, শাসনতন্ত্রই সাময়িকভাবে বাতিল করে দিয়ে বিশেষ ঘোষণার মারফত শাসন চালাবার, কায়েমীস্বার্থ-আশংকাগ্রস্ত হলেই নিষ্ঠুরতম স্বেচ্ছাতন্ত্রের বল্‌গা ছেড়ে দেবার।

এই শাসনতন্ত্রকে সমর্থন করার এবং তীব্র নিন্দা না করার অর্থ, গত দু-বছর ধরে যে-রাজ ভারতীয়দের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে তাকেই সমর্থন করা, অনুমোদন করা। এর অর্থ, প্রেসিডেন্সি, ভেলোর, কুড্ডালোর আর সবরমতী জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের যারা গুলি করে মারে তাদের সমর্থন করা, কলকাতার জেলে নারী-বন্দীদের উপর জঘন্য ব্যবহার করার অপরাধে যারা অপরাধী তাদের সমর্থন করা।

এই ভয়ংকর শাসনতন্ত্র ধ্বংস হোক! ধ্বংস হোক বৃটিশ আর আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে জাতীয় দাসত্বের সম্পদ এই শাসনতন্ত্র। এই দাস, ফ্যাশিস্ট শাসনতন্ত্র নিপাত যাক।

কেবল নেহরু আর তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা অথবা টাটা-বিড়লার দলই যে শুধু এই শাসনতন্ত্র সমর্থন করছে তা নয়।

সোশালিস্ট পার্টির বিশ্বাসঘাতক নেতারাও এই শাসনতন্ত্রকে সমর্থন করছে এবং জনসাধারণকে এই বলে ভুল বোঝাচ্ছে যে, এই শাসনতন্ত্র দিয়েই তাদের সব সমস্যার সমাধান হতে পারে, এই শাসনতন্ত্রের মারফতই জনগণ ক্ষমতা দখল করতে পারে। এই সোশালিস্ট নেতারা প্রত্যেকটি ধর্মঘটে, প্রত্যেকটি কৃষক সংগ্রামে, বেইমানি করে।

নেহরু সরকারের নীতির সঙ্গে এদের কাজের কোনই তফাৎ নেই। এরাই এখন নেহরু সরকারের চালাকির পুনরাবৃত্তি করার, জনসাধারণকে ভাঁওতা দেবার চেষ্টা করছে।

নেহরু-প্যাটেল কোম্পানী জনসাধারণকে ঠকিয়ে, তাদের পিঠে চড়ে ক্ষমতার আসনে বসে এখন সেই জনসাধারণের উপরেই অত্যাচার চালাচ্ছে।

জয়প্রকাশ কোম্পানীও আগামী নির্বাচনে জনসাধারণের ভোট চায় এবং সেই ভোটের জোরে ক্ষমতা পাবার পর পুঁজিদার শ্রেণির স্বার্থে সেই জন সাধারণকেই আবার ঠকাতে চায়।

এই বিশ্বাসঘাতকরা সমস্ত রকম জঙ্গী সংগ্রামের বিরোধী। এরাই—নরেন্দ্র দেব আর তার সঙ্গীরাই—যুক্তপ্রদেশে জমিদারদের বিপুল, জবরদস্তী ক্ষতিপূরণ দিতে নির্লজ্জের মত স্বীকার করেছিল। আর এরাই এখন আবার সেই ক্ষতিপূরণের বিরোধী সেজেছে।

এই বিশ্বাসঘাতকরাই ত্রি-দলীয় সম্মেলনে হাজার হাজার শ্রমিক ছাঁটাই করার ব্যাপারে দেশী বিদেশী পুঁজিদার আর নেহরু সরকারকে সমর্থন করেছে; আর নিজেদের সেই বিশ্বাসঘাতকতাকে ঢাকবার জন্য বেকারির বিরুদ্ধে মিছিল করছে।

এরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী লেবার গভর্নমেন্টকে সমর্থন করে, আর সমাজতন্ত্রী রুশিয়ার বিরুদ্ধে বিষ ঢালে।

এরা চায় শ্রমিক এবং কৃষকেরা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে এই শাসনতন্ত্র মেনে নিক, যাতে পুঁজিবাদ টিকে থাকতে পারে আর সোশালিস্ট নেতারা গদীতে বসে, মন্ত্রিত্ব নিয়ে সেবা করতে পারে—পুঁজিদারদের।

মজুর। কিষাণ। ছাত্র। মহিলা। শোষিত মধ্যবিত্ত।

২৬শে জানুয়ারি শোষকদের এই শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে, জাতীয় দাসত্বের এই শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করুন।

ধর্মঘট করে, মিছিল করে, বিক্ষোভ দেখিয়ে ভারতীয় কায়েমীস্বার্থ আর বিদেশি শোষকদের এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আপনাদের ক্ষুব্ধ প্রতিবাদকে ভাষা দিন।

এই শাসনতন্ত্রে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে পুঁজিদার, জমিদার, সামন্ত রাজারাজড়া, চোরাবাজারী আর খাদ্যচোরদের হাতে; এ শাসনতন্ত্র কৃষকদের দাস করেছে; মুসলমান সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে অসমান ব্যবস্থা করে, অস্পৃশ্যদের উপর সামাজিক অত্যাচার অনুমোদন করে, সমস্ত জাতির উপর অত্যাচার করে এই শাসনতন্ত্র মেহনতি জনতার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে;—একে কবর দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করুন।

এই শাসনতন্ত্র রচনা করেছে যুদ্ধবাদীরা, আর যারা ভারতকে ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধশিবিরে ঢুকিয়েছে তারা; এতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাদেরই হাতে যারা সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ষড়যন্ত্রে সাহায্য করছে। এই শাসনতন্ত্র ধ্বংস হোক।

সমস্ত মেহনতি মানুষকে, প্রত্যেক সাচ্চা দেশবাসীকে কমিউনিস্ট পার্টি আহ্বান করছে—শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভকে মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য জনগণের ঐক্য অভিযানে,

মেহনতি মানুষের ঐক্য অভিযানে পরিণত করুন।

ভারতের সমগ্র শ্রমিক শ্রেণিকে প্রত্যেকটি শ্রমিক সংগঠনকে কমিউনিস্ট পার্টি ডাক দিচ্ছে—সোশালিস্ট বিভেদকারীদের সমস্ত অপচেষ্টা ব্যর্থ করে শাসনতন্ত্র বিরোধী দিবসে শ্রমিকশ্রেণির একতার পরিচয় দিন।

শ্রমিক শ্রেণিকে বুঝতে হবে যে, শক্তিকে ভাগ করে দেওয়া শত্রুরই কৌশল। এই শত্রুর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণির একটিই অজেয় হাতিয়ার আছে—সে হচ্ছে শ্রেণি-ঐক্যের হাতিয়ার।

শ্রমিক থেকে শ্রমিককে আলাদা করে দেবার, শ্রমিকদের দিয়ে টাটা-বিড়লাদের এই শাসনতন্ত্র মানিয়ে নেবার যে চেষ্টা সোশালিস্ট নেতারা করছে; তাকে ব্যর্থ করুন। শ্রমিক শ্রেণির একতার পরিচয় দিন।

২৬শে জানুয়ারি ঘোষণা করুন—শ্রমিক, কৃষক, খেতমজুর, ছাত্র, মহিলা, কর্মচারীদের নিয়ে, শ্রমিক কৃষকেরা সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত এক শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট আমরা গড়ব।

ভারতের জনগণ যে শাসনতন্ত্র চায় তা শোষকদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে না; তা আদায় করা যাবে জনগণের নিজের জোরে, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার লড়াইয়ে জয়লাভ করে।

বর্তমান শাসনতন্ত্রের রচয়িতারা যখন জনসাধারণের অধিকার নিয়ে হাতসাফাই করতে ব্যস্ত, তখন তেলেঙ্গানার বীর কৃষকরা সামরিক শাসনের অতুলনীয় অত্যাচার অগ্রাহ্য করে, নিজেদের বীরত্ব, আত্মত্যাগ, সাহস আর দৃঢ়তা দিয়ে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করছিল।

তেলেঙ্গানার জঙ্গী কৃষকরা দু' বছর আগে নিজামের অত্যাচারী পুলিসদের তাড়িয়ে বিস্তৃত অঞ্চলকে নিজামের শাসনমুক্ত করেছে, চাষীকে জমি দিয়েছে, সকলের জন্য মানুষের মত বাঁচার ব্যবস্থা করেছে।

কেরালায়, অন্ধ্রে, মেদিনীপুরে, কাকদ্বীপে—সারা ভারত জুড়ে আজ যে অসংখ্য লড়াই চলেছে, তাতে শ্রমিক আর কৃষকরা সাহস, দৃঢ়তা আর বীরত্বের সঙ্গে লড়ছে। এই সব লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই তৈরি হচ্ছে জনগণের শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার শক্তি। এইসব রক্তাক্ত সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে জমির উপর চাষীর অধিকার, শ্রমিকের বাঁচার মত মজুরি পাবার অধিকার আর জনগণের আর্থিক এবং রাজনৈতিক নিরাপত্তার অধিকার।

তাই, এই শাসনতন্ত্র ধ্বংস হোক।

এগিয়ে চলো—জনগণের শাসনতন্ত্রের দিকে। যে শাসনতন্ত্র রূপ পাবে ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতা আর সার্বভৌমত্ব; চাষী পাবে জমি, আর শ্রমিক এবং খেতমজুর পাবে বাঁচার মত মজুরি; শিল্প কারখানা হবে জাতীয় সম্পত্তি; সকলের জন্য থাকবে কাজ করার ব্যবস্থা আর আর্থিক নিরাপত্তা; যে শাসনতন্ত্রে ক্ষমতা থাকবে মেহনতি জনতার হাতে, আর শান্তির জন্য, যুদ্ধের বিরুদ্ধে, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন আর বিভিন্ন গণরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের মৈত্রী হবে সুনিশ্চিত।

দাস-শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক, কৃষকের বিপ্লবী ঘোষণা

জেলায় জেলায় কংগ্রেসী পুলিশের বিরুদ্ধে মেহনতী জনতার অভিযান

২৬শে জানুয়ারি ... এই দিনে ধনিক কংগ্রেসী শাসকশ্রেণি নয়া শাসনতন্ত্রের নামে শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি জনতার উপর চাপিয়ে দিয়েছে এক গুণ্ডা শাসন ব্যবস্থা, গোলামীর নতুন শৃঙ্খল।

এই দিনেই কারখানায় কারখানায়, গ্রামে গ্রামে, স্কুল কলেজে শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি জনতা বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—এ গোলামীর শৃঙ্খল আমরা মানবো না। একে আমরা খান্ খান্ করে ভেঙ্গে ফেলবো; এ শাসন আমরা বরদাস্ত করবো না, একে আমরা কবর দেবো।

জেলায় জেলায় বিপ্লবী অভিযানের মধ্য দিয়ে মেহনতি জনতা তাদের এই ঘোষণাকে বাস্তবরূপ দিয়েছেন।

বাঁকুড়ায়

বাঁকুড়ার শ্রমিক কৃষকেরা রেলওয়ে পুলিশ ঘাঁটির উপর বোমা ফেলে কংগ্রেসী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

চন্দননগরে

গোন্দলপাড়ার (চন্দননগর) বিপ্লবী শ্রমিকরা কংগ্রেসী শাসনতন্ত্রকে অভ্যর্থনা করেছেন ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ আর কংগ্রেসী জুলুমের প্রতীক পুলিশ থানা আর ঘাঁটি জ্বালিয়ে দিয়ে।

২৬শে জানুয়ারি খুব ভোরে শ্রমিকদের জঙ্গীদলের আক্রমণে জ্বলে উঠল চন্দননগরের কাছে থানার একদিক, আহত হোল একাধিক পুলিশ। আতঙ্কিত পুলিশের দল থানা ছেড়ে পালাল। থানার ইন্-চার্জ এলে আত্মসমর্পণ করল, থানার যা কিছু জিনিস সব তুলে দিল শ্রমিকদের হাতে।

এর আগেই আক্রান্ত হয়েছে চন্দননগর রেল স্টেশনের পাহারাদারদের ঘাঁটি। জঙ্গী শ্রমিকদের আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালায় সিপাইদের দল। স্টেশনের যাত্রী সাধারণ মানুষরা কিন্তু এতটুকুও বিচলিত নয়, তারা শুয়েই থাকে নিশ্চিন্ত মনে। তারা জানে তাদেরই লালঝাণ্ডা আক্রমণ করছে কংগ্রেসী সরকারের পাহারাদারদের ওপর।

২৪শে তারিখ আক্রান্ত হয় চন্দননগরের প্রধান থানা, আহত হয় ৪ জন পুলিশ, ঐদিনই কোতরং থানাও আক্রান্ত হয়, থানার একাংশ পুড়ে যায়।

একের পর এক এই আক্রমণে সারা চন্দননগরে পুলিশের মধ্যে প্রচণ্ড আতঙ্ক। অনেক

সিপাইই কাজ ছেড়ে দেশে চলে যাবার উদ্যোগ করছে।

মেদিনীপুরে

ঘাটাল মহকুমার একটি গ্রামে এক হাজার ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকেরা তীর ধনুক, বোমা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে গ্রামের পুলিশ ঘাঁটিটি আক্রমণ করেন। পুলিশ গুলি চালিয়েও তাদের অভিযানকে রুখতে পারেনি—শেষে পুলিশ কর্ত্তারা হন্তদন্ত হয়ে চুঁচুড়া থেকে আরো বেশী পুলিশ এখানে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করেছে।

তমলুকের পুতপুতিয়া গ্রামের ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকেরা মার্চ্চ করে পুতপুতিয়া থানা আক্রমণ করেন—বোমার আঘাতে তারা পুলিশদের আহত করেন। পুলিশ ছয় রাউণ্ড গুলি চালিয়েও মজুর-কৃষকদের অভিযানকে হটাতে পারেনি।

এমনিভাবেই শহীদ চৈতন্য ও সুধীরের মেদিনীপুর কংগ্রেসী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে।

কাটোয়ায়

এখানকার মেহনতী জনতা পুলিশ ঘাঁটি আক্রমণ করে গোলামী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

২৬শে জানুয়ারি সশস্ত্র মেহনতী জনতা কাটোয়ার রেলওয়ে পুলিশ ঘাঁটিটি আক্রমণ করেন। পুলিশ গুলি চালিয়েও তাঁদের অভিযানকে প্রতিহত করতে পারেনি—জনতার আক্রমণে একজন দারোগা ও একজন হেড কনেষ্টবল গুরুতরভাবে আহত হয়।

নৈহাটিতে পুলিশ আহত

গত ২৬শে জানুয়ারি দাস-শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নৈহাটি গৌরীপুর এলাকায় পাঁচ শতাধিক শ্রমিকের সভা হয় মিয়া বাগানে। ক্রমশঃ আরও অনেক শ্রমিক ও অন্যান্য জনসাধারণ সভায় আসিতেছেন দেখিয়া পুলিশ সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে কাঁদুনে বোমা ছুঁড়িয়া আক্রমণ করে জনতার ভিতর হইতে পুলিশের উপরও বোমা পড়ে, ফলে কয়েকজন পুলিশ আহত হয়।

এই সংঘর্ষের পরই শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত মেয়েদের মিছিল বাহির হয়, পথে কংগ্রেসীরা মেয়েদের উপর হামলা করিতে চেষ্টা করিলে বহুসংখ্যক শ্রমিক চারিদিক হইতে আসিয়া জড়ো হয় এবং কংগ্রেসী গুণ্ডাদের তাড়া করে।

খড়দহ-দক্ষিণেশ্বর রেল কলোনীর শ্রমিকরা লেবার অফিসারের ডাকা সভা বয়কট করে এবং মিছিল করিয়া দাস শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে ধ্বনি দিতে দিতে কামারহাটি পর্যন্ত যায়।

শান্তিপুরে জনতার লড়াই

নদীয়া জেলার শান্তিপুর শহরে গত ২৬শে জানুয়ারি দাস-শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনতার প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা যায়। সকালে বাড়ীতে বাড়ীতে এবং রাস্তার মোড়ে মোড়ে কালো ঝাণ্ডা উড়িতে থাকে। দুজায়গায় ক্রুদ্ধ জনতা কংগ্রেসী তেরঙ্গা ঝাণ্ডা পুড়াইয়া দেয়।

বিকালে পাঁচশতাধিক লোকের সভা হয়। সভা হইতে কয়েকজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিলে ক্ষিপ্ত জনতা তাঁহাদিগকে ছিনাইয়া লয়। পুলিশ তখন ৪৩ রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে।

পরে সারা পাড়া খোঁজ করিয়া পুলিশ বাড়ী বাড়ী জুলুম করে। দশ বারজন বৃদ্ধকে থানায় ধরিয়া লইয়া গিয়া ভীষণভাবে মারপিট করে। দারোগা যখন পাড়ায় ঢুকিতে ছিল তখন তাহার উপর বোমা পড়ে। কোনও জঙ্গীকে ধরিতে না পারিয়া আশপাশের ২/৩ জন দোকানদারকে গ্রেপ্তার করে ও বর্ব্বরের মত মারপিট করে।

মল্লারপুরে সশস্ত্র মিছিল

বীরভূম জেলার মল্লারপুর বাজারে গত ২৫শে জানুয়ারি দাস-শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে হাট হরতাল হয়, বিশেষতঃ সাঁওতালরা কেহই হাটে আসে না।

২৬শে জানুয়ারি ক্ষেতমজুর, গরীব কৃষক ও ছাত্রদের একটি মিছিল লাঠি ও তীর ধনুক লইয়া মিছিল করিয়া বাজারে আসে। জনতার তেজ দেখিয়া পুলিশ ও কংগ্রেসীরা বাধা দিতে সাহস করে না।

ইহারা পূর্ব্বে ২১শে জানুয়ারি মল্লারপুর গ্রামের কৃষক ও ছাত্ররা সভা করিয়া ‘লেলিন দিবস’ পালন করিয়াছিলেন।

কংগ্রেসীদের পলায়ন

২৪ পরগণা জেলার মৌশলি গ্রামে কৃষকেরা ২৫শে জানুয়ারি কালোঝাণ্ডা উড়ায় দাস-শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে। ২৬শে কংগ্রেসীরা সভা করার চেষ্টা করে। ইহাতে জনতা ক্রুদ্ধ হইয়া ওঠে। কৃষকদের মিছিল সভার দিকে আসিতেছে দেখিয়া কংগ্রেসীরা ভয়ে পলায়ন করে। তখন সভা ও মিছিল করিয়া জনতা শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

কলিকাতার ছাত্রীদের প্রতিবাদ

দাস-শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে কলিকাতার ছাত্রীরা ব্যাপকভাবে প্রতিবাদ আন্দোলন করে। ভিক্টোরিয়া স্কুলে ১৭ই জানুয়ারি ছাত্রীদের সভা হয়, ১৮ই ‘শহীদ দিবসে’ ভিক্টোরিয়া স্কুলে পূর্ণ ধর্মঘট এবং সুরকন্যা বিদ্যালয়ে আংশিক ধর্মঘট হয়—সিটি কলেজ (ছাত্রী বিভাগ), দেশবন্ধু, ব্রাহ্ম, সুরকন্যা, মুরলী ধর, কালীধন ও ভিক্টোরিয়া স্কুলের ছাত্রীদের সভা হয়। ২০শে জানুয়ারি ব্রেবোর্ণ কলেজের ছাত্রীদের সভা হয় এবং দাস শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে ও রাজবন্দীদের মুক্তি দাবি করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২৬শে জানুয়ারি দাস-শাসনতন্ত্র বিরোধী দিবসে ওরিয়েন্টাল স্কুলে পূর্ণ ধর্মঘট হয় এবং কালীধন ও মহামানব স্কুলে আংশিক ধর্মঘট হয়।

(স্বাধীনতা, ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০)

টিকা : ‘স্বাধীনতা’ পত্রিকা বেআইনি হয়েছিল ১৯৪৮ সালের ২৬শে মার্চ থেকে। আবার তা নবপর্যায়ে চালু হয়েছিল ১৯৫১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি থেকে। পার্টির বে-আইনি পর্বে গোপন কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন নামে তখন কাগজ বেরোত। যেমন নূতন সংবাদ, নূতন খবর, মঞ্জিল, শিবির, মতামত ইত্যাদি। তবে কখনও কখনও ‘স্বাধীনতা’ পত্রিকাও প্রকাশিত হত, এটাই বোঝানোর জন্য যে ‘স্বাধীনতা’ পত্রিকা উঠে যায়নি, তবে গোপনে রয়েছে। এই রকমের একটি সংখ্যায় বেরিয়েছিল উক্ত খবর। (—সম্পাদক)

২৬শে জানুয়ারি— দেশপ্রিয় পার্কের আশে পাশে

(একজন রিপোর্টারের ডায়েরি)

রশিদ আলী দিবসের কলকাতা আবার জেগে উঠেছে। এবার আর শুধু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নয়, সাম্রাজ্যবাদের পাহারাদার ধনিক কংগ্রেসের অসহ্য শাসনের বিরুদ্ধে। চারিদিকে তখন লড়াই চলেছে জনতা আর পুলিশের মধ্যে, চারিদিকে জ্বলছে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা আর সরকারি ট্রামবাস। তারই মধ্যে দেখলাম এক শীর্ণকায় প্রৌঢ় হাতে তাঁর রেশন ব্যাগ, চীৎকার করছেন— পোড়াও পোড়াও কংগ্রেস ফ্ল্যাগ। আর, আর শালাদের!! মনে হোল কংগ্রেসী দুঃশাসনের জর্জ্জর বাংলার ডাক বেজে উঠছে সেই ডাকেঃ ওদের তাড়িয়ে নিয়ে যাও! এগিয়ে যাও তোমরা!!

কলকাতার রাস্তায় সশস্ত্র পুলিশের বিরুদ্ধে জনতার লড়াই বহুবার দেখেছি, কিন্তু জনতার আক্রমণে বিরাট পুলিশ বাহিনীকে এমন করে ঘেরাও হতে দেখিনি আর কখনও।

পার্কেব মধ্যে সভার ওপর পুলিশ আক্রমণ শুরু করা মাত্র শোনা গেল একটা বোমা ফাটার আওয়াজ। পুলিশ দল ভয়ে থমকে দাঁড়াল। জনতা ততক্ষণে পার্ক ছেড়ে গিয়ে ঘাঁটি নিয়েছে চারিদিকের রাস্তার মোড়ে, গলির মধ্যে। পুলিশ ভাবল জনতা পালাচ্ছে, এগুবার চেষ্টা করল দক্ষিণ দিকের রাস্তায়। জনতা উত্তর দিল ঝাঁকে ঝাঁকে ইট ছুড়ে আর বোমা দিয়ে। পুলিশই ভয়ে পিছু হটে আশ্রয় নিল একেবারে পার্কের মধ্যে, যেখানে ইট পৌঁছয় না। ঠিক এমনই ঘটল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে।

এখানেও আর একদল পুলিশ জনতার আক্রমণে তিষ্টিতে না পেরে হঠে গেল মাঠের মধ্যে।

জনতার প্রতি আক্রমণ

এবার পার্কের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের জনতা পিছন দিক থেকে আক্রমণ করল পুলিশ দলকে, পরপর কয়েকটা বোমা মেরে বিপুল বেগে পার্কের মধ্যে ছুটে গেল। কয়েকজন পুলিশ আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আর উপায় নেই দেখে পুলিশ দল গুলি চালাল পর পর কয়েক রাউন্ড। গুলির সামনে জনতা একটু পিছনে সরে এসে রাস্তার মোড় থেকে আক্রমণ চালাতে থাকল। পুলিশ আর এগোতে সাহস পায় না।

ঠিক সেই সময়ই আর একদল মাঠের মধ্যে ঢুকে আক্রমণের জন্য ছুটে গেল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে। আবার গুলি চলল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইট চলছে অবিরাম।

মাঠের চারিদিকে তখন হাজার হাজার জনতার মহড়া, শ্লোগান উঠছে অবিরাম, ইট পড়ছে বৃষ্টি ধারার মত পুলিশ দলের ওপর। আর মাঠের মধ্যে ঘেরাও হয়ে আটকা পড়েছে সশস্ত্র পুলিশ দল। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, পুলিশের দল আর অফিসাররা হৃতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছে, মাঝে মাঝে টিয়ারগ্যাস ছেড়ে বোধহয় নিজেদেরই সাহস দেবার চেষ্টা করছে।...

মোড়ে মোড়ে ব্যারিকেড

ততক্ষণে সারা এলাকায় মোড়ে মোড়ে ব্যারিকেডে ছেয়ে গেছে। ল্যান্সডাউনের মোড়ে একটা জীপ গাড়িকে ঠেলে এনে চিৎ করে ফেলে রাস্তা আটক করা হোল। লেক মার্কেটের সামনে ১২০ ফুট চওড়া রাসবিহারী এভিনিউর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত একটানা ব্যারিকেড। জ্বলন্ত ট্রাম নেভাবার জন্য যে দমকল এসেছিল তাকেই দখল করে জনতা তার মোটা মোটা হোসপাইপ দিয়ে রাস্তা বেঁধে ফেলছে। আর এসেছে ঠেলাগাড়ি, ডাষ্টবিন, টুল, টেবিল আর চেয়ার। রাস্তার দুপাশের বড় অট্টালিকার বড়লোক মালিকরা আতঙ্কে ঘরে খিল এঁটেছে, আর তাদেরই বাড়ির চাকররা টেবিল, চেয়ার বের করে দিচ্ছে ব্যারিকেডের জন্য। একজন ঠেলাগাড়ি চালক এগিয়ে দিল তার রোজগারের একমাত্র উপায় ঠেলাগাড়িটা, ফলওয়ালা এনে দিল তার ফলের বাক্স। এমনি করে গড়ে উঠল দুর্ভেদ্য ব্যারিকেড একটার পর একটা মোড়ে।

আর প্রত্যেকটা ব্যারিকেডের পিছনে ২০/৩০ থেকে শুরু করে ৪০/৫০ জন পর্যন্ত সৈনিক। থান ইট ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে নিয়ে এসেছে তারা জনতার সুপরিচিত বুলেট। কারুর হাতে শক্ত লাঠি, লোহার ডাণ্ডা—এমনই আরও হাতিয়ার, যে যা পেরেছে তাই নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে মরণপণ যুদ্ধে।

শক্ত ব্যারিকেড আর তার পেছনে মৃত্যুভয়হীন সৈনিক—সারা এলাকা দুর্ভেদ্য কেল্লায় পরিণত হয়েছে। তাকে ভেদ করে পার্কের পুলিশও বেরোতে পারছে না, লালবাজার থেকে পাঠানো নতুন পুলিশ দলও পার্কের কাছে পৌঁছতে পারছে না।

বিপ্লবী মোর্চা

...বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের চেহারা যদি কেউ দেখতে চায় তবে সে আজ চেয়ে দেখুক ঐ ব্যারিকেড গুলোর পিছনে—ব্যারিকেড রক্ষীদের দিকে।

আধ-ময়লা কাপড় পরা কারখানার মজুরের পাশে হাফশার্ট পরা স্কুলের ছাত্র ব্যারিকেড পাহারা দিচ্ছে; পাশের দোকান থেকে চেয়ার, টেবিল, বাক্স টেনে এনে ব্যারিকেড আরও মজবুত করে তুলছে মেয়েরা। ওদিকে রাস্তার কোণে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছে তরুণ কেরাণী—লড়াইয়ের আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে সমবেত জনতার মনে। আর সবার ওপরে শোনা যাচ্ছে হাজার কণ্ঠের আওয়াজ লালঝাণ্ডা কি জয়, কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ।

কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ—জনতার রণধ্বনি

পুলিশের ট্রাকের সামনে বা রাইফেলের গুলিতে যদিবা সাময়িকভাবে জনতা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, কিন্তু লাল ঝাণ্ডা কি জয়, কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ শ্লোগানের সঙ্গে সঙ্গে আবার লোক জমা হয়ে পুলিশের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে। কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ—সারা এলাকার সাধারণ মানুষ আপনা থেকে এই আওয়াজ দিচ্ছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে কমরেড স্ট্যালিনের

নাম করে বক্তৃতা শুনে তাদের চোখে আগুন জ্বলে উঠছে।

...কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সমবেত শ্রমিক-ছাত্র-নওজোয়ান মহিলা জঙ্গীদের লড়াই ক্রমে এলাকার সমস্ত গরীবকে টেনে এনেছে লড়াইয়ের মধ্যে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে যারা এতক্ষণ দেখছিল, আর উৎসাহ দিচ্ছিল ব্যারিকেড রক্ষীদের, তারাও লড়াইয়ে নেমে এসেছে। দেশপ্রিয় পার্ক থেকে রসা রোড আর গড়িয়াহাট পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কে লড়ছে আর কে লড়ছে না তার তফাৎ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে, সুবিধা পেয়েও ইট মারছে না এমন লোক নাই। রাস্তার মোড়ে ৭/৮ বছরের শিশুরা পর্যন্ত আর কিছু না পেয়ে কাগজের বল তৈরি করে ছুড়ে মারছে চলন্ত পুলিশ ট্রাকগুলির দিকে আর হাসছে নির্ভীক আনন্দে।

লেক মার্কেটের কিছু আগের একটা ব্যারিকেড কোনরকমে পার হয়ে একদল সশস্ত্র পুলিশ এগোবামাত্র দুপাশ থেকে এমনভাবে ঢিল এসে পড়তে লাগল যে পুলিশ বাধ্য হয়ে গাড়ী থামিয়ে টিয়ার গ্যাসের বোমার পর বোমা ছুড়তে লাগল। কিন্তু কোন ফল হল না। জঙ্গী জনতার আক্রমণ আরও তীব্র হয়ে উঠল। আস্ত আস্ত ইট পুলিশ-গাড়ীর চারিপাশে পড়ছে, ওদের হাতে পায়ে মাথায় লাগছে। মাথা নীচু করে চোখ বুজে ৫/৭ মিঃ কোনরকমে আত্মরক্ষা করে ওরা গাড়ি ঘুরিয়ে রসা রোড ধরে পালাল। এমনই ঘটনা বারবার ঘটছে। দেশপ্রিয় পার্কের সামনে ২৫/৩০ জন পুলিশের একদল উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে। পুলিশ পালাচ্ছে, পুলিশ পালাচ্ছে— বলে আরও হাজার লোক ঝাঁপিয়ে পড়ছে ওদের ওপর। চারিদিক কাঁপিয়ে আওয়াজ উঠছে—কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ।...ছড়িয়ে পড়ছে লড়াই আগুনের মত—সার্দাণ এভিনিউ থেকে হাজরা পর্যন্ত। কোটিপতি জইদকার বাড়ীর উৎসবের সব আলো চূর্ণ হয়ে গেল। কালীঘাট ট্রাম ডিপোতে বেজে উঠল জনতার পদধ্বনি।

গড়িয়া হাট থেকে রসা রোড, সার্দাণ এভিনিউ থেকে হাজরা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় কংগ্রেসী সরকারের বিরাট সশস্ত্র বাহিনীকে আটক করে, দখল করে রেখেছে কলকাতার মজুর-ছাত্র-নওজোয়ান-মহিলা কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো—তখনো চারিদিকে জ্বলছে কংগ্রেসী তেরঙ্গার চিতা। গলির মোড়ে এক ভদ্রলোক আর একজনকে বলছেন, "দেখেছ কাণ্ড! ওরা সারা বালীগঞ্জ দখল করে রেখেছে।" পাশ দিয়ে চলে যেতে উত্তর কানে এল, "শুধু বালীগঞ্জ কেন, ওরা সারা দেশটাই জয় করবে, তুমি দেখে নিও"।

'স্বাধীনতা', ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০

এবারকার ফসল-মজুরি ও জমির সংগ্রামে বিপ্লবী কৌশল

প্রিয় কমরেড,

ধনিক-জমিদার-জোতদারের আজ্ঞাবহ বিধান-নুরুল আমীন সরকারের শত শত পুলিশ ঘাঁটি, হাজার হাজার সেবাদল-আনসার গুণ্ডা বাহিনীকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার এক বিরাট অঞ্চল জুড়িয়া লক্ষ লক্ষ ক্ষেতমজুর-গরীব কৃষক-ভাগচাষীর ফসল, মজুরি ও জমি দখলের ঐতিহাসিক অভিযান শুরু হইয়াছে। এপর্যন্ত যেটুকু খবর আসিয়াছে তাহা হইতেই বুঝা যায় এবারকার সংগ্রামের ব্যাপকতা ও তীব্রতা অতীতের সমস্ত রের্কড ছাড়াইয়া গিয়াছে।

কিন্তু তবু একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, ফসল কাটার সময়ে সারা বাংলায় যেমন ব্যাপক ক্ষেতমজুর ধর্মঘট সংগঠিত করা হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল এখনো সেরকম ব্যাপক ধর্মঘট শুরু করা হয় নাই। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, এখনো দক্ষিণ বাংলার অধিকাংশ জেলায় ভাগচাষীরা নিজ খামারে ধান তোলার ব্যাপারে নিজেদের দোমনাভাব কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। বরং কোন কোন জেলায় স্পষ্টই লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, সংগ্রামের নেতৃত্ব মাঝপথে দাঁড়াইয়া আপসের চেষ্টা করিতেছে; আংশিক দাবির ভিত্তিতে আপস করিয়া সংগ্রামকে বানচাল করিয়া দিতেছে।

কেন এমন হইতেছে এখনই তাহা খুঁজিয়া বাহির করা দরকার। প্রত্যেক জেলা কমিটিকে এখনই হস্তক্ষেপ করিতে হইবে, সংগ্রামের পর্যালোচনা করিয়া দুর্বলতা কোথায় তাহা ধরিতে হইবে এবং নির্মমভাবে তাহার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া ফসল-মজুরি ও জমির সংগ্রামকে আরো ব্যাপক, আরো তীব্র, আরো উচ্চস্তরে লইয়া যাইতে হইবে।

ক্ষেতমজুরদের ব্যাপক ধর্মঘট হইল না কেন—জেলা কমিটিগুলির কাছ হইতে এখনো তাহার পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় নাই। তবু, ছোট ছোট রিপোর্ট হইতেই ইহার অন্যতম কয়েকটি কারণ অনুমান করা যাইতেছে।

জেলার অনেক কমরেড লিখিয়াছেন, ফসল কাটার সময়ে ক্ষেতমজুরদের অনেক 'ওভারটাইম' কাজ থাকে, তাহার ফলে তাহাদের আয় বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় কিছুটা বাড়ে। কোথাও কোথাও তাহারা কিছু ধানও পাইয়া থাকে। সুতরাং এই সময় তাহাদের ধর্মঘটে নামানো খুব কঠিন।

ক্ষেতমজুরদের ধর্মঘটে নামাইবার পরিবর্তে মেদিনীপুর এবং আরো কয়েকটি জেলা তাহাদের রিপোর্টে লিখিতেছেন ঃ ক্ষেতমজুরদের মজুরি আগেকার তুলনায় অনেক বাড়িয়াছে। কোথাও কোথাও দেড়গুণ পর্যন্ত হইয়াছে।

ইহা আত্মপ্রতারণা ছাড়া কিছু নয়। সকলেই জানে যে ফসল কাটার সময়ে ক্ষেতমজুরদের মজুরি বাড়ে, কিন্তু সেই বাড়া খুবই সাময়িক। ফসল জোতদার-ধনিক কৃষকের গোলায় উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতমজুরের মজুরি আবার সাবেক কোঠায় নামিয়া আসে।

কোন কোন কমরেড প্রশ্ন করিয়াছেন ঃ পার্টি যখন ভাগচাষীকে সমস্ত ফসল নিজ খোলানে তুলিতে নির্দেশ দিয়াছে তখন ক্ষেতমজুররা ধর্মঘট করিবে কি করিয়া। ক্ষেতমজুরেরা ধর্মঘট করিলে ফসল কাটিবে কে, ভাগচাষীর ঘরে ফসল তুলিবে কে?

নিজেদের সংগ্রাম-বিরোধী মনোভাবকে ঢাকিবার ইহা আর একদফা চেষ্টা। এমন বহু জোতদার-ধনী কৃষক আছে যাহারা খাসে মজুর খাটাইয়া চাষ করে। তাহাদের ফসল কাটা ও ফসল ঘরে তোলার সময়ে ধর্মঘট হইল না কেন? জমির এই একচেটিয়া মালিকদের সমস্ত ফসল ক্ষেতমজুররা ধর্মঘট করার মধ্য দিয়া দখল করিল না কেন?

দ্বিতীয়ত, ভাগচাষীদের মধ্যেও নিশ্চয়ই প্রত্যেক জেলায় দুই রকমের চাষী দেখা যাইবে। যেসকল গরীব ভাগচাষী সংগ্রাম-কমিটির নেতৃত্বে ফসলের জন্যে সংগ্রাম করিতেছে, সংগ্রাম-কমিটিরই অন্যতম দায়িত্ব সেখানে ক্ষেতমজুরের দাবি মানিয়া লওয়া; এমন কি সমস্ত ফসল দখলে আসিলে সেই ফসলেরও এক অংশ ক্ষেতমজুরকে দিবার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হওয়া। সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই ধর্মঘটের কোন প্রয়োজন হইবে না। ক্ষেতমজুর-গরীব কৃষক, ভাগচাষী ঐক্যবদ্ধ হইয়াই জমিদার-জোতদার-ধনী কৃষক এবং তাহাদের সরকারের বিরুদ্ধে লড়িবে। কিন্তু যেসকল ভাগচাষী ফসলের জন্যে সংগ্রাম শুরু করিতে অস্বীকার করিতেছে, তাহাদের ফসল কাটার সময়ে ক্ষেতমজুররা ধর্মঘট করিল না কেন? যাহারা নিজেদের ফসল খুনী জোতদার-জমিদারের ঘরে তুলিয়া দেয় তাহাদের সেই ফসল জোতদারের গোলায় তুলিতে ক্ষেতমজুররা অস্বীকার করিল না কেন? মাঠ হইতে সেই ফসল সংগ্রাম কমিটির গোলায় তুলিল না কেন?

পুলিশ জুলুম ও দমননীতির প্রতিবাদে ক্ষেতমজুরদের ব্যাপক ধর্মঘট হইল না কেন? এইভাবে ক্ষেতমজুররা লড়াই শুরু করিলেই দেখা যাইত দুর্বলচিত্ত মাঝারী ভাগ-চাষীদের দোমনাভাবও কাটিয়া গিয়াছে, তাহারাও লড়াইয়ে নামিয়াছে, ফসল ঘরে তুলিবার সাহস পাইয়াছে।

বহরমপুর এবং আরামবাগ হইতে কমরেডরা প্রশ্ন তুলিয়াছেন ঃ ক্ষেতমজুররা ধর্মঘট করিলে বাহির হইতে মজুর আমদানি করিয়া তাহাদের ধর্মঘট ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে। সেক্ষেত্রে ধর্মঘটের সাফল্যের সম্ভাবনা কোথায়?

এইসকল কমরেড ভুলিয়া গিয়াছেন যে, কলকারখানায় ও বাহির হইতে শ্রমিক আমদানি করিয়া ধর্মঘট ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেইসকল শ্রমিককে বুঝাইয়া বলিলে তাহারা কাজ চালু করিতে আসে না। কিন্তু যদি কোন ক্ষেত্রে তাহারা ধর্মঘটি মজুরের রোজী মারিতে অগ্রসর হয় তবে তাহাকে দালাল হিসাবে গণ্য করিতে হইবে এবং দালালের যে শাস্তি প্রাপ্য সেই শাস্তিই তাহাকে দিতে হইবে।

অভিজ্ঞতা হইতেই দেখা গিয়াছে, ক্ষেতমজুররা ধর্মঘট করিয়া দীর্ঘদিন চুপচাপ বসিয়া থাকে না। তাহারা দিনে হোক, রাত্রিতে হোক, যেভাবে হোক হয় ফসল কাটিয়া নিজেদের ঘরে আনে, নতুবা জোতদারের গোলা দখল করে, জমি দখল করে এইভাবে বিপ্লবী কায়দায় নিজেদের দাবি আদায় করিয়া লয়।

কিন্তু গ্রাম-অঞ্চলের অধিকাংশ পার্টিকর্মী এখনো ক্ষেতমজুরদের এই বিপ্লবী চরিত্র দেখিতে পান নাই, ফসলের সংগ্রামে তাহাদের ধর্মঘট ও সংগঠিত হস্তক্ষেপের গুরুত্ব অনুভব করেন নাই। সমস্ত ফসল ও জমির মালিকানা কৃষকের এবং বাঁচার মত মজুরি চাই—এই আওয়াজের বিপ্লবী তাৎপর্য্য ও বিপ্লবী শক্তি দেখিতে পান নাই।

ফসলের সংগ্রামের উপর ইহার ফল কি হইয়াছে? ফল হইয়াছে মারাত্মক। গত দুই বছরের মতই অধিকাংশ জেলায় ফসলের সংগ্রাম মাঝারী কৃষকের নেতৃত্বে পরিচালিত হইতেছে।

আরামবাগ (থানা) হইতে এক কমরেড লিখিতেছেন, সংগ্রাম-কমিটি গঠিত হইয়াছে, কিন্তু তবু ভাগচাষী নিজ খোলানে ধান তুলিতে ইতস্তত করিতেছে। মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম হইতে এক কমরেড লিখিতেছেন, ব্যাপক পুলিশ জুলুমের ভয়ে নিজ খোলানে ধান উঠিতেছে না। হাওড়া হাটাল এলাকা হইতে এক কমরেড লিখিতেছেন, পুলিশ পাহারায় ধান কাটিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে, কিন্তু বাধা দেওয়া যায় নাই। পুলিশ ও জোতদাররা মাঝারী কৃষকদের সহিত যোগাযোগ করিতেছে, আপসের প্রস্তাব করিতেছে।

গত বছরও ফসলের সংগ্রামে ঠিক ইহাই দেখা গিয়াছিল। মাঠ হইতে ফসল কাটিয়া আনা, ধান ঝাড়াই-মারাই করা এবং ভাগ-বাঁটোয়ারা করা—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মাঝারী কৃষক দোমনাভাব দেখাইয়াছে; আপস ও দমননীতি—এই দুই চাপের মধ্যে পড়িয়া আপসের পথই বাছিয়া লইয়াছে।

এই দোমনাভাব কাটাইয়া উঠিবার উপায় কি? উপায় হইল ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করা, ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের লইয়া জঙ্গী দল গঠন করা, মাঠ হইতেই ফসল দখল করার দায়িত্ব এই জঙ্গীদের হাতে দেওয়া। যেখানে মাঝারী কৃষক ফসল নিজ খামারে তুলিতে অস্বীকার করিবে সেখানে সমস্ত ফসল সংগ্রাম-কমিটির খামারে তোলা। হাওড়ার যে জমিদার-জোতদার সারা বছর গ্রামে পুলিশ ডাকিয়া আনিয়াছে, মাসিনা-হাটাল সর্বত্র মা-বোনের রক্তে ফসলকে রক্তাক্ত করিয়াছে—সেই শত্রুর ঘরে ফসল তোলার প্রস্তাব করে সাহস করে? সেই শত্রুর ঘরের ফসল পুলিশ ছাড়া আর কে ভোগ করিবে? ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকের মধ্যে যদি এই মেজাজ দেখিতে পাইত, ব্যাপক ধর্মঘট করিয়া ক্ষেতমজুররা যদি এই বিপ্লবী শপথ জানাইয়া দিতে পারিত, তাহা হইলে তাহার মধ্য দিয়া সমগ্র গ্রাম-অঞ্চলে আপসহীন শ্রেণি সংগ্রামের আবহাওয়া সৃষ্টি হইত। শ্রমিক শ্রেণি এবং তাহাদের সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা জাগ্রত হইত মাঝারী কৃষকও মনে বল পাইত, দমননীতি এবং পুলিশ ক্যাম্প থাকা সত্ত্বেও তাহারা ফসল কাটিয়া নিজ খোলানে আনিত। প্রথমে এক দুইখানা গ্রামেও যদি ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের জঙ্গী বাহিনী পুলিশ ক্যাম্প অগ্রাহ্য করিয়া সমস্ত ফসল কৃষকের ঘরে আনে তাহা হইলে অন্যান্য এলাকায়ও তাহার বিপ্লবী প্রভাব ছড়াইয়া পরিবে। অধিকাংশ জেলায় এখনো ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকের উপর নির্ভর করিয়া এই ধরনের বিপ্লবী নেতৃত্ব দেওয়া হইতেছে না। তাহার জন্যেই ফসলের সংগ্রাম আপসের চোরাবালিতে আটকাইয়া যাইবার গুরুতর সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

একদিকে যেমন ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের উপর নির্ভর করা হইতেছে না, তেমনি অপরদিকে প্রকাশ্য গণসমাবেশ প্রভৃতির উপর কম জোর দেওয়া হইতেছে। কাকদ্বীপ ও

হাওড়ার রিপোর্ট হইতে দেখা যায়, অনেক এলাকার শ্রেষ্ঠ জঙ্গীরা সংঘর্ষের প্ল্যান করার নামে দিনের পর দিন সময় নষ্ট করিয়াছেন, অথচ এলাকার কৃষকদের কোন গণসংগ্রামেই টানিতেছেন না। আসলে গণসমাবেশ হইলে পুলিশ আসিবে এইকথা মনে করিয়াই তাহারা পুলিশের সহিত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এড়াইয়া যাইতেছেন। এইভাবেই তাঁহারা গ্রামের অধিকাংশ কৃষককে সংগ্রামে অংশীদার করিতে অস্বীকার করিতেছেন।

প্রকাশ্য সভা, শোভাযাত্রা, ঘেরাও গণবিক্ষোভ প্রভৃতি সংগঠিত না করার ফল কি হইতেছে?

প্রকাশ্য সভা-শোভাযাত্রা-জাঠা প্রভৃতি বাহির না করায় কৃষক তাহার বিপুল শক্তির সন্ধান পাইতেছে না—নিজেকে একা এবং দুর্বল মনে করিতেছে। আবার অন্যান্য কোথায় কিরকম লড়াই হইতেছে তাহার সমগ্র চিত্র তাহার সামনে না থাকায় দমননীতির মুখে সে বারবার প্রশ্ন করিতেছে আমরা একাই কেন লড়াই করিয়া সর্বস্বান্ত হইব? প্রকাশ্য আন্দোলনের মধ্য দিয়া শত্রুর প্রচারের জবাব দেওয়া, আতংক দূর করা শত শত জঙ্গী বাহির করা এবং তাহাদের সামনে সংগ্রামের বিপ্লবী লক্ষ্য স্পষ্ট করিয়া উপস্থিত করা—ইহার কোনটাই এখনো ভালভাবে করা হইতেছে না।

গ্রামের অধিকাংশ কৃষককে এই ফসলের সংগ্রামে টানিতে হইবে, তাহাদের মধ্যে উদ্যোগ সৃষ্টি করিতে হইবে, তাহাদের সক্রিয় করিতে হইবে—এই দায়িত্ব এখনো সম্যক উপলব্ধি হয় নাই বলিয়াই জেলা কমিটির বর্দ্ধিত সভায় মেদিনীপুরের কমরেড রাধাপদ প্রশ্ন করিয়াছেন : এখন যখন ক্ষমতা দখলই আমাদের মূল লক্ষ্য তখন এলাকায় এলাকায় বিভিন্ন দাবি লইয়া লড়াই করিতে গেলে ক্ষমতা দখলের লড়াই বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে না কি? এই ধরনের প্রশ্ন ও সন্দেহ মনে থাকার জন্যেই অনেক কমরেড এখনো মুখে অতি বিপ্লবী বুলি আওড়াইয়া এবারকার ফসলের সংগ্রামের উপর তেমন গুরুত্ব দিতেছেন না। তেভাগা দাবি করা হইবে, কি পুরা ফসল দাবি করা হইবে, কি টাকায় খাজনা দিবার প্রস্তাব করা হইবে—তাহা লইয়া এখনো বিতর্ক চলিতেছে।

এই বিতর্কের এখনই অবসান হওয়া প্রয়োজন। মেদিনীপুর, ময়মনসিং, হাওড়া, ২৪ পরগণা প্রভৃতি যেসকল জেলায় ভাগচাষীরা ১৯৪৬ সাল হইতে ফসলের সংগ্রাম চালাইয়া আসিয়াছে—এবছর সেখান হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই দাবি উঠিয়াছিল—এবার আর তেভাগা নয়—চৌ-ভাগাই অর্থাৎ সব ফসলই দখল করিতে হইবে। অথচ, রিপোর্ট হইতে দেখা গেল, এই সকল এলাকায়ও পার্টির প্রচার প্রভৃতিতে তে-ভাগার উপরেই প্রধান জোর দেওয়া হইতেছে, সমস্ত ফসল নিজ খামারে তুলিতে ইতস্তত করা হইতেছে। এই দোমনাভাব কাটাইবার জন্যেই প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক গত ১৬ই ডিসেম্বরে এক সার্কুলারে বলেন : 'আধি নাই, তেভাগা চাই'—এই শ্লোগান আর দেওয়া চলিবে না, সমস্ত ফসলই ঘরে তুলিতে হইবে। ফসল রক্ষা করিতে হইবে এবং সংগ্রাম কমিটির সিদ্ধান্ত মত কাজ হইবে। মাঝপথে আপসের পথ বন্ধ করার জন্যেই প্রাদেশিক সম্পাদক এই জরুরি নোট পাঠাইয়াছিলেন।

কিন্তু আপস বা সংস্কারবাদ বন্ধ করার কোন সহজ ধরাবাধা উপায় নাই; ক্ষমতা দখলের মূল লক্ষ্য ভুলিয়া গেলে সংগ্রাম সংঘর্ষের পর্যায়ে উঠিলেও তাহা সংস্কারবাদের গণ্ডী পার হইতে পারে না, আংশিক সংগ্রামের স্তরেই থাকিয়া যায়। ১৯৪৬ সালে দিনাজপুর, রংপুরে বা

১৯৪৭ সালে ২৪ পরগণায় ফসলের সংগ্রামে তাহা কে না দেখিয়াছে? আবার ক্ষমতা দখলের লক্ষ্য সামনে রাখিলে তেভাগা বা ফসলের বদলে টাকায় খাজনা—এই আওয়াজ সামনে রাখিয়াও সংগ্রামকে উচ্চস্তরে লইয়া যাওয়া যায়—গত বছরের ফসলের সংগ্রামে অনেক জেলায়ই আমাদের সেই অভিজ্ঞতা হইয়াছে। কাকদ্বীপের কৃষক দাবি করিয়াছিল তেভাগা, হাওড়া, ডোমজুরের কৃষক দাবি করিয়াছিল টাকায় খাজনা। মেদিনীপুরের কৃষক দাবি করিয়াছিল—সাজা বন্ধ, জমিদার-জোতদাররা ফসলের একভাগ নেয় নাই, টাকায় খাজনা নেয় নাই, সাজা বন্ধের প্রস্তাব মানিয়া লয় নাই, পুলিশ পাঠাইয়া সব ফসলই দখল করিতে চাহিয়াছে। সেখানকার কৃষক তাহার জবাব দিয়াছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সব ফসলই দখল করিয়া, গোলা দখল করিয়া, জমি দখল করিয়া, জোতদার-জমিদার-দালাল হালাল করিয়া। পুলিশের সহিত অসংখ্য সংঘর্ষের মধ্য দিয়া গৃহযুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে; গ্রামগুলিতে বিধান মন্ত্রিসভার খুনী শাসন অচল হইয়া পড়িতেছে।

তেমনি বাঁকুড়ার ক্ষেতমজুর দাবি করিয়াছিল বাঁচার মত মজুরি। বাঁচার মত মজুরির সংগ্রামই বিধান মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের রূপ লইয়াছে, ১৫ই অগষ্টের বিক্ষোভে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছে।

অপর দিকে, ক্ষমতা দখলের মূল লক্ষ্য ভুলিয়া গেলে একটা বিরাট সংগ্রামও কিভাবে পণ্ড হয় তাহা আমরা দেখিয়াছি চট্টগ্রামের কুতুবদিয়া দ্বীপে এবারকার ক্ষেতমজুর ধর্মঘটে। ৫০০০ ক্ষেতমজুর ধর্মঘট করিল কিন্তু সমগ্র এলাকায় একটা সভা বা শোভাযাত্রা হইল না। আরাকানের মুক্ত এলাকা হইতে মাত্র ৭০ মাইল দূরে থাকিয়াও পার্টিকর্মীরা একবারের জন্যেও ক্ষেতমজুরদের নিকট জমি বা ক্ষমতা দখলের কথা প্রচার করিলেন না, সভা-সমিতিতে খুনী নুরুল আমীনের মুখোশ খুলিলেন না। পুলিশ জুলুমের ভয়ে আতংকিত হইয়া সংগ্রাম কমিটি মাঝপথে আপস করিল; সংগ্রাম কমিটির সম্পাদক নিজে ধর্মঘট ভঙ্গকারিতে পরিণত হইল; এতবড় একটা বিপ্লবী সম্ভাবনাপূর্ণ সংগ্রাম সাময়িক মজুরি বৃদ্ধিতে শেষ হইল। সংস্কারবাদী যুগের আংশিক সংগ্রামের দৃষ্টি লইয়া সংগ্রামকে পরিচালিত করা হইল।

রিপোর্ট হইতে দেখা যায়, সংগ্রামকে এইভাবে সংস্কারবাদের চোরাবালিতে ধ্বংস করার ব্যাপারে কুতুবদিয়া একা নয়। মেদিনীপুর হইতে খবর আসিয়াছে, অনেক জোতদার ধান সীজ এড়াইবার জন্যে নিজেরাই ভাগচাষীর খামারে ধান তোলার প্রস্তাব করিয়াছে, এবং সেখান হইতে নিজেদের পুরা ভাগ আদায় করার চেষ্টা করিতেছে। কোন কোন জোতদার তেভাগার দাবি মানিয়া লওয়ায় তাহাদের সহিত আপস করা হইতেছে।

ময়মনসিং পাহাড় অঞ্চলের রিপোর্ট হইতে দেখা যায়, অধিকাংশ ধনী ও মাঝারী কৃষক ক্ষেতমজুরদের মজুরি কিছুটা বৃদ্ধি করিয়াছে বলিয়া পার্টি কর্মীরা ক্ষেতমজুরদের আলাদা সংগঠন গড়ার কাজে ঢিলা দিয়াছেন।

দিনাজপুরের একখানা ইস্তাহারে দেখা যায় তাঁহারা 'আধি নাই' বলিয়াছেন, কিন্তু তেভাগা বা সম্পূর্ণ ফসল চাই—কোনটাই স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই—আপসের পথ খোলা রাখিয়াছেন।

সংগ্রামের মধ্যে কোন দাবি আংশিকভাবে পূর্ণ হইলে তাহাকে উচ্চতর সংগ্রামে পৌঁছিবার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে—ইহাই আংশিক দাবির সংগ্রাম সম্পর্কে বিপ্লবী কৌশল। ইহা ভুলিয়া যাওয়ার জন্যেই কুতুবদিয়ার ক্ষেতমজুররা পুলিশের সহিত মোকাবিলা করিয়া—

জমি দখল-কাছারি দখলের দিকে অগ্রসর হইতে পারিল না। ইহা ভুলিয়া গেলেই মেদিনীপুরে যে ফসল কৃষকের ঘরে উঠিয়াছে তাহাও রক্ষা করা যাইবে না। এইকথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যেই প্রাদেশিক সম্পাদক জরুরি নোট পাঠাইয়াছিলেন।

কিন্তু ঐ জরুরি নোট হইতে একটা ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে—এখানে সে সম্পর্কে দুই একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। পেছনে পড়া এলাকার কৃষকদের মধ্যে উদ্যোগ সৃষ্টির জন্যে তাহাদের অধিকাংশকে ময়দানে টানিবার জন্যে কোথাও তেভাগার নাম করা যাইবে না—প্রাদেশিক সম্পাদকের জরুরি নোট তাহা রাখিতে চাহে নাই। এলাকার আন্দোলনের স্তর বিচার করিয়া জেলা কমিটিকেই স্থির করিতে হইবে, কোথায় তেভাগার দাবিতে সংগ্রাম শুরু করিতে হইবে। আরামবাগ বা আসানসোলে দেখা গিয়াছে তেভাগার আওয়াজই পিছনে পড়া ভাগচাষীদের সংগ্রামে টানিয়াছে। ঐ দাবির উপরে বড় বড় সভা শোভাযাত্রা হইতেছে। সুতরাং এই সকল এলাকায় প্রাথমিক অবস্থায় তেভাগার দাবি সামনে রাখিয়াই ফসল দখল করিতে হইবে এবং নিজ খামারে ফসল তুলিতে হইবে। ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মালদহ জেলাতেও এমন অনেক পেছনে পড়া এলাকা থাকিতে পারে যেখানে গত তিন বছরে একবারও ফসলের লড়াই হয় নাই। সেখানে তেভাগার দাবি তোলা কোন অপরাধের কাজ নয়। আসল কথা দখল, পুরা ফসলের উপর মালিকানা ...—এই বিশ্বাস লইয়া তেভাগার দাবি হইতে দ্রুত জমি দখল—পুরা ফসল দখলের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। গত বছর ঠিক এইখানেই আমরা ব্যর্থ হইয়াছি। মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় ব্যাপক এলাকায় তেভাগা এবং টাকায় খাজনার দাবি ভাগচাষীর মধ্যে সংগ্রামী উদ্বেগ সৃষ্টি করিয়াছিল, হাজার হাজার কৃষক সংগ্রামে আসিয়াছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে বিধান মন্ত্রিসভা ভাগচাষ কনট্রোল বোর্ডের ধোকা, উপস্থিত করিল, যে মুহূর্তে ভাগচাষীরা স্থানীয়ভাবে আপসের আওয়াজ তুলিল, তখনই অনেক এলাকায় সংগ্রামে বিভেদ আসিল। সংগ্রাম কমিটি গুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধনী ও মাঝারী কৃষকের হাতে থাকায় তাহারা দমননীতির বিরুদ্ধে না দাঁড়াইয়া আপসের পথ গ্রহণ করিল। হাওড়ার একজন কৃষক নেতা পরামর্শ দিলেন ঃ সকলে এক সঙ্গে আপস কর। গত বছর তেভাগার দাবি তুলিয়া অন্যায় করা হয় নাই—সংগ্রামের বিপ্লবী লক্ষ্য ভুলিয়া গিয়া, সংগ্রামকে মাঝারী কৃষকের নেতৃত্বে ছাড়িয়া দিয়া অনেক স্থানে পণ্ড করা হইয়াছে। এবারও সংগ্রাম কমিটিগুলিতে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের প্রাধান্য কায়েম করিতে না পারিলে ফসলের সংগ্রাম গত বছরের মতই পণ্ড হইবে।

গত বছর যে সকল এলাকায় তেভাগা, টাকায় খাজনা, সাজা ...... প্রথার বিরুদ্ধে যেখানে যে সংগ্রাম হইয়াছে—এবার সেখানে স্বতঃস্ফূর্ত ... দেখিতে না পাইয়া অনেকে শত্রুর শক্তিকে বড় করিয়া দেখিতেছেন। হাওড়া রাজপুরের কমরেডরা বলিতেছেন ঃ পুলিশ ঘাঁটিকে আগে নিশ্চিহ্ন কর, তাঁহা হইলে ফসল ঘরে তুলিব। ১৯৪৬ সালের মত স্বতস্ফূর্ত গণ-অভ্যুত্থান দেখিতে না পাইয়া বর্দ্ধমানের কোন কোন কমরেড সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন, তেভাগার দাবিতেও হয়ত কৃষকদের সংগ্রামে নামানো যাইবে না।

এই সকল কমরেড নিজেদের শক্তিকে এত ছোট করিয়া দেখিয়াছেন কেন? ১৯৪৬ সালে বা গত বছর পুলিশ এত ব্যাপকভাবে গ্রামে গ্রামে ক্যাম্প করিয়া থাকে নাই, ফসল কাটার সময় মাঠে মাঠে এমনভাবে পাহারা বসায় নাই, টংক এলাকার মত কোথাও পুলিশ বাহিনী নিজেদের

হাতে ফসল কাটিতে অগ্রসর হয় নাই। এবার যে তাহারা গ্রামের পর গ্রামে ফসল উঠার আগে হইতে ছাউনী তুলিয়াছে—ইহা কি তাহাদের শক্তির পরিচয় না দুর্বলতার পরিচয়? গ্রামে পুলিশ ক্যাম্প বসানোর তাৎপর্য কি? যতদিন বিধান-নুরুল আমীন মন্ত্রিসভার পক্ষে প্রতিশ্রুতি আর ধাপ্পা দিয়া, আনসার-সেবাদল গুণ্ডাবাহিনী দিয়া গ্রামকে হাতে রাখা সম্ভব ততদিন তাহারা গ্রামে পুলিশ পাঠাইবে কেন? গ্রামে তো সংগ্রাম তীব্র হইয়াছে, গৃহযুদ্ধের রূপ লইয়াছে; গ্রাম তাহাদের হাতছাড়া হইতেছে, গ্রামে গণ-অধিকার ও গণ-শাসন কায়েম হইতেছে—ইহা বুঝিতে পারিতেছে বলিয়াই তাহারা নতুন করিয়া গ্রামগুলিকে দখল করিতেছে। যে গ্রামে পুলিশ ক্যাম্প বসিয়াছে সেই গ্রাম মুক্ত এলাকায় প্রবেশ করিতেছে,—এই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া দেখিলেই তেভাগা, পুরা ফসল, জমি, মজুরি সকল সংগ্রাম একই লক্ষ্যে পরিচালিত হইবে। কোন এলাকার পেছনেপরা একজন দুইজন কৃষকের সহিত সায় দিয়া অথবা মাঝারী কৃষকদের দোমনাভাবের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া কমরেড এই কথা আজ কে বলিবে যে—তেভাগার সংগ্রামেও কৃষককে টানা যায় না।

ফসল মাঠেই থাকুক, আর যেখানেই থাকুক—সমস্ত ফসল কৃষকের—ইহা যদি সত্য না হইত তবে গত বছর যে সকল এলাকায় কৃষক ফসল উঠার সময়ে তেভাগার ক্ষভে সংগ্রাম করে নাই সেখানকার কৃষকও কিছুদিন যাইতে না যাইতে জোতদারের গোলা হইতে খাদ্য দখল করিল কেন? এখনো হয়ত অনেক ফসল পুলিশ পাহারায় জোতদার-জমিদারের গোলায় উঠিয়াছে—কিন্তু জঙ্গীদের সাহায্যে এখনই তাহা টানিয়া বাহির করা হইবে না কেন? অধিকাংশ ফসল জোতদারের গোলায় উঠিয়াছে দেখিয়া গত বছর সন্দেশখালি হইতে কমরেড মহেশ লিখিয়াছিলেন, এবারকার মত ফসলের সংগ্রাম শেষ হইয়াছে। কিন্তু সেই সন্দেশখালির কৃষকই জোতদারের গোলা ভাঙ্গিয়া ফসল দখল করিয়া মহেশের কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করিয়াছে।

গত বছর দেখা গিয়াছে, ফসল জোতদারের বাড়ী তোলার পরও দিনাজপুর-২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলায় কৃষকরা দীর্ঘ দিন গাদা বয়কট চালাইয়া তেভাগার দাবি আদায় করিতে চেষ্টা করিয়াছে। গাদা বয়কটের সত্যাগ্রহী কায়দা পরিত্যাগ করিয়া ভাগচাষীকে গাদা দখল করিয়া আবার নিজ খোলানে ধান তোলায় উৎসাহিত করিতে পারিলে ঘটনা অন্যরকম হইত। ক্ষেতমজুরদের দাবি লইয়া সংগ্রাম না করায়, পুলিশ জুলুম ও দমননীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্ষেতমজুর ধর্মঘট ও বিক্ষোভ সৃষ্টি না করায় প্রতিরোধ গড়িয়া না তোলায়, গাদা ভাঙ্গার কাজে কৃষকদের উৎসাহিত করা যায় নাই, তাহার জন্যেই ঐ সংগ্রাম সত্যাগ্রহে ও আপসে-আত্মসমর্পণে শেষ হইয়াছে।

এবার আর তাহা ঘটিতে দেওয়া হইবে না। এবার ক্ষেতমজুরদের ধর্মঘট শুরু করিতে হইবে, জোতদার-জমিদার-ধনী কৃষকদের গাদা ভাঙ্গিয়া আনার জন্যে জঙ্গীবাহিনী তৈরি করিতে হইবে এবং সমস্ত ফসল দখল করার সংগ্রামকে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেওয়ার মত সংগ্রামকমিটি গঠন করিতে হইবে। সমস্ত ক্ষেতমজুর-গরীব কৃষক ভাগচাষীকে পুলিশ জুলুম ও দমননীতির বিরুদ্ধে পরিচালিত করিতে হইবে, তাহাদের বুঝাইয়া বলিতে হইবে যে, মাঝপথে থামিবার আজ আর কোন উপায় নাই। মাঝপথে থামিলে আজ ফসল হাতছাড়া হইবে—কাল সরকারি ধান সীজ শুরু হইবে, পরশু অর্ডিনান্সের জোরে জমি হাতছাড়া হইবে, বাড়ীঘরও পুলিশ-জোতদারের গুণ্ডারা দখল করিয়া লইবে, আর সাহসের সহিত জমিদার-জোতদারের গাদা ও গোলা দখল

করিলে, জমি-দখল করিলে বাড়ী ও কাছারি আক্রমণ করিলে, পুলিশ ও গুণ্ডাদের ঘাঁটিগুলি নিশ্চিহ্ন করিলে সারা বছর জোতদার-জমিদারের মুখের দিকে তাকাইয়া উপবাসী থাকিতে হইবে না, বিধান-নুরুল আমীনের শাসনই অচল হইবে। লড়াই না করিলে বিধান মন্ত্রিসভার 'ভাগ-চাষ কনট্রোল' রোজই গ্রামে ধনী পুলিশের একচ্ছত্র রাজত্ব কায়েম করিবে, আর লড়াই চালাইয়া গেলে তাহাদের গ্রামে প্রবেশ করাই অসম্ভব হইয়া পড়িবে। এইভাবে সর্বত্র আপসহীন সংগ্রামের মনোভাব সৃষ্টি করিয়া গ্রামে শোষক শ্রেণি ও তাহাদের দালালদের অস্তিত্ব লোপ করিতে হইবে; খাজনা, ট্যাক্স, ঋণ প্রভৃতি আদায় করিবার জন্য যাহারা গ্রামে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিবে তাহাদের উপর কৃষকের ১৪৪ ধারা জারি করিতে হইবে।

খুনী বিধান-নুরুল আমীন মন্ত্রীসভা আজ সবদিক হইতেই মার খাইতেছে। ময়মনসিং পাহাড় এলাকা ও কাকদ্বীপের লাল জঙ্গী বাহিনী পুলিশের ক্যাম্প আক্রমণ সারা গ্রামাঞ্চলে তাহার প্রভাব আগুনের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। চটকলের শ্রমিকরা আবার সাধারণ ধর্মঘটের দিকে অগ্রসর হইতেছে; রেল শ্রমিকরা মালিকদের ঘেরাও করিতেছে; ছাত্র-ছাত্রীরা মূল দাবির উপর সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত লইয়াছে; সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, ব্যাঙ্ক কর্মচারী—সকলেই একসঙ্গে সাধারণ ধর্মঘট শুরু করিয়া বিধান মন্ত্রিসভাকে শেষ আঘাত হানিতেছে। বন্দীশালায় নিরস্ত্র বন্দীরা শত্রুকে বারবার আঘাত করিয়া নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার কায়েম করিতেছে। ২৬শে জানুয়ারির দাস শাসনতন্ত্র জনগণের ঘৃণা ও ক্রোধের আগুনে ছাই হইয়া যাইতেছে, জয়যুক্ত হইতেছে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রদের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট এবং তাহার বিপ্লবী কার্য্যক্রম। জমি-মজুরি-স্বাধীনতার দাবি লইয়া আমরা চীনের মত ক্ষমতা দখলের পথে অগ্রসর হইয়াছি। ফসলের সংগ্রামকে জয়যুক্ত করিয়া এই গণতান্ত্রিক বিপ্লবকেই আমরা জয়যুক্ত করিতেছি।

৩০ ডিসেম্বর ১৯৪৯

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

আপনার বাঁচার লড়াইয়ে কমিউনিস্ট পার্টিকে টাকা দিন, শত্রুর বিরুদ্ধে জমি, রুটি, শান্তি ও স্বাধীনতার লড়াইকে তীব্র করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির দুই লক্ষ টাকার সংগ্রামী তহবিলকে পূর্ণ করুন

ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল, ভারতীয় পুঁজিরাজের হুকুমবরদার এই কংগ্রেসী গবর্ণমেন্ট ক্ষমতার আসনে বসার সঙ্গে সঙ্গেই দেশবাসীর উপর নৃশংস আক্রমণ শুরু করেছে। মেহনতি জনতার প্রত্যেকটি অংশের উপরেই এই ফ্যাসিস্ট গবর্ণমেন্ট আজ বন্দুক আর কয়েদখানার রাজত্ব কায়েম করেছে। তাই এর বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছে শোষিত জনতার দুরন্ত প্রতিরোধ। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শুরু হয়েছে দুর্বার অভিযান—জমি আর রুটির জন্য, রুজি আর গণতন্ত্রের জন্য, শান্তি এবং স্বাধীনতার জন্য। কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে দেশের শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর ছাত্র, কেরাণী, বাস্তুহারা গরীব সবাই আজ এগিয়ে চলেছে—বিদেশীর দালাল এই কংগ্রেসী সরকারকে ধ্বংস করায় পথে, ফ্যাসিস্ট রায় মন্ত্রী সভাকে খতম করার লড়াইয়ে। এই লড়াইকে আরও ছড়িয়ে দেবার জন্য টাকা চাই। কমিউনিস্ট পার্টিকে আপনারা টাকা দিন।

দেশের লক্ষ-লক্ষ ভাই-বোন উপোসী থাকা সত্ত্বেও এই কংগ্রেসী গবর্ণমেন্ট বাঁচার মত মজুরি দিতে পর্যন্ত অস্বীকার করেছে। নিজেদের বেইমানী শাসনকে বাঁচাবার জন্য এই গবর্ণমেন্ট জনসাধারণের নাগরিক অধিকারকে দমন করছে; মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে কেড়ে নিয়েছে, শত-শত গরীব নর-নারীকে পথে-ঘাটে গুলি করে হত্যা করেছে, হাজার-হাজার লোককে ধরে নিয়ে জেলের পর জেল ভর্ত্তি করেছে। একমাত্র পশ্চিম বাংলাতেই ৫ হাজারেরও বেশী রাজনৈতিক কর্মীকে জেলে আটক রাখা হয়েছে।

আতংকিত-আহত জানোয়ারের মত এই গরবর্ণমেন্ট কথায় কথায় গুলি চালাচ্ছে, লাঠিবাজি ডাণ্ডাবাজি করছে, শ্রমিকের বস্তী এবং কৃষকের ঘর লুটে নিচ্ছে, আমাদের মা-বোনদের পর্যন্ত হত্যা করেছে, বলাৎকার করছে। জেলে শৃঙ্খলিত রাজবন্দিনীদের উলঙ্গ করে তাদের উপর পাশবিক অত্যাচারের চেষ্টা চলেছে। কিন্তু এত করেও ফ্যাসিস্ট দস্যুরা পার পাচ্ছে না। রুখে দাঁড়িয়েছে বিদ্রোহী জনতা তারই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে। এই বিদ্রোহকে এগিয়ে নেবার জন্য টাকা চাই। কমিউনিস্ট পার্টিকে আপনারা টাকা দিন।

গবর্ণমেন্টের পৈশাচিকতাকে ঘৃণায় উপেক্ষা করে দেশের মানুষ ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মত লড়াইয়ে এগিয়ে চলেছে, কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী ঝাণ্ডার তলায় এসে তারা সামিল হচ্ছে। আজ কমিউনিস্ট পার্টিই তাদের ভরসা। কারণ, এই কমিউনিস্ট পার্টি সংগ্রামী জনতারই শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের নিয়ে গড়ে উঠেছে। কারণ, এই পাত্রটি শত্রুর কোন হুমকিকেই পরোয়া করে না; সব হুমকিকেই পায়ে মাড়িয়ে শত্রুকে আঘাত করতে বারে বারে ছুটে যায়।

দেশের লক্ষ-লক্ষ মানুষ স্বচক্ষে আজ দেখছেন : ইঙ্গ-মার্কিনের দালালদের এত নৃশংসতা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টি কখনও তার শত্রুর কাছে মাথা নোয়ায় নি, তার মাথা কখনও

নোয়াবেও না। তাই দেখে আজ সাহসে ভর করে, হাজার মৃত্যুকে তুচ্ছ করে দেশের মেহনতী মানুষ বেছে নিচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির লড়াইয়ের পথ। এই লড়াই থামবে না। এই লড়াই চলবে—চলবে যত দিন না এই বিদেশীর দালাল, জনতার এই দুশমন সরকারকে একেবারে খতম করা না যায়, ভারতের মাটিতে প্রতিবেশী চীনের মত জনগণের গণতন্ত্র যত দিন না কায়েম হয়।

ফ্যাসিস্ট কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে আপনাদের লড়াইকে শতগুণ বাড়িয়ে নেবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে জোরদার করুন। কমিউনিস্ট পার্টির সংগ্রামী তহবিলে যথা সর্ব্বস্ব ঢেলে দিন। কমিউনিস্ট পার্টিকে জোরদার করা আপনারই দায়িত্ব। আপনারই লড়াইয়ের প্রয়োজনে তার লড়াইয়ের তহবিলকে ভর্ত্তি করে দিন।

বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদীদের চোখে আজ মৃত্যু ভয় ফুটে উঠেছে। এদেশেও পুঁজিদারী শাসক দস্যুদের মৃত্যুর দিন আর দূরে নেই! আহত পশুর হিংস্রতাকে বন্ধ করতে হলে তাকে দুনিয়া থেকে একেবারে সরিয়ে দিতে হবে। দুনিয়ার মুক্তিকামী জনতার হাতে হাত মিলিয়ে আপনাদের চারিদিককার লড়াইকে আরো তীব্র, আরো নির্মম করে তুলুন। আপনাদের লড়াইয়ের নেতা কমিউনিস্ট পার্টিকে তেজীয়ান করে তুলুন, তার দুই লাখ , টাকার সংগ্রামী তহবিলকে অবিলম্বে ভর্ত্তি করে দিন। সারা দেশ আজ এই বিরাট অভ্যুত্থানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দেশজোড়া রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘট আসন্ন। চটকলে, রেলে, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ, সূতাকলে, কয়লার খনিতে, চা-বাগানে, ডাক, স্কুলে-কলেজে, ব্যাঙ্কে, অফিসে, সরকারি দপ্তরে—খণ্ড খণ্ড লড়াই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সাধারণ ধর্মঘটের দিকে, বিরাট বিপ্লবী বন্যার দিকে ছুটে চলেছে। গ্রামে গ্রামে ফসল কেটে ঘরে তোলার লড়াইকে খেতমজুরের বাঁচার মত মজুরীর লড়াইকে কমিউনিস্ট পার্টি এলাকার পর এলাকায় ক্ষমতা দখলের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তেলেঙ্গানায়, লালগঞ্জে, হাজং এলাকায় স্বাধীন মুক্ত এলাকা গড়ে উঠেছে।

এই লড়াইয়ের জঙ্গী নেতৃত্বকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব আপনার নিজের কমিউনিস্ট পার্টির সংগ্রামী তহবিলকে পূর্ণ করার জন্য আপনারই লড়াই আপনাকে ডাক দিচ্ছে।

তথাকথিত বামপন্থী দলের নেতারা সোশালিষ্ট, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর-এস-পি নেতারা সোজা আজ শত্রুর শিবিরে ঢুকে পড়েছে। চারিদিককার লড়াইয়ের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে এই সব কাপুরুষ বিশ্বাসঘাতকের দল দেশী ও ঈঙ্গ-আমেরিকান পুঁজিপতিদের বেশ্যাবৃত্তি শুরু করেছে। রেলে, সুতাকলে, কয়লা খনিতে শ্রমিকের ধর্মঘটকে ভাঙ্গার জন্য মালিকশ্রেণির এই পোষা কুকুরের দল হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে। এইসব দালাল পার্টি ও সংগঠনের সাচ্চা-সংগ্রামী ভাইদের কাছে কমিউনিষ্ট পার্টির আওয়াজ দালাল নেতাদের দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিন, আপনাদের দাবিকে আদায় করার জন্য, দাবির লড়াইকে দুর্বার করে তোলার জন্য—কমিউনিষ্ট পার্টির তহবিলে যথাসাধ্য অর্থ দিন, লালঝাণ্ডার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হউন।

দেশের প্রত্যেকটি সংগ্রামী ভাই-বোনের কাছে প্রত্যেক দলের সাধারণ সভ্যের কাছে আমরা দাবি জানাই ক্ষমতাদখলের চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য বিপ্লবের অব্যর্থ হাতিয়ারকে—কমিউনিষ্ট পার্টিকে শাণিত করে তুলুন, তার তহবিলকে অবিলম্বে পূর্ণ করে দিন, তাকে দুর্দ্ধর্ষ ও দুর্বার করে তুলুন।

১ জানুয়ারি ১৯৫০

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

পার্টি-চিঠি—৩

(১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০)

প্রিয় কমরেডগণ,

জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে জনগণ আর এক কদম এগিয়ে গেছে ২৫শে এবং ২৬শে জানুয়ারি। ১৯৫০ সালের উদ্বোধন হয়ে গেল বাংলার জনগণের খণ্ড সংগ্রামগুলিকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের উন্নত পর্যায়ে তুলে ধরে।

২৬শে জানুয়ারি দক্ষিণ কলকাতায় প্রায় এক লক্ষ নরনারী ব্যারিকেড রচনা করে তিন ঘণ্টা ধরে লড়েছে আক্রমণকারী শত্রুসেনার বিরুদ্ধে। কলকাতার রাস্তায় ব্যারিকেড সংগ্রাম গত এক বছরে আরও কয়েকবার হয়েছে, কিন্তু এবারকার সংগ্রাম সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। প্রথমতঃ এবারকার সংগ্রাম অন্যবারের মত কোন আংশিক গণদাবি নিয়ে হয়নি, হয়েছে সরকারি গঠনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে; এ সংগ্রাম হল সমগ্রভাবে জাতীয় পরাধীনতার বিরুদ্ধে ও ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রশক্তির উচ্ছেদের লক্ষ্য নিয়ে। সাধারণ নাগরিকেরাও সঠিকভাবে ২৬শে জানুয়ারির ঘটনাকে রসিদ আলি দিবসের সঙ্গে তুলনা করছেন।

মাত্র দুমাস আগে,—২৬শে নভেম্বর,—কলকাতার ময়দানে হয়েছিল ১ লক্ষ নরনারীর শান্তি সমাবেশ। ২ মাস পরেই আবার হল ১ লক্ষ নরনারীর আর এক অভিযান—সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে, রাস্তায় রাস্তায় এবং ব্যারিকেডে ব্যারিকেডে।

২রা জানুয়ারি থেকে কাকদ্বীপের মুক্ত এলাকাকে শত্রু-সৈন্য চারিদিক থেকে অবরোধ করে রেখেছে, তার ভিতর চলছে জনগণের জঙ্গী প্রতিরোধ। কিন্তু মুক্তি সংগ্রাম ছড়িয়ে গেছে দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায়। ২৬শে জানুয়ারি মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি থানায় কাকদ্বীপের মত সশস্ত্র অভিযান সংগঠিত হয়েছিল, কাকদ্বীপ অবরোধের জবাবে মেদিনীপুর জেলার এক বিরাট অংশ শত্রু শিবিরকে পরাস্ত করে ফেলেছিল। সরকার ভয়ে সে কথা বেমালুম গোপন করে গেছে। ২৪ পরগণা জেলা-কলকাতা এবং কাকদ্বীপের মাঝামাঝি অঞ্চল, মেদিনীপুর জেলার বহু অঞ্চল এবং হুগলী জেলার আরামবাগ এই সমস্ত জায়গাটা জুড়ে এখন সশস্ত্র মুক্তি-সংগ্রাম চালাতে হবে দিনের পর দিন, আঘাতের পর আঘাত হেনে দক্ষিণবঙ্গকে মুক্তি সংগ্রামের দুর্জয় ফ্রন্টে পরিণত করতে হবে—আগামী এক বছরের ভিতর। এই সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলুন কমরেডগণ, সারা দুনিয়ায় গণশক্তি আজ আমাদের পক্ষে, সারা এশিয়ার মুক্তি সংগ্রাম জয়ের পথে চলেছে দৃপ্ত-পদক্ষেপে, সারা ভারত জেগে উঠছে পরাধীনতা এবং ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে যুগান্তকারী গতিবেগ নিয়ে।

দক্ষিণবঙ্গের দিকে দিকে জঙ্গীবাহিনী তৈরি করুন আর গেরিলা কায়দায় সংগ্রাম চালিয়ে শত্রুর হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিন, শত্রুর হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে কেড়ে সশস্ত্র মুক্তিফৌজ তৈরি করুন। হাওড়ার কমরেডগণ পুলিশের হাত থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে দেখিয়েছেন কি করে মুক্তি সংগ্রামের জন্য হাতিয়ার সংগ্রহ করতে হয়। সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে এই পন্থা অনুসরণ করুন। দক্ষিণবঙ্গের জনশক্তি আজ প্রস্তুত। এখন অস্ত্র চাই আর চাই জঙ্গীবাহিনী। সশস্ত্র জঙ্গীবাহিনী এই অঞ্চলের অবস্থা ফিরিয়ে দেবে, বাংলাকে মালয় এবং বর্মার সমপর্য্যায়ে ফেলবে।

হাজং পল্লী এবং দক্ষিণবঙ্গ এখন সারা বাংলার মুক্তি সংগ্রামের দুটি যুদ্ধফ্রন্ট। সারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেছে বেছে পার্টির যোদ্ধাদের দক্ষিণবঙ্গে পাঠাতে হবে এই ফ্রন্টটিকে শক্তিশালী করবার জন্য। সমগ্র দক্ষিণবঙ্গকে এখন একটি বিস্তীর্ণ যুদ্ধ-ক্ষেত্রের মত এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিচালনা করতে হবে।

এই যুদ্ধের ভিতর দিয়ে গড়ে তুলতে হবে মুক্তিফৌজ। এই মুক্তিফৌজ গ্রামের পর গ্রাম, থানার পর থানা মুক্ত করতে করতে অগ্রসর হবে। ২নং পার্টি চিঠিতে এই কর্তব্যের কথা উল্লেখ করেছিলাম, তা আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। দক্ষিণবঙ্গ আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ফ্রন্ট-লাইন আর কলকাতার উপকণ্ঠস্থ শিল্প এলাকায় আমাদের মূল শিবির। ফ্রন্ট-লাইনের সাফল্য নির্ভর করছে এই মূল শিবিরের জঙ্গী অভিযানের ওপর।

২৫শে জানুয়ারি জাতীয় পরাধীনতা এবং ফ্যাসিস্ট গঠনতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিকের ব্যাপক অভিযান নূতন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। এই দিন সর্বপ্রথম হিন্দুস্থানী শ্রমিকদের ভেতর ব্যাপক রাজনৈতিক সাড়া পাওয়া গেল কংগ্রেস রাজের মেকি আজাদীর বিরুদ্ধে। আই-এন-টি-ইউ-সির দালালরা তাদের অধিকাংশকে জোর-জবরদস্তি করে সরকারি সভায় নিতে হয়েছে, আবার অনেকেই স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছেন লালঝাণ্ডার সভায়। এ আজাদী ঝুটা আজাদী—এ আওয়াজ উঠেছে হিন্দুস্থানী শ্রমিকদের ভিতরও। আমাদের প্রচার এবং আন্দোলন প্রধানতঃ বাংলা ভাষায় হয় বলে তাঁদের কাছে পার্টির কথা পৌঁছতে পারে না, তাই বাঙ্গালী শ্রমিকদের চেয়ে তাঁরা কিছুটা পিছিয়ে আছেন। তাই শিল্প এলাকায় হিন্দুস্থানী শ্রমিকের কাছে তাঁর নিজ ভাষার ব্যাপক প্রচার এবং আন্দোলন চাই।

কলকাতায় পার্টির শত শত কর্মী আছেন। তাদের অনেককে যেতে হবে দক্ষিণবঙ্গে সংগ্রাম চালাতে। কিন্তু আরও অনেককে যেতে হবে শহরতলীর বিস্তীর্ণ এলাকায়, হিন্দী শিখে নিয়ে হিন্দী ভাষাভাষী শ্রমিকদের সংগঠিত করার জন্য। প্রত্যেকটি ইউনিয়নকে সংগঠিত করতে হবে, প্রত্যেকটি ইউনিয়নকে শ্রমিকদের জঙ্গী জমায়েতে পরিণত করতে হবে, প্রত্যেকটি কারখানার মধ্যে শ্রমিকের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, পার্টির লক্ষ্য ও কর্মপন্থায় শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে খুব ব্যাপকভাবে এবং খুব তাড়াতাড়ি। কারখানার পর কারখানা থেকে সুবিধাবাদীদের হটিয়ে দিতে হবে। বিভিন্ন ইউনিয়নের সাধারণ সদস্যদের নিয়ে সম্মিলিত কমিটি ও প্রতিনিধিমূলক কারখানা কমিটি গঠন করে শ্রমিকদের সমস্ত রকম দাবি নিয়ে সমস্ত রকম কায়দায় লড়ে যেতে হবে। সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘটের সম্ভাবনা তবেই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। ধর্মঘটের এক নূতন জোয়ার উঠছে ভারতের দিকে দিকে, শীঘ্রই এ জোয়ার এক দুরন্ত বন্যা সৃষ্টি করবে। বম্বে ৭৫০০০ টেক্সটাইল শ্রমিকের হরতাল এবং হায়দ্রাবাদের সাধারণ ধর্মঘট সেই সম্ভাবনার আভাস দিয়েছে।

পার্টির প্রতি শ্রমিকের আস্থা জয় করতে হবে—এই আওয়াজ নিয়ে ১৫ই থেকে ২৫শে জানুয়ারি এই দশদিন কলকাতায় কমরেডদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কারখানা অঞ্চলে অভিযান চালাতে। কলকাতার পার্টি কমরেডদের অল্পাংশই সে নির্দেশ পালন করেছিলেন। যাঁরা এই দশদিন কারখানা অঞ্চলে গিয়ে প্রচার এবং আন্দোলন চালিয়েছেন তাঁরা সবাই এই অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এসেছেন যে সমগ্র শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে রয়েছে উন্নত রাজনৈতিক চেতনা। তাই অল্পসংখ্যক কমরেড মাত্র দশদিনে সমগ্র শিল্প এলাকায় ২৫শে জানুয়ারি এক

ব্যাপক রাজনৈতিক অভিযান সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন।

এ থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে আরও ব্যাপক সংখ্যায় স্থায়ীভাবে শ্রমিক আন্দোলনে নামলে একবছরে বাংলার চেহারা ফিরে যাবে। হিন্দী শিখুন, কারখানায় যান, ইউনিয়নগুলো গড়ে তুলুন আর শ্রমিক ঐক্যের অভিযান চালান। ইউনিয়নগুলোর মধ্যে এখনও এমন সুবিধাবাদী পার্টি-কর্মী আছেন যাঁরা ২৫ তারিখে ধর্মঘটের বিরোধিতা করেছিলেন। তাদের সরিয়ে বিপ্লবী কর্মী দিয়ে ইউনিয়নগুলো সচল এবং সবল করে তুলুন। আগামী ৯ই মার্চ যাতে রেল ধর্মঘট হয় তার প্রস্তুতি করুন। এ কাজ যদি না করেন তবে মুক্তি-সংগ্রাম সাবোটাজ করা হবে।

জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের জোর জোয়ার উঠেছে, কেউ পিছপাও হবেন না। কারাগারের ভিতর কমিউনিস্ট বন্দীরা সুদীর্ঘ অনশন ধর্মঘট এবং বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ চালিয়ে যে আদর্শ স্থাপন করলেন তা আমাদের পার্টির অতি মূল্যবান সম্পদ। এমন সম্পদ আর কোন্ পার্টির আছে? ২৬শে জানুয়ারি, দক্ষিণ কলকাতায়, শহীদ নিখিল আবার নূতন করে প্রমাণ করে গেল যে—কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে আজ তরুণের রক্ত তপ্ত হয়ে ওঠে শহীদ হবার জন্য।

কারখানা অঞ্চলে প্রচার করতে গিয়ে কৃষ্ণ চক্রবর্তী যে সাহস দেখালো এবং যে যন্ত্রণা বরণ করলো তা প্রমাণ করে পার্টির রাজনৈতিক পথের সতেজ শক্তি। এইসব ক্যাডার আমাদের পার্টির অমূল্য সম্পদ। এমনি ক্যাডার চাই আজ, শত শত ক্যাডার চাই, চাই মার্ক্সবাদ-লেলিনবাদে শিক্ষিত ক্যাডার। লেনিন এবং স্ট্যালিনের লেখার মধ্যে পাবেন মার্ক্সবাদ-লেলিনবাদের শিক্ষা, বিপ্লবের বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান শিখুন এবং শেখান। পার্টির নীতি এবং কর্মপন্থা ভালভাবে আয়ত্ত করুন। কমিনফর্ম এবং ভারতের ও পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির প্রচারপত্র নিয়মিতভাবে পড়ুন এবং অপরকে পড়ান। যে কমিউনিস্টরা লেখাপড়া জানেন তাদের বিপ্লবী দায়িত্ব হল সংগ্রাম ক্ষেত্রের সহস্র সহস্র শ্রমিক এবং কৃষক যোদ্ধাকে পার্টির আহ্বান বোঝানো এবং মার্ক্সবাদ-লেলিনবাদ শেখানো। মার্ক্সবাদ-লেলিনবাদ আজ পৃথিবীর অগণিত জনগণের বৃহত্তম চালনী শক্তি। এই শক্তিকে আয়ত্ত করুন, জয় সুনিশ্চিত।

ইতিহাসের চাকা জোর ঘুরতে আরম্ভ করেছে। আতংকিত শাসক শ্রেণি তাই হন্যে হয়ে উঠেছে। অত্যাচার বেড়েছে এবং আরও বাড়বে। গৃহযুদ্ধের ভিতর দিয়ে আমরা এগোচ্ছি এবং এগুবো। বিপ্লবের জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবিপ্লব ঘোরতর হিংস্র হয়ে উঠছে এবং উঠবে। রাজনৈতিক বন্দী-বন্দিনীদের ওপর অত্যাচার করে, নিখিল ভাদুড়িকে পিটিয়ে মেরে এবং তেলেঙ্গনার বন্দীদের ফাঁসির হুকুম দিয়ে শাসকেরা যে হিংস্রতা দেখিয়েছে তা থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে ওদের দিন ঘনিয়ে এসেছে এবং সেকথা ওরা বুঝতে পেরেছে। দমননীতিতে এখন কুলোচ্ছেনা বলে ওরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু এতেও হালে পানি পাবে না।

এগিয়ে চলুন কমরেডগণ, আর একটু জোর কদমে এগিয়ে চলুন। আপনাদের সামনে ৯ই মার্চ, রেল ধর্মঘটের ঐতিহাসিক স্মরণীয় দিন। গতবছর এই দিন থেকেই আরম্ভ হয়েছিল বিপ্লবী অভিযানের জোর কদম। এবারকার ৯ই মার্চকে ইতিহাসের পাতায় রক্তাক্ষরে লিখে দিন এই চিঠির নির্দেশগুলি পালন করে। তারপর আরও এগিয়ে চলুন।

১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫০

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

বিভীষণের ফাঁদ

গরীবের লবণ-দিয়াশলাইয়ের উপর ট্যাক্স বসিয়ে কংগ্রেসী সরকার যে পয়সা তোলে তা কিভাবে গরীবদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যেই খরচ করা হয় তার আর একটি দৃষ্টান্ত হলো তাদের সাম্প্রতিক প্রকাশিত দু'খানা বই—একখানার নাম **ভাগচাষ**, আর একখানার নাম **ঘরশত্রু বিভীষণ**। প্রথম বইখানা পশ্চিমবাংলার সকল জেলায়ই ছড়ানো হয়েছে।

বৃটিশ আমলেও সরকারের কাজ ছিল জমিদার-জোতদার-চৌকিদার-দফাদার মারফৎ 'বাংলার কথা' প্রভৃতি সরকারি কেতাব ছড়ানো। এবং সে সকল কেতাবের সাথে এ বই দু—খানার মিল দেখলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। কিন্তু আশ্চর্য হবার কিছু নেই; বই যারা লিখছে তারা সেই বৃটিশ আমলের আমলারাই, যে ছাপাখানায় ছাপা হচ্ছে তাও সেই বৃটিশ আমলের ছাপাখানাই। শুধু বদল হয়েছে বইয়ের মালিকানা। এখন এসকল বই কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাব নামে ছাপা হচ্ছে, এবং কংগ্রেস কমিটির দপ্তর থেকে প্রচারিত হচ্ছে—এই যা তফাৎ।

কিন্তু বইয়ের চেহারা যাই হোক উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। উদ্দেশ্য হলো, কৃষকদের মধ্যে ভেদ-সৃষ্টি করা, তাদের মধ্যে মিথ্যা-প্রচার করে সংগ্রামের গতিবেগ কমিয়ে দেয়া, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকার সম্পর্কে মোহ সৃষ্টি করা। বুলেট, পুলিশ ক্যাম্প এবং গুণ্ডাদল যে সময়ে গ্রামে তাণ্ডব নৃত্য চালাতে থাকবে কৃষকের মনে ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, তখন এ বইয়ের উদ্দেশ্য হলো দুর্বল-চিত্ত মাঝারী কৃষককে, দোমনা ভাগ-চাষীকে সাময়িকভাবে হলেও সরকারের মুখাপেক্ষী এবং আপস-মুখী করে তোলা। তাই, এ বই দু'খানাকে বুলেট থেকে কম ক্ষতিকর মনে করা চলবে না।

ভাগচাষ বইখানাতে বিধান মন্ত্রিসভা কৃষকদের বুঝাবার চেষ্টা করেছে যে, নূতন বর্গাদার জরুরি আইনে তারা তেভাগা প্রায় মেনেই নিয়েছে। পাছে, কৃষকদের অবিশ্বাস হয় তার জন্যে কাকদ্বীপ প্রভৃতি সংগ্রামী এলাকায় হাটে-বাজারে ঢোল দিয়ে প্রচার করা হচ্ছে—লড়াই বন্ধ কর, তেভাগা নিয়ে নাও।

'৪৬ সাল থেকে বাংলার কৃষক তেভাগার জন্যে লড়ে আসছে, কোনদিন তেভাগা মেনে নিলাম—সরকার একথা বলেনি। আজ হঠাৎ কাকদ্বীপে তারা এত ঘটা করে একথা প্রচার করছে কেন? কারণ, ফসল নয়, জমি এবং গোটা রাজটাই তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এত প্রচারের মধ্যেও ফাঁকিটা ভাগচাষীর চোখ এড়ায়নি। ভাগচাষ বইখানা খুলেই তারা দেখতে পেয়েছে তার তৃতীয় পৃষ্ঠায় ৭ ধারার (১), (২) এবং (৩) উপধারায় ভাগচাষীকে জমি থেকে উচ্ছেদ করার সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করা হয়েছে। জমিদার জোতদাররা

যখনই বলবে, তারা নিজেরা মজুর দিয়ে জমি চাষ করবে, অথবা যখনই নালিশ করবে যে ভাগচাষী জমি ঠিকমত চাষ করেনি, ভাগচাষ শালিশী বোর্ড তখনই ভাগচাষীকে উচ্ছেদ করার হুকুম দিবে; জোতদাব-লাটদার-ধনী কৃষক যখনই নালিশ করবে যে তারা ফসলের প্রাপ্য অংশ পায়নি—তখনই বোর্ড ভাগচাষীর জমি কেড়ে নিবে। বোর্ডের সভাপতি হবে সরকারের লোক—বাকী চারজন সভ্যও হবে সরকার মনোনীত। এবং বোর্ডের কোন হুকুম অমান্য করলে তার সমস্ত জমিই কেড়ে নেয়া হবে।

এ উচ্ছেদের আইন পাশ করার পর তেভাগা দেয়া হলো বলে ঢাক পেটানোর অর্থ কারো বুঝতে বাকি থাকে না। ফসলের ভাগ নিয়ে আপস কর, আর তারপর সরকারি কর্মচারীরা 'সীজ ধান' আদায় করার নামে তোমার সব ফসলই ঘর থেকে বের করে নিক এবং জরুরি আইন প্রয়োগ করে, তোমাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করতে থাক। তারজন্যেই বিড়াল তপস্বীরা মাছের শোকে গ্রামে গ্রামে কেঁদে বেড়াচ্ছে। তাদের এ ফাঁদে আজ আর কেউ ধরা দিতে রাজি হচ্ছে না; কোন ভাগচাষীই আজ এতখানি বোকা নেই।

কংগ্রেসী শয়তানেরা একথা টের পেয়েছে বলেই সম্ভবত **ঘরশত্রু বিভীষণ** বইখানা প্রকাশ করেছে। এ বইখানার চালাকি ধরা একটু শক্ত; কারণ সব কথাই আকারে ইঙ্গিতে লেখা হয়েছে—সম্ভবত কৃষকের হাতে মার খাবার ভয়ে।

ঘরশত্রু বিভীষণে কংগ্রেসী সরকারের কাঁদুনী দেখে কে? তাতে বিধান-নলিনী বলছে—এত লড়াই করে আমরা গরীবের রাজ কায়েম করলাম আব এখন "একদল লোক" অশান্তি সৃষ্টি করে আমাদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে চাচ্ছে! দেখো আমরা তোমাদের জন্যে কতটাকা খরচ করছি—ক্যানিংএ মাছা-ঘাটার জন্যে আড়াই হাজার টাকা খরচ করছি, মন্ত্রী হরেন রায় চৌধুরীর জমিদারি মথুরাপুরে স্কুল তৈরি করছি, মন্ত্রী হেম নস্করের জমিদারিতে মাছের চাষের জন্যে টাকা খরচ করছি; তোমাদের এখন কাজ হলো—পেটে পাথর বেধে ফসল বাড়ানো। দুঃখকষ্ট তোমাদের বিদেশী শাসনেও ছিল, এখনো আছে। কিন্তু এখন যে দুঃখকষ্টের কথা খুলে বলতে পারো—এটা কি কম কথা?—"এই তো গণতন্ত্র, এই তো কৃষক-প্রজারাজ!"

বিধান-নলিনী মন্ত্রিসভা বইখানার নাম **ঘরশত্রু বিভীষণ** দিয়ে ঠিকই করছে। সত্যি, কৃষকদের লড়াই কংগ্রেসী সরকারের মতো ঘরশত্রু বিভীষণদের বিরুদ্ধেই। কোন কৃষক না আজ দেখতে পাচ্ছে যে এ বিভীষণের দল তাদের ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুদের জন্যে সরকারি তহবিলের শতকরা ৭০ ভাগ টাকাই যুদ্ধের অস্ত্রপাতি কিনতে খরচ করছে। দেশে ডেকে আনছে আবার '৪৩ সালের মন্বন্তর। কোন কৃষক না দেখতে পাচ্ছে যে, এরা টাটা-বিড়লার কেনা গোলাম, জমিদার-জোতদারদের দালাল; ফসল উৎপাদনের কথা এরা বলে শুধু চোরাবাজারীদের জন্যে ফসল না হলে তাদের কোটি কোটি টাকা আমদানি হবে কি করে? কোন কৃষক না দেখতে পাচ্ছে যে, জোতদারের গোলা ভরা ধান থাকতে ও গ্রামের ক্ষেতমজুর-গরীব কৃষক না খেয়ে মরছে—কংগ্রেসী পুলিশ তাদের গোলা থেকে এক ছটাক ধান আদায় করে দেয়নি, জোতদারের হাতে হাজার হাজার বিঘা জমি থাকতেও তার এক বিঘা জমি ক্ষেতমজুরকে দেয়া হয়নি; আর যখনই "একদল লোক" জোতদারের গোলা দখল করে তা বিলি করেছে গ্রামের নিরন্ন গরীবদের মধ্যে, জোতদারের জমি কেড়ে নিয়ে তা বিলি করেছে তা ক্ষেতমজুর-গরীব কৃষকের মধ্যে, তখনই বিভীষণের দল চীৎকার করে উঠেছে—অশান্তি,

অশান্তি। আর, "অশান্তি" দমনের নামে তারা গ্রামে গ্রামে পুলিশ ক্যাম্প বসিয়েছে, গ্রামের মা-বোনদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে, শিশু ও নারীদের হত্যা করেছে—আর তার নাম দিয়েছে—শান্তি। এ ফ্যাসিস্ট অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্যেই হাজার হাজার কৃষককে জেলে পুরেছে এবং জেলের মধ্যেও তাদের গুলি করে হত্যা করছে—এবং এর নাম দিয়েছে গণতন্ত্র! ইঙ্গ-মার্কিন পঞ্চম বাহিনী ছাড়া এরকম হিটলারী শাসনের গুণগান আর কে করবে?

হাঁ, "একদল লোক" এই হিটলারী শাসনকে খতম করতেই চায়; তাদের নাম করতে এত ভয় কেন? তারা কমিউনিস্ট দল। ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষক দেখেছে—এরা গ্রামে খাদ্য দখল করে তা গরীবের মধ্যে বিলি করে, জমি দখল করে যাদের জমি নেই তাদের দেয়, মুষ্টিমেয় ধনী জমিদারের শাসন খতম করে অধিকাংশ লোকের গণতান্ত্রিক শাসন মজুর-কিষাণ রাজ কায়েম করে। সারা দুনিয়ার ধনিক গোষ্ঠী এবং তাদের দালালরা গত ৩২ বছর কুৎসা প্রচার করে সোভিয়েট ইউনিয়নের যে সত্যকে ঢাকতে পারেনি, চীনের কমিউনিষ্টদের 'ডাকাত' নাম দিয়ে যারা নিজেদের ডাকাতি ঢাকতে পারেনি, এদেশের বিধান-নলিনী ও তাদের কংগ্রেসী দালালরা কাকদ্বীপ-মেদিনীপুর দু'খানা সরকারি কেতাব প্রচার করে তা ঢাকবে কি করে?

'স্বাধীনতা', ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০ সম্পাদকীয়

আগামী তে-ভাগার লড়াই

সারা পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য সংকট আজ দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ আকারে দেখা দিয়াছে। অসংখ্য কৃষক এবং গরীব শ্রমিক ও মধ্যবিত্তকে উপবাসী থাকতে হচ্ছে। কৃষকদের মধ্যে অনাহারে ও মৃত্যুর সংবাদও পাওয়া যাচ্ছে। এই খাদ্যসংকটকে কিছু পরিমাণে লাঘব করা যায় লক্ষ লক্ষ ভাগচাষী বা আধিয়ারের তে-ভাগার দাবি আদায় করে।

আমন ধান পাকতে আর কয়েক সপ্তাহ মাত্র বাকি আছে। এবার আমন ফসল ওঠার সময় সারা পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে ব্যাপক তে-ভাগা আন্দোলন শুরু করতে হবে।

তে-ভাগা আন্দোলনের লক্ষ্য হচ্ছে একদিকে গরীব কৃষকের আশুদাবি যথাসম্ভব আদায় করা, অন্যদিকে এই আন্দোলনের ভিত্তিতে গরীব কৃষক শ্রেণির নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলের সকল-স্তরের কৃষককে ঐক্যবদ্ধ করে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ ও কৃষি বিপ্লবের পথে অগ্রসর হওয়া। সেই কারণে তে-ভাগা আন্দোলনের গুরুত্ব খুব বেশি।

কিন্তু এই ভিত্তিতে আমরা এ পর্যন্ত তে-ভাগা আন্দোলনকে গড়ে তুলতে পারিনি। ১৯৪৬-৪৭ (১৩৫৩) সালে এই আন্দোলন যথেষ্ট ব্যাপক ও শক্তিশালী হয়েছিল বটে, কিন্তু সংস্কারবাদী নীতির ফলে তা অগ্রসর হোতে না পেরে বরং শত্রুর আক্রমণে ভেঙ্গেই পড়েছিল। তারপর ১৯৪৭-৪৮ (১৩৫৪) সালে তে-ভাগা আন্দোলন হয়নি বললেই চলে। ১৯৪৮-৪৯ (১৩৫৫) এবং ১৯৪৯-৫০ (১৩৫৬) সালে খুব ব্যাপক না হলেও অনেক জায়গায় খুব তীব্র হয়েছিল। কিন্তু তাকেও নষ্ট করা হয়েছিল ট্রটস্কিবাদী সংকীর্ণতার নীতি এবং হঠকারিতার কৌশল অবলম্বন করে। কাজেই এবার এই আন্দোলনকে ব্যাপক ও সফল করবার জন্য তারনীতি ও কৌশল সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সচেতন ও সতর্ক হয়ে কাজ করতে হবে।

তে-ভাগা আন্দোলনকে সফল করতে হোলে প্রথমেই আমাদের দেখতে হবে, প্রধানতঃ যে জমিদার জোতদার শোষকদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন, তারা ছাড়া গ্রাম এলাকার বাকি সমস্ত কৃষক ও অকৃষক জনতাকে যেন তে-ভাগা দাবির সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ করা হয়। তাদের মিলিত শক্তির জোরে তে-ভাগার দাবি আদায় করতে হবে।

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে বড় জোতদাররা তে-ভাগার দাবি পূরণ করতে অস্বীকার করবে। সোজাসুজি হোক বা নানারকম প্যাচের কথা বলেই হোক, তারা আন্দোলন বানচাল করতে চেষ্টা করবে। তাদের চালে ভুললে চলবে না। তারা গুণ্ডা ও পুলিশ লাগিয়ে আন্দোলন দমন করতে চেষ্টা করবে? গভর্নমেন্টও তাদের সকলরকম সাহায্য করবে। তখন সংঘর্ষের অবস্থা দেখা দেবে। সে কথা বিবেচনা করে গোড়া থেকেই প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

কিন্তু সংঘর্ষের অবস্থা দেখলেই সংঘর্ষে নেমে পড়তে হবে, এটা হঠকারিতার নীতি। কাজেই এই অবস্থায় ঠাণ্ডা মাথায় সকল দিক বিবেচনা করে সংগ্রামের উপযুক্ত কৌশল অবলম্বন করতে হবে। আন্দোলনের বাস্তব পরিস্থিতি, গতি ও সম্ভাবনা বিচার করে সেই বিশেষ অবস্থার উপযুক্ত সংগ্রামের ও সংগঠনের সঠিক রূপকে জনতার সামনে তুলে ধরতে হবে। যাতে জনতাকে বিপ্লবের পথে টেনে নেওয়া যায়, লক্ষ লক্ষ লোককে বিপ্লবের রণাঙ্গনে জমায়েত করা যায়।

সেজন্য এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিশেষভাবে খেয়াল করতে হবে :

(১) কৃষক সাধারণের ব্যাপক ঐক্য এবং কৃষক ও অকৃষক গণতন্ত্রী জনতার ব্যাপক ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।

(২) গণ সমাবেশ এবং জনতার ব্যাপকভাবে যোগদানের অথবা সমর্থনের ভিত্তিতে আন্দোলন ও সংগ্রাম চালাতে হবে।

(৩) জনতার অগ্রগামী অংশ উদ্যোগ নেবে কিন্তু জনতা থেকে তার বিচ্ছিন্ন হোলে চলবে না। বরং ক্রমশঃ বেশি সংখ্যায় জনতাকে সংগ্রামে নামাতে হবে।

(৪) এমন কৌশলে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হবে এবং শত্রুকে প্রতি-আক্রমণ করতে হবে যাতে শত্রুর তুলনায় আমাদের ক্ষতি কম হয় এবং শক্তি বাড়ে।

(৫) কোন জায়গায় গেরিলা কায়দায় সশস্ত্র সংগ্রাম চালান উচিত কিনা, অর্থাৎ প্রয়োজন ও সম্ভব কিনা তা স্থানীয় জনতার চেতনা, গণ-সমর্থনের সম্ভাবনা এবং সংগঠনের অবস্থা বিবেচনা করে স্থানীয় দায়িত্ব স্থির করতে হবে।

এ সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশি স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া এখন সম্ভব নয়। রণকৌশল সম্বন্ধে পার্টির মধ্যে বর্তমানে প্রচণ্ড মতভেদ চলছে যা POC-র মধ্যেও কমবেশি পরিমাণে প্রতিফলিত হতে বাধ্য। এই অবস্থায় POC কোন একটা বিশেষ মত কারো উপর চাপিয়ে দিতে পারে না এবং চায় না। POC চায় এখন মতামতের সংগ্রাম চলুক এবং কার্যক্ষেত্রে বিভিন্ন মতের পরীক্ষা হোক।

তে-ভাগা আন্দোলন প্রধানতঃ চালাতে হবে অপেক্ষাকৃত বড় জোতদারের বিরুদ্ধে। কিন্তু এমন অনেক ছোট ছোট জোতদার আছে যাদের শুধু জোতদারীর আয়ে সংসার চলে না, চাকরি বা ছোটখাটো ব্যবসা ইত্যাদি করে সংসার খরচের অধিকাংশ রোজগার করতে হয়। এই সমস্ত জোতদারের সঙ্গে এবং আরো যে সমস্ত ছোট জোতদার নাবালক বা বিধবা বলে নিজেরা চাষের কাজ করতে পারে না তাদের সঙ্গে আপসে দাবি আদায় করতে হবে। সে আপস কি কি শর্তে হবে তা স্থির করবে তে-ভাগার সমর্থক জনতা। এই আপস ব্যবস্থার মারফৎ সকল লোককে জমিদারি ও জোতদারি শোষণের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রী ফ্রন্টের মধ্যে আনার চেষ্টা করতে হবে। অবশ্য কোন ছোট জোতদার যদি কিছুতেই আপস করতে না চায়, তাহলে তার বিরুদ্ধেও লড়তে হতে পারে।

অনেকক্ষেত্রে ভাগচাষীর নিজ খামারে ধান তোলার দাবি নিয়েও গোলযোগের সম্ভাবনা দেখা দিবে। ধান কার খামারে তোলা হবে—ভাগচাষীর খামারে বা সাধারণ খামারে অথবা জোতদারের খামারে—তা স্থির করতে হবে জনতার মত নিয়ে। অবশ্য আমরা চাই—কৃষকের

নিজ খামারে ধান তোলা হোক এবং লড়াইয়ের উপযুক্ত কৌশল অবলম্বন করে তা রক্ষা করা হোক।

তে-ভাগার দাবি একটা বিচ্ছিন্ন দাবি নয়। প্রধানত যে সব শোষক ভাগচাষী বা আধিয়ারদের শোষণ করে, প্রধানত তারাই ক্ষেত মজুরদেরও শোষণ করে। ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুরদের প্রধান শোষকরা মোটের উপর গ্রামাঞ্চলের প্রধান শোষক শ্রেণি। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুর উভয়েরই লড়াই। অন্যান্য শোষিত কৃষকদের লড়াইও প্রধানত তাদেরই বিরুদ্ধে। কাজেই তে-ভাগার লড়াই-এর সাথে সাথে ক্ষেতমজুরের মজুরি বৃদ্ধির জন্যও সংগ্রাম করতে হবে এবং মজুরি বৃদ্ধির দাবি প্রচারও করতে হবে। লড়াইয়ে ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষী পরস্পর কে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করবে। মজুরি কি হারে ধার্য করার জন্য দাবি তুলতে হবে তা স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা করে জনতার রায় নিয়ে স্থির করতে হবে। দু'চার জনের অবাস্তব ইচ্ছা মতো বা পূর্বেকার কোন বাঁধা ধরা নির্দেশ অনুসারে ঠিক করলে চলবে না।

মজুরি বৃদ্ধি আন্দোলনেরও লক্ষ্য হবে গ্রামাঞ্চলে ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষীর নেতৃত্বে সমস্ত জনতাকে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করে শোষক শ্রেণিদের নেতৃত্বকে হটিয়ে দেওয়া এবং কৃষি বিপ্লবের পথে এই জনতাকে অগ্রসর করে দেওয়া।

তে-ভাগার লড়াই শুরু করার পূর্বে এখন থেকেই রীতিমতো পরিকল্পনা নিয়ে তে-ভাগা দাবির উপর ব্যাপক প্রচার অভিযান চালাতে হবে। প্রচারের দ্বারা গ্রামাঞ্চলের কৃষক ও অকৃষক ব্যাপক গণতন্ত্রী জনতাকে তে-ভাগা দাবির সমর্থনে টেনে আনতে হবে। প্রচারের কাজের ও আন্দোলন পরিচালনার জন্য এখনি সমস্ত সমর্থক জনতার মিলিত সভায় নির্বাচিত কর্মীদের নিয়ে প্রত্যেক এলাকায় তে-ভাগা কমিটি গঠন করতে হবে। কাজের নিয়মিত প্রোগ্রাম ঠিক করে আন্দোলন ও সংগ্রামের প্রতিদিনের কাজ চালাবে সেই কমিটি।

কমিটি প্রতিরোধের প্রয়োজনে ও অন্যান্য কাজের জন্য ভলান্টিয়ার বা জঙ্গী বাহিনী তৈরি করবে এবং তার জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে। কমিটি চেষ্টা করবে আন্দোলনকে যতদূর সম্ভব ব্যাপক করতে এবং সমর্থক জনতাকে যতদূর সম্ভব সচেতন ও সক্রিয় করে তুলতে।

আন্দোলন ও সংগ্রাম যেমন যেমন অগ্রসর হোতে থাকবে, তেমনি তাকে উচ্চতর স্তরে তোলবার ব্যবস্থা করতে হবে; এবং সেজন্য প্রয়োজন মতো সংগ্রামের ধরনের ও তে-ভাগা কমিটির গঠনের মধ্যে পরিবর্তনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যতদূর সম্ভব জনতার মত নিয়ে। সেজন্য প্রত্যেক স্তরে আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি বুঝে ও ব্যাখ্যা করে জনতাকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। অবস্থা বিশেষে এই কমিটি ইত্যাদি গোপনে প্রকাশ্য বা অর্ধপ্রকাশ্য হবে।

মোট কথা তে-ভাগা ও মজুরি বৃদ্ধি আন্দোলনের ভিতর দিয়ে পার্টির কাজ হবে গ্রামের গরীবদের জন্য কিছু কিছু অর্থনীতিক সুবিধা আদায় করার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গণতন্ত্রী জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করা, গণতন্ত্রী ফ্রন্ট গঠনের কাজ শুরু করা। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে পার্টি নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলের আন্দোলনকে আবার চাঙ্গা করে তোলা, পার্টি সংগঠনকে অগ্রসর করে দেওয়া এবং একদিকে সংস্কারবাদের ও অন্যদিকে ট্রটস্কিবাদ-টিটোবাদের বিরুদ্ধে পার্টি র‍্যাংকের

বা মেম্বার সাধারণের মনে সংগ্রামী প্রেরণা জাগিয়ে তোলা।

এই আন্দোলনের ভিতর দিয়ে পার্টির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি কাজ হবে কৃষক সংগঠনকে কৃষি বিপ্লবের জোরদার হাতিয়ার হিসাবে গড়ে তোলা। বর্তমান সরকার কৃষক সভাকে বেআইনি করে রেখেছে। নতুন নাম দিয়ে কৃষক সংগঠন গড়তে গেলেও গভর্নমেন্ট তাকে বেআইনি ঘোষণা করবে; অন্তত তাকে কার্যত বেআইনি অবস্থায়ই কাজ করতে হবে। কাজেই বেআইনি হলেও কৃষক সভাকেই এখন নতুনভাবে গড়ে তুলতে হবে; লক্ষ লক্ষ কৃষককে তার মেম্বার তালিকাভুক্ত করতে হবে। শুধু গরীব কৃষকই নয়, মাঝারি কৃষকদেরও তার মধ্যে আনতে হবে। বেআইনি কৃষক সভার মেম্বার হবার জন্য ব্যাপকভাবে কৃষকদের মধ্যে উপযুক্ত মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। কৃষক সভার প্রতি এতদিন যে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে কৃষক আন্দোলনেরই অনিষ্ট করা হয়েছে, তাকে ধ্বংস করতে সাহায্য করা হয়েছে। কৃষক আন্দোলনকে বিপ্লবী আন্দোলন হিসাবে গড়ে তুলতে হলে তাকে স্থায়ী আন্দোলনে পরিণত করতে হবে এবং ক্রমাগত এগিয়ে নিয়ে যেতে ও উচ্চতরস্তরে তুলতে হবে। সে কাজ করা কিছুতেই সম্ভব হবে না যদি কৃষকদের বিপ্লবী গণসংগঠন হিসাবে কৃষক সভাকে বিপ্লবী চেতনা নিয়ে নিয়মিতভাবে গড়ে তোলা না হয়। অতীতের অভিজ্ঞতা আমাদের এই শিক্ষা দিচ্ছে।

আগামী দু মাসের মধ্যেই সারা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে সংগ্রামের নতুন জোয়ার এসে পড়বে। এবং সেই সংগ্রামের ভিতর দিয়েই কৃষক বিপ্লবের হাতিয়ার হিসাবে কৃষক সভা নতুন আকারে ও নতুন শক্তি নিয়ে গড়ে উঠতে থাকবে।

বিপ্লবী অভিনন্দনসহ

১লা অক্টোবর ১৯৫০

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

কাকদ্বীপ মামলার ডিফেন্স চাই

কাকদ্বীপের সাতটি মামলার জন্য স্পেশাল জজ নিযুক্ত করা হয়েছে। এই স্পেশাল জজের কাজটা তো কি সবাই বুঝতে পারেন। যাতে সবচেয়ে বেশি কঠোর সাজা দেওয়া যায় তার জন্যই এই বিচারের প্রহসন। কিন্তু আমাদের সকলকেই আজ এই মামলাগুলির ডিফেন্সের জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করতে হবে। কাকদ্বীপের সংগ্রামী কৃষকদের পাশে এসে আজ আমাদের দাঁড়াতে হবে। তাদের মামলায় শক্তিশালী এবং উপযুক্ত ডিফেন্স চাই।

এই জন্যে অর্থের প্রয়োজনীয়তা একান্ত জরুরি। প্রথম দিকেই অন্ততপক্ষে হাজার দুই টাকা দরকার হবে। ভাল উকিল নিযুক্ত না করলে কোন ডিফেন্সই আসলে হবে না। অথচ অভিজ্ঞ কোন উকিলকে এত বেশিদিন মামলা চালাতে হলে তাকে কিছুটা ফিস্ দেওয়া দরকার হবেই। তাছাড়া মামলার অন্যান্য মামুলী খরচপত্রও রয়েছে।

পার্টির বর্তমান আর্থিক দুরবস্থায় এই সকল মামলা পরিচালনার জন্য বিশেষভাবে অর্থ সংগ্রহ না করলে কোন মতেই ডিফেন্সের ন্যূনতম ব্যবস্থাও করা যাবে না। তাই আমরা সকল পার্টিসভ্য, ইউনিট এবং দরদীদের বিশেষভাবে আহ্বান জানাচ্ছি তাঁরা যেন অবিলম্বে নিজেরা সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করেন এবং অন্যদের নিকট থেকেও অর্থ সংগ্রহ করেন। টাকা পয়সা ব্যক্তিস্বাধীনতা কমিটি কিংবা পিওসির লিগ্যাল ডিফেন্স ইউনিটের নিকট (পি-ও-সির মারফৎ কিংবা সরাসরি) পাঠাতে পারেন। সব সময়েই কাকদ্বীপের স্পেশাল মামলার জন্য যে টাকা পাঠানো হল একথাটা উল্লেখ করে দেবেন। তা হলে এই টাকা অন্য কোন মামলার ব্যাপারে খরচ হবার সম্ভাবনা থাকবে না।

যে আইন এবং পদ্ধতিতে কাকদ্বীপের এই সকল বীর কমরেডদের সরকার বিচার করছেন তাতে তাদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং এমনকি প্রাণদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। কাকদ্বীপের বীর কৃষকদের কথা আমরা নিশ্চয়ই ভুলে যাইনি। পার্টির আহ্বানে তাদের সংগ্রামী উদ্যোগ এবং ত্যাগ স্বীকার আমাদের সকলেরই গৌরবের বস্তু। তাই যখন তাদের সম্মুখে দীর্ঘ কারাবাস এবং এমনকি প্রাণদণ্ডের সম্ভাবনা বিদ্যমান তখন আমরা কিছুতেই উদাসীন থাকতে পারি না। এরা আমাদেরই কমরেড—আমাদের পার্টির শ্রেষ্ঠ সৈনিক। তাই প্রত্যেকটি পার্টিসভ্য এবং পার্টি দরদী বর্তমান এই সংকট মুহূর্তে নিশ্চয়ই কৃষকশ্রেণির এই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের পাশে এসে দাঁড়াবেন এবং তাদের ডিফেন্সের জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করবেন। সর্বস্বপণ করে সেদিন পার্টির আহ্বানকে তারা ভুলে নাই। আজ কি আমরা তাদের ভুলব?

রুদ্ধ কারাপ্রাচীরের অন্তরাল হতে এই প্রশ্নই আপনাদের সামনে উপস্থিত।

আমরা বিশ্বাস করি পশ্চিমবাংলার পার্টিসভ্য এবং দরদীবৃন্দ তার যথার্থ উত্তর দিবেন।

আজ হতেই কাকদ্বীপের জন্য সাহায্য এবং অর্থ সংগ্রহ করুন। কাকদ্বীপের অজেয় সংগ্রামী কৃষকের আহ্বান আজ দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হোক।

স্বাধীনতাকামী এবং গণতান্ত্রিক সমস্ত নরনারীর ঐক্যবদ্ধ সমর্থন আদালতে শক্তিশালী ডিফেন্সের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হয়ে উঠুক।

৩০শে নভেম্বর ১৯৫০

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

টিকা : ১৯৫৭ সালে কংসারী হালদার ডায়মণ্ডহারবার কেন্দ্রের লোকসভা আসনে জয়লাভ করেছিলেন। এরপরেই তাঁকে ১৯৪৮-৫০ সালে কাকদ্বীপ অঞ্চলে তে-ভাগা আন্দোলনের বিভিন্ন কাজকর্মে লিপ্ত থাকার অভিযোগ তুলে ১৯৫৭ সালের অগষ্ট মাসে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এইসব অভিযোগের মধ্যে ছিল পুলিশবাহিনীর সদস্যদের হত্যা, অগ্নি-সংযোগ ইত্যাদি। এইসব অভিযোগের ভিত্তিতে কলকাতা হাইকোর্টে 'কংসারী হালদার বনাম রাষ্ট্র' এই নামে মামলা চলেছিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৬২ সালের রায়ে তাঁকে সমস্ত রকম অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এর পূর্বে ট্রাইব্যুনাল তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি দিয়েছিল। সেটিও নাকচ করে দেওয়া হয়।

লেবার-রিলেসন্স-বিল-বিরোধী দিবস পালন করুন

দলমত নির্বিশেষে সব মজুর মিলে ধর্মঘট করার অধিকার রক্ষা করুন।

মজুর ভাইসব।

নেহরু সরকার 'লেবার-রিলেসন্স বিল' নামে এক নূতন কানুন তৈরি করে সমস্ত মজুরের হরতাল করার ও ইউনিয়ন গড়ার মৌলিক অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে। ভারতের মজুর শ্রেণি বহু লড়াই ও বহু ত্যাগ স্বীকার করে ধনিক শ্রেণির হামলার বিরুদ্ধে লড়াই করার একমাত্র হাতিয়ার—ইউনিয়ন গড়া ও হরতাল করার অধিকার কায়েম করেছে। সেই অধিকার আজ বিপন্ন।

আজ মুষ্টিমেয় দেশী-বিদেশী পুঁজিপতি যখন নিজেদের মুনাফার জন্য মজুর শ্রেণির উপর ছাঁটাই,মজুরিকাটা প্রভৃতি আক্রমণ ভীষণভাবে চালাচ্ছে, যখন ধনিকের এই আক্রমণ দিন দিন বেড়েই চলেছে, যখন হরতাল করার ও ইউনিয়ন গড়ার অধিকার মজুর শ্রেণির সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন—ঠিক সেই সময়েই নেহরু সরকার এই কালা-কানুন দ্বারা মজুর শ্রেণির মৌলিক অধিকার কেড়ে নিয়ে মুষ্টিমেয় ধনিকের স্বার্থের জন্য মজুরের ধ্বংসের পথ সুগম করে দিচ্ছে।

এই বিলে এমন সমস্ত বিধান করা হয়েছে, যাতে ধনিকের হামলা ও অত্যাচার রুখবার জন্য মজুররা হরতাল করলে মজুরদের শাস্তি হবে।

এই বিলে এমন সব বিধান করা হয়েছে—যাতে মজুরদের সাচ্চা ইউনিয়নগুলি নিজেদের বৈধ আন্দোলন চালাবার কোন সুযোগ পাবে না। অথচ, সরকারের পেটোয়া ও মালিকদের দালাল সোশ্যালিস্ট ও আই-এন-টি-ইউ-সি মজুর শ্রেণির ভিতর বিভেদ ঘটাতে, মজুরদের সব আন্দোলন বানচাল করার অবাধ স্বাধীনতা পাবে। অর্থাৎ মালিকের দালাল ও সরকারের পেটোয়া ইউনিয়নগুলিকে মজুরদের ইউনিয়ন বলে দাঁড় করিয়ে, মজুরদের আসল ট্রেড ইউনিয়নগুলির বৈধ কাজ পর্য্যন্ত দমন করা হবে।

এই বিলের জবরদস্তিমূলক বিধানগুলি ভাঙলে "মজুরের জেল হবে, তার মজুরি কাটা যাবে, তার পাওনা ছুটি, বোনাস, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকেও মজুরকে বঞ্চিত করা হবে"। অপরদিকে, এই বিলের বিধান অনুসারেই মালিকেরা—ওয়াকার-টাটা-বিড়লা গোষ্ঠী খুশিমত ছাঁটাই করতে পারবে।

এই বিলে মজুর শ্রেণি হারাবে তার ধর্মঘট করার ও ইউনিয়ন গড়ার অধিকার ও

মালিকেরা পাবে ছাঁটাই করার ও মজুরদের উপর অত্যাচার করার পূর্ণ অধিকার। ইহাই আজ মজুর শ্রেণির নিকট কংগ্রেসী "প্রজাতন্ত্রের" উপহার।

নেহরু সরকার ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গোলাম। তার জন্যেই এখানে ব্রিটিশ কলকারখানা জাতীয়করণ তো দূরের কথা এখন আরো বেশি ব্রিটিশ ও মার্কিন মূলধন ডেকে আনছে ভারতের রক্তশোষণ করতে। তার জন্যেই ইঙ্গ-মার্কিন মালিকরা দাবি করছে এই ধর্মঘট-বিরোধী কালা-কানুন। মার্কিন ও ব্রিটিশ মালিকদের খুশি করার জন্যেই নেহরু সরকার এখন এই গোলামীর আইন পাশ করছেন। নেহরু সরকার ব্রিটিশ কমনওয়েলথ-এর অংশীদার এবং ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ-শিবিরের পাহারাদার। সোভিয়েত ও চীনের বিরুদ্ধে কাশ্মীরে, বাংলায় ও অন্যান্য এলাকায় সাম্রাজ্যবাদীরা এখনই যুদ্ধ-ঘাঁটি তৈরি করতে চাচ্ছে। যুদ্ধ-ঘাঁটিকে নিরাপদ করার জন্যে তারা দমন করতে চাচ্ছে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনকে। তার জন্যেই নেহরু সরকার ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুদের হুকুমে এই কালা-কানুন পাশ করেছেন। দাঙ্গা ও যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করে, কারখানায় কারখানায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে, সংখ্যাল্প শ্রমিকদের কাজ থেকে তাড়িয়ে, বস্তী থেকে তাড়িয়ে সারা দেশে এমন অবস্থা সৃষ্টি করা হচ্ছে যাতে এই কালা-কানুনের বিরুদ্ধে কোন মিলিত প্রতিবাদ না উঠতে পারে।

ভাইসব, সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের গোলাম নেহরু সরকারের এ আক্রমণ ব্যর্থ করুন। দুনিয়ার সমস্ত দেশে লালঝাণ্ডা শ্রমিকের জয়যাত্রা দেখে শত্রু আজ এতই আতংকিত যে শ্রমিকদের লক্ষ লক্ষ শিকল দিয়ে বেঁধেও এরা নিশ্চিন্তে থাকতে পারছে না। চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুক্তি-ফৌজের বিজয় অভিযান এদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। চীনের মুক্তি-ফৌজের পথ ধরেই আমরা নেহরু সরকারের এই নূতন গোলামীর শিকল চুরমার করে অগ্রসর হবো। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস আপনাদের কাছে সে আহ্বানই জানাচ্ছেন। আপনারা ৩রা এপ্রিল 'লেবার-রিলেসন্স-বিল-বিরোধী দিবস' পালন করুন।

যে কানুন আপনাদের হরতাল করা ও ইউনিয়ন গড়ার মৌলিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছে, যে কানুনের উদ্দেশ্যই হলো ভারতের ধনবল জনবল ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধের লালসায় বলি দেওয়া—বেইমান সোশ্যালিস্ট ও আই-এন-টি-ইউ-সি'র নেতারা সেই সর্বনাশা বিলকেই দিল্লীর দপ্তরে বসে সমর্থন করছে।

তাই, সোশ্যালিস্ট ও আই-এন-টি-ইউ-সি ইউনিয়নের সাধারণ শ্রমিক, ভাই ও সাধারণ কর্মীদের নিকট আমাদের বিশেষ আবেদন, ঐ 'নেতাদের' বেইমানী চুরমার করে এই কালা-কানুনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। প্রত্যেকটি মজুরের হরতাল করার, ইউনিয়ন গড়ার অধিকার যখন বিপন্ন তখন দলগত মতগত পার্থক্য সত্ত্বেও একত্রে লড়াইয়ে নামতে হবে। সমস্ত মজুরের একতা দ্বারাই এই কালা-কানুনকে আমরা রুখতে পারবো। আর, সোশ্যালিস্ট ও আই-এন-টি-ইউ-সি'র নেতাদের বেইমানীতে মজুরদের ভিতর বিভেদ হলে কংগ্রেসী সরকারের এই কালা-কানুন প্রত্যেকটি মজুরের জীবনকে চুরমার করে দেবে।

তাই দলমত নির্বিশেষে সমস্ত মজুরকে আমরা আহ্বান করছি : আপনারা নিজেদের হরতাল করা ও ইউনিয়ন গড়ার অধিকার রক্ষা করুন। ৩রা এপ্রিল সর্বত্র ঐক্যবদ্ধভাবে সভা-শোভাযাত্রা করে এই কালা-কানুনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ঘোষণা করুন। দাবি করুন এখনই

এই বিল প্রত্যাহার করা হোক। সমস্ত মজুরের একতা দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী ও ধনিকদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিন।

—লেবর-রিলেসন্স বিল বরবাদ হোক।

—নেহরু সরকারের শ্রমিক-বিরোধী নীতি বরবাদ হোক।

—সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র বরবাদ হোক।

—মজুরের একতা জিন্দাবাদ।

২৪ মার্চ ১৯৫০ — বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস

তেলেঙ্গানার বীর কৃষক সন্তানদের মৃত্যুদণ্ড রদ করার জন্য প্রবল জনমত গড়ে তুলুন

তেলেঙ্গানার ১৭ জন বীর কৃষক যোদ্ধার মৃত্যু দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের সুপ্রীম কোর্টে যে আপিল করা হয় কয়েকদিন পূর্বে সুপ্রীম কোর্ট সে আপিল অগ্রাহ্য করেছে। সুতরাং বিচারালয় মারফৎ এই কৃষক নেতাদের বাঁচাবার প্রচেষ্টা এখানেই শেষ হল। তাই এই বীরদের বাঁচাতে হলে মৃত্যুদণ্ড রদ করার জন্য প্রবল ও ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করতে হবে।

কৃষক-কর্মী ও ইউনিটগুলিকে এই আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সক্রিয় হতে হবে। মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে বিভিন্ন উপায়ে প্রতিবাদের ব্যবস্থা করতে হবে।

- যেখানেই সম্ভব জনসভা, শোভাযাত্রা করুন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ক্লাব প্রভৃতির নিকট আবেদন জানান যাতে তাঁরা দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করেন।
- ব্যাপক গণ-সহি সংগ্রহ একটা প্রধান কাজ। দলমত নির্বিশেষে যেখানেই সম্ভব প্রত্যেকের সহি সংগ্রহ করুন।
- জমি-খাদ্য-স্বাধীনতার জন্য বীর যোদ্ধা এই কৃষক সন্তানদের বাঁচাবার যে বিশেষ দায়িত্ব কৃষক সাধারণের উপর রয়েছে তার প্রতি লক্ষ্য রেখে কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক সহি সংগ্রহ করতে হবে।
- শহর ও গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহি সংগ্রহ করুন।
- জনসভা, প্রস্তাবাদি এবং গণ-সহি দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী জওহরলাল নেহরুর নিকট তার যোগে ও ডাকে সত্বর পাঠাবেন। সংবাদপত্রেও খবরগুলি পাঠাতে হবে। প্রাঃ কৃষক ফ্র্যাকশনে বিস্তৃত রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

১৫ ডিসেম্বর ১৯৫০ — *পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক ফ্র্যাকশন*

দাঙ্গার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শ্রমিক শ্রেণিকেই নেতৃত্ব দিতে হবে
মজুরি, নোকরী ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করার জন্যে দাঙ্গাকে রোখ!
মুসলিম জনতাকে রক্ষা করার জন্যে গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে লড়ো!

সাতদিন যাবৎ প্রাণপণ চেষ্টা করেও বিধান-প্যাটেলের গুণ্ডাবাহিনী, আর-এস-এস, জাতীয় টি-ইউ-সি, সেবাদল—পুলিশের দল শ্রমিক শ্রেণিকে দাঙ্গায় নামাতে পারেনি, দাঙ্গার পেছনে জনসাধারণের সমর্থন জুটাতে পারেনি। কমিউনিস্ট পার্টি ও লালঝাণ্ডার কর্মীরা দিনরাত দাঙ্গার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। দাঙ্গার বিরুদ্ধে সংগ্রামে কলকাতা ও শিল্প অঞ্চলের শ্রমিক-জনতা অপূর্বভাবে সাড়া দিচ্ছে।

নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিতর থেকেই শ্রমিকরা দেখতে পাচ্ছে দাঙ্গা কে বাধাচ্ছে, কার স্বার্থে বাধাচ্ছে।

● শ্রমিকদের মজুরি দাবি করার জন্যে, লালঝাণ্ডার বন্দীদের মুক্তি দাবি করার জন্যে বিধান মন্ত্রিসভা কলকাতায় সভা করতে দেয় না। অথচ সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের জন্যে মহাসভাকে ঘটা করে সম্মেলন করতে দেওয়া হচ্ছে—আর সে সম্মেলন থেকেই মহাসভা আওয়াজ তুলছে ঃ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, বাগেরহাটের বদলা নিতে হবে।

● মজুরদের পক্ষ থেকে সত্যি কথা বলবার জন্যে প্রায় ৩০ খানা পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, আর সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াবার জন্যে মিথ্যা প্রচারের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে সমস্ত কংগ্রেসী পত্রিকাকে।

● যারা বরাবর সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে—সে সকল কমিউনিস্ট ও লালঝাণ্ডা নেতাদের আটক করা হচ্ছে জেলে; আর যারা গান্ধীজীকেও হত্যা করতে ছাড়েনি সে আর-এস-এস গুণ্ডাদের স্থান দেওয়া হয়েছে কংগ্রেসের মধ্যে। তাদের সর্দারের সাথে গুণ্ডা-সর্দার প্যাটেলের শলা-পরামর্শ চলছে ঘন ঘন। এখনো যারা দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রচার করছে—পুলিশ তাদেরই বেছে বেছে জেলে পুরছে, যারা দাঙ্গা লাগাচ্ছে তাদের হাতে দিচ্ছে অস্ত্র।

● কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ফেডারেশন, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, কৃষকসভা-ক্ষেতমজুর সমিতি ও নওজোয়ান মজুর লীগ—যারা দাঙ্গার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতা বিধান মন্ত্রিসভা তাদের করেছে বে-আইনি। আর যারা বরাবর টাটা-বিড়লা-বাড়ীওয়ালা-জমিদারদের পোষা গুণ্ডা হিসেবে দাঙ্গা বাধায় সে হিন্দু মহাসভা প্রোটেকশন-অব-মাইনরিটিস, ভারত সেবাশ্রম

সংঘ দাঙ্গার সংগঠন তৈরি করছে প্রকাশ্যে। খুলনার জমিদার জে. পি. মিত্র, পি. আর. ঠাকুর প্রভৃতি পাকিস্তান আক্রমণের নামে গুণ্ডা দলে লোক সংগ্রহ করছে প্রকাশ্যে।

● প্যাটেল নিজে গুণ্ডা নেতাদের সাথে গোপন বৈঠকে দাঙ্গার ষড়যন্ত্র করেছে—কলকাতার সরকারি দপ্তরে বসে,—গণ-বিপ্লবের হাত থেকে রক্ষা পাবার আশায়। তারই নির্দেশ অনুসারে গত ৫ই ফেব্রুয়ারী ব্যারাকপুরে সারা বাংলার পুলিশ সুপারের বৈঠকে তৈরি হয়েছে ব্যাপক দাঙ্গা বাধানোর প্ল্যান।

● শ্রমিক এলাকা বাটানগরে দাঙ্গা লাগার পর একজন কংগ্রেস কর্মী বিধান রায়কে জিজ্ঞেস করেন, দাঙ্গা থামানোর জন্যে তারা কি করবেন। তার জবাবে বিধান রায় তাকে জানিয়ে দেয়—ঘটনা যেদিকে চলছে সেদিকে চলতে দিলেই ঠিক হবে।

● নানু ঘোষ-বিষ্টু ঘোষ প্রভৃতি গুণ্ডা নেতারা গুণ্ডাদল তৈরি করে বিধান মন্ত্রিসভাকে রক্ষা করবে—এ প্রতিশ্রুতিতে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। আর-এস-পি ও সোশ্যালিস্ট নেতারা স্কুল-কলেজে প্রকাশ্যে আর-এস-এস ও ন্যাশন্যাল ক্যাডেট-কোরের সাথে এক হয়ে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে গুণ্ডাদল তৈরি করেছে। এখন সে সকল গুণ্ডাদলই অগ্রণী হচ্ছে দাঙ্গা বাধানোর কাজে।

এ সকল ঘটনার মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণি ও সমস্ত মেহনতী জনতা দেখতে পাচ্ছে—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা খুনী বিধান-প্যাটেলের বিপ্লব বিরোধী ষড়যন্ত্রের ফল। তার জন্যেই দাঙ্গার বিপ্লব-বিরোধী সমস্ত শক্তি ঐকবদ্ধ হয়েছে। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হুকুমে যারা দেশ বিভাগ করেছে, টাটা-বিড়লার গোলাম হিসেবে যারা প্রত্যহ শ্রমিক শ্রেণিকে তার রুটি ও জীবিকা থেকে বঞ্চিত করছে—দাঙ্গার পেছনে যে বিশ্বাসঘাতক বিধান-প্যাটেলের ষড়যন্ত্র দেখতে পাচ্ছে বলেই শ্রমিকরা কেউ আজ দাঙ্গাকে সমর্থন করছে না। পাইকপাড়ার গুণ্ডারা যখন কয়েকটি গরীব মুসলিম পরিবারকে গৃহহীন করে দিয়েছে, ক্রীক রোতে গুণ্ডারা যখন একজন গরীব মুসলিম ফেরীওয়ালাকে মার দিয়েছে, বস্তীর জমিদারদের ভাড়াটে গুণ্ডারা যখন মানিকতলায় মুসলিম ঘরগুলি আগুন লাগিয়েছে, গরীব বিড়ির দোকানগুলি গুণ্ডারা যখন লুট করেছে এখানে সেখানে—তখন চারপাশে হিন্দু জনতা দুঃখ করেছে, বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে, প্রতিবাদ জানিয়েছে।

কিন্তু দুঃখ আর প্রতিবাদই যথেষ্ট নয়—বিধান মন্ত্রিসভা ও তাদের গুণ্ডাবাহিনীর বিরুদ্ধে সংগঠিত করতে হবে শ্রমিক শ্রেণি ও মেহনতী জনতার ক্রোধ। পাড়ায় পাড়ায়, কারখানা ও বস্তী অঞ্চলে গুণ্ডাদের এগিয়ে যেয়ে আঘাত করে দাঙ্গা বন্ধ করতে হবে। বিধান মন্ত্রিসভা ও তাদের মনিব টাটা-বিড়লা-ডলার-সাম্রাজ্যবাদ ছাড়া দাঙ্গায় আর কার লাভ?

● দাঙ্গা বাধার সঙ্গে সঙ্গে বাটার মালিক শ্রমিক ছাঁটাই করতে শুরু করেছে; অন্যান্য প্রত্যেক কারখানার মালিকেরই মজুর ছাঁটাই-এর প্ল্যান আছে। এতদিন তারা শ্রমিকদের ঐক্য দেখে সে প্ল্যান চালু করতে পারেনি দাঙ্গার সুযোগে তারা এবার ছাঁটাই শুরু করবে। বিধান মন্ত্রিসভা এর মধ্যেই ১৪৪ ধারা জারি করে শ্রমিকদের সভা সমিতির অধিকার কেড়ে নিয়েছে। এভাবেই তারা পথ করে দিচ্ছে বিড়লা-নলিনী সরকারের অবাধ মুনাফার।

● শ্রমিকদের চাকুরি ও বাঁচার মত মজুরি দিতে পারছে না বলেই খুনী কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা মাড়োয়ারী-গুজরাটি-বেনেদের হুকুমে ব্যাপক নরহত্যার ষড়যন্ত্র করছে। পশ্চিম বাংলায়

মুসলমানদের হত্যা করার অর্থ, পূর্ব বাংলার হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের উত্তেজিত করা; তাতে ইস্পাহানী ও খুনী নুরুল আমীন ছাড়া আর কে লাভবান হবে? পশ্চিম বাংলায় মুসলিমদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হবার অর্থ পূর্ব বাংলায় খুনী নুরুল আমীনের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য গড়ে তোলা। উভয় বাংলায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ছাড়া উভয় বাংলার সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার আর কোন পথ নেই। উভয় বাংলার ধনিক শাসন খতম করা ছাড়া বাংলাকে আবার ঐক্যবদ্ধ করার আর কোন পথ নেই। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সেদিনটিকেই পিছিয়ে দিচ্ছে।

তারজন্যেই শ্রমিক শ্রেণিকে এ দাঙ্গা-বিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব নিতে হবে। নিজেদের মজুরি ও নোকরীর স্বার্থে সংখ্যাল্পদের স্বার্থে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার স্বার্থে বাস্তুহারাদের স্বার্থেই দাঙ্গাবাজ বিধান মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। দাঙ্গা বন্ধ করতে হবে।

দাঙ্গাবাজ গুণ্ডাদলকে শ্রমিক শ্রেণি ছাড়া আর কে রুখবে? শ্রমিক শ্রেণি দেখেছে—বিড়লা তার কেশোরাম ও টেক্সম্যাকোতে কিভাবে আর-এস-এস গুণ্ডাদের দিয়ে ধর্মঘট ভাঙ্গে। শ্রমিকরাই দেখেছে, কিভাবে নলিনী সরকার পটারী ও গ্যাসে 'জাতীয়' টি-ইউ-সি—সেবাদল গুণ্ডাদের দিয়ে তাদের ধর্মঘট ভেঙ্গেছে। শ্রমিকরা দেখেছে—কিভাবে কখনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কখনো প্রাদেশিকতার বিষ ছড়িয়ে এ গুণ্ডার দল বরাবর লড়াইয়ের ঐক্য ভাঙবার চেষ্টা করেছে। তারজন্যেই এবারও শ্রমিক শ্রেণিকেই এগিয়ে গিয়ে আঘাত করতে হবে—দাঙ্গাবাজ গুণ্ডাবাহিনীকে।

কলকারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে লড়াই যত তীব্র হবে—ততই এ গুণ্ডাদল কোণঠাসা হবে। গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির ঐক্য যতই বাড়বে—কারখানায় কারখানায় দাবির জন্যে লড়াই করা ততই সহজ হবে। গুণ্ডারা কারখানায় যে সকল মিথ্যা প্রচার করে, বস্তীতে যে সকল গুজব রটায় তার জবাব দিতে হবে, গুণ্ডাদের এলাকায় মুখ দেখানো অবাস্তব করে দিতে হবে, তাদের ডাণ্ডার জোরে ঠাণ্ডা করতে হবে।

মুসলিম শ্রমিক ও গরীব জনতাকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিতে হবে হিন্দু শ্রমিক ভাই-বোনদের। তারজন্যে এখনই কারখানায় ও এলাকায় দাঙ্গা-বিরোধী কমিটি তৈরি কর, হিন্দু শ্রমিকদের নিয়ে জঙ্গী দল গঠন কর, দাঙ্গাবাজ পুলিশ-গুণ্ডার বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে তাকে তৈরি কর, ইস্তাহার, পোষ্টারে মিথ্যা প্রচারের জবাব দাও, দাঙ্গার উস্কানির প্রতিবাদে ধর্মঘট কর, বিক্ষোভ প্রকাশ কর, ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে ফেল হাজার মজুরের পায়ের তলে।

২৬শে জানুয়ারি দক্ষিণ কলকাতায় হিন্দু-মুসলিম-হিন্দুস্তানী-বাঙ্গালী শ্রমিক জনতার বিপ্লবী গণঅভ্যুত্থান জানিয়ে দিয়েছে—আমাদের মুক্তি কোনপথে। কাকদ্বীপ ও মেদিনীপুরের গণঅভ্যুত্থান বিধান মন্ত্রিসভার মৃত্যু ঘোষণা করেছে। জনতার সেই মুক্তি অভিযানকে অপরাজেয় করে তোল—সারা দেশে দাঙ্গা বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কলকাতা ও শিল্প এলাকার শ্রমিক শ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ করে আওয়াজ তোল :

দাঙ্গাবাজ বিধান মন্ত্রিসভা ধ্বংস হোক। দাঙ্গার বিরুদ্ধে এক হও।

১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

পূর্ব বাংলা থেকে আগত বাস্তুহারাদের প্রতি কমিউনিস্ট পার্টির ডাক

বাসস্থান, খাদ্য, কাজ ও জমির জন্যে লড়ুন

পূর্ব বাংলার আশ্রয়প্রার্থী ভাই-বোনেরা,

ভারতীয় পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতা শুনে আপনারা নিশ্চয়ই বাস্তুহারাদের জন্যে তার মায়াকান্নার আসল পরিচয় পেয়েছেন।

ব্রিটিশ কমনওয়েলথ-এর গোলাম নেহরুর কাছ থেকে বাস্তুহারারা এ ধরনের লাঞ্ছনা ও অবমাননা ছাড়া আর কি আশা করতে পারে?

ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হুকুমের চাকর নেহরু-লিয়াকত সরকার আপনাদের ভাগ্য নিয়ে আজ জুয়া খেলছে। ট্রুম্যান-এটলী-চার্চিলের হুকুমে এবং টাটা-বিড়লা-ইস্পাহানীর স্বার্থে তারা ভারত বিভাগ করে সোনার বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করেছে, বাংলার অর্থনীতিক, রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক জীবকে পঙ্গু করেছে। এখন বাংলাকে তারা পরিণত করতে চাচ্ছে মুক্ত চীন ও মুক্ত বর্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘাঁটিতে। উভয় বাংলার, সংখ্যাল্পদের তারা ব্যবহার করছে তাদের সে মতলব হাসিল করার কাজে।

সাম্রাজ্যবাদীদের ইঙ্গিতেই আজ কাশ্মীর, কাল বাণিজ্য-যুদ্ধের নাম করে এই শয়তানের দল সংবাদপত্র ও রেডিওর মারফৎ দিনের পর দিন বিষ ছড়িয়েছে সংখ্যাল্পদের বিরুদ্ধে, পুলিশ-আনসার-সেবাদল-আর-এস-এসদের নিযুক্ত করেছে সংখ্যাল্পদের সোনার সংসার ধ্বংস করার জন্যে, ঘরবাড়ি তছনছ করার জন্যে, তাদের হত্যা করার জন্যে, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে পথের ভিক্ষুকে পরিণত করার জন্যে। তারপর নেহরু মায়াকান্না শুরু করেছে পাকিস্তানের 'হিন্দু'দের জন্যে, আর লিয়াকত মায়াকান্না শুরু করেছে হিন্দুস্তানেরই 'মুসলমান'দের জন্যে। আবার সাম্রাজ্যবাদীদের ইঙ্গিতেই তারা এখন আপস আলোচনা শুরু করেছে দিল্লী ও করাচীর দপ্তরে। গোল-টেবিলে আবার তাদের খানাপিনার আয়োজন চলেছে।

পূর্ব বাংলার আশ্রয়প্রার্থীদের দুরবস্থা দেখবার জন্যে পণ্ডিত নেহরু দু'বার পশ্চিম বাংলায় এসেছিলেন। তিনি এমন কি রাণাঘাট ও বনগাঁওয়ের আশ্রয়প্রার্থী শিবির পর্য্যন্ত ঘুরে এসেছেন। কিন্তু কি উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি আশ্রয়প্রার্থীদের দেখতে গিয়েছিলেন তা বোঝা গেল তাঁর পার্লামেন্টের বক্তৃতা পড়ে। সেখানে তিনি দুনিয়ার লোককে শুনিয়ে দিলেন যে, পূর্ব বাংলার আশ্রয়প্রার্থীরা অনেক টাকা-পয়সা, সোনাগয়না, মালপত্র নিয়ে এসেছে। নেহরুজীর আশ্রয়প্রার্থী

শিবিরে ভ্রমণের যে ছবি প্রকাশিত হলো তাতে পাকা পাকা বাড়ী দেখিয়ে প্রমাণ করা হলো যে, এখানে এসেও তারা বেশ রাজার হালেই আছে। তার জন্যেই এবার পার্লামেন্টে গত বছরের তুলনায় আট কোটি টাকা কম ব্যয় বরাদ্দ করা হলো! বাস্তুহারাদের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শকসেনা লালদিঘীর দপ্তরে বসে প্ল্যান তৈরি করলেন যে, আশ্রয়প্রার্থীদের শুধু পশ্চিম বাংলায় রাখা হবে না, তাদের ছড়িয়ে দিতে হবে আসাম, উড়িষ্যা, বিহার প্রভৃতি প্রদেশে। বিধানের সরকারি দপ্তর থেকে হুকুম করা হলো যে, বাস্তুহারাদের যেন পাক সীমান্তেই তাঁবু খাটিয়ে রাখা হয়, কলকাতার দিকে যেন আসতে না দেওয়া হয়! যেখানে রোজ কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বেকারের সংখ্যা বাড়ছে নেহরুজী সেখানে বাস্তুহারাদের খুব গম্ভীরভাবে পরামর্শ দিলেন, তোমাদের কাজ জোগাড় করে খেতে হবে!

টাটা-বিড়লার দালাল নেহরু গভর্নমেন্টের কাছ থেকে বাস্তুহারারা এর চেয়ে আর বেশি কি আশা করতে পারে? গত দু'বছর ধরে বিধান মন্ত্রিসভার কাছ থেকে বাস্তুহারারা লাঠি-গুলি ছাড়া আর কি পেয়েছে? কয়জন বাস্তুহারা আজ পর্য্যন্ত বাসস্থান পেয়েছে, কাজ পেয়েছে? নেহরুজী তার পার্লামেন্টের বক্তৃতার মধ্যে বাস্তুহারাদের সম্পর্কে গভর্নমেন্টের দায়িত্বের কথাই অস্বীকার করেছেন।

কিন্তু পূর্ব বাংলার যে সকল বাস্তুহারা এখানে চলে এসেছেন তাদের টাটা-বিড়লার স্বার্থে ব্যবহার করার আশা নেহরু-বিধান ছাড়েননি। তাদের আসামে পাঠানো হচ্ছে অসমিয়া-বাঙ্গালী দাঙ্গার ক্ষেত্র তৈরি করার জন্যে, উড়িষ্যায় পাঠানো হচ্ছে—বাঙ্গালী-উড়িয়া ঝগড়া বাধানোর জন্যে, বিহারে পাঠানো হচ্ছে—বাঙ্গালী-বিহারী লড়াই লাগানোর জন্যে। তাদের অস্থায়ীভাবে রাখা হচ্ছে বেকার-বাহিনী হিসেবে শ্রমিকের ধর্মঘট ভাঙ্গার কাজে ব্যবহার করার জন্যে, কাকদ্বীপের কৃষকের জমি কেড়ে নেবার জন্যে। তাদের উস্কানি দেওয়া হচ্ছে—আবার হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধানোর জন্যে, মুসলিমদের তাড়িয়ে তাদের ঘরবাড়ী দখল করার জন্যে। তাদের জমায়েত রাখা হচ্ছে প্রয়োজনমত হানাদার দলে ভর্ত্তি করে তাকে পাকিস্তানে পাঠানোর জন্যে যেমন হানাদার দল পাঠিয়েছিলেন লিয়াকত আলি কাশ্মীরে ইংরেজদের হুকুমে। আপনাদের দুর্ভাগ্য, আপনাদের স্ত্রী-পুত্রের লাঞ্ছনা এই খুনীদের বিচলিত করে না, সাম্রাজ্যবাদী মতলব এবং টাটা-বিড়লার মুনাফা জন্যেই এরা আপনাদের ব্যবহার করতে চাচ্ছে—দাঙ্গার ঘুঁটি হিসেবে, কখনো দাঙ্গায়, কখনো যুদ্ধে।

কিন্তু কেন আপনারা এই জুয়াড়ীদের হাতে দাবার ঘুঁটিতে পরিণত হবেন? ব্রিটিশ কমনওয়েলথ-এর মধ্যে থেকে, এরা আপনাদের জন্যে কিছুই করতে পারে না। আজ যেসকল বামপন্থী দল পশ্চিম বাংলায় বসে নুরুল আমীনের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধের' কথা বলছেন, 'পুলিশ একশান'-এর কথা বলছেন—পূর্ব বাংলায় তারাই চিরদিন নুরুল আমীনের পা-চেটে এসেছেন, পূর্ব বাংলার শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র আন্দোলন দমন করার কাজে নুরুল আমীন সরকারের আনসার গুণ্ডাদের সাহায্য করে এসেছেন। আজ তাঁরা এখানে যেমন নেহরুজীর প্রতি আনুগত্য জানাচ্ছেন, তেমনি আনুগত্য তাঁরা পাকিস্তানে জানাচ্ছেন লিয়াকত আলির প্রতি। তাদের 'যুদ্ধে' সাম্রাজ্যবাদ ও টাটা-বিড়লা-ইস্পাহানী ছাড়া আর কার কি লাভ হবে?

কিন্তু সত্যিকারের মুক্তিযুদ্ধ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন—ময়মনসিংয়ের হাজং এলাকায়, কালসিরা, নাচোল, জয়দেবপুর প্রভৃতি কৃষক এলাকায়, পশ্চিমবঙ্গের কাকদ্বীপ ও মেদিনীপুরে।

পূর্ব বাংলায় এখনো এক কোটি ১৫ লক্ষ হিন্দু রয়েছেন। আপনাদের অধিকাংশ আত্মীয়স্বজন এখনো সেখানে। তাঁদের বাস্তুত্যাগ করলে চলবে না, নেহরু-বিধানের উপর ভরসা রাখলে চলবে না, 'বামপন্থী'দের মেকি আজাদীর প্রতিশ্রুতিতে কান দিলে চলবে না। তাদের পূর্ব বাংলায় নিজের মাতৃভূমিতে দাঁড়িয়েই লড়তে হবে খুনীদের বিরুদ্ধে, যেমনভাবে লড়ছে হাজং-গাড়ো-ডালুরা মুসলিম কৃষক জনতার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। সেখানে যে মুক্তিসেনা তৈরি হয়েছে তারাই পূর্ব বাংলাকে মুক্ত করতে পারে। মুসলিম জনতার সমর্থন আছে বলেই নুরুল আমীন ও তাদের গুণ্ডাদল এবং 'হিন্দু' জমিদার-কংগ্রেসী জমিদার একত্র হয়েও তাকে ধ্বংস করতে পারেনি; সেখানে দাঙ্গা লাগাতে পারেনি। ময়মনসিংয়ের পাহাড় এলাকার পথই—পূর্ব বাংলার বুকে গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম করার পথ। একমাত্র সে পথেই সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা করতে হবে।

এখানে আপনারা যারা চলে এসেছেন তাদের কাজ হলো এখানকার মুক্তি-সংগ্রামকে শক্তিশালী করা। কমিউনিস্ট পার্টিই হিন্দু-মুসলিম জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে পূর্ব বাংলায় নুরুল আমীন সরকারকে খতম করছে; এখানে কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করার দাবি তুলুন, তাতেই পূর্ব বাংলার মুক্তি-সংগ্রাম আরো শক্তিশালী হবে। পশ্চিম বাংলায় বিধান মন্ত্রিসভাকে তাড়িয়ে গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম করুন, দেখবেন তাতে শুধু আপনারাই এখানে স্থায়ী বাসস্থান ও কাজ পাবেন না—উভয় বাংলা আবার ঐক্যবদ্ধ হবে, সোনার বাংলা আবার শিল্প-সম্পদে ভরে উঠবে।

নেহরু-বিধানের হাতে দাবার ঘুঁটি হওয়ার অর্থ আরো দুর্ভাগ্য, আরো লাঞ্ছনা, আরো মৃত্যু। তাদের দাঙ্গা ও যুদ্ধ-নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করেই আপনাদের বাঁচতে হবে এখানে, বাঁচাতে হবে পূর্ব বাংলার সংখ্যাল্পদের।

বিধান সরকার আপনাদের বলবে—বাড়ীতেই তোমরা তাঁবুতে শিয়াল-কুকুরের মতো দিন কাটাও। আপনারা কলকাতা শহরের লাটপ্রাসাদ, শ্বেতাঙ্গ বনিকদের বড় বড় হোটেল ও ক্লাব বাড়ী, নিজামপ্রাসাদ ও মাড়োয়ারী প্রভুদের বাড়ীগুলি দখল করে বিধান সরকারের জবাব দিন! নেহরু-বিধান সরকার বলবে—তোমরা নিজেরা কাজ জুটিয়ে নাও, কাজ দিতে পারবো না। আপনারা ক্লাইভ ষ্ট্রীট থেকে শ্বেতাঙ্গ মালিকদের তাড়িয়ে দিয়ে এখানকার বড় বড় শিল্পগুলি দখল করুন, সেগুলি জাতীয় সম্পত্তি বলে ঘোষণা করুন।

নেহরু-বিধান সরকার বলবে, এখানে জমি নেই, তোমাদের অন্য প্রদেশে পাঠাবো, আন্দামানে পাঠাবো। আপনারা জমিদারদের জমি দখল করে তাদের দেখিয়ে দিন বাংলায় জমির অভাব নেই। অন্যপ্রদেশে চালান হতে অস্বীকার করুন।

নেহরু-বিধান বলবে, তোমাদের অসুখ-বিসুখে, শিক্ষা ও ভাত-কাপড়ের জন্যে খরচ করার মতো টাকা নেই। দু'চারজন বড়লোক বাস্তুহারাকে বড় বড় চাকুরি ও ঠিকেদারি দিয়ে আপনাদের তারা খুশি রাখতে চাইবে, আপনাদের মুখ বন্ধ করতে চেষ্টা করবে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জন্যে, শ্রমিক-কৃষক বাস্তুহারা দমনের জন্যে গভর্নমেণ্ট যে সৈন্য-পুলিশ বাড়াচ্ছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাদের প্রচারকে মিথ্যা প্রমাণিত করুন, সরকারি ভাতা আদায় করুন।

পশ্চিম বাংলায় যারা দু'বছর আগে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে এসেছিলেন—তারা এভাবে নিজেদের একতার জোরে, শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জমি দখল করেছে,

আজাদগড়ের মতো কলোনী তৈরি করে খুনী বিধানের আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করেছে। তাদের সাথে একত্র হয়ে আপনারা বাস্তুহারাদের জমি, রোজি ও বাসস্থানের ব্যবস্থার ভার নিজ হাতে গ্রহণ করুন। এখনই হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও শান্তি রক্ষা করুন। পশ্চিম বাংলার গণ-আন্দোলনে আপনারা একলক্ষ নূতন সৈনিক। কমিউনিস্ট পার্টি ও লালঝাণ্ডা আপনাদের জমি, রোজি, ভাতা, বাসস্থানের সংগ্রামে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে। বাংলাকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-ঘাঁটি হতে দিব না, টাটা-বিড়লা-ইস্পাহানীর স্বার্থে ধ্বংস হতে দেবো না, দুই বাংলাকে স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ করবো—এ শপথ নিয়ে আসুন সংগঠিত হই, প্রত্যেক বাস্তুহারা শিবিরে সকল দল ও মতের বাস্তুহারাদের নিয়ে সংগ্রাম-কমিটি গঠন করি, জঙ্গী দল গঠন করি, সংগ্রাম শুরু করি। আসুন আমরা জমি, রোজি, ভাতা ও বাসস্থানের দাবি নিয়ে সভা, শোভাযাত্রা, ঘেরাও শুরু করি, নেহরু-বিধান সরকার শঙ্কিত বাস্তুহারাদের যে অবমাননা করেছেন তার সমুচিত জবাব দিই।

২২ মার্চ ১৯৫০ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

বাস্তুহারাদের ঐক্যবদ্ধ করুন

তিনমাস আগেও পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় মজুর-কৃষক ছাত্রজনতার বিপ্লবী সংগ্রাম দাবানলের মত ছড়াইতেছিল, পূর্ব বাংলার গারো পাহাড় অঞ্চলে পশ্চিম বাংলায় কাকদ্বীপ ও মেদিনীপুরে কৃষক জনতার জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সশস্ত্র গণসংগ্রামের পথে দুর্বার বেগে জাগাইতেছিল। জেলের মধ্যে বন্দীদের বাইরে মজুর ছাত্র ও মধ্যবিত্তদের লড়াই কখনো ধর্মঘট, কখনো ব্যারিকেড লড়াই-এর রূপ নিয়ে—২৬শে জানুয়ারি পশ্চিমবাংলায় দাস শাসনতন্ত্র বিরোধী দিবসকে কেন্দ্র করিয়া একটি প্রচণ্ড গণঅভ্যুত্থান ফাটিয়া পড়িল। একদিকে চীন ও তার পাশাপাশি ভিয়েতনাম, মালয়-বর্মার জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের জয়ের পর জয় ও অপরদিকে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বিপ্লবী সংগ্রামের অগ্রগতিতে ভীত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধচক্রান্তে উন্মত্ত ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ তাই আর্তনাদ শুরু করিয়া দিল—"সব গেল সব গেল,—পশ্চিম বাংলাকে চীনের পথ হইতে ফিরাও—গণতান্ত্রিক শক্তিকে বিধ্বস্ত কর—চীন ও বর্মার সীমান্ত বাংলায় নিরাপদ যুদ্ধঘাঁটির ক্ষেত্র প্রস্তুত কর।"

ইঙ্গ-আমেরিকান সেনাপতি ও দুতেরা নয়াদিল্লী ও করাচীতে ছুটাছুটি শুরু করিলেন। সাম্রাজ্যবাদের পাহারাদার কুকুর নেহরু-প্যাটেল-লিয়াকৎ-বিধান-নুরুল আমীনের দল আনসার আর-এস-এস গুণ্ডার দলকে লেলাইয়া দিল কোথাও মুসলমানদের খুন করিয়া হিন্দুকে ক্ষেপাইতে, কোথাও হিন্দুদের মারিয়া মুসলমানকে উত্তেজিত করিতে। এমনিভাবে জনতার রুটি, রুজি ও স্বাধীনতার সংগ্রামকে ধ্বংস করিতে।

সেই সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের বিষফল আজ ফলিতে শুরু করিয়াছে। হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান ভীত সন্ত্রস্ত নিরস্ত্র মেয়েপুরুষ শিশু বৃদ্ধ বাঙ্গালী বাস্তুহারা প্রতিদিন সীমানা অতিক্রম করিয়া প্রাণভয়ে পলাইতেছে। উভয় বাংলার সমস্ত শহরে সমস্ত জেলার আকাশ বাতাস নিরাশ্রয় বাস্তুহারাদের আর্তনাদে ভরিয়া উঠিয়াছে। নিজেদের ঘরবাড়ী ভিটামাটিতে শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকিবার জন্য যাহারা বুক বাঁধিয়াছিল তাহাদের উপর এখন ইতস্তত আক্রমণ চলিতেছে। আজ এখানে কাল ওখানে লুণ্ঠন, গৃহদাহ ও নিরাপরাধ সাধারণ গরীব মানুষের হত্যা প্রতিদিনের ঘটনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

গত দুইমাস নেহরু-প্যাটেল-বিধান রায় স্বয়ং পূর্ব বাংলার হিন্দুদের উত্তেজিত করিয়াছে। ঐদিকে লিয়াকৎ-নুরুল আমীনের দল পশ্চিমবাংলায় মুসলিম নির্য্যাতনের বীভৎস কাহিনী ছড়াইয়া এমন কি ঢাকার সেক্রেটারিয়েট কর্মচারীদের দলে দলে পাঠাইয়াছে হিন্দু আক্রমণের জন্য। উভয় বাংলার সরকারি দালাল কাগজগুলি সংখ্যালঘিষ্ঠদের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠদের

উত্তেজিত করিয়াছে। আর সাম্প্রদায়িকতার প্রচার—হত্যা—গৃহদাহ ও সন্ত্রাসসৃষ্টির পরিপূর্ণ সুযোগ ও স্বাধীনতা দিয়াছে আর-এস-এস হিন্দুসভা আনসার ও লীগ প্রতিক্রিয়াশীলদের। পুলিশ অফিসারেরা সরকারি পাহারায় দাঙ্গাকারী গুণ্ডার দলকে আক্রমণের স্থলে পৌঁছাইয়া দিয়াছে—অস্ত্র জোগাইয়াছে—আড়াল করিয়া রাখিয়াছে।

এইভাবে মেহনতী মানুষের জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়া উভয়বঙ্গের সরকার গরুর শোকে শকুনের কান্না তুলিয়া—ভাঁওতা দিয়াছে—যতখুশি আশ্রয়প্রার্থী আসিতে চায় আসুক—তাহাদের সমস্ত বন্দোবস্ত আমরা করিব।

আর আজ? সীমান্ত স্টেশনগুলিতে বড় বড় শহরে—গ্রামাঞ্চলে সর্বত্র লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা একমুষ্ঠি অন্ন ও একটু আশ্রয়ের জন্য আর্তনাদ করিতেছে—মহামারিতে প্রাণ দিতেছে, সর্বত্র যখন শ্মশানের সর্বনাশ সৃষ্টি হইতেছে তখন নেহরু-বিধান সরকার নিরাশ্রয় বাস্তুহারাদেরই নিন্দা শুরু করিয়াছে—বিক্ষুব্ধ হিন্দু বাস্তুহারাকে গরীব মুসলমানের ঘর দেখাইয়া দিতেছে। নিজেদের ইহাতে লক্ষ লক্ষ মানুষের ঘরে আগুন লাগাইয়া সমস্ত কিছু ছাই করিয়া দিয়া—এখন নেহরু লিয়াকৎ পরামর্শ করিতে বসিয়াছে, এই আগুন কি ভাবে 'নিভান' যায়?

জনসাধারণের শত্রু, সাম্রাজ্যবাদের পাহারাদার পোষা কুকুর কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের এমনি ঘৃণিত রূপ!

বাস্তুহারা ভাইবোনেরা, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রপ্রিয় মেহনতী জনসাধারণ! নেহরু-লিয়াকৎ সরকারের শয়তানী চেহারাকে চিনুন।

বাস্তুহারা ভাইবোনদের আজ মজুর কৃষক ছাত্রদের গণতান্ত্রিক শক্তির সাথে হাত মিলাইয়া—ঐক্যবদ্ধ শক্তির জোরে ভাত-কাপড় জীবিকা ও বাসস্থানের জন্য লড়িতে হইবে।

গণতন্ত্রপ্রিয় সমস্ত দেশপ্রেমিকদের আগাইয়া আসিতে হইবে যাহাতে বাস্তুহারাভাইদের সাম্রাজ্যবাদ শয়তান ও টাটা-বিড়লা-ডালমিয়ার দল নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার না করিতে পারে।

লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারার মধ্য হইতে এক দুর্বার ও দুর্দ্ধর্ষ ধনতান্ত্রিক শক্তি সংগঠিত করুন। নেহরু-বিধানের হাতে দাবার ঘুঁটি হওয়ার অর্থ বাস্তুহারাদের জীবনে আরো দুর্ভাগ্য। আরো লাঞ্ছনা আরো মৃত্যু। তাদের দাঙ্গা ও যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াই পশ্চিমবাংলার বাস্তুহারাদের বাঁচিতে হইবে ও পূর্ববাংলার সংখ্যালঘুদের বাঁচাইতে হইবে।

বাস্তুহারা ভাইবোনেরা,

অন্য প্রদেশে চালান হইতে অস্বীকার করুন। আপনারা জমিদারদের জমি দখল করিয়া দেখাইয়া দিন বাংলায় জমির অভাব নাই। কলিকাতার লাটপ্রাসাদ, শ্বেতাঙ্গ বণিকদের বড় বড় হোটেল, ক্লাববাড়ী, নিজামপ্রাসাদ ও মাড়োয়ারী প্রভুদের বাড়ীগুলি দখল করিয়া বাসস্থান সংগ্রহ করুন।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জন্য, শ্রমিক-কৃষক বাস্তুহারা দমনের জন্য গভর্নমেন্ট যে সৈন্য-পুলিশে জলের মত টাকা ঢালিতেছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া সরকারি ভাতা আদায় করুন।

পশ্চিমবাংলায় যাহারা দুই বছর আগে আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে আসিয়াছিলেন তাহারা একতার জোরে শ্রমিক কৃষক ছাত্রদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া জমি দখল করিয়াছে, আজাদ গড়ের মত কলোনী তৈয়ার করিয়া খুনী বিধানের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছে। আপনারাও সেই পথে আগাইয়া আসুন। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও শান্তি রক্ষা করুন।

সমস্ত কমিউনিস্ট ও লালঝাণ্ডা কর্মীদের বাস্তহারাদের পুনর্বসতির এই গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পুরোভাগে এখনি সামিল হইতে হইবে। বাস্তুহারাদের রুটি রুজি ভাতা, জমি ও বাসস্থানের সংগ্রামকে গড়িতে হইবে।

সর্বত্র আওয়াজ তুলুন—বাংলাকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-ঘাঁটিতে পরিণত হইতে দেব না, টাটা-বিড়লা-ইস্পাহানীর স্বার্থে ধ্বংস হইতে দেব না। দুই বাংলাকে স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ করিব—এই শপথ নিয়ে সমস্ত বাস্তুহারাদের সংগঠিত করুন। প্রত্যেক বাস্তুহারা শিবিরে সকল দল ও মতের বাস্তুহাদের নিয়ে সংগ্রাম কমিটি গঠন করুন, জঙ্গীদল গঠন করুন। জমি রুজি ভাতা ও বাসস্থানের দাবি নিয়ে সভা শোভাযাত্রা ঘেরাও শুরু করুন। নেহরু-বিধান ও লিয়াকৎ-নুরুল আমীন সরকার লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারার জীবনে যে সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে তাহার সমুচিত জবাব দিন।

'স্বাধীনতা', সম্পাদকীয়, ৬ এপ্রিল, ১৯৫০

প্রাদেশিক বাস্তুহারা কেন্দ্রের তিনটি সার্কুলার

ক) বাস্তুহারা পত্রিকা সম্পর্কে পার্টির কর্তব্য

সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ প্রতিষ্ঠার ফলে একই সংগঠনে সমস্ত বাস্তুহারাদিগকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া একই কেন্দ্র হইতে একই রাজনৈতিক ভিত্তিতে প্রদেশব্যাপী বাস্তুহারা আন্দোলন পরিচালনা করার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু যে গতিতে ইহার কাজ চালানো উচিত ছিল তাহা মোটেই সম্ভব হয় নাই। পশ্চিমবাংলার ৬০ লক্ষ বাস্তুহারাদের অধিকাংশকে এই সংগঠনে সংগঠিত করা যায় নি এবং ইহাকে বাস্তুহারাদিগের মধ্যে জনপ্রিয় করিয়া তোলা যায়নি। পার্টির আভ্যন্তরীণ সংকটজনক অবস্থা ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ি তাহা আমরা জানি। কিন্তু পার্টির এই সংকটজনক অবস্থার নিষ্ক্রিয় দর্শক হিসাবে থাকা স্রোতে গা ভাসাইয়া দেওয়া প্রকৃত মার্ক্সবাদীর কর্তব্য নয়—বলশেভিক দৃঢ়তা লইয়া পার্টির গণসংযোগ বাড়াইয়া বাস্তুহারাগণের স্বার্থে আশু দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন করিতে হইবে। সেই গণ-আন্দোলনকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও পূর্ণ স্বাধীনতাকামী ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টে রূপ দিয়া এই সংকট সমাধানের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

বাস্তুহারাদিগের মধ্যে ব্যাপকভাবে এইরূপ আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ একটি প্রধান গণসংগঠন। উদ্বাস্তুদিগের আন্দোলন সঠিক পথে পরিচালিত করিতে গেলে এবং সংগঠন আরো দৃঢ় এবং ব্যাপক করিতে গেলে উদ্বাস্তুদিগের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বিশেষ প্রয়োজন এবং সেই উদ্দেশ্যে একটি সাপ্তাহিক প্রকাশ করা হয়। পুরাতন প্রাদেশিক কমিটির মত অনুযায়ী ইহা পার্টির পরিচালনাধীন থাকে—অবশ্য ইহা নামে মাত্র থাকে, কিন্তু ইহার কোন দায়িত্বই প্রাদেশিক কমিটি গ্রহণ করেন না। পত্রিকার সমস্ত দায়িত্বই মাত্র কয়েকজন কমরেডের উপর পড়ে। সংগঠিত এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার ও অভিজ্ঞতার অভাবে পত্রিকার পরিচালনায় ও সম্পাদনায় ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দেয়। পত্রিকার প্রচার সংখ্যা আশানুরূপ না হওয়ায় এবং তেমন কোন বিজ্ঞাপন না পাওয়ায় আজ পর্যন্ত পত্রিকার উপর ৭০০ টাকার মত দেনা চাপিয়াছে। এইরূপ আর্থিক সংকটের জন্য অনেক সময় পত্রিকার পাতার সংখ্যা কমানো হইয়াছে এবং নির্ধারিত দিনে পত্রিকা বাহির হইতে পারে নাই। ফলে প্রচার সংখ্যা আরো কম হইয়া যাইতেছে। মাত্র কয়েকজনের চেষ্টায় এই পত্রিকা বেশিদিন বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব নয়। সেইজন্য অস্থায়ী প্রাদেশিক বাস্তুহারা ফ্রাকশান পত্রিকার নীতি কি হইবে নিম্নলিখিত প্রস্তাব মারফৎ তাহা ব্যক্ত করিয়াছে :

"উদ্বাস্তুদিগের মুখপত্র সম্মিলিত বাস্তুহারা আন্দোলনের সংগঠক হিসাবে ব্যাপকতম ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া উচিত। সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ এবং উদ্বাস্তুদিগের মুখপত্রের উদ্দেশ্যে এক এবং অভিন্ন ও একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি অপরটির পরিপূরক হিসাবেই কাজ করিবে। উদ্বাস্তুদিগের মধ্যে সংযুক্ত ফ্রন্টকে আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তুহারাদিগের সহিত অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য স্থাপনের জন্য এই পত্রিকা সাহায্য করিবে। কেন্দ্রীয় পরিষদের সহিত ও কেন্দ্রীয় পরিষদ মারফৎ সকল শ্রেণির বাস্তুহারাদিগের সহিত যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ করিবার জন্য সাপ্তাহিক পত্রিকাটি হইবে অন্যতম প্রধান হাতিয়ার।"

কেন্দ্রীয় পরিষদের সহিত যুক্ত সমস্ত বামপন্থী দল ও ব্যক্তি যাহাতে এই পত্রিকাকে বাস্তুহারাদের সম্মিলিত আন্দোলনের মুখপত্র হিসাবে গ্রহণ করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে আমরা পত্রিকা পরিচালনা করিব। সংশ্লিষ্ট সমস্ত বামপন্থী দল যাহাতে যুক্ত বাস্তুহারা আন্দোলন ও পত্রিকার অংশীদার হিসাবে নিজেদের দায়িত্ব অনুভব করিতে পারেন সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখিতেই হইবে। সকলকেই এই দায়িত্বের অংশ বহন করিতে উৎসাহিত করিতে হইবে। পত্রিকাটি হইবে সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের মুখপত্র।

সংকীর্ণতাবাদীর দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্মিলিত ফ্রন্টের শুধু সাইনবোর্ড লাগাইয়া রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে নিজেদের একচেটিয়াপনা জাহির করিলে চলিবে না।

সম্মিলিত বাস্তুহারা আন্দোলন গড়িতে এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ ও পরিচালনা করিতে প্রত্যেক ব্যাপারেই যে আমাদেরই নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে তাহা আমরা জানি। কিন্তু জোর করিয়া আমাদের নেতৃত্ব চাপাইয়া তাহা কখনও সম্ভব হইবে না।...

সাপ্তাহিক পরিচালনা ও প্রকাশ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মীর নিকট হইতে আমরা পরামর্শ গ্রহণ করিব (ইহা আমরা পূর্বে করিতে পারি নাই)। ইহার ফলে আমরা তাহাদের আরো বেশি সাহায্য ও সহযোগিতা পাইব।

... সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সাপ্তাহিকটি যে কেবলমাত্র বাস্তুহারাদিগের প্রকৃত মুখপত্র হইয়া উঠিবে—তাহাই নহে, বাস্তুহারা আন্দোলনকে ইহা অপরাজেয় করিয়া তুলিবে এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নির্ভরযোগ্য সাথী হিসাবে গড়িয়া তুলিবে। সুতরাং—

(১) জেলার বাস্তুহারা ইউনিটগুলিকে সাপ্তাহিক বিক্রয়ের জন্য বিশেষ সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে। স্থানীয় পার্টি ইউনিট এবং কর্মীদিগকে উদ্যোগী হইয়া এই দায়িত্ব লইতে সাহায্য করিবে জেলা কমিটি ও জেলা বাস্তুহারা ফ্রাকশন। এইভাবে সাপ্তাহিকের সর্বাধিক প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) বাস্তুহারা জীবনের বাস্তবচিত্র সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হইলেই তাহা জনপ্রিয় হইতে পারে। সেইজন্য প্রত্যেক বাস্তুহারা কর্মীকে বিস্তৃত বা বাস্তব রিপোর্ট সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে হইবে।

(৩) গঠনমূলক সমালোচনা এবং আত্মসমালোচনা ভিন্ন পত্রিকার মান কখনোই উচ্চ হইতে পারে না; সেইজন্য প্রত্যেক পত্রিকা পাঠক, বিক্রেতা এবং কর্মীর সমালোচনা কর্মীদেরই সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে হইবে।

(৪) পত্রিকাটিকে বাঁচাইতে অর্থ সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন বাস্তুহারা, পার্টি সেল

এবং কর্মীদিগকে "বাস্তুহারা পত্রিকা ফাণ্ড"-এর কোটা লইয়া অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। নিজেদের প্রচেষ্টায় এবং পত্রিকা পরিচালক বা সম্পাদকমণ্ডলীর সহযোগিতায় বিভিন্ন উপায়ে অর্থসংগ্রহ করিয়া পত্রিকা তহবিলে পাঠাইতে হইবে।

(৫) একদিকে যেমন (অস্থায়ী) প্রাদেশিক বাস্তুহারা ফ্রাকশন আন্দোলনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পত্রিকাটি সুষ্ঠভাবে পরিচালনার ব্যাপারে আন্দোলনের নীতি ও কার্যধারা সম্পর্কে মতামত দিয়া সাহায্য করিবে; অপর দিকে তেমনি প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি Agit-Prop (প্রচার ও প্রকাশন) বিভাগকে এই পত্রিকা পরিচালনার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করিতে অবিলম্বে অগ্রসর হইতে হইবে। নীচে থেকে উপরে পর্যন্ত সমস্ত পার্টি কমিটি ও পার্টি সভ্যরা সকলে মিলিয়া এই কাজে উদ্যোগী হইলে পত্রিকাটি জনপ্রিয় হইতে বাধ্য।

কাজেই হয়তো আমরা পত্রিকা সংক্রান্ত দায়িত্ব এবং কর্তব্য সুসংবদ্ধভাবে করিয়া উঠিতে পারিব না। কিন্তু এই লক্ষ্যে তাড়াতাড়ি পৌঁছিব। ইহা স্থির করিয়া আসুন আমরা সকল শক্তি লইয়া অগ্রসর হই।

১২ নভেম্বর ১৯৫০ বিপ্লবী অভিনন্দনসহ

খ) আগামী বাস্তুহারা প্রতিনিধি সম্মেলন ও আমাদের কাজ

পশ্চিম বাংলার সমস্ত বাস্তুহারাকে একই সংগঠনে সংগঠিত করিবার জন্যই বাস্তুহারা কর্মপরিষদ গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ভুল নীতি ও কৌশলের জন্য তাহা কার্যকরী করা যায় নাই। ব্যাপকতম ভিত্তিতে একটি ঐক্যবদ্ধ বাস্তুহারা সংগঠন গড়িয়া তোলা বাস্তুহারা কর্মপরিষদের মধ্য দিয়া সম্ভব হইল না। এই উদ্দেশ্যে বাস্তুহারা কর্মপরিষদের প্রধান উদ্যোগে এবং ৭টি বিভিন্ন প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল, বহু বাস্তুহারা ও রিলিফ প্রতিষ্ঠান এবং অনেক বাস্তুহারা ক্যাম্প-কলোনীর প্রতিনিধির সমবেত প্রচেষ্টায় সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার গণভিত্তি আরও ব্যাপক এবং সমাবেশ করার ক্ষমতাও কর্মপরিষদের তুলনায় অনেক বেশি। সুতরাং একই প্রকার গণ আন্দোলনে একই রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক নীতি লইয়া পৃথক দুইটি প্রাদেশিক সংগঠন থাকিলে ঐক্য অপেক্ষা বিভেদ বাড়িবার সম্ভাবনা ও কারণ বর্তমান থাকিয়া যাইবে। তাই আমাদের লক্ষ্য হইবে বাস্তুহারা কর্মী ও সাধারণ বাস্তুহারার চেতনার স্তর উন্নত করিয়া ঐক্যের আহ্বানে বাস্তুহারা কর্মপরিষদকে সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের সহিত মিলাইয়া দেওয়া। ইহার ফলে সমস্ত পশ্চিমবাংলার বাস্তুহারাদিগকে একটিমাত্র সংগঠনে সুসংগঠিত করা যাইবে।

এই উদ্দেশ্য লইয়া আমরা গত নভেম্বর মাসের ১৮ই ও ১৯শে বাস্তুহারা কর্মপরিষদের বাৎসরিক সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলাম কিন্তু ১৮ই তারিখে প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন শতকরা ৯৫ ভাগ প্রতিনিধি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। বাস্তুহারা আন্দোলনের বিভেদপন্থীরা—মৃণাল খাস্তগীর ও সৌরেন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া কর্মপরিষদের মধ্যে তাহাদের দলগত প্রাধান্য বিস্তার করিবার জন্য এক প্রকার জোর করিয়া সম্মেলন চালাইতে থাকে। ঘন্টা দুই সম্মেলন চলিবার পর অন্য সকলে সম্মেলন বন্ধ করার জন্য দাবি উঠায়। তখন সভাপতি সম্মেলন স্থগিত রাখেন এবং অন্যান্য

ডেলিগেটসহ সভাকক্ষ পরিত্যাগ করেন। ইহা সত্ত্বেও ভেদপন্থীরা সম্মেলন চালাইয়া যায় এবং তাহাদের সুবিধামত একটি কমিটি তৈয়ারি করে—সাথে সাথে কর্মপরিষদের কাগজপত্র চুরি করিয়া সরিয়া পড়ে। ইহা সত্ত্বেও আমরা তাহাদিগকে সংযুক্ত কেন্দ্রীয় পরিষদের সহিত মিলিত হইবার জন্য আহ্বান জানাই। কিন্তু তাহারা প্রত্যাখ্যান করে এবং ঐ সংগঠনটিকে সংযুক্ত কেন্দ্রীয়ের পাল্টা সংগঠন হিসাবে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিতেছে।

পরে কর্মপরিষদের সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির অধিকাংশ সভ্য বাস্তুহারা আন্দোলনের একতার জন্য আগামী ২৩শে ডিসেম্বর মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে প্রতিনিধি সম্মেলন ও ২৪শে তারিখে প্রকাশ্য অধিবেশন আহ্বান করিয়াছেন। এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে—বাস্তুহারাদিগের উপযুক্ত পুনর্বসতি, খাদ্য, কলোনী স্বীকার, ভোটাধিকার ইত্যাদি দাবি লইয়া আন্দোলন জোরদার ও সুসংগঠিত করিবার জন্য, বাস্তুহারাদিগের একতা দৃঢ় করার জন্য সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের সহিত মিলিত হওয়া এবং সেইসাথে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিদের চক্রান্ত ও ভেদপন্থীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করা।

আগামী ২৩শে তারিখ কর্মপরিষদ সম্মেলনের এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য আমাদিগকে বেশি সংখ্যায় অংশগ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে দোদুল্যমান চিত্তের লোকেরা আমাদের শক্তি ও কৌশলে আকৃষ্ট হইয়া ঐক্যের আহ্বানে সাড়া দেন।

এইজন্য আমাদের পার্টির প্রত্যেকটি বাস্তুহারা ইউনিট, সভ্য ও দরদীদের নিকট আবেদন তাহার যেন এখন হইতেই উল্লিখিত বিষয়ের উপর বাস্তুহারাগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচারকার্যে লাগিয়া যান—সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সহিত নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করুন ও অর্থ সাহায্য করুন। নিজেরা প্রতিনিধি হউন এবং স্থানীয় বাস্তুহারাদিগের আস্থাভাজন লোকদিগকে প্রতিনিধি করিয়া পাঠান, সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে আপনার এলাকার সকল বাস্তুহারা লইয়া (সম্ভব হইলে শোভাযাত্রা করিয়া) যোগদান করুন এবং ব্যাপক সমাবেশে পরিণত করুন। বাস্তুহারাদের দাবির ও একতার আন্দোলনকে জয়যুক্ত করুন।

৪ ডিসেম্বর ১৯৫০ বিপ্লবী অভিনন্দনসহ

গ) বাস্তুহারাদিগের সেবার জন্য প্রত্যেক কলোনীতে রিলিফ কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন করুন।

যে-সকল বাস্তুহারা কলোনীতে নিয়মিতভাবে রিলিফ স্কোয়াড যায় সেই সকল কলোনীর বাস্তুহারাদিগের সেবার কাজ চালাইতে গেলে স্থানীয় রিলিফ কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন করা একান্ত প্রয়োজন। স্কোয়াডগুলি সাধারণত সপ্তাহে একবার বা দুইবার যায় সেজন্য এই স্কোয়াডে অন্তর্বর্তীকালে তাহারা সেবার কাজকে চালাইয়া যাইতে পারিবে। এই স্বেচ্ছাসেবকদল ও রিলিফ কমিটিকে ক্রমে ক্রমে কলোনীর স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থায় ও রোগীর সেবায় দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

যে সকল কলোনীতে রিলিফ স্কোয়াড যায় না সেই সকল কলোনীতে এই প্রকার রিলিফ কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবকদল তৈয়ারি করা আরও বেশি প্রয়োজন। তবে যে কলোনীগুলিতে রিলিফ স্কোয়াড যায় সেই কলোনীগুলিতে সেই স্কোয়াডকে কেন্দ্র করিয়া ও স্থানীয় কলোনী কমিটির সাহায্য লইয়া এই প্রকার রিলিফ সংগঠন গড়িয়া তোলা সুবিধাজনক হইবে।

এই সকল স্বেচ্ছাসেবকদিগের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা উভয়েই থাকা প্রয়োজন। মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা মহিলা রোগী পরীক্ষা করিবার সময় ও সেবার কাজে বিশেষ প্রয়োজন।

এই সকল স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ হইবে যে-সকল অসুস্থ রোগীর দেখিবার শুনিবার কেহই নাই তাহাদের অসুস্থতার সংবাদ ডাক্তারের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া ডাক্তারকে ডাকিয়া আনা বা গুরুতর হইলে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা,—ঔষধপত্র পৌঁছাইয়া দেওয়া বা সংগ্রহ করা, কলোনীর লোকদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে নজর দেওয়া, কেহ সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে তাহা যাহাতে কলোনীব্যাপী ছড়াইয়া না পড়ে তাহার জন্য উপযুক্ত প্রতিষেধক ব্যবস্থা করা। পানীয় জলের বিশুদ্ধতার দিকে নজর রাখা,—কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড ইত্যাদির প্রতিষেধক টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হইয়া অনেক বাস্তুহারাকে অকালে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচানো যাইতে পারে। এই বৎসর বাস্তুহারাদিগের মধ্য হইতেই সব থেকে বেশি সংখ্যক লোক মহামারিতে মারা গিয়াছে।

স্থানীয় রিলিফ আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে বা স্থানীয় সৎ চিকিৎসকের সহযোগিতা গ্রহণ করিতে, উপযুক্ত রিলিফ আদায় করিবার জন্য সরকার ও রিলিফ কর্তৃপক্ষের উপর চাপ দিতে এবং আংশিকভাবে হইলেও রিলিফের কাজকে স্বাবলম্বী ভিত্তিতে দাঁড় করাইতে এই রিলিফ কমিটিগুলি যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিবে।

আর্থিক দিক হইতে স্বাবলম্বী হইবার জন্য এই রিলিফ কমিটি বিভিন্ন উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে—কলোনীবাসীদের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিতে হইবে, বিশেষ করিয়া প্রতি সক্ষম অসুস্থ রোগীর নিকট হইতে সামান্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে হইবে যাহাতে রিলিফ স্কোয়াড উঠিয়া গেলে তাহারা নিজেরাই মোটামুটিভাবে চালাইয়া লইতে পারেন।

এই রিলিফ কমিটি গঠন ও স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন করার প্রধান দায়িত্ব কলোনীর কর্মীদিগের লইতে হইবে। অবশ্য, রিলিফ স্কোয়াডের কর্মীদিগকে এই বিষয়ে সাধ্যমত সাহায্য করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে প্রাথমিক চিকিৎসা বা স্বাস্থ্যরক্ষাবিধি শিখাইতে হইবে। আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে এইভাবে বাস্তুহারা জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সেবার কাজের ভিতর দিয়া আমরা বাস্তুহারা জীবনের সহিত সব থেকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারি—যাহার মধ্য দিয়া আমরা তাহাদের চেতনার স্তর বুঝিতে পারি এবং বাস্তুহারা সমস্যার সমাধানের আন্দোলনকে সঠিক পথ ধরিয়া আরও উন্নততর পর্যায়ে লইয়া যাইতে পারি।

১০ ডিসেম্বর ১৯৫০

বিপ্লবী অভিনন্দনসহ
প্রাদেশিক বাস্তুহারা কেন্দ্র
পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

সহায়ক তথ্য - ১৭

বাংলায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর চক্রান্ত থেকে

সংখ্যালঘুদের বাঁচার পথ

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি

দাম—দুই পয়সা

১৪ই মার্চ্চ, ১৯৫০

বাংলায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর চক্রান্ত থেকে সংখ্যালঘুদের বাঁচার পথ

জানুয়ারি মাসে কলম্বোতে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ-এর সম্মেলন হল, আর তারপর একমাস যেতে না যেতেই বাংলাদেশে লেগে গেল হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা।

এই কলম্বো সম্মেলনেই জওহরলাল নেহরু এবং লিয়াকত আলি খাঁ যথাক্রমে ভারত এবং পাকিস্তানকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতর পাকাপাকিভাবে বেঁধে এসেছেন, বেভিনের কাছে শপথ করে এসেছেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশে অক্ষুণ্ণ থাকবে।

ভারতীয় ইউনিয়ন এবং পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর সমস্যা এবং মুদ্রানীতি হ্রাস নিয়ে তার আগে থেকেই বিরোধ চলছিল, সে বিরোধের কোন মীমাংসা কলম্বোতে হয়নি, কিন্তু ইংলন্ডের সঙ্গে ভারত এবং পাকিস্তান যে কোন বিরোধ চালাবে না সে মীমাংসা হয়ে গেছে।

ভারতের ইতিহাসে বহুবার দেখা গেছে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে কংগ্রেস এবং লীগের যখনই একটা রফা হয় তখনই একবার করে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধে। এবারেও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

পূর্ববঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘিষ্ঠদের নির্যাতন হল কলম্বো সাম্রাজ্য সম্মেলনের প্রত্যক্ষ ফল। নেহরু এবং নাজিমুদ্দিন উভয়েই যে পাক-ভারত বিরোধকে কাশ্মীর সমস্যার সঙ্গে যুক্ত করেছেন এটা খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ।

কলম্বো সম্মেলনে কি আলোচনা হয়েছে এবং কি সিদ্ধান্ত হয়েছে সে কথা সরকারি কর্তারা গোপন রেখেছেন। কিন্তু একটি কথা তারা কিছুতেই গোপন করতে পারেননি—সে কথাটা হল এই যে—

"দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম দমন করার জন্য ভারতে এবং পাকিস্তানে ইংরেজ ও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের সামরিক শক্তি মজবুত করতে হবে।"

এই মূল বিষয়ে নেহরু এবং লিয়াকত যখনই রাজি হয়ে এসেছেন তখনই সাম্রাজ্যবাদীদের 'ভানুমতীর খেল' শুরু হয়েছে এবং তারই ফলাফল ভোগ করছে পূর্ববঙ্গের হতভাগ্য হিন্দুরা এবং পশ্চিমবঙ্গের হতভাগ্য মুসলমানেরা।

ঘটনাবলীর এই যোগসূত্র যাতে সহজে স্মরণে আসে সে জন্য শুধু একটি বিবরণ মনে করিয়ে দিয়ে আরম্ভ করতে চাই।

১৯৪৬-৪৭ সালে তৎকালীন ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন যখন কংগ্রেস এবং লীগকে দিয়ে ভারত বিভাগ মানিয়ে নিচ্ছিল তখনই বেধে উঠল মারাত্মক দাঙ্গা। দাঙ্গা ছাড়া ভারতের স্বাধীনতাকামী জনসাধারণকে দিয়ে ভারত বিভাগ কিছুতেই বরদাস্ত করানো যেতো না, তাই সাম্রাজ্যবাদীর হিন্দু-মুসলমান অনুচরেরা তখন দাঙ্গা বাধিয়েছিল।

ভারত বিভাগ হয়ে গেল বটে কিন্তু তবু ইংরেজ সৈন্য অপসারণ করতে হয়েছে ভারত এবং পাকিস্তান থেকে। তার কারণ প্রধানত দুটি—প্রথমত, সারা ভারতের এবং পাকিস্তানের জনসাধারণ জাতীয় স্বাধীনতার জন্য এত উদ্বুদ্ধ যে ইংরেজ সৈন্য অপসারিত না করলে একথা বোঝানই যাবে না যে ভারত এবং পাকিস্তান স্বাধীন হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত ইউনিয়ন

এবং অন্যান্য গণরাষ্ট্রীয় দেশের প্রতিনিধিগণ ইংরেজদের ওপর প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছিলেন সমস্ত পরাধীন দেশ থেকে ইংরেজ সৈন্য অপসারণ করার জন্য।

বাধ্য হয়েই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এদেশ থেকে ইংরেজ সৈন্য সরিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু তার পর থেকে তাদের ক্রমাগত অভিসন্ধি চলছে কি করে আবার এদেশে ইংরেজ সৈন্য মোতায়েন করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যায়।

এই উদ্দেশ্য নিয়েই কাশ্মীরে পাকিস্তানী হানাদার পাঠিয়ে তারা একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছে। কলম্বো সম্মেলনে কাশ্মীর সংকট উপলক্ষ করে বাংলায় আর একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করার ষড়যন্ত্র হয়েছে।

কলম্বো সম্মেলনের গুপ্ত বিবরণ যদি প্রকাশ করা হত তা হলে জনসাধারণ আগেই বুঝতে পারতেন যে বাংলায় শীঘ্রই দাঙ্গা বাধবে।

এখন দেখা যাক কিভাবে এই ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা সকলেই স্বীকার করে থাকেন যে কলম্বো সম্মেলনে বেভিন, নেহরু এবং লিয়াকত নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে একমত হয়েছেন :—

(১) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কমিউনিজম দমন করতে হবে—অর্থাৎ ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলিকে বাঁচাতে হবে।

(২) ভারত এবং পাকিস্তান উভয়কেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকতে হবে।

(৩) ভারত এবং পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটিতে চাহিদামত ইঙ্গ-আমেরিকান সামরিক বাহিনীর দখল দিতে হবে।

(৪) ভারত এবং পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক সংগ্রামগুলিকে প্রাণপনে দমন করতে হবে।

(৫) উল্লিখিত চারটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রেখে ভারত এবং পাকিস্তানের সরকার একের বিরুদ্ধে অপরের দাবি-দাওয়া নিজেরা নিজেরা যা পারে তা আদায় করবে।

এই পাঁচটি পয়েন্টে একমত হবার পর ইঙ্গ-আমেরিকান সরকারের প্রতিনিধিরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করল যে কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতের দাবি মানা হবে না, কাশ্মীরের উত্তর অঞ্চলে হানাদারদের রাজত্ব একরকম মেনে নিতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাকিস্তানের সমগ্র বাহিনীর কুচকাওয়াজ আবার নূতন করে আরম্ভ হল।

এক্ষেত্রে নেহরু সরকারের পক্ষে একটি পথ খোলা ছিল। সে পথ হল কাশ্মীর সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিসংঘে ইঙ্গ-আমেরিকানদের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে দাবি করা যে, কাশ্মীর সীমান্তে যে কটি রাষ্ট্র আছে তাদের প্রতিনিধিদের সম্মিলিত তত্ত্বাবধানে কাশ্মীর সমস্যার মীমাংসা হোক। কিন্তু কলম্বো সম্মেলনে নেহরু সরকার বেভিনের কাছে যে দাসখত নূতন করে লিখে দিয়ে এসেছেন তারপর সে দাবি করা নেহরুর পক্ষে অসম্ভব। কারণ, কাশ্মীরের সীমান্তে রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনের গণরাষ্ট্র। এই দুই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই নেহরু সরকার ইঙ্গ-আমেরিকান যুদ্ধব্যবস্থায় সহযোগিতা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

কাশ্মীর সম্পর্কে ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের মনোভাব অনমনীয়, কারণ সোভিয়েত রাশিয়া এবং গণতান্ত্রিক চীনের সীমান্তে কাশ্মীর অবস্থিত, পাকিস্তানী হানাদাররা সেখানে ইঙ্গ-আমেরিকান যুদ্ধযন্ত্রের শিখণ্ডী মাত্র।

নেহরু সরকার কলম্বো সম্মেলনে ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে যে কাশ্মীরের স্বাধীনতা আদায় করতে সাহস করেননি তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, কারণ ইংরেজ সম্রাটই ভারতীয় "রিপাবলিকের" অধিপতি।

এ কথা বুঝতে কষ্ট হয় না যে কলম্বো থেকে নেহরু বেশ বুঝে এসেছেন যে কাশ্মীর ছেড়ে দিতে হবে, কিন্তু সে কথা ভারতীয় জনগণের সামনে তিনি খুলে বলতে সাহস করেন নি। নেহরু ভারতীয় জনমতের চাপে, কাশ্মীরের সাম্রাজ্যবাদী সমাধান মেনে নিতে পারবে না বলেই সাম্রাজ্যবাদীরা পূর্ববঙ্গে লীগের চাপ সৃষ্টি করে সারা ভারতীয় জনমত বাংলার দিকে নেবার ব্যবস্থা করে রেখেছিল।

ভারত বিভাগের সময় মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেস নেতাদের বুঝিয়ে দিয়েছিল যে ভারত বিভাগ মানতেই হবে, বরং বাংলাদেশে যা রাখতে চাও তাই রাখতে পার। ইঙ্গিতটা বুঝেই লীগ সরকার তখন বাংলাদেশে জোর সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সৃষ্টি করল যাতে বাংলার যতটা সম্ভব ততটা পাকিস্তানের মধ্যে রাখা যায়। এবারেও বেভিন নেহরুকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে কাশ্মীর দিতে হবে, অন্তত উত্তর কাশ্মীর, তবে বাংলাদেশে যা পার কিছু করতে পার। এবারেও এই ইঙ্গিত বুঝে নাজিমুদ্দিন আগেভাগেই পূর্ববঙ্গ সফরে গেলেন, প্যাটেল এলেন পশ্চিমবঙ্গে। বাংলার দুই অঞ্চলে চাপ এবং প্রতিচাপের আয়োজন চলল।

এদিকে তখন, পূর্ববঙ্গে কৃষক আন্দোলনের উপর পাকিস্তান সরকারের নির্যাতন চলছিল। লীগ সরকার খুলনা এবং রাজশাহীতে আনসার বাহিনী লেলিয়ে দিল বাগেরহাটের ব্যাপক অঞ্চলে কৃষক জনতার ওপর। উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গে বাস্তুহারার চাপ সৃষ্টি করা।

এটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে খুলনা জেলার শোভনায় এবং ময়মনসিংহের হাজং পল্লীতে লীগ সরকার অনুরূপ অত্যাচার গত দুবছর ধরে করে আসছে। তা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী বিধান রায়কে লীগ সরকারের বিরুদ্ধে কোন দিন বিবৃতি দিতে দেখেনি। বরং দেখেছে কমিউনিস্ট দমনে পরস্পরকে সাহায্য করতে। এবার বিধান রায়ের বিবৃতি বেরুলো লীগ সরকারের বিরুদ্ধে এবং তার পরমুহূর্তেই কলকাতার মুসলিম বস্তীতে বোমা ফাটলো এবং আগুন জ্বললো। এটা যে একেবারে সাজানো ব্যাপার তা বুঝতে কষ্ট হয় না। কাশ্মীরে পাকিস্তানী চাপের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুস্থানী চাপই এর উদ্দেশ্য।

কিন্তু এই চাপাচাপির ব্যাপারে পাকিস্তানের লীগ সরকারও হটবার পাত্র নয়। লীগ গুণ্ডারা এর নির্মম প্রতিশোধ নিল ঢাকায়, বরিশালে এবং অন্যত্র নিরপরাধ এবং অসহায় সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদের ওপর নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার করে। সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিশোধের প্রতিশোধ নেবার পাল্লা লেগে গেল ভারতীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলে।

এই সুপরিকল্পিত আবহাওয়ার মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর সমস্যার আলোচনা চলেছে। ইংলণ্ড এবং আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী কাগজগুলো সুযোগ বুঝে সুর তুলেছে ভারত এবং পাকিস্তানের এই সংঘর্ষ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার দিক থেকে অবাঞ্ছনীয়।

নেহরু দেখলেন যে এই সুযোগে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জোর একটা হুমকি দিলে হয়ত কিছু কাজ হতে পারে। ভারতীয় ইউনিয়নের জনসাধারণও হয়ত তাতে খুশি হবে। তাই তিনি বাংলার দাঙ্গা সম্বন্ধে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য যুক্ত কমিটির দাবি জানিয়ে ঘোষণা করলেন যে পাকিস্তান সরকার যদি এই প্রস্তাব গ্রহণ না করে তবে "অন্য ব্যবস্থা" অবলম্বন করা হবে।

কিন্তু পাকিস্তানী সরকার তাতে দমবার পাত্র নয়। দাঙ্গা সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য বাংলার উভয় অঞ্চলে যুক্তকমিটি গঠনের প্রস্তাব পাকিস্তানী সরকার প্রত্যাখ্যান করল। তার কারণ প্রধানত দুটি, প্রথমত, তথ্য অনুসন্ধানের ফলে পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের ঘটনাবলী বিশ্বের সম্মুখে প্রকাশিত হয়ে পড়বে। দ্বিতীয়ত, কাশ্মীর হাতে না পাওয়া পর্য্যন্ত মিটমাট তার উদ্দেশ্য নয়।

কিন্তু নেহরু সরকার তার বেওকুফী ঢেকে রাখতে অক্ষম। লিয়াকত সেই পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিকে লক্ষ্য করে জানিয়ে দিলেন যে নেহরু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ভয় দেখাচ্ছে; সঙ্গে সঙ্গে নেহরুও জানিয়েদিলেন—না, আমি ত যুদ্ধের ভয় দেখাইনি, "অন্য ব্যবস্থা" মানে আমি শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থার কথাই বলেছি।

এই কৈফিয়ৎ দেবার আবশ্যকতা হল কেন? কারণ ইংরেজ সরকার নেহরুকে এখনও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার আদেশ কিংবা অনুমতি দেয় নি। কাশ্মীরের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী সৈন্য আক্রমণ আরম্ভ করেছিল ইংরেজ সরকারের আদেশে। তারই আদেশে নেহরু সরকার কাশ্মীরের অনেকখানি অঞ্চল থেকে সৈন্য সরিয়ে এনে নিরাপত্তা পরিষদেব দ্বারস্থ হয়েছে। তারই আদেশে কিংবা অনুমতিক্রমে নেহরু সরকারের সৈন্য বাহিনী হায়দ্রাবাদে প্রবেশ করেছিল। ভারতীয় সৈন্য যদি পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করে তবে তাও ইংরেজ সরকারের আদেশ কিংবা অনুমতি পেলে করবে। তা এখনও পাওয়া যায়নি তাই নেহরু তাড়াতাড়ি ঢোক গিলে বলেছে, যে "অন্য ব্যবস্থা" মানে আমি শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থার কথাই বলেছি। এই সূত্রে পাঠকবর্গ স্মরণ রাখবেন যে ইংরেজ সরকারের পরামর্শবাহিকা খ্যাতনাম্নী লেডি মাউণ্টব্যাটেন এই মুহূর্তে নেহরুর অতিথি।

ইংরেজ সরকারের পরামর্শটা কি তা অনুমান করা অসম্ভব নয়। সম্ভবত নেহরুকে তাদের উপদেশ হল এই যে ভারতীয় ইউনিয়ন দাবি করুক পূর্ববঙ্গকে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্গত করা, আর লিয়াকতকে তাদের উপদেশ এই যে পাকিস্তান বাংলার সমস্যা নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থিত করুক। ভারতীয় ইউনিয়নের দাবিটা স্বর্গীয় শরৎ বসুর বিবৃতি আকারে নেশন পত্রিকার মারফৎ স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, পাকিস্তানের দাবিটা উপস্থাপিত হয়েছে ছোরওয়ার্দি সাহেবের বিবৃতি মারফৎ। এটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে উভয়ক্ষেত্রেই এই দাবি দুটো প্রথম প্রকাশ পেয়েছে "বামপন্থী" দুজন নেতার মুখ দিয়ে। কারণ দায়িত্বহীন দাবি "দায়িত্বশীল"দের মুখ দিয়ে হঠাৎ বের হয় না, তাঁরা প্রথমটা অন্যদের দিয়ে চালিয়ে তার প্রতিক্রিয়া যাচাই করে নেন।

সাম্রাজ্যবাদীরা এখন এমনভাবে জালটা ফেঁদেছে যে কার্য্যসিদ্ধির নানারকম পথ খোলা রইলো। তার ভেতর একটি পথ স্বভাবতই এই হতে পারে :—

কাশ্মীর এবং বাংলা দুটোই ভারত এবং পাকিস্তানের বিরোধ বাড়িয়ে তুলছে এই অজুহাতে এই দুই উপদ্রুত অঞ্চলে মধ্যস্থতার নামে ইংরেজ সৈন্য মোতায়েন করা। অন্ততপক্ষে তার ক্ষেত্র যথেষ্ট প্রস্তুত করে রাখা।

এই মতলব হাসিল করবার জন্য প্রথম কৌশল হল দাঙ্গা চালানো। হিন্দুস্থানে রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ এবং পাকিস্তানে আনসার বাহিনী এ কাজে সিদ্ধহস্ত এবং ব্রিটিশ সামরিক বিভাগের ইঙ্গিত অনুসারেই তারা চালিত হয়ে থাকে। এতে যদি সমস্যার মীমাংসা না হয় তবে

নেহরু সরকার আদিষ্ট হবে পূর্ববঙ্গে সৈন্য পাঠাবার জন্য এবং তারপর কিছুদিন যাবত কাশ্মীর ঘটনাবলীর পুনরাভিনয় হবে বাংলাদেশে।

ভারত বিভাগের ফলাফল এমনি করেই উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। ভারত এবং পাকিস্তান যে এখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনস্থ উপনিবেশ এমনি করেই তা জনগণের চোখে ধরা দিচ্ছে। ভারত সরকার এবং পাকিস্তান সরকার যে ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরই ক্রীতদাস এমনি করেই তা প্রকাশ পাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদীদের এই হিংসা-যজ্ঞে মারা পড়ছে ভারত এবং পাকিস্তানের সংখ্যালঘিষ্ঠগণ।

ঘটনাবলীর এই বিবরণ থেকে কয়েকটি সরল সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে ঃ—

(১) ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অধীনে আছে বলেই ভারত এবং পাকিস্তান সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ-ষড়যন্ত্রের লীলাক্ষেত্র হয়ে রয়েছে। স্বাধীন ভারত এবং স্বাধীন পাকিস্তান ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীর যুদ্ধ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে তাদের দাঙ্গার-ষড়যন্ত্রও ফেঁসে যেত।

(২) ভারত সরকার সোভিয়েত-বিরোধী যুদ্ধ-ষড়যন্ত্রের অংশীদার বলেই কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে সোভিয়েত-ভারত সহযোগিতার পথ গ্রহণ করতে অক্ষম। পাকিস্তান সরকারও ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীর ইঙ্গিতে উত্তর কাশ্মীরে হানাদার বসিয়ে রেখেছে। তারই ফলে উভয় বঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠরা আজ বিপন্ন।

(৩) ভারতের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম দমন করার জন্য ভারত সরকার দাঙ্গাবাজ রাষ্ট্রীয় সেবকসংঘকে পুষছে আর অনুরূপ কারণে পাকিস্তান সরকার পুষছে আনসার বাহিনী। এই দুটি দাঙ্গাবাজ দল দমন করতে পারে এমন স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বন্ধ হয়ে যাবে।

(৪) ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীর তাঁবেদার সরকার দুটি যথাক্রমে ভারতে এবং পাকিস্তানে সমগ্র জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার ধ্বংস করে এমন অবস্থা করে রেখেছে যে জনসাধারণের কাছে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের গুপ্ত তথ্য প্রকাশ করার পথ বাধা প্রাপ্ত। কমিউনিস্ট পার্টি গণতান্ত্রিক অভিযান চালাবার অধিকার থেকে বঞ্চিত কিন্তু এপারে রাষ্ট্র সেবক সংঘ এবং ওপারে আনসার বাহিনী এই দুটি ফ্যাসিস্ট প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ব্যক্তি-স্বাধীনতা উপভোগ করছে সংখ্যালঘিষ্ঠদের নির্যাতন করবার।

(৫) ভারত বিভাগ মেনে নিয়ে কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের পুতুল হয়েছে, এখন সাম্রাজ্যবাদীরা ভারত বিভাগের সুযোগ নিয়ে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ বাড়িয়ে চলেছে এক ডোমিনিয়নের সরকারকে অপর ডোমিনিয়নের বিরুদ্ধে ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহার করে। তাই কোন ডোমিনিয়নেই সংখ্যালঘিষ্ঠদের নিরাপত্তা ও শান্তি নেই।

প্রকৃত স্বাধীনতা, শান্তি এবং গণতন্ত্রের জন্য জনগণের ঐক্য ও সংগ্রামই উভয় ডোমিনিয়নের সংখ্যালঘুদের শান্তি এবং নিরাপত্তার একমাত্র পথ।

যাঁরা বিশ্বাস করেন যে সংখ্যালঘুদের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য দাঙ্গা করা মানবতার বিরুদ্ধে একটি জঘন্য অপরাধ, তাঁদের অগ্রসর হতে হবে প্রকৃত স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের সংগ্রামে। নতুবা মানবতার প্রতি তাঁদের প্রীতি সংখ্যালঘুদের কোন সাহায্যে আসবে না।

কমিউনিস্ট ও অন্যান্য গণতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা আইন এবং রাষ্ট্র সেবক সংঘ ও আনসার বাহিনীর জন্য ব্যক্তি-স্বাধীনতা যাঁরা বরদাস্ত করেছেন তাঁরা সকলেই সংখ্যালঘুদের

ওপর গুণ্ডার হামলার জন্য নৈতিক দায়িত্ব বহনকারী। তাঁরা সকলেই জানেন যে পূর্ববঙ্গের মুসলিম জনসাধারণ এবং পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু জনসাধারণ সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার করছে না, অত্যাচার করছে ওধারে আনসার বাহিনী এবং এধারে রাষ্ট্র সেবক সংঘ।

যে সরকার শ্রমিকের ধর্মঘট ভাঙ্গতে ওস্তাদ সেই সরকারই আবার সাম্প্রদায়িক হিংসা দমন করতে অক্ষম। এ থেকেই বুঝতে হবে যে সরকারি ইঙ্গিত না থাকলে দাঙ্গা হয় না। লীগ সরকার বলে যে কংগ্রেসী সরকার দাঙ্গার উস্কানি দিচ্ছে আর কংগ্রেসী সরকার বলে যে লীগ সরকার দাঙ্গার উস্কানি দিচ্ছে, আসলে উভয় সরকারই দাঙ্গার উস্কানিদাতা এবং সাম্রাজ্যবাদীর হাতের ক্রীড়নক। পুলিশের পাহারাধীনেই ওধারে আনসার বাহিনী এবং এধারে রাষ্ট্র সেবক সংঘ সংখ্যালঘুদের পীড়ন করছে।

যারা বিশ্বাস করেন যে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধান তাঁদের স্বদেশপ্রেমিক কর্তব্য, তাঁদের এগিয়ে আসতে হবে—প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদের শিখণ্ডী সরকারের বিরুদ্ধে। তাঁদের দাবি করতে হবে কমিউনিস্ট ও অন্যান্য গণতন্ত্রীদের জন্য পরিপূর্ণ ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা। নতুবা তাঁদের মৌখিক স্বদেশপ্রীতি সংখ্যালঘুদের প্রতি ভণ্ডামিতে পরিণত হবে।

এটা সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র এবং অন্যান্য জনসাধারণ দাঙ্গার মধ্যে অংশগ্রহণ করেন না। কারণ তাঁদের এ চেতনা আছে যে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, বাঙ্গালী-বিহারী দাঙ্গা প্রভৃতি নানাবিধ আত্মঘাতী দাঙ্গায় তাঁরা যদি জড়িত হন তা হলে সাম্রাজ্যবাদীর দালাল এবং জনগণের শোষক বড় বড় ধনিক পুঁজিপতি ও জমিদারেরা দাঙ্গার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করবে। তারা এই সুযোগে জনসাধারণের জীবিকা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবে।

জনসাধারণ আগেই এই দাঙ্গার আবহাওয়া থেকে নিষ্কৃতি এবং শান্তি চান। এক ডোমিনিয়নে যখন সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার হয় তখন অপর ডোমিনিয়নের সর্বসাধারণ বিচলিত হয়ে ওঠেন এবং প্রতিকারের রাস্তা খোঁজেন।

কিন্তু প্রতিকারের রাস্তা কি? নেহরুর বিবৃতির ফলে ভারতীয় ইউনিয়নের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের মধ্যে এমন একটা মত দেখা গিয়েছে যে নেহরু সরকার সৈন্য নিয়ে পূর্ববঙ্গ দখল করলে সেখানকার হিন্দু সংখ্যালঘিষ্ঠরা বাঁচতে পারেন। কিন্তু ভারতের কংগ্রেসী সরকার এবং পাকিস্তানের লীগ সরকার যুদ্ধে নিযুক্ত হলে তার সমাধান কিভাবে হবে তার আভাস পাওয়া গেছে কাশ্মীরে। অর্থাৎ ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরাই মধ্যস্থ হিসেবে এসে জুড়ে বসবে। আর ঠিক সেই সুযোগ সৃষ্টি করার জন্যই তারা দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে সংঘর্ষ বাধাচ্ছে।

স্বভাবতই ভারতবাসীর মনে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের মনে প্রশ্ন জাগছে—তবে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের বাঁচবার পথ কি?

মনে রাখবেন যে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুরা সকলেই এক শ্রেণিভুক্ত নন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা বড় বড় জমিদার এবং ব্যবসায়ী তাঁদের বাঁচার পথ করে নিয়েছেন, সে পথ হল লীগ সরকারের প্রশস্তি গেয়ে কমিউনিস্ট দমনের নামে কৃষক দমনের ব্যবস্থা করা। তা বুঝতে পারবেন খুলনার জমিদার শৈলেন ঘোষের বিবৃতি থেকে, তা বুঝতে পারবেন বরিশালের

বিত্তশালী হিন্দু ভদ্রলোকের বিবৃতি থেকে।

স্বভাবতই মজুর, কৃষক এবং গরীব মধ্যবিত্তদের বাঁচবার প্রশ্নই প্রধান প্রশ্ন। হায়দ্রাবাদে যখন নিজামের রাজাকাররা তাদের মারত তখন তাদের প্রতিরোধ চালাতো কমিউনিস্ট পার্টি। তারপর তাদের বাঁচাবার নাম করে নেহরুর সৈন্য যখন হায়দ্রাবাদে ঢুকল তখন নেহরু রফা করল নিজামের সঙ্গে আর নেহরুর সৈন্য মারতে আরম্ভ করল কমিউনিস্ট পার্টিকে। হায়দ্রাবাদের সেই জনতা এখনও অত্যাচারিত হচ্ছে নেহরুর সৈন্যবাহিনী দ্বারা, আর তাদের প্রতিরোধ এখনও চালাচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি।

পূর্ববঙ্গেও সংখ্যালঘিষ্ঠদের বাঁচাবার উপায় লীগ সরকারের বিরুদ্ধে সেখানে জনতার প্রতিরোধ আর কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে এখানে জনতার প্রতিরোধ। সুতরাং কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে দাঁড়ান, তাকে বৈধ করার আন্দোলন দুর্বার করে তুলুন, তার সঙ্গে গণতান্ত্রিক প্রতিরোধের সংগ্রামে যোগ দিন। দাবি তুলুন—দাঙ্গাবাজ রাষ্ট্র সেবক সংঘ ভেঙ্গে দাও।

পূর্ব পাকিস্তানে লীগ সরকারের বিরুদ্ধে ও আনসার বাহিনীর বিরুদ্ধে মৈমনসিংহের হাজং অঞ্চলে, খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমায় এবং রাজশাহী জেলার নাচোল অঞ্চলে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কৃষক জনসাধারণ যে সংগ্রাম পরিচালনা করছে সেই সংগ্রামই দমন করতে গিয়েছিল লীগ সরকার। লীগ সরকারের এই দমননীতির বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের মুসলিম জনসাধারণের বিক্ষোভ আছে বলেই লীগ সরকার এই সংগ্রামকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে পরিণত করার জন্য আনসার বাহিনী লেলিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি এই সাম্প্রদায়িক চক্রান্তের মুখোশ খুলে ধরার জন্য মুসলিম জনগণের কাছে যে প্রচার চালাচ্ছিল তার সফলতা বাধাপ্রাপ্ত হল যখনই পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক গুণ্ডারা নিরপরাধ মুসলমানদের ওপর প্রতিশোধ নিতে আরম্ভ করল। তাদের এ কাজে পরোক্ষভাবে সহায়তা করল প্রধানমন্ত্রী বিধান রায়ের বিবৃতি। পূর্ববঙ্গের কৃষক সংগ্রামকে এবং তার ওপর লীগ সরকারের জঘন্য হামলাকে বিধান রায় ইচ্ছে করেই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বলে ঘোষণা করলেন কারণ তিনিও এরাজ্যে কৃষক সংগ্রাম অমনিভাবেই দমন করছেন। কৃষক বিদ্রোহের ফলে পূর্ববঙ্গে যদি লীগ সরকারের উচ্ছেদ ঘটে তাহলে পশ্চিমবঙ্গে বিধান রায়েরও তাতে বিপদ আছে, তাই জনগণের নজর সরাসরি সাম্প্রদায়িকতার দিকে ঠেলে দিয়ে পূর্ববঙ্গে কৃষক জনতার ঐক্য ভেঙ্গে দিয়েছেন, পূর্ববঙ্গে কমিউনিস্ট দমনে লীগ সরকারকে অপরিমিত সাহায্য দিয়ে বিধান রায় সেখানে সংখ্যালঘুদেরও সর্বনাশ বাড়িয়েই তুলেছেন।

পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের যাঁরা সত্যসত্যই বাঁচাতে চান তাঁরা দাবি তুলুন পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবিলম্বে পূর্ববঙ্গ থেকে গুপ্তচর বিভাগের সমস্ত সাহায্য তুলে নিতে, দাবি করুন পশ্চিমবঙ্গের কারাগার থেকে কমিউনিস্টদের মুক্তি এবং জনতার পরিপূর্ণ ব্যক্তি-স্বাধীনতা। পশ্চিমবঙ্গে ফ্যাসিস্ট শাসনই প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্তিশালী করছে। নেহরুর কাছে কৈফিয়ৎ দাবি করুন যে পশ্চিমবঙ্গের সরকার কেন লীগ সরকারকে পুলিশী সাহায্য দেয় পূর্ববঙ্গে প্রতিরোধের সংগ্রামী নেতা কমিউনিস্টদের দমনে। কমিউনিস্ট পার্টিই দুর্জয় করে তুলতে পারে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুদের সমান অধিকারের সংগ্রাম। গণতন্ত্রের এবং স্বাধীনতার অজেয় সংগ্রামই সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীলদের গদিচ্যুত করতে পারে।

ভারতীয় ইউনিয়নের পুলিশের সাহায্য ছাড়া পাকিস্তান সরকারের সাধ্য নেই পাকিস্তানের

কমিউনিস্ট পার্টিকে দমন করে, আর পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীন অধিকার পেলে হাজং পল্লীর মত অসংখ্য দুর্গে গড়ে উঠবে হিন্দু-মুসলিম মিলিত বাহিনীর প্রতিরোধ। হাজং পল্লীর পথই পাকিস্তানে সর্বসাধারণের মুক্তির এবং শান্তির পথ। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করে পাকিস্তানেও কমিউনিস্ট পার্টির বৈধতা অনিবার্য করে তুলুন।

কমনওয়েলথ-এর মালিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর আদর্শেই নেহরু সরকার পাকিস্তানের লীগ সরকারকে কমিউনিস্ট দমনে সাহায্য করে। এই কমনওয়েলথই হিন্দু-মুসলিম বিরোধ এবং পাক-ভারত বিরোধ সৃষ্টির কারখানা। ভেঙ্গে ফেলুন এই কারখানাটাকে, পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রাম সতেজ করুন, জোরদার করুন কংগ্রেসী সরকার সরিয়ে দিয়ে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ এই উভয়েরই স্থায়ী শান্তি এবং সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নির্ভর করে সারা বাংলায় একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গঠন করার ওপর, সে রাষ্ট্র হবে—বাংলার সমস্ত জনসাধারণের গণতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্র, সে রাষ্ট্র ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্গত হবে কিনা তা ঠিক হওয়া উচিত বাংলার সমস্ত জনসাধারণের গণভোট দ্বারা সে রাষ্ট্র অনুসরণ করবে ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা এবং স্বাধীনতা, শান্তি ও প্রতিবেশী স্বাধীন রাষ্ট্র সমূহের সঙ্গে সহযোগিতার পথ, সে রাষ্ট্র অনুসরণ করবে সোভিয়েত ইউনিয়ন, স্বাধীন চীন, স্বাধীন ভিয়েতনাম প্রভৃতির সঙ্গে একতার পথ।

নেহরু সরকার এবং লিয়াকত সরকার এ পথের বিরোধিতা বলেই বাংলার আজ এত দুর্দশা। মাড়োয়ারী, গুজরাটি এবং সিন্ধী ধনিকেরা বাংলার হিন্দুস্তানী শ্রমিক এবং বাঙ্গালী শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তদের অবাধে শোষণ করতে চায়, তাই কংগ্রেস ও লীগ সরকার ভারত বিভাগ এবং বঙ্গভঙ্গ মেনে নিয়েছে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি করার সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টায় বাধা না দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদারী গ্রহণ করেছে। ওদের শাসনে বাংলার মুক্তিও নেই, শান্তিও নেই।

দুই বাংলায় অবিলম্বে পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নেহরু সরকারের ওপর চাপ লাগান কাশ্মীর সমস্যার গণতান্ত্রিক সমাধানের জন্য। নেহরু সরকারকে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করতে হবে যে কাশ্মীর স্বাধীন হল, কাশ্মীরের মহারাজকে সরিয়ে দিয়ে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক, কাশ্মীরের নিরাপত্তার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, ভারত এবং পাকিস্তান সম্মিলিতভাবে সেখানে গণভোট তত্ত্বাবধান করুক, ইংরেজ এবং আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের কোন স্বার্থ কাশ্মীরে মানা হবে না। তাদের কোন মধ্যস্থতা রাখা হবে না।

নেহরু সরকার যদি এই ঘোষণা দিতে পারে তবেই হিন্দু-মুসলমানে হানাহানি বন্ধ হয়ে যাবে। জিজ্ঞাসা করুন নেহরু তাতে রাজি কিনা। আমরা জানি যে নেহরু তাতে রাজি নয়, কারণ সে ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীর তাঁবেদারী করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সে যে টাটা-বিড়লা-ডালমিয়ার চাকর।

কাশ্মীরের স্বাধীনতা রক্ষায় অক্ষম নেহরুর কাছে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের নিরাপত্তা আশা করা বৃথা। নেহরুর কাছে বাংলার জনসাধারণের কথার চেয়ে লেডি মাউন্টব্যাটেনের কথার দাম বেশি। কারণ লেডি মাউন্টব্যাটেন ইংলণ্ডের রাজদূতী। ভারতীয় ইউনিয়নে যতক্ষণ ইংলণ্ডেশ্বরের পদসেবী কংগ্রেসী সরকার কায়েম আছে, ততক্ষণ এদেশের মুক্তিও নেই শান্তিও নেই।

কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীর ইঙ্গিতে লীগ সরকার যে গোলযোগ সৃষ্টি করেছে তার ফলে পাকিস্তানের মুসলিম জনগণের ভাগ্য ইঙ্গ-আমেরিকানদের হাতে খুব শক্তভাবে বাঁধা পড়ল। তথাকথিত "আজাদ কাশ্মীর" আসলে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-আমেরিকানদের যুদ্ধঘাঁটি। শুধু ভারতের নয়, সমগ্র পৃথিবীর গণতান্ত্রিক জনসাধারণ পাকিস্তানের লীগ সরকাররের এই অপকীর্তির বিরুদ্ধে। ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীর পদসেবা করার জন্যই লীগ সরকার কাশ্মীরে হানা দিয়ে ভারতীয় ইউনিয়নের শত্রুতা অর্জন করছে। তার ওপর পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠদের বিরুদ্দে আনসার বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে লীগ সরকার পূর্ববঙ্গের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের যে ভেদ সৃষ্টি করছে তার শাস্তি তাকে পেতে হবে পূর্ববঙ্গের মুসলিম জনসাধারণের কাছেই।

বাগেরহাট এবং নাচোলে আনসার বাহিনীর বীভৎস অত্যাচারের সাফাই গেয়ে নুরুল আমিন ঘোষণা করছে যে সেখানে জনতার ওপর যে অত্যাচার করা হয়েছে তা তারা হিন্দু বলে করা হয়নি, তারা কমিউনিস্ট পরিচালিত কৃষক বলে করা হয়েছে। অর্থাৎ জমিদারের বিরুদ্ধে কৃষকের অভিযান হলে অমনি করেই যে অত্যাচার হবে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত কৃষকের ওপর, সেই কথাই খুব স্পর্দ্ধার সঙ্গে নুরুন আমিন ঘোষণা করেছে খুব স্পষ্টভাবে সারা বিশ্বের কাছে। নুরুল আমিনের এই বিবৃতি পূর্ববঙ্গের সমস্ত মুসলমান মজুর-কৃষকের চোখ খুলে দেবে। পূর্ববঙ্গের কৃষক আন্দোলন দমন করার জন্য নুরুল আমিন আজ ভারতীয় ইউনিয়নের মুসলমানদের বিপদাপন্ন করে তুলেছে। লীগ সরকার এবং আনসার বাহিনীর এই নিষ্ঠুরতার জবাব দিন পূর্ববঙ্গের মুসলিম জনগণ, নইলে ঐ জহ্লাদের হাতে আপনাদেরও মারা পড়তে হবে।

পাকিস্তানে যতক্ষণ লীগ সরকার কায়েম আছে, ততক্ষণ সারা ভারত এবং সারা পাকিস্তানের মুসলমানদের ভাগ্য ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের বলি হয়ে থাকবে।

হিন্দু-মুসলমানের সমবেত মাতৃভূমি ভারতের অশান্তি ও দুর্ভোগের মূলে রয়েছে ভারত বিভাগ এবং বঙ্গ বিভাগ। স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিতর দিয়ে হিন্দু-মুসলমানে যে সম্প্রীতি এবং যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল লীগ নেতাদের কুখ্যাত পাকিস্তান দাবিই তাকে জখম করেছে। পাকিস্তানের গরীব মুসলমান মাত্রই জানেন যে পাকিস্তান গড়ে মুসলিম জনগণের কোন স্বাধীনতা, শান্তি ও সুখ ত হয়ই নি, বরং দাসত্ব ও দৈন্য বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন। সারা ভারত এবং পাকিস্তানের মুসলিম জনসাধারণ এ সত্য উপলব্ধি করবেনই যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের পদাশ্রিত লীগ সরকারই তাঁর শত্রু আর গরীব হিন্দু জনসাধারণ তাঁর বন্ধু। তাই পূর্ববঙ্গে তাঁদের পবিত্র কর্তব্য হল বন্ধুকে বাঁচানো শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে, সত্যকার স্বাধীনতা, জাতীয় একতা এবং প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। তাই লীগ সরকারের কাছে দাবি করুন— কাশ্মীর থেকে হানাদার সরাও, আনসার বাহিনী ভেঙ্গে দাও, মজুর-কৃষক আন্দোলনের স্বাধীন অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। তবেই হিন্দু-মুসলিম শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

১৪ মার্চ ১৯৫০

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

রাজবন্দী মুক্তির দাবিতে—

১) রাজবন্দী কমরেড রতন লাল (এম এল এ) রক্তাক্ত অজ্ঞান অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজে আনীত। আলিপুর জেলে রাজবন্দীদের উপর পাশবিক মারপিট

দার্জিলিং-এর বন্দী মজুর নেতা এম এল একে গতকাল আলিপুর জেল হইতে রক্তার্ত অজ্ঞান অবস্থায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হইয়াছে।

আলিপুর জেলে ৫ই জানুয়ারি অনশনী রাজবন্দীদের উপর খুনী বিধান মন্ত্রীসভার নৃশংস আক্রমণের খবর গতকাল আমরা কিছুটা প্রকাশ করিয়াছি।

এই বিধান মন্ত্রীসভার নৃশংসতা ও রাজবন্দীদের অপূর্ব বীরত্ব সম্পর্কে এখন আরও বিস্তারিত খবর আসিয়াছে।

আলিপুর জেলে অনশনী রাজবন্দীদের প্রথম হইতেই সেলে সেলে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। ৫ই জানুয়ারি বেলা এগারটার সময় জেলের সুপার বিমল দত্ত জেলার চারু চক্রবর্তী ও ডেপুটি জেলার জীবন দাশগুপ্ত ৫০ জন সশস্ত্র সিপাই নিয়ে সেলে সেলে অনশনী বন্দীদের উপর আক্রমণ চালায়। বর্বর জীবন দাশগুপ্তই কিছুদিন আগে হুগলী জেলে গুলি চালায়।

এই বর্বরতার জন্য বিধান মন্ত্রীসভা তাহাকে প্রমোশন দিয়া আলিপুর পাঠাইয়াছে।

অনশনী রাজ বন্দীগণ সেল অবরোধ করিয়া এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে থাকেন। এক একটি সেলে ১০/১২ জন করিয়া সশস্ত্র সিপাই হামলা করে। কিন্তু একজন বন্দী বোতল, লংকাগুঁড়া, ইট ছুড়িয়া সশস্ত্র সিপাহীদিগকে হটাইয়া দিতে থাকেন। এইভাবে বন্দীরা একঘণ্টা যাবৎ লড়াই চালাইয়া জয়লাভ করেন। সশস্ত্র সিপাহীরাও হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

এর পর আরো সিপাহী আনাইয়া দ্বিতীয়বার আক্রমণ শুরু হয়। এবারও বন্দীগণ অপূর্ব বীরত্বে লড়াই চালাইতে থাকেন। বর্দ্ধমানের ছাত্র নেতা আমানুল্লাকে ১০/১২ জন সিপাহী অমানুষিকভাবে মারিতে থাকে। তখন কমরেড অজিত বোস সিপাহীদের বিরুদ্ধে আসিয়া দণ্ডায়মান ও অদ্ভুত সাহসে ১০/১২ জন সিপাহীর সাথে ৫৫ মিনিট যাবৎ লড়াই চালান। কমরেড অজিত বোসের সর্বাঙ্গে লাঠি পড়িতে থাকে ও তাঁহার মাথা ফাটিয়া দর দর করিয়া রক্ত পড়িতে থাকে ও তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া যান।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ হয় দার্জিলিং-এর মজুর নেতা কমরেড রতনলালের সঙ্গে। ১০/১২ জন সিপাহী বার বার বীর রতনলালের সেল হামলা করে। কিন্তু বীর রতনলাল বার

বার সেই হামলা হটাইয়া দেয়। তখন কমরেড রতনলালের সামনে আর কেহ যাইতে রাজি হয় না। জেলের অফিসারগণ তখন ১০/১২ জন দালাল সিপাহী জড়ো করিয়া আবার রতনলালের সেল আক্রমণ করে। দস্যুদল শাবল, গাঁইতি নিয়া সেলের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া সেলে প্রবেশ করিয়া ১৫/২০ জনে লাঠি ও শাবল নিয়া বীর রতনলালের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। আমাদের বীর বন্দী ভাই রতনলাল খালি হাতেই এই ১৫/২০ জন পশুর বিরুদ্ধে লড়াই চালাইতে থাকেন ও ৫/৬ জন সিপাহী তাঁহার হাতে জখম করে।

অফিসার পশুরা কেহই রতনলালের সেলে ঢুকিতে সাহস পায় নাই। তাহারা পিছন হইতে ঐ দালাল সিপাহীদের উস্কাইয়াছে।

১৫/৩০ জন সিপাহীর সাথে বহুক্ষণ লড়াই করার পর কমরেড রতনলাল বিষম ক্লান্ত হইয়া পড়েন। তাহার উপর লাঠি বৃষ্টি হইতে থাকে।

অসম এই যুদ্ধে বীর রতনলাল তখন আহত অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যান। সারা গা দিয়া তাঁহার ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিতেছে। রক্তাক্ত-অজ্ঞান কমরেড রতনলালের উপরই অনবরত বুটের লাথি ও লাঠি চালাইতে থাকে। রতনলালের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। এখনও তিনি অজ্ঞান অসহ্য বুটের লাথিতে তাঁহার মাথায় ব্যথা। বুকের পাঁজরও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে অবস্থাতে বীর বন্দী রতনলালকে মেডিকেল কলেজে নিয়া আসা হইয়াছে। তাঁহার পালস ১৩২ ও শ্বাসপ্রবাহ ৩৩। পশুর দল বীর রতনলালকে রক্তাক্ত অজ্ঞান করিয়া অন্যান্য বন্দীদের জেল আক্রমণ করে। প্রত্যেক জেলেই বীর বন্দীগণ অসীম প্রতিরোধ চালান।

এই ভাবে খুনী বিধানের সশস্ত্র সিপাহীদের সঙ্গে বন্দীদের লড়াই চলে বেলা ১১টা হইতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। কমরেড সুধীর চ্যাটার্জিও (খুলনা) অদ্ভুত বীরত্বের সঙ্গে লড়াই চালান রতনলালের মত তাঁহার সেলেও প্রস্তরের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিতে হয়।

এই অপূর্ব লড়াই এ প্রত্যেকটি রাজবন্দী বিষম আহত হইয়াছেন। দার্জিলিং-এর আর একজন মজুর নেতা প্রেমলাল এখনও অর্দ্ধচেতন অবস্থায় পড়িয়া আছেন। তাহার পাঁজরের হাড়ও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কমরেড সুধীর মুখার্জি রক্ত বাহ্য করিতেছেন।

কমরেড শিবদাসের নাক মুখ দিয়া প্রচুর রক্ত পড়িয়াছে। কমরেড নারায়ণ ভৌমিক অজ্ঞান হইয়া পড়েন। কমরেড বিমল (বয়স ১৬) ৩ ঘণ্টা অজ্ঞান হইয়া থাকেন।

এই ভাবে সশস্ত্র দস্যুদল আমাদের বীর বন্দী ভাইদের রক্তে আলিপুর জেল ভাসাইয়া দিয়াছে। পশুর দল এসে আমাদের এই বীর বন্দীদের সেলে সেলে জল, আলো ছাড়া আবাদ করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু, বীর বন্দীগণ সবই তুচ্ছ করিয়াই অনশন সংগ্রাম চালাইতেছেন।

- **এই বন্দীদের মুক্ত কর।**
- **এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নাও।**

২) ৭ই জানুয়ারি কলিকাতার স্থানে স্থানে বন্দী মুক্তির লড়াই

বন্দীমুক্তি সংগ্রাম কমিটির আহ্বানে ৭ই জানুয়ারি কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে জনগণ বন্দীমুক্তির লড়াই চালিয়েছেন। ময়দানে প্রায় দু'হাজার মেয়ে-পুরুষ-মজুর-ছাত্র সমবেত হন। বেলা দুইটা

হইতেই সাদা পোষাক পরা প্রায় ২০০ পুলিশ সারা ময়দান ঘিরিয়া ছিল কিন্তু পুলিশ উপেক্ষা করেই জনতা সমবেত হন তাঁহাদের বন্দীমুক্তির দৃঢ় সংকল্প জানাতে।

প্রথম বক্তা বক্তৃতা দিতে ওঠামাত্রই বিধান মন্ত্রীসভার সশস্ত্র পুলিশ সভার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পশুর দল নিরস্ত্র জনতার উপর—বিশেষ করে বেছে বেছে মেয়েদের উপর নির্মমভাবে লাঠি চালায়। লাঠির বাড়িতে মেয়েরা পড়ে গেলেও রেহাই দেয় না—চুলের মুঠি ধরে তাঁদের টানতে টানতে নিয়ে যায়। বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হয়।

এই বর্বরতার ক্রোধে জ্বলে ওঠে এবং পশু সত্যেন চাটার্জীকে তাক করে বোমা নিক্ষেপ করা হয়। এরূপ পর পর দুটি বোমা পড়ে। বোমা পড়ার পর, পুলিশ আতঙ্কিত হয়ে এলোপাথাড়ি ছুটেছে।

মনুমেন্টের নীচে যখন এই লড়াই চলছিল—তখন পাশেই কার্জন পার্কে ডালহৌসীর মার্কেন্টাইল কর্মচারীরা বন্দীমুক্তি দাবিতে সভা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রায় ৮ শত কর্মচারী বেলা ২টার সময় ডালহৌসী স্কোয়ার থেকে শোভাযাত্রা করে আসেন। শোভাযাত্রায় তারা 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই', 'দমননীতি চলবে না' আওয়াজ তুলে সারা ডালহৌসী ঘুরে এসেছেন। কার্জন পার্কে সভায় জমায়েত হয়ে তাঁরা বন্দীমুক্তি দাবি করেন ও নিজেদের ছাঁটাই-এর প্রতিবাদ জানান।

এদিকে উত্তর কলিকাতায় তখন বিডন স্কোয়ারে ও শক্ স্ট্রীটে সভা চলেছে বন্দীমুক্তির দাবিতে। বিডন স্কোয়ারে সভা ডেকেছিল ফরওয়ার্ড ব্লক প্রিজন ভ্যানে বন্দী হত্যার প্রতিবাদে। বিডন স্কোয়ার সভার পর সংগ্রামী জনতার শোভাযাত্রা বের হয়। সেই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে সবাই—কমিউনিস্ট, ফরওয়ার্ড ব্লক, বন্দীমুক্তিকামী আরো জনসাধারণ। শোভাযাত্রা রাস্তায় রাস্তায় জঙ্গী বিক্ষোভ দেখায়। শোভাযাত্রার বিক্ষোভের সামনে ট্রাম চলাচল থামিয়া যায়।

৮ জানুয়ারি, ১৯৫০

রাজবন্দী মুক্তি সংগ্রাম
দৈনিক বুলেটিন

বন্দীদের উপর অত্যাচারের জবাব দাও

১৫ই ডিসেম্বর থেকে সারা বাংলার জেলে জেলে শত শত মজুর-কৃষক-ছাত্র- মেহনতী মধ্যবিত্ত, নারী ও পুরুষ বন্দীদের দীর্ঘস্থায়ী অনশন সংগ্রাম কংগ্রেসী কারাগারে বিপ্লবী প্রতিরোধের নূতন ইতিহাস রচনা করেছে।

ভিতরে বন্দীদের ও বাইরে জনতার বিক্ষোভে ভয় পেয়ে খুনী বিধানের দল বন্দীদের যে ন্যায্য দাবি আগে বার বার মেনেছে, আবার পরমুহূর্তেই বুটের তলায় মাড়িয়েছে— সেই দাবিই বন্দীরা এবার আবার তোলেন। তাঁদের দাবি—সুদুর বক্সার কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে অথবা জেলের বাইরে অন্যত্র পাঠান চলবে না। মজুর কৃষক আন্দোলনে ধৃত সমস্ত বন্দীকেই রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে একই উচ্চ শ্রেণিতে একই সাথে রাখতে হবে ইত্যাদি।

কিন্তু এই ন্যায্যদাবি মানার পরিবর্তে কংগ্রেসী পশুরা গত ১৫ই ডিসেম্বর চিয়াং কাইশেকি অত্যাচার ও ফ্যাসিস্ট গুণ্ডামীর উন্মত্ত আক্রমণ চালায় বন্দীদের উপর। এমন কি তালাবন্ধ ঘরে বন্দিনী মা-বোনদেরও রেহাই দেয়নি।

বাইরের জনতার হাতে মারের পর মার খেয়ে কংগ্রেসী শয়তানেরা কাপুরুষের মত প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল জেলখানার বন্দীদের উপর। দস্যুরা ভেবেছিল অত্যাচারের মুখে বন্দীদের প্রতিরোধের শক্তিকে চুরমার করে দেবে তাদের মনোবলকে ভেঙ্গে ফেলবে, তবেই ফ্যাসিস্ট অত্যাচারের বিভীষিকায় বাইরের জনতাও পিছু হটবে।

কিন্তু এই নূতন অত্যাচারের জবাবে প্রেসিডেন্সী জেলের বন্দীরা অনশন ধর্মঘট শুরু করলেন। দেখতে দেখতে সেই অনশন ধর্মঘটে সামিল হলেন আলিপুর, দমদম, মেদিনীপুর, বহরমপুর, হুগলী থেকে শুরু করে কৃষ্ণনগর, শ্রীরামপুর প্রভৃতি সমস্ত জেলার ও মহকুমার সাব জেলের শত শত বন্দী ভাই বোন। সরকারি চ্যালেঞ্জের জবাব দিলেন দমদমের বন্দীরা জেলখানায় লালঝাণ্ডা উড়িয়ে। জবাব দিলেন সাধারণ কয়েদীরা এমনকি ওয়ার্ডাররা বন্দীদের সাথে হাত মিলিয়ে। বাংলার জেলখানায় বন্দীদের বিপ্লবী সংগ্রামের ইতিহাসে এটা এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এমনিভাবে সংগ্রামী শ্রমিক-কৃষক-ক্ষেতমজুর-ছাত্র ও মেহনতী মধ্যবিত্তের এক নূতন সম্মিলিত যুদ্ধ-ফ্রন্ট গড়ে উঠল কংগ্রেসী কারাগারের মধ্যে কংগ্রেসী শাসকদেরই বিরুদ্ধে।

বাইরের জনতাও ক্ষেপে উঠলেন। স্কুলে-কলেজে কারখানায় শিল্প অঞ্চলে অগণিত সভা সমিতি ও শোভাযাত্রায় আওয়াজ উঠল "বন্দীদের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ চাই"। কলকাতার পথে পার্কে-ময়দানে এমনকি জেলখানার সুমুখে দিনের পর দিন ব্যারিকেড

সংগ্রামের নূতন ইতিহাস রচিত হল। বিপ্লবী নওজোয়ানেরা বোমার ঘায়ে শতাধিক পুলিশ ও অফিসার আহত হল। স্বয়ং বিধান শিলিগুড়ি ও যাদবপুরে জনতার হাতে মার খেয়ে প্রাণ নিয়ে পালান। জনতার আক্রমণের, সশস্ত্র সংগ্রামের এই নূতন শক্তি আমরা এর আগে আর এমন দেখিনি যেমন দেখেছি এবার বন্দীদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে।

কিন্তু অত্যাচারী সরকারের দিন ঘনিয়ে এসেছে বলেই, তার শাসন, শোষণ ও আমলের অবসানের আর দেরি নেই বলেই আরো বেশি মরিয়া, আরো বেশি মারমুখী হয়ে উঠেছে।

তাই বন্দীদের ন্যায্য দাবি মানার পরিবর্তে অনশনক্লিষ্ট দুর্বল বন্দীদের উপর দিনের পর দিন নিত্য নূতন আক্রমণ চালিয়েছে আজ এই জেলে কাল ঐ জেলে। গণতন্ত্রের ঠাঁট ছেড়ে ক্রমশঃ ফ্যাসিস্ট কায়দায় নগ্ন অত্যাচারীর আসল মূর্ত্তিতে ক্ষেপে উঠেছে। অনশনী যক্ষ্মারোগীকেও এক ফোঁটা ঔষধ দেয়নি। শ্রমিক কর্মী আব্দুল আজিজকে খুন করেছে। বন্দীদের মা-বাপের সঙ্গে পর্যন্ত দেখা করতে দেয়নি। কঠিন লৌহ যবনিকা টেনে বন্দীদের সমস্ত সংবাদ বাইরে আসা বন্ধ করেছে।

কিন্তু তবু বীর বন্দীদের মনোবল ভাঙতে পারেনি। সর্বত্রই বন্দীদের দুর্বার প্রতিরোধের সুমুখে টিকতে না পেরে শয়তানের দল পালিয়ে এসেছে। আলিপুর জেলে বন্দীনেতা রতনলালের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সারা বাংলার জেলে জেলে আরো বিপ্লবী দৃঢ়তার তুফান তুলেছে। সর্বোপরি প্রায় দুই মাস ধরে পুলিশী লাঠি ও টিয়ার গ্যাসে আহত বন্দীদের অনমনীয় দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট-সংগ্রামে নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

এইভাবে বাইরে জনতার আক্রমণ, গ্রামাঞ্চলের সশস্ত্র সংগ্রাম ও জেলখানার ভিতরে বন্দীদের প্রতিরোধ ও অনশন ধর্মঘটে কংগ্রেসী দাস-শাসনতন্ত্র কায়েম করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। নয়াদিল্লীর কংগ্রেসী মসনদ কেঁপে উঠল। সর্দার প্যাটেল স্বয়ং ছুটে এলেন—কাকদ্বীপকে ঠাণ্ডা করে, বন্দীদের শায়েস্তা করে জনতাকে সন্ত্রস্ত করতে। "শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া বেয়নেটের মুখে দাস-শাসনতন্ত্র কায়েম করতে। আর সারা দুনিয়ায় ছলে বলে কৌশলে প্রমাণ করতে যে" বাংলার গোলমাল শুধু মুষ্টিমেয় কমিউনিস্ট "সন্ত্রাসবাদী"দের কারসাজি। তাই কাকদ্বীপে মিলিটারী হামলা ও অত্যাচার শুরু হল গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে। বন্দীদের সাধারণ দাবি না মেনে অত্যাচারের মাত্রা বাড়ান হল। পুলিশকে ঢালাও হুকুম দেয়া হল। পথে পার্কে হাজতে যেখানে পাও সংগ্রামী মানুষকে মেরে মেরে ঠাণ্ডা কর।

কিন্তু সর্দারের সমস্ত চিয়াং কাইশেকি আশাই আজ বিপ্লবী জনতার ক্রোধের আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সারা পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ মজুর-কৃষক ছাত্র ও বিপ্লবী জনতা জমি, রুটি ও স্বাধীনতার লড়াইকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়েছে ২৬শে জানুয়ারী। শুধু দাস শাসনতন্ত্র নয় শাসনতন্ত্রের রচয়িতা অত্যাচারী কংগ্রেসী সরকারের শেষ দিনই আজ আসন্ন। কলিকাতা-মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-হাওড়া-হুগলী-চব্বিশ পরগণা-মুর্শিদাবাদ-নদীয়া—এমন কোন শহর নাই—এমন কোন জেলা নেই যেখানে হাজার হাজার জনতা শুধু দাস-শাসনতন্ত্রের মৌখিক প্রতিবাদ নয়—সরাসরি কংগ্রেসী পুলিশের ঘাঁটি থানা-ক্যাম্প,—জোতদার, জমিদারের বাড়ী ও কাছারীর উপর হামলা না করেছে। খাস কলিকাতায় দেশপ্রিয় পার্কের চারিদিকে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে লক্ষ জনতার ব্যারিকেড সংগ্রামে কংগ্রেসী শাসকেরাও বুঝেছে—তাদের শেষ দিনের আর বেশি বাকি নেই।

এমনিভাবেই জনতার ক্ষমতা দখলের বিপ্লবী অভিযান ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলেছে। ধনিক ও মালিক শ্রেণির অত্যাচারী কংগ্রেসী শাসনের মসনদ ভাঙিয়া চুরমার হচ্ছে।

১৫ই ডিসেম্বর হতে ২৬শে জানুয়ারী কংগ্রেসী শাসকেরা চেয়েছিল বন্দীদের উপর বর্ব্বরতম অত্যাচার চালিয়ে শুধু বন্দীদের নয়—সমস্ত মেহনতী জনতার সংগ্রামী অভিযানকে স্তব্ধ করে দিতে।

কিন্তু প্রায় দুইমাস তিলে তিলে মৃত্যুর পথে এগিয়েও বন্দী ভাই-বোনেরা যে এতদিনকার দীর্ঘস্থায়ী অনশন সংগ্রাম চালিয়েছেন—নিত্য নূতন প্রতিটি হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করেছেন—তাহাতে কংগ্রেসী জেল শুধু কংগ্রেসী শাসনের বিরুদ্ধে একটা বিপ্লবী লড়াইয়ের দুর্ভেদ্য দুর্গেই পরিণত হয়নি—বাইরের বিপ্লবী সংগ্রাম আরো দুর্বার আরো প্রচণ্ড শক্তিতে সহস্র শিখা বিস্তার করিয়া সারা বাংলার শহরে শহরে হাজার হাজার নূতন গ্রামে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। এই আগুন কংগ্রেসী শাসনকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবেই দেবে। বন্দী ভাই-বোনদের মুক্ত করে আনবে। সেদিন আর দূরে নয়।

বন্দীমুক্তি ও দাস-শাসনতন্ত্র বিরোধী এই সম্মিলিত সংগ্রামের বিপুল শক্তিকে সংগঠিত কর। আরো দ্বিগুণ উৎসাহে বন্দীদের দাবির সমর্থনে প্রতি শহরে-স্কুলে-কলেজে- কারখানায়-বস্তীতে ও গ্রামে প্রতিদিন সভা-সমিতি-সমাবেশ কর সংগঠিত শক্তিতে শত্রুর উপর আঘাত হান। বন্দীদের ন্যায্য দাবি আদায়ের লড়াইকে আরো জোরদার কর। তৈরি থাক—কড়া নজর রাখ বন্দীভাইদের যেন বক্সায় না নিয়ে যেতে পারে। মা-বোনদের উপর যারা পশুর মত অত্যাচার করেছে তাদের নিশ্চিহ্ন করার জঙ্গী সংগ্রামকে আরো ব্যাপক আরো দুর্বার—আরো নির্মম করে তোল।

'স্বাধীনতা', সম্পাদকীয় ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০

মার্কিন যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন গড়িয়া তুলুন

জঘন্য চাপ, হুমকি ও প্রবঞ্চনার দ্বারা মার্কিন যুদ্ধবাজরা নয়া চীনের বিরুদ্ধে, সমস্ত এশিয়ায় যুদ্ধের আগুন ছড়াইয়া দিবার ঘৃণিত প্রস্তাব পাশ করাইয়াছে। একমাত্র তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলিই মার্কিন যুদ্ধবাজদের সহিত রাষ্ট্রসংঘে ভোট দেয়। অন্য পক্ষে পৃথিবীর অধিকাংশ জনতার প্রতিনিধি হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্র মার্কিনী যুদ্ধাত্মক নীতির বিরোধিতা করে।

মার্কিন যুদ্ধবাজদের প্রস্তাবের মধ্য দিয়া তাহাদের যুদ্ধাত্মক নীতির মুখোশ খুলিয়া পড়িয়াছে। ভোটের জোরে প্রস্তাব পাশ করাইলেও মার্কিনী ইজ্জৎ দুনিয়ার সম্মুখে বাড়ে নাই বরং কমিয়াছে। যুদ্ধবাজরা আরও দুনিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে।

দ্বিধাগ্রস্ত হইলেও ভারতের শান্তিপ্রচেষ্টা, জাতিসংঘে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহিত একযোগে ভোট দেওয়া, ইত্যাদি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নেহেরু সরকারের এই বিশেষ ভূমিকা বিশ্বশান্তি আন্দোলনেও যুদ্ধবাজদের কোণঠাসা ও নগ্ন করিবার কাজে প্রচণ্ড সাহায্য করিয়াছে। ইহা প্রত্যক্ষ ভাবে ভারতের অভ্যন্তরেও শান্তি আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়াছে ও করিবে। আজ যখন যুদ্ধ ও শান্তি সমস্ত দুনিয়ার সম্মুখে সর্বপ্রধান ও মূল সমস্যা, যখন যুদ্ধ ইতিমধ্যেই কোরিয়ার বুকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ শুরু করিয়াছে, নেহেরু সরকারের এই শান্তি প্রচেষ্টা যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে ভারতের ও পৃথিবীর জনগণকে সংগঠিত হইতে সাহায্য করিবে। ভারত সরকারের এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে আমরা তাই অভিনন্দন জানাই ও সমর্থন করি।

ইহার সাথে সাথে নেহেরু সরকার এখনও যে সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণিত নাগপাশে আবদ্ধ আছে, শান্তির পক্ষে দ্বিধাগ্রস্তভাবে চলিতেছে তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। আজও যে দেশে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এমন কি শান্তি আন্দোলন ব্যাপারেও প্রতিক্রিয়াশীল নীতি চলিতেছে ও তাহার ফলে সরকার জনসাধারণ হইতে আরও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে তাহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। ভারত সরকারের নীতির এই দিকের তীব্র সমালোচনা করিতে হইবে। নেহেরুর সাম্প্রতিক পররাষ্ট্রনীতি ও শান্তি প্রচেষ্টার সহিত ইহার সঙ্গতি নাই।

নেহেরুর বর্তমান দ্বিধাগ্রস্ত ও অসঙ্গতিপূর্ণ শান্তি প্রচেষ্টার মূলে রহিয়াছে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের ও উপনিবেশিক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত সংকট। সাম্রাজ্যবাদের শিবিরের সংকট ক্রমেই জটিল ও তীব্রতর হইতেছে।

শান্তি আন্দোলনে ইহারও সুযোগ লইতে হইবে। উপযুক্ত কৌশলের দ্বারা শান্তি ও

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন আরও ব্যাপক ও শক্তিশালী করিতে হইবে। দল, মত ও শ্রেণি নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষকে এই যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে আনিতে হইবে। আজ যাঁহারা নেহেরু বা কংগ্রেসের অনুরক্ত তাঁহাদেরও ব্যাপক ভাবে শান্তি আন্দোলনে আনার সম্ভাবনা বহু গুণে বাড়িয়া গিয়াছে।

এই উদ্দেশ্যে সমগ্র পার্টিকে সর্বত্র এখনই আন্দোলনে ও গণসমাবেশের কাজে অগ্রণী হইতে হইবে।

সর্বত্র সভা সমিতি গণসমাবেশ করিয়া নিম্নলিখিত দাবিগুলিকে শ্রেণি, দল নির্বিশেষে সমগ্র জনতার ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ জাতীয় দাবিতে পরিণত করিতে হইবে। তাহা ছাড়া আন্দোলনের অন্যান্য উপায়ও কাজে লাগাইতে হইবে।

১। চীনকে আক্রমণকারী ঘোষণা করার মার্কিন প্রস্তাবের বিরোধিতা। সর্বত্র এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনের তুমুল ঝড় তুলিতে হইবে। মার্কিন যুদ্ধবাজরা ভারত হইতে যুদ্ধের জন্য (যাতে) কোন প্রকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বৈষয়িক সাহায্য লাভ করিতে না পারে এই জন্য জনমত সজাগ এবং সংগঠিত করিতে হইবে। ইঙ্গ-মার্কিনের নিকট কোন যুদ্ধ উপকরণ রপ্তানি করা চলিবে না।

২। ওয়ারশ কংগ্রেসের দাবি এবং ঘোষণাকে কার্যকরী করার দাবি উপস্থিত করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া ভারতে যুদ্ধপ্রচার বেআইনি ঘোষণা করা হউক এই দাবি করিতে হইবে।

৩। বিশ্বশান্তি রক্ষাকল্পে গণতান্ত্রিক চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সহিত ভারতের আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা দাবি করিতে হইবে। সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি এবং চীন-ভারত মৈত্রী সমিতি প্রভৃতি গণসংগঠনকে সক্রিয় এবং উদ্যোগী করিয়া তুলিতে হইবে। সোভিয়েত-চীন-ভারত মৈত্রীর ও সহযোগিতার পথই যে শান্তি, স্বাধীনতা ও প্রগতির পথ তাহার ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত জরুরি।

৪। ভারতকে কমনওয়েলথ্ তথা ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শিবির হইতে বাহির হইয়া আসার জন্য সর্বত্র আওয়াজ তুলিতে হইবে। কমনওয়েলথের বন্ধন যুদ্ধের বন্ধন।

৫। ভারত সরকারের, ২৭শে জুনের জাতিসংঘের বেআইনি প্রস্তাবের সমর্থন প্রকাশ্যে প্রত্যাহার করিতে হইবে (এই বেআইনি প্রস্তাবের আড়ালেই মার্কিনরা জাতিসংঘের নামে কোরিয়া আক্রমণ করিতে সমর্থ হয়) সঙ্গে সঙ্গে এই বেআইনি প্রস্তাব অনুযায়ী ম্যাকআর্থারের জন্য ভারত সরকার যে এম্বুলেন্স বাহিনী পাঠাইয়াছে তাহাকে এখনি তুলিয়া আনিতে হইবে। আক্রমণকারীদের জন্য এম্বুলেন্স বাহিনী প্রেরণের সহিত শান্তি প্রচেষ্টার কোনই মিল থাকিতে পারে না।

৬। তাইওয়ান (ফরমোজা), ভিয়েতনাম, মালয় প্রভৃতি দেশ হইতে সমস্ত বিদেশী সৈন্য অপসারণের দাবি ভারত সরকারকে করিতে হইবে। ভারতের বন্দরে যুদ্ধসরঞ্জাম বা এই সকল বিদেশী সৈন্য বহনকারী জাহাজের কোন আশ্রয় বা সাহায্য দেওয়া হইবে না।

৭। শান্তির ব্যাপারে ব্রিটেন ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করিয়াছে। ব্রিটিশ সরকার মার্কিন যুদ্ধবাজদের প্রধান সহায়ক। তাই জাতীয় বিমান, নৌ এবং সৈন্য বাহিনী হইতে সমস্ত ব্রিটিশ অফিসারদের অবিলম্বে অপসারিত করিতে হইবে। ভারতে ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধবাজদের এই পঞ্চম বাহিনীর কোন স্থান নাই।

৮। দেশের শান্তি আন্দোলনের পথে যে সমস্ত সরকারি বাধানিষেধ আছে তাহা এখনি প্রত্যাহার করিতে হইবে। ইহার জন্য ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং নাগরিক অধিকার কায়েম করিতে হইবে।

বিশ্বশান্তির সপক্ষে প্রচার কল্পে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর দ্বার শান্তিকামীদের জন্য উন্মুক্ত করিতে হইবে। যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শান্তির জন্য আবেদন জানাইয়াছেন তাহাদের বেতার ভাষণ দিবার জন্য সমস্ত প্রকার সুযোগ সুবিধা দিতে হইবে।

এখানে বলা দরকার যে এই প্রকার আন্দোলনের সঙ্গে সর্বত্র শান্তি কমিটি সংগঠনের কাজ আগাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। প্রচার ও এই সাংগঠনিক প্রচেষ্টার যেন কোনই ত্রুটি না হয়।

৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

THE NEHRU-LIAQUAT PACT

On April 8, the Prime Ministers of India and Pakistan concluded their Agreement on the question of treatment of minorities in the two Dominions.

As everybody knows the Agreement came in the wake of recrudescence of riots in India and Pakistan, especially in East and West Bengals, and large scale migration of population.

The Birla-Dalmia-Goenka press in India has wasted no time to hail the agreement as a 'great step', 'a turning point from the brink of a precipice', 'the dawn of a new era', and so on and so forth. Ex-Governor General, now on pension, Rajagopalachari had declared that the agreement is a wonderful example of Indo-Pak amity being reached without imperialist intervention. Socialist leader Jayaprakash Narain has advised the people to give the agreement a fair chance and rally in support of Pandit Nehru and his Government at this hour of grave national emergency. This chorus of hails is an attempt to make the suffering people believe that the Indo-Pak Agreement is the first step to iron out all outstanding differences between the two Dominions, that the end of people's sufferings is in sight and the way has been found to eradicate riots and killing and the uprooting of millions from the soil for all times.

But this veil of hypocrisy cannot stand the test of even a cursory examination of the agreement and its background.

Even a child in India knows of the growth of the powerful liberation movement in East and West Bengal and the headache it is giving to the ruling circles in the two Dominions. In East Pakistan the mighty movement of peasants for land has reached its peak in an area spreading over 2,000 square miles covering 400 villages in North Mymensingh

where the fighting peasants are doing away with the age-old feudal exploitation and have distributed 150,000 bighas of land. In West Bengal the movement of workers, peasants and other sections of the people for national liberation has reached huge dimensions and ever more areas are seething with the spirit of Kakdwip where the movement is fast reaching the climax.

Debacle in S. E. Asia

This rapid growth of liberation movement threatens to totally upset imperialist plans in India and South-East Asia.

Imperialism in its fright at the extension of people's rule in Asia wants to throw a chain around the frontiers of the People's Republic of China, the link of this chain to run between Burma and Viet Nam. But the Government of Burma led by the British puppet Thakin Nu only controls one-seventh of the whole territory, a fact which even the London OBSERVER admits. More than half the territory of that country is under the control of People's Liberation movement. In Viet Nam already more than 90 per cent of the country has been liberated from imperialist domination and the Democratic Government of Viet Nam headed by Ho Chi Minh is launching an all out offensive to drive away the French from even the 10 per cent of the territory that they hold. In Malaya the total offensive of the British colonisers against the patriotic guerillas has ended in a miserable failure.

These creaking links of the chain have to be strengthened if imperialism is to be saved in Asia. The Colombo Commonwealth Conference convened for this purpose could not lay down a workable plan to save the situation. Even the monetary help to the Nu Government through Indian Union and Pakistan Governments have not improved the situation to any considerable degree. In this situation a firm control over Bengal as the strategic gateway to South-East Asia becomes a thousand times more necessary for Anglo-American imperialism. The rise of democratic forces in Bengal and Assam is a mortal threat to imperialist plots and conspiracies.

The riots were an open imperialist conspiracy to disrupt this mounting wave of workers' and peasants' struggles in Bengal for freedom, bread, land, and peace, which is the only way imperialism can

hope to make Bengal safe for itself.

But this game of imperialism and its hirelings had to reckon with the determined urge of the people for unity and peace and against riots. This powerful urge made it impossible for them to envelop the mass of people in riots and drag them into war. Threatened with exposure and people's opposition these black forces have changed their tactics and called for a temporary lull. This was also necessary in view of the coming Commonwealth Conferences to be held at London and Canberra to hatch detailed military and economic plans against the freedom movements of the people of South-East Asia. And so followed the Nehru-Liaquat Agreement.

Does this agreement promise to fulfil the peace aspirations of the people?

Firstly, both the Prime Ministers with utter solemnity have declared that the rights already guaranteed to minorities in both the Dominions either through Constitution or otherwise are 'fundamental', that they would take steps 'to enforce them effectively' and that these 'democratic rights shall be assured to all without distinction'.

As if these declarations were not there before and as if they ever changed the practice of persecution of minorities! As for Fundamental Rights, need Indian people be told that these are as big a hoax as the other Fundamental Rights guaranteed in the Indian Constitution—to be taken away in the next breath without any ceremony?

Secondly, the Agreement reiterates the 'resolve' to punish those guilty of 'criminal offences against persons and property' and 'to take prompt and effective measures' to prevent riot-mongering and war-mongering propaganda. These too are nothing new; but could they even be enforced against rabid communal Press preaching racial and communal hatred and armed conflict or against goondas who are running riot in both the dominions? How is it that RSS in India and Ansars in Pakistan still go scot free inciting and committing atrocities on the minority communities?

Thirdly, the two Prime Ministers have laid down 'elaborate procedure' for implementation of the agreement with various joint commissions, etc. Who, after all this, would pin his faith in such commissions as the one 'to enquire into and report on the causes and

extent of the recent disturbances and to make recommendation with a view to preventing recrudescence of similar trouble in future'? It is clear that, as usual this will be a joint effort to screen the real trouble makers and their game.

And in these pompous declarations one would search in vain to find a word about the vast number of refugee population in both the Dominions. It is not without significance that Liaquat Ali's concern is only about the Muslim minorities in India while Nehru champions the Hindu minorities in Pakistan. But when these minorities leave their hearths and homes, become refugees seeking protection of the self-styled champions of their safety, what awaits them is not food and shelter, but utter starvation, misery and ruin. And if they dare organise for the simple demands of food, shelter and work, they face arrests, lathis and bullets—same as other fighting sections of the toiling millions.

In this light the sections on evacuee property—worked out in detail in the Delhi agreement—are extremely significant. These arrangements for property settlement, in fact, are the only new feature of the agreement. Through these sections, the propertied classes of both India and Pakistan have come to mutual understanding for protecting and retaining their property rights and which means an agreement to keep the feudal social structure in tact. It should also be noted that during the riot-fury, rather on the strength of it, the Hindu, Muslim and British jute interest—the Birlas, Ispahanis and Walkers—have hatched a joint plan of enforcing mass retrenchment and rationalisation on the jute mill workers of West Bengal and retaining the Ishpahani-Farooqui clique monopoly of jute trade in East Bengal. The Walker-Ishpahani trade agreement which preceded the political settlement in Delhi, has opened the way for unlimited profits at the expense of workers and peasants in both Bengals.

Foil Imperialist Plot

Such is the real background and meaning of the much-boosted agreement. And it is not difficult to understand that this is but a temporary frame-up to deceive the people, whose urge for peace can no longer be ignored by the imperialists and then stooges. It is a dangerous attempt to lull the vigilance of the people and then catch them unawares with a cry of war or a demand for imperialist intervention on the plea of

broken agreements by this or that Dominion. It is in this way that imperialism wants to get direct control over Bengal, to turn Bengal into another Kashmir.

The Nehru-Liaquat Agreement thus marks the completion of the second stage of this vile imperialist conspiracy.

It is therefore of utmost urgency that the students of India, together with the democratic people of our country, see through this game and foil it before it is too late.

Peace cannot come through pacts signed by two junior partners of the imperialist family that is the Commonwealth.

Only the complete liberation from imperialism which for decades thrived on fomenting strife between our peoples, can ensure durable peace, security and prosperity. for the toiling masses of India and Pakistan.

Strengthening the struggle for that complete liberation must be the peoples' answer to the riots and war scares.

Editorial
'The Student'
Journal of the All India Students' Federation
Editor, Sunil Munsi

22 4.1950

টিকা : (১) AISF এর 'The Student' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সুনীল মুন্সী।
(২) এই পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন :
—সুব্রত সেনগুপ্ত (পঃবঃ)
—নার্গিস বাটলিওয়ালা (মুম্বাই)
—সামুয়েল জ্যাকব ইজরায়েল (মুম্বাই)
—সুলতান নিয়াজি (উঃপঃ)
—বিমলা বাকায়া (ডাং) (পাঞ্জাব)
—সত্‌পাল ডাং (পাঞ্জাব)
—মুনীশ নারায়ণ সাক্সেনা (উঃপঃ)
—সি. এন. সাস্ত্রি (উঃপঃ)
—এন. পি. শ্রীধরণ (কেরালা)
—অন্নদাশংকর ভট্টাচার্য (পঃবঃ)
পরবর্তীকালে বিদ্যা মুন্সী এই সম্পাদকমণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন।
এই নামগুলি সুনীল মুন্সীর কাছ থেকে প্রাপ্ত। (—সম্পাদক)

PEACE ENITIATIVES

(1) STOCKHOLM APPEAL

We demand the absolute banning of the atomic bomb, weapon of terror and mass extermination of populations.

We demand the establishment of strict international control to ensure the implementation of this ban.

We consider that the first government to use the atomic weapon against any country whatsoever would be committing a crime against humanity and should be dealt with as a war criminal.

We call on all men of goodwill throughout the world to sign this appeal.

Stockholm, 19 March 1950

(2) NEW CHAPTER IN PEACE MOVEMENT'S HISTORY

Chitta Biswas

Can you prevent the use of atomic weapons by collecting signatures?

This was the common question asked when the signature campaign on the Stockholm Appeal was launched in India 25 years ago. We argued, we tried to dispel doubts, we impressed upon people the necessity of mobilishing public opinion against atomic weapons.

There was tremendous enthusiasm among the young people to collect signatures to the Appeal. I participated actively in this campaign in Calcutta, which is India's biggest city. Almost all the major street junctions of Calcutta were the centres for collecting signatures. There were pamphlets, posters, leaflets, describing the devastation wrought by atom bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki.

Thousands of meetings were held all over India, to explain the significance of the Appeal. There were scenes of mass endorsement of the Stockholm Appeal in the meeting of workers, peasants, intellectuals, students, youth and women. There were several individuals who became "star colectors" of signatures in different parts of India.

The Stockholm Appeal opened a new chapter in the history of the peace movement which has grown into a mighty force.

(New Perspectives, vol. V, 1975, No. 1)

১৯৫০-এর নভেম্বর বিপ্লব দিবসে যুদ্ধমত্ত সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতা ও শান্তিকামী জনসাধারণের সম্মিলিত ব্যাপক সমাবেশ গড়ে তুলতে হবে

রুশ-বিপ্লবের গৌরবোজ্জ্বল বার্ষিকী দিবস সমাগত প্রায়। প্রতি বছর বিশ্বের সর্বত্রই নভেম্বর বিপ্লবের দিনগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টি তাহার সমস্ত শক্তি নিয়ে জনতার সমাবেশ করে। নভেম্বর দিবসে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণি ও তাহার পার্টি প্রতি বছরই নতুন করে বিপ্লবের কঠোর শপথ গ্রহণ করে। বিশ্বের কমিউনিষ্টরা এই বিপ্লব-বার্ষিকীর সময় লেনিন-ষ্ট্যালিনের তৈরি মহান কমিউনিস্ট পার্টিকে সংহত করে সোভিয়েতের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। কমিউনিস্টরা এই স্মরণীয় দিনে শান্তি, স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের নেতা সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিচালনায় নিজ নিজ দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রামের উদ্দেশ্যে বজ্রমুষ্টি তুলে ধরে।

এ বছর আমাদের পার্টির আভ্যন্তরীণ সংকটের মধ্যেই আমাদের নভেম্বর বিপ্লবের বার্ষিকী উদযাপন করতে হবে।

পার্টির সংকট যে অতিশয় তীব্র আকার ধারণ করেছে তা আমরা প্রতিদিন প্রত্যেকেই মর্মে মর্মে অনুভব করছি। গত কয়েকমাস ধরে জনসাধারণের জীবনের কোন সংকটেই আমরা পার্টি হিসাবে উল্লেখযোগ্যভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারি নাই। শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত জনতার খাদ্য, বস্ত্র, মজুরি ও জমির সমস্যার সামনে আমরা প্রায় দর্শকমাত্র হয়ে রয়েছি, কিন্তু জনসাধারণ এই সব সমস্যার বিরুদ্ধে তাঁদের লড়াই একদিনও থামান নাই। তাঁদের সে সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টি বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারছে না।

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বড় বড় ঘটনায় আমরা কিছুই করতে পারছি না। কোরিয়ার প্রশ্নে, চীন দিবস উদযাপনে, শান্তির লড়াইয়ে, বন্দী মুক্তি ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রশ্নে—আমরা পশ্চিমবাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে সংগ্রামের নেতৃত্ব দেওয়া তো দূরের কথা, জনতার পাশে এসেও দাঁড়াতে পারছি না।

ট্রটস্কিবাদ ও টিটোবাদের প্রতিক্রিয়া আমাদের পার্টিকে জটিল পঙ্কিল আবর্তে এনে ফেলেছে। ফলে পার্টি সংগঠিতভাবে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পারছে না।

বিশ্ব-বিপ্লবের সেনাপতি ষ্ট্যালিনের শিক্ষা—জনসাধারণই কমিউনিস্টদের শক্তির উৎস। যেকোন সংকট মুহূর্তে পার্টিকে সেই জনসাধারণের কাছে গিয়ে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সংগ্রাম-শিক্ষা সঞ্চয় করতে হয়।

পার্টির রাজনীতিক-সংগঠনিক সংকট গভীর হলেও পার্টি হিসাবে আমরা গত ৮/৯ মাস জনতার সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলেও, পশ্চিমবাংলার কমিউনিস্ট সভ্য-সাধারণ, দরদী ও শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত জনতার সমর্থন আমাদের পার্টি একেবারে হারায়নি। কমিউনিস্টদের (ওদের) সমর্থনে পল্লীতে-পল্লীতে, শহরের কারখানায়-কারখানায় শত শত সাধারণ মানুষ আজও কথা বলেন। সেই শক্তিকে অবলম্বন করে আমরা আবার আমাদের বিপ্লবী প্রচেষ্টাকে সুসংহত করতে পারব—এ বিশ্বকে প্রতিটি খাঁটি বলশেভিকের আছে। জনতার সেই সমর্থনকে এবারকার নভেম্বর দিবসে একত্রীভূত করতে হবে। তাকে সমাবেশ ও মিছিলে রূপ দিতে হবে।

শত বাধা নিষেধ সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টি কোনদিন নিস্তেজ হয় না, কোনদেশে এ পার্টিকে কেউ নিশ্চিহ্ন করতে পারে না। পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের নিশ্চিত বিজয়ের ভরসা ও জনতার বিপ্লবী শক্তি আমাদের মনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করবেই।

এই বিশ্বাস নিয়েই POC সারা প্রদেশে এবারকার নভেম্বর বিপ্লব দিবসগুলিতে ব্যাপকতম সমস্যা ও সভা করার জন্য প্রতিটি পার্টি সভ্য ও দরদীকে আহ্বান জানাচ্ছে।

নিরলস পরিশ্রমে শহরে ও গ্রামে কর্মীদল গঠন করে নভেম্বর বিপ্লবের প্রচার চালাতে হবে।

এ বছরের নভেম্বর দিবসের সামনে প্রধান আন্তর্জাতিক ঘটনা হচ্ছে—কোরিয়া প্রভৃতি স্বাধীনতাকামী দেশগুলির ওপর আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বর্বর আক্রমণ এবং তার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলে জর্জরিত এশিয়ার পরাধীন দেশগুলির ব্যাপক জনতার দুর্বার প্রতিরোধ, এবারকার নভেম্বর দিবসে আমাদের প্রধান কর্তব্য—গণতন্ত্র স্বাধীনতা ও শান্তির সংগ্রামে দেশের ভিতর ব্যাপকতম ঐক্য গঠন করা।

জনসাধারণের জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তাদের সমস্যা ও আশু প্রয়োজন বুঝে নিয়ে তাদের স্থানীয় ও আংশিক সংগ্রামগুলির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তি ও স্বাধীনতার লড়াইকে একীভূত করে তোলার কাজে অগ্রসর হতে হবে।

নভেম্বর বিপ্লবের বার্ষিকী উপলক্ষে জনতার এক বিরাট অভিযান সৃষ্টি করাই হবে পার্টি-সংকট কাটিয়ে ওঠার সংগ্রামে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ।

স্থানীয়ভাবে ছোট ছোট ২০০০ থেকে শুরু করে ৭ই নভেম্বর থেকে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত ১০ *দিন বিভিন্ন জেলায় ও কলকাতায় কয়েকটি কেন্দ্রীয় সমাবেশ করতে হবে।*

প্রচারের হাতিয়ার হিসাবে প্রচুর সংখ্যায় প্রাদেশিক ও স্থানীয় ইশতেহার, পোস্টার বিলি করতে হবে।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির লড়াইকে সামনে রেখে আমাদের কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। *স্টকহোম শান্তি কংগ্রেসের আবেদনে লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হবে।*

শ্রমিক, মধ্যবিত্ত জনসাধারণের রুটি রোজগার, বোনাস, মজুরি, কৃষকের জমি ও মজুরি, বাস্তুহারাদের কাজ, জমি ও অর্থ সাহায্য, ব্যক্তি স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, বন্দীমুক্তি প্রভৃতি দাবির সংগ্রামগুলিকে পূর্ণ স্বাধীনতা ও শান্তির জন্য দেশজোড়া বিরাট লড়াইয়ের ময়দানে সম্মিলিত করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদ, নেহরু সরকার ও দেশীয় বড় পুঁজিপতি জমিদার শ্রেণির অত্যাচার

এই প্রচার অভিযানের নেতৃত্ব করার জন্য প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনকে উদ্যোগী হতে হবে। নভেম্বর অভিযান সংগঠিত ও পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বে স্থানীয় শ্রমিক ইউনিয়ন, কৃষক সংগঠন, ছাত্র ও মহিলা, নওজোয়ান প্রভৃতি গণসংগঠন গুলিকে প্রতি এলাকায় প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বামপন্থী দল, পূর্ণ স্বাধীনতাকামী, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ব্যক্তি ও দলকে একযোগে এবারকার অভিযান সংগঠিত করার জন্য স্থানীয়, জেলা ও প্রদেশগতভাবে আবেদন করতে হবে। সোভিয়েতের নেতৃত্বে শান্তি, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার শিবিরে সমস্ত শ্রেণি ও স্তরের নরনারীকে জমায়েত করাই হবে সম্মিলিত অভিযানের উদ্দেশ্য।

অক্টোবর মাসের বাকী দিনগুলি এইভাবে প্রচার চালাতে পারলে নভেম্বর বিপ্লবের দশদিন দশটি জনসভা ও তার সাথে মিছিল সংগঠিত করা প্রত্যেক এলাকাতেই সম্ভব হবে। এই অভিযানে সর্বশ্রেণীর সর্ব দলের মানুষের ব্যাপকতম জনসমাবেশ করার ভিতর দিয়েই আমাদের কমিউনিস্ট যোগ্যতার পরীক্ষা হবে।

যুক্তভাবে প্রচার ও অভিযানের সংগঠন গড়ার সাথে সাথে প্রতি ইউনিটকে স্থানীয়ভাবে সোভিয়েত ও চীন সাহিত্য এবং প্রচার পুস্তিকা প্রচার করতে হবে। পার্টির জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। দোকান থেকে সরাসরি এই সব সাহিত্য সংগ্রহ করে প্রতি এলাকায় কর্মীরা দল বেঁধে প্রচারে নামবেন। এর ভিতর দিয়ে সোভিয়েতের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ, বাস্তুহারা ও খাদ্যসমস্যা সমাধানের বিপ্লবী পন্থাগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে হবে। স্থানীয়ভাবে লাইব্রেরী, স্কুল, কলেজ হল ও শ্রমিক বস্তীতে সোভিয়েতের বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র গঠন সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তৃতা মালার ব্যবস্থা করতে হবে। পোষ্টার ও ছবি প্রদর্শনের ভিতর দিয়ে সোভিয়েতের সমাজ ব্যবস্থা ও বিশ্ব শান্তি প্রচেষ্টা জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে হবে। শান্তি কমিটি, সোভিয়েত সুহৃদ, লেখকশিল্পী, গণনাট্য প্রভৃতি সংগঠনে কার্যরত কমরেডদের বিশেষভাবে অগ্রণী হয়ে এইসব কায়দায় সর্বত্র ব্যাপকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও নভেম্বর বিপ্লবের প্রচার কার্য চালাতে হবে।

এই বিরাট অভিযান সফল করতে হলে প্রত্যেক জেলা কমিটি LC ও সেলকে অবিলম্বে নিজ উদ্যোগে পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। কর্মীদের দলে দলে ভাগ করে ইস্তেহার, পোষ্টার ও সাহিত্য নিয়ে কাজে নামতে হবে। প্রতিটি কর্মী ও দরদী এই অভিযানের ভিতর দিয়ে পার্টি ও জনসাধারণের ভিতর যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে তার মূলোচ্ছেদ করতে অগ্রসর হবেন।

তবেই আমরা লেনিন-ষ্ট্যালিনের পার্টির উত্তরাধিকারী হিসাবে দাঁড়াতে পারব। জনসাধারণের প্রতি আমাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন করার জন্য কমিউনিস্ট হিসাবে আমাদের পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ ও লৌহ দৃঢ় করে গড়ে তুলতে সক্ষম হব। ভারতের পূর্ণ জাতীয় মুক্তি ও বিশ্ব শান্তির সংগ্রামে অগ্রসর হতে পারব। নভেম্বর বিপ্লবের অনির্বাণ শিখা আমাদের বিপ্লবী চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে তুলবে।

১৪ অক্টোবর ১৯৫০

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

নেপালের মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির ডাক

ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তল্পীবাহক নেপালের রাণাশাহীর বিরুদ্ধে নেপালের জনসাধারণ অভিযান শুরু করিয়াছে। শতাব্দীব্যাপী বর্বর সামন্ততান্ত্রিক শোষণ এবং পীড়নের বিরুদ্ধে জনতার এই সশস্ত্র বিদ্রোহ ভারতের নরনারীর মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। ভারতের সমগ্র গণতান্ত্রিক মানুষ আজ একান্ত আগ্রহের সহিত নেপালের ঘটনাবলী লক্ষ্য করিতেছে। ভারতের শ্রমিক-কৃষক ছাত্র-মধ্যবিত্ত সকলেই নেপালে সাম্রাজ্যবাদ ও রাণাশাহীর আশু অবসান চায়। নেপালের এই মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে ভারতের মুক্তি আন্দোলন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

নেপালের এই সশস্ত্র অভ্যুত্থান কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ঐতিহাসিক বিজয় ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে যে গণজাগরণের প্লাবন সৃষ্টি করে নেপাল তাহা হইতে বাদ পড়ে নাই। নেপালের জনগণের মধ্যে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা দানা বাঁধিতে থাকে। রাণাশাহীর নিরঙ্কুশ দমননীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ধূমায়িত হইতে থাকে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাম্রাজ্যবাদের সহিত রফা এবং নেপাল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের নেহরু প্যাটেল প্রভৃতি নেতাদের লেজুড়ীপনার ফলে নেপালের আন্দোলনও কিছুটা বিভ্রান্ত ও বিপর্য্যস্ত হয়। তা সত্ত্বেও জনতার রুটি, জমি ও স্বাধীনতার লড়াই কোন সময় বন্ধ হয় নাই।

কংগ্রেস নেতৃত্বের চরম বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান চালু হইবার পর মুহূর্তেই ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নেপালে নূতন করিয়া চক্রান্ত শুরু করে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজদের প্রধান লক্ষ্য হয় কি করিয়া নেপালের উপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করা যায়, নেপালকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং গণতান্ত্রিক চীনের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ ঘাঁটিতে পরিণত করা যায়। তাহা ছাড়া মালয়ে মুক্তি সংগ্রামকে দমন করিবার জন্যও তাহাদের প্রয়োজন হয় নেপালী সৈন্যের। ... নেপালের রাণাশাহী এবং ভারতের কংগ্রেসী সরকার একজোট হইয়াই তাহাদের প্রভু ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হুকুম তামিল করে। নেপালকে ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজিপতি এবং যুদ্ধবাজদের নিকট সঁপিয়া দেওয়া হয়।

এই সকল চক্রান্তের ফলে নেপালের দরিদ্র জনসাধারণের অবস্থা দুঃসহ হইয়া উঠে। একদিকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজ ও বিড়লাগোষ্ঠীর চক্রান্ত এবং অপরদিকে রাণাশাহীর সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগীয় শোষণ, এই দুয়ের চাপে পড়িয়া নেপালের ৭০ লক্ষ নরনারী নিষ্পেষিত হইতে থাকে। কিন্তু চীনের মুক্তিসংগ্রামের ঐতিহাসিক সাফল্য এবং প্রতিবেশী

তিব্বতের মুক্তিসংগ্রাম শোষিত নেপালী জনতার মনে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে।

তাই রাণাশাহীর সহিত নেপাল রাজার স্বার্থের সংঘাত যে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করিয়াছে তাহার মধ্য দিয়াই গণ বিক্ষোভ আজ সশস্ত্র অভিযানের রূপ লইয়াছে। নেপালী কংগ্রেসের নেতাদের রাজার প্রতি আপসপন্থী মনোভাব এবং বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গির একান্ত অভাব সত্ত্বেও জনসাধারণের এই সশস্ত্র অভিযান নেপালের জীবনে আজ এক বিরাট বিপ্লবী সম্ভাবনা উপস্থিত করিয়াছে। একমাত্র শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে কৃষক ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী শ্রেণি ও দল এবং প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত ফ্রন্ট এবং ব্যাপক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়াই নেপালী জনতার রুটি, জমি, স্বাধীনতা, শান্তি ও গণতন্ত্রের দাবি পূরণ হইতে পারে।

এই গণবিপ্লবকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন কৃষি বিপ্লবের পক্ষে এই সশস্ত্র সংগ্রামকে এখনি পরিচালিত করা। নেপালী কৃষকের হাতে জমি এবং অস্ত্র দিয়া ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং রাণাশাহীর উপর চরম আঘাত হানা সম্ভব হইবে। ভূমিদাস প্রথা হইতে মুক্ত, সশস্ত্র কৃষকের অজেয় গণ ফৌজের সম্মুখে রাণাশাহীর কোন প্রতিরোধই দাঁড়াইতে পারিবে না। আজ জনতার আক্রমণের পালা শুরু হইয়াছে। দ্বিধাহীনভাবে এই আক্রমণকে ব্যাপক এবং সর্বাঙ্গীন করিয়া তুলিতে হইবে। কৃষি বিপ্লব এবং ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের ভিত্তিতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও অভিযানের পথে অগ্রসর হইলে নেপালী জনতার বিজয় অনিবার্য।

এই অভিযান সম্পর্কে আমরা মুক্তিকামী নেপালী ভাই-বোনদের কোন কোন বিষয়ে সতর্ক করা দরকার মনে করি। তিব্বতের মুক্তি অভিযান সফলতার পথে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া তাহার প্রতিবেশী, নেপালী জনতার অভ্যুত্থান যেভাবে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে তাহারা যে নেপালের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখিবার জন্য মরিয়া হইয়া চেষ্টা করিবে একথা ভুলিলে চলিবে না। নেহরু সরকার যে মধ্যস্থতার ভান করিয়া সামান্য সংস্কারের বদলে ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধবাজদের স্বার্থে নেপালী জনতার মুক্তি অভিযানকে বানচাল করিতেই চেষ্টা করিবে তাহাও মনে রাখিতে হইবে। ইহাও দেখিতে হইবে যে নেপালী কংগ্রেসের উপরের নেতারা নেপালের রাজাকে সমর্থন করিতে থাকিলে এবং ভারতীয় কংগ্রেসের বিশ্বাসঘাতক নেতৃত্বের প্রভাবের মধ্যে পড়িয়া থাকিলে তাঁহারা নেপালী জনতার বিপ্লবী অভিযানকে সফলতার পথে অগ্রসর করিতে পারিবেন না। তাই নেপালী জনতার শান্তি, স্বাধীনতা ও জমির জন্য এই অভিযানকে সার্থক করিতে হইবে দিল্লীতে পর্দার আড়ালে সলাপরামর্শের ভিতর দিয়া নয়, নেপালের শহরে ও গ্রামে জনতার সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়া।

নেপালী নরনারীকে আজ তাই নেহরু সরকারের কারসাজী সম্পর্কে বিশেষভাবে হুঁশিয়ার থাকিতে হইবে। যে নেহরু সরকার নিজের দেশে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের পাহারাদার হইয়া রহিয়াছে তাহা কখনও নেপালে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান ঘটাইতে সাহায্য করিবে না। যে নেহরু সরকার নিজের দেশকে প্রতিনিয়ত ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্তে জড়াইতেছে, তাহা কখনও নেপালকে এই চক্রান্ত হইতে মুক্ত করিতে পারে না। যে নেহরু সরকার সারা ভারতে বিড়লা-সিংহানিয়া গোষ্ঠীর অবাধ লুণ্ঠনের পাকা ব্যবস্থা করিয়া দিতেছে, ধনিক শ্রেণির আজ্ঞাবাহক সেই নেহরু সরকার কখনও নেপালে বিড়লা গোষ্ঠীর স্বার্থে আঘাত করিবে না। নেহরু সরকার তেলেঙ্গানায় শত শত কৃষককে হত্যা করিয়া হায়দরাবাদে আজও

নিজামশাহী রক্ষা করিতেছে, রাজা মহারাজা শ্রেণির পরম বন্ধু সেই নেহরু সরকার কখনও নেপালে রাণাশাহীর উচ্ছেদ চাহিতে পারে না।

সাম্রাজ্যবাদ ও রাণাশাহীর বিরুদ্ধে নেপালী জনতার বিপ্লবী অভিযানকে পরিচালনা করিবার জন্য নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি নেপালী কংগ্রেস, নেপালী রাষ্ট্রীয় কংগ্রেস ও অন্যান্য সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠনের যে আবেদন করিয়াছে আমরা তাহা আন্তরিক ভাবে সমর্থন করি।

নেপালের এই গণবিপ্লব ও তিব্বতের মুক্তি অভিযান ভারতের গণবিপ্লবকে আসন্ন ও অনিবার্য করিয়া তুলিতেছে। ভারতে জমি, রুটি, স্বাধীনতা, শান্তি ও গণতন্ত্রের সংগ্রাম আমাদের প্রতিবেশী দেশের জনতার সংগ্রামের সহিত অবিচ্ছেদ্য।

আমরা পশ্চিমবাংলার জনসাধারণের পক্ষ হইতে নেপালের সশস্ত্র গণ অভ্যুত্থানকে অকুণ্ঠ সম্বর্দ্ধনা ও সমর্থন জানাই। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের রক্ষী নেপালের সরকারি ফৌজ নেপালী জনসাধারণের সহিত যুক্ত হউক। কৃষক জনতা ও গণফৌজের সম্মিলিত শক্তি সমস্ত শোষণ ও অত্যাচারের ধ্বংসস্তূপের উপর স্বাধীন গণতান্ত্রিক নেপালের ভিত্তি প্রস্তুত করিবে।

নেপালের মুক্তি শুধু ভারতেব মুক্তি আসন্ন করিবে না, বর্মা ও মালয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও শাসন অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যে নেপালী সৈন্য ব্যবহার হইতেছে, নেপালের গণবিপ্লব মালয় ও বর্মায় প্রেরিত সেই নেপালী ফৌজের মনেও বিপ্লবী চাঞ্চল্য আনিতে বাধ্য। নেপালের জনতার এই অভ্যুত্থান বিপ্লবী বর্মী এবং মালয়ী জনতার অভিযানে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে প্রচণ্ড আঘাত হানিবে।

দ্বিধাহীন কৃষিবিপ্লবের ও সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়া যে নতুন নেপাল জন্মলাভ করিতেছে, তাহা সোভিয়েত দেশের নেতৃত্বে পরিচালিত সারা বিশ্বের শান্তি ও গণতন্ত্রের শিবিরেরই অংশীদার।

আমরা ভারতের জনতার পক্ষ হইতে এই নবীন নেপালকে সম্বর্দ্ধনা জানাই। কৃষিবিপ্লব ও জনতার সশস্ত্র সংগ্রামই বিজয়ের পথ।

আপসকামী নেতৃত্ব সম্বন্ধে হুশিয়ার। নেপাল ও ভারতের জনতার বিপ্লবী ঐক্য জিন্দাবাদ।

১৫ নভেম্বর ১৯৫০

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

এটম-দস্যুদের শয়তানী চক্রের বিরুদ্ধে শান্তিকামী জনগণ এক হও

কোরিয়ার ম্যাকআর্থারের সাম্রাজ্যবাদী বাহিনী কোরিয়ার গণমুক্তি ফৌজ, কোরীয় গেরিলা বাহিনী ও চীনা স্বেচ্ছাবাহিনীর মিলিত চাপে মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে দেখে দস্যু-সর্দার ট্রুম্যান এটম বোমা দিয়ে কোরিয়াকে ধ্বংস করার মতলব করেছে। সাম্রাজ্যবাদী ডাকাতরা মরিয়া হোয়ে এইভাবে কোরিয়া ও চীনের মুক্ত জনগণকে ধ্বংস করতে চায়।

ট্রুম্যানের এই ব্যাপক গণহত্যার প্ল্যান সারা দুনিয়ার সাধারণ মানুষকে ধ্বংস ও মৃত্যুর মুখে তুলে দিচ্ছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ডাকাতদের এবং তাদের সর্দার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সে মতলব সকল দেশের শান্তিকামী জনগণ ব্যর্থ করবেই।

আজ দুনিয়ার পঞ্চাশ কোটি মানুষ এটম বোমা বে-আইনি করার জন্য সই দিয়ে মত প্রকাশ করেছে। এই পঞ্চাশ কোটি মানুষের এবং তাদের মতো আরো যে কোটি কোটি মানুষ সে মত পোষণ করে তাদের সকলেরই চোখে একথা আজ দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ট্রুম্যান ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা মানবতা-বিরোধী ঘৃণ্য দস্যু ছাড়া কিছু নয়।

যে এটম বোমা ও ব্যাপক ধ্বংসের অস্ত্রের ঘটা দেখিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা অন্যান্য দেশের সাম্রাজ্যবাদীদের নিয়ে শয়তানী জোট পাকিয়ে দুনিয়ার সাধারণ মানুষকে তাদের গোলাম বানাতে চেষ্টা করছে, এই এটম বোমা এখনি ব্যবহার করা হবে শুনে এবং তার বিরুদ্ধে পৃথিবীর জনমত যে অত্যন্ত শক্তিশালী তা বুঝে ট্রুম্যানের দোসর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা পর্যন্ত এই জাগ্রত জনমতকে উপেক্ষা করে এটম বোমা ব্যবহার করা সম্বন্ধে ইতস্তত করতে বাধ্য হচ্ছে।

এই অবস্থা ঘটেছে সোভিয়েত দেশের নেতৃত্বে সারা পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তি আন্দোলনের যে ব্যাপক প্রচার চলছে, এটম বোমার বিরুদ্ধে যে শক্তিশালী জনমত তৈরি হয়েছে, তারি ফলে। এই শান্তি আন্দোলনই আজ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্তে ফাটল ধরিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদকে পিছু হঠিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে চিরকালের জন্য বন্ধ করতে হলে এই শান্তি আন্দোলনকে এখনি আরো জোর দিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এই শান্তি আন্দোলনকে সারা দেশে সর্বাত্মক আন্দোলন হিসাবে ছড়িয়ে দেবে তারাই যারা শান্তিকামী সাধারণ মানুষ, যারা কোটি কোটি সাধারণ মানুষকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে চায়।

এই আন্দোলনকে শতগুণ ব্যাপক ও শক্তিশালী করবার জন্য সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও যুদ্ধ বিরোধী জনতাকে সচেতনভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসতে হবে, সমস্ত শ্রমিক কৃষক

মধ্যবিত্ত ছাত্র নৌজোয়ান মহিলা ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধীদের দায়িত্ব নিতে হবে। শহরে এই দায়িত্ব প্রধানত থাকবে শ্রমিক, ছাত্র ও নৌজোয়ানদের উপর, গ্রাম এলাকায় থাকবে প্রধানত কৃষকদের উপর। এজন্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও যুদ্ধ-বিরোধী সমস্ত গণতান্ত্রিক পার্টি, দল, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এই ঐক্যই খুনে এটম-জল্লাদদের হাতকে পঙ্গু করে দেবে।

আমাদের দেশে সমস্ত যুদ্ধ-বিরোধী ও শান্তিকামী জনতা চায় যেন নেহরু গবর্নমেন্ট সাম্রাজ্যবাদের সাথে সকল সম্পর্ক এখনি ত্যাগ করে। এই জনতাকে চারিদিক থেকে কোটি কণ্ঠে আওয়াজ তুলতে হবে ঃ নেহরু গবর্নমেন্ট, অবিলম্বে বৃটিশ কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে এস, কোরিয়া চীন ও অন্যান্য দেশের উপর ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সমস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে সোভিয়েত দেশ ও জনতার চীনের মতো রুখে দাঁড়াও, সোভিয়েত দেশ ও চীনের সাথে বিশ্ব শান্তি আন্দোলনে জনগণের সমর্থনে এগিয়ে এস।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং জনগণের শান্তির পক্ষে আমাদের দেশের সর্বত্র সমস্ত জনতাকে আজ এমন এক প্রবল আন্দোলনের ঢেউ তুলতে হবে যাতে সাম্রাজ্যবাদীরা এটম বোমা ও বিশ্বযুদ্ধের নাম পর্যন্ত মুখে আনতে সাহস না পায়, যাতে কোরিয়া ও চীনের বাহাদুর জনগণের মতো ভারতের জনগণকেও শান্তি ও মুক্তির জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের ও যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের পাশে দাঁড় করান যায়।

- অবিলম্বে এটম বোমা বে-আইনি কর
- ব্যাপক ধ্বংসের সমস্ত অস্ত্র বে-আইনি কর
- সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বন্ধ কর
- কোরিয়া ও ফরমোসা থেকে বিদেশী সৈন্য সরাও
- নেহরু সরকার, ইঙ্গ-মার্কিন জোট ছেড়ে দাও
- জনগণের শান্তি জিন্দাবাদ
- সোভিয়েত চীন ভারত ঐক্য জিন্দাবাদ

২ ডিসেম্বর ১৯৫০

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

- ট্রুম্যানের এটম হুমকির জবাব দিন
- শান্তি আন্দোলনকে শক্তিশালী করুন
- ওয়ারস শান্তি কংগ্রেসের বাণী
জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দিন।

কোরিয়ার যুদ্ধে সেখানকার জনসাধারণের এবং গণতান্ত্রিক চীনের বিরুদ্ধে এটম বোমা প্রয়োগ করবার কথা মার্কিন যুদ্ধবাজদের সর্বাধিনায়ক প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের মুখ হতে উচ্চারিত হবার পরই সারা বিশ্বে এক বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর শান্তিকামী জনগণের মানবশত্রু মার্কিন যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এবং ঘৃণা ফেটে পড়ছে। এতদিন যারা মার্কিন যুদ্ধবাজদের মিথ্যা প্রচারে বিশ্বাস করত তাদেরও অনেকেই আজ বুঝতে পারছে যে, মার্কিন যুদ্ধবাজরা সভ্যতা এবং সমগ্র মানবজাতির ঘৃণ্যতম শত্রু।

এই কারণেই আজ যুদ্ধবাজদের নিজেদের শিবিরেও গরমিল এবং সংঘাত দেখা দিয়েছে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী প্রায় রাতারাতি সাগর পাড়ি দিয়ে একেবারে মার্কিন মল্লুকে উপস্থিত হয়েছেন। এটম বোমার কথায় বৃটেনের গণমত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। এটলির আর সাধ্য নেই এই জাগ্রত গণমতকে উপেক্ষা করার। এই ঘটনা শান্তি আন্দোলনের শক্তি এবং যুদ্ধ-শিবিরের দুর্বলতারই সাক্ষ্য দেয়।

এটম হুমকি দেওয়ার ফলে মার্কিন দস্যুদের নৈতিক এবং রাজনৈতিক পরাজয়ই আরো বেশি করে সূচিত হয়েছে। আজ সমগ্র বিশ্ব এই মুষ্টিমেয় ঘৃণিত এটম আততায়ীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে। নিমেষে শান্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রের ও পরিধি বহুগুণ সম্প্রসাবিত হয়েছে। মার্কিন যুদ্ধবাজরা আজ নিজেদের অনুচরবর্গের উপরও পুরোপুরি নির্ভর করতে পারছে না।

কিন্তু মার্কিন দস্যুদের এই গণহত্যার চক্রান্তকে শান্তিকামী জনসাধারণকে নিজেদের মিলিত শক্তির বলেই পরাস্ত করতে হবে। এরজন্য সর্বাগ্রে শান্তি আন্দোলনকে ব্যাপকতর করে তুলতে হবে। তাই আমাদের কর্ত্তব্য ওয়ারস কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত এবং ঘোষণার ভিত্তিতে শান্তি আন্দোলনকে আরো ব্যাপক এবং সক্রিয় করে তোলা। এই কাজে সকলকেই অগ্রসর হতে হবে। প্রতিটি পার্টি সভ্যের এ একটি অতি পবিত্র কর্ত্তব্য। শান্তি আন্দোলন কোন বিশেষ শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাই যিনি যেখানেই থাকুন না কেন, ওয়ারস শান্তি আন্দোলনের ঐতিহাসিক দাবির পিছনে গণমত সংগঠিত এবং সক্রিয় করে তুলুন।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ভিতর দিয়ে

যুদ্ধশিবিরের আভ্যন্তরীণ সংকট মূর্ত হয়ে উঠেছে। নেহরু সরকারের সহিত তার ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুদের বিশেষ করে মার্কিন প্রভুদের সংঘাত এই সংকটেরই পরিচায়ক। নেহরু সরকার মোটেই সাম্রাজ্যবাদ জোট পরিত্যাগ করেনি। কিন্তু এই সংঘাতকে উপেক্ষা করা চলে না; তা আমাদের আন্দোলনের ক্ষেত্র বাড়াচ্ছে। তাই ওয়ারসা শান্তি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত এবং ঘোষণা প্রচার করার সঙ্গে সঙ্গে নেহরু সরকার সম্পর্কে নিম্নলিখিত দাবিগুলি বিশেষভাবে উপস্থিত করা আবশ্যক ঃ

(১) নেহরু সরকারকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এটম বোমার বিরুদ্ধে ঘোষণা করতে হবে। ভারতে যুদ্ধ প্রচার নিষিদ্ধ করতে হবে।

(২) এটম যুদ্ধবাজ ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধশিবিরের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে। কমনওয়েথ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

(৩) কোরিয়া এবং তাইওয়ান (ফরমোসা) থেকে সকল বিদেশী সৈন্যের আশু অপসারণ দাবি করতে হবে।

(৪) শান্তিপূর্ণ উপায়ে কোরিয়ার দুই অংশেরই প্রতিনিধিদের সহযোগিতার এবং চীনের জনতার গণতন্ত্রকে রাষ্ট্র সংঘে স্বীকার করে রাষ্ট্র সংঘের মারফৎ কোরিয়া সমস্যার সমাধান করতে হবে।

(৫) বিশ্বশান্তি রক্ষা কল্পে সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীনের জনতার গণতন্ত্রের সহিত সকল প্রকারে সহযোগিতা করতে হবে।

(৬) চীনের জনতার গণতন্ত্র-সহ বৃহৎ পঞ্চশক্তির আশু সম্মেলনের প্রস্তাব সমর্থন করতে হবে।

শান্তি আবেদনে গণ-দরখাস্ত হ'তে শুরু করে গণসমাবেশ প্রভৃতি আন্দোলনের সকল কায়দাই ব্যবহার করতে হবে। বিভিন্ন ফ্রন্টের কমরেডরা নিজ নিজ ফ্রন্ট বা এলাকায় উদ্যোগী হয়ে এখনি এই আন্দোলন শুরু করুন, এবং সমস্ত জনতাকে আন্দোলনের মধ্যে টেনে আনুন। সঙ্গে সঙ্গে শান্তি কমিটি গড়ার দিকেও নজর দিন।

ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণে মহান সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে এই ঐতিহাসিক বিশ্বব্যাপী শান্তি আন্দোলনে আজ আমাদের সকলকেই সামিল হতে হবে।

বিপ্লবী অভিনন্দনসহ

৬ ডিসেম্বর ১৯৫০

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

মহান ষ্ট্যালিনের ৭১তম জন্ম দিবস পালন করুন

আগামী ২১শে ডিসেম্বর মহান ষ্ট্যালিনের জন্ম দিবস। মুক্তিকামী মানুষের ইহা একটি স্মরণীয় দিন। পার্টি-সভ্য ও দরদীদের এই দিবসটি যথাযোগ্যভাবে পালন করিবার জন্য আহ্বান জানান হইতেছে।

আজিকার দুনিয়ার শান্তি এবং মানব-মুক্তির বিশ্ব-জোড়া সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিনায়ক, ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা মহান ষ্ট্যালিনের জন্ম দিবস পালন উপলক্ষ্যে বিশ্ব শান্তির অভূতপূর্ব মহাসংগ্রামকে আরও অধিকতর ব্যাপক এবং শক্তিশালী করিয়া তুলিবার শপথ আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। সমগ্র মানব জাতির এই বিরাট সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মহান ষ্ট্যালিনের যুগান্তকারী নেতৃত্ব এবং ভূমিকার কথা জনগণের সম্মুখে স্পষ্টতর করিয়া তুলিয়া ধরিতে হইবে।

একমাত্র এইভাবেই ষ্ট্যালিনের জন্ম-দিবস সমুচিতভাবে পালন করা যায়।

কেন্দ্রীয়ভাবে এবং বিভিন্ন এলাকায় পার্টি-সভ্য এবং দরদীরা সভা, শোভাযাত্রা, সাহিত্য প্রচার প্রভৃতির ভিতর দিয়া ষ্ট্যালিনের বাণী জনগণের ব্যাপকতম অংশের মধ্যে বহন করিয়া লইবার জন্য উদ্যোগী হউন।

প্রতিটি সভায় কমরেড ষ্ট্যালিনের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া এবং তাঁহার প্রতি ভারতের জনতার অকৃত্রিম ভালবাসা ও অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়া প্রস্তাব পাশ করিতে হইবে। এই সকল প্রস্তাবের কপি নয়া দিল্লীস্থ টাস এজেন্সীতে এবং অন্যান্য সংবাদপত্রে অবশ্যই পাঠাইতে হইবে।

মহান ষ্ট্যালিন জিন্দাবাদ * সোভিয়েত ইউনিয়ন জিন্দাবাদ * সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী জিন্দাবাদ * বিশ্বশান্তি জিন্দাবাদ

১৮ ডিসেম্বর ১৯৫০

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

ইনফরমেশন ডকুমেণ্ট নং বাং ১ পঃ বঃ
(জ্ঞাতব্য দলিল)
[পার্টি ইউনিট ও পার্টি সভ্যদের জন্য]

পাবলো নেরুদার

কথোপকথন

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির
পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি

৫ই ডিসেম্বর ১৯৫০

দাম—এক আনা

ভারতের দ্বিতীয় শান্তি কংগ্রেসের প্রস্তুতি কমিটি ও সারা ভারত ও বোম্বাইয়ের শান্তি কমিটির কয়েকজন সদস্যের সাথে পাবলো নেরুদার কথোপকথন

রিপোর্ট ঃ এই বিবরণী হতে টুকে নেওয়া হয় (সর্টহ্যান্ড নয়)। সুতরাং এর মধ্যে অসম্পূর্ণতা থাকা অপরিহার্য্য। কিন্তু তার কথোপকথোনের সারমর্ম এর মধ্যে সঠিকভাবে দেওয়া হয়েছে।

পাবলো নেরুদা ঃ বিশ্বশান্তি কমিটির পক্ষ থেকে আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। ভারত থেকে বিশ্বশান্তি কংগ্রেসে কারা কারা এবং কি প্রকারের প্রতিনিধি দল যাওয়া প্রয়োজন আমার এখানে আসা সেই কাজের সম্পর্কেই। আপনাদের অসুবিধা আমি জানি। বিশ্বশান্তি কংগ্রেসও একথা জানে। এখানে এসে আমি নিজেই সে অসুবিধা ভোগ করেছি। আমার সঙ্গে বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের পুস্তিকা ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ছিল, তার কতগুলি এমনকি আমার ব্যক্তিগত কিছু চিঠিপত্রও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আমাকে দিল্লী ছাড়া আর কোথাও না যেতে বলা হয়েছে। মূল্যবান পনেরটি দিন ভিসা পাবার চেষ্টায় প্যারিসে নষ্ট হয়েছে। এই পথে মেক্সিকো যাবার জন্য মাত্র আমাকে একটি ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। আপনাদের কনভেনসনে উপস্থিত থাকার জন্যে আমি আগ্রহান্বিত ছিলাম। কিন্তু আমি কারুর অসুবিধা সৃষ্টি করতে চাইনি এবং কোন উসকানী দিতে যাইনি যে অজুহাতে শেষ পর্যন্ত এমন কি কনভেনসনটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

"বিশ্বশান্তি কংগ্রেসে ভারতের প্রতিনিধিত্বের সম্বন্ধে বিশ্বশান্তি কমিটী বিশেষ আগ্রহশীল। অতীতে সব জায়গায়ই ভুল করা হয়েছে; কমিটিতে সে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, ল্যাটিন আমেরিকায় আগেকার প্রতিনিধি দল শুধু কমিউনিস্টদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। কিন্তু আমাদের কংগ্রেস কেবলমাত্র কমিউনিস্টদের কংগ্রেস নয়। সব স্তরের জনগণ এবং জনসংখ্যার প্রত্যেক অংশের লোককেই আমাদের নিয়ে আসতে হবে। শান্তি আন্দোলন অত্যন্ত ব্যাপক একটি আন্দোলন সুতরাং যথাসম্ভব ব্যাপক সমর্থন একে অর্জন করতে হবে।

"বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের তরফ থেকে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে ভারতবর্ষের অন্যান্য লোককে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। এর মানে এই নয় যে, কমিউনিস্টরা কেউ যাবেন না। তারা যে গণ-সংগঠনে কাজ করে তার পক্ষ থেকে তাঁরা যেতে পারেন, এবং তাঁদের যাওয়া উচিত।"

মিষ্টার নেরুদা শান্তি কমিটির প্রতিনিধিদের যাওয়া সম্ভব কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তাঁকে উত্তর দেওয়া হয় যে, পাসপোর্ট পাওয়া খুবই কঠিন। গত বছর দুজন ছাত্র প্রতিনিধি ও ডাক্তার আনন্দের পাসপোর্ট বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। এবং অনেককে পাসপোর্ট দিতে অস্বীকার করা হয়েছিল।

মিষ্টার নেরুদা প্রত্যুত্তরে বলেন যে এই রকম ব্যাপার ঘটলে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট গভর্নমেন্টকে টেলিগ্রাফ পাঠানো উচিত। মিষ্টার নেরুদা আশ্বাস দেন যে সব প্রতিনিধিদের

প্রয়োজন আছে এবং কংগ্রেসে যাদের উপস্থিতি বিশ্বশান্তি আন্দোলনের পক্ষে ও ভারতের আন্দোলনের পক্ষেও মূল্যবান সম্পদবিশেষ, তাঁদেরকে সংগৃহীত বিশ্বশান্তি তহবিল থেকে সাহায্য দেওয়া যেতে পারে।

কনভেনসনে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর জন্যে তিনি কমিটিকে অভিনন্দন জানান। সম্প্রতি অধিকতর সই সংগ্রহের সাফল্যের জন্য তিনি ভারতের শান্তি যোদ্ধাদের অভিবাদন জানান। কিন্তু তিনি বলেন, ইহার জন্য আরো অনেক অগ্রগতি হওয়া দরকার।

মিষ্টার নেরুদা বলেন, জাতিসংঘে ভারতবর্ষ কোরিয়ার প্রশ্নে শান্তি ও যুদ্ধপ্রশমনের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন। আপনারা হয়তো তা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করতে নাও পারেন। কিন্তু, এই বাস্তব ঘটনাকে অবহেলা করা যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে কোন কথায় অন্যান্য অনেক দেশই 'হাঁ' বলে দেয়। ভারতের মতো বিরাট দেশ এই প্রথম সাম্রাজ্যবাদীদের মতে সম্পূর্ণভাবে সায় দিল না। শান্তি আন্দোলনকে আন্দোলনের এই নিশ্চিত ঘটনাটি বিবেচনা করে দেখতে হবে।

তারপর মিঃ নেরুদাকে কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়।

(১) প্রথম প্রশ্ন ঃ শান্তি আন্দোলনের সঙ্গে জনগণের বিভিন্ন অংশের এবং ঔপনিবেশিক দেশসমূহের জাতির মুক্তি সংগ্রামের সম্পর্ক কি?

তিনি উত্তর দেন ঃ "শান্তির সঙ্গে জনগণের আন্দোলনকে আপনারা মিলিত করতে পারেন। কিন্তু শান্তি আন্দোলনকে সকল সংগ্রাম ও আন্দোলনের সঙ্গে এক করে দেখা চলে না।"

কথাটিকে ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, যখন আমরা শ্রমিকদের কাছে শান্তির কথা বলি, তখন শান্তি কেমন করে সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি নিয়ে আসে, কেমন করে তাদের শ্রম-ব্যবস্থা উন্নত করে এই কথাই আমরা বলি। কিন্তু শান্তিফ্রন্টের প্ল্যাটফর্ম থেকে আমরা একথা বলতে পারি না যে শান্তি আন্দোলনকে বিভিন্ন অংশের সব সংগ্রামকেই সমর্থন করতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ান, কৃষক সভার মতো সংগঠনের চেয়ে শান্তি আন্দোলনের ব্যাপকতর ভিত্তি রয়েছে। শান্তি আন্দোলনের মধ্যে অনেকেই ঐ সব সীমাবদ্ধতার সাথে সায় নাও দিতে পারেন। অন্যান্য সমস্ত রকম আন্দোলনের সঙ্গে যদি শান্তি আন্দোলনকে এক করে ফেলেন তবে শান্তি আন্দোলন ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে, এবং সঙ্কীর্ণ হয়ে যাবে।

২। দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ শান্তি আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি ও জনশত্রুদের নাম কি উল্লেখ করা উচিত?

মিঃ নেরুদা উত্তর দেন, "শান্তি আন্দোলন, তার প্রোগ্রামে বা ঘোষণাতে কোন দেশেরই নাম উল্লেখ করা যায় না। প্যারিস ইস্তাহারে ও স্টকহোম আবেদনে তা করা হয়নি। কারণ শান্তি আন্দোলনকে হতে হবে একটি ব্যাপকতম আন্দোলন। কোন বিশেষ সাম্রাজ্যবাদী দেশের বিরুদ্ধে লড়াই করার উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ কেউ শান্তি আন্দোলনে যোগ দিতে পারেন; আবার অন্যান্য অনেকে এতে একমত নাও হতে পারে। কিন্তু তবুও অন্য কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে তাঁরা শান্তি আন্দোলনে যোগ দেন; যেহেতু সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধলিপ্সুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার সঙ্গেই শান্তি আন্দোলন সংযুক্ত। কাজেই উভয়েই যখন যুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে রাজী হন তখনই শান্তি আন্দোলনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

স্টকহোম আবেদনে বলা হয়েছে, যে দেশ প্রথমে এটম বোমা ফেলবে তাকে যুদ্ধপরাধী বলে গণ্য করা হবে। এই কথা যারা মানবেন তাঁরাই শান্তি যোদ্ধা বলে পরিগণিত হবেন। কিন্তু কাজ করার সময়, যখন নানা প্রশ্ন উঠবে, আপনারা আপনাদের ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করতে পারেন। আন্দোলন থাকবে উচ্চতর ও ব্যাপকতর স্তরে, কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র নীতিতে যেন তা না পর্য্যবসিত হয়। নাম উল্লেখ না করলেও প্রত্যেকেই সাম্রাজ্যবাদকে বুঝতে পারবে। যদি সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রথম এটম বোমা ফেলে তাহলেও শান্তি আন্দোলন তাকে অপরাধী বলে ঘোষণা করবে কি? কেউ এই প্রশ্ন করলেও আমরা বলবো "হ্যাঁ"। কারণ আমরা জানি, সোভিয়েত ইউনিয়ন ওরকম করবে না। আমাদের ভয় পাবার কি আছে? কোরিয়ার প্রশ্নেও একই কথা। যুক্তরাষ্ট্রের নাম করলে, আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ করা হবে, অথচ শান্তির প্লাটফর্মকে সীমাবদ্ধ করলে চলবে না। এ হচ্ছে আন্তর্জাতিক আন্দোলন, ইহাই ক্রমেই আরো বেশি বেশি বিস্তৃত করা দরকার এবং এর সঙ্কীর্ণতাকে ক্রমেই আরো কমিয়ে আনা দরকার।

আরেকটি প্রশ্ন করা হয়েছিল—

"সই সংগ্রহের সময় জনসাধারণ জিজ্ঞেস করে এতে কোন লাভ আছে কি?"

মিঃ নেরুদা উত্তর দেন : আমাকেও অনেকে এই প্রশ্ন করেছেন। কারণ হচ্ছে, প্রথমত স্টকহোম আবেদনে সই দেওয়ার অর্থই যুদ্ধের বিরুদ্ধে কিছু না কিছু করা—এই হল যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রাথমিক কাজ। আপনি যদি সই না দেন, যুদ্ধের বিরুদ্ধে আপনি কিছুই করলেন না এবং প্রকৃতপক্ষে আপনি যুদ্ধের সমর্থনই করলেন।

দ্বিতীয়ত কেউ যদি সই দেন, সে সই একমাত্র একজনের নয়, তা হল পৃথিবীব্যাপী কোটী কোটী মানুষের স্বাক্ষরের অন্যতম। এই প্রথম শান্তির সমগ্র সৈন্যবাহিনী সই করছেন, যুদ্ধের বিরুদ্ধে কিছু করছেন। এটা একটা প্রচণ্ড শক্তি একথা উপলব্ধি করা দরকার।

তৃতীয়ত ফ্রান্সের শ্রমিকদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাঁরা যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছে। স্টকহোম আবেদনে সই করার মধ্য দিয়ে এই শ্রমিকরা যুদ্ধের বিরোধী চেতনা লাভ করেছিল বলেই এই কাজ তারা করতে পেরেছে। এই প্রাথমিক পদক্ষেপ ব্যতীত একাজ সম্ভব হত না।

চতুর্থত বিশ্বশান্তি কমিটিতে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস স্টকহোম আবেদনে ৫০ কোটি মানুষের স্বাক্ষর এসেছে বলেই কোরিয়াতে এটম বোমা ফেলা হয়নি। আমাদের মনে হয়, এই কাজটি না করলে সেখানে নিশ্চয়ই এটম বোমা ফেলা হত।

আরেকটি প্রশ্ন ছিল, অনেকেই জিজ্ঞেস করেন, "সকল রকম অস্ত্র-শস্ত্রকেই বে-আইনি ঘোষণা না করে একমাত্র এটম বোমাকেই বে-আইনি ঘোষণা করা হবে কেন?"

জবাবে মিঃ নেরুদা বলেন, প্রত্যেকেই তার মতামত শান্তি আন্দোলনে ও বিশ্বশান্তি কংগ্রেসে আলোচনার জন্যে দিতে পারেন। প্রাগ্ প্রস্তাবে ইতিমধ্যে এই প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্টকহোম আবেদনের চেয়েও প্রাগ্ প্রস্তাব আরো ব্যাপকতর।

আরেকটি প্রশ্ন করা হয়েছিল :—ভারতের অনেক জায়গায়ই ভীষণ দমননীতি চলছে, এবং শান্তির কর্মীরাও তা থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। আমাদের কেমন করে এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে?

তিনি উত্তরে বলেন, বিভিন্ন কায়দা ব্যবহার করতে হবে। ধরুন, জনসাধারণকে এই

দমননীতির কথা জানাতে হবে, গভর্নমেন্টকে এই দমননীতি বন্ধ করতে অনুরোধ জানিয়ে টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে, এমন ধরনের সমস্ত কায়দা। তিনি বলেন প্রধান কথা হচ্ছে, শান্তি আন্দোলনকে ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলতে হবে, জীবনের বিভিন্ন দিকের লোককে—নূতন নূতন লোককে টেনে আনতে হবে। এমন সব লোককে টেনে আনতে হবে যাদের আনবার ফলে সর্বসাধারণের আন্দোলনে পরিণত হতে পারে। এবং তাহলে কারো পক্ষেই এই আন্দোলন দমন করা সম্ভব হবে না।

মিঃ নেরুদা বলেন, শান্তি আন্দোলনকে সবল রাখতে হলে বিভিন্ন ধরনের উপায় নেওয়া দরকার, স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী, বিতর্ক সভা, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি নানাবিধ উপায় অবলম্বন করতে হবে। "মেক্সিকোতে একটি অতি চমৎকার উপায় আমি দেখেছিলাম, সেখানে যুদ্ধ ও শান্তির উপর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আঁকা ছবির একটা প্রদর্শনী করা হয়েছিল। এই প্রদর্শনী খুবই ভাল হয়েছিল। ফিল্ম শো, গান, সভাসমিতি প্রভৃতি আমাদের আন্দোলনের পক্ষে ভালো পদ্ধতি।"

শান্তি আন্দোলনে দমননীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শান্তি আন্দোলনকে লুকিয়ে রাখা যায় না বা তাকে গোপনভাবে রাখা যায় না। আর্জেন্টিনা ও ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য দেশে যেখানে এরূপ দমননীতি রয়েছে, বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করা হয়। শান্তি যোদ্ধারা এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় স্থানান্তরিত হন, তারা সই সংগ্রহ করেন। এবং তারপর যদি সেখানে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে, তবে আরেকটি এলাকায় গিয়ে তারা কাজ শুরু করেন। এই এক রকম পদ্ধতি হতে পারে। আরো নূতন নূতন বহু পদ্ধতি বেছে নেওয়া যায়।

কেরালার বিখ্যাত কবি ভল্লাথোল ও হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিশ্বশান্তি কংগ্রেসে যোগদান করতে সম্মত হয়েছেন শুনে মিঃ নেরুদা সুখী হন।

তিনি বলেন, মিঃ ভাল্লাথোল ও চট্টোপাধ্যায় কংগ্রেসের মূল্যবান সম্পদ বলে পরিগণিত হবেন। ভাল্লাখোল দক্ষিণ ভারতের একজন প্রচণ্ড খ্যাতনামা ব্যক্তি। শান্তি কংগ্রেসের এক মহা সম্পদ হবেন তিনি। তাঁর অবদান হবে অমূল্য। ভারতের শান্তি কমিটিকে দেখতে হবে যে তাঁরা যাতে যেতে পারেন তার জন্য সর্বপ্রকারে যেন চেষ্টা করা হয়। বিশ্বশান্তি কমিটি তার সমস্ত শক্তি দিয়ে সাহায্য করবে।

১ নভেম্বর ১৯৫০

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

কমনওয়েলথ ছাড়ো

'বামপন্থী' নেশন পত্রিকা থেকে শুরু করে, কংগ্রেসী শাসক শ্রেণির রক্ষিতা আনন্দবাজার পত্রিকা পর্যন্ত সবাই এক সুরে হাঁক দিচ্ছে ঃ—পূর্ববঙ্গ জয় করতে হবে, আজাদ পূর্ববঙ্গ সরকার কায়েম করতে হবে; আজাদ পূর্ববঙ্গ ফৌজ তৈরি করতে হবে।

সমাজতন্ত্রী নেতা জয়প্রকাশ থেকে শুরু করে আর-এস-এস নেতা গোলওয়ালকর পর্যন্ত একসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুকে জানিয়ে দিচ্ছে যে পূর্ববঙ্গ আক্রমণের কাজে তারা সবাই নেহরুকে পূর্ণ সমর্থন করবেন, নেহরু-প্যাটেল বিধানের সৈন্য দলে নাম লিখাবেন।

নেহরু-প্যাটেলের পেছনে এসে দাঁড়ানোর অর্থ কি? অর্থ হলো, বৃটিশ কমনওয়েলথ-এর পেছনে এসে দাঁড়ানো। কারণ, কাশ্মীরের ব্যাপারে, মুদ্রামূল্য হ্রাসের ব্যাপারে, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের ব্যাপারে—এমনি প্রত্যেক ব্যাপারে দেখা গেছে নেহরু প্যাটেল ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পোষা কুত্তা ছাড়া কিছু নয়; তাদের হুকুমের চাকর ছাড়া কিছু নয়।

মার্কিন মনিবদের প্রতিনিধি জেসাপ থেকে শুরু করে বৃটিশ মনিবদের প্রতিনিধি লেডি মাউন্টব্যাটন পর্যন্ত সবাই ভারত ও পাকিস্তানের "সেবাব্রত" নিয়ে দিল্লী-করাচী ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তারা নেহরু-প্যাটেল-লিয়াকতকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন চীন-ইন্দোচীন মালয় ও বর্মার মুক্তি অভিযানের বিপদের কথা এবং তার বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে কলম্বোতে কমনওয়েলথ-এর সাকরেদদের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছে—সে চুক্তির কথা। তারা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে শুধু কাশ্মীরকে যুদ্ধ-ঘাঁটি বানালে তাদের চলবে না, তাদের যুদ্ধ-ঘাঁটি চাই বাংলার সীমান্তে। যুদ্ধ-ঘাঁটিকে শক্ত করার জন্যে পশ্চিম ইয়োরোপের মত এখানেও আমদানি করতে হবে ইঙ্গ-মার্কিন অস্ত্র ও সৈন্য। পাকিস্তান আমদানি করবে পশ্চিম জার্মানী থেকে, নেহরু আমদানি করবেন বিলাত থেকে। কমিউনিজম-এর বিরুদ্ধে লড়তে হবে বলেই নেহরু-প্যাটেলকে হাত মিলাতে হবে লিয়াকত-নুরুল আমীনের সাথে; সেবাদল আর-এস-এসদের কাঁধে কাঁধ মিলাতে হবে—আনসার-বাহিনীর সাথে।

নেহরু-প্যাটেলের পেছনে এসে দাঁড়ানোর অর্থই হলো ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চৌকিদারের দলে নাম লিখানো, তাদের যুদ্ধের ষড়যন্ত্রে সাহায্য করা। সে যুদ্ধ কার বিরুদ্ধে হায়দরাবাদের দিকে তাকালেই তা আজ যে কেউ বুঝতে পারবে। হায়দরাবাদ অভিযানের সময়ও নেহরু-প্যাটেল ঠিক একথাই বলেছিলেন যে, তাঁরা নিজাম-রাজাকারদের বর্বরতার হাত থেকে "হিন্দুদের উদ্ধার করতে যাচ্ছেন জয়প্রকাশের দল ভারতীয় সৈন্যদলকে মুক্তি ফৌজ আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু আসলে দেখা গেল নেহরু-প্যাটেল নিজাম ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে

কিছুই বললেন না। তাঁরা আক্রমণ শুরু করলেন তেলেঙ্গানার মুক্ত এলাকার বিরুদ্ধে, কৃষকের হাত থেকে জমি কেড়ে নিয়ে নিজাম রাজাকারদের হাতে তুলে দিবার জন্যে সৈন্য পাঠালেন গ্রামে গ্রামে। নিজাম ও রাজাকার নেতাদের স্থান হলো নেহরু সরকারের দপ্তরে, আর যারা নিজাম ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে বরাবর লড়াই করে এসেছেন—তাঁদের ১০৮ জনকে শুনানো হলো ফাঁসির হুকুম।

এমনি 'মহান' উদ্দেশ্য নিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গোলামরা আজ পূর্ববাংলা অভিযানের কথা বলছেন। তাদের আক্রমণের লক্ষ্য লিয়াকত-নুরুল আমীন সরকার নয়। পূর্ব-বাংলার গণ-আন্দোলন ও মুক্তি-সংগ্রাম দমন করার উদ্দেশ্য নিয়েই তারা পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করার কথা চিন্তা করছেন। পশ্চিমবাংলার সীমান্ত ময়মনসিংয়ের হাজং এলাকায় হিন্দু-মুসলিম কৃষক লালঝাণ্ডা ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে দেড় লক্ষ বিঘা জমি দখল করেছে, হাজার হাজার নওজোয়ান নিয়ে মুক্তিফৌজ তৈরি করেছে, প্রায় ৮০ মাইল এলাকা জুড়ে মুক্ত-এলাকার অবস্থা সৃষ্টি করেছে। পশ্চিম বাংলার সীমান্ত খুলনার কলিসিয়া, রাজশাহীর নাচোল, শ্রীহট্টের নানকার এলাকায় হিন্দু-মুসলিম জমিদার- জোতদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের অভ্যুত্থান শুরু হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার শাসক শ্রেণির চোখের ঘুম তারা কেড়ে নিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ-ঘাঁটিকে তারা বিপন্ন করে তুলেছে। গত দু'বছর বিধান মন্ত্রিসভা এ সকল এলাকার গণ-আন্দোলন দমন করার জন্যে নুরুল আমীন সরকারকে প্রাণপণে সাহায্য করেছেন, ঘন ঘন চীফ সেক্রেটারীদের বৈঠক ডেকেছেন, নেতাদের গ্রেপ্তার করে নুরুল আমীন সরকারের কাছ থেকে বাহ্‌বা পেয়েছেন।

যাঁরা আজ পূর্ববাংলার আজাদ সরকার ও মুক্তি-সেনা গঠনের স্বপ্ন দেখছেন তাঁদেরও পূর্ববাংলার এই বিপ্লবী গণ-আন্দোলনের পেছনেই এসে দাঁড়াতে হবে, নেহরু-বিধানের পেছনে নয়। পূর্ববাংলার হিন্দু-মুসলিম কৃষকের গণ-অভিযানকে শক্তিশালী করার পথ কি? পথ হলো, এখানে নেহরু-বিধান সরকারের আক্রমণ থেকে গণ-আন্দোলনকে রক্ষা করা, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যকে রক্ষা করা, কমিউনিস্ট পার্টি ও গণ-সংগঠনগুলিকে আইনসঙ্গত করার দাবি তোলা, কাকদ্বীপ ও মেদিনীপুরে নেহরু-বিধানের লৌহ যবনিকার অন্তরালে যে ফ্যাসিস্ট দমননীতি চলছে তা বন্ধ করা। পশ্চিমবাংলা ও ভারতে নেহরু-বিধানের শাসন খতম করে, কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে এসেই আমরা পূর্ববাংলাকে মুক্ত করতে পারি, ঐক্যবদ্ধ করতে পারি পশ্চিমবাংলার সাথে। যারা "সভ্যতা বিস্তারে"র জন্যে পূর্ববাংলা আক্রমণ করার কথা বলেন, তাদের সাথে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের ভারতে সভ্যতা বিস্তারের সাথেই শুধু তুলনা চলে। পশ্চিমবাংলার গ্রামে সেবাদল পাঠিয়ে খুনী বিধান আমাদের মা-বোনদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালাচ্ছে। সুতরাং তার কাছে সভ্যতার মূল্য কি? সভ্যতা বিপন্ন হয়েছে—সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের দালালদেরই হাতে। সাম্রাজ্যবাদী শিবির থেকে সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা করা যায় নি—তা যে-কেউ আজ দেখতে পাচ্ছে—আমেরিকায় নিগ্রোদের ক্ষেত্রে, বিলাতে ইহুদীদের ক্ষেত্রে, দক্ষিণ আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া, লঙ্কায় ভারতীয়দের ক্ষেত্রে। সাম্রাজ্যবাদীরা যুক্তভারতে সংখ্যালঘুদের ব্যবহার করতো সংখ্যাগরিষ্ঠদের বিরুদ্ধে, আজ বিভক্ত ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠদের ব্যবহার করছে সংখ্যালঘিষ্ঠদের বিরুদ্ধে। সংখ্যালঘুদের সমানাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকারের সেখানে কোন স্থান নেই কমনওয়েলথ ও সাম্রাজ্যবাদী শিবির থেকে

বের হয়ে আসলেই সংখ্যালঘুদের সে দাবি সুরক্ষিত হতে পারে যেমন তা সুরক্ষিত হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নে, নয়া গণতন্ত্রের দেশে, নয়া চীনে।

যারা আজ সংখ্যালঘুদের বাঁচানোর 'সহজ' পন্থার নাম করে জনগণকে বলছে ... বিধানের পেছনে সমবেত হতে ... আসলে সাম্রাজ্যবাদের দালাল, সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ-প্ল্যানই তারা কার্যকরী করতে যাচ্ছে। এমনি 'সহজ পথ' তারা বাতলিয়ে দিয়ে ছিল কাশ্মীরে। কিন্তু সেখানে আমরা আজ কি দেখছি? দু'বছরের লক্ষ লক্ষ ভারতীয় ও পাকিস্তানী জান কোরবান করেছে, একমাত্র ভারত সরকারই দৈনিক এক কোটি টাকা খরচ করেছে, পাকিস্তানের গরীবদের সমস্ত অর্থ তাতে নিঃশেষ হয়েছে। কিন্তু সে জান ও অর্থ কাশ্মীরবাসীর কোন কাজে লাগেনি; কি 'আজাদ' কাশ্মীরে, কি ভারতীয় কাশ্মীরে কোথাও তাদের রাজ হয়নি, কৃষক জমি পায়নি। সেখানে সুযোগ হয়েছে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধের।

সংখ্যালঘুদের বাঁচানোর 'সহজ' পন্থার নাম করে ভারত বিভাগ করা হয়েছিল; তাতে কোন সমস্যার সমাধান হয়েছে কি? তা হয়নি। সাম্রাজ্যবাদীদের আরো সুযোগ হয়েছে কখনো দাঙ্গা, কখনো যুদ্ধ বাধিয়ে উভয়ের উপর সালিশী করার।

কমনওয়েলথ-এ থাকার জন্যেই কোন সমস্যার সমাধান হয়নি। ধনিক-জমিদার সাম্রাজ্যবাদী দালালদের হাতে শাসনভার থাকার জন্যেই তা হয়নি। সহজ পথ এবং একমাত্র পথ হলো ঃ নেহরু-লিয়াকত কমনওয়েলথ ছাড়ো। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের শিবির ছাড়ো। তেলেঙ্গানা, কাকদ্বীপ, ময়মনসিংয়ের পাহাড় এলাকার সংগ্রামে হিন্দু-মুসলিম জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে, গণফৌজ ও গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করেই, আমরা বাংলাকে স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ করবো, উভয় বাংলার সংখ্যালঘুদের জান-মান অধিকার রক্ষা করবো।

'স্বাধীনতা', সম্পাদকীয়, ১৮ই মার্চ ১৯৫০

উপনিবেশ ও পরাধীন দেশসমূহে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরাট অগ্রগতি

বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির যে বিশেষ লক্ষণগুলি প্রথমেই চোখে পড়ে তার মধ্যে উপনিবেশ এবং পরাধীন দেশগুলির জনসাধারণের বিপ্লবী সংগ্রামের অভূতপূর্ব ব্যাপকতা হচ্ছে অন্যতম।

অনেক দেশেই এই সংগ্রামের রূপ হচ্ছে সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ—প্রাচ্যের দেশগুলির কোটি কোটি মেহনতী জনতা এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করছে। শ্রমিক শ্রেণি এবং কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা পরিচালিত এই সংগ্রামের ব্যাপকতা ও রূপ দেখিয়ে দিচ্ছে যে, ঔপনিবেশিক দাসত্বের বিরুদ্ধে এবং জাতীয় মুক্তির জন্য উপনিবেশ ও পরাধীন দেশের জনসাধারণ সুদৃঢ় সংকল্প নিয়ে বিপ্লবের পথই গ্রহণ করেছে।

যুদ্ধান্তে পরাধীন ও ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে বিপ্লবী মুক্তিসংগ্রামের বিরাট অগ্রগতি বিশ্ব-সাম্রাজ্যতন্ত্রের সমগ্র ব্যবস্থাকে, এমনকি তার ভিত্তিকে পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলেছে এবং দেখিয়ে দিচ্ছে যে, উপনিবেশের জনসাধারণ আর একদিনের জন্যও পুরোনো ধারায় বাস করতে অস্বীকার করছে, এবং উপনিবেশের মালিকদের দেশের শাসক শ্রেণিরা আর একদিনের জন্যও পুরোনো ধারায় শাসন করতে সক্ষম হচ্ছে না।

মহান অক্টোবর সোস্যালিস্ট বিপ্লব ঔপনিবেশিক দেশগুলির অত্যাচারিত জনগণের বিপ্লবী শক্তিকে মুক্ত করে দিল, মুক্তি এবং জাতীয় স্বাধীনতার জন্য তাদের সংগ্রামকে সকল দেশের মেহনতী জনতার বিপ্লবী সংগ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত করলো এবং এইভাবে তাদের মুক্তির পথ খুলে দিল।

জাতি সম্পর্কে লেনিন-ষ্ট্যালিনের নীতি, সোভিয়েত ইউনিয়নে সোস্যালিজমের বিজয় রাশিয়ার সীমান্ত অঞ্চলগুলির জনসাধারণ যারা আগে অত্যাচারিত হ'তো তাদেরকে এক একটি সমান সোস্যালিস্ট জাতিতে পরিবর্তিত করেছে; তাদের নিয়েই আজ তৈরি হয়েছে সোভিয়েতের জনসাধারণের বিরাট ভ্রাতৃত্বমূলক পরিবার। জাতি সম্পর্কে লেনিন-ষ্ট্যালিনের এই নীতিই, সোভিয়েত ইউনিয়নে সোস্যালিজমের এই বিজয়ই উপনিবেশ ও পরাধীন দেশের জনসাধারণের জীবনে ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে এক বিরাট শক্তি এবং সমর্থন এনে দিয়েছে এবং এখনও দিচ্ছে।

ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিজয়ী মুক্তিযুদ্ধ, যার নেতৃত্ব করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন; জার্মান ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় এবং বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালী, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম প্রভৃতি ঔপনিবেশিক শক্তিবর্গ যে ভীষণভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে সেই ঘটনাও—

এই সমস্তই উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলিতে সংগ্রামের এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিজয়ের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

মধ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং গণরাষ্ট্রগুলির বর্দ্ধিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি, উপনিবেশের জনসাধারণের স্বাধীনতার প্রধান উৎপীড়ক আমেরিকান ও বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েতের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক শিবিরের স্থির সঙ্কল্প ও সুদৃঢ় সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদের সমগ্র ব্যবস্থাটিকেই দুর্বল করে দিয়েছে—এবং এ রকম দুর্বল করতেই হতো।

এবং এইভাবেই এ ঘটনাগুলি উপনিবেশের জনসাধারণকে, জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য তাদের সংগ্রামে চূড়ান্ত সাহায্য করেছে এবং এখনও কবে চলেছে।

প্রতিক্রিয়াশীল কুয়োমিণ্টাং ও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে চীনের জনসাধারণের দুনিয়াজোড়া ঐতিহাসিক বিজয় জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অগ্রগতি; এ সংগ্রামে যারা নেতৃত্ব করছে সেই কমিউনিস্ট পার্টির রণনীতি রণকৌশল সম্পর্কে লেনিন-ষ্ট্যালিনের শিক্ষার জয়জয়াকারের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে শক্তিশালী করার পক্ষে চীনের জনসাধারণের বিজয়ের গুরুত্ব রয়েছে।

চীনের জনসাধারণের মুক্তি-বিপ্লব কি অবস্থার মধ্যে বিজয়ী হ'লো তা বিশ্লেষণ ক'রে বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট লিউ-সাও-চি পিকিং-এ অনুষ্ঠিত এশিয়া এবং ওসেনিয়ার দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনে তাঁর বক্তৃতায় বলেন ঃ

"জাতীয় স্বাধীনতা ও গণরাষ্ট্রের সংগ্রামে অনেক উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলিকেই চীনের জনসাধাবণ যে পথ গ্রহণ করেছিল সেই পথই গ্রহণ করতে হবে।"

চীনের জনসাধারণের বিজয়ী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অভিজ্ঞতা এই শিক্ষাই দেয় যে, সাম্রাজ্যবাদী আর তাদের ভাড়াটেদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং শ্রমিক শ্রেণি ও তার অগ্রগামী বাহিনী, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এক ব্যাপক, দেশব্যাপী সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠন করতে যারা ইচ্ছুক সেই সমস্ত শ্রেণি, পার্টি, গ্রুপ এবং সংগঠনের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে সেই পার্টি যে পার্টি মার্কসবাদ- লেলিনবাদের থিওরী দিয়ে সুসজ্জিত, যে পার্টি বিপ্লবী রণনীতি ও রণকৌশলের আর্টকে আয়ত্ত করেছে, যে পার্টির প্রতি নিঃশ্বাসে জনসাধারণের শত্রুর প্রতি বিপ্লবী আপসহীন জনসাধারণের গণ-আন্দোলনে প্রোলেটারিয়েন সংগঠন ও শৃঙ্খলা প্রকাশ পাচ্ছে।

জনসাধারণের মুক্তিফৌজ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আভ্যন্তরীণ অবস্থা যখন সৃষ্ট হয়, তখন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জনসাধারণের মুক্তিফৌজ গঠন করাই হচ্ছে জাতীয় যুক্তি সংগ্রামের বিজয়ী সাফল্যের একটি চরম শর্ত্ত।

চীন, ভিয়েৎনাম, মালয় এবং অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দিচ্ছে যে, অনেক উপনিবেশ ও পরাধীন দেশে আজ সশস্ত্র সংগ্রামই জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের প্রধান ধরন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ভিয়েৎনামে সশস্ত্র জনসাধারণ ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীর হাত থেকে তাদের দেশের শতকরা ৯০ ভাগ অঞ্চলকে মুক্ত করেছে। ভিয়েৎনামে দেড় লক্ষ ফরাসী সৈন্য অধিকৃত শহরগুলি ত্যাগ করতে আজ ভীত হয়ে উঠেছে, ভিয়েৎনাম রিপাবলিকের সশস্ত্র সৈন্যদের দ্বারা আজ

তারা সেখানে ঘেরাও হয়ে পড়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় আমেরিকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তাঁবেদার সিঙহ্যম-রির পুলিশবাহিনীর জীবন গেরিলাবাহিনীরা অতিষ্ঠ করে তুলছে।

মালয়ের জনসাধারণের জাতীয় মুক্তি ফৌজকে ধ্বংস করবার নিষ্ফল প্রচেষ্টায় মালয়ে এক লক্ষ কুড়ি হাজার বৃটিশ সৈন্য বাদায় আটকা পড়ে গেছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শ উপনিবেশ ফিলিপাইনে তাঁবেদার কুইরিনো গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে গেরিলারা সংগ্রামে নেমেছে।

ইন্দোনেশিয়ার ডাচ এবং হাতার কুইসলিঙ সৈন্যদের বিরুদ্ধে দেশ প্রেমিক সৈন্যরা লড়াই চালাচ্ছে। বর্ম্মার অর্দ্ধেক আজ জনসাধারণের সৈন্যদের হাতে—তারা লড়াই করছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী এজেন্সীর বিরুদ্ধে। লাটিন আমেরিকায় আফ্রিকায় এবং নিকট প্রাচ্যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন চারদিকে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে।

উপনিবেশ এবং অর্দ্ধ-উপনিবেশগুলিতে জনসাধারণের গণ-আন্দোলন, যে আন্দোলন যুদ্ধান্তে বিস্তারলাভ করেছে এবং সশস্ত্র সংগ্রামে বিকশিত হয়েছে সেই আন্দোলন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কৌশলে পিছু হটতে বাধ্য করেছে। ভারতের উপর চাপানো হয়েছে এক কৃত্রিম স্বাধীনতা। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ 'পবিত্র এবং অলঙ্ঘনীয়ই' রয়েছে। মাউন্টব্যাটেনরা চলে গিয়েছে কিন্তু রয়ে গিয়েছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ—ভারতকে সে অক্টোপাশের মতন তার রক্তাক্ত শুঁড়ে আঁকড়ে ধরেছে।

এই অবস্থায় ভারতের কমিউনিস্টদের কাজ হচ্ছে চীন এবং অন্যান্য দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অভিজ্ঞতা নিয়ে, স্বভাবতই সমস্ত কৃষকদের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণির মিতালিকে শক্তিশালী করা, আশু প্রয়োজনীয় কৃষি-সংস্কার প্রবর্তনের জন্য লড়াই করা এবং—যারা দেশের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে সেই ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে আর যারা তাদের সাথে সহযোগিতা করছে সেই প্রতিক্রিয়াশীল বড় বড় বুর্জোয়া ও সামন্ত নৃপতিদের বিরুদ্ধে, দেশের মুক্তি ও জাতীয় স্বাধীনতার জন্য একই সাধারণ সংগ্রামের ভিত্তিতে—সমস্ত শ্রেণি, পার্টি, গ্রুপ এবং সংগঠনকে যারা ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তিকে রক্ষা করতে ইচ্ছুক, তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা।

চীনে বিপ্লবের জয় এবং উপনিবেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অগ্রগতি সাম্রাজ্যবাদীদের উন্মত্ত করে তুলছে—উপনিবেশের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য তারা বে-পরোয়া হয়ে চেষ্টা করছে। সাম্রাজ্যবাদীদের, যাদের পরাজয় ঘটছে—তাদের কর্মচাঞ্চল্যকে খাটো করে দেখা ভুল হবে।

উপনিবেশ এবং পরাধীন দেশগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক সংগঠনকে মেহনতী জনতার ও সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির সমাবেশ করতে হবে, প্রতিদিন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের উপনিবেশ স্থাপনের প্ল্যানগুলির এবং প্রতিক্রিয়া পন্থীদের যারা সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে তাদের বিশ্বাসঘাতক, জনস্বার্থ বিরোধী ভূমিকার মুখোশ খুলে ধরতে হবে।

উপনিবেশের মালিকদের দেশে কমিউনিস্টদের, যাদের কর্তব্য হচ্ছে উপনিবেশের জনসাধারণের সমর্থনে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে সমাবেশ করা এবং ঐক্যবদ্ধ করা, তাদের কমরেড ষ্ট্যালিনের কথাগুলো মনে রাখতে হবে : "উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলিতে কোন

স্থায়ী বিজয় সম্ভব নয়, যদি না তাদের মুক্তির জন্য আন্দোলন আর পশ্চিমের অধিকতর অগ্রসর দেশগুলির প্রোলেটারিয়েন আন্দোলনের মধ্যে প্রকৃত যোগসূত্র স্থাপিত হয়।"

মার্সাই, সেইণ্টনাজায়ার এবং ফ্রান্সের অন্যান্য বন্দরে নাবিকেরা, ডকমজদুরেরা ও রেল শ্রমিকেরা সাহসের সঙ্গে ভিয়েৎনামে উপনিবেশিক যুদ্ধ চালাবার জন্য নির্দিষ্ট গোলাবারুদ স্পর্শ করতে অস্বীকার ক'রে আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণির মৈত্রীবন্ধনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

রাশিয়ায়, চীনে এবং গণরাষ্ট্রগুলিতে বিপ্লবের অভিজ্ঞতা এই শিক্ষাই দেয় যে, যখন একটি দেশের জনসাধারণ দৃঢ়সংকল্প নিয়ে সংগ্রামে নামে এবং যখন কমিউনিস্ট পার্টি এই সংগ্রামের নেতৃত্ব করতে সক্ষম হয়, তখন দেশের মধ্যেকার প্রতি-বিপ্লবের এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের কোন শক্তিই ব্যাপক জনসাধারণকে যারা বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয়েছে তাদেরকে ধ্বংস করতে পারে না।

পাশ্চাত্য দেশগুলির মেহনতী জনতা আর উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির বিপ্লবী জনসাধারণের মধ্যে ভ্রাতৃত্বমূলক মৈত্রীবন্ধন গড়ে উঠছে। কোটি কোটি জনসাধারণের এই মৈত্রীবন্ধন হচ্ছে সেই পর্বত যার উপরে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হয়ে যাবে।

২৭ জানুয়ারি ১৯৫০ — সম্পাদকীয়, সংখ্যা ৪

ফর এ লাষ্টিং পিস ফর এ পিপল্‌স্ ডেমোক্রাসী

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, প্রাদেশিক কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত।

টিকা : (ক) ১৯৪৩ সালে তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক তুলে দেওয়া হয়েছিল। এরপর যুদ্ধ শেষে ১৯৪৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগে পোল্যাণ্ডে ৯ পার্টি মিলে একটি সংগঠন তৈরি করল। যে সব দেশের কমিউনিস্ট পার্টি এতে ছিল, তারা হল সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, ফ্রান্স ও ইতালি। সংগঠনটির নাম দেওয়া হল, 'কমিউনিস্ট ইনফরমেশন ব্যুরো'—সংক্ষেপে 'কমিনফর্ম'।

খ. কমিনফর্মের মুখপত্রের নাম হল 'For a Lasting Peace For a Peoples' Democracy' সংক্ষেপে 'LPPD'.

গ. এই দলিলটি হল LPPD'র ২৭শে জানুয়ারি, ১৯৫০-এর সম্পাদকীয়।

সহায়ক তথ্য - ৩১

NOTE No 8 4th August 1949
TO WBPC SECTT

On Rival Party

Dear Comrades,

I had a few notes to send to you but I am told by .... that she has yet to seek contact and can't manage more than a small cover for the first dak. I will write in details later.

The main purpose of my wanting contact was to send you the enclosed statement for publication in the Party Press Provincial and Central.

As you know the canard about my starting a rival party has been appearing in the press for some time. I hope you knew enough about me to publish in the Party press at least a prompt and suitable retort to the anti-Party slanderers or ask me to draft one as Comrade Gour had done immediately after the P. Congress. When nothing of the sort happened I thought the P. leadership was taking the line to ignore the story as unworthy of a contradiction. I waited patiently only to hear from the few friends of the family that they hear the slander being gossipped about in P. circles and not contradicted by Party cadres. I thought my patience is not only working against my Party honour but also damaging the good name of our Party.

Need I assure you once again that nothing will tempt nor provoke me into such a foul deed as attempting to start a rival party. I will wait patiently as I am and remain loyal to the Party till the Party itself thinks I can be of use to it as its active cadre.

If you decide not to publish my brief statements in the P. Central and Provincial press I will request you to let me have your answer in writing as soon as possible. You can send it through the same channel to .... house.

Again, I await any directions that you may think fit to give me.

STATEMENT

(From P. C. Joshi for publication in Swadhinata and Communist Bulletin (both Bengali) and for being forwarded to the Party Centre, for publication in the Central Party Press and for being circularised in the way the Party thinks fit.)

"THE ENEMIES OF THE PARTY USE NOT ONLY TERROR AGAINST US TO BREAK OUR LINKS WITH THE MASSES BUT ALSO SPREAD SLANDERS AGAINST THE PARTY TO CONFUSE OUR CADRES AND THUS SEEK TO DAMAGE THE INTERNAL UNITY OF THE PARTY."

"THE LATEST SUCH SLANDER IS THAT I AM STRATING A RIVAL PARTY."

"THE PETTY SLANDERERS, THEMSELVES KNOW THAT EVERY HONEST COMMUNIST HOLDS LOYALTY TO THE PARTY DEARER THAN LIFE ITSELF. THE ENEMIES OF OUR PARTY HAVE YET TO LEARN THAT NOTHING THAT THEY CAN DO WILL EVER DAMAGE THE UNITY OF OUR PARTY WHICH WILL ULTIMATELY TRIUMPH SCATTERING TO THE WINDS ALL SLANDERERS AND OPPRESSORS THROUGH SUCCESSFUL ORGANISATION OF THE STRUGGLE OF OUR PEOPLE FOR REAL INDEPENDENCE AND PEOPLE'S DEMOCRACY WHICH ALONE CAN BE THE ABIDING BASIS TO BUILD A CLEAR AND HEALTHY, HAPPY AND PROSPEROUS NATIONAL LIFE."

P. C. Joshi.

প্রাপ্তি স্বীকার : 'Views' No. 1, To Comrades Abroad & B. T. Randive by P. C. Joshi

টিকা : 'গৌর' সোমনাথ লাহিড়ীর ছদ্মনাম। (—সম্পাদক)

Statement of the Polit-Bureau on the Editorial Article of the Organ of the Information Bureau on the National-Liberation Movement in the Colonies

(The polit-bureau in issuing the statement given below to the ranks of the party has sent the following circular to all PCs :

You should study the *Lasting Peace* editorial of 27 January 1950 and the PB statement on the same carefully and express yourself on both the documents. The PB statement attempts to place the mistakes of the PB and at the same time carry forward the achievements made by the party. We are also sending herewith Balabushevich's article (PB document for all PMs—No 15) which will place the activities of the party correctly and will help in understanding the *Lasting Peace* editorial. The article is from Problems of Economics, No 8, Moscow. The PB will report on its mistakes to the CC which will take all steps necessary to implement the correctives. You should circulate both the *Lasting Peace* editorial as well as the PB statement to the ranks. You should also circulate this covering letter and wherever possible Balabushevich's article to the ranks.)

The editorial article on "Mighty Advance of the National Liberation Movement in the Colonies and Dependent Countries" published in the organ of the information bureau of the communist and workers' parties, *For a lasting Peace, For a People's Democracy*, No. 4 (64) dated 27 January 1950 is a brilliant contribution to the Indian people's struggle for national independence and people's democracy.

It is a correct lead to the Communist Party of India and a timely reminder that in its actual achievements it is *lagging behind* the immense possibilities of the rising tempo and sweep of the revolutionary struggles which the Indian people are waging against Anglo-American imperialists

and their Indian collaborators for national liberation and against colonial slavery.

"One of the outstanding features of the present international situation", states the editorial article, "is the unprecedented scope of the revolutionary struggle of the peoples of colonial and dependent countries, which in many countries is of armed nature with hundreds of millions of working people of the countries of the east taking part in it."

This mighty advance of the postwar revolutionary liberation struggle of the colonies and semicolonies, which has shaken the entre system of world imperialism to its very foundations, has been opened up, as the editorial article points out, by the following major factors :

(1) The great October socialist revolution, the victory of socialism in the USSR and the Lenin-Stalin national policy which turned the former oppressed peoples into equal socialist nations.

(2) Victorious people's liberation war led by the USSR against fascism, the defeat of German and Japanese imperialism, and the weakening of such colonial powers as Britain, France, Italy, Holland and Belgium.

(3) The establishment of the people's democratic power in the countries of Central and Southeastern Europe.

(4) The resolute struggle of the democratic camp headed by the USSR against British and American imperialism—the main oppressors of the freedom of the colonial peoples.

(5) The world-historic victory of the Chinese people over the combined forces of the reactionary Kuomintang and American imperialism.

All these factors have weakened the entire system of imperialism and have created favourable conditions for the struggle and for the victory of the national-liberation movements in the colonial and dependent countries.

The editorial article is thus a sharp reminder to the Communist Party in India and in Pakistan of the great lag that exists between the mighty advancing forces in the entire colonial world led by their communist parties and the Indian people's liberation movement led by the Communist Party of India.

A tremendous responsibility rests upon the Communist Party of India to make up this lag. This is all the more urgent at the present moment

when the British and American imperialists, with the active support of the Indian big bourgeoisie and other reactionaries, are desperately seeking to tighten their grip on our country, crushing the national independence and freedom of the peoples both in India and Pakistan, monopolising their vast material resources, to convert the entire country into a military base, to crush the national-liberation struggles in the countries of South-East Asia, in Malaya, Burma, Vietnam and Indonesia and to unleash a war against the Soviet Union, People's Democratic China and people's democracies of Central and Southeastern Europe.

"The victory of the revolution in China and the advance of the national-liberation struggles in the colonies", warns the editorial article, "have thrown the imperialists, who are desperately trying to retain their grip on the colonies, into a fury. It would be a mistake to underestimate this feverish activity of the imperialists, who are suffering defeat."

The resolute struggles which the working class, peasantry and other progressive forces such as the students, democratic youth and women are waging under the leadership of the Communist Party in the Indian Union and in Pakistan against the reactionary bloc of the imperialists, the big bourgeoisie, the feudal princes and the landlords; the fact that these struggles are rising to the pitch of armed clashes between the police and the people in many cities and districts; the peasant partisan warfare developing in Telangana and in certain other parts of the country—all these indicate that the Indian proletariat and the Communist Party are rising to the level of the leader of the national-liberation struggle of the Indian people, and that conditions for the victory of this struggle for the rout of the Anglo-American imperialists and their Indian collaborators are maturing fast.

These developments point out that the lags that exist are not inevitable, that they can and must be removed. They can and must be removed by correctly applying the Lenin-Stalin teaching concerning the strategy and tactics of the communist parties heading the national-liberation struggles, which have registered a signal triumph in the world-historic victory of the Chinese people's liberation revolution.

In this respect, the editorial article has drawn the pointed attention of the Communist Party of India to the rich experience of the people's democratic revolution in China which was led by the Communist Party

of China and its leader, Mao Tse-tung, to its final and irrevocable victory. The editorial article has emphasised that "the path taken by the Chinese people... is the path that should be taken by the people of many colonial and dependent countries in their struggle for national independence and people's democracy".

The editorial has sharply underlined two main lessons which the experiences of the victorious national-liberation struggle of the Chinese people teach us :

(1) "The working class must unite with all classes, parties, groups and organisations willing to fight the imperialists and their hirelings and to form a broad, nationwide front headed by the working class and its vanguard, the communist party, equipped with the theory of Marxism-Leninism; the party that has mastered the art of revolutionary strategy and tactics; that breathes the spirit of revolutionary irreconciliability to enemies of the people, the spirit of proletarian organisation and discipline in the mass movement of the peoples."

(2) "A decisive condition for the victorious outcome of the national-liberation struggle is the formation, when the necessary internal conditions allow for it, of people's liberation armies under the leadership of the communist party."

The polit-bureau shall reexamine all its resolutions, including the report on the strategy and tactics, in the light of these lessons and make comprehensive reviews and submit them to the central committee for confirmation and issue them to the ranks in the immediate future.

The second congress of the Communist Party of India was a great step in the life of the Indian Communist Party. The political thesis adopted by the congress laid down the basic programme and strategy and tactics of the people's democratic revolution in India. The political thesis advanced as the most important task in the new stage, the struggle for the consolidation by all means of the people's democratic front, which must be the embodiment of the alliance of the working class, the peasantry and the urban petty bourgeoisie under the leadership of the working class.

The congress became the starting point and a tremendous step forward in unleashing the forces of people's liberation struggles in Indian Union and Pakistan and for the strengthening of proletarian hegemony in the same.

The general secretary's report on the strategy and tactics adopted by the polit-bureau correctly applied on many points the line of the political thesis, and combated reformist influence inside the party, which was a hindrance in giving a bold leadership to the struggles of the workers and the toiling masses. This is testified by the fact that in the course of the last one year, the working class and the Communist Party have registered considerable successes in developing and heading struggles of workers, peasants and the oppressed petty bourgeoisie in many parts of the country in which tens of thousands have been mobilised.

But the Communist Party cannot rest satisfied with rousing and leading tens of thousands, at a time when under the stress of the deepening economic crisis, and when the anger and the disillusionment of the people against the bourgeois servitors of imperialism are rising ever higher, the objective possibility exists of mobilising tens of millions of people belonging to all classes, parties and groups and organisations willing to fight imperialists and their hirelings, and uniting them in the revolutionary struggle for people's power.

This lag is explained by the fact that while fighting reformism, which acted as a brake on the unleashing and the bold leadership of the struggles of the workers and the toiling masses, the polit-bureau committed certain errors in dogmatist and sectarian directions, which restricted the scope of those struggles and prevented the mobilisation of the broadest masses in the same.

In combating the reformists who were retreating before repression and resiling from revolutionary struggle, the various resolutions of the polit-bureau, particularly the report on strategy and tactics, correctly emphasised that the countrywide offensive launched by the Congress Government against the Communist Party and the democratic forces is a measure not of the strength of the reactionary camp but of its crisis, of its growing weakness and a sign of its impending collapse. We correctly pointed out the growing crisis of the capitalist order and underlined the revolutionary tempo and sweep which the struggles of the masses were assuming under the leadership of the proletariat and called for the unwavering and resolute leadership of these struggles by the communists. But in doing so we failed to bring out sharply the fact that the grant of fictitious independence in the form of dominion status has

not changed the colonial character of the Indian economy in which the key positions still remain in the hands of foreign imperialists. As a result of this faulty understanding, the main stress was not laid on the fact that the character of the struggle still remained in the main anti-imperialist, antifeudal and national-liberationist. The task of dislodging of the national bourgeoisie from the leadership of the movement and its isolation, which constitutes one of the most important conditions for the hegemony of the working class in the national-liberation struggle, cannot be effectively carried out unless this basic fact is kept firmly in view.

In combating the reformists, who maintained that nothing has changed as a result of the Mountbatten award, the resolution of the polit-bureau correctly pointed out that the Nehru-Patel government representing the interests of the capitalists and landlords has gone over to imperialism, but we failed to underline the fact that in this sham independence, which we correctly unmasked, the interests of British imperialism remained 'sacred and inviolable" and that "the Mountbattens had departed but Britism imperialism remains and octopus-like grips India in its bloody tentacles". This led to two serious errors :

Firstly, we described the national bourgeoisie as the leading force (most active fighting partner) in the imperialist-bourgeois-feudal combine; whereas imperialists constitute the leading force in the bloc composed of the imperialists and their Indian satellites. The Nehru-Patel government is carrying out the dictates of Anglo-American imperialists.

Secondly, the general secretary's report on strategy and tactics adopted by the polit-bureau failed to distinguish between the Indian big bourgeoisie and other sections of the bourgeoisie, to point out that it is the big bourgeoisie that is placed in the seat of power and collaborating with imperialists as their satellites.

In combating the reformist position, which advocated abjuration of struggle against the bourgeoisie of the less-developed nationalities, the resolutions of the polit-bureau correctly maintained that one of the essential conditions of victory of the Indian revolution is ruthless struggle against all shades of bourgeois nationalism, establishment of the unity of the workers and the toiling masses belonging to all nationalities in a common people's revolutionary front in the struggle against imperialism and its collaborators. But they failed to point out that various sections of

the bourgecisie, i.e. mainly belonging to undeveloped nationalities, can still at one time or another play the role of "fellow-travellers" in the national-liberation struggle, that the working class can enter into temporary agreements on national-democratic issues with those sections of the bourgeoisie for common struggle against imperialism, feudalism and national big bourgeoisie representing predominantly the Gujarati and Marwari capitalists. At the same time we must bear in mind that under the present conditions of the extreme accentuation of the general crisis of capitalism, when a specially sharp polarisation of class forces is taking place, both on an international scale and within the bounds of every capitalist country individually, these oppositional strata of the Indian bourgeoisie ought not to be regarded in any way as reliable or stable members of the anti-imperialist camp.

In combating the reformist elements, who had been undermining the struggles of the agricultural workers and poor peasants in the interest of the rich peasants and refusing to tear off the former from the political influence of the latter, the polit-bureau resolution on the agrarian question and similar other documents correctly laid stress on the supreme importance of firmly relying on agricultural workers and the mass of the peasantry. It is as a result of this strategy that mightly agrarian struggles have developed under the leadership of the Communist Party in a number of provinces and districts. The aforementioned resolution of the polit-bureau, instead of emphasising the antifeudal character of the workers' and peasants' alliance, wrongly lumps the rich peasants with the landlords, describing the former as the spearhead of bourgeois-feudal reaction in the rural area. The resolution failed to point out that main slogans of the present stage of Indian revolution—abolition of landlordism without compensation and land to the tillers—corespond to the interests of the entire peasantry.

The aforementioned article of the organ of the information bureau has corrected this serious mistake by pointing out that "In these conditions, the task of the Indian Communists, drawing on the experience of the national-liberation movement in China and other countries, is naturally to strengthen the alliance of the working class with all the peasantry, to fight for the introduction of the urgently needed agrarian reforms..." No doubt political influence of the rich peasants in

the village must be fought, peasant masses weaned away from them and proletarian leadership and discipline established in the mass peasant movement. But in the interest of rallying the entire peasantry, for the struggle for the abolition of landlordism without compensation and for securing land to the tillers, which constituted the urgently-needed agrarian reform, and in the interest of strengthening the alliance of the working class and all the peasantry, such reforms as nationalisation of all land must not be advocated as an immediate demand and the slogan of expropriation of rich peasants must not be advanced, the trade-union movement must actively lend its support to the peasant movement. The Communist Party must organise the peasant masses into action for general as well as the partial democratic demands of the peasantry.

In applying the correct slogan of alliance of the working class and all the peasantry, reformists will distort its true meaning by preaching abjuration of partial struggles of the agricultural workers and sharecroppers on the ground that they endanger the interests of the rich peasants; such distortion must be combated in order to establish leadership of the working class over the peasant movement and to lend it a revolutionary character. Reformists will further distort the slogan to hinder the mass struggles of the peasantry on the ground that they will alienate the rich peasants. It is by fighting such deviations that peasant struggles have advanced and will advance.

The ideological root of the sectarian deviation of the polit-bureau on the agrarian question arises out of this : while development of capitalist relations in agriculture in India and the consequent class differentiation of the peasantry have been rightly pointed out, we have failed to see feudal landlordism as the dominant form of exploitation in the agrarian economy. It further arises out of the failure to understand the anti-imperialist and national-liberationist character of the Indian peasant movement.

The understanding of the development of the capitalist relations in agriculture, growing within the framework of feudal property relations, and of the consequent growth of class differentiation in the ranks of the Indian peasantry enabled the party to recognise the very important role which the agricultural workers must play in developing the agrarian revolution and in drawing the broad masses of the peasantry in the

revolutionary struggle for the abolition of landlordism. It enabled us to come out of the grooves of reformism and to swing the peasant movement towards militant struggles of the peasant masses for land and agricultural workers' strike struggles for higher wages, etc. But the failure to understand feudal landlordism as the dominant form of exploitation and the colonial character of Indian economy or, in other words, the failure to understand that the fight against imperialism and feudal landlordism constitute the basis of the community of interest of the entire peasantry have led to restricting the scope and sweep of peasant struggle on a countrywide scale.

The editorial article of the organ of the information bureau has correctly formulated our important task in the following words : "On the basis of the common struggle for freedom and national independence of the country, against the Anglo-American imperialists oppressing it and against the reactionary big bourgeois and feudal princes collaborating with them, to unite all classes, parties, groups and organisaions willing to defend the national independence and freedom of India." The programme of people's democratic front set forth in the political thesis of the second party congress constitutes the basis of this broad joint front. Such a joint front must be obviously under the leadership of the working class and an ally of the international democratic anti-imperialist front led by the USSR.

In order to draw the broadest sections of the masses in the revolutionary struggles and to build the people's democratic front capable of ending the rule of the imperialists and its Indian collaborators, we must emphasise the importance of the following cardinal tasks :

(1) The peace movement which has already begun with a broadbased character must be developed throughout the country along the line laid down in the resolution of the information bureau on the "Defence of Peace and the Struggle Against Warmongers". It must become the pivot of the entire activity of the party and the mass organisations. It is our duty to merge the struggle for national liberation with that for peace, tirelessly exposing the antinational and treacherous policy of the Congress and League governments which have become direct lieutenants of British and American imperialists and are seeking to make India a base of war against the USSR, the people's democracies and the liberation struggle of the peoples of Asia.

(2) Ceaseless efforts must be made to unite the ranks of the working class by systematic exposure of the splitters like the leadership of the INTUC and the Socialist Party, by persistently explaining to the rank-and-file workers under reformist influence the significance of the cause of working class unity, by bringing the unorganised workers into the fold of the unions affiliated to AITUC, organising joint strike committees with all unions in defence of working class rights and interests, and by setting up broad-based rank-and-file mill committees, factory committees, etc. The Communist Party and the militant unions led by it must be in the forefront of all in mobilising the broadest masses of workers to fight for their immediate and most easily understood demands and thus help to establish permanent unity in the ranks of the proletariat. Unity of the working class is essential not only for the successful defence of its day-to-day interests but also for consolidating its leading and organising role in the people's liberation struggle.

(3) Systematic efforts must be made to develop the struggle of the agricultural workers for wages and land and to organise independent agricultural workers' unions. At the same time, it is of the utmost importance to remove the lag in giving a broadbased and all-India character to the struggles of the peasants against the oppression of the feudal landlords and the police and for the seizure of land, which are developing under the revolutionary leadership of agricultural workers and proletarianised peasants and which are rising to the level of partisan warfare as in Telangana and other places. Drawing the broadest masses of the peasantry in the revolutionary struggle for land, for the abolition of landlordism will be possible only by resolutely fighting against the Congress and socialist leaders, the purveyors of the stupefying influence of Gandhism, who are seeking to draw away the peasant masses from revolutionary struggle and to disrupt the growing worker-peasant alliance in the countryside. The building of mass agricultural workers' unions, and of mass Kisan Sabhas, their coordination and guidance on an all-India plane, the isolation and exposure of the parallel Kisan organisations that are sought to be formed by the Congress and socialist leaders are the most important tasks closely bound up with the developing revolutionary struggle of the peasantry under the leadership of the proletariat and the Communist Party.

(4) It is of the utmost importance to develop a broadbased struggle against the fascist repressive policy of the Congress rulers, the trampling of all democratic rights and liberties by them which is arousing anger and disillusionment among the wide sections of the people. For this purpose we must broaden the movement for the defence of civil liberties by bringing within its fold all parties, groups, organisations and individuals who are prepared to defend the civic rights and political liberties of the people.

The resolutions of the polit-bureau, correctly repudiating both reformist restriction of mass· struggles into the confines of peaceful constitutionalism as well as petty-bourgeois revolutionism advocating socalled 'militant' actions without the participation of the mases, have rightly stressed upon the supreme importance of combining all reforms of struggle taking into account the unequal development of the movement of the mases in different parts of the country. These directives summed up the essence of our experience of the countrywide struggles led by the Communist Party in different forms on different issues. Emphasising the essence of the experience of the Chinese revolution and the national-liberation struggle of other colonial countries, the editorial article has correctly pointed out that "A decisive condition for the victorious outcome of the national-liberation struggle is the formation, when the necessary internal conditions allow for it, of people's liberation armies."

The immense significance of the editorial article of the organ of the information bureau must be properly understood. The Anglo-American imperialists are preparing for war with feverish haste, to drown in blood the national-liberation movement of the Asian peoples. The Communist Party of India must play its historic role by mobilising millions of people against imperialism, for national independence and people's democracy.

The hatred and indignation of the people are rising high against the Congress Government selling national independence to the imperialists and brutally suppressing the people at the orders of their imperialist masters. Armed clashes are taking place between its police and the people in many parts of the country. Partisan fighters are already active in the field in certain regions. The base of the imperialists is tottering.

By correct application of the tactical line contained in the editorial

article, the Communist Party shall be able to be at the head of a nation-wide struggle for real national independence and people's democracy.

By daily exposing the colonising plans of the imperialists at every step, by weaning away the masses from the influence of the Congress and the socialist leaders acting as the stooges of Anglo-American imperialists, by combining all forms of struggle and by mobilising all democratic forces, we will be able to remove the gap that exists between the national-liberation struggle of the Indian people and that of the other Southeast Asian countries. The patriotic call for national independence, peace and democracy has such a wide appeal that it is possible for the Communist Party to mobilise the millions of working people and other democratic forces in India against the anti-national reactionary bloc led by Anglo-American imperialists.

The Congress Government is delivering cruel blows on the people's movement, on the working class and on the Communist Party to save the crumbling colonial order of the imperialist colonisers. But as the editorial article points out, "when a people resolutely goes into struggle and when the communist parties are capable of heading this struggle, no forces of internal counterrevolution and of the foreign imperialists can crush the people's masses who have taken to revolution".

The editorial article of the information bureau organ is a great contribution to the unification of party ranks. Since the second party congress the stubborn fight against reformism carried on by the entire party has played a great role in unifying the ranks and putting the party at the head of the fighting people. The editorial article of the information bureau strengthens that fight and at the same time corrects our sectarian deviation from the path of Marxism-Leninism. Armed with this weapon based upon the correct application of Lenin and Stalin teachings to fight against all alien trends, we must unify the entire party as a granite rock against imperialism and its Indian allies.

প্রাপ্তি স্বীকার : Documents of History of Communist Party of India, Vol VII P. 614-627 Ed. M. B. Rao

টিকা : This statement was issued on 22 February 1950 as PB document No. 14 for all party members. (—সম্পাদক)

কমিনফর্ম সম্পাদকীয় আলোচনার মধ্য দিয়ে পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করুন, টিটোপন্থী-যোশীবাদীদের বিচ্ছিন্ন করুন

বাহির ও ভিতর থেকে সাম্রাজ্যবাদ শ্রমিক শ্রেণি এবং তার মহান পার্টি কমিউনিস্ট পার্টির উপর প্রাণপণে আক্রমণ শুরু করেছে। সমগ্র পার্টিকে এখনই ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলশেভিক দৃঢ়তার সাথে এ আক্রমণকে রুখতে হবে।

বাইরে এ আক্রমণের রূপ হলো দাঙ্গা, ভিতরে এর রূপ হলো ভেদপন্থীদের চক্রান্ত। কমিনফর্ম আমাদের এ দুই আক্রমণের বিরুদ্ধেই সতর্ক করে দিয়েছেন—এ দুই আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যেই মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের অমোঘ হাতিয়ার তুলে দিয়েছেন—তাকে এখনই প্রয়োগ করতে হবে শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার কাজে।

পার্টির ভিতরে টিটোপন্থী যোশীবাদীদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। কিন্তু তারা বর্তমান দাঙ্গা ও দমননীতির সুযোগ নিয়ে পার্টির মধ্যে ভেদ-সৃষ্টির জন্যে যেসকল কৌশল অবলম্বন করেছে—সে সম্পর্কে সমস্ত পার্টি-সভ্যকে সচেতন করা প্রয়োজন। সে-সকল কৌশল কি?

(১) কমিনফর্ম পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ আলোচনা করার নাম করে যোশীপন্থীরা পার্টি-নেতৃত্ব এবং পার্টির আভ্যন্তরীণ কাজকর্ম সম্পর্কে সর্বত্র কুৎসা রটনা করে বেড়াচ্ছে, নানাপ্রকার গুজব ও মিথ্যা রটনা করে—পার্টি-সভ্যদের মনোবল ভেঙ্গে দিতে চাচ্ছে, পার্টি-সভ্যদের কাজকর্মের গতিবেগ কমিয়ে দিতে চাচ্ছে।

তারা কিরকম মিথ্যা রটনা করছে—তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি : তারা রটনা করছে কমরেড সোমনাথ লাহিড়ীকে পার্টিতে কয়েদী করে রাখা হয়েছে, অন্ধ্র প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েটকে বহিষ্কার করা হয়েছে, কমরেড ডাঙ্গেকে পার্টি থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে—ইত্যাদি। তারা প্রচার করছে যে—পার্টিতে রাজনৈতিক প্রশ্ন তুললেই তাকে তাড়িয়ে দেয়া হয়—ইত্যাদি।

(২) তারা পার্টি-ইউনিটে শ্লোগান তুলছে যে, আগে পার্টি নীতি ঠিক হোক—তারপর কাজ করবো। অর্থাৎ যোশী-নীতি যতক্ষণ না আবার গৃহীত হচ্ছে ততক্ষণ যেন কোন কমরেড কাজ না করেন; এককথায়, শত্রুর আক্রমণ যেখানে দাঙ্গার নির্মম রূপ নিচ্ছে—সেখানে তারা শ্রমিক শ্রেণিকে সকল প্রকার প্রতিরোধ থেকে নিরস্ত্র করতে চাচ্ছে।

(৩) শত্রুপক্ষে যোগদান করার জন্যে, পুলিশের গুপ্তচরের কাজ করার জন্যে, পার্টির ক্ষতি করার জন্যে যেসকল লোককে পার্টি থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে তাদের পার্টিতে ফিরিয়ে

আনার জন্যে, ভেদপন্থীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আন্দোলন শুরু করেছে। পার্টির নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ভেদপন্থীরা তাদের সাথে প্রকাশ্যেই মেলা-মেশা করছে। অনন্ত সিং, সুবোধ দাশগুপ্ত, দেবদাস ঘোষ, পরিতোষ, সরোজ রায়, অজিত রায় প্রভৃতির বাড়ীগুলি ভেদপন্থীদের প্রধান আড্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(৪) জেলা কমিটিগুলিতে শ্রমিক এবং কৃষক সভ্য বেশি নেওয়ার বিরুদ্ধে তারা নানারকমের যোশীবাদী 'থিওরী প্রচার করছে। পার্টি-ইউনিটগুলিকে জেলা কমিটির বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহ' করতে বলছে। জেলা কমিটির শ্রমিক-সভ্যদের মার্ক্সবাদ-লেলিনবাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পার্টি-সভ্যদের মধ্যে তাদের হেয় করার চেষ্টা করছে, তাদের দৈনন্দিন কাজে বাধা সৃষ্টি করছে।

(৫) এই ছদ্মবেশী শত্রুর দল পার্টির মধ্যে যে লৌহদৃঢ় বলশেভিক ঐক্য ও শৃঙ্খলা রয়েছে, যে বলশেভিক কেন্দ্রীয়করণের নীতি (সেন্ট্রালিজম্) রয়েছে—'গণতন্ত্রের' নাম করে তাকেই আঘাত করার চেষ্টা করছে, তাকেই দুর্বল করার চেষ্টা করছে। পার্টির বে-আইনি অবস্থায় এই বলশেভিক নিয়ম-শৃঙ্খলাকে একবার দুর্বল করতে পারলে শত্রুর পক্ষে পার্টিতে প্রবেশ করা সহজ হবে, পার্টিকে ধ্বংস করা সহজ হবে—তার জন্যেই যে কোন রকমের কেন্দ্রীকতার বিরুদ্ধেই ভেদপন্থীদের আক্রমণ শুরু হয়েছে সবচেয়ে বেশি।

পার্টির মধ্যে ভেদপন্থীদের এ ধরনের আক্রমণ সম্পর্কেই নিউ-টাইমস পত্রিকা, কমিনফর্ম এবং প্রাভদা প্রভৃতি কমিউনিস্ট আন্দোলনের মুখপত্রগুলি আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। তাঁরা পরিষ্কারভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন যে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রধান গোয়েন্দা টিটো খাস নয়া দিল্লীতে তাঁর দপ্তর খুলেছে। কমিনফর্মের সতর্কবাণী যে কতখানি সত্য তা নয়াদিল্লী থেকে 'ব্লিৎস' পত্রিকা সম্প্রতি যে খবর ছাপিয়েছে তা থেকেও বুঝা যায়। 'ব্লিৎস' পত্রিকা লিখেছে যে, নেহরু সরকার পুলিশের গুলি অপেক্ষা যোশীবাদীদের ভেদনীতির উপর বেশি নির্ভর করবে বলে স্থির করেছে এবং তারজন্যেই যারা জেলে নিজেদের যোশীবাদী বলে ঘোষণা করবে তাদের ছেড়ে দিবে। তারা যাতে 'সমাজতন্ত্রী'দের সাথে একযোগে কাজ করতে পারে তার জন্যে তাদের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হবে। ঐ পত্রিকায়ই বলা হয়েছে যে যোশী কলকাতায় কোথায় থাকে কি করে তা গভর্নমেন্ট জানে, কিন্তু তাকে ধরার তাদের কোন ইচ্ছা নেই। জেল থেকে বন্ড দিয়ে বের হয়ে এসে যোশীবাদীরা বোম্বাইয়ে প্রকাশ্যেই নেহরুর পুলিশ-গোয়েন্দার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। কাজেই, যোশীবাদীরা যে এসময়ে সবচেয়ে সক্রিয় হয়ে উঠবে তাতে মোটেই আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ভারত ও পাকিস্তানে সাম্রাজ্যবাদের প্রাধান্য তা না দেখবার ফলে, সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ-প্ল্যান কতখানি পেকে উঠেছে—তা না দেখবার ফলে আমরা যেমন এতবড় দাঙ্গার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না, সাম্রাজ্যবাদ প্রধান শত্রু—একথা এতদিন প্রচার না করার ফলে আজ যেমন চট করে দাঙ্গার জন্যে তাদের দায়ি বললেই সকলে তা বিশ্বাস করে উঠতে পারে না, তেমনি ভারত ও পাকিস্তানে টিটোপন্থী বিশ্বাসঘাতকদের সম্পর্কেও সতর্ক না থাকার ফলে এখন কোন কোন ভাল কমরেডও তাদের প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে নির্মমভাবে লড়তে পারছেন না। বাইরের আর-এস-এসদের মতোই ভিতরের এই ভেদপন্থীরা রক্তক্ষয় করে পার্টিকে দুর্বল করতে চাচ্ছে। বাইরে সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য যেমন তেলেঙ্গানা, কাকদ্বীপ এবং ময়মনসিংয়ের মুক্তএলাকা, পার্টির ভিতরেও

বিভেদপন্থীদের আক্রমণের লক্ষ্য গত দু' বছরে পার্টি বিপ্লবের যে সকল দুর্গ গড়ে তুলেছে তাই। পার্টি সভ্যদের মন থেকে তার বিপ্লবী চেহারা মুছে ফেলে দিয়ে তারা তেলেঙ্গানা ও কাকদ্বীপ মেদিনীপুরকে তুলে দিতে চায় শত্রুর হাতে। মিলিটারী-পুলিশের গুলি যা করতে পারেনি—রাজনৈতিক অস্ত্র প্রয়োগ করে—এই বিভীষণের দল তাই করতে পারবে বলে আশা করছে।

কমিনফর্মের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ তাদের সে আশায়ই ছাই দিয়েছেন, নিউ-টাইমস-এর মন্তব্য তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যেই আহ্বান জানিয়েছেন। এ সংগ্রাম প্রত্যেক পার্টি সভ্যকে আজ সচেতনভাবে চালাতে হবে। কিভাবে আমরা এ সংগ্রাম চালাতে পারি?

আমাদের প্রথম কাজ হলো—কমিনফর্ম-এর সম্পাদকীয় এবং তার উপর পলিট-ব্যুরোর প্রস্তাবের আলোচনাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা। পলিট-ব্যুরোর প্রস্তাবের পক্ষে-বিপক্ষে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করার পূর্ণ সুযোগ পার্টিতে রয়েছে। পলিট-ব্যুরো নিজেই তার প্রস্তাব আলোচনা করতে বলেছেন। প্রাদেশিক কমিটি ও জেলা কমিটি প্রত্যেক ইউনিটকে এ আলোচনায় সাহায্য করবেন। পলিটব্যুরোর প্রস্তাব সম্পর্কে প্রত্যেক পার্টি সভ্য প্রত্যেক পার্টি ইউনিট যাতে তার মন খুলে, নিজস্ব মত দিতে পারেন, যাতে পার্টি সাহিত্য পড়ে আলোচনার জন্যে নিজেদের তৈরি করতে পারেন,—তার ব্যবস্থা করবেন। শুধু ভিন্ন রকমের রাজনৈতিক মত প্রকাশের জন্যে পার্টি থেকে বিতাড়িত করা হয়—একথা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তা পার্টি সভ্যদের বুঝিয়ে দিতে হবে।

সংগঠিতভাবে আলোচনা চালানোর কায়দা কি? কায়দা হলো—পার্টি-ইউনিটের সামনে নিজ নিজ মত উপস্থিত করা। কমিউনিস্ট পার্টি বুর্জোয়া গণতন্ত্র বা মামুলী গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। কাজেই সেখানে 'বিরোধী দল' গঠনের জন্যে কোন গণতন্ত্র নেই। কমিউনিস্ট পার্টিতে গণতন্ত্র রয়েছে প্রত্যেকের লড়াইয়ে প্রত্যেককে সাহায্য করার জন্যে, নেতৃত্বের কাজে সাহায্য করার জন্যে, কোথায় ভুল রয়েছে—কোথায় বুর্জোয়াদের প্রভাব রয়েছে, অতীতের কোন কোন সংগ্রামে তা প্রকাশ পেয়েছে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে তা বের করে তাকে আঘাত করার জন্যে। প্রত্যেক ইউনিটের আলোচনায় একটিমাত্র লক্ষ্যই ঘোষিত হবে—সে লক্ষ্য হলো সমস্ত পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে শত্রুর বিরুদ্ধে আঘাত আরো শক্তিশালী করা।

যারা পার্টি-ইউনিটকে ভয় করে, যারা পার্টির লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলাকে ভয় করে একমাত্র তারাই পার্টির বাইরে শত্রুমহলে যেয়ে পার্টির সমালোচনা করে। তাদের উপর নজর রাখতে হবে। তাদের স্বরূপ প্রকাশ করতে হবে। তাদের লক্ষ্য পার্টিকে ভেঙ্গে দেয়া—এ সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে।

দ্বিতীয় কাজ হবে দাঙ্গার বিরুদ্ধে সংগ্রামে কমিনফর্ম সম্পাদকীয়কে মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে অগ্রসর হওয়া। দাঙ্গাবাজাদের চেহারা জনগণের সামনে তুলে ধরে তাদের বিরুদ্ধে ক্রোধ জাগ্রত করা। যারা বলছে—পার্টিনীতি ঠিক না হলে কাজ করতে পারবো না, তাদের প্রধান উদ্দেশ্য, রাজনীতি বুঝা নয়, উদ্দেশ্য হলো পার্টির কাজকর্ম বন্ধ রেখে পার্টি-নেতৃত্বকে অকেজো করে দেয়া। তাদের এ নীতি প্রত্যক্ষভাবে শত্রুকে সাহায্য করে বলেই তাদের স্বরূপ খুলে দিতে হবে; তাদের উপর নজর রাখতে হবে।

কমিনফর্মের সম্পাদকীয় প্রবন্ধের বিপ্লবী তাৎপর্য কোন পার্টি-ইউনিট কতখানি বুঝেছেন

তার একটা বড় প্রমাণ পাওয়া যাবে দৈনন্দিন সংগ্রামে তার প্রয়োগের মধ্যে। দাঙ্গার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রত্যেক পার্টি-ইউনিট নূতন-নূতন কৌশলের কথা বলতে পারেন এবং তাকে কাজে পরিণত করতে পারেন এবং তার মধ্য দিয়েই অতীতের ভুল ত্রুটি আরো সহজে ধরা পড়তে পারে। আমাদের এই বলশেভিক পথই গ্রহণ করতে হবে।

আমাদের তৃতীয় কাজ হবে, যেসকল টিটোপন্থী যোশীবাদী আজ রাতারাতি 'বিপ্লবী' সাজবার চেষ্টা করছে তাদের কুকীর্ত্তির ইতিহাস পার্টির সভ্য ও সমর্থকদের সামনে তুলে ধরে তাদের সতর্ক করা। যোশী পার্টিকে পরিণত করেছিল বুর্জোয়া সংগঠনে; পার্টির দরজা খুলে দিয়েছিল শত্রুর জন্যে, ভীরুদের জন্যে, বুর্জোয়া দালাল ও পুলিশ এজেন্টের জন্যে। রাজনীতি যখন বুর্জোয়াদের লেজুড়বৃত্তি হয়—তখন সংগঠনের ক্ষেত্রে পার্টি পরিণত হয় বুর্জোয়া সংগঠনে—লেনিনের এটা একটা ঐতিহাসিক কথা। গত দু'বছরে এই বুর্জোয়া দালালদের পার্টি থেকে তাড়িয়ে এই আমরা একটা সত্যিকারের বলশেভিক পার্টি গড়ে তুলেছি। 'সখের সাম্যবাদ' করা আজ পার্টিতে কঠিন হয়ে পড়েছে বলেই তারা এখন এত হৈ চৈ শুরু করেছে। যে কমিনফর্মের সম্পাদকীয়ের কথা উল্লেখ করে 'বিপ্লবী' সাজবার চেষ্টা করছে—সে কমিনফর্মেরই অন্য এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই ধরনের সংস্কারবাদীদের বিতাড়িত করে পার্টিকে শক্তিশালী করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

কমিনফর্ম সম্পাদকীয় এবং তার উপর পলিট বুরোর প্রস্তাব টিটোপন্থী যোশীপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার, পার্টিকে মার্ক্সবাদ-লেলিনবাদের উপর ঐক্যবদ্ধ করে সাম্রাজ্যবাদ-বড় বুর্জোয়া ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার হাতিয়ার, একটি তেলেঙ্গানা, হাজং এলাকা ও কাকদ্বীপ নয়—পাকিস্তান ও ভারতের ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে মুক্ত এলাকা সৃষ্টি করার ডাক। যোশীবাদের বিরুদ্ধে নির্মম সংগ্রাম করে, ভেদ-পন্থী টিটোপন্থীদের পার্টির চুতঃসীমা থেকে দূর করেই আমাদের সে সংগ্রামে অগ্রসর হতে হবে। কমিনফর্ম প্রস্তাবের উপর আলোচনা ও আত্মসমালোচনার সময় প্রত্যেক পার্টি-সভ্য প্রত্যেক পার্টি-ইউনিটকে একথা মনে রাখতে হবে।

৩০ মার্চ ১৯৫০ *প্রোসেক্ট*, সার্কুলার নং ১৬

সহায়ক তথ্য - ৩৪

সি-সি'র জন্য পি-বি'র খসড়া
এবং পার্টি সভ্যদের ভিতর আলোচনার জন্য

ভারতের জনতার গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান কর্ত্তব্য

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি
পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি

দাম-পাঁচ আনা

১৩ই মে, ১৯৫০

ভারতের জনতার গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রধান বৈশিষ্ট্য
এবং
কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান কর্তব্য

(সি.সি.-র জন্য পি.বি.-র প্রস্তাবের খসড়া)

কমরেডস্,

এই দলিল পি-বি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছেন। কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত হবার আগেই দলিলটি পার্টি সভ্যদের নিকট উপস্থিত করা হচ্ছে দুটো উদ্দেশ্যে ঃ

প্রথমত, পার্টি সভ্যরা তাঁদের মূল্যবান বাস্তব অভিজ্ঞতা ও থিয়োরেটিক্যাল জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত নিজেদের মত প্রকাশ করে সঠিক কর্মনীতি (ষ্ট্রাটেজি) ও কৌশল (ট্যাকটিক্স্) স্থির করবার ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে অংশ নিবেন ও পি-বি ও সি-সি'কে সাহায্য করবেন।

দ্বিতীয়ত, পার্টি সভ্যরা এমনভাবে তাঁদের আলোচনা চালাবেন যাতে বামপন্থী সংকীর্ণতা ও দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে সঠিকভাবে লড়াই চালানো যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) দলিলগুলি, কমিনফর্ম মুখপত্রের সম্পাদকীয়, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির দলিলগুলি, এশিয়া ও অষ্ট্রেলেশিয়ার দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়নের পিকিং সম্মেলনের প্রস্তাব ও বক্তৃতাবলি, বিভিন্ন ইউনিট ও পার্টি মেম্বাররা পি-বি'র যা সমালোচনা পাঠিয়েছেন, এই সবের সাহায্যে পি-বি'র মৌলিক ভুলগুলি সম্বন্ধে সাধারণভাবে এই দলিলে উপস্থিত করা হয়েছে।

এই দলিলের প্রধান ত্রুটি হচ্ছে এতে প্রধান ভুলগুলি সম্বন্ধে বলা হয়েছে এবং খুব সাধারণভাবে বলা হয়েছে। গত আড়াই বছরে যে সব সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে তার কোন পর্যালোচনা এতে দেওয়া হয় নাই। জাতি সমস্যা ও ভাষাগত প্রদেশ সম্বন্ধে এতে কিছু বলা হয় নাই। এই সব প্রশ্ন ও জেলে যে সব সংগ্রাম পরিচালনা করা হয়েছে, সে সব ভিন্ন দলিলে আলোচনা করা হবে। এ সব তৈরি করতে পি-বি'র সময় লাগবে।

'জনতার গণতন্ত্র', 'কৃষি সমস্যা' ও 'শ্রমিক ফ্রন্টের কৌশল' সম্বন্ধে আলাদা দলিল তৈরি করা হচ্ছে। কমরেড মাও-সে-তুংকে ভুলভাবে ও প্রকাশ্যভাবে সমালোচনা করে পি-বি যে ক্ষমাহীন অপরাধ করেছেন, তার ওপরও একটি দলিল তৈরি হয়েছে। পি-বি'র কাজের একটি আত্মসমালোচনামূলক রিপোর্টও তৈরি হচ্ছে। পি-বি'র কার্যকলাপের পরিপূর্ণ আত্মসমালোচনামূলক খতিয়ান থাকবে এই রিপোর্টে। কমিনফর্ম সম্পাদকীয় দেরিতে প্রকাশ করার মত অপরাধজনক কাজ, প্রভৃতিও এতে থাকবে। যথাশীঘ্র সম্ভব এই দলিলগুলি আপনাদের নিকট পাঠানো হবে।

পি-বি আশা করেন, এই দলিলে যে মোটা সাধারণ লাইন দেয়া আছে তার ওপর দলিলটিকে প্রত্যেক পার্টি ইউনিট আলোচনা করবেন এবং নিজেদের অমূল্য অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত নিজেদের মতামত দিয়ে পি-বি ও সি-সিকে সাহায্য করবেন। নেহরু সরকার ও টিটো

অনুচরেরা ভিতর ও বাইরে থেকে যোশী ও অন্যান্য দলত্যাগীদের (রেনিগেড) সাহায্যে পার্টিকে ভাঙবার জন্য যে সব ফন্দি আঁটছে, এইসাথে, সে দিকেও তীব্র নজর রাখবেন।

৭ এপ্রিল ১৯৫০ অভিনন্দন।

পি-বি

সি.সি.-র জন্য পি.বি.-র খসড়া

ভারতের জনতার গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান কর্তব্য

এক

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারতীয় জনতার গণতান্ত্রিক সংগ্রাম অভূতপূর্ব গতিতে অগ্রসর হয়েছে। এই সংগ্রামগুলি পরিচালিত হয়েছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং তার দাসানুদাস বৃহৎ বুর্জোয়া, দেশীয় নৃপতি ও জমিদারদের বিরুদ্ধে। এই সংগ্রামের প্রধান চরিত্র হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী। এ সংগ্রাম উপনিবেশ ও পরাধীন দেশের জনতার জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের সাধারণ বৈপ্লবিক অগ্রগতির অঙ্গ। এ সংগ্রাম, সোভিয়েত রুশিয়া পরিচালিত আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক শিবিরের অঙ্গ। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ আন্দোলনের বর্তমান স্তরের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ আন্দোলন শ্রমিক শ্রেণি ও তার পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বের ভূমিকা, জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনকে জনতার গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের চরিত্র দিয়েছে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের জন্য নয়।

জাতীয় মুক্তির জন্য এই সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে শ্রমিক, সমস্ত কৃষক সম্প্রদায়, শহরের পেটি বুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবী ও যারা গলাকাটা বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সাম্রাজ্যবাদী পীড়নের বিরুদ্ধে নিজেদের বাঁচাতে চায় সেই মাঝারি বুর্জোয়াদের সাথে কমিউনিস্ট পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

জনতার গণতন্ত্র যেমন সাম্রাজ্যবাদী পীড়ন থেকে মুক্তির গ্যারান্টি দিবে, তেমনি দেশকে খাঁটি গণতান্ত্রিক রূপান্তরে পরিচালনার গ্যারান্টি দিবে। সমাজবাদী গঠনে যাবার প্রয়োজনীয় আনুপূর্বিক ব্যবস্থা করবে।

ভারতীয় বিপ্লবের বর্তমান স্তরের মৌলিক প্রশ্ন সম্বন্ধে ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সালে গৃহীত পি-বি'র প্রস্তাবগুলি, মার্ক্সবাদ-লেলিনবাদের সঠিক পথ থেকে বামপন্থী সংকীর্ণতার বিচ্যুতি (লেফ্‌ট সেকটেরিয়ান) করেছে।

কমিনফর্মের মুখপত্রের ১৯৫০ সালের ২৭শে জানুয়ারী সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমাদের জন্য, আমাদের বিপ্লবের বর্তমান স্তরের লেনিন-ষ্ট্যালিন কর্মনীতি ও কৌশলের (ষ্ট্রাটেজি ও ট্যাকটিক্‌স্‌) কাঠামো দিয়েছে এবং এইভাবে আমাদের এই বামপন্থী সংকীর্ণতার বিচ্যুতির উপর তীব্র আলোকপাত করেছে। এই সম্পাদকীয়র উপর ২২শে ফেব্রুয়ারী পি-বি যে

বিবৃতি দিয়েছিলেন তাতে এই সম্পাদকীয় থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করা হয় নাই এবং পি-বি যে বামপন্থী সংকীর্ণতার বিচ্যুতি করেছেন তার গুরুত্বকে তাতে ছোট করে দেখবার চেষ্টা হয়েছে। ইহা বিপ্লবী সম্ভাবনার পিছনে শুধু পিছিয়ে পড়ার (ল্যাগিং) প্রশ্ন নয়, অথবা কৌশল সম্বন্ধে (ট্যাকটিকস্) শুধু কিছু গোঁড়ামী (ডগম্যাটিস্ট) ও সংকীর্ণতার ভুলের কথা নয়। ইহা সাধারণ ভুল ছিল না। আমাদের বিপ্লবের বর্তমান স্তর, কর্মনীতি (ষ্ট্রাটেজি) এবং শ্রেণি সম্বন্ধ নির্ণয় করার ব্যাপারে গুরুতর 'বামপন্থী' সুবিধাবাদী বিচ্যুতি হয়েছিল।

"বিপ্লবের প্রকৃতি সম্বন্ধে যে ভুল করে, নির্দিষ্ট বিপ্লবী কর্তব্য সম্বন্ধেও ভুল করতে সে বাধ্য।"

পি-বি বিপ্লবের প্রকৃতির প্রশ্নেই যে শুধু ভুল, মার্ক্সবাদ-বিরোধী ও লেনিনবাদ-বিরোধী সূত্র ঠিক করেছিলেন, তাই নয়। বিপ্লবী কৌশল ও নির্দিষ্ট বিপ্লবী কর্তব্যগুলি সম্বন্ধেও পি-বি গুরুতর বামপন্থী সংকীর্ণতার ভুল করেছিলেন। লেনিন ও ষ্ট্যালিনের শিক্ষা থেকে গভীর পথচ্যুতির দোষে পি-বি দোষী ছিলেন।

এই বিচ্যুতির গুরুত্ব ও এ সম্বন্ধে সঠিক উপলব্ধি জন্মাতে পারে, নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অবস্থা, বিজয়ী চীন বিপ্লবের পথ ও তা থেকে শিক্ষা—এই সম্বন্ধে নির্ভুল উপলব্ধি থেকেই।

দুই

মহান অক্টোবর সমাজবাদী বিপ্লবের পর, উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের নিপীড়িত জনতার জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন ক্রমেই গভীরতর হয়েছে, অনবরত সাম্রাজ্যবাদের পশ্চাৎভাগ বিপর্যস্ত করেছে। ষ্ট্যালিন বলেছেন, "অক্টোবর বিপ্লব নবযুগের ঔপনিবেশিক বিপ্লবের যুগের সূচনা করেছে। এই বিপ্লব দুনিয়ার নিপীড়িত দেশগুলিতে পরিচালিত হচ্ছে, শ্রমিক শ্রেণির সহযোগে ও শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে"। (প্রবলেমস অফ লেনিনিজম, ১৯৪৭ মস্কো সংস্করণ, ২০১ পৃঃ)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট আক্রমণকারীদের পরাজয়, সোভিয়েতের বিশ্ব-ঐতিহাসিক বিজয়, এবং অনেকগুলি দেশ যে পুঁজিবাদী প্রথা থেকে খসে পড়েছে ও সমাজবাদ বিকাশের পথ গ্রহণ করছে, এতে উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদের কর্তৃত্ব প্রভূত ও অভূতপূর্ব পরিমাণে দুর্বল করে দিয়েছে। ইহা ঔপনিবেশিক প্রথার সংকটকে গভীর করেছে, পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের ইহা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনটাং ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে চীনের জনতার বিশ্ব-ঐতিহাসিক বিজয়, উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের অগ্রগতির জ্বলন্ত নিদর্শন।

"পরাধীন ও ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে যুদ্ধপরবর্তী বিপ্লবী, মুক্তি-সংগ্রামের বিপুল অগ্রগতি বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের গোটা প্রথার একেবারে ভিত্তি পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়েছে। এবং দেখা যায়, উপনিবেশের জনতা পুরোনো ধরনে আর বাস করতে রাজি নয় ও সাম্রাজ্যবাদী দেশের শাসক শ্রেণিও আর পুরোনো কায়দায় শাসন চালাতে পারছে না"। এই কথাগুলির ভিতর দিয়ে কমিনফর্ম পত্রিকা (১৯৫০ সালের ৪ নং), উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির বর্তমান অবস্থার সারমর্ম প্রকাশ করেছে।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উপনিবেশের জনতার জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : অনেক উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশে সশস্ত্র সংগ্রামই সংগ্রামের প্রধান রূপ

হয়ে উঠেছে; এই সব সংগ্রাম শ্রমিক শ্রেণি ও তার পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে; বৃহৎ বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদের শিবিরে চলে গেছে; এবং কৃষক সম্প্রদায় হচ্ছে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের চালক শক্তি (ড্রাইভিং ফোর্স)

কমিনফর্ম পত্রিকার ঐ সম্পাদকীয়তে (১৯৫০ সালের ৪ নং) বলা হয়েছে ঃ

"চীনের জনতার বিজয়ী জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের অভিজ্ঞতা এই শিক্ষা দেয়, সাম্রাজ্যবাদ ও তার ভাড়াটিয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে ইচ্ছুক সমস্ত শ্রেণি, পার্টি, দল ও সংগঠনের সাথে শ্রমিক শ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং ব্যাপক দেশব্যাপী যুক্তফ্রন্ট গড়তে হবে শ্রমিক শ্রেণি ও তার অগ্রণী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে। যে পার্টি মার্ক্সবাদ- লেনিনবাদের নীতিতে সুসজ্জিত, যে পার্টি বিপ্লবী কর্মনীতি ও কৌশল করায়ত্ত্ব করেছে, যে পার্টি জনতার শত্রুদের প্রতি আপসহীন বিপ্লবী ভাবধারায় উদ্দীপিত, জনতার গণ-আন্দোলনে শ্রমিক সংগঠন ও শৃঙ্খলার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত"।

চীনের অভিজ্ঞতা বলে, "জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের সাফল্যের চূড়ান্ত শর্ত হচ্ছে, প্রয়োজনীয় আভ্যন্তরীণ অবস্থা সৃষ্টি হলে, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জনতার মুক্তি- ফৌজ গঠন।"

সারা দুনিয়া ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সহঃ সভাপতি লিউ-শাও-চি বলেন, "সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুচরদের পরাস্ত করার জন্য ও চীন গণরাষ্ট্র গঠন করার জন্য চীনের জনতা যে পথ গ্রহণ করেছে, বিভিন্ন উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির জনতাকে নিজেদের জাতীয় স্বাধীনতা ও জনতার গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে সেই পথ গ্রহণ করতে হবে"।

জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে জয়লাভের জন্য চীনের শ্রমিক শ্রেণি যে পথ গ্রহণ করেছে তার সার কথা হচ্ছে ঃ—

(১) অবিরাম সংগ্রামের ভিতর দিয়ে চীনের শ্রমিক শ্রেণি ব্যাপক জনতার সমর্থন লাভ করেছে এবং চীনের জনতার মুক্তি-আন্দোলনে প্রকৃত নেতা হয়েছে। চীনের শ্রমিক শ্রেণি ব্যাপক কৃষক জনতার সমর্থন লাভ করেছে এবং বিপ্লবী কৃষি সংগ্রাম গড়ে তুলেছে; তাতে ব্যাপক কৃষক জনতা যোগ দিয়েছে।

(২) চীনের শ্রমিক শ্রেণি শহরে ব্যাপক পেটিবুর্জোয়া জনতার সাথে, বিশেষ করে বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। যারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ইচ্ছুক, সেই সব পার্টি, শ্রেণি ও দলের ব্যাপক জাতীয় যুক্ত ফ্রন্ট গড়ে তুলতে পেরেছে। মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের থেকে জাতীয় বুর্জোয়াদের আলাদা করে দেখতে পেরেছে এবং জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে জাতীয় বুর্জোয়াদের মিত্র হিসাবে দেখেছে।

(৩) চীনের শ্রমিক শ্রেণির অনেক কর্মী গ্রামে চলে গিয়েছে এবং সেখানে জমিদারদের বিরুদ্ধে ব্যাপক কৃষক জনতাকে আন্দোলনে নামিয়েছে, অসংখ্য ছোট ছোট বাহিনী গড়ে তুলেছে, গেরিলা ঘাঁটি তৈরি করেছে, যা সুদীর্ঘ দিনের গেরিলা যুদ্ধের ভিতর দিয়ে শক্তিশালী জনতার মুক্তি-ফৌজে পরিণত হয়েছে।

(৪) শহরে, প্রতিকূল অবস্থার ভিতর শ্রমিক শ্রেণি সম্মুখযুদ্ধ এড়িয়ে চলেছে। সংগঠন সংহতি বজায় রেখে ও শক্তি সঞ্চয় করে শ্রমিক আন্দোলন চালনা করেছে। আইনগত ও প্রকাশ্য কাজের সামান্যতম সম্ভাবনাকেও ব্যবহার করা হয়েছে। শত্রুদের ভিতরকার সামান্য অন্তর্দ্বন্দ্বেরও ব্যবহার করে মেহনতী জনতাকে সংগঠিত ও শিক্ষিত করে তোলা হয়েছে, তাদের

জীবনের মানের উন্নতির জন্য দৈনন্দিনকার ক্ষুদ্র সংগ্রামও পরিচালনা করা হয়েছে।

লি লি সান বলেন, "অবশ্য এই সব আইনগত কার্যকলাপ ও প্রকাশ্য সংগ্রাম নানা আকারে ও নানা যোগসূত্র মারফৎ চালাতে হয়েছে, যাতে সম্পূর্ণ গোপন সংগঠনের অধীনে এগুলি চালানো যায়। এইভাবে আইনগত সংগ্রামের সাথে বিপ্লবী গোপন কাজের যোগ সাধন করা হয়েছে। এইভাবে উপযুক্ত মুহূর্তের জন্য বিপ্লবী শক্তি সঞ্চয় করা হয়েছে, যে মুহূর্তে জনতার মুক্তি-ফৌজ কর্তৃক শহর দখল করার সময় শ্রমিক শ্রেণিকে সাহায্য করার জন্য আহ্বান করা হত। বিপ্লবের বিজয়ের আগে শহরে কাজের এই ছিল প্রধান ধারা।

(৫) চীনের কমিউনিস্ট পার্টি চীনের শ্রমিক শ্রেণিকে ও চীনের শ্রমিক আন্দোলনকে পরিচালিত করেছে।

চীনের শ্রমিক শ্রেণি এই পথ অনুসরণ করতে পেরেছে, কারণ তারা এই জ্ঞান অর্জন করেছে, 'চীনের মত আধা-ইউনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী দেশে, শ্রমিক শ্রেণি নিশ্চিতভাবে তার অবস্থা ও জীবনের মানের মৌলিক উন্নতি সাধন করতে পারে না...যদি না নিজেদের নেতৃত্বে বিপ্লবী ফৌজ গঠন করে, সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুচরদের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনতার সমর্থনে বিপ্লবী যুদ্ধ পরিচালনা করে"।

চীনের জনতা এই পথই নিয়েছে এবং মালয়, বর্মা, ভিয়েৎনাম এবং ইন্দোনেশিয়ার মত অন্যান্য উপনিবেশও এই পথই গ্রহণ করেছে। ঔপনিবেশিক জনতার বিপ্লবী সংগ্রামের প্রকৃতির ফলেই উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলি এই পথ গ্রহণ করেছে।

কমরেড ষ্ট্যালিন অপূর্ব স্পষ্টতার সাথে এই বিপ্লবের চরিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। চীনের বিপ্লবের প্রকৃতির প্রশ্নে সাধারণ সূত্র হিসাবে ১৯২৭ সালের মে মাসে কমরেড ষ্ট্যালিন বলেছেন ঃ—

"বর্তমানের চীন বিপ্লব, বিপ্লবী আন্দোলনের দুইটি ধারার মিলন—সামন্ত অবশেষের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন। চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হচ্ছে সামন্ত অবশেষের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাথে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মিলন"। (ষ্ট্যালিন, চীনের বিপ্লব ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্তব্য)

কমরেড মাও-সে-তুং যে নির্ভুল নীতি চালাচ্ছিলেন তার বিরুদ্ধে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ভিতর "বামপন্থী" সুবিধাবাদ দেখা দেয়। ইহা চীন বিপ্লবের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চরিত্র অস্বীকার করে। 'ট্রটস্কিবাদীরা ঠিক এই নীতিরই বিরুদ্ধাচরণ করছিল। তারা ভেবেছিল বিদেশের সাথে চীনের সম্বন্ধ হচ্ছে কেবলমাত্র শুল্কের সম্বন্ধ। এইভাবে তারা চীনের বিপ্লবের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রকৃতিই বাদ দিয়েছিল"। (চেন-পো-তা, ষ্ট্যালিন ও চীন বিপ্লব)

চীনের ট্রটস্কিপন্থীদের "বামপন্থী" সুবিধাবাদ চীন বিপ্লবের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রকৃতিই অস্বীকার করেছে এবং মনে করেছে চিয়াংকাইশেকের নেতৃত্বে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা ক্ষমতা দখলের পর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শেষ হয়েছে, কামালের নেতৃত্বে তুরস্কের ধরনের বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে। ট্রটস্কিবাদীদের জবাবে ষ্ট্যালিন বলেছেন ঃ

'চীনে, সাম্রাজ্যবাদকে জাতীয় চীনের জীবন্ত দেহ ভেঙে ফেলতে হবে, টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতে হবে, গোটা প্রদেশ কেড়ে নিয়ে নিজেদের পুরানো অবস্থা বা অন্তত তার খানিকটা বজায় রাখতে হবে।"

"সুতরাং যদিও তুরস্কে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কামালবাদীদের অসম্পন্ন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে পরিণতি লাভ করতে পারে, চীনে এ সংগ্রাম নিশ্চিত গণ-চরিত্র ও স্পষ্ট জাতীয় চরিত্র গ্রহণ করবেই এবং ধাপে ধাপে প্রসারিত হবে। শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জীবনমরণ সংগ্রামে পরিণত হবে, তাতে দুনিয়াব্যাপী সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিটাই নড়ে উঠবে।" (ষ্ট্যালিন, সুন-ইয়াৎ-সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে আলোচনা)

ভারতের জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের সমস্যা বুঝবার পক্ষে চীন সমস্যায় কমরেড ষ্ট্যালিনের এই সূত্রগুলি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও তার নেতা কমরেড মাও-সে-তুং'এর নেতৃত্বে চীনের জনতা বিজয়ের সাথে যে পথ অতিক্রম করেছে, ভারতের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামকেও সেই পথ গ্রহণ করতে হবে। ভারত উপনিবেশ ও আধা-সামন্ত দেশ। ভারতের বিপ্লবের প্রকৃতিও চীনের মতই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্ত-বিরোধী। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ত-বিরোধী চরিত্র অস্বীকার করার ফলে, মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদ চাপানোর পর শ্রেণি সম্পর্ক এমনভাবে উপস্থিত করা হয়েছে যাতে মনে হয় যেন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লব সম্পন্ন হয়ে গেছে, তারই ফলে, ভারতের সমস্যায় বামপন্থী সংকীর্ণতার বিচ্যুতি এসেছে।

তিন

ভারত বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বারা শাসিত ঔপনিবেশিক দেশ। শ্রমিক শ্রেণির সংখ্যার দিক থেকে উপনিবেশের ভিতর ভারত অন্যতম প্রধান স্থান অধিকার করলেও, ভারতের শিল্প খাঁটি ঔপনিবেশিক চরিত্রের। ভারতের শিল্প সম্পূর্ণ বৃটিশ পুঁজির উপর নির্ভরশীল এবং ভারতীয় পুঁজির অধিকাংশই বৃটিশ। ভারতীয় শিল্পের কয়েকটি শাখার বিকাশ হলেও, ভারতে শিল্প বিকাশের সাধারণ স্তর আজও খুবই নিম্ন ধরনের। ভারতের অর্থনীতির ঔপনিবেশিক অনগ্রসরতা পরিষ্কার দেখা যাবে এই ঘটনাতে যে, ভারতের সমগ্র উৎপাদনের মোট মূল্যের শতকরা ২০ ভাগ মাত্র শিল্পজাত দ্রব্য। আর, গোটা দুনিয়ার প্রায় ছ'ভাগের এক ভাগ লোক ভারতে বাস করে বটে কিন্তু ধনবাদী দেশগুলির শিল্পের উৎপাদনের শতকরা দু'ভাগেরও কম হচ্ছে ভারতের শিল্পোৎপাদন। ভারী শিল্প, সর্বোপরি গলিত ধাতু শিল্প আজও প্রায় নগণ্য। যন্ত্র তৈরি শিল্পই হচ্ছে প্রকৃত শিল্পোন্নতির ভিত্তি ও একটা দেশের আর্থিক স্বাধীনতার গোড়ার কথা। সেই যন্ত্র তৈরি শিল্পই ভারতে প্রায় নাই বললেই চলে।

ভারতের অর্থনীতি মূলত কৃষি অর্থনীতি। ভারতের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকই কৃষিতে নিযুক্ত। গত আদমসুমারীর (১৯৪১) হিসাব অনুযায়ী ৩৯ কোটি ৩৩ লাখ লোক অর্থাৎ দেশের সমগ্র লোকসংখ্যায় শতকরা ৮৭ জনেরও বেশি গ্রামে বাস করে।

মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদ চাপানোর পরও ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান অর্থনীতিক, রাজনীতিক ও সামরিক দিক থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীন। বৃটিশ পুঁজি রয়ে গেছে এবং ভারত ও পাকিস্তানের অর্থনীতিতে ইহার প্রাধান্য বাড়িয়েই চলেছে। তার ওপর, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মার্কিন পুঁজি আরও সক্রিয়ভাবে ভারতের অর্থনীতিতে প্রবেশ করছে। এবং মার্কিন একচেটিয়া পুঁজি ভারতে তাদের অবস্থা সব রকমে পাকা করবার চেষ্টা করছে।

বৃটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ভিতর দুনিয়ার সর্বাংশে অন্তর্দ্বন্দ্ব বেড়ে চলা সত্ত্বেও, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতই, ভারতে তারা সাম্রাজ্যবাদী শাসন শক্তিশালী

করবার সমস্বার্থ অনুসরণ করছে। সর্বতোভাবে ভারতে শিল্প বিকাশের পথ রোধ করছে। এই সব দেশকে ঔপনিবেশিক লেজুড় করে রাখছে, সাম্রাজ্যবাদী শিল্পের জন্য কৃষিজাত কাঁচামাল সরবরাহের কেন্দ্র ও তাদের শিল্পজাত মালের বাজার করে রাখছে।

বিদেশী পুঁজির লেজুড় হিসাবেই ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়ারা গড়ে উঠেছে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা এদের গদীতে বসিয়েছে তাদের স্বার্থের জিম্মাদার হিসাবে। জনতার আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাহায্য চায়। তাদের শ্রেণি স্বার্থের জন্যই তারা জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। নেহরু-প্যাটেল সরকার জাতি-বিরোধী বৃহৎ বুর্জোয়া ও সামন্ত শ্রেণিদের প্রতিনিধি তারা ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের দাসানুদাস।

তাই, মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদের পরও ভারতীয় বিপ্লবের চরিত্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও জাতীয় মুক্তিবাদীই আছে।

পি-বি কর্তৃক গৃহীত কর্মনীতি ও কৌশলের উপর রিপোর্টে, চীন সমস্যায় ট্রটস্কিপন্থীদের মতই, ভারতীয় বিপ্লবে, মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদের পর, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ত-বিরোধী চরিত্র ও ভারতের অর্থনীতির ঔপনিবেশিক চরিত্র অস্বীকার করা হয়েছে।

কর্মনীতি ও কৌশলের রিপোর্টে বলা হয়েছে,

"শিল্পের ব্যাপারে গভর্নমেন্ট তার মুখোশ খুলে ফেলেছে এবং পরিষ্কার ধনবাদী সরকার হিসাবে এগিয়ে এসেছে। জাতীয়করণের নীতি তারা পরিত্যাগ করেছে, ধনবাদী ব্যবস্থা রক্ষার নিশ্চয়তা তারা দিয়েছে।"

সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব যে আছে, ভারতীয় শিল্পের যে উপনিবেশিক চরিত্র, নেহেরু- প্যাটেল সরকার যে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের স্বার্থ রক্ষা করছে, সে সব সূত্রই এতে প্রকাশ্যে অস্বীকার করা হয়েছে।

নীচের কথাগুলিতে এ কথার আরও প্রমাণ পাওয়া যাবে ঃ

"আমরা দেখেছি, আভ্যন্তরীন নীতিতে গভর্নমেন্ট পুঁজিবাদীদের স্বার্থে, বর্তমানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা রক্ষার জন্য সন্ত্রাসনের সাহায্যে শাসন করতে চেষ্টা করছে।"

ঔপনিবেশিক দাসত্ব যে আছে, 'সন্ত্রাসনী শাসন' যে সাম্রাজ্যবাদী দমন-নীতিরই অব্যাহত ও আরও তীব্র অবস্থা, দেশীয় বৃহৎ বুর্জোয়া মারফৎ তা চালানো হচ্ছে, এই সব ঘটনাই উহাতে অস্বীকার করা হয়েছে।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে ঃ

"বুর্জোয়া শ্রেণি ও তাদের সরকার শুধু যে আপসকারী ও সহযোগী হিসাবে দাঁড়িয়েছে তাই নয়; তারা দাঁড়িয়েছে প্রতি-বিপ্লবী শক্তিগুলির পুরোধা হিসাবে, ইহারাই হচ্ছে প্রধান শক্তি, কেবল ইহারাই নিজেদের গণ-প্রভাব থাকার জন্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থা রক্ষা করতে পারে, জনতার ভিতর বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে এবং সন্ত্রাস গড়ে তুলতে পারে। কি সাম্রাজ্যবাদ, কী সামন্তবাদ, আর কোন শ্রেণিই তা পারে না। বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জন্য, সাময়িকভাবে হলেও, অন্য কোন শ্রেণিই ব্যাপক সামাজিক সমর্থন সংগ্রহ করতে পারে না। এমন সন্ত্রাসন চালাবে এবং তবু কিছু দিনের জন্য অস্তিত্ব বজায় রাখবে ও শাসন চালাবে, তা আর কোউ পারে না।"

এই বামপন্থী সংকীর্ণতার সূত্রের গোড়ার কথা হচ্ছে—সাম্রাজ্যবাদকে ছোট করে দেখা

এবং দেশীয় বৃহৎ বুর্জোয়াদের বড় করে দেখা। ভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়াদের এতে শুধু স্বাধীনতাই দেয়া হয় নাই, নেতৃত্বের ভূমিকাও দেয়া হয়েছে এবং ব্যাপক সামাজিক ভিত্তি দেয়া হয়েছে। এই প্রতি-বিপ্লবী সূত্রের চরম প্রকাশ হয়েছে নীচের কথাগুলিতে ঃ

"বুর্জোয়া-সামন্ত-সাম্রাজ্যবাদী জোটের ভিতর ভারতীয় বুর্জোয়ারা হচ্ছে সবচেয়ে সংগ্রামশীল, সক্রিয় অংশীদার। জনতার সাথে সম্বন্ধের দিক থেকে তিনের ভিতর ইহারাই সবচেয়ে শক্তিশালী এবং আজ যখন এই জোটের প্রধান আশু কর্তব্য হচ্ছে বিপ্লবের গতিরোধ করা, তখন ভারতের বুর্জোয়ারা এই জোটের নেতৃস্থানীয় মেম্বর হিসাবে এসে দাঁড়িয়েছে।

"সুতরাং বিপ্লবের জন্য লড়াই সোজাসুজি কংগ্রেসী সরকারের শাসনের বিরুদ্ধে ফেটে পড়েছে—এবং যতই সাম্রাজ্যবাদকে গালাগালি দেয়া হোক না কেন এই ঘটনার পরিবর্তন হয় না।

"জনতার চেতনায় এবং বাস্তবে বিপ্লবের জন্য লড়াইয়ের অর্থ হচ্ছে কংগ্রেস সরকারকে উচ্ছেদ করবার লড়াই। তার কারণ কংগ্রেস সরকার ও বুর্জোয়ারা শুধু হাতের পুতুল নয়, আসলে তারা এই জোটের সক্রিয় অংশীদার এবং পরিচালক শক্তি।"

সুতরাং যে কংগ্রেসী সরকার ও ভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদের হাতের পুতুল, সেই কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই, সাম্রাজ্যবাদী উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে লড়াই নয়। অন্যদিকে যুক্তি দেয়া হয়েছে, ভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়ারা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের হাতের পুতুল নয়। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরাই ভারতীয় বুর্জোয়াদের হাতের পুতুল। কুকুর তার লেজ নাড়ছে না, লেজই কুকুরকে নাড়াচ্ছে।

কর্মনীতি ও কৌশলের রিপোর্টে ভারতের বুর্জোয়াদের আপসকারী চেহারাকে এই ভাবেই বোঝা হয়েছে।

সুতরাং প্রকাশ্যেই বলা হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান হয়েছে, দেশীয় বুর্জোয়ারা স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র পেয়েছে, ব্যাপক যুক্ত ফ্রন্টের কোন ভিত্তি নাই কারণ, "বিভক্ত শক্তি নিয়েই বিপ্লব শুরু হয়েছে।" এই পরাজিত সংকীর্ণতামূলক বিশ্লেষণ এই ঘটনা থেকেই এসেছে যে, ঔপনিবেশিক সমস্যা সম্পর্কে ট্রটস্কিবাদী সূত্র উপস্থিত করা হয়েছে, ভারতে কামালী ধরনের বিপ্লব সমাধা হয়েছে। স্বভাবতই যাঁরা এই রিপোর্ট গ্রহণ করেছেন সেই পি-বি, সমস্ত কৃষক সম্প্রদায়কে নিয়ে এবং এমনকি মাঝারী বুর্জোয়াদেরও সহযোগে ব্যাপক যুক্ত ফ্রন্ট গঠনের যে সম্ভাবনা রয়েছে, তা দেখতে পান নাই। ইহা তাঁদের দেখতে না পাবার কারণ তাঁরা শিক্ষা গ্রহণ করেছেন চীন সম্বন্ধে ট্রটস্কিপন্থীদের নীতি থেকে, ষ্ট্যালিনের বিশ্লেষণ থেকে নয়। সুতরাং মাও-সে-তুঙ'কে যে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী বলে নিন্দা করা হয়েছে তা একটা আকস্মিক ঘটনা নয়।

ভারতের অবস্থা সম্পর্কে এই মূলত "বামপন্থী" সুবিধাবাদী বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শ্লোগান দেয়া সম্বন্ধে রিপোর্টে গুরুতর হুঁশিয়ারী দেয়া হয়েছে। রিপোর্টের নবম অধ্যায়ে বলা হয়েছে ঃ

"এই প্রশ্নেও অনেক কমরেডের ভিতর ঝোঁক রয়েছে, ভারতীয় ইউনিয়ন সরকার ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকে যোগ দিয়েছে সে সম্বন্ধে শুধু সাধারণ শ্লোগান আওড়ান, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হুকুমে ভারতে দমননীতি চালানো হচ্ছে এ কথা পুনরাবৃত্তি করা, এই বিবৃতির জন্য তথ্যাবলী

উপস্থিত করার চেষ্টা হচ্ছে না এবং এমনভাবে যুক্তি দেয়া হচ্ছে যেন কংগ্রেসের পেটি-বুর্জোয়া সমর্থক সমেত বেশির ভাগ লোকই ইতিমধ্যে ধরে নিয়েছে যে গভর্নমেন্ট সাম্রাজ্যবাদের সহচর, এরা স্বাধীন নীতি চালাচ্ছে না।"

প্রথম বার পড়লে মনে হয়, যেন লেখকের উদ্দেশ্য গবর্নমেন্টের তাঁবেদারী চেহারা, সাম্রাজ্যবাদের সহচরের রূপ অস্বীকার করা নয়, যেন লেখক পার্টিকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন, তাঁবেদার সরকার, প্রভৃতি কথা 'তথ্যাদি' দিয়ে প্রমাণ না করে বলা উচিৎ নয়। কিন্তু রিপোর্টে আগা গোড়াই জোরের সাথে বলা হয়েছে, নেহরু-প্যাটেল সরকার তাঁবেদার সরকার নয়, সাম্রাজ্যবাদী-বুর্জোয়া-সামন্ত জোটের ভিতরকার পরিচালক শক্তি। তাই নবম অধ্যায়ে যে হুঁশিয়ারী দেয়া হয়েছে, আসলে তা, ভারতের জনতার উপর ইঙ্গ-মার্কিন প্রাধান্য সম্বন্ধে ষ্ট্যালিনবাদী সূত্রের বিরুদ্ধেই হুঁশিয়ারী এবং নিজেদের 'বামপন্থী' সুবিধাবাদী নীতির পক্ষে নির্লজ্জ ওকালতি।

সুতরাং ইহা স্পষ্ট, কর্মনীতি ও কৌশল সম্বন্ধে রিপোর্ট, ভারতের শ্রেণি সম্বন্ধের যে মূল বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা হচ্ছে এই "বামপন্থী" সুবিধাবাদী ভাবধারা যে, মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদের ফলে সাম্রাজ্যবাদ চলে গেছে, ভারতের শিল্পের আর ঔপনিবেশিক চরিত্র নাই। সাম্রাজ্যবাদ যে ভারতকে ঔপনিবেশিক অনগ্রসর কৃষিপ্রধান দেশ করে রাখতে চায়, মার্ক্সবাদী-লেলিনবাদী এই বিশ্লেষণের বিপরীত পাল্টা বিশ্লেষণ রিপোর্টে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, স্বাধীন পুঁজিবাদী বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ নীচের কথাগুলি বিচার করুন ঃ

"মুনাফার নিশ্চয়তা আদায় না করে, মজুরি না কমিয়ে এবং শ্রমিকদের-খাটুনীর বোঝা না বাড়িয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বললে পুঁজিপতিদের মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়। কারণ অদূর ভবিষ্যতের বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের আসন্ন বিভীষিকা তাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে আছে।

"উন্নততর যন্ত্রপাতি আমদানি করে পুঁজিপতিরা পরিত্রানের পথ খুঁজছে। এতে শ্রমিকের সংখ্যা কমানো যাবে, মজুরির খাতের খরচ বাঁচবে এবং মোটা মুনাফা থাকবে।"

ইহা ভারতীয় বুর্জোয়াদের স্বাধীন ভূমিকা আরোপ করবারই সামিল, ভারতকে শিল্পে অনগ্রসর রাখবার জন্য ভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়ারা যে তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদেরই হুকুম তামিল করছে, সে কথা গোপন রাখবার সামিল। গভর্নমেন্ট যে প্রথমত বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির অতি মুনাফা নিশ্চিত করছে, নেহরু সরকারের শ্রম বিরোধী নীতি যে শুধু ভারতীয় পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষাই করে না, প্রধানত সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষা করে, পি-বি'র বিশ্লেষণ এ কথা লুকিয়ে রাখে। পি-বি'র সূত্র ভুল ভাবে দেখিয়েছে, যেন বুর্জোয়াদের ক্ষমতা হস্তান্তর করার পর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে, যেন বুর্জোয়ারা কৃষি বিপ্লব সম্পাদন করেছে এবং পুঁজিবাদী বিকাশের অবস্থা তৈরি হয়েছে।

এই 'বামপন্থী' সুবিধাবাদী ভাবধারার সাথে লেনিন ও ষ্ট্যালিনের শিক্ষার উপর ভিত্তি করা নীচের বিশ্লেষণটি তুলনা করুন ঃ

"১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতকে, ভারত ও পাকিস্তান, এই দুই অংশে বিভক্ত করেছে এবং ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের আকারে মেকী আজাদী দিয়েছে। কিন্তু তার ফলে এই দুই ডোমিনিয়নের ঔপনিবেশিক অর্থনীতিক চরিত্র বদলায় নাই।

"ভারত বিভাগ উভয় ডোমিনিয়নেরই অর্থনৈতিক পরাধীনতা বাড়িয়ে দিয়েছে, তাদের

অর্থনীতিক অবস্থা চূড়ান্ত খারাপ করে দিয়েছে, তাদের উৎপাদন শক্তির অগ্রগতি আরও ব্যাহত করেছে। এই সব মিলে, ভারত ও পাকিস্তানকে বৃটেনের কৃষি ও কাঁচামালের লেজুড় হিসাবে বেঁধে রাখবার জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করেছে।" (বালাবুশেভিচ)

দেশীয় রাজ্যের প্রশ্নে পি-বি'র বামপন্থী সংকীর্ণতার বিচ্যুতি প্রকাশ পেয়েছে এতে সাম্রাজ্যবাদী চালবাজীর প্রকৃত তাৎপর্য দেখতে না পারার ভিতর দিয়ে।

কর্মনীতি ও কৌশলের রিপোর্টে ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়াদের শুধু স্বাধীন ভূমিকাই আরোপ করা হয়নি, সীমাবদ্ধভাবে তাদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং সামন্তবাদ-বিরোধী ভূমিকাও আরোপ করা হয়েছে। হায়দরাবাদের প্রশ্নে রিপোর্টে বলা হয়েছে ঃ

"শুধু নিজাম ও ভারতীয় ইউনিয়নের ভিতরই দ্বন্দ্ব ছিল না, ভারতীয় ইউনিয়ন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিতরও দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু তিনটি দলই দৃঢ় ছিল যেন এই চিত্রের ভিতর জনতা কোথাও না আসে। এই সব আপস আলোচনা পার্টি থিসিসের সূত্র আর একবার প্রমাণিত করলো। থিসিসে বলা হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় ইউনিয়ন সরকারের ভিতরকার দ্বন্দ্বে জনতাকে সংগ্রামের জন্য ডাকা হবে না এবং সমস্যার সমাধান হবে গবর্নমেন্টের স্তরে। এখানেও অবশ্য জনতাকে এড়িয়ে যাওয়া হল, যদিও মনে হল সমস্যাটির আপস আলোচনার ভিতর দিয়ে এবং গভর্নমেন্টের স্তরে দর কষাকষির ভিতর দিয়ে সমাধান হল না, আসলে কিন্তু এইভাবেই সমাধান হল। কারণ, সাম্রাজ্যবাদ আগে যে রফায় মত দিয়েছিল, নিজামের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘর্ষ তাকেই নিশ্চিত করলো শুধু, তার বেশি কিছু নয়।"

ইহার অর্থ নেহরু সরকার হায়দরাবাদে সৈন্য পাঠিয়ে ভারতীয় ইউনিয়ন ও নিজামের দ্বন্দ্ব জনতাকে সংগ্রামে না ডেকে গভর্নমেন্টের স্তরে সমাধান করছিল।

কিন্তু আসল কথা ছিল, যখন নিজামের রাজাকাররা তেলেঙ্গানার সংগ্রামী জনতাকে দমন করতে পারলো না, তখন হায়দরাবাদের ধ্বংসোন্মুখ রাজন্যপ্রথাকে বাঁচাবার জন্য, তেলেঙ্গানাকে দমন করবার জন্য সাম্রাজ্যবাদের হুকুমে নেহরুর ফৌজ হায়দরাবাদে প্রবেশ করলো। বৃহৎ বুর্জোয়ারা যে সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করছে, এই সঠিক সূত্রের বদলে কর্মনীতি ও কৌশলের রিপোর্ট এই সূত্র স্থির করলো। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের ভিতরকার দ্বন্দ্ব 'গভর্নমেন্টের স্তরে' সমাধান হচ্ছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় ইউনিয়ন, দেশীয় রাজ্য এবং পাকিস্তানকে পরস্পরের সাথে সংশ্লিষ্ট স্বাধীন গভর্নমেন্ট এবং তাদের দ্বন্দ্ব গভর্নমেন্টের স্তরে সমাধান করছে বলে মনে করা হয়েছে। যেন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অগ্রগতি চলছে। লেখকের একমাত্র কথা হচ্ছে এই অগ্রগতি জনতাকে বাদ দিয়ে সংস্কারবাদী কায়দায় চলছে।

এই বিষয়টি আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে কর্মনীতি ও কৌশল সম্বন্ধে রিপোর্টের নিম্নলিখিত কথাগুলিতে ঃ

"সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় বুর্জোয়াদের দ্বন্দ্বের গভর্নমেন্টের স্তরে সমাধান হবে, বাস্তব জীবনে, এই সূত্রটি কখনও প্রমাণিত হচ্ছে দেখতে পাই, কখনও সামান্য রদবদল হচ্ছে। যেমন, কাশ্মীরের বেলায়, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় বুর্জোয়াদের ভিতরকার দ্বন্দ্ব যদিও আপসের কাঠামোর ভিতরই লড়া হল, ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে আলোচনা চালানো হল সন্দেহ নাই কিন্তু ইহার অপর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে, কি ভারত, কি পাকিস্তান কোথাও জনতাকে প্রকৃতপক্ষে ডাকা হল না।"

ইহা আসলে এই সত্যের অপলাপ ঃ সাম্রাজ্যবাদই উভয় ডোমিনিয়নের উপর নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য ও সামরিক ঘাঁটি হিসাবে কাশ্মীরকে ব্যবহার করার জন্য ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান সরকারকে পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরকে ব্যবহার করছে। বিপরীত পক্ষে, উপরোক্ত কথাগুলি থেকে মনে হয় যেন ভারত ও পাকিস্তান দুটি স্বাধীন শক্তি, কাশ্মীর দখলের জন্য পরস্পরে রেষারেষি করছে এবং তারপর জনতাকে বাদ দিয়ে গভর্নমেন্টের স্তরে দ্বন্দ্বের সমাধানের জন্য সাম্রাজ্যবাদের কাছে আবেদন করছে।

কর্মনীতি ও কৌশলের রিপোর্টে এই সাংঘাতিক সূত্রটি নির্ণয় করা হয়েছে ঃ

"কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ তার হিসাব থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল বিষয়ই বাদ দিয়েছে—তা হচ্ছে জনতা—যে জনতাকে কেবল বুর্জোয়ারাই ব্যবহার করতে পারে। তাই বাস্তব জীবনে বুর্জোয়ারা মাউন্টব্যাটেন আপসকারী পরিকল্পনার কাঠামোর ভিতর থেকেই কাজ করে কঠিন দর কষাকষিতে লাভ করে, নিজেদের স্বার্থ এগিয়ে নিয়েছে এবং দেশীয় নৃপতিদের সাম্রাজ্য-বাদের মজুত শক্তি নিজেদের পক্ষে টেনে নিয়েছে। যদিও বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য মাউন্টব্যাটেনের তৈরি যোগদানপত্রে সই দিয়েছে, যে পত্রে কেন্দ্রের হাতে শুধু দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র নীতি, প্রভৃতি দেয়া হয়েছে, কিন্তু কংগ্রেস নেতারা শীঘ্রই একদিকে গণ-আন্দোলনের ভীতি ব্যবহার করলো ও অন্যদিকে সামরিক সাহায্য অস্বীকারের ভয় দেখালো। এইভাবে একে একে দেশীয় রাজারা নির্বাচিত আইনসভায় রাজি হল। এই আইনসভায় যদিও ভোটাধিকার গণ্ডীবদ্ধ ছিল, তবু সংখ্যাগরিষ্ঠদের পক্ষে পাবার জন্য এবং রাষ্ট্রের ভিতর থেকে চাপ দিবার জন্য ও বুর্জোয়াদের অনুকূল শর্তে এবং কেন্দ্রের নূতন মর্যাদার সাথে সঙ্গতি রেখে সামন্তদের সাথে সহযোগিতা করার জন্য বুর্জোয়াদের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট ছিল"। (কর্মনীতি ও কৌশল, ৮ পৃঃ সাইক্লো)

ইহা বৃহৎ বুর্জোয়াদের উপর প্রগতিশীল ভূমিকা আরোপ করা ছাড়া আর কিছু নয়, যেন ইহারা দেশীয় রাজ্যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অগ্রগতির কর্তব্য সম্পাদন করছে, যেন বৃহৎ বুর্জোয়ারা সামন্ত নৃপতি প্রথাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাচ্ছে না, তাকে সংস্কার করছে। এতে দেখা যায়, বৃহৎ বুর্জোয়াদের উপর বিশ্বাস থেকেই আমাদের বামপন্থী সংকীর্ণতার উদ্ভব হয়েছে, যেমন হয়েছিল দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদের। উপরোক্ত ভুল ও প্রতিবিপ্লবী সূত্রের সাথে লিওনিডভের সঠিক সূত্রটি তুলনা করুন। 'ভারতের ধনপতিদের বংশাবলী' নামক প্রবন্ধে তিনি লিখছেন ঃ

"নৃপতিদের রাজ্যে গভর্নমেন্ট যে 'সংস্কার' সাধন করছে, তাতে মহারাজাদের টলায়মান অবস্থাকে নূতন করে শক্তি দিয়েছে। মহারাজারা নিজ রাজ্যে ও গোটা প্রদেশে গভর্নর নিযুক্ত হয়েছে।"

(নিউ টাইমস, ৩২ নং, ১৯৪৮)

সুতরাং আমাদের পি-বি'র হিসাবের উল্টোটাই নেহরু-প্যাটেল সরকার করছে। তারা ধ্বংসোন্মুখ নৃপতিতন্ত্রকে শক্তিশালী করছে, তার সংস্কারসাধন করছে না।

কৃষক সমস্যা সম্পর্কে, পি-বি'র বামপন্থী সংকীর্ণতার নীতি এসেছে, ঔপনিবেশিক সামন্ত চরিত্রই যে ভারতীয় কৃষির প্রধান চরিত্র, সে কথা বুঝতে না পারার ফলে।

ভারতের বর্তমান ভূমি সম্পর্কের সার কথা হচ্ছে ঃ

বৃটিশ শাসকরা সামন্ত ও আধা-সামন্ত জমিদারি প্রথার প্রবর্তন করেছিল ভারতে তাদের

প্রভুত্ব পাকা সরবার জন্য, বৃটিশ শিল্পের জন্য ভারতকে কাঁচা মালের যোগানদার ও তৈরি মালের বাজার করে রাখবার জন্য। এরই ফলে বৃটিশ শাসনের দুশো বছরে কৃষককুলকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব করেছে। কৃষির অবনতি ঘটিয়েছে। কৃষিতে শোষণের প্রধান রূপ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী সামন্ত শোষণ। ধনবাদের বিকাশ এখনও অতি নগণ্য। সামন্তবাদী খাজনার পীড়ন ও মহাজনী, সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশকারীদের দাস শ্রম ও কাঁচা মাল যোগানো, ইহাই হচ্ছে এই প্রথার প্রধান বিশেষত্ব। কংগ্রেস সরকার যে কৃষি সংস্কারের প্রস্তাব করছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষি বিপ্লবের হাত থেকে সামন্ত জমিদারি-প্রথাকে বাঁচানো। গণতান্ত্রিক বিপ্লবে কৃষককুলই হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণির সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিত্র। কৃষকরা একমাত্র শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বেই মুক্তিলাভ করতে পারে, যেমন কৃষককুলের সাথে মিতালী করেই শুধু এবং তাদের পরিচালিত করে শ্রমিক শ্রেণি ঔপনিবেশিক বিপ্লবকে বিজয়ে পরিণত করতে পারে। কৃষি বিপ্লবের প্রধান শ্লোগান হচ্ছে, বিনা খেসারতে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ এবং চাষীর হাতে জমি চাই। সামন্ত শোষণ অবসানের জন্য, কৃষি সংস্কার ও জাতীয় মুক্তির জন্য, কৃষি বিপ্লব গড়ে তুলে, গ্রামাঞ্চলে কৃষক জনতাকে সশস্ত্র সংগ্রামে পরিচালিত করে, শ্রমিক শ্রেণি সমগ্র কৃষককুলের সাথে মিতালী সুদৃঢ় করবে।

পি-বি'র কৃষি-সমস্যা সম্পর্কে প্রস্তাবে ও কর্মনীতি ও কৌশলের রিপোর্টে কৃষক সমস্যা সম্পর্কে মৌলিক ভুল বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইহাতে সামন্ত শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে দুর্বল করা হয়েছে এবং কৃষি বিপ্লবকে শ্রমিক বিপ্লবের সাথে প্রায় এক করে দেখা হয়েছে। ভারতের কৃষিতে আধা-সামন্ত শোষণই যে প্রধান, ধনবাদ প্রবেশ করা সত্ত্বেও ভূমি সম্পর্ক যে প্রধানতঃ আধা-সামন্ত সম্পর্ক, ইহাতে তাহাই দেখা হয় নাই। কৃষি সমস্যা সম্পর্কে পি-বি'র প্রস্তাবে বলা হয়েছে ঃ

"উপসংহারে বলা যায়, ধনবাদী সম্বন্ধ গড়ে ওঠা সত্ত্বেও সামন্ত-প্রথা মরে নাই। কিন্তু সামন্ত-প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম গ্রামাঞ্চলে নূতন ধনবাদী শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাথে যুক্ত হয়েছে। একটা বাদ দিয়ে অন্যটা চালাবার চেষ্টা করলে শ্রেণি সহযোগিতার অপরাধে অপরাধী হতে হবে এবং কৃষি বিপ্লবের সংগ্রামে বিভেদ সৃষ্টি করা হবে। এই সংগ্রাম জমির জন্য সংগ্রামের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ছে, কারণ, কি জমিদারি, কি রায়তয়ারী এলাকায় আজ জমির জন্য সংগ্রাম, জমিদার ও ধনী কৃষকদের জমির উপর একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধেই পরিচালিত। নূতন ও পুরাতন একচেটিয়া অধিপতিদের জমির একচেটিয়া অধিকারকে আক্রমণ না করে জনতার জমির ক্ষুধা মিটানো যাবে না। চাষীর হাতে জমি চাই, কৃষি বিপ্লবের এই শ্লোগান উভয়ের বিরুদ্ধেই পরিচালিত।"

এই অ-মার্ক্সীয় ও মৌলিক ভুল বিশ্লেষণ থেকেই সমাজবাদী বিপ্লবের কর্মনীতি উপস্থিত করা হয়েছে। যেমন, ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকের উপর দৃঢ় নির্ভরতা, জমিদার ও ধনী কৃষকদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং আসলে মাঝারী কৃষকদের নিরপেক্ষ করা। যেভাবে মাঝারী কৃষকদের দোলায়মান ভূমিকা উপস্থিত করা হয়েছে, মাঝারী কৃষকদের "জয় করবার" কথা বলা হয়েছে, আসলে তা দাঁড়ায়, মাঝারী কৃষকদের নিরপেক্ষ করা।

এই কর্মনীতি হচ্ছে, শ্রমিক শ্রেণির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিত্র, সমগ্র কৃষককুল থেকে শ্রমিক শ্রেণিকে বঞ্চিত করা। দেশের সর্বাংশে যখন কৃষি বিপ্লব ফেটে পড়ছে, তখন কৃষি বিপ্লবে ভেদ সৃষ্টি করা। গ্রামাঞ্চলে যখন সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে উঠছে তখন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয়

মুক্তি সংগ্রামের অবসান করা। কংগ্রেস সরকার যখন কোন রকমের কৃষি-সংস্কার করতে অপরাগ ও অনিচ্ছুক বলে প্রকাশ পাচ্ছে এবং জমিদারি-প্রথা উচ্ছেদ-করবে বলে কংগ্রেস যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তাতে বিশ্বাসঘাতকতা করছে বলে প্রমাণিত হচ্ছে তখন কৃষকদের অংশবিশেষকে বুর্জোয়া সংস্কারবাদীদের খপ্পরে ফেলা।

পি-বি এই ভ্রান্ত ও ভেদমূলক নীতি দেবার ফলে, দেশব্যাপী ক্রমবর্দ্ধমান কৃষক আন্দোলনের অগ্রগতির পিছনেই যে শুধু পার্টি পড়ে আছে, তাই নয়, কৃষি বিপ্লবের গতিরোধ করা এবং এমনকি কোন কোন স্থানে ইহাতে ভেদ সৃষ্টি করার জন্য পর্যন্ত দায়ি।

কৃষক সমস্যায় নিজেদের বামপন্থী সংকীর্ণতার নীতির যৌক্তিকতা দেখিয়ে পি-বি কৃষক সমস্যার প্রস্তাবে এই থিসিস উপস্থিত করেছেন ঃ

"এই সংস্কারবাদের নীতিগত সূত্র কি যা যুদ্ধের আগে ছিল এবং এখনও চলেছে? সেটা হচ্ছে এই ফরমুলা, সমালোচনামূলক মনোভাব রহিত ফরমুলা,—জমিতে সামন্তবাদের বিরুদ্ধেই শুধু কৃষি সংগ্রাম (জাতীয় সংগ্রাম শুধু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, এই সূত্রেরই আর এক অংশ)। ইহার ফলে গ্রামাঞ্চলে পরিবর্তনমূলক শ্রেণি সম্পর্কের বাস্তবতা বুঝিতে দেয় নাই, এবং তাই ধনী শোষকের সাথে সহযোগিতামূলক কৌশলের পক্ষে ওকালতি করা হয়েছে এবং কৃষক ঐক্যের কথা বলা হয়েছে, যেখানে শোষিত অংশ, প্রকৃত চালক শক্তি। ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষককেই তাহাদের নেতৃত্বের ভূমিকা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।"

এই কথাগুলির ভিতর দিয়ে কি বলতে চেষ্টা করা হয়েছে? ভারতের কৃষি ধনবাদী চরিত্রই প্রধান চরিত্র, সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমগ্র কৃষককুলের ঐক্য মিথ্যা মরীচিকা, এই কাল্পনিক অবস্থা বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে। স্পষ্টই দেখা যায়, পুঁজিবাদের ভুল ধারণা থেকেই থিসিস শুরু হয়েছে। ইহাতে শুধু পণোৎপাদনকেই পুঁজিবাদের সাথে এক করে দেখা হয়েছে। খাদ্যশস্য ছাড়া, ভারতের কৃষিজাত পণ্য বেশির ভাগই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের জন্য কাঁচা মাল। এই ঘটনার ফলেই ভারতের কৃষি ঔপনিবেশিক অধীনতায় প্রধানত আধা-সামন্ত অর্থনীতিক চরিত্র লাভ করেছে, ধনবাদী কৃষির রূপ পায় নাই। থিসিস এ কথা বুঝতে পারে নাই। ধনবাদী উৎপাদনের সার কথা হচ্ছে বাড়তি মূল্য উৎপাদন, মজুরি খাটা শ্রমের শোষণ। ভারতের কৃষিতে ইহার স্থান খুবই নগণ্য। স্পষ্টত, পি-বি প্রস্তাবে, সাম্রাজ্যবাদের শোষণ, মহাজন, সামন্ত জমিদার ও বণিক মধ্য ব্যক্তিদের শোষণ, এই সমস্ত রকমের শোষণকে পুঁজিবাদী শোষণ বলে মনে করা হয়েছে। ইহা পুঁজিবাদের অ-মার্ক্সীয় ধারনা। ইহাতে সব রকমের শোষণকেই পুঁজিবাদী শোষণ বলে মনে করা হয়েছে। ইহাতে মার্কসের সবচেয়ে মূল সূত্রটিকেই অস্বীকার করা হয়েছে। সে সূত্র হচ্ছে, বাড়তি মূল্য নিংড়ে নেওয়াই হচ্ছে পুঁজিবাদী শোষণ, পণ্যোৎপাদন মাত্রই পুঁজিবাদ নয়, এমন প্রথাও আছে, যা প্রাক-পুঁজিবাদী পণোৎপাদন প্রথা।

ভারতের কৃষিতে সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক শোষণ কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশ করছে না, বরং ইহাতে বাধাই দিচ্ছে এবং সামন্ত ও আধা-সামন্ত শোষণকে শক্তিশালী করছে। কংগ্রেস সরকারের তথাকথিত জমিদারি উচ্ছেদ বিলগুলি যদি কার্যকরী করাও হয়, তাতে কৃষিতে পুঁজিবাদী-বিকাশের পথ পরিষ্কার করবে না, বরং অপর পক্ষে আধা-সামন্ত শোষণ ব্যবস্থাকেই পাকা করবে। পি-বি'র কৃষি সমস্যার প্রস্তাবে এই সত্যটিই অস্বীকার করা হয়েছে।

পি-বি যে ভূমি সম্বন্ধ সম্পর্কে ভুল বিশ্লেষণ করেছে, অন্য বিষয়ের সাথে তার মূলে

আছে, ভারতের ক্ষেত-মজুরের প্রকৃতি সম্বন্ধে ভুল ধারণা। নিঃস্ব জমিহীন কৃষককে পাশ্চাত্যের কৃষি-মজুরের সাথে এক করে দেখা হয়েছে। এই বিষয়ে কমরেড বালাবুশেভিচের নিম্নলিখিত বিশ্লেষণ খুবই শিক্ষণীয় ঃ

"ক্ষেত-মজুরের বিরাট বাহিনী স্পষ্ট দেখিয়ে দেয় জনসংখ্যার তুলনায় ভারতের কৃষিতে লোক অনেক বেশি। অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশের কৃষি-মজুরের সাথে ভারতের ক্ষেত-মজুরের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ধনী কৃষক ও জমিদারের খামারে মজুররা কাজ করে (সাধারণত দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে এবং বছরে অনধিক ৩/৪ মাসের জন্য); তারই পাশাপাশি রয়েছে বিরাট ক্ষেত-মজুর জনতা, যারা গোলামীর শিকলে আবদ্ধ; সেই তথাকথিত কৃষি, চাকর-বাকর, কর্জা-গোলাম, এবং সামন্ত শোষণে নিষ্পেষিত গ্রাম্য জনতার বিত্তহীন স্তরের ভিতরকার অন্যান্য অংশ। এই পর্যায়ের ভিতরেই রয়েছে গরীব ও সর্বহারায় পরিণত গ্রাম্য কারিগর (কুমোর, কামার, চামার প্রভৃতি)। যে সব ক্ষুদ্র মালিক ও ক্ষুদ্র প্রজা অতি ক্ষুদ্র টুকরো জমি নিয়ে কাজ করে, তাদের অবস্থা ক্ষেত মজুরের অবস্থার সাথে খুব কমই তফাৎ। ইহা খুবই স্পষ্ট, কেবলমাত্র সামাজিক সম্বন্ধের মৌলিক পরিবর্তনই, একমাত্র কৃষি বিপ্লবই, সামন্ত অবশেষের উচ্ছেদ করতে পারে এবং ভারতের কৃষককুলের ও ক্ষেত-মজুরদের অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারে।"

এই অবস্থায়, "যে কৃষি বিপ্লব গড়ে উঠছে, তাতে ক্ষেত-মজুররা খুবই গুরুত্বপূর্ণ শক্তি না হয়ে পারে না। তারা দেশের অনেক জেলার কৃষক আন্দোলনে খুবই বড় ভূমিকা গ্রহণ করছে"। বালাবুশেভিচ কৃষক আন্দোলনের প্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিকভাবেই বলেছেন,

"ভারতে যুদ্ধের পরবর্তীকালের কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠছে শ্রমিক শ্রেণির সাথে কৃষককুলের মৈত্রী সুদৃঢ় করবার শ্লোগান নিয়ে। শ্রমিক শ্রেণি ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে যে সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন অগ্রসর হচ্ছে ইহা তার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।"

ভারতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা সম্বন্ধে প্রশ্নে, পি-বি অ-মার্ক্সীয়, অবাস্তব ও বামপন্থী সংকীর্ণতার সূত্র গ্রহণ করেছে। তাতে গোটা ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণিকে প্রতিবিপ্লবের পুরোধা, সহযোগী ও সাম্রাজ্যবাদ বুর্জোয়া-সামন্ত জোটের নেতা হিসাবে দেখা হয়েছে। ইহা করবার কারণ, পি-বি দেখতে পায় নাই, ভারতীয় অর্থনীতির উপর সাম্রাজ্যবাদী প্রাধান্য রয়েছে, ভারতের শিল্প ঔপনিবেশিক চরিত্রের ও মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবারের একচেটিয়া অধিকারে।

টাটা, বিড়লা, ডালমিয়া, সিংহানিয়া, গোয়েঙ্কা, বালচাঁদ, হিরাচাঁদ এবং অপর কয়েকজন—এই কয়েকটি বৃহৎ পরিবার সব সময়ই বৃটিশ পুঁজির সাব-এজেন্ট ছিলো, তাদের শিল্প কারবার বিদেশী পুঁজির সাথে বহুসূত্রে জড়িত। প্রভূত অর্থসম্পদ তারা নিয়ন্ত্রণ করে। তারা কংগ্রেস সংগঠন নিয়ন্ত্রণ করে ও নেহরু-প্যাটেল মারফৎ কংগ্রেসের নীতি পরিচালিত করে। তারা জাতি-বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদী দালাল। ইহারাই হচ্ছে বৃহৎ বুর্জোয়া। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সাথে একযোগে তারা এই দেশের মাঝারী বুর্জোয়াদের স্বার্থ ও অগ্রগতির পথ রোধ করে। ভারতীয় নৃপতিদের সামন্ত পরিবারের সাথে এই ধনিক গোষ্ঠীর আর্থিক যোগ রয়েছে।

বৃটিশ একচেটিয়া পুঁজির সাথে ভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়া কারবারের মিলন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। ভারতে ৪টি সবচেয়ে পুরোনো ও সবচেয়ে বড় বৃটিশ ঔপনিবেশিক কারবারের,

যারা বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর উত্তরাধিকারী, তাদের তিনটি কারবার; গিলান্ডার্স আরবুথনেট এন্ড কোং, বার্ড এন্ড কোং এবং মার্টিন ও বার্নস, ভারতে সরাসরি ২০০ কোম্পানী নিয়ন্ত্রণ করে; তারা ইতিমধ্যেই তাদের শেয়ারের অংশ ভারতীয় অংশীদারদের হস্তান্তরিত করেছে। বেশির ভাগ শেয়ারই বৃটিশের হাতে আছে। সমস্ত কৌশলপূর্ণ শিল্প তারাই নিয়ন্ত্রণ করে।

ভারতের নুতন একচেটিয়া পুঁজি, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস যার প্রতিনিধি, আসলে তা হচ্ছে প্রধানত ইঙ্গ-ভারত পুঁজি। অনেকগুলি ভারতীয় ফার্ম মার্কিন ট্রাস্টগুলির সাথেও চুক্তি করেছে। যেমন লিওনিডভ নিউ টাইমস পত্রিকায় (১৯৪৮ সালের ৩২ নং) দেখিয়েছেন, নিউইয়র্কের ন্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্কের সাথে বিড়লা ব্যাঙ্কের সরাসরি যোগ রয়েছে। এই নিউইয়র্ক ব্যাঙ্ক টাটার নূতন বিমান ট্রাস্টের আর্থিক এজেন্ট হচ্ছে। ভারতীয় ধনপতিরা মার্কিন একচেটিয়া পুঁজির সাথে আরও যোগাযোগের পথে চলেছে। প্যাটেল ও নেহরুর চারপাশে সমাবিষ্ট এই সব ধনপতিদের লুব্ধ দৃষ্টি পড়েছে অন্যান্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির দিকে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির শোষণে তারা বৃটিশ ও মার্কিন পুঁজির প্রধান এজেন্ট হবার আশা পোষণ করে।

এই সব বৃহৎ বুর্জোয়াদের আকাঙ্ক্ষাই কংগ্রেস নেতারা কাজে পরিণত করছে। এই বৃহৎ বুর্জোয়ারা যে কোন উপায়ে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন দমন করতে চায়। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতে 'ঔপনিবেশিক-সামন্ত-ধনবাদী' রাজত্ব পাকা ও শক্তিশালী করা।

১৯২৫ সালেই কমরেড ষ্ট্যালিন দেখিয়েছেন, ভারতের জাতীয় বুর্জোয়ারা, বিপ্লবী পার্টি ও আপসকারী পার্টিতে বিভক্ত হয়েছে। এবং এই বুর্জোয়াদের আপসকারী অংশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে ইতিমধ্যেই চুক্তিতে এসেছে। এই প্রসঙ্গে কমরেড ষ্ট্যালিন জোর দিয়েছেন যে ভারতীয় বুর্জোয়াদের আপসকারী অংশ নিজ দেশের শ্রমিক ও কৃষকের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের সাথে এক ব্লকে যোগ দিয়েছে। "এই ব্লক চূর্ণ না করা পর্যন্ত বিপ্লবে জয়লাভ সম্পন্ন হতে পারে না। কিন্তু এই ব্লক ভাঙ্গতে হলে আপসকারী জাতীয় বুর্জোয়াদের উপর আগুন কেন্দ্রীভূত করতে হবে; ইহার বিশ্বাসঘাতকতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে হবে, ইহার প্রভাব থেকে মেহনতী জনতাকে মুক্ত করতে হবে এবং শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বের উপযোগী অবস্থা নিয়মিতভাবে গড়ে তুলতে হবে। অন্য কথায়, ভারতের মত উপনিবেশগুলিতে, শ্রমিক শ্রেণিকে মুক্তি-আন্দোলনের নেতৃত্বের ভূমিকার জন্য তৈরি করার প্রশ্ন এবং এই সম্মানজনক স্থান থেকে বুর্জোয়া ও তার মুখপাত্রদের ধাপে ধাপে হটিয়ে দেবার প্রশ্ন। কর্তব্য হচ্ছে একটি বিপ্লবী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ব্লক তৈরি করা এবং এই ব্লকে শ্রমিক নেতৃত্ব সুনিশ্চিত করা।"

(ষ্ট্যালিন, জাতীয় ও ঔপনিবেশিক সমস্যা)

ভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়া অর্থাৎ যে বৃহৎ বুর্জোয়াদের (টাটা-বিড়লা-ডালমিয়া, প্রভৃতি) প্রতিনিধি হচ্ছে কংগ্রেস নেতৃত্ব, তারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই সাম্রাজ্যবাদের সাথে চুক্তিতে এসেছে। সাম্রাজ্যবাদের যেটুকু বিরুদ্ধাচরণও তারা করতো, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে সেটুকুও ত্যাগ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী শাসনের জিম্মাদার হয়েছে। ক্রমবর্দ্ধমান বিপ্লবী শক্তিতে সন্ত্রস্ত হয়েই তারা এ কাজ করেছে। তাদের সংকীর্ণ শ্রেণিস্বার্থ সাম্রাজ্যবাদের কাছে প্রকাশ্য আত্মসমর্পণ দাবি করেছে।

কিন্তু, যেমন কমরেড বালাবুশেভিচ ৮ নং প্রবলেমস অফ ইকনমিকস-এ সঠিকভাবেই বলেছেন,

"প্রতিক্রিয়া ও সাম্রাজ্যবাদের শিবিরে ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়ারা চূড়ান্তভাবে চলে গেলেও, জাতীয় বুর্জোয়াদের আলাদা আলাদা দল, কখন কখন, কোন কোন সময়ে, সাম্রাজ্যবাদ ও তার মিত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে গণতান্ত্রিক শক্তির সাথে এখনও সহযাত্রী হবার সম্ভাবনা দূর হয়ে যায় না। প্রথমত, ইহারা হচ্ছে বুর্জোয়া শ্রেণির সেই অংশ, দেশের মধ্যে বেশি করে বিদেশী পুঁজি প্রবেশ করার ফলে বিশেষ করে যাদের স্বার্থ হানি ঘটছে। ভারতের যে জাতীয় অঞ্চলগুলি বিকাশের দিক থেকেও অধিকতর অনগ্রসর সেই অঞ্চলের উদীয়মান বুর্জোয়ারাও এর ভিতর রয়েছে। আগেই যেসব একচেটিয়া পুঁজি দল গড়ে উঠেছে তাদের প্রাধান্যে এই সব বুর্জোয়ারা অসন্তুষ্ট। সেই সাথে মনে রাখা দরকার, পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের বর্তমান চূড়ান্ত তীব্র অবস্থায়, যখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আলাদাভাবে প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশে শ্রেণি শক্তির চরম বিভাগ বিশেষ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে, তখন ভারতীয় বুর্জোয়াদের এই বিরোধী স্তরকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শিবিরের নির্ভরযোগ্য বা স্থায়ী সভ্য মনে করা চলবে না।"

বুর্জোয়াদের কোন অংশ বা পেটিবুর্জোয়া, কেহই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নেতা হতে পারে না। মাঝারি বুর্জোয়াদের গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের দোলায়মান মিত্র বলে মনে করতে হবে। শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে, শ্রমিক শ্রেণি, সমগ্র কৃষক সম্প্রদায় এবং পেটিবুর্জোয়ারা সুদৃঢ়ভাবে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করবে। প্রধান লড়াই পরিচালিত হবে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও দেশীয় বৃহৎ বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে।

পি-বি'র প্রস্তাব শ্রেণি সম্পর্কের এইরূপ নির্ভুল বিশ্লেষণ করতে পারে নাই, যে অন্ধ্র পি-সি'র দলিল এই সব প্রশ্নে সাধারণত নির্ভুল সূত্র গ্রহণ করেছিল তাকে বাতিল করেছে এবং বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদী কর্মনীতি উপস্থিত করেছে। কারণ পি-বি মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদের তাৎপর্য সঠিকভাবে বুঝতে পারেন নাই, ক্ষমতা হস্তান্তরের আড়ালে সাম্রাজ্যবাদের প্রভুত্ব যে থাকছে এবং দেশভাগের ভিতর দিয়ে ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তানে যে সাম্রাজ্যবাদের নিজের ক্ষমতা শক্তিশালী করছে, পি-বি তা বুঝতে পারেন নাই।

পি-বি'র সমস্ত প্রধান সিদ্ধান্তগুলিতেই আগাগোড়া একটি সূত্র রয়েছে ঃ সাম্রাজ্যবাদ পিছু হটেছে, জাতীয় বুর্জোয়ারা জাতীয় রাষ্ট্র পেয়েছে এবং ভারতীয় অর্থনীতির ঔপনিবেশিক চরিত্র যথেষ্ট পরিমাণে কমে গেছে। অন্য কথায়, মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদ অগ্রগতির পরিচায়ক।

ইহা তাৎপর্যপূর্ণ যে, পার্টির ভিতরে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ ও 'বামপন্থী' সুবিধাবাদ একই মূল থেকে এসেছে। তা হচ্ছে এই ভুল ধারণা ভারতীয় বুর্জোয়ারা ভারতকে আগেই জাতীয় স্বাধীনতার পথে একধাপ এগিয়ে নিয়েছে। যথেষ্ট পরিমাণে ঔপনিবেশিকতার অবসান (ডিকলোনাইজেশন) হয়েছে। দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদ ও বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদ, উভয়ের মূল একই, নূতন অবস্থার সাম্রাজ্যবাদী প্রাধান্যের অস্তিত্বকে অন্ধের মত না দেখা।

পার্টির ভিতরে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ এসেছে বুর্জোয়াদের তথাকথিত বিপ্লবী ভূমিকার উপর বিশ্বাস থেকে। বর্তমান সময়ে ইহার মূল হচ্ছে, মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদের তাৎপর্য সম্বন্ধে ভুল ধারণা, ক্ষমতা হস্তান্তরের পিছনে সাম্রাজ্যবাদকে না দেখা।

পুরানো সি-সি ১৯৪৭ সালের জুন মাসে মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদ সম্পর্কে যে প্রস্তাব

গ্রহণ করেন, তাতে এই সূত্রটি ছিল ঃ

"কমিউনিস্ট পার্টির অভিমত হচ্ছে, জাতীয় অগ্রগতির পক্ষে নূতন সুযোগ লাভ করা গেছে। জনপ্রিয় সরকার ও রাষ্ট্রগঠন পরিষদ, এই দুটি হচ্ছে জাতীয় নেতৃত্বের হাতে কৌশলপূর্ণ হাতিয়ার। জাতীয় আন্দোলনের কর্তব্য, এগুলি যাতে জাতীয় আদর্শ দ্রুত কাজে পরিণত করার জন্য ব্যবহার করা হয়, সে বিষয়ে সুনিশ্চিত করা।"

এই দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী সিদ্ধান্ত অস্বীকার করে যে, বৃহৎ বুর্জোয়ারা চূড়ান্তভাবে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে চলে গিয়েছে, মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদ দেশভাগের মধ্য দিয়ে নূতন কৌশলপূর্ণ হাতিয়ার সৃষ্টি করেছে, জাতীয় মুক্তির জন্য নয়, ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য।

এই প্রস্তাবের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে মাসলেনিকভ (মস্কোতে প্রকাশিত প্রবলেমস অফ ইকনমিক্স ৯ নং ১৯৪৯) বলেছেন ঃ—

"যাই হোক, কমিউনিস্ট পার্টির পুরাতন নেতৃত্ব সংস্কারবাদী প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। এই প্রভাব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে পার্টির নীতিকে আঘাত করছে। ভারতকে ভাগ করা এবং ভারত ও পাকিস্তানকে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দান করার জন্য 'মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা', বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে ভারতীয় বুর্জোয়াদের উচ্চস্তরের একটা আপস ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহা হচ্ছে, এই দুই ডোমিনিয়নেরই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের, আর্থিক ও রাজনীতিক অধীনতার নূতন রূপ। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির আগের নেতৃত্ব, এই মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনাকে ভারতীয় জনতার উপর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের নূতন রূপ বলে মনে করেন নাই, কোন ধরনের 'অগ্রগতির ধাপ' বলেই মনে করেছেন। দুই ডোমিনিয়নে ভারত বিভক্ত হবার পর কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব বুর্জোয়া নেহরু সরকারকে সমর্থনের এবং গান্ধী থেকে কমিউনিস্ট পর্যন্ত এক যুক্ত জাতীয় ফ্রন্ট গঠনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মার্চে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস বসে, তাতে এই সংস্কারবাদী নীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়।"

নূতন অবস্থা সম্বন্ধে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী ভাবধারায় সংশোধন করা হয় পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে।

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের ফলাফল বিচার করতে যেয়ে কমরেড বালাবুশেভিচ (মস্কোতে প্রকাশিত প্রবলেমস অফ ইকনমিকস ৮নং) লিখেছেন ঃ

"১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে ও মার্চের প্রথমে কমিউনিস্ট পার্টির যে দ্বিতীয় কংগ্রেস বসেছিল, তা ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং দেশের মধ্যে একটা প্রধান রাজনৈতিক ঘটনা। কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব যে অনেক বেড়েছে, এই কংগ্রেস তা দেখিয়ে দিয়েছে।

"এই নূতন পর্যায়ে, সর্বতোভাবে জনতার গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সুদৃঢ় করার জন্য সংগ্রামই সবচেয়ে জরুরি কর্তব্য বলে কংগ্রেস ঘোষণা করেছিল। শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে শ্রমিক, কৃষক ও শহরের পেটিবুর্জোয়াদের মিতালী হবে এই ফ্রন্টের রূপ। ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বর্তমান পর্যায়ে জনতার গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় শ্লোগান হিসাবে কংগ্রেস নিম্নলিখিত দাবি ঘোষণা করেছিল ঃ

(১) পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা, বৃটিশ সাম্রাজ্য ও ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীল ব্লক থেকে সরে

আসা এবং খাঁটি গণতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে, সর্বোপরি সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপন।

(২) বিনা খেসারতে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ এবং চাষীর হাতে জমি বন্টন।

(৩) দৃঢ়ভাবে ভারতের গণতন্ত্রীকরণ, এবং জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির ভিত্তিতে জাতীয়, জনতার গণতান্ত্রিক রিপাবলিকসমূহের ইউনিয়ন গঠন; দেশীয় রাজাদের রাজ্যের উচ্ছেদ।

(৪) মূল শিল্প জাতীয়করণ, বিদেশী এবং সর্বোপরি বৃটিশ কারবারগুলির বাজেয়াপ্তকরণ, শ্রমিক শ্রেণির অবস্থার মৌলিক উন্নতি।

"ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঐক্য গড়ে তোলাকে কমিউনিস্ট পার্টি এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বলে গ্রহণ করেছিল এবং এই বিষয়ের উপর জোর দিয়েছিল যে সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন থেকে উভয় ডোমিনিয়নেরই মুক্তির জন্য ঐক্য হচ্ছে অপরিহার্য শর্ত এবং ভারতের উভয় অংশের প্রকৃত গণতন্ত্রীকরণের উদ্দেশ্যে সফল সংগ্রামের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় পূর্ব-ব্যবস্থা।"

ইহা হল দ্বিতীয় কংগ্রেসের অবদান। পুরাতন কেন্দ্রীয় কমিটি যে দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী নীতি চালাচ্ছিলেন কংগ্রেস সে নীতি বাতিল করেছে। কংগ্রেস ঘোষণা করেছে বৃহৎ বুর্জোয়া এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব জনতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ও সাম্রাজ্যবাদের দলে ভিড়েছে। কংগ্রেস পরিষ্কার করে বলেছে, সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব এখনও চলছে এবং মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা জনতার বিরুদ্ধে "সুচতুর পাল্টা আক্রমণ"। কংগ্রেসে দেখানো হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এখনও প্রধান কর্তব্য রয়ে গেছে। গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সঠিক প্রোগ্রাম উপস্থিত করা হয়েছে। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামেও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের শ্রেণি মৈত্রীর ভিতর শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বের উপর জোর দেয়া হয়েছে।

সুতরাং কংগ্রেসের প্রধান সিদ্ধান্ত দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ ও বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে এক কার্যকরী হাতিয়ার ছিল। এই কথা বিশেষ করে মনে রাখা দরকার এই জন্য যে, পি-বি'র বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদী বিচ্যুতির সুযোগ নিয়ে বর্তমানে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা চলছে এবং অপরদিকে আবার পি-বি'র ভুলগুলি রাজনীতিক থিসিসের ভিতরই ছিল, এই কথা বলে অনেকে পি-বি'র বামপন্থী সুবিধাবাদী অপরাধকে ছোট করবার চেষ্টা করছে।

তবু রাজনীতিক থিসিসে (কংগ্রেসে গৃহীত সংশোধনাবলির ভিত্তিতে শেষ পর্যন্ত খসড়া তৈরি কমিটি এই থিসিস প্রস্তুত করেন) বামপন্থী সুবিধাবাদী সিদ্ধান্ত রয়েছে। পি-বি' যে পরবর্তীকালে গুরুতর বামপন্থী বিচ্যুতি করেছিলেন, তা শুরু হয় এগুলি থেকেই। যথা—

(১) রাজনীতিক থিসিসে ভারতে বিপ্লবের বর্তমান স্তর অর্থাৎ জনতার গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর সম্বন্ধে দেখানো হলেও, পরবর্তী স্তর, সমাজবাদী স্তর থেকে পরিষ্কারভাবে আলাদা করে দেখানো হয় নাই। অপর পক্ষে, জনতার গণতন্ত্রের কর্তব্য সম্বন্ধে এবং 'এক আঘাতে' 'সাথে সাথে সমাজবাদ গঠনের' ভুল সিদ্ধান্ত করা হয়েছে।

(২) রাজনীতিক থিসিসে বৃহৎ বুর্জোয়া ও অন্যান্য বুর্জোয়াদের ভিতর পার্থক্য টানা হয় নাই। এবং তাদের ভূমিকার ভিতর যে তফাৎ রয়েছে, তা দেখা হয় নাই। থিসিসে সমস্ত

বুর্জোয়াদেরই (সাম্রাজ্যবাদের) "সহযোগী"র পর্যায়ে ফেলা হয়েছে।

(৩) রাজনীতিক থিসিসে ভারতীয় শিল্পের ঔপনিবেশিক চরিত্রের কথা বলা হয় নাই। ভারতকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের অধীনে তাদের ঔপনিবেশিক ঘাঁটি হিসাবে রাখবার জন্য ভারতীয় বৃহৎ পুঁজি যে ইঙ্গ-মার্কিন একচেটিয়া পুঁজির এজেন্ট হিসাবে কাজ চালাচ্ছে, ভারতীয় বৃহৎ পুঁজির এই মুৎসুদ্দি চরিত্রের উপর থিসিসে জোর দেয়া হয় নাই। তার বদলে, ভারতীয় বৃহৎ পুঁজির স্বাধীন বিকাশের উপর ভুলভাবে জোর দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদের সাথে ইহার দ্বন্দ্ব রয়েছে, 'রাজনীতিক দর কষাকষি' করে ইহারা কতকগুলি বড় রকমের সুবিধা আদায় করেছে।

(৪) ভারতীয় অর্থনীতি যেন স্বাধীন পুঁজিবাদী অর্থনীতি, এই ধারনা থেকেই থিসিসে ভারতীয় অর্থনীতিক সংকটের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

(৫) বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে থিসিসে কোন হুঁশিয়ারী দেয়া হয় নাই।

ইহা তাৎপর্যপূর্ণ যে অন্ধ্র সেক্রেটারিয়েট, যার ভিতর কেন্দ্রীয় কমিটির মেম্বারেরা আছেন এবং দু'জন পি-বি মেম্বর আছেন, তাঁরা যখন পার্টি কংগ্রেসের ঠিক পরই, কংগ্রেস নির্দিষ্ট সাধারণ নীতিকে বাস্তব অবস্থায় প্রয়োগের কথা বিবেচনা করছিলেন, তখন তাঁরা থিসিসের ঠিক এই সব দুর্বলতার বিরুদ্ধেই দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসের খসড়া প্রস্তাবে, যা পি-বি'র কাছে পেশ করা হয়েছিল, তাতে এই সব দুর্বলতাই দূর করার চেষ্টা হয়েছিল। মাও-সে-তুং'এর "নূতন গণতন্ত্রের" ভিতর ঔপনিবেশিক বিপ্লবের নূতন স্তরের যে চমৎকার বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তার উপর ভিত্তি করে, অন্ধ্র সেক্রেটারিয়েট তাঁদের দলিলে নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলি উল্লেখ করেছিলেন ঃ

বিপ্লবের বর্তমান স্তর প্রধানত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্ত-বিরোধী; গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের শ্রেণি মৈত্রী এই ঘটনার উপর ভিত্তি করতে হবে যে, বৃহৎ একচেটিয়া বুর্জোয়ারাই সাম্রাজ্যবাদের দিকে গিয়েছে, গোটা বুর্জোয়া শ্রেণি নয়; এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি দ্বারা নিপীড়িত মাঝারি বুর্জোয়াদের সম্বন্ধে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে।

কৃষি বিপ্লব, সামন্ত ও আধা-সামন্ত জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ এবং চাষীর ভিতর জমি বিলি, ইহাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল কথা। কৃষি বিপ্লবের শ্রেণি মৈত্রীর ভিতর থাকবে ব্যাপক কৃষক জনতা, এবং যে ধনী কৃষক প্রধানত সামন্তভাবে শোষণ করে না তাদের সম্বন্ধে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে।

ভারতীয় বিপ্লবের অগ্রগতির লক্ষ্য চীনের বিপ্লবের মতই; শ্রমিক শ্রেণি ও তার পার্টিকে কৃষি বিপ্লব গড়ে তোলা ও গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রাম গড়বার দিকেই অগ্রসর হবার প্রধান লক্ষ্য রাখতে হবে। অন্ধ্র সেক্রেটারিয়েট সঠিকভাবেই তাঁদের দলিলে বলেছিলেন, পার্টি কংগ্রেস গৃহীত সাধারণ নীতি ও প্রোগ্রামকে যদি বাস্তব অবস্থায় এইভাবে প্রয়োগ করা না হয়, তাহলে গুরুতর-বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদী ভুলের বিপদ থেকে যাবে।

অন্ধ্রের দলিলে, সিদ্ধান্তের কতকগুলি দুর্বলতা থাকলেও, প্রধানত পার্টির সাধারণ নীতির যথাযথ ও বাস্তবে প্রয়োগের খুবই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি দেয়া হয়েছিল।

অপর পক্ষে, পি-বি এই সব দুর্বলতা দূর করছেন মনে করে বিপরীত পথ ধরলেন এবং অন্ধ্র দলিলকে 'দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী' বলে বাতিল করে দিলেন। পি-বি তার দলিলগুলিতে,

কার্যত, রাজনীতিক থিসিসের সমস্ত সবল পয়েন্টগুলিই পরিত্যাগ করলেন, এবং কার্যত আগাগোড়া বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদী থিসিস বিস্তৃতভাবে তৈরি করলেন। পি-বি, সাম্রাজ্যবাদ-বুর্জোয়া-সামন্ত জোটের ভিতর বুর্জোয়াদের পরিচালক শক্তি বলে বর্ণনা করলেন, বিপ্লবের স্তরকে পুঁজিবাদ-বিরোধী চরিত্রের বলে ব্যাখ্যা করলেন, ধনী কৃষককে প্রতিবিপ্লবের পুরোধা বলে বর্ণনা করলেন, বঞ্চনাকর বুলির আড়ালে সমাজবাদী শ্রমিক বিপ্লবের কর্মনীতি উপস্থিত কবলেন। এইভাবে পি-বি রাজনীতিক থিসিসকে ঢেলে সাজালেন।

পি-বি'র 'বামপন্থী' সুবিধাবাদের দিকে পুরোপুরি ঝুঁকে পড়লেন

'বামপন্থী' সুবিধাবাদকে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ থেকে কম বিপদজনক মনে করা ভুল। দুটোই সমান বিপদজনক। দুটোই মার্ক্সবাদ-বিরোধী, লেনিনবাদ-বিরোধী ঝোঁক, দুটো ঝোঁকই বিপ্লবকে ধ্বংস (সাবোটাজ) করে। দুটো ঝোঁক আলাদা দিক থেকে এ কাজ করে। কমিউনিস্ট পার্টিকে বিপ্লবের প্রকৃত ও বাস্তব নেতা হিসাবে গড়তে হলে, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে বিজয়ের পরিণতিতে পরিচালিত করার জন্য প্রকৃত বিপ্লবী কর্মী গড়ে তুলতে হলে, এই উভয় বিচ্যুতির বিরুদ্ধেই সুদৃঢ় সংগ্রাম চালানো প্রয়োজন। উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টির কাজের ভিতর এই দুই ধরনের বিচ্যুতি সম্বন্ধে ষ্ট্যালিনের সংজ্ঞাকে, এই সব বিচ্যুতির বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে আমাদের স্থির পথ নির্দেশক হিসাবে রাখতে হবে।

"প্রথম বিচ্যুতি হচ্ছে, মুক্তি-আন্দোলনের বিপ্লবী সম্ভাবনাকে ছোট করে দেখা এবং উপনিবেশ ও পরাধীন দেশের বিকাশের অবস্থা ও পরিমাণ সম্বন্ধে ঠিক বিচার না করে এইসব দেশে সর্বব্যাপক জাতীয় যুক্ত ফ্রন্ট গঠনের ভাবধারাকে বড় করে দেখা। এটা হচ্ছে দক্ষিণদিকে বিচ্যুতি। ইহা বিপ্লবী আন্দোলনকে অবনতিতে টেনে নামাবার এবং কমিউনিস্টদের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের পাকে ডুবিয়ে দিবার বিপদ আনে। প্রাচ্যের জনতার বিশ্ববিদ্যালয়ের সোজাসুজি কাজ হবে চরম দৃঢ়তা নিয়ে এই বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই করা।"

"দ্বিতীয় বিচ্যুতি হচ্ছে, মুক্তি-আন্দোলনের বিপ্লবী সম্ভাবনাকে বড় করে দেখা এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণি ও বিপ্লবী বুর্জোয়াদের ভিতর মৈত্রীর গুরুত্ব ছোট করে দেখা। ইহা হচ্ছে বামদিকে বিচ্যুতি। ইহা কমিউনিস্ট পার্টিকে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় ও গণ্ডীবদ্ধ সম্প্রদায়ে পরিণত করার বিপদ ডেকে আনে। প্রাচ্যের উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলিতে প্রকৃত বিপ্লবী কর্মী তৈরির পক্ষে, এই বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সুদৃঢ় সংগ্রাম প্রয়োজনীয় শর্ত।" (অন দি কলোনিয়াল কোয়েশ্চেন, লেনিন-ষ্ট্যালিন-জুকভ, পি-পি-এইচ, ২১-২২ পৃঃ)

অপর একস্থানে ষ্ট্যালিন এই দুইটি বিচ্যুতি সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

'চীনের কমিউনিস্টদের রাজনীতিক আত্মনিয়ন্ত্রণে অগ্রসর হবে এই দুইটি সমান ক্ষতিকর বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঃ

দক্ষিণপন্থী বিলুপ্তিবাদ (লিকুইডেশনিজম) চীনের শ্রমিক শ্রেণির স্বতন্ত্র শ্রেণিরূপ অস্বীকার করে এবং সাধারণ গণতান্ত্রিক জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে শিথিলভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, এবং চরম বাম ভাবাবেগ, যা আন্দোলনের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক স্তর বাদ দিয়ে যেতে চায় এবং চীনের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে যা মূল এবং প্রধান অংশ সেই কৃষককুলকে ভুলিয়া শ্রমিক একনায়কত্ব ও সোভিয়েত-গভর্নমেন্টের লক্ষ্য সরাসরি গ্রহণ করে। (১৯২৭ সালে আগষ্ট মাসে ষ্ট্যালিনের বক্তৃতা, মার্ক্সিসিজিম এন্ড ন্যাশনাল এন্ড কলোনিয়াল কোয়েশ্চেন।

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের পূর্ববর্তী কালে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ও সাধারণ কর্মীদের ভিতর দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের প্রাধান্য ছিল। ফলে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের নূতন স্তরে আমরা শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বের জন্য সংগ্রামকে অস্বীকার করেছি এবং আমাদের 'মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাবে' দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী নীতি অনুসরণ করেছি। ঐ প্রস্তাব বিশ্বাসঘাতক জাতীয় বৃহৎ বুর্জোয়াদের লেজে সংগ্রামী জনতাকে বেঁধে রাখতে চেয়েছিল।

১৯৪৬ এবং ১৯৪৭ সালে ভারতের শ্রমিক শ্রেণি বিরাট সংগ্রাম করেছে এবং জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে নেতা হিসাবে বের হয়ে এসেছে; অনেকগুলি প্রদেশে কৃষক সংগ্রাম অন্যান্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মতই সশস্ত্র সংগ্রামে পরিচালিত হওয়ার অবস্থায় এসেছিল। দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে, সে পথে অগ্রসর হতে আমরা অস্বীকার করেছি এবং যে বৃহৎ বুর্জোয়া নেতৃত্ব বিপ্লবে তখনই বিশ্বাসঘাতকতা করছিল, তাদের সাথে সহযোগিতার কথা প্রচার করেছি। আমরা বুর্জোয়াদের পিছনে পিছনে চলেছি।

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের পর, এই গত দু'বছরে পি-বি'র প্রস্তাবগুলিতে এবং পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মীদের কাজে বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদী বিচ্যুতি প্রধান স্থান জুড়ে ছিল। ফলে আমরা বিপ্লবের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সামন্ত-বিরোধী স্তর বাদ দিয়ে যাবার চেষ্টা করেছি এবং বিপ্লবের সমাজবাদী স্তরের লক্ষ্যের কথা বলতে শুরু করেছিলাম, যেমন গ্রামে পুঁজিবাদী উপাদানগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করা, ইত্যাদি। আমরা ভুলে গিয়েছিলাম সাম্রাজ্যবাদের চালু করা সামন্ত ও আধা-সামন্ত জমিদারি প্রথার অধীনে নিষ্পেষিত ব্যাপক কৃষক জনতা ভারতের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে মূল এবং প্রধান শক্তি এবং যে কৃষি বিপ্লব গড়ে উঠছিল, তার উপর আমরা শক্তি কেন্দ্রীভূত করি নাই।

১৯৪৮ এবং ১৯৪৯ সালে কৃষি বিপ্লবকে ও গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামকে পরিচালনা করার বিপুল সম্ভাবনা উপস্থিত হয়েছিল কিন্তু আমাদের "বামপন্থী" সুবিধাবাদ কৃষক ফ্রন্টে ভেদ সৃষ্টি করেছে; গ্রাম্য সশস্ত্র সংগ্রামকে অবহেলা করেছে এবং বর্তমান গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে শ্রমিক শ্রেণিকে তার মিত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। আমরা শ্রমিক শ্রেণির অগ্রণীকে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছি।

তাই, দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ ও "বামপন্থী" সুবিধাবাদের ফলাফল একই হয়েছে, বিপ্লবের অগ্রগতিতে বাধা দেয়া হয়েছে দুটো ভিন্ন উপায়ে। দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ অগ্রণীকে বুর্জোয়াদের পিছনে চালিত করে, আর বামপন্থী সুবিধাবাদ অগ্রণীকে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে।

বিপ্লবের চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের গোঁড়ামীমূলক বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদী সিদ্ধান্ত থাকার ফলে সংগ্রামের বামপন্থী বেপরোয়া রূপ দেয়া হয়েছে। তা হচ্ছে ঃ আমরা গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রামে অবহেলা করেছি, হয় আমরা সেগুলিকে অগ্রসর করিয়ে নিয়ে যাই নাই (তেলেঙ্গানা, অন্ধ্র এবং হাজং এলাকা বাদে), অথবা আমরা সেগুলিকে পরিচালিত করি নাই যেমন কাকদ্বীপ ও মেদিনীপুরে, আমাদের এইরূপ করাব কারণ, আমাদের এই গোঁড়ামীমূলক নীতি ছিল, যে বিপ্লবী অভ্যুত্থান প্রথমে শহরেই হতে হবে, গ্রামের সংগ্রাম ইহারই অনুগামী। বিপ্লবের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ত-বিরোধী চরিত্র আমরা একেবারেই বুঝতে পারি নাই এবং কৃষি বিপ্লবকে সাংঘাতিকভাবে ছোট করে দেখেছি। তাই, সমস্ত ফলাফলকে অস্বীকার করে কলকাতায় সশস্ত্র মিছিলের উপর শক্তি কেন্দ্রীভূত করা, বেপরোয়া চরিত্রের (এডভেঞ্চারিষ্ট)

ছিল এবং তার ফলে গুরুতর কর্মী ক্ষয় হয়েছে ও সংগঠনের ক্ষতি হয়েছে। তেমনি জেলের ভিতরকার কতকগুলি সংঘর্ষ চূড়ান্ত বেপরোয়াবাদের নিদর্শন।

আমাদের বামপন্থী বেপরোয়া কার্যাবলী পার্টি সংগঠনের উপর এবং শ্রমিক আন্দোলনের উপর বিপর্যয় এনেছে।

এই বিষয়ে চীনের কমিউনিস্ট নেতা কমরেড লি-লি-সানের নিম্নলিখিত বর্ণনা খুবই শিক্ষাপ্রদ ঃ

"বেশ অনেক দিন পর্যন্ত, আমরা বুঝতে পারি নাই, চীনের মত আধা-উপনিবেশ ও আধা-সামন্ত দেশে ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসনী শাসনে, বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও বিপ্লবী সংগ্রামের কোন আইনগত রক্ষা ব্যবস্থা নাই। আন্দোলনে যখন বিপর্যয় হত তখন কি করে যথোচিত আত্মরক্ষা ব্যবস্থা করতে হয় এবং পিছু হটতে হয়, তা আমরা জানতাম না। উল্টো দিকে, আমরা বেপরোয়াভাবে আক্রমণ চালিয়েছি এবং প্রকাশ্যেই শ্রমিকদের ধর্মঘট ও মিছিল গড়ে তুলেছি এবং এমন কি সশস্ত্র সংগ্রামও চালিয়েছি। ফলে, শহরগুলিতে বিপ্লবী সংগঠনগুলি ও বিপ্লবী শক্তিগুলি গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। চূড়ান্ত ক্ষয় হয়েছে। এক সময় তো কার্যত পার্টির সমস্ত সংগঠন এবং বিপ্লবী গণ-সংগঠন শত্রু দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছে। এই বিষয়ে আমি নিজে গুরুতর ভুল করেছি এবং সেই জন্যই এইসব ঐতিহাসিক শিক্ষা সম্বন্ধে গভীরভাবে অনুভব করি। (এশিয়া ও অষ্ট্রেলেশিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনে লি-লি-সানের রিপোর্ট)।

এই বর্ণনা থেকে কি শিক্ষা পাওয়া যায়? পিকিং-এর এশিয়া ও অষ্ট্রেলেশিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনে কমরেড লিউ-শাও-চি'র বক্তৃতায় ইহার সারমর্ম বলা হয়েছে ঃ

"অনেক উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশে জনতার মুক্তি-সংগ্রামের প্রধান রূপ হবে সশস্ত্র সংগ্রাম। তার মানে এই নয় যে, সশস্ত্র সংগ্রামের সাথে অন্য ধরনের সংগ্রামের যোগ সাধনের প্রয়োজন নাই। সশস্ত্র সংগ্রাম চালাতে হবে গ্রামাঞ্চলে, আর শত্রু কবলিত শহর ও এলাকায় অন্যান্য আইনগত ও বে-আইনি সংগ্রাম চালাতে হবে ও ইহার সাথে যোগ সাধন করতে হবে।"

এই দৃষ্টিতে বিচার করে আমরা স্থির করতে পারি কোন কোন সংগ্রাম সঠিকভাবে পরিচালিত হয়েছিল এবং কোন কোন সংগ্রাম বামপন্থী বেপরোয়াবাদী ছিল। যথাশীঘ্র সম্ভব এইসব সংগ্রামের পর্যালোচনা করা হবে।

শহরে সংগ্রাম পরিচালনার ব্যাপারে চীনের কমরেডরা অনুসরণীয় কোন নীতি দিয়েছেন? সে নীতি হচ্ছে ঃ আমাদের পার্টি ও গণসংগঠনকে শত্রুরা ধ্বংস করতে পারবে না, কিন্তু পার্টি দ্বারা পরিচালিত শ্রমিক শ্রেণি শত্রুর উপর আঘাত হেনে তার ক্ষতি করতে সমর্থ হবে। এই নীতি অনুসরণ করেই আমরা অগ্রসর হব। এই নীতি মনে না রাখলে হয় দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী আর না হয় 'বামপন্থী' বেপরোয়াবাদী বিশ্বাসঘাতকতা হবে। এই নীতি দিয়েই আমাদের বিচার করতে হবে, একটা বিশেষ ধরনের কাজের উপযুক্ত সময় কখন, কখন অগ্রসর হতে হবে আর কখন পিছু হটতে হবে। 'বামপন্থী' বেপরোয়া কৌশল বলে সব সময়ই এবং আগাগোড়া অগ্রসর হও। দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী কৌশল বলে, সব সময়ই এবং আগাগোড়া পিছু হটো।

অনেক ক্ষেত্রে আমরা সাধারণ ধর্মঘটের শিশুসুলভ আহ্বান দিয়েছি, শ্রমিকদের সংগঠিত

না করেই, সতর্কতার সাথে আয়োজন না করেই, শ্রমিক ঐক্যের জন্য গুরুতর চেষ্টা না করেই এবং পুলিশী সন্ত্রাসনের সামনে শ্রমিকদের বের হয়ে আসা সম্ভব কিনা তা বিচার না করেই। ইহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিকরা সাড়া দেয় নাই। প্রশ্ন উঠেছে এই সব আহ্বান যুক্তিযুক্ত কিনা। নিঃসন্দেহে এগুলি ছিল বেপরোয়া আহ্বান, সংস্কারবাদীরা যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেপরোয়া বলে সে দিক থেকে নয়, কিন্তু বিপ্লবের দৃষ্টি থেকে।

সংস্কারবাদীরা ইহাকে বেপরোয়া বলে এই জন্য যে তারা শুধু শান্তিপূর্ণ কায়দায় সমাবেশ চায় এবং আগাগোড়া পিছু হটতে চায়। সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান প্রভৃতি এবং পুলিশের সাথে জনতার সব রকমের সংঘর্ষকেই তারা বেপরোয়া বলে অভিহিত করে।

একবার যদি আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে শ্রমিক শ্রেণির প্রধান কাজ হচ্ছে, গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করা, তা হলেই সমস্ত বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। এই কথাটি বুঝতে পারলেই, শহরে কর্মীদের রক্ষা করার চরম গুরুত্ব এবং বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ধরনের সংগ্রাম চালাবার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়।

সেই সাথে এই কথা মনে করলে চলবে না, ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন শহরে যে সব রাজনীতিক ধর্মঘট সাফল্যের সাথে পরিচালিত হয়েছে, তা ছিল বেপরোয়া কাজ। ভারতের শ্রমিক শ্রেণিকে সাধারণ সংগ্রামের নেতৃত্বের পর্যায়ে আনবার জন্য এই সব রাজনীতিক গণ-ধর্মঘট যে বেশ বড় ভূমিকা নিয়েছে তা ছোট করে দেখলে চলবে না। বালাবুশেভিচ (৮ নং প্রবলেমস অফ ইকনমিক্স, মস্কো) এই সব ধর্মঘট সংগ্রামকে নিম্নলিখিতভাবে বিচার করেছেন ঃ

"দেশ বিভাগের পর, ভারতে কংগ্রেস সরকারের ও পাকিস্তান মুসলিম লীগ সরকারের জন-বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে, উভয় ডোমিনিয়নের এই দুই সরকার কর্তৃক কমিউনিস্ট পার্টি, সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলির উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক ধর্মঘট ও গণসংগ্রাম ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে।"

"কংগ্রেস সরকার কর্তৃক মূল্য বিনিয়ন্ত্রণের প্রতিবাদে বোম্বাইয়ের ৭ লাখ শ্রমিকের একদিনের জন্য সাধারণ ধর্মঘট (১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর), বাংলা প্রাদেশিক আইন সভায় বাংলা সরকারকে অতিরিক্ত অবাধ ক্ষমতা দান করে যে আইন গৃহীত হয়, তার প্রতিবাদে কলিকাতায় ১ লাখ শ্রমিকের একদিনের জন্য সাধারণ ধর্মঘট (জানুয়ারী, ১৯৪৮), সরকারের শ্রমিক বিরোধী নীতির প্রতিবাদে মধ্যপ্রদেশে ও বেরারে ২ লাখ শ্রমিকের একদিনের জন্য সাধারণ ধর্মঘট (মার্চ, ১৯৪৯), শ্রমিক-বিরোধী আইন প্রবর্তনের প্রতিবাদে কলিকাতায় ৫০ হাজার শ্রমিকের একদিনের জন্য ধর্মঘট (জুলাই, ১৯৪৮) এবং আরও অনেকগুলি বড়ো বড়ো রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং কমিউনিস্ট পার্টির উপর দমননীতির বিরুদ্ধে অনেকগুলি প্রতিবাদ ধর্মঘট—শ্রমিক শ্রেণির এই সব রাজনীতিক সংগ্রাম ভারতের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।..."

এই সাথে আমরা যোগ দিতে পারি, অল্প কিছুদিন আগেকার হায়দরাবাদের সাধারণ ধর্মঘট ও বোম্বাইয়ের ৭৫ হাজার সুতাকল শ্রমিকের ধর্মঘট।

বালাবুশেভিচ বলছেন,

"ভারতের শ্রমিক শ্রেণির বর্দ্ধিষ্ণু রাজনৈতিক সংগ্রাম নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে শ্রমিক শ্রেণি শুধু নিজের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্যই যে এগিয়ে আসছে তাই নয়, সাম্রাজ্যবাদ বৃহৎ বুর্জোয়া ও জমিদারদের প্রতি ক্রিয়াশীল ব্লকের বিরুদ্ধে এবং ব্যাপক মেহনতী জনতার স্বার্থরক্ষার জন্য সংগ্রামও শ্রমিক শ্রেণি পরিচালনা করছে। এইভাবে, কার্যত শ্রমিক শ্রেণি সাধারণ সংগ্রামের নেতার পর্যায়ে উঠেছে।"

এমনি রাজনীতিক ধর্মঘট ও গণ-সংগ্রাম শহরে ভবিষ্যতেও ঘটবে, (অবশ্য) এমন অবস্থায়, যখন গভর্নমেন্টকে আত্মরক্ষার অবস্থায় ফেলা হবে, যখন জনতার আক্রমণ পুলিশকে পিছু হটতে বাধ্য করবে। অপরিণত বেপরোয়া সংগ্রামের ভিতর ঝাঁপিয়ে না পড়ে, এই পরিপক্ক অবস্থার সুযোগ আমাদের নিতে হবে।

এ বিষয়ে আমাদের পথনির্দেশক নীতি কি হবে? সে নীতি দেয়া হয়েছে এশিয়া ও অষ্ট্রেলেশিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনের ইস্তাহারে। তাতে বলা হয়েছে ঃ

"শহরে, প্রতিক্রিয়াশীল সন্ত্রাসনের ভিতর, ভাল বিচারবুদ্ধি দিয়ে ও পরিবর্তনোপযোগী করে এমন কৌশল প্রয়োগ করতে হবে যাতে আপনাদের স্বার্থ ভালভাবে রক্ষা হয়। সক্রিয় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীগণ, যেখানেই জনতা আছে, সেখানেই আপনাদের থাকতে হবে, এমনকি প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা চালিত ট্রেড ইউনিয়ন, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানেও, জনতার স্বার্থরক্ষার জন্য, বিশেষ করে দাস-শ্রমের প্রতিবাদে ও সমস্তরকম বৈষম্যের প্রতিবাদে জনতার দৈনন্দিনকার সংগ্রাম গড়ে তুলতেই হবে। এইভাবে আপনাদের শক্তি সংগ্রহ করতে হবে ও তৈরি হতে হবে, যাতে অনুকূল সুযোগ এলে পরে ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন, যে আন্দোলন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উপর চূড়ান্ত আঘাত হানবে।"

উপরোক্ত নীতির প্রধান কথা হচ্ছে কর্মীদের রক্ষা করা। ইহা ধর্মঘট না করার নীতি নয়। সর্বত্র এবং আগাগোড়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে আক্রমণ করার বিরুদ্ধে গুরুতর হুঁশিয়ারী। ভাল বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে বুঝতে হবে, কখন এবং কি ধরনের সংগ্রাম শত্রুর ক্ষতি করতে পারে। নূতন নূতন কর্মী গড়ে তুলুন, কর্মীদের রক্ষা করুন, ট্রেড ইউনিয়ন ও পার্টি সংগঠন শক্তিশালী করুন, পার্টিকে শ্রমিক শ্রেণির প্রকৃত নেতা হিসাবে গড়ে তুলুন, জনতার সাথে পার্টির যোগাযোগ বাড়িয়ে তুলুন।

আমরা ভুল করেছিলাম কারণ আমাদের পথনির্দেশক নীতি ছিল, প্রতিক্রিয়াশীল সন্ত্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করবার একমাত্র পন্থী হিসাবে বর্দ্ধমান রাজনীতিক ধর্মঘটের উপর নির্ভর করা। কারণ আমাদের এ দৃষ্টি ছিল না যে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং কৃষি বিপ্লব পরিচালিত করে, গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তুলে, তবেই শ্রমিক শ্রেণি তার জীবিকার ও শ্রম ব্যবস্থার মৌলিক উন্নতি সাধন করতে পারে। কারণ আমরা এই ধারণা নিয়েই চলেছিলাম যে শ্রমিক শ্রেণির আক্রমণাত্মক সংগ্রাম কোন আঁকাবাঁকা পথে না যেয়ে অবিরাম এগিয়ে চলবে। বিপ্লবের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্ত-বিরোধী চরিত্র আমাদের দৃষ্টি থেকে সরে গিয়েছিল বলেই আমরা এই বিচ্যুতি করেছিলাম। এই বিচ্যুতির কারণ আমরা ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করেছি ও আমাদের কর্তব্য ঠিক করেছি গোঁড়ামীর সাথে রুশ বিপ্লবের সাথে ঐতিহাসিক সামন্তরাল টেনে।

সঠিক কৌশল কিভাবে ঠিক করতে হয়? সঠিক কৌশল গ্রহণ করতে হলে নির্দিষ্ট

ঐতিহাসিক অবস্থা দেখতে হবে। এই ঘটনাগুলি মনে রাখা নিতান্ত প্রয়োজন ঃ আমরা এমন এক সময়ের ভিতর দিয়ে চলেছি যখন ঔপনিবেশিক জনতার সংগ্রাম অভূতপূর্ব গতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে, ভারতে কৃষি বিপ্লবের শক্তিসমূহ দ্রুতগতিতে পরিণতি লাভ করছে, সাম্রাজ্যবাদীরা প্রবলভাবে পরাজিত হয়ে তাদের আক্রমণ বাড়িয়ে চলেছে, গোটা ঔপনিবেশিক জগৎ জুড়ে সশস্ত্র বিপ্লব সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের সম্মুখীন হচ্ছে।

এই অবস্থায় দেশের অনেক অংশে তেলেঙ্গানা গড়ে তোলা সম্ভব এবং কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে তা অবশ্য করণীয়। একবার ইহা সম্পাদন করতে পারলে, সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থা দেখা দিবে। আমাদের সমস্ত কার্যকলাপ পরিচালিত হবে এই মূল উদ্দেশ্য নিয়ে ঃ কি করে যত বেশি সম্ভব এলাকাতে তেলেঙ্গানা গড়ে তোলা যায়। তেলেঙ্গানার পথই হবে আমাদের প্রধান পথ।

বড় বড় শহরে ও শিল্প কেন্দ্রে, শ্রমিক শ্রেণি, বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্যদের গণসংগ্রাম আমাদের পরিচালিত করতে হবে। শ্রমিক শ্রেণির কাজের উপর হামলা, মজুরি ও জীবিকার ব্যবস্থার উপর হামলা রুখবার জন্য অক্লান্তভাবে আমাদের শ্রমিক ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। জাতীয় সংস্কারবাদী ও সমাজ সংস্কারবাদী বিভেদ সৃষ্টিকারীদের কোণঠাসা করতে হবে, তারা যে বৃটিশ ও মার্কিন শ্রমিক বিভেদকারীদের দালাল ও ইঙ্গ-মার্কিনের ভাড়াটিয়া, তাদের এই স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে হবে। শহরে সমস্ত ব্যাপক গণ-আন্দোলনের পরিচালক শক্তি হবে, কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা চালিত সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণি।

অভূতপূর্ব দক্ষতা ও উৎসাহ নিয়ে যথাসম্ভব ব্যাপকতম শান্তি আন্দোলন আমাদের গড়ে তুলতে হবে। শান্তির জন্য ও ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নিম্নলিখিত শ্লোগানের ভিত্তিতে চালাতে হবে ঃ কমনওয়েলথ ছাড়ো; ভারত ও পাকিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের ঔপনিবেশিক ও যুদ্ধঘাঁটি করবার যে চক্রান্ত করছে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভারত ও পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ঐক্য চাই; ভিয়েৎনাম, ইন্দোনেশিয়া, বর্মা, মালয়, ফিলিপাইনের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে সর্ব প্রকার সমর্থন চাই; এইসব দেশের জনতার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চালনার জন্য সৈন্য ও অস্ত্র সরবরাহের যানবাহন চালনা করা চলবে না। দুনিয়ার শান্তি কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির নেতৃত্বে সর্বদেশে যে প্রবল আন্দোলন শক্তি সঞ্চয় করছে, তার সাথে আমাদের এই আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করতে হবে।

পুলিশের দমননীতির বিরুদ্ধে, শ্রমিক ও সাধারণ নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে জনতার ব্যাপক অংশকে টেনে এনে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার যে সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশকারীদের দালাল, সে স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে দিতে হবে।

সংগ্রামের রূপ পরিবর্তন উপযোগী হবে, ধর্মঘট থেকে শান্তিপূর্ণ মিছিল পর্যন্ত, প্রকাশ্য আইনসঙ্গত সমাবেশ থেকে বে-আইনি প্রচার পর্যন্ত। আমাদের লক্ষ্য হবে, শহরে শ্রমিক শ্রেণি ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলা, কমিউনিস্ট পার্টি ইউনিট ও কমিটি, ট্রেড ইউনিয়ন, ফ্যাক্টরী ও মিল কমিটি, যুবক, নারী ও ছাত্র-সংগঠন, প্রভৃতি গড়ে তোলা। এইসব সংগঠনের নেতৃস্থানীয় কর্মী ও সংগঠন যন্ত্র ব্যাপক জনতার ভিতর বে-আইনি ভাবে কাজ চালাবে। এবং দমননীতি ও প্রতিক্রিয়াশীল সন্ত্রাসনের সামনে ক্রমশ ব্যাপক গণ-আন্দোলন নেতৃত্ব করতে সমর্থ হবে।

শহরে এবং শিল্পকেন্দ্রে শ্রমিক ও গণতান্ত্রিক জনতাকে সংগঠিত করুন, সংগঠিত করুন, সংগঠিত করুন। তা হলে আমরা শহরেই শুধু গণ-আন্দোলন পরিচালনা করতে পারবো, তাই নয়, ইহার ফলে গ্রামাঞ্চলের সংগ্রাম গড়ে তুলবার ও পরিচালনা করবার জন্য শ্রমিক জঙ্গী ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী বাহিনীও আমরা পাঠাতে পারবো।

এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করলে, পরিপক্ক মুহূর্ত আসবে, যখন শত্রু আত্মরক্ষার অবস্থায় পড়বে এবং শহরে বিপুল অভ্যুত্থান পরিচালিত হবে।

যাতে আমরা এই কাজ করতে পারি সে জন্য পিকিং সম্মেলনে কমরেড লিউ-শাও-চি ৪টি জরুরি নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

(১) সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালদের দমননীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে ইচ্ছুক এমন সমস্ত শ্রেণি, পার্টি, দল, সংগঠন ও ব্যক্তিবিশেষের সাথে শ্রমিক শ্রেণি ঐক্যবদ্ধ হয়ে ব্যাপক, দেশব্যাপী যুক্ত ফ্রন্ট গড়ে তুলবে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালদের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় সংগ্রাম চালাবার জন্য প্রস্তুত হবে।

(২) এই দেশব্যাপী যুক্তফ্রন্ট পরিচালিত হবে শ্রমিক শ্রেণি দ্বারা, যারা সবচেয়ে দৃঢ়ভাবে, সবচেয়ে সাহসের সাথে এবং সবচেয়ে নিঃস্বার্থভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, এবং পরিচালিত হবে শ্রমিক শ্রেণির রাজনীতিক পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা। উভয়েই হবে এই ফ্রন্টের কেন্দ্র। দোলায়মান ও আপসকামী জাতীয় বুর্জোয়া বা পেটিবুর্জোয়া এবং তাদের রাজনীতিক পার্টি ইহাকে পরিচালিত করতে পারে না।

(৩) শ্রমিক শ্রেণি ও তার রাজনীতিক পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টিকে, সমস্ত জাতীয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি ঐক্যবদ্ধ করার কেন্দ্র হতে হলে এবং জাতীয় যুক্তফ্রন্টকে বিজয়ের পরিণতিতে সাফল্যের সাথে পরিচালনা করতে হলে, প্রয়োজন হচ্ছে ধৈর্যের সাথে সংগ্রাম করে এমন কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করা, যে পার্টি মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের নীতিতে সুসজ্জিত, যে পার্টি কর্মনীতি ও কৌশল করায়ত্ত করেছে, যে পার্টি আত্মসমালোচনা করে ও কড়া শৃঙ্খলা রক্ষা করে এবং যে পার্টি জনতার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

(৪) যেখানে এবং যখনই সম্ভব কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জনতার মুক্তি-ফৌজ গঠন করতে হবে, যে ফৌজ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়বার পক্ষে শক্তিশালী ও সুদক্ষ। এবং এইসব ফৌজের লড়াই চালাবার শক্ত ঘাঁটি গঠন করতে হবে। সশস্ত্র সংগ্রামের সাথে শত্রু কবলিত এলাকার গণ-সংগ্রামের যোগাযোগ সাধনও করতে হবে। উপরন্তু অনেক উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে সশস্ত্র সংগ্রামই হচ্ছে সংগ্রামের প্রধান রূপ।

২৭শে জানুয়ারীর কমিনফর্ম মুখপত্রের সম্পাদকীয়ের এক বিশেষ দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

ব্যাখ্যাটি হচ্ছে ঃ "ভারতবর্ষ এমন স্তরে আছে যখনকার কর্মসূচী সশস্ত্র সংগ্রাম নয়'। 'স্বরূপ উদ্ঘাটন অভিযানের উপরই আমাদের জোর দিতে হবে'।

তাই যদি হয়, তা হলে তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রের সংগ্রাম কি সবই ভুল? আর তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রের সংগ্রাম যদি নির্ভুল হয়, তা হলে কি অন্ধ্র ও ভারতের বাকী অংশের ভিতর কোন মৌলিক পার্থক্য আছে? যদি এমনি কোন মৌলিক পার্থক্য থাকে, তা হলে সে পার্থক্যের প্রধান পয়েন্টগুলি কি?

তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রের সংগ্রামকে ভুল বলার অর্থ নিকৃষ্ট ধরনের সংস্কারবাদ প্রচার করা।

উপরোক্ত প্রশ্নের জবাব দিতে হলে পিকিং ইস্তাহার হবে আমাদের পথ প্রদর্শক। পিকিং ইস্তাহারের সার কথা কি? তা হচ্ছে : সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে কৃষি-সংগ্রাম যেখানেই গড়ে উঠবে তাকেই সশস্ত্র সংগ্রাম, পার্টিসান যুদ্ধ, প্রভৃতি হিসাবে পরিচালিত করতে হবে। ঠিক এই নীতি অনুসরণ করেই তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রের সশস্ত্র সংগ্রাম সঠিকভাবেই পরিচালিত হচ্ছে। তাই, পার্টি, যেখানে কৃষি-সংগ্রাম গড়ে তুলবার অবস্থায় আছে, যেমন কাকদ্বীপ, মেদিনীপুর ও হাজং এলাকায়, যেখানে এই সংগ্রামকে সশস্ত্র সংগ্রাম হিসাবে পরিচালনা করতে হবে। এই বিচার অস্বীকার করলে, পিকিং ইস্তাহার আর পথ প্রদর্শক থাকে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অন্ধ্রের সশস্ত্র সংগ্রাম যে বাস্তবে পরিণত হয়েছে, তার কি কি কারণ আছে? প্রধান কারণগুলি হচ্ছে : জমির জন্য ও গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে কৃষক জনতায় ঐক্য, কৃষককুলের উপর কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব এবং কৃষি সংকটের খাস অস্তিত্ব।

নিশ্চয়ই এই অবস্থা দেশের অনেক অংশের ভিতর আছে। যেখানে জমির জন্য ও গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে কৃষক জনতার ঐক্য এখনও গড়ে উঠে নাই অথবা যেখানে কৃষক জনতার উপর পার্টির নেতৃত্ব এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সেখানে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার পূর্ব-ব্যবস্থা হিসাবে এইসব গড়ে তোলাই হবে পার্টির কাজ। শ্রমিক শ্রেণির সাথে সমস্ত কৃষককুলের মৈত্রী শক্তিশালী কর—এই শ্লোগানের কথাই হচ্ছে সার কথা। এই অবস্থা অস্বীকার করার অর্থ বামপন্থী বেপরোয়া বিচ্যুতি করা।

নিশ্চয়ই দেশের অনেক অংশে কৃষক আন্দোলন এখনই এমন স্তরে উঠেছে, যখন তাকে একমাত্র তেলেঙ্গানার পথেই পরিচালিত করা যায় অথবা তাকে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়।

তাই, কমিনফর্ম মুখপত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধের দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী ব্যাখ্যা পিকিং সম্মেলনের ঐতিহাসিক ইস্তাহারকে অস্বীকার করা ছাড়া আর কিছু নয়। এই ব্যাখ্যার শুধু একটিমাত্র অর্থই হতে পারে, যথা, শান্তিপূর্ণ পার্লামেন্টারীবাদের পক্ষে ওকালতী। পিকিং ইস্তাহার সমস্ত বর্ণের শান্তিপূর্ণ পার্লামেন্টারীবাদের বিরুদ্ধে পরিষ্কার সাবধান বাণী। মনে রাখতে হবে, কমিনফর্ম মুখপত্রের সম্পাদকীয়টি পিকিং ইস্তাহারের সার কথাই বলেছে এবং ইহার কোন সুবিধাবাদী ব্যাখ্যার সুযোগ নাই।

অন্যদিক থেকে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী বিচ্যুতি দেখা দিবে, যদি পিকিং সম্মেলনের নির্দেশগুলিকে আমরা 'ধর্মঘট নয়' এই নীতি ও শান্তিপূর্ণ প্রচারের নীতি হিসাবে গ্রহণ করি। যদি আমরা গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রশ্নকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে গ্রহণ না করি, যদি আমরা শহরে, সব অবস্থায়ই, সব রকমের সংগ্রামকে অস্বীকার করি। এবং শেষ পর্যন্ত আমরা যদি ভুলে যাই, ইহা বিপ্লবের অগ্রগতির যুগ। বর্তমান অবস্থায়, কোন কোন ক্ষেত্রে (যেমন অন্ধ্র ও হাজং এলাকা) আমরা এই অগ্রগতির সম্মুখীন হয়েছি, সেখানে আমাদের কমরেডরা মোটামুটি নির্ভুল মার্ক্সবাদী-লেলিনবাদী কৌশল প্রয়োগ করছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের বিপর্যয় ঘটেছে, যেমন পশ্চিমবঙ্গে, সেখানে আমরা সঠিক কৌশল গ্রহণ করতে পারি নাই। কিন্তু বিপ্লবী অগ্রগতির অনুকূল অবস্থা গড়ে উঠবেই এবং কিছুদিনের জন্য আঁকাবাঁকা পথ গ্রহণ করবে।

সঠিক নীতি গ্রহণ করেও যদি আমরা তাকে গোঁড়ামীর পথে প্রয়োগ করি, তাহলে আরও

অনেক গুরুতর ভুল করা হবে। এমন কি আমাদের মৌলিক বিচ্যুতিগুলিও গোঁড়ামী থেকেই এসেছে। দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ ও 'বামপন্থী' সুবিধাবাদ, উভয়ই এসেছে আমাদের গোঁড়ামী থেকে। আমরা এতো গুরুতর ভুল করি তার কারণ আমরা গোঁড়ামীবাদী। গোঁড়ামীবাদের অর্থ কি? ইহার অর্থ, নির্দিষ্ট অবস্থা বিচার না করে যন্ত্রবৎ কতকগুলি সাধারণ ফরমূলা প্রয়োগ করা। ইহার অর্থ বিশেষ অবস্থার পরিবর্তন হলেও পার্টি-নির্দেশ পরিবর্তন করতে না পারা। ইহার অর্থ, পার্টি-নীতিকে ফৌজদারী আইনের কঠোর বিধি হিসাবে গ্রহণ করা, কাজের পথপ্রদর্শক হিসাবে নয়। পার্টি নীতিকে কাজের পথপ্রদর্শক বলেই মনে করতে হবে। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ, প্রত্যেকটি বিশেষ অবস্থায়, পার্টি-নীতি প্রয়োগ কালে বিশেষ অবস্থাটি কি তা বিচার করতে হবে, পার্টি নীতির অন্তর্নিহিত লক্ষ্যে কি করে পৌঁছানো যায়, কি কি বিচারের উপর পার্টি-নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল এবং নীতি প্রয়োগের সময়ের বিশেষ অবস্থায় ইহার কি পরিবর্তন প্রয়োজন।

নির্ভুল পার্টি-নীতি প্রয়োগের বেলায়ই যে শুধু গোঁড়ামীবাদ দেখা দেয় তাই নয়, পার্টি-নীতি ঠিক করার সময়ও ইহা দেখা দেয়, আমরা যে অন্ধ্র পি-সি'র প্রস্তাব বাতিল করেছিলাম, 'চীনের পথ' বাতিল করেছিলাম, ইহাই তো গোঁড়ামীবাদের নমুনা। রুশ বিপ্লবের বিপ্লবী কার্যকলাপের নির্ভুল নীতি, ভিন্ন অবস্থায় ও ভিন্ন যুগে আমরা ভারতে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলাম। আমরা ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছি। যে চীনের বিপ্লবে সেখানকার বিশেষ অবস্থায়, সাম্রাজ্যবাদী প্রাধান্য ও ঔপনিবেশিক দাসত্বের অবস্থায়, লেনিন-ষ্ট্যালিনের শিক্ষা প্রয়োগ করা হয়েছে। অনেক মূল বিষয়ে যে চীনের অবস্থা ভারতের অবস্থারই মত, সেই চীনের বিপ্লবের অমূল্য অভিজ্ঞতা থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছি।

পিকিং সম্মেলনের ও কমিনফর্ম মুখপত্রের সম্পাদকীয়ের (৪ নং, ১৯৫০) সঠিক নির্দেশ কার্যকরী করে একবার যদি আমরা ভুল শোধরাতে পারি, তাহলে কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ণ স্বাধীনতা ও জনতার গণতন্ত্রের জন্য জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের শক্তির উৎস খুলে দিতে সমর্থ হবে। যথেষ্ট পরাজয় ভোগ করে করে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালাল নেহরু-প্যাটেল সরকার ক্ষেপে যেয়ে, আগের চেয়ে অনেক বেশি নৃশংসতার সাথে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর আক্রমণের জন্য চক্রান্ত করছে। এই কাজ হাসিল করার জন্য তারা সব রকমের যন্ত্র ব্যবহার করছে,—পুলিশের সন্ত্রাসন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দক্ষিণপন্থী সোশালিস্ট বিভেদ এবং ভিতর ও বাহির থেকে কমিউনিস্ট পার্টির উপর হামলা। পার্টিকে ভাঙ্গবার জন্য দিল্লীতে মার্কিন-যুগোশ্লাভ দূতাবাসে গুপ্তচর দল সংগঠিত করা হচ্ছে। মস্কো রেডিও এবং প্রাভদার এই হুঁশিয়ারী গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করতে হবে।

বুর্জোয়া জাতীয় সংস্কারবাদের সমস্ত ঝোঁকের বিরুদ্ধে নির্মম সংগ্রাম, বামপন্থী সুবিধাবাদের, পরিপূর্ণ বিলোপ, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নীতির ভিত্তিতে কড়া শৃঙ্খলা, জনতার ভিতর অক্লান্ত কাজ, গোটা পার্টিকে নীতিগতভাবে ঢেলে সাজা, এবং সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা—এই সব হচ্ছে হাতিয়ার। এই হাতিয়ারের পরিপূর্ণ ব্যবহার করে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে যাতে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের বিপুল আলোড়নের পুরোভাগে এসে আমরা দাঁড়াতে পারি। আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী কারণ দুনিয়ার ঐতিহাসিক শক্তি আমাদেরই অনুকূলে অভিযান করে চলেছে।

শিখতে অস্বীকার করার ফলে পার্টি নেতৃত্ব গুরুতর ভুল ও বিচ্যুতি করেছে। চারটি উৎস থেকে পার্টি নেতৃত্বকে শিখতে হবে ঃ প্রথমতঃ মার্ক্স-এঙ্গেলস্-লেলিন-ষ্ট্যালিনের শিক্ষা থেকে; দ্বিতীয়ত অন্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বিশেষ করে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির, অমূল্য অভিজ্ঞতা থেকে; তৃতীয়ত পার্টির নীচেকার ইউনিট ও সাধারণ সভ্য যারা অনবরত জনতার সাথে যুক্ত, তাঁদের কাছ থেকে; চতুর্থত জনতার কাছ থেকে। এইসমস্ত উৎস থেকে শিখবার মত বলশেভিক বিনয় না থাকবার ফলে পার্টি নেতৃত্ব আমলাতান্ত্রিক ও গোড়ামীবাদী হয়ে পড়েছে। সবাইকে শিখাবার জন্য ব্যগ্রতা এবং কাহারও কাছ থেকে শিখতে অস্বীকার করা, এগুলি হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্বের দোষ। এইসব দোষই পার্টির সমস্ত প্রধান দুর্বলতার জন্য দায়ি। এইসব দোষের শ্রেণি উৎপত্তি রয়েছে পেটিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের ভিতর যাদের কোন বিপ্লবী অভিজ্ঞতা নাই এবং মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নাই। এই শ্রেণি-অবস্থাই গোঁড়ামী-বাদ পুষ্ট করে এবং প্রতি পদে সঠিক মার্ক্সবাদ-লেলিনবাদের ধারণায় নিতে বাধা দেয়। তাই পার্টির ভিতরে গণতন্ত্র—গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা কার্যকরী করার প্রশ্ন এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

১৩ মে ১৯৫০

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

নূতন লাইন তৈরি করার লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করুন

কমিনফর্ম সম্পাদকীয় ভারত ও পাকিস্তানের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের যে রণনীতি ও রণকৌশল নির্দেশ করেছেন তাঁর ভিত্তিতে নূতন লাইন ঠিক করতে হবে, পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের থিসিস ও উচ্চ কমিটির সমস্ত দলিলপত্র পরীক্ষা করে দেখতে হবে, বামপন্থী সংকীর্ণতার (লেফট সেক্টেরিয়ান) গণ্ডী থেকে পার্টিকে মুক্ত করতে হবে—এ সঙ্কল্প নিয়ে পার্টি সভ্যরা আজ এক ঐতিহাসিক সংগ্রাম শুরু করেছেন। ভুলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁরা লেনিনের মূল্যবান শিক্ষাকেই সামনে রাখছেন। লেনিন বলেছেন ঃ "কোন্ রাজনৈতিক দল কতখানি দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন, শ্রেণি ও জনগণের প্রতি কার্যত কে কতখানি দায়িত্ব পালন করে তা পরীক্ষা করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং নিশ্চিত উপায় হলো—সে রাজনৈতিক দল তার নিজের ভুল সম্পর্কে কি মনোভাব গ্রহণ করে তা লক্ষ্য করা। দায়িত্বশীল পার্টির লক্ষণ হলো—তারা নিজেদের ভুল অকপটে স্বীকার করে, ভুলের কারণ কি তা খুঁজে বের করে, কি অবস্থার মধ্যে ভুল হয়েছে তা পরীক্ষা করে দেখে এবং কি করে ভুল সংশোধন করা যায় তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে। এভাবেই তাদের দায়িত্ব পালন করতে হয়; শ্রেণি এবং তারপর জনগণকে শিক্ষিত করতে হয়, ট্রেনিং দিতে হয়।"

"যে সকল বিপ্লবী দল আজ পর্যন্ত ধ্বংস হয়েছে—তাদের ধ্বংস হবার কারণ তারা অহংকারী হয়ে উঠেছিল, তাদের শক্তির উৎস কোথায় তা দেখতে পায়নি, নিজেদের দুর্বলতা সম্পর্কে বলতে ভয় পেয়েছে। আমরা ধ্বংস হবো না, কারণ আমরা আমাদের দুর্বলতা সম্পর্কে বলতে ভয় পাই না। আমরা দুর্বলতা অতিক্রম করতে শিখতে পারবো।"

পার্টির ভিতরকার গণতন্ত্র এবং সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার সাহায্যেই খুঁজে বের করতে হয় ভুলের কারণ ও তার সংশোধনের পথ। বামপন্থী সংকীর্ণতার ফলে পার্টির ভিতরকার গণতন্ত্র অনেকখানি সংকুচিত হয়েছিল; সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার স্থান খুব কমই ছিল; সংগঠনের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিকতা দেখা দিয়েছিল। নূতন লাইনের জন্যে সংগ্রাম স্বভাবতই পার্টির ভিতরে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা প্রতিষ্ঠা করা, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার অস্ত্র ধারালো করা এবং আমলাতান্ত্রিকতাকে ধ্বংস করার সংগ্রামের সাথে যুক্ত হয়ে গিয়েছে।

কমিনফর্ম সম্পাদকীয় এবং তার উপর পলিট-ব্যুরোর প্রস্তাব আসার পরও অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের নিকট কমিনফর্ম সম্পাদকীয় প্রবন্ধের সম্যক বিপ্লবী তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয়ে

উঠেনি। তার জন্যেই, প্রাদেশিক কমিটির নিজস্ব মতামত পার্টি সভ্যদের নিকট উপস্থিত করতে যথেষ্ট দেরি হয়েছে। ইতিমধ্যে আমাদের পক্ষ থেকে এমন কোন কোন দলিল বা লেখা প্রকাশিত হয়েছে, নেতৃস্থানীয় কমরেডরাও অনেক সময় এমন অনেক মতামত প্রকাশ করেছেন যার মধ্য দিয়ে একথাই সুস্পষ্ট হয়েছে যে নূতন লাইন তৈরি করার সংগ্রাম সবেমাত্র শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পরও যেমন অনেক দলিলপত্র ও কাজকর্মে দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদ অনেকদিন পর্যন্ত থেকে গেছে, ঠিক তেমনি এখনো আমাদের অনেক দলিলপত্র বা কাজকর্মে বামপন্থী সংকীর্ণতা থেকে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। একমাত্র সমস্ত পার্টি সভ্যের সতর্ক দৃষ্টিই তার সংশোধন করতে প্যারে। ৩নং ছাত্র সংগঠক অথবা ১৬ নং প্রোসেক্ট সার্কুলারে বামপন্থী সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের বলিষ্ঠ আহ্বান নেই বলে যাঁরা সমালোচনা করেছেন তাঁদের সমালোচনা অনেকখানি ঠিক। দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদীদের ভেদ-নীতির বিরুদ্ধে সমগ্র পার্টিকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে, পার্টির প্রত্যেক সভ্যকে পি-বি বিবৃতির উপর নির্ভয়ে আলোচনা ও সমালোচনা শুরু করতে বলার উদ্দেশ্যেই ১৬ নং প্রোসেক্ট সার্কুলার লিখিত হয়েছিল। কিন্তু বামপন্থী সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে প্রধান গুরুত্ব না দেবার ফলে—ঐ সার্কুলারের উদ্দেশ্য অনেকখানি ব্যর্থ হয়েছে।

পলিট-বুরো সম্প্রতি এক নূতন বিবৃতি প্রকাশ করেছেন। এই বিবৃতি নিয়ে আলোচনা করা, একে কমিনফর্ম সম্পাদকীয় এবং মার্কসবাদ- লেনিনবাদের আলোতে পরীক্ষা করে দেখাই হবে আমাদের এখন প্রধান কর্তব্য। প্রত্যেক পার্টি-ইউনিট এই দলিলের উপর আলোচনা শুরু করুন। খোলাখুলি আলোচনার জন্যে প্রাদেশিক কমিটি থেকেও একটি 'ফোরাম' বের করা হচ্ছে, এই দলিলের উপর নিজেদের মতামত সেখানে প্রকাশ করুন।

প্রাদেশিক কমিটি পলিট-বুরোর প্রথম বিবৃতির উপর যে মতামত প্রকাশ করেছেন—তা তাঁদের প্রাথমিক মতামত মাত্র। প্রাদেশিক কমিটি তাঁদের গত দু'বছরের কাজের সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা করবেন। এ কাজে প্রত্যেক পার্টি ইউনিট প্রাদেশিক কমিটিকে নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন। প্রাদেশিক কমিটির সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা সমস্ত পার্টি সভ্যদের নিকট উপস্থিত করা হবে এবং সে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার ভিত্তিতে যে সকল রাজনৈতিক ও সাংগঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন তা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। একাজ আমরা যত তাড়াতাড়ি করতে পারবো, কমিনফর্মের সম্পাদকীয় এবং মার্ক্সবাদ-লেলিনবাদের উপর যত তাড়াতাড়ি আমরা সমগ্র পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারবো—তত তাড়াতাড়ি ভেদপন্থীদের পরাস্ত করে বর্তমান ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমরা আমাদের বিপ্লবী দায়িত্ব পালন করতে পারবো।

সার্কুলার নং ১৮

৪ মে ১৯৫০

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

সংকীর্ণতাবাদী হঠকারী লাইনের বিরুদ্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির আত্মসমালোচনা—১৯৫০

বাংলায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নতুন স্তর

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হবার পর বাংলায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলন একটি নতুন স্তরে প্রবেশ করে।

জমিদার, জোতদার ও মুষ্টিমেয় একদল বৃহৎ শিল্পপতি এবং বৃহৎ ব্যবসায়ীর সহায়তায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই বাংলায় তাদের শোষণের রাজত্বকে আরো কয়েকশো গুণ শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করেছিল। মুদ্রাস্ফীতি, যুদ্ধকালীন ঠিকাদারি আর কালোবাজারিকে কাজে লাগিয়ে বাংলার দরিদ্র মানুষকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল আরো দারিদ্র্যের মুখে, ধ্বংস করা হয়েছিল ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়ী সংস্থাগুলিকে এবং মুষ্টিমেয় জাতীয়তা-বিরোধী, সমাজবিরোধী বৃহৎ মুনাফাবাজদের পুষ্ট করে তাদের আরো স্ফীতকায় করে তোলা হয়েছিল। দুর্ভিক্ষে বাংলার ত্রিশ লক্ষ মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। লক্ষ লক্ষ নিরন্ন চাষী নিজেদের জমি-জিরেত লোলুপ জমিদার আর জোতদারদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হল। দিনযাপনের খরচে ৪০০ শতাংশ বৃদ্ধি সরাসরি আঘাত করল শহরের শ্রমজীবী শ্রেণি ও খেটে-খাওয়া মধ্যবিত্তের দরিদ্রতম অংশটিকে। বাংলার সমগ্র অর্থনীতি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তার ভিত কেঁপে উঠল, কয়েক কোটি মানুষের জীবনে অনাহার আর আশ্রয়হীনতার অন্ধকার নেমে এল। শুধুমাত্র বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী আর তাদের শাকরেদরা অর্থাৎ মুষ্টিমেয় জমিদার, জোতদার আর বৃহৎ শিল্প-মালিকরা এই ঘোর বিপর্যয়ে দুহাতে মুনাফা লুটতে লাগল।

কিন্তু ঐ সময়েই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক শিবিরের ঐতিহাসিক বিজয়ে বাংলায় এক নতুন বিপ্লবী তরঙ্গের সৃষ্টি হল। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন আরো তীক্ষ্ণ হল; কি শহরে কি গ্রামে সে আন্দোলন আরো অনেকগুণ তীব্র হল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মানুষের ক্রোধ আর ঘৃণার স্বতস্ফূর্ত বিস্ফোরণ হল—আই এন এ বন্দীদের মুক্তির দাবিতে সংগঠিত বিক্ষোভ, রসিদ আলি দিবসের ব্যারিকেডে, ভিয়েতনাম দিবসে রাজপথের রণাঙ্গনে। ২৯শে জুলাই-এর সাধারণ ধর্মঘটের শ্লোগানে কেঁপে উঠল ব্রিটিশ একচেটিয়া কারবারী—ক্লাইভ স্ট্রীটের সার সার অফিস। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নেতা হিসেবে আরো সুস্পষ্ট চেহারায় শ্রমজীবী শ্রেণির উত্থান ঘটল।

তেভাগার দাবিতে সংগঠিত মহান সংগ্রামে জমিদার-জোতদারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কৃষক

সমাজের গণ-বিদ্রোহ আপনার আত্মপ্রকাশের ভাষা খুঁজে পেল। উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় প্রায় ৬০ লক্ষ কিষাণ এই সংগ্রামে সামিল হয়েছিল। ময়মনসিংহের পাহাড়ী এলাকায় এবং অন্যান্য অঞ্চলে তেভাগার দাবিতে আর 'টংক' প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, হাওড়ায় সামন্ততান্ত্রিক জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে, সিলেটে 'নানকর' প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, বর্ধমানে ক্যানাল-কর-এর বিরুদ্ধে, মেদিনীপুরে দুর্ভিক্ষ-ঋণ পরিশোধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সংগঠিত হল। এইরকম অনেক জায়গায় এই কৃষক অভ্যুত্থান পুলিশ এবং মিলিটারীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ নিয়েছিল।

বেহালা ক্যাম্পে বায়ুসেনাদের একাংশ বিদ্রোহ করেছিল এবং আর আই এন ধর্মঘটীদের সমর্থনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল। প্রয়োজনীয় সাহায্য ও নির্দেশের প্রত্যাশায় তারা কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে এসেছিল। প্রতিপক্ষীয় কংগ্রেস, লীগ এবং বামপন্থী মতাদর্শ নির্বিশেষে সশস্ত্র সেনাবাহিনীর সমস্ত পদমর্যাদার সৈন্যরা ব্রিটিশ প্রভুদের বিরুদ্ধে একজোটে রুখে দাঁড়িয়েছিল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিল যে, পুরোনো ধাঁচে আর বেশিদিন তাদের পক্ষে এই দেশকে শাসন করা সম্ভব হবে না। তাই তারা নয়া কৌশল নিল—ভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণি আর জমিদারদের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসার কৌশল, যেখানে তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব কায়েম রাখতে শেষোক্ত শ্রেণিকে বেশ একটা পর্দার মতো ব্যবহার করা যায়।

সারা ভারতে কংগ্রেসী রাজত্বে

নিরাপত্তার বলি

১৫ই অগাস্ট ১৯৪৭ হইতে ১লা অগাস্ট ১৯৫০ পর্যন্ত

♦ গুলি চলিয়াছে—	১,৯৮২ বার
♦ নিহতের সংখ্যা—	৩,৭৮৪ জন
♦ আহত ও পঙ্গু—	১০,০০০ জন
♦ জেলে আটকের সংখ্যা—	৫০,০০০ জন
♦ নারীহত্যা একমাত্র পশ্চিমবাংলায়—	৪৭ জন
♦ ৪০টি সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ	

নিজেদের পক্ষে সম্পূর্ণ সুবিধাজনক এমন শর্তে একটা সমঝোতায় পৌঁছোবার জন্য 'চাপ' প্রয়োগের অস্ত্র হিসেবে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সেই অতি পুরোনো খেলা, হিন্দু-মুসলিমের দাঙ্গাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করল। ব্রিটিশের হাতের পুতুল লীগ মন্ত্রিসভার প্রত্যক্ষ সহায়তায় ১৯৪৬ সালে বাংলায় যে দাঙ্গা হয়েছিল, তা ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা দেশে আর এইভাবে ভারত-ভাগের একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছিল। হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের আর মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের খেপিয়ে তুলে দখলদারির শাসন বজায় রাখার পুরোনো সাম্রাজ্যবাদী কৌশল একেবারে নতুন চেহারায় ঢেলে সাজাবার চেষ্টা চললো—'হিন্দুস্তান' আর 'পাকিস্তান' এই দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের নামে দুপক্ষকেই পরস্পরের বিরুদ্ধে এমনভাবে উত্তেজিত করে রাখা হল যাতে সাম্রাজ্যবাদীদের রাজনৈতিক, আর্থিক এবং মিলিটারী প্রভুত্বকে একটুও নষ্ট হতে না দিয়ে উভয় রাষ্ট্রের ওপরেই তা কায়েম রাখা যায়।

একদিকে ভারতীয় জনসাধারণের বৈপ্লবিক ক্রোধ, সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শিবিরের শক্তিবৃদ্ধি, চীনা বিপ্লবের বিজয়সূচক অগ্রগতি, আর অন্যদিকে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের লোলুপ দৃষ্টি—এই দ্বিমুখী বিপদ থেকে নিজেদের বাঁচাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা মাউন্টব্যাটেন ছক সাজাল। এটা এমন এক পরিকল্পনা যাকে ভারতের দেশীয় বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দ বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা 'স্বাধীনতা'-র ছক হিসেবে পরম আহ্লাদে গ্রহণ করলেন।

মাউন্টব্যাটেনের দেওয়া 'পুরস্কার'-এর ফলস্বরূপ বাংলাভাগ আর সাথে সাথে দাঙ্গা, অর্থনৈতিক সংঘাত— বাংলার মানুষের জীবনের সংকট আরো আরো সুতীব্র হয়ে উঠলো।

ব্রিটিশ এবং মারোয়াড়ি-গুজরাটি পুঁজিপতিরা তাদের যুদ্ধকালীন মুনাফার পর্বতপ্রমাণ হার বজায় রাখার জন্য লোক ছাঁটাই করে, বেতন কমিয়ে একেবারে সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু করল।

দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ একটি বিরাট সমস্যা হিসাবে দেখা দিল এবং সমস্ত বাংলাভাষী অধ্যুষিত এলাকাকে একটিমাত্র সীমানার মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করার দাবি আরো ব্যাপক ও জনপ্রিয় হয়ে উঠল। বাঙালীর অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য তার জাতিসত্তাগত ন্যায়সঙ্গত দাবির প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বাধাদানকারী ভূমিকায় সমস্ত শ্রেণির বাঙালীর মধ্যে গভীর কেন্দ্র-বিরোধী মনোভাব তৈরি হল।

পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকার সম্পর্কে তখন মানুষের দ্রুত মোহমুক্তি ঘটছে। ব্রিটিশ পুঁজিকে বাজেয়াপ্ত করার পরিবর্তে, এই সরকার বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং অন্যান্য শিল্পে তাদের আরো বিনিয়োগের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করল। ব্রিটিশ মালিকানাধীন কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর বিপুল মুনাফাকে আরো সুবিপুল করার জন্য তারা ট্রাম-ভাড়া বৃদ্ধিতে সম্মত হল।

যুদ্ধের আড়াই বছর পরে বাংলায় প্রায় ৬০ লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘটে সামিল হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ছাঁটাই-বিরোধী ধর্মঘট এবং কাপড়-কল (বাসন্তী, শ্রীদুর্গা ইত্যাদি), পাটকল এবং ইঞ্জিনীয়ারিং (শালিমার) কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘটের ওপর আই এন টি ইউ সি-র গুণ্ডাবাহিনী এবং কংগ্রেস সরকারের পুলিশ পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছিল।

জমিদার আর কালোবাজারিদের শোষণকে মদত দেবার জন্য কংগ্রেস সরকারের নির্দেশে বড়া কমলাপুর এবং ডোঙাজোড়ায় অসংখ্য কৃষককে গুলি করে মারা হল।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে ঘোষিত হল যে, দেশের মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া এই 'স্বাধীনতা' মিথ্যা।

এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কংগ্রেস আর লীগ নেতাদের লেজুড়বৃত্তির সংশোধনী পথ পার্টি পরিত্যাগ করল এবং সরাসরি বিশ্বাসঘাতক কংগ্রেস আর লীগ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে শ্রমিক এবং মেহনতী মানুষের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে লাগল।

ভারতবর্ষে, ব্রিটিশ পুঁজিবাদের প্রধান ভিত্তি হল পশ্চিমবঙ্গ। চীনে এবং সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাতীয় মুক্তি-বিপ্লবের অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতিতে ভীত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কংগ্রেস সরকার মারফৎ নিরাপত্তা আইন জারি করিয়ে বাংলার গণ-আন্দোলনকে আঘাত করল। ব্রিটিশের জারি করা যুদ্ধকালীন 'আটক' আইনের ঘৃণ্য ব্যবস্থাগুলো এই নিরাপত্তা আইনের ছত্রেছত্রে লেখা ছিল। পুলিশী দমনপীড়ন আর আই এন টি ইউ সি এবং সোস্যালিস্ট নেতাদের

গুণ্ডামীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, ১৯৪৮ সালের ৮ই জানুয়ারি, প্রাদেশিক টি ইউ সি-র আহ্বানে এক লক্ষ শ্রমিক এই কালা আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-ধর্মঘটে সামিল হয়েছিল।

শ্রমজীবী শ্রেণি এবং সাধারণ মানুষের ওপর পার্টির ক্রমবর্ধমান প্রভাব, কৃষক ও শ্রমজীবী শ্রেণির মধ্যে ঐক্যের সম্প্রসারণ—এসবে আতংকিত নেহরু-বি সি রায় সরকার তার ইঙ্গ-আমেরিকান প্রভুদের আদেশমতো ১৯৪৮ সালের ২৬শে মার্চ পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করল।

যে ঘটনাবলী থেকে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছিল

দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে আন্তঃপার্টি প্রচারের কর্তব্য ঠিকমতো শুরু করার আগেই পার্টির ওপর এই আঘাত নেমে এল। শ্রমজীবী শ্রেণি ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে পার্টির যোগসূত্র ছিন্ন করতে সাম্রাজ্যবাদ সর্বশক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। গুণ্ডা এবং দালালদের যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে, দমনপীড়নকে তীব্রতর করে সে শ্রমজীবী শ্রেণির সংগ্রামকে সমূলে বিনাশ করতে চাইলো। এই নীতির নগ্ন বহিঃপ্রকাশের সাক্ষী হয়ে রইল গ্যাস, পটারী, ট্রাম আর ব্রুকবণ্ডের শ্রমিকদের মধ্যে গড়ে ওঠা লালঝাণ্ডার কেন্দ্রগুলি।

পার্টি সদস্যদের একাংশ প্রশ্ন তুলতে শুরু করল "বিপ্লবের শক্তিগুলি বিকশিত হচ্ছে, না কি ফ্যাসীবাদ জিতছে?"

এই প্রশ্ন উঠেছিল কেননা 'স্বাধীনতা' সম্পর্কে বাগাড়ম্বর থেকে তৈরি করা সংশয়, সোস্যালিস্ট এবং আই এন টি ইউ সি নেতৃত্বের বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা এবং সর্বত্র শ্বেত সন্ত্রাসের পরিস্থিতি—এইসব কারণে পার্টির ওপর চাপানো নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে গণ-প্রতিবাদ সংগঠিত করা সম্ভব ছিল না। অনেক কমরেড পার্টি কংগ্রেসের থিসিসের মধ্যে তাঁদের সমস্ত প্রশ্ন ও সংশয়েরই উত্তরসন্ধান করেছিলেন কিন্তু সেখানে কোনো সন্তোষজনক সমাধান পাননি, ফলে তাঁরা হতাশ হয়েছিলেন। তাঁদের এ মনোভাব কিন্তু বেশিদিন টেকেনি। এপ্রিলের শেষে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ মহিলাদের জঙ্গী বিক্ষোভ এবং এই বিক্ষোভের প্রতি সাধারণ মানুষের স্বতস্ফূর্ত সমর্থন, তাঁদের হারানো বিশ্বাস আবার ফিরিয়ে আনলো।

কলকাতার ছাত্র আর মেহনতী মানুষের কাছে সংগ্রামের এক নতুন তরঙ্গের সংকেত ছিল ১৯৪৮ সালের মে দিবসের মিছিলে। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন এবং বামপন্থী পার্টির যুক্ত আহ্বানে ৫০০০০ কর্মচারী ও মেহনতী মানুষের মিছিলে ২৯শে জুলাই-এর বর্ষপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপিত হল। ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের শ্রমিকরা এবং অমৃতবাজার, আর যুগান্তর অফিসের কর্মচারীদের দুর্দমনীয় ধর্মঘট সংগ্রাম সেপ্টেম্বরে, সশস্ত্র ওয়াচ এ্যাণ্ড ওয়ার্ড বাহিনীর গুর্খা ধর্মঘটীদের সমর্থনে এগিয়ে এল ১৭০০০ বন্দর শ্রমিক। স্কুল ও কলেজের ২০০০০ ছাত্রছাত্রী সৌভ্রাতৃত্বসূচক ধর্মঘট করে বন্দর শ্রমিকদের সংহতি জানালো। রেশন বন্টনে অব্যবস্থার বিরুদ্ধে ডাকা আলমবাজার জুট শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট সশস্ত্র পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যারিকেড যুদ্ধের রূপ নিল। পুলিশের বিভিন্ন স্তরেও অসন্তোষের চিহ্ন দেখা গেল। এমনকি সোস্যালিস্ট পার্টি নেহরু সরকারের কাছে 'শিল্প-শান্তি' বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েও নিজের প্রভাব হারানোর ভয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং এবং ট্রাম-শ্রমিকদের প্রতীক-ধর্মঘট ডাকতে বাধ্য হল। ট্রাম-শ্রমিকদের এই 'প্রতীক' ধর্মঘটকে সমস্ত মতবাদের শ্রমজীবী মানুষ, শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তার

আর প্রতারণার বিরুদ্ধে সংগঠিত এক শক্তিশালী, জোটবদ্ধ এবং জঙ্গী সংগ্রামে রূপান্তরিত করল। পুলিশের সঙ্গে অসংখ্য সংঘাতের ঘটনা ঘটতে লাগল। এর ফলে জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে গণসংগ্রাম তীক্ষ্ণতা লাভ করল এবং সেই সংগ্রাম বারেবারে হিংসাত্মক সংঘর্ষের রূপ নিচ্ছিল, ফলে পার্টি নেতৃবৃন্দও বারেবারে এ প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছিলেন যে, আমাদের স্পষ্ট কর্মসূচী ও কৌশলটা তাহলে কীরকম? দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক দলিল এবং আলোচনার ভিত্তিতে নেতৃত্ব এই বিষয়ে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন।

একথা সত্যি যে, মৌলিক এবং তাত্ত্বিক দুই বিচারেই বিপ্লবের স্তর, বুর্জোয়াদের ভূমিকা, কৃষকদের শ্রেণিচরিত্র বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ে পার্টি কংগ্রেসের থিসিসের ভুল তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকে সে সময়ের নেতৃবৃন্দ চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেননি। কিন্তু প্রতিটি দিনের যে সংগ্রাম তার সুনির্দিষ্ট বাস্তব অভিজ্ঞতা, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের প্রাথমিক সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক সূত্রায়নে সঠিক পথে চলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কৌশল সংক্রান্ত প্রোজেক্ট সার্কুলার নং ৫, 'গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট এবং বামপন্থী পার্টিসমূহ' শীর্ষক কমরেড রবির প্রস্তাবনা, কমরেড গোরা ও বলাই-এর ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়ক প্রস্তাব, কমরেড নন্দনের ছাত্র সংগ্রাম সংক্রান্ত সার্কুলার প্রাদেশিক ছাত্র কেন্দ্রের নামে জারি করা হয়েছিল; কমরেড রবির প্রথম খসড়া রচনা, 'বাংলার কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদের বিকাশ'—এই সমস্ত দলিল দক্ষিণ ও বামপন্থী সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেকটাই সঠিক দিকনির্দেশ দিয়েছিল।

'গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট এবং বামপন্থী পার্টিসমূহ' শীর্ষক প্রস্তাবে মৌলিক সূত্রায়ন করা হয়েছিল যে, প্রথমে গ্রামাঞ্চলেই ক্ষমতা দখল করতে হবে, গড়ে তুলতে হবে মুক্তিবাহিনী এবং মুক্তাঞ্চল—মুক্তিবাহিনী শহরাঞ্চলকে দখল করে নেওয়ার মত, অবস্থায় না আসা পর্যন্ত শহরে শ্রমজীবী শ্রেণিকে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলতেই হবে; চীনের পথেই দেশের মুক্তি, রাশিয়ার পথে নয়। তদানীন্তন প্রাদেশিক কমিটির দু-একজন সামনের সারির নেতারা যদিও এর বিরোধী ছিলেন কিন্তু তবুও প্রাদেশিক কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য একে সমর্থন করেছিলেন।

ট্রেড ইউনিয়ন-সংক্রান্ত প্রস্তাবের মধ্যে যদিও অনেক দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী সূত্রায়ন ছিল, তবুও শ্বেত সন্ত্রাসের পরিস্থিতিতে 'আঘাত করো এবং পালাও'—এই জাতীয় নমনীয় কৌশল-এর কথা চিন্তা করা হয়েছিল।

এর অল্প কদিন পরে 'কৌশল এবং তত্ত্ব' বিষয়ে পলিটব্যুরো ট্রটস্কির পথ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু দলিলটি পার্টি-সদস্যদের হাতে পৌঁছোবার অনেক আগেই, পশ্চিমবঙ্গের পার্টি নেতৃত্বকে ঢেলে সাজাবার প্রশ্নে পলিটব্যুরো হস্তক্ষেপ করেছিল। পুলিশের এজেন্ট অনন্ত সিংহ ও তার সমর্থক এস কে আচার্য্যকে বহিষ্কারের মধ্য দিয়ে পলিটব্যুরোর এই কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হয়। কমরেড রবি ও পলিটব্যুরো তাদের দলিলে প্রমাণ করে যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে পরিত্যাগ করে দেন এবং যোশিপন্থী সংস্কারবাদের পক্ষে নিমজ্জিত হয়েছে। পলিটব্যুরোর দলিলে 'সংশোধনবাদ'-এর মুখোশ পার্টির সর্বস্তরের সামনে খুলে দেওয়া হয়েছে। পলিটব্যুরোর কাছে কমরেড মল্লিকের দেওয়া রিপোর্টে আরো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, তদানীন্তন ও বর্তমান প্রাদেশিক কমিটি বিচ্যুত হয়ে সংগ্রাম বিরোধী, মেহনতী শ্রেণি বিরোধী এক আমলাতন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

কমরেড রবি এবং মল্লিকের দলিলের ভিত্তিতে পলিটব্যুরো পশ্চিমবঙ্গ কমিটি বিষয়ে তাদের প্রস্তাব তৈরি করেছিল এবং সেই প্রস্তাবের ভিত্তিতে নতুন প্রাদেশিক কমিটি গঠন করেছিল।

এই পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় কোন্ সত্য উন্মোচিত হল? দেখা গেল যে, কমরেড মল্লিকের রিপোর্টে যে দুজন কমরেড অর্থাৎ কমরেড নিতাই আর কমরেড সূর্য্য সংশোধনবাদী এবং আমলাতান্ত্রিক হিসেবে কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছেন, তাঁরাই প্রাদেশিক কমিটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। নতুন প্রাদেশিক কমিটিতে তাঁদের বাছাই করার সময় পলিটব্যুরো কোনো ধারাবাহিক নীতি কিংবা কোনো গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করেনি।

৩০.৪.৪৯ তারিখে 'পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি পুনর্গঠন সংক্রান্ত প্রস্তাব'-এ পলিটব্যুরোর সুবিধাবাদী এবং নীতিহীন পদ্ধতিগুলি অনাবৃত হয়ে পড়েছিল। নিতাই এবং সূর্য্য সম্পর্কে এই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল "অনেক ভুল করা সত্ত্বেও এঁরা যে অতিদ্রুত নিজেদের মানসিকতার উন্নতি ঘটাবেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের দোদুল্যমান অবস্থানকে কাটিয়ে তুলতে পারবেন সে বিষয়ে পলিটব্যুরোর নিশ্চিত বিশ্বাস রয়েছে"।

এই 'দোদুল্যমান' কমরেডদের পুরোপুরি বিশ্বাস করা একেবারেই উচিত নয়, পলিটব্যুরো একথা বলে সাবধান করেছিল। পি বি লিখেছিল, "যে পার্টিতে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে পেটিবুর্জোয়া লোকজন দখল করে বসে আছে, সেই পার্টি কোনোদিন বুর্জোয়া শাসনের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারে না—এটা মার্ক্সবাদের অ-আ-ক-খ"।

এইভাবে পলিটব্যুরো প্রথমে প্রাদেশিক কমিটিতে 'সংশোধনবাদী'-দের অন্তর্ভুক্ত করল; তারপর একটা হুঁশিয়ারি জারি করল যে, কখনোই এদের বিশ্বাস করে "গুরুত্বপূর্ণ পদ" দেওয়া উচিত নয় এবং শেষে বলল, "আমাদের সংশোধনবাদী অতীতের বিরুদ্ধে কঠোর এবং একরোখা লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। নতুন প্রাদেশিক কমিটিতে গোপেনদাসহ তিনজন শ্রমিক কমরেড এই সংশোধনবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করবেন"।

কী কী 'সংশোধনী' প্রবণতার বিরুদ্ধে তাদের লড়াই করতে হবে? মানুষের গণতান্ত্রিক মতামত অনুসরণের অজুহাতে কিংবা সংকীর্ণ, বিচ্ছিন্নতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করার অজুহাতে বুর্জোয়াদের লেজুড়বৃত্তি করার যে-কোনো ধরনের প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। এই ধরনের 'গণতান্ত্রিক' ও 'অ-সংকীর্ণ' প্রবণতার বিরুদ্ধে শ্রমিক কমরেডরা ও গোপেনদা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রাম করবেন এই আশা পলিটব্যুরো পোষণ করেছিল।

সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে 'রক্ষাকবচ'-এর কিন্তু এখানেই শেষ নয়। প্রস্তাবে আরো বলা হয়েছে, "যদি এঁদের মধ্যে কাউকে (অর্থাৎ প্রাদেশিক কমিটির সদস্যদের) তার কাজের পক্ষে অদক্ষ কিংবা অনুপযুক্ত বলে মনে হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাদ দিতে হবে"।

প্রাদেশিক কমিটিতে পেটি-বুর্জোয়া দোদুল্যমানদের কোনো স্থান নেই; অবশ্য পলিটব্যুরো একটু নরম হয়ে তাঁদের কাউকে জায়গা দিয়েছে, কিন্তু সেক্ষেত্রে শ্রমিক কমরেডদের দিয়ে তাঁদেরকে 'বন্দী' করে রাখতে হবে এবং নতুন প্রাদেশিক কমিটির বিরুদ্ধে বাইরে যাতে কোনো সমালোচনার স্বর না শোনা যায় সে কারণে এটা করা হয়। পলিটব্যুরোর বক্তব্য হল, "পার্টি সদস্যদের একাংশের মধ্যে নতুন প্রাদেশিক কমিটির দোষ ধরে বেড়ানোর প্রবণতা দেখা যাবে। সাধারণভাবে সেইসব পেটি-বুর্জোয়া সুবিধাবাদীদের মধ্যেই এই ঝোঁক দেখতে পাওয়া যাবে, যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি শ্রমিকশ্রেণি বিরোধী, এবং যাঁরা মনে করেন যে, বুদ্ধিজীবী শ্রেণিই হল

সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। পার্টির কাজকর্মে অন্তর্ঘাত ঘটানোই এদের একমাত্র কাজ। .... এই প্রবণতার মুখোশ খুলে ফেলতে হবে"।

"যে-কোন ব্যক্তি যদি নতুন প্রাদেশিক কমিটির প্রতি কেবল শত্রুতামূলক আচরণ করেন, যদি তিনি সর্বশক্তি দিয়ে নতুন প্রাদেশিক কমিটির কাজকে সাহায্য না করেন এবং পার্টিকে বর্তমান সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য না করেন তাঁকে অবশ্যই একজন অন্তর্ঘাতী হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে।" "গোপন ধ্বংসাত্মক পদ্ধতি, বিশৃঙ্খল কার্যকলাপ ইত্যাদি যে কোনো উপায়ে যে পার্টি শৃঙ্খলাকে দুর্বল করে দেবে, সে হল পার্টির শত্রু।"

এইভাবে, একেবারে শুরু থেকেই সমস্ত সমালোচনা আর আত্মসমালোচনার গলা টিপে ধরা হল। নতুন প্রাদেশিক কমিটির প্রথম সভায় কমরেড রণদিভে তঁর উদ্বোধনী ভাষণে কময়েড নিতাই ও সূর্য্যকে শাণিত ভাষায় আক্রমণ করলেন (নতুন প্রাদেশিক কমিটিতে নিজের নাম অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে আপত্তি তোলার জন্য কমরেড নিতাইকে আর কমরেড সুর্যকে তাঁর 'সংশোদনবাদী' এবং 'আপসমুখী' প্রবণতার জন্য)। কমরেড নন্দনকে তাঁর মার্ক্সবাদ-লেলিনবাদের বিষয়ে অজ্ঞতার জন্য হাস্যাস্পদ করা হল। কমরেড রণদিভে নিজেই প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের নাম প্রস্তাব করলেন। প্রাদেশিক কমিটির এই প্রথম সভায় (১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে) সাধারণ সম্পাদক নতুন প্রাদেশিক কমিটিকে "ব্যাখ্যা"ও করে দিলেন যে, মার্চের ৯ তারিখের আসন্ন রেল ধর্মঘট কেমন করে ক্ষমতা দখলের জন্য বিপ্লবী সংগ্রামে পরিণত হবে।

প্রাদেশিক কমিটির একাংশের গায়ে 'সংশোধনবাদী' ছাপ লাগিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অন্যদের মধ্যে সন্দেহ জাগিয়ে তোলার নীতিহীন কৌশল, অযোগ্যতা সত্ত্বেও পেটি-বুর্জোয়া ব্যক্তিদের প্রাদেশিক কমিটিতে স্থান দিয়ে মহানুভবতা দেখানো এবং এইভাবে চূড়ান্ত নীতিহীনতায় পলিটব্যুরোর সাংগঠনিক "পুনর্গঠন" প্রক্রিয়ার কি প্রভাব পড়লো নতুন প্রাদেশিক কমিটির ওপর?

একদিকে প্রাদেশিক কমিটিতে নানারকম রাজনৈতিক প্রবণতার একটা সুবিধাবাদী জোট গড়ে উঠলো এবং কোনো বিষয়ে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। অন্যদিকে, সমালোচনা, আত্মসমালোচনার কোনো জায়গাই রইলো না আর তার পদলে প্রাদেশিক কমিটির সদস্যদের মধ্যে পলিটব্যুরোর প্রতি একটা দাসত্বের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠলো। এই পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নিয়ে পলিটব্যোর কমিটির রাজনৈতিক পার্থক্যের 'মীমাংসা' করার নামে, একে 'একত্রিত' করার নামে, প্রাদেশিক কমিটির প্রতিদিনকার কাজকর্মে নাক গলাতে শুরু করল। সাধারণ সদস্যদের বিরুদ্ধে এবং তাদের সন্ত্রস্ত করে তোলার কাজে সবসময় প্রাদেশিক কমিটির পক্ষাবলম্বন করে পলিটব্যুরো একটা কাজে সফল হল, প্রাদেশিক কমিটিকে তাদের সমস্ত ভুলত্রুটি সম্বন্ধে অন্ধ করে রাখলো। একদিকে মার্ক্সবাদ বোঝার ক্ষেত্রে দুর্বলতা আর নিজেদের পেটি-বুর্জোয়াসুলভ অহমিকা, অন্যদিকে হীন দাসত্ববোধ, এর ফলেই প্রাদেশিক কমিটির সদস্যরা পলিটব্যুরোর পরিকল্পনা মতো উপযুক্ত এবং বাধ্য শিকারে পরিণত হয়েছিল। এইভাবে জন্মলগ্ন থেকেই নতুন প্রাদেশিক কমিটি পলিটব্যুরোকে তার ট্রটস্কীয় নীতি এবং টিটো-অনুসারী আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতি অবাধে চালিয়ে যাবার একটা ফলপ্রসূ ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছিল।

এর মধ্যেই, কমরেড রবি, গৌর এবং অবশ্যই পুরোনো প্রাদেসিক কমিটির সমস্ত সদস্যরা পলিটব্যুরোর "রণনীতি ও কৌশল" নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিলেন এবং এর বিরুদ্ধে সমালোচনার একটা আওয়াজও ওঠেনি।

বরং এর বিপরীতে, কমরেড রবি কলকাতার জঙ্গী ছাত্র বিক্ষোভ (জানুয়ারি ১৯৪৮)-এর আলোচনায়, তার যে জনপ্রিয় গণ-অংশগ্রহণের চরিত্র যেমন, ব্যারিকেড করে লড়াই, ট্রাম-বাসে আগুন লাগানো ইত্যাদির কথা বলতে গিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, পলিটব্যুরোর লাইনের যাথার্থ প্রমাণিত হয়েছে এই ঘটনায় এবং ১৯০৫ সালের বিপ্লবের আগে রাশিয়ার যেমন অবস্থা ছিল, এখানকার অবস্থাও বর্তমানে তেমনই।

'অত্যাচার-বিরোধী সংগ্রাম কমিটি গঠন করো' এই শিরোনামে কলকাতার প্রতিটি পার্টি সদস্যের কাছে প্রচারিত প্রাদেশিক কমিটির সার্কুলারে (কমরেড নিতাই-এর খসড়া) তাদের উদ্দেশ্যে লেনিনের ১৯০৫ সালের ভাষায় আহ্বান জানানো হয়েছিল—"যেখানে যেভাবে পারেন সশস্ত্র হন।"

শহরে অভ্যুত্থান-এর জন্য অর্থহীন লড়াই

সর্বভারতীয় স্তরে পলিটব্যুরোর 'রণনীতি ও কৌশল' প্রয়োগের প্রথম প্রচেষ্টা করা হল মার্চের ৯ তারিখে ডাকা রেল ধর্মঘটের ঘটনায়।

'রেলের ধর্মঘট এবং আমাদের কর্তব্য' বিষয়ক ২৩শে ফেব্রুয়ারির সার্কুলারেতে পলিটব্যুরো স্পষ্ট ভাষায় নিশ্চিত করে দিয়েছিল যে, পরিস্থিতি এখন 'ক্ষমতা দখল'-এর মুখে, ১৯০৫ সালের বিপ্লবের আগে রাশিয়ায় ঠিক যেমনটি হয়েছিল। সার্কুলারে বলা হয়েছিল যে, আসন্ন ধর্মঘট বাস্তবে ক্ষমতা দখলের বিপ্লবী লড়াই ছাড়া আর কিছু নয়। এর মাধ্যমে তেলেঙ্গানার মতো অসংখ্য মুক্তাঞ্চল তৈরি হবার সম্ভাবনা রয়েছে এবং অসংখ্য শহরে প্রতিষ্ঠিত হবে 'মজদুর-কিষাণ রাজ'। পলিটব্যুরোর মতানুসারে, এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজন হল, সময় থাকতেই সংঘাতের ক্ষেত্রগুলি সংগঠিত করা, পুলিশকে ব্যস্ত রাখা, পুলিশ এবং মিলিটারীকে বিপ্লবের সপক্ষে নিয়ে আসা, সরকারের শক্ত ঘাঁটিগুলি দখল করার পূর্বপরিকল্পনা মজুত রাখা, সমস্ত কলকারখানার শ্রমিকদের একটি সাধারণ ধর্মঘটে সামিল করা আর সমস্ত দায়িত্বশীল পদ থেকে দোদুল্যমান এবং ভীতু সমস্ত লোকদের সরিয়ে দেওয়া। কেবলমাত্র সোস্যালিস্ট নেতারাই নন, সাধারণ সোস্যালিস্ট সদস্যরাও যদি ধর্মঘটের বিরোধিতা করেন তবে তাঁদেরও আক্রমণ করতে হবে। আত্মগোপনকারী পার্টি সদস্যদের গোপন ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং এই সংগ্রামে প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব দিতে হবে।

পলিটব্যুরোর এই সার্কুলারের প্রতিটি খুঁটিনাটিসহ উল্লেখ করা প্রয়োজন, কেননা প্রাদেশিক কমিটির পরিচালনায় পরবর্তী প্রায় প্রতিটি ধর্মঘট (কিংবা ধর্মঘটের প্রচেষ্টা), ৯ই মার্চের 'বিপ্লবী' উদ্দেশ্যকে মনে রেখে এবং সেই একই বিপর্যয়কর কৌশলগত লাইনকে অনুসরণ করেই সংগঠিত হয়েছে।

৯ই মার্চ তারিখের একপক্ষকালের অল্প কিছুদিন আগে পলিটব্যুরোর এই সার্কুলার নতুন প্রাদেশিক কমিটির হাতে আসে। তারপর থেকেই রেলের স্থানীয় নেতা এবং কর্মীদের ব্যাপক

ধরপাকড়ের ফলে শ্রমিকদের মধ্যে হ্যাণ্ডবিল বিলি করাও বস্তুতপক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। সন্ত্রস্ত রেলের শ্রমিকরা পার্টির ডাকা মিছিল-মিটিং থেকে দূরে থাকতো। সশস্ত্র সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘাতের সম্ভাবনায় এবং দমদমে RCPI সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য কমিউনিস্টরাই দায়ি এই মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে, রেলের শ্রমিকরা যত বেশি আতঙ্কিত ও হতোদ্যম হয়ে পড়তে লাগলো, প্রাদেশিক কমিটি বেপরোয়াভাবে ততো বেশি করে 'স্পেশাল স্কোয়াডের' ওপর, ছাত্র, মহিলা ইত্যাদি সংগঠনের বিক্ষোভ আন্দোলনের ওপর নির্ভর করতে লাগলো। অতএব পার্টির প্রায় সমস্ত স্তরের সমাবেশ সত্ত্বেও যে ৯ই মার্চের রেল ধর্মঘট সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে এতে অবাক হবার কিছু নেই।

পলিটব্যুরোর মতানুসারে, (৯ই মার্চের ঘটনা থেকে শিক্ষা বিষয়ক সাধারণ সম্পাদকের চিঠি) তিনটি কারণে এই ব্যর্থতা—নজিরবিহীন ফ্যাসিবাদী অত্যাচার, সোস্যালিস্ট নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতা এবং পার্টির অভ্যন্তরে দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদ। এই বিশ্লেষণের ভিত্তি করে প্রাদেশিক কমিটি তার পর্যালোচনায় (কমরেড নিতাইকৃত খসড়া), ৯ই মার্চের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে যে-সমস্ত কমরেড সামান্যতম সন্দেহের প্রশ্ন তুলেছিলেন, তাঁদের সকলকে 'ভীরু' এবং 'বিশ্বাসঘাতক' বিশেষণে অভিহিত করল। এইরকম প্রচ্ছন্ন হুমকি সত্ত্বেও অনেক কমরেড প্রাদেশিক কমিটি পর্যালোচনা মেনে নিতে পারলেন না কিংবা তার সঙ্গে কিছুতেই একমত হলেন না। তাঁরা এই ধর্মঘটের সিদ্ধান্তকে 'ভুল' বলে সমালোচনা করলেন এবং ৯ই মার্চের 'অ্যাকশন'-কে 'পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লব' হিসাবে চিহ্নিত করল। কিন্তু সাধারণ সদস্যদের কাছ থেকে শেখার চেষ্টা করার বদলে, প্রাদেশিক কমিটি তার অন্ধ ঔদ্ধত্যে তাঁদের সমালোচনাকে চেপে দিল এবং তাঁদের মুখ বন্ধ করে দিল। পুরোনো প্রাদেশিক কমিটি তার আমলাতান্ত্রিকতা সত্ত্বেও সময়ে সময়ে পার্টি সদস্যদের প্রশ্নোত্তর ('পার্টি আলোচনা' শিরোনামে প্রধানত কৃষক সমস্যা) প্রকাশ করতো। অন্যদিকে এই নতুন প্রাদেশিক কমিটি শৃঙ্খলাভঙ্গ করার শাস্তির ভয় দেখিয়ে সাধারণ সদস্যদের মুখ বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করল।

সমস্ত জেলা কমিটিগুলির উদ্দেশ্যে প্রচারিত ১৫ই এপ্রিল, '৪৯ তারিখের সার্কুলারে প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক বলেন, "মার্চের ৯ তারিখের পর থেকে বিশ্বাসঘাতকরা, শত্রুর গুপ্তচররা আর যোশিপন্থীরা পার্টির নেতৃত্ব এবং উচ্চতর কমিটিগুলোর বিরুদ্ধে মিথ্যা গুজব এবং কুৎসা ছড়াতে প্রচারাভিযানে নেমে পড়েছে...। আমাদের পার্টির সংশোধনবাদী অতীত এবং বহু পার্টি ইউনিটের বিরাট সংখ্যায় পেটি-বুর্জোয়াসুলভ প্রাধান্যের সুযোগ নিয়ে শ্রেণিশত্রুর দালালরা এমনকি পার্টির ভেতরেও পার্টি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা ছড়িয়ে চলেছে"। এই 'কুৎসাকারীদের' 'যথোচিত শাস্তি' দানের আহ্বান জানানো হয় সার্কুলারে।

কিন্তু এ কথার অর্থ এই নয় যে, পার্টির মধ্যে সত্যিকারের সংশোধনবাদী কেউ ছিল না এবং কেউ পার্টির নেতা ও উচ্চতর নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে কুৎসা ও মিথ্যা গুজব রটায়নি। পার্টির মধ্যে এমন অনেকে ছিল যারা পরিস্থিতির সুযোগ-সন্ধানে ফেরে। কিন্তু উপরোক্ত সার্কুলার যেভাবে ঢালাও এবং বল্গাহীন আমলাতান্ত্রিক নিন্দা করা হল, কেবল কুৎসাকারীরাই তার লক্ষ্যবস্তু ছিল না, বরং যে সমস্ত সৎ পার্টি সদস্যরা তাঁদের সত্যিকার দ্বিধা এবং প্রশ্নের ভিত্তিতে সত্যিকারের সন্দেহ ব্যক্ত করেছিলেন তাঁরাই ছিলেন আসল লক্ষ্য।

রেলের শ্রমিক এবং কর্মচারীদের মধ্যে যাঁরা ৯ই মার্চের কাজে যোগ দিয়েছিলেন এবং এই

ধরনের নানান 'দুর্বলতা' দেখিয়েছিলেন, সেই সমস্ত পার্টি সদস্যদের ওপর অত্যন্ত কঠোরভাবে শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হল। অনেককে অনির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেণ্ড করা হল এবং অন্যদের দায়িত্বশীল পদ থেকে একেবারে অপসারিত করা হল।

৯ই মার্চের বিতর্কের রেশ মেলাতে না মেলাতে আবার ২৭শে এপ্রিলের ঘটনা ঘটে গেলো। অনশন ধর্মঘটে সামিল হওয়া রাজনৈতিক বন্দীদের সমর্থনে এবং অত্যাচারের প্রতিবাদে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ১৪৪ ধারার অমান্য করে মহিলা বিক্ষোভ সমাবেশ সংগঠিত করেছিল। 'শ্বেত সন্ত্রাস'-এর আসল চেহারার সম্পর্কে আত্মপ্রসাদে অন্ধ প্রাদেশিক কমিটির নেতৃত্ব পুলিশ এবং গুণ্ডাদের অমানুষিক আক্রমণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিলেন। চারজন মহিলা কমরেড এবং দুজন তরুণ কমরেডকে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে মারা হল। রায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ক্রোধের বাঁধ ভেঙে গেল। বৌবাজার মেডিকেল কলেজ এলাকা একটা ছোটখাটো রণক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গেল। গাড়ীতে, ট্রামে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল, তৈরি হল ব্যারিকেড, রাস্তায় রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে দুদিন ধরে মুখোমুখি লড়াই চললো।

এইসব ঘটনা থেকে প্রাদেশিক কমিটি এই শিক্ষা নিল যে, সরকারি বাহিনীর সঙ্গে যেনতেন প্রকারেণ ছক কষে লড়াই বাধাতে পারলেই দ্রুত ক্ষমতা দখলের পথে এগিয়ে যাওয়া এখন সম্ভব হবে। প্রাদেশিক কমিটির এই সময়কার লিফলেট ও সার্কুলার (বেশির ভাগ লিফলেটের খসড়া কমরেড গৌরের লেখা) এই ধারণাই প্রতিফলিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ—২৯/৪/৪৯ তারিখে সার্কুলারে (কমরেড গৌরের লেখা) বলা হল, "এমনভাবে শ্রমিকদের রাগ জাগিয়ে তোলো যাতে তারা এক্ষুনি কারখানার দালালদের পিটতে শুরু করে, অত্যাচারী ম্যানেজারদের 'ঘেরাও' করে এবং কংগ্রেসী নেতা আর কংগ্রেস সেবাদল কর্মীদের নিগ্রহ করে....। শ্রমিকদের জোর করে সাধারণ ধর্মঘটে সামিল করো, আর ফ্যাসিবাদী কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ বাধিয়ে দাও"।

মজদুরদের লড়াই-এ যুক্ত করার জন্য পার্টির যে প্রচেষ্টা তাতে খুবই সামান্য সাড়া পাবার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ১৮ নং কমিউনিস্ট বুলেটিন (কমরেড নিতাই-এর খসড়া) বলছে—'শ্রমজীবী শ্রেণির মধ্যে অপ্রতুল রাজনৈতিক প্রচারের কারণেই শ্রমিকদের পেছিয়ে পড়া অংশ অ্যাকশনে যোগ দেয়নি। অর্থনৈতিক লড়াইকে রাজনৈতিক লড়াই-এ রূপান্তরিত করতে হবে, রাজনৈতিক ধর্মঘটকে রূপান্তরিত করতে হবে ব্যারিকেড লড়াই-এ আর এই রাস্তা ধরেই আমরা ক্ষমতা দখলের পথে দ্রুত এগিয়ে যাবো। এই হল এপ্রিলের লড়াই-এর শিক্ষা।' এইভাবে প্রতিটি আংশিক লড়াইকে, শহরের প্রতিটি স্থানীয় সংঘর্ষকে ক্ষমতা দখলের জন্য একটি বিপ্লবী সংগ্রামে রূপান্তরিত করার দিকনির্দেশ দেওয়া হল।

এই লাইনের যা পরিণতি হওয়া উচিত তা পুরোদস্তুর দেখা গেলো ১৯৪৯ সালের জুন মাসের লড়াই-এ।

১৯৪৯ সালের প্রথম ছ'মাসে, কংগ্রেস সরকারের জারি করা প্রকারান্তরে 'সামরিক আইন' সত্ত্বেও, সোস্যালিস্ট নেতা ও আই এন টি ইউ সি সংগঠিত বিভেদমূলক কাজ ও গুণ্ডামী সত্ত্বেও, পশ্চিমবাংলায় দেড় লক্ষ শ্রমিক ও প্রায় লক্ষাধিক ছাত্র ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল। সমস্ত শ্রেণির শ্রমজীবী মানুষের মনে রায় মন্ত্রিসভা সম্পর্কে দীর্ঘকাল যাবৎ যে মোহাবিষ্টতা ছিল তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। ঠিক এমনি সময়ে দক্ষিণ কলকাতা উপনির্বাচন

সামনে এসে গেল। কংগ্রেস এই সুযোগে সকল গণতান্ত্রিক নাগরিকের কাছে এ চ্যালেঞ্জ এনে দিল একথা প্রমাণ করার যে রায় মন্ত্রিসভা সম্পর্কে তাঁদের আস্থা আছে না নেই।

পার্টি নেতৃবৃন্দ প্রথমে এই নির্বাচনের রাজনৈতিক তাৎপর্য বুঝতেই চায়নি এবং এতে অংশগ্রহণের বিষয়ে পার্টির যে প্রস্তাব তাকে 'সংশোধনবাদী' চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। একেবারে শুরুতে কমরেড গৌর ও রবি দুজনেই এবং তাঁদের সঙ্গে প্রাদেশিক কমিটির বেশির ভাগ সদস্যই এই মত পোষণ করতেন। পরে, পলিটব্যুরোর হস্তক্ষেপেই যে উপনির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহই নেই, কিন্তু এই অংশগ্রহণকেও প্রাথমিক ক্ষমতা দখলের লড়াই-এর একটা অংশ হিসেবে দেখা হয়েছিল। ["শ্রমিক, কৃষক এবং গণতান্ত্রিক শ্রেণির কাছে এই নির্বাচন শাসক কংগ্রেস শ্রেণির হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবার প্রশ্নটিকেই সামনে এনেছে"—কমরেড নিতাই-এর খসড়ায় নির্বাচনী পর্যালোচনা যেটি পরে প্রচার না করে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।] ঠিক এই দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখেই নির্বাচন-পূর্ব এবং পরবর্তী সমস্ত ঘটনা এবং কার্যক্রম বিষয়ে নেতৃবৃন্দ তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল।

জুন মাসের ৮ এবং ৯ তারিখে ফ্যাসিবাদী জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে জেলে আটক চারজন কমরেড জেলের মধ্যে শহিদ হয়ে গেলেন। পটারী কারখানায় সংঘর্ষও হল ৮ই জুন। সেখানে দু'হাজার শ্রমিক কারখানার দখল নিয়ে নিল এবং যে পুলিশ বাহিনীর হাতে একজন শ্রমিক নিহত হয়েছিল সংঘবদ্ধ শক্তিতে সেই সশস্ত্র বাহিনীর মোকাবিলা করল। মালিকপক্ষ দুজন ছাঁটাই শ্রমিককে পুনর্নিয়োগ করতে অস্বীকৃত হওয়াকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা ঘটে গেল। সাধারণ জনসমর্থনের নির্ভরতায় দেশপ্রিয় পার্কে ডাকা কংগ্রেসের নির্বাচনী জনসভাকে আক্রমণ করা হল এবং কংগ্রেসী নেতাদের বাড়ি হানা দেওয়া হল। অ্যালেনবেরির শ্রমিকরা তাদের কারখানার দখল নিল। সেখান থেকে তাদের বের করে দেবার এবং ছাঁটাই করবার সমস্ত প্রচেষ্টাকে তারা প্রতিহত করল। ন্যাশনাল কার্বন কোম্পানির শ্রমিকরা পুলিশ আর গুণ্ডাবাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হল। হাওড়া, ব্যারাকপুর, হুগলী এবং অন্যান্য জেলার গ্রামে-শহরে স্থানে স্থানে সংঘর্ষ দেখা দিল।

প্রাদেশিক সম্পাদকমণ্ডলী তাদের ১৪.৬.৪৯ তারিখে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে ডাক দিল, "জেলের গেট ভেঙে বন্দীদের ছিনিয়ে আন....সরকার সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের বক্সা-য় পাঠানোর ষড়যন্ত্র করছে। এটা কিছুতেই হতে দেওয়া চলবে না। সমগ্র জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে এই বদলি ঠেকাবার জন্যে প্রতিরোধ সংগঠিত করতে হবে জেলের ভেতরে, জেলগেটে, রাস্তায়, জেলায় জেলায় প্রতিটি রেলস্টেশনে" (কমরেড মল্লিকের খসড়া)।

দক্ষিণ কলকাতার উপনির্বাচন জঙ্গী পেটি-বুর্জোয়া-র মধ্যে এক কংগ্রেস বিরোধী গণজাগরণের রূপ নিল। পার্টির নেতৃত্বে বেশ বড়ো আকারে বিস্তৃত গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের সম্ভাবনা তৈরি হল। কিন্তু প্রাদেশিক নেতৃত্ব তাঁদের সংকীর্ণ লাইনের অনুসরণে এই প্রগতিশীল জন-জাগরণের থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখল, অন্যান্য বাম ও গণতান্ত্রিক দলগুলোকে 'অচ্ছুৎ' বলে নাক কোঁচকালো এবং পার্টির 'স্বাতন্ত্র্য' বজায় রাখার নামে নিজেদের সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে একলা নিঃসঙ্গ হয়ে রইল। পার্টির তৈরি করা 'নির্বাচনী প্রচার কমিটি' একটা আড়াল ছাড়া আর কিছুই নয়। আসল উদ্দেশ্য হল এই গণজাগরণকে কাজে লাগিয়ে যত্রতত্র

পুলিশের সঙ্গে বারবার সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়া।

কিন্তু রাজনৈতিক বন্দী মুক্তির দাবিতে প্রচারাভিযান এবং নির্বাচনে বিপুল জয় এই দুটি ঘটনাকে আরো, আরো বেশি সংঘাতের মাধ্যমে সংগ্রামের উচ্চ থেকে উচ্চতর রূপে পরিবর্তিত করার জন্য পার্টি নেতৃত্বের যে প্রচেষ্টা তা ব্যর্থ হল। আর ব্যর্থতার দায় আবার একবার চাপিয়ে দেওয়া হল পার্টির সাধারণ সদস্যদের ঘাড়ে। প্রদেশ সম্পাদকের ১৭ই জুনের নোটে বলা হল, "এখানে ওখানে সংগঠিত প্রতিটি সংগ্রামকে খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করুন এবং অবিলম্বে ভীরু আর দোদুল্যমানদের শাস্তি দিন। সংশ্লিষ্ট কমরেডটি যদি নেতৃত্বের পদেও থাকেন তাহলেও কিছু যাবে আসবে না। তাঁদের পদ থেকে নামিয়ে দিতে হবে কিংবা সাসপেণ্ড করতে হবে আর প্রয়োজন হলে পার্টি থেকে বের করে দিতে হবে। সর্বহারার পার্টিতে শ্রেণি সংগ্রামের অন্তর্ঘাতীদের কোনো জায়গা নেই। পার্টির সাধারণ সদস্যদের সামনে, জনসাধারণের সামনে এইসব কমরেডদের, বিশ্বাসঘাতকদের মুখোশ খুলে দিন"।

কিন্তু এই হুমকিতে সমস্ত সাধারণ সদস্যদের চুপ করিয়ে রাখা গেল না। বারবার তাঁরা একই প্রশ্ন তুললেন, "রেল স্টেশন আক্রমণ করা কি ঠিক কাজ? ট্রাম-বাসে বোমা মারা কি ঠিক কাজ? নেহরুর সভা গায়ে পড়ে ভেঙে দেওয়া, সুরেন ঘোষের বাড়ি আক্রমণ করা, কংগ্রেসের অফিসগুলোতে আগুন ধরানো সবই কি ঠিক? এইসব কর্মসূচীতে শ্রমিকরা অংশ নিল না কেন? আমাদের এতো অসংখ্য নিষ্ঠাবান কমরেডদের হারানোর ঘটনায় পার্টির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়লো না কি?"

এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রাদেশিক কমিটি দুটি দলিল প্রকাশ করল। জেলের অনশন ধর্মঘটের সমর্থনে জুনের যে আন্দোলন তার পর্যালোচনা করে (কমিউনিস্ট বুলেটিন নং ১৫ কমরেড কবীরের খসড়া), দেখানো হল যে, "দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদ আমাদের যাঁতাকলে আটকে ফেলেছে, আর আমাদের লড়াইকে উন্নততর স্তরে উন্নীত করতে বাধা দিচ্ছে"। এই রোগের সমাধান-প্রস্তাবটি হল, প্রাদেশিক কমিটি এবং জেলা কমিটিগুলি এই মুহূর্তে একেবারে নীচের সেল থেকে শুরু করে সমস্ত পার্টি ইউনিটগুলোকে 'পুনর্গঠন'-এর কাজেই তাদের সমগ্র মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করবে যাতে সেগুলিকে সংশোধনবাদের প্রভাব থেকে বাঁচানো যায়।

'পশ্চিমবাংলায় সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই'—শিরোনামে দ্বিতীয় দলিলটি কমরেড রবির খসড়া করা। সশস্ত্র সংগ্রামের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে যারা সন্দেহ প্রকাশ করেছিল তাদের উদ্দেশ্য করে কমরেড রবি খুবই নির্ভুলভাবে দেখিয়েছেন যে, ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল হিসেবেই আমরা ইতিমধ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম এবং গৃহযুদ্ধের পর্যায়ে প্রবেশ করেছি। কিন্তু ক্ষমতা দখলের যুদ্ধে সফল হবার উপায় হিসেবে 'চীনের পথ'—অনুধাবন করার বিষয়টি সম্পূর্ণ বাদ পড়ে যাওয়ায় গোটা দলিলে কৃষক আন্দোলনকে বস্তুতপক্ষে উপেক্ষা করা হয়েছিল। শহরের 'আক্রমণাত্মক' সংগ্রামের জন্য এই দলিলে নিছকই কিছু কৌশলগত এবং সাংগঠনিক নির্দেশিকা ছকে দেওয়া ছিল এবং অন্য সকল আংশিক সংগ্রামকে একই পর্যায়ে ফেলা হয়েছিল। স্বভাবতই, দলিলে অনেক নির্ভুল কথা থাকা সত্ত্বেও, বাম হঠকারিতার সাঁড়াশি পেষণ থেকে পার্টিকে বাঁচানোর কাজে স্বাভাবিকভাবেই এটি ব্যর্থ হয়েছিল।

জুন-জুলাই-এর সংঘর্ষের ধারাবাহিকতায় পার্টিকে যেরকম সাংঘাতিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল সে কারণে, অগস্ট-সেপ্টেম্বরে আবার নতুন করে সংঘর্ষ সংগঠনের সম্ভাবনা

যথেষ্ট হ্রাস পেয়ে গেল। ৯ই অগস্টের বর্ষপূর্তিতে আমাদের ছাত্র কমরেডরা 'বাম' ছাত্রদের একাংশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হল। বিভিন্ন কলেজের সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে এই ঘটনার অত্যন্ত খারাপ প্রতিক্রিয়া হল। কলকাতা জেলা কমিটির প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও প্রাদেশিক কমিটি ১৫ই অগস্টের কংগ্রেসের সমাবেশ আক্রমণ করে ভেঙে দেবার সিদ্ধান্ত নিল, কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে কমরেড রবির হস্তক্ষেপে এই সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে নেওয়া হল।

১৪৪ ধারা তুলে নেবার আইনগত সুবিধার সদ্ব্যবহার করে, প্রাদেশিক ক্ষেতমজুর, সারা ভারত ছাত্র সম্মেলন এবং রেল শ্রমিকদের সম্মেলনের মাধ্যমে মেহনতী মানুষের সঙ্গে পার্টির ছিন্ন যোগসূত্র পুনঃস্থাপনের একটা চেষ্টা এখন শুরু হল। প্রতিটি সম্মেলনে হাজার হাজার মানুষ সমবেত হলেন, অসংখ্য নতুন জঙ্গী কমরেড কাজ করতে এগিয়ে এলেন, সম্মেলনের খরচ মেটাতে সাধারণ মানুষ প্রচুর টাকা অকাতরে দান করলেন।

কিন্তু এই গণ-উদ্দীপনা সত্ত্বেও, প্রতিটি সম্মেলন সংগঠিত হল, পরিচালিত হল একটি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে।

সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ এবং বৃহৎ বুর্জোয়াদের প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করার পরিবর্তে, ক্ষেতমজুর এবং ছাত্র সম্মেলনে অত্যন্ত আক্রমণাত্মক ঢঙে 'বুর্জোয়া' এবং 'ধনী কৃষক'-দের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল হিসেবে আলাদা করে নেওয়া হল।

রেলের সম্মেলনের সময়ে, শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতাই ছিল সর্বপ্রধান বাস্তবতা। রেলকর্মচারী ফেডারেশনের অবস্থান তখনো পর্যন্ত পুরোপুরি উদ্ঘাটিত নয়। কাজেই, লাল পতাকার প্রভাবের বাইরে তখনো যেসব শ্রমিক-কর্মচারী রয়েছে তাদের ঐক্যবদ্ধ করার আবেদন কত বেশি পরিমাণে হাসিল করা যাবে তারই ওপর এই সম্মেলনের সাফল্য নির্ভর করেছিল। কিন্তু এর পরিবর্তে, সম্মেলনে কার্যত AIRF-এর 'দালাল'-দের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে স্বাগত জানানো হল এবং পুরোপুরি পার্টির প্রভাবাধীনে একটি নতুন 'প্রতিদ্বন্দ্বী' সংগঠন গড়ে তোলার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা উদ্ধতভাবে করা হল। সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে উপচে-পড়া জনসমাগমে কেবলমাত্র রেলের শ্রমিক-কর্মচারী নয়, অন্যান্য শিল্পকারখানা এবং নানান অংশের শ্রমিক-কর্মচারীরাও যে ছিল এতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই।

এই তিনটি সম্মেলনের কোনোটিতেই অন্যান্য বামপন্থী পার্টি বা গোষ্ঠী কিংবা পার্টির বাইরের মানুষজনকে এমনকি শুধুমাত্র উপস্থিত থাকার জন্যও আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। সম্মেলনের কাজকর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণের বিষয়টি কেবলমাত্র পার্টি শুভানুধ্যায়ী এবং সক্রিয় কর্মীদের মধ্যে একান্তভাবে সীমাবদ্ধ ছিল।

কিন্তু এই নিয়ন্ত্রিত এবং 'শান্তিপূর্ণ' অংশগ্রহণের পর্বকালও বেশিদিন স্থায়ী হল না।

অগস্টের ২৫ তারিখে, সারা বাংলার ৬০০০০ ছাত্র শিক্ষা সংক্রান্ত নানান দাবিতে ধর্মঘটে সামিল হল। সেপ্টেম্বরের শুরুতেই বাণিজ্য শিক্ষাক্রমের ছাত্রদের ঐতিহাসিক ধর্মঘট হল। সেপ্টেম্বরের ৯ তারিখে পুলিশী বাড়াবাড়ির প্রতিবাদে এবং শিক্ষা সংক্রান্ত দাবির সমর্থনে ৩০০০০ ছাত্র লাগাতার এগারো দিন ধর্মঘট চালিয়ে গেল।

ছাত্রদের এই নতুন আন্দোলনের তরঙ্গকে পরিচালনা করতে গিয়ে 'সংঘর্ষ' এবং অনির্দিষ্টকাল ধারাবাহিক ধর্মঘটের সেই পুরোনো কৌশলগত লাইনের প্রশ্নটি সামনে এসে গেল।

ডালহৌসি স্কোয়ারের দিকে বিক্ষোভ সমাবেশকে চালিত না করার জন্যে ছাত্র কমরেডদের কঠোরভাবে তিরস্কার করা হল। কমরেড নন্দন লিখলেন, "আমাদের আশু লক্ষ্য এবং কর্তব্য হল প্রদেশ-জুড়ে দীর্ঘমেয়াদী সাধারণ ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়া যতক্ষণ না পর্যন্ত সরকার ও শিক্ষা বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের প্রধান দাবিগুলো মেনে নিচ্ছে এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত ঘৃণ্য রায় মন্ত্রিসভাকে গদিচ্যুত করা যাচ্ছে" ['কলকাতার ছাত্রদের সেপ্টেম্বরের মহান সাধারণ ধর্মঘট এবং তার শিক্ষা'] । এইভাবে আরো একবার শহরের ছাত্র সংগ্রামকে ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম হিসেবে উপস্থাপিত করা হল।

মার্চের ৯ তারিখের পরবর্তী সময়কালে, বাংলার গ্রামাঞ্চলে বিশেষত ময়মনসিংহের পাহাড়ী অঞ্চলে, ২৪ পরগনার কাকদ্বীপে, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হাওড়া এবং বর্ধমানে কৃষক আন্দোলন বারেবারেই সশস্ত্র সংগ্রামের আকার নিয়েছিল। ফ্যাসিবাদী কংগ্রেস, লীগ সরকার আর তার পুলিশ বাহিনী, সেবাদলের গুণ্ডা আর আনসারিদের শ্বেত সন্ত্রাস সত্ত্বেও শুরু হল বিস্তৃত এলাকা জুড়ে কৃষি-মজুরদের ধর্মঘট, অগস্টের ১৫ তারিখে বিষ্ণুপুর শহরে (বাঁকুড়ার) সশস্ত্র কৃষক-বিক্ষোভ; কাকদ্বীপ এবং ২৪ পরগনার অন্যান্য এলাকায় জমি এবং শস্য দখল; 'টংক' প্রথা বন্ধের দাবিতে এবং সরকারের মজুত সংগ্রহের বিরুদ্ধে হাজং চাষীদের সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং বর্ধমানে সংঘর্ষ (পুলিশের রাইফেল দখল করার ঘটনা), অন্যান্য অনেক জেলায় শস্যের দখল নেওয়া। ১৯৪৯ সালে নতুন ফসল তোলার সময় যে আন্দোলনের প্রস্তুতি তাকে এই পশ্চাৎপটের নিরিখে দেখা হল।

অক্টোবরে, কলকাতায় কর্পোরেশনের ২০০০০ শ্রমিক ধর্মঘটে নামল। কাজের ঘণ্টা কমানোর জন্য, বেতন সংকোচন এবং ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে চটকল শ্রমিকদের মধ্যে ক্রোধ আর ঘৃণার পাহাড় জমতে লাগল। পরিস্থিতির এহেন পরিবর্তনের ভিত্তিতে পার্টি নেতৃত্ব ঘোষণা করলেন, "শ্রমিক শ্রেণির আক্রমণের কাল" শুরু হয়ে গেছে। এখন কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘটে নেমে পড়ার ওপরেই নির্ভর করছে যে, কত তাড়াতাড়ি আমরা দক্ষিণবঙ্গে মুক্তাঞ্চল গড়ে তুলতে পারবো (পার্টি চিঠি নং ঃ ১, কমরেড রবির করা খসড়া)।

এই উদ্দেশ্যকে মনে রেখে (অর্থাৎ দক্ষিণবঙ্গে মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলা) প্রাদেশিক কমিটি নভেম্বরের ৮ তারখে চটশিল্পে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিল। পার্টি চিঠিতে একে 'আর একটি ৯ই মার্চ' বলে বর্ণনা করা হল। আরো একবার ধর্মঘট সফল করার জন্য পার্টির সমগ্র অংশকে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলা হল; আরো একবার 'বিশেষ' স্কোয়াড ইত্যাদিকে অ্যাকশনের জন্য তৈরি করা হল। কিন্তু চটশিল্পের শ্রমিক এবং অন্যান্যদের সময়ানুগ প্রতিক্রিয়া ও মনোভাবের বিষয়টি হয় উপেক্ষা করা হল, কিংবা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হল।

এবারও, চটশিল্প ধর্মঘটের সমস্ত ব্যর্থতার দায় চাপিয়ে দেওয়া হল পার্টির সাধারণ সদস্যদের ওপর। ধর্মঘট সম্পর্কে প্রাদেশিক কমিটির পর্যালোচনায় (কমরেড সূর্যের খসড়া) বলা হল যে, ধর্মঘট সফল হতে পারল না কেননা "সংশোধনবাদী নীতি এবং অভ্যাস পথের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল"। হাওড়ার একজন কমরেড যখন এই প্রশ্ন তুললেন যে, ধর্মঘটের প্রস্তুতিতে কেন আরো বেশি সময় নেওয়া হয়নি, তখন তাঁকে এই বলে আক্রমণ করা হল যে, "সংশোধনবাদীরা সবসময় নিজের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য এ ধরনের নানান অজুহাতের আশ্রয়

নেয়" (ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক নং ঃ ৫, কমরেড সূর্যের করা খসড়া)। ৯ই মার্চের 'সাফল্যগুলি'কে উদ্ধৃত করে ৮ই নভেম্বরের ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত যে সঠিক ছিল সেটি প্রমাণ করার চেষ্টা চালানো হতে লাগল।

চটশিল্পে ধর্মঘটের ডাক এভাবে ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার ফলে পার্টি প্রচুর কর্মীকে হারাল এবং সাধারণ চট শ্রমিকদের সঙ্গে পার্টির সংযোগের যে সূত্রটি ইতিমধ্যেই দুর্বল ছিল সেটি আরো গুরুতরভাবে দুর্বল হয়ে পড়ল (১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় যখন চটকল এলাকার বেশির ভাগ অঞ্চলে লাল পতাকার লোকজন হস্তক্ষেপ করতে পারল না তখনই এই বিচ্ছিন্নতার ধ্বংসাত্মক ফলাফল পুরোপুরি বুঝতে পারা গেল)।

৮ই নভেম্বরের ঐ বিশৃঙ্খলায় পার্টির ভেতরে যে নিরুৎসাহ তৈরি হয়েছিল, সাময়িকভাবে হলেও সারা ভারত শান্তি কংগ্রেসের মহান সমাবেশে তার থেকে কিছুটা উদ্দীপনা দেখা গেল।

এই শান্তি কংগ্রেসকে পার্টি নেতৃত্ব (পিবি) সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হিসেবে না দেখে 'বুর্জোয়াদের' বিরুদ্ধে লড়াই হিসেবে দেখল। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শরৎ বোস এবং অন্যান্য নেতাদের এই কংগ্রেসে আমন্ত্রণ না জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। প্রাদেশিক কমিটির ২৯.১০.৪৯ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে (কমরেড নিতাই-এর করা খসড়া) ঘোষণা করা হল যে, "সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি নিঃশর্ত এবং সম্পূর্ণ সমর্থনই এই শান্তি কংগ্রেসে অংশগ্রহণের অবশ্য নির্ণায়ক শর্ত হবে"। এইরকম সংকীর্ণ পদ্ধতিতে, একমাত্র পার্টির প্রত্যক্ষ অনুগামীদের মধ্যেই এই শান্তি কংগ্রেস আবদ্ধ রইল।

শান্তি কংগ্রেসের প্রস্তুতিপর্বের সময়কালে, সভা-সমিতি, বিক্ষোভ-মিছিল নিয়মিতভাবে পুলিশের হাতে আক্রান্ত হচ্ছিল। পার্টি নেতৃত্বের একাংশ (এদের মধ্যে অগ্রগণ্য কমরেড গৌর) শান্তি কংগ্রেসের চেয়েও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়াকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। পুলিশের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক হওয়া এবং ওরা আমাদের আক্রমণ করার আগে ওদের আক্রমণ কর— এই পথের প্রবক্তা ছিলেন তাঁরা। অবশেষে কমরেড রবির হস্তক্ষেপে এই পথটি পরিত্যক্ত হল।

কিন্তু এই যে যুগ্ম বিপদ—একদিকে এক ধরনের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি আর অন্যদিকে হঠকারী কার্যকলাপ—এসব সত্ত্বেও শান্তি কংগ্রেসের ঐ সুবিশাল সমাবেশকে আমরা কেমন করে ব্যাখ্যা করতে পারি? আমাদের সাধারণ পার্টি-কর্মীদের ধারাবাহিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রচারই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মানুষজনকে হাজারে হাজারে ময়দানে টেনে এনেছিল।

কিন্তু ময়দানের এই বিশাল জনসমাবেশে পার্টি নেতৃত্ব তাঁদের ট্রটস্কীয় লাইনের অভূতপূর্ব 'সাফল্য'ই দেখতে পেলেন। এ থেকে বোঝা যায় কেন পার্টির এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্য শান্তি কংগ্রেস শেষ হতে না হতেই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রচার বন্ধ হয়ে গেল, সেখানে যে শান্তি কমিটির ভিত্তি তৈরি হয়েছিল, কেন যে সেটা একটা ভাঙাচোরা সংগঠনে পরিণত হল—সমস্ত কিছুরই ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদী বিপদের বিষয়টি পার্টির সচেতন ভাবনা থেকে পুরোপুরি বাদ পড়ে গিয়েছিল। আরো একবার পার্টির সাধারণ সদস্যদের পথ-সংঘর্ষ আর সশস্ত্র কর্মসূচীর জন্য সংগঠিত করা হল।

জেল কর্তৃপক্ষের ফ্যাসিস্টসুলভ বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আবার জেলের ভেতর ১৫ই ডিসেম্বর থেকে লাগাতার অনশন ধর্মঘট ব্যাপক আকারে শুরু হল। আবারো

একবার পার্টি নেতৃত্ব এই সংগ্রামকে দক্ষিণবঙ্গে মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী লড়াই-এর একটা অংস হিসেবেই দেখলেন। অনশন ধর্মঘট-রত বন্দীদের উদ্দেশ্যে কমরেড মল্লিক লিখলেন, "তেভাগার জন্য লড়াই উভয় বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছে। শিক্ষক, অধ্যাপক এবং ছাত্ররা সাধারণ ধর্মঘটের প্রস্তুতি নিচ্ছে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারি কর্মচারী এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরাও একই প্রস্তুতিতে রত। চটকল শ্রমিকরা আক্রমণাত্মক লড়াই চালাচ্ছে এবং আবার একটা সাধারণ ধর্মঘটের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আপনাদের প্রতিটি প্রতিরোধী কর্মসূচী এই সমস্ত সংগ্রামকে আরো শক্তিশালী করবে। নির্ভয়ে আপনাদের প্রতিরোধ চালিয়ে যান"।

প্রথমে অনশন ধর্মঘটীদের সমর্থনে বেশ বিশাল বিশাল জনসমাবেশ করা গেল। কিন্তু সেখানে চেষ্টা করা হত যে, প্রতিটি সভা যেন শেষ হয় পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে আর প্রতিটি বিক্ষোভ মিছিল হয়ে ওঠে ব্যারিকেড লড়াই। কমরেড গৌরের খসড়া করা একটি 'গোপন' সার্কুলারে যে সমস্ত কমরেডরা বিক্ষোভে, সভায় অংশগ্রহণ করছিল, তাদের সকলকে কোনো না কোনো অস্ত্র নিদেনপক্ষে ইটপাথর সঙ্গে নিয়ে যেতে নির্দেশ দেওয়া হল। পুলিশের কেন্দ্রীভূত আক্রমণে এবং গণ-গ্রেপ্তারের ফলে যখন আর গণ-জমায়েত করা সম্ভব হল না তখন ডালহৌসী স্কোয়ার প্রভৃতি নানান পুলিশ স্টেশনে বিচ্ছিন্ন আক্রমণের ঘটনা চালিয়ে যাওয়া হল। প্রেসিডেন্সী জেলের সামনে, ময়দানে আমাদের সভায়, বিক্ষোভ-সমাবেশে রায় মন্ত্রিসভার পুলিশ ও গুণ্ডারা নজিরবিহীন হিংস্র আক্রমণ চালাল। পার্টি সদস্য এবং শুভানুধ্যায়ীরা—নারীপুরুষ নির্বিশেষে বর্বর লাঠি চার্জের শিকার হল এবং পরে তাদের অনেককে পুলিশ লক-আপে মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলা হল।

অবস্থা যখন এইরকম—যখন বারবার সংঘর্ষে পার্টি সদস্যরা রক্তাক্ত, যখন শ্রমিক এবং মেহনতী মানুষের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, যখন পার্টি এবং তার গণসংগঠনগুলিকে 'শক্তিশালী' করার জন্যে প্রবল উদ্দীপনাময় আহ্বানেও আর কোনো কাজ হচ্ছে না—এমন একটা অবস্থায় এসে গেল ২৬শে জানুয়ারি। পলিটব্যুরোর সার্কুলারে সেদিন রাজনৈতিক জনসমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছিল—সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নয়, এই 'বুর্জোয়া সরকার'-এর দাস মনোবৃত্তির সংবিধানের বিরুদ্ধে। প্রাদেশিক কমিটি তার সার্কুলারে (কমরেড গৌরের করা খসড়া) বলল যে, "২৬শে জানুয়ারির সংবিধান বিরোধী সংঘর্ষের সাফল্য শ্রমিক শ্রেণির চূড়ান্ত জয়ের ওপরেই নির্ভর করছে।" সমস্ত ফ্রন্ট থেকে কমরেডদের বদলি করে এনে শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে প্রচারের কাজে যুক্ত করার জন্য নির্দেশিকা জারি করা হল। 'শ্রমিক শ্রেণিকে কাছে টেনে আনার নামে এইভাবে প্রগতিশীল পেটি-বুর্জোয়া এবং গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে পার্টির যে অবশিষ্ট যোগসূত্র—বর্তমানের এতো ঝোড়ো হাওয়া আর উপর্যুপরি আঘাতও যেটিকে পুরোপুরি ধ্বংস করার লক্ষ্যে তখনো সফল হয়ে উঠতে পারেনি, সেই যোগসূত্রটি একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হল।'

২৬শে জানুয়ারি 'সাধারণ ধর্মঘট'-এর ডাক দেওয়া হল, যদিও এমন একটা ধর্মঘট যে হতে পারে, সে কথাই কেউ বিশ্বাস করেনি। যদি কখনো 'অভ্যুত্থান'-এর মতো পরিস্থিতি আসে কেবলমাত্র তখনই ব্যবহার করার জন্য পলিটব্যুরোর যে খসড়া ইস্তাহারে তৈরি করা ছিল, প্রাদেশিক কমিটি নিজে উদ্যোগী হয়ে তড়িঘড়ি তাকে ছাপিয়ে দিল (কমরেড নিতাই-এর

উদ্যোগে 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল)।

২৫শে এবং ২৬শে জানুয়ারি এই দুদিনের সাধারণ ধর্মঘট শ্রমিকশ্রেণি স্পষ্টতই যোগ দিল না। ২৬শে জানুয়ারির শ্রমিক সমাবেশেও লোক হল খুবই কম। বেশ কয়েকঘণ্টা ধরে স্থানীয় মানুষজনের সহযোগিতায় পুলিশের সঙ্গে পার্টি কর্মীদের সংঘর্ষ চললো।

কিন্তু ২৬শে জানুয়ারির এই ঘটনাবলীকে পার্টি নেতৃত্ব কীভাবে ব্যাখ্যা করলেন? তাঁরা লিখলেন, "চার ঘণ্টা ধরে দক্ষিণ কলকাতা জনগণের নিয়ন্ত্রণে ছিল" (স্বাধীনতা)। পার্টির ৩ নং চিঠিতে কমরেড রবি লিখলেন, "এখন পর্যন্ত দলে এমন অনেক সুবিধাবাদী কমরেড আছেন যাঁরা ২৬শে জানুয়ারির ধর্মঘটের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁদের অবশ্যই তাড়াতে হবে, এবং আমাদের নতুন নতুন বিপ্লবী কর্মীবাহিনীর সহায়তায় ট্রেড ইউনিয়নকে অবশ্যই সক্রিয় এবং শক্তিশালী করে তুলতে হবে"।

এইভাবে ১৯৪৯ সালের ৯ই মার্চ থেকে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি পর্যন্ত, শহরে অভ্যুত্থান ঘটানোর নিরর্থক প্রচেষ্টায় ট্রটস্কীয় নীতি ও কৌশলকে বাস্তবায়িত করার নিরন্তর চেষ্টা চলতেই থাকলো।

এই সময়কালে, অনেক সংগ্রামের ক্ষেত্রেই, নেতৃত্বের ভূমিকায় শ্রমিকশ্রেণি এবং তার পার্টির ক্রমবর্ধমান উত্থান এবং জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রখর তীব্রতার বিষয়টি সমর্থিত হয়। নেহরু-বি সি রায় সরকারের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মোহমুক্তি শতগুণ বেড়ে গেছে; শ্রমিক, ছাত্র এবং পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণি বারংবার সংগ্রামে উত্তাল হয়ে উঠছে। জানুয়ারি এবং সেপ্টেম্বর (১৯৪৯)—ছাত্রদের সংগ্রাম, নভেম্বরে (১৯৪৯) শিক্ষক ও অধ্যাপকদের ধর্মঘট, দক্ষিণ কলকাতার উপ-নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গণ-অভ্যুত্থান, পটারী, অ্যালেন বেরী এবং কর্পোরেশনের শ্রমিকদের ধর্মঘট—সমস্ত ইতিহাসে লেখা থাকবে। কিন্তু পার্টির ভুল নীতি এইসব বীরোচিত সংগ্রামকে পরাজয় এবং হতাশায় পর্যবসিত করার জন্য দায়ি ছিল।

শ্রমিক শ্রেণি, ছাত্র এবং পেটি-বুর্জোয়াদের শক্তিকে একত্রিত এবং সংহত করার বদলে পার্টি কেবলই এদের বিচ্ছিন্ন করেছে, মূল স্রোত থেকে পৃথক করেছে। শ্বেত সন্ত্রাসের মুখে নির্বিচারে এবং অন্ধের মতো একের পর এক পার্টিকর্মীদের বলি দিয়ে পার্টি এবং গণ-সংগঠনগুলোকে দুর্বল করে দেওয়া হয়েছিল। একেবারে টিটোর কায়দায় সাধারণ পার্টি কর্মীদের গায়ে 'সংশোধনবাদী' লেবেল মেরে, সমস্ত দায়িত্বশীল পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে, তাদের উদ্যোগ এবং আত্মবিশ্বাসকে নির্দয়ভাবে দলে-মুচড়ে দেওয়া হল। শহরের যে-কোন সংগ্রাম অর্থাৎ প্রতিটি সংগ্রাম যদি একবার সশস্ত্র হয়ে ওঠে তাহলেই সেটা সংগ্রামের 'উচ্চতর' স্তরে উন্নীত হয়ে যাবে এরকম একটা অবাস্তব মতবাদের অপ্রত্যক্ষ একটা ফলাফলের জন্য যে 'বিশেষ' মালমশলার প্রস্তুতি দরকার হয় তাতে অসংখ্য মূল্যবান জীবন শেষ হয়ে গেল।

গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ঃ শহরেই অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি নিতে হবে এই একপেশে ধারণা একেবারে মাথার মধ্যে গেঁথে যাওয়ায় যোগ্য কৃষক আন্দোলনকে এমনভাবে উপেক্ষা করা হল যাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলা চলে। ময়মনসিংহ জেলার পাহাড়ী সীমা-অঞ্চলের সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি যে মনোভাব দেখানো হয়েছিল সেটাই এর জ্বলন্ত উদাহরণ।

১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে দুই বাংলার জন্য একটি যুগ্ম প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হল।

এর তিন কি চার মাস আগে থেকে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক কমিটির দুজন নেতা (কমরেড অজিত এবং কবীর) কার্যত পশ্চিমবাংলার প্রাদেশিক কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও, আজ পর্যন্ত প্রাদেশিক কমিটি পাহাড়ী এলাকার সশস্ত্র সংগ্রামের সমস্যাবলী নিয়ে বিশদ আলোচনা কিংবা কোনো পর্যালোচনাও করেনি। এমনকি, লিফলেট বিলি বা ঐ জাতীয় কিছু করেও সেই অঞ্চলের কমরেডদের প্রাদেশিক কমিটি কোন সাহায্য করেনি। যদিও খুঁটিনাটি ('বিশেষ') সাহায্যের জন্য বারবার অনুরোধ এসেছে, তবু প্রাদেশিক কমিটি মনে করেছে কলকাতায় পুলিশ থানার উপর আক্রমণ করাটা 'আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজ'।

কলকাতায় ঃ 'দক্ষিণবঙ্গের মুক্তাঞ্চল', 'কাকদ্বীপ—বাংলার শিশু তেলেঙ্গানা' ইত্যাদি বিরাট বাক্যবিন্যাস সত্ত্বেও, একথা মেনে নিতেই হবে যে, গ্রামাঞ্চলের সশস্ত্র সংগ্রামকে পার্টি নেতৃত্ব কখনই ক্ষমতা দখলের লড়াই হিসেবে দেখেনি কিংবা তাকে সে পথে চালিত করেনি। শহরে প্রতিটি সাধারণ ধর্মঘটের 'ডাক' দেবার সময়, শহরের বিপ্লবী যুদ্ধের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য, সহায়ক 'প্রতিরোধী' উপায় হিসেবে গ্রামাঞ্চলেও একই সঙ্গে সংঘর্ষ সৃষ্টি করার জন্য একেবারে যান্ত্রিকভাবে নিয়মমাফিক নির্দেশ পাঠানো হয়েছে।

বারবার কৃষকরা সশস্ত্র সংগ্রামের পথে গিয়েছিল। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, ২৪ পরগনা, বর্ধমান, আরো অনেক জায়গায় হাজার হাজার ক্ষেতমজুর বেশি মজুরির দাবিতে ধর্মঘট করেছিল; ২৪ পরগনা, হাওড়া, বগুড়া ইত্যাদি এলাকার কৃষকরা হাজার হাজার মন শস্য দখল করে নিয়েছিল আর সমস্ত শস্য গ্রামের গরীব মানুষের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিল; বাঁকুড়া আর মালদার কৃষকরা জোর করে জমিদারের পুকুর, দীঘি দখল করে নিয়েছিল; ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান আর মেদিনীপুরের শতাধিক গ্রামে শস্য দখলের লড়াই চলেছিল; কাকদ্বীপের কৃষকরা জমিদার, 'লাটদার' আর কাছারির-এর জমি দখল করে নিয়ে হাজার হাজার বিঘা জমি বিলি করে দিয়েছিল। কালাইরা (কালনা) আর নাচোল (রাজশাহী)-এর কৃষকেরা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল, তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়েছিল। পুলিশ যখনই কৃষকনেতাদের গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করেছিল তখনি তাদের প্রবল গণ-প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। হাওড়া, ২৪ পরগনা এবং হুগলীর এমন সব সংঘর্ষে বীর নারীযোদ্ধারা তাঁদের প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন।

প্রাদেশিক কমিটি কখনই এইসব সংগ্রামের অভিজ্ঞতা আলোচনা করেনি, কখনই এইসব সশস্ত্র সংগ্রামের কৌশল গভীরভাবে অধ্যয়ন করেনি। উল্টোদিকে কমিটি কীভাবে সংগ্রাম পরিচালিত করেছিল? আমাদের লড়াই-এর ওপর সেবাদলের গুণ্ডাবাহিনী আর সশস্ত্র পুলিশের ভয়ঙ্কর আক্রমণের মুখে, প্রাদেশিক কমিটি নির্দেশনামা জারি করল যে, যে-কোন মূল্যে এই আক্রমণকে মুখোমুখি প্রতিহত করতে হবে, প্রয়োজনে খালি হাতেও তা করতে হবে। পুলিশ ক্যাম্পের ওপর গণ-আক্রমণ চালানোর নির্দেশ পাঠানো হল। পুলিশের ঘেরাটোপ থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য মেদিনীপুরের কৃষক নেতা কমরেড মধুকে 'ভীরু' বলে অভিযুক্ত করা হল। একেবারে সামনে থেকে সরাসরি পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণের নীতিতে অসম্মত হওয়ায় বাঁকুড়ার নেতা কমরেড প্রদেশ এবং কাকদ্বীপের নেতৃবৃন্দ চূড়ান্তরকমে সমালোচিত হলেন।

'প্রাদেশিক কমিটির সে-সমস্ত সদস্যরা (কমরেড বিরাট, নিতাই, নন্দন এবং পরবর্তীকালে কমরেড আজাদ) যাঁরা এই কৃষক আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন, তাঁরা সশস্ত্র সংগ্রামের

মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষা, বিশেষ করে মাও সে তুং-এর গেরিলা রণনীতির শিক্ষা মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেননি, এর কৌশলে শিক্ষিত হননি আর নিজ নিজ গ্রামীণ এলাকার সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি অনুযায়ী একে প্রয়োগ করেননি। কোনও একটা এলাকায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হলেই ঐ এলাকাকে 'মুক্তাঞ্চল' বলে ঘোষণা করা হত। কিন্তু যখনই সেই এলাকা পুলিশ ঘিরে ফেলে আক্রমণ চালাত, তখনি প্রাদেশিক কমিটির ভুল কৌশলে শত্রুর হাতে সাংঘাতিক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যেত। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান অক্ষ যে কৃষিবিপ্লব এই বোধের অভাবে, প্রাদেশিক কমিটি গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী কেন্দ্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তুলতে ব্যর্থ হল।

সূচনাপর্ব থেকেই কাকদ্বীপের যে সংগ্রাম নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে উঠেছিল, তারও পরিণতি হল একইরকম। একটা ছোট্ট এলাকা ছিল লড়াই-এর ক্ষেত্র, একটা সমতল এলাকায় ছোট্ট 'পকেট'। যদিও কমরেড আজাদ সেই এলাকায় এলাকায় ঘুরে এসে প্রাদেশিক কমিটিকে সেই স্থানের কয়েকটি সাংগঠনিক দুর্বলতার বিষয়ে একটি রিপোর্ট দিয়েছিলেন, তবু প্রাদেশিক কমিটির কৌশলগত ভুল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সে দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা যায়নি। শত শত সশস্ত্র পুলিশ আর সেবাদলের গুণ্ডাবাহিনীর যখন ঐ এলাকার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন প্রাদেশিক কমিটির উচিত ছিল আক্রান্ত এলাকা থেকে 'জঙ্গী' বাহিনী তুলে নিয়ে অন্য এলাকায় যেমন পার্শ্ববর্তী মেদিনীপুর এবং সন্দেশখালি অঞ্চলে তাকে ছড়িয়ে দেবার চলমান কৌশল গ্রহণ করা। প্রত্যাহার করার এই কাজটা সহজেই করা যেত, অথচ প্রাদেশিক কমিটির নেতৃবৃন্দ এই পথ নিলেন না বরং স্থানীয় কমরেডদের সেই স্থানে থেকে গিয়ে প্রতিরোধ সংগঠিত করতে উৎসাহিত করলেন। পরে সেইসব স্থানীয় কমরেডরা নিজেদের উদ্যোগে 'জঙ্গী' বাহিনী ঘিরে-ফেলা এলাকা থেকে বেরিয়ে যেতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু তারপর ফ্রন্টে লড়াই-এর ভ্রান্ত শিক্ষার দ্বারা চালিত হয়ে এবং নেতৃত্বের সঙ্গে সমস্ত সংযোগ ছিন্ন হওয়ার কারণে, তাঁরা আবার তাঁদের পুরোনো এলাকায় ঢোকার চেষ্টা করলেন এবং ধরা পড়ে গেলেন।

মেদিনীপুরের কেশপুর এলাকাতেও একই ধরনের ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হল। ২৬শে জানুয়ারির সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বানকে আরো উন্নত করতে, তাকে ছড়িয়ে দিতে, অবশ্যম্ভাবী সর্বাত্মক পুলিশী আক্রমণের সম্পর্কে সঠিক নজরদারি গড়ে তোলা উচিত ছিল। জঙ্গী কমরেডরা যাতে চিহ্নিত হয়ে না পড়েন সেদিকে খেয়াল রাখা, শত্রুর হাতে ধরা পড়ার ঘটনা থেকে তাঁদের বাঁচাতে ঠিক সময় বুঝে তাঁদের অন্য এলাকায় পাঠিয়ে দেওয়া, এগুলি খুব জরুরি ছিল। কিন্তু এই নজরদারির অভাবে, পার্টির নেতৃত্বের কাছ থেকে পাওয়া যে ভুল শিক্ষার কারণে 'জঙ্গী'-দের একটা বিরাট অংশ সমেত জেলা কমিটির সম্পাদক ধরা পড়ে গেলেন।

এইভাবে হাওড়া, হুগলী আর অন্য সব জেলার সশস্ত্র সংগ্রামেও অন্তর্ঘাতের ঘটনা ঘটেছিল। গেরিলা বাহিনী সংগঠিত করা, গেরিলা রণকৌশলের শিক্ষা সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা, জঙ্গী কমরেডদের গ্রেপ্তারের হাত থেকে বাঁচানো কিংবা (খুব ছোট্ট ক্ষেত্র ছাড়া) সেইসব কমরেডদের সশস্ত্র করা—এরকম কোন কাজেই জেলা কমিটিকে সাহায্য করেনি প্রাদেশিক কমিটি। সশস্ত্র সংগ্রামের সমস্ত সমস্যাগুলোকে খুবই হাল্কাচালে লঘুভাবে দেখা হয়েছে। এর ফলে, আগের অসংখ্য 'লাল' এলাকাকে পার্টি কার্যত পরিত্যাগ করেছে। ঐ

সংগ্রামের সামনের সারিতে থাকা অসংখ্য জঙ্গী কমরেড, যারা সেসময় বীরের মতো লড়াই করেছিল, তারা হয় শত্রুর হাতে পড়েছে কিংবা হতাশা আর নীতিভ্রষ্টতায় হারিয়ে গেছে।

কিন্তু কেবলমাত্র যে এই একটি উপায়েই কৃষক সংগ্রামে অন্তর্ঘাত করা হয়েছিল তা নয়। শ্রেণি-বিশ্লেষণের ভুলে গ্রামাঞ্চলে ধনী কৃষকরা আমাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছিল। এই ভুলের পরিণতি কী হল? গ্রামাঞ্চলে আমাদের শত্রুর সংখ্যা বেড়ে গেল।

২২.১১.৪৮ তারিখের কমিউনিস্ট বুলেটিনে (কমরেড রবির খসড়া করা) কৃষিতে পুঁজিবাদের অগ্রগতির প্রেক্ষিতে, বাংলার কৃষক আন্দোলনের একটি পর্যালোচনা করা হয়েছিল। সেই বুলেটিনে পরিষ্কার ভাষায় বলা হল যে, সর্বস্তরের কৃষক সংহতি গড়ে তোলার চেষ্টা হল আকাশ কুসুম কল্পনা। জেলার পর জেলার ঘটনার পর্যালোচনা করে দেখানো হল যে, মধ্যমবর্গীয় কৃষকের দোদুল্যমানতা এবং আক্রমণের মুখে তাদের আপসমুখী প্রবণতার কারণেই সর্বত্র এই আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে।

মধ্যমবর্গীয় কৃষককুলকে বিশ্বাস করা যায় না, তাদের ওপর নির্ভরও করা যায় না— পলিটব্যুরোর এই তত্ত্বই প্রাদেশিক কমিটি কার্যকরী করেছে আর সংগ্রামরত কৃষক শিবিরের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করার কাজে বেশ সফল হয়েছে। ক্ষেতমজুর আর গরীব কৃষকদের নেতৃত্বের অবস্থানে উন্নীত করার নামে, মধ্যমবর্গীয় কৃষকদের থেকে গরীব কৃষকদের বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

বড়া-কমলাপুরে (হুগলী) সমস্ত কৃষকদের 'সামন্ততন্ত্র-বিরোধী' জোটকে 'সংশোধনবাদী' বলে সমালোচনা করা হল। চন্দ্রকোণায় (মেদিনীপুর) কৃষিমজুরদের ধর্মঘটের সময়, মধ্যমবর্গীয় কৃষকরা একটা আলাদা সমঝোতার প্রস্তাব নিয়ে আমাদের কাছে এসেছিল। আমরা তাদের প্রত্যাখ্যান করি। ফলে তারা গিয়ে পড়ে কংগ্রেসীদের খপ্পরে। একইরকমভাবে, নন্দীগ্রামে (মেদিনীপুর) তেভাগার আন্দোলন চলাকালীন, ছোট জোতদার-তথা-ধনী কৃষকরা আলাদা একটা সমঝোতার প্রস্তাব আনে। যথারীতি আমরা তাদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিই এবং তাদের শত্রু শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য করি। বড় জমিদার আর জোতদারদের গ্রামের বাকি লোকজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার পরিবর্তে, স্থানে স্থানে গ্রামগুলি কমবেশি সমান শক্তিশালী বিরোধী শিবিরে খণ্ডিত হয়ে পড়তে শুরু করে। এরকম খণ্ডিত শক্তি নিয়ে বড় জমিদার আর জোতদারদের আক্রমণ করার অসুবিধা ক্রমশ বাড়তে থাকায়, ফের ধীরে ধীরে ধনী কৃষকরাই আমাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তু হিসেবে সামনের সারিতে চলে আসে। 'দালালদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' ঘোষণার নামে, কখনো শত্রুপক্ষ কিংবা পুলিশের সাহায্য নেবার জন্য, ধনী কৃষকরা (আর অনেকক্ষেত্রেই মধ্যমবর্গীয় কৃষকরাও) আক্রান্ত হয় আর অন্যরা আক্রান্ত হয় সংগ্রামে অংশগ্রহণ না করার জন্য। এইভাবেই চলতে থাকে (যেমন মালদা ইত্যাদি স্থানে)।

এইভাবে, আমাদের শত্রুর সংখ্যা বাড়তে থাকায় আর তার ফলে ভয়ঙ্কর নিপীড়নের মারাত্মক আতঙ্কে, কৃষকদের একটা বিরাট অংশ কংগ্রেস সেবাদলের খাতায় নাম লেখায়। আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেইসব কৃষকদের 'শত্রু' হিসেবে চিহ্নিত করে ফেলি।

সামন্ততন্ত্র এবং জমিদারতন্ত্রকে মূল শত্রু হিসেবে চিনতে পারার ক্ষেত্রে যে ব্যর্থতা তার একটা ফল হল, শিল্প ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মতো একই পথে যান্ত্রিকভাবে কৃষিমজুরদের আন্দোলনকে পরিচালিত করা। খেট-মজদুর সম্মেলনের প্রস্তুতিকালে, 'ন্যূনতম' মজুরি নির্ণয়ের

প্রশ্নটি উঠেছিল। প্রাদেশিক কমিটির কয়েকজন নেতা প্রস্তাব করেছিলেন যে, এটির পরিমাণ ধার্য করা হোক মাসিক ৮০ টাকা এবং এর ওপরে মহার্ঘভাতাও দিতে হবে। এই দাবির প্রথম খসড়াপত্রে ক্ষতিপূরণ ছাড়াই জমিদারি ব্যবস্থা উচ্ছেদের দাবি বাদ পড়ে গিয়েছিল।

তেভাগার প্রচারের সময়ও (১৯৫০) একই দৃষ্টিভঙ্গি অভিব্যক্ত হয়। ভাগচাষীদের সহায়তায় অনেক মধ্যমবর্গীয় কৃষকও নিজেদের জমি চাষ করত। কিন্তু প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক হঠাৎ একটা ফতোয়া জারি করলেন, 'তেভাগার দাবি ভুল, আমাদের চাই চৌভাগা (অর্থাৎ পুরো শস্য)'। বর্ধমান এবং অন্যান্য জেলার কমরেডরা আপত্তি জানালেন। পরবর্তীকালে, সবদিক বিচার করে আগের 'ফতোয়া' পুরোপুরি বাতিল করে আরেকটা সার্কুলার জারি করা হল।

দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে যে অসংখ্য আদিবাসী মানুষজন (যেমন সাঁওতাল, হাজং, গারো, ত্রিপুরী ইত্যাদি), সামন্ততন্ত্রে যারা সবচেয়ে বেশি শোষিত এবং অত্যন্ত জঙ্গী তাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া যে জরুরি প্রয়োজন, সেটাকে প্রাদেশিক কমিটি উপেক্ষা করল। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে, এরই ভিত্তিতে এই মানুষদের সমস্ত অংশকে দৃঢ়ভাবে জোটবদ্ধ করা যেতো, শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বের ছত্রছায়ায় তাদের একত্রিত করা যেতো, নিজেদের বিশেষ রাজনৈতিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য দাবির বিষয়ে তাদের সচেতন করা যেতো, সেই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি পার্টি কোনদিন তোলে নি।

সামন্ততন্ত্রকে মূল শত্রু হিসেবে দেখা হয়নি এবং কৃষক সংহতি গড়ে ওঠে নি—এই কারণে কিন্তু কৃষকদের আংশিক সংগ্রাম ব্যর্থ হয়নি। তা ব্যর্থ হয়েছে প্রধানত সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কে নেতৃত্বের ভুল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে।

১নং পার্টির চিঠিতে (নভেম্বর ১৯৪৯) যেখানে 'দক্ষিণবঙ্গের মুক্তাঞ্চল'-এর স্লোগান রয়েছে, সেখানেও অন্যান্য এলাকা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ "এইসব জেলার কয়েকটি অংশে কৃষিমজুর আর দরিদ্র চাষীদের যে আন্দোলন চলছে, তা এখনো সশস্ত্র অভ্যুত্থানে উন্নীত হবার পর্যায়ে পৌঁছায়নি। একবছর আগের কাকদ্বীপ এবং হাজং-এর লড়াই-এর স্তরও তারা এখনো ছুঁতে পারেনি।" (কমরেড নিতাই-এর লেখা ১৭ নং কমিউনিস্ট বুলেটিনেও এই অবাস্তব পার্থক্যরেখা আরও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে)।

কিন্তু এই 'পার্থক্যরেখা' কি কার্যক্ষেত্রে সঠিক বলে প্রমাণিত? যেখানেই কৃষকরা তাদের আংশিক দাবির জন্য সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, সেখানেই সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার মুখোমুখি হয়েছে তারা। গেরিলা যুদ্ধের কৌশলে শিক্ষিত, এক সশস্ত্র 'জঙ্গী' বাহিনী ছাড়া কোনো দাবির লড়াই-এ জেতবার কি কোনো আশা আছে? আজকে কৃষক সমাজকে এই ভয়ানক বাস্তবের মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

গ্রামে কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার কাজটিও সশস্ত্র সংগ্রামের মূল কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয়েছে। আজ গ্রামাঞ্চলে কোথাও কৃষক সমিতি কিংবা ক্ষেতমজুর সমিতির কোনো অস্তিত্ব নেই। ১৭ নং বুলেটিনে 'আইনসঙ্গত' কাজকর্ম এবং 'খোলামেলা' কার্যকলাপের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। আজকের এই গৃহযুদ্ধ আর শ্বেত সন্ত্রাসের পরিস্থিতিতে, সমস্ত অঞ্চলের জন্য এই ঢালাও নির্দেশের ফল কী? এর অর্থ আমাদের কৃষক

কমরেডরা শত্রুর হাতে পড়বে। আজ এখনো যেসব অঞ্চলে জঙ্গী আন্দোলনের দ্রুত অগ্রগতি ঘটছে, সেখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল কৃষক এবং ক্ষেতমজুরদের বেআইনি সংগঠন গড়ে তোলা আর গোপনে গণসদস্য সংগ্রহ করা। প্রাদেশিক কমিটি একথা কখনো বুঝতে পারে নি, তাই অন্যদের পথে দেখাতেও পারেনি, গ্রামাঞ্চলে গান্ধীবাদী মতবাদের বিরোধিতা করার পরিবর্তে, এইভাবে একের পর এক কমরেডদের জেলে পাঠিয়ে তারা কার্যত, গান্ধীবাদী নীতিই অনুসরণ করছে।

এইভাবে, শহরে 'অভ্যুত্থান'-এর অলীক আকাশ-কুসুমের সন্ধানে ফেরা অথচ গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র অভ্যুত্থানকে অবহেলা করা; জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেবার জন্য উদ্দীপ্ত করা অথচ জঙ্গী কৃষকদের গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতি এবং কৌশল সম্পর্কে অজ্ঞ করে রাখা; শ্রেণি-সম্পর্কের সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা করে গ্রামের ৯২% জনসমষ্টিকে অবশিষ্ট ৮% শতাংশের বিরুদ্ধে একত্রিত করতে ব্যর্থ হওয়া; যে গোপন এবং বেআইনি সংগঠন গ্রামের জঙ্গী কৃষকদের শ্বেত সন্ত্রাসের হাত থেকে বাঁচাতে পারতো, তা গড়ে তোলার কাজ অবহেলা করা—এইসব কারণে প্রাদেশিক কমিটির নেতৃত্ব যে কেবল কৃষক আন্দোলনকে তার বিশাল বৈপ্লবিক সম্ভাবনায় বিস্তৃত এবং উন্নীত করতেই ব্যর্থ হল না, শত্রুর আক্রমণের মুখে কাকদ্বীপের মতো এগিয়ে যাওয়া অঞ্চলেও যে অত্যন্ত বিপর্যয় পশ্চাদপসরণের যন্ত্রণা তার সমস্ত দায়ভাগ বইতে হবে প্রাদেশিক কমিটির নেতৃত্বকেই।

ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টে হঠকারিতার দুর্ভাগ্যজনক পরিণাম

ট্রেড ইউনিয়নের প্রথম প্রস্তাবনার (অগস্ট, ১৯৪৮) 'আঘাত করে পালাও' এই পথের বদলে নতুন প্রস্তাবনায় (কমরেড সূর্যের খসড়া) বলা হল ঃ "বন্দরের ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড, অমৃতবাজার, লয়েডস ব্যাঙ্ক, শালিমার, ভারতিয়া, ম্যানসফিল্ড, ম্যাকফরলেন, ইন্ডাসকো, অ্যালকালি কর্পোরেশন ইত্যাদির শ্রমিকদের গৌরবোজ্জ্বল উদাহরণ সমস্ত সংশয়ের অবসান ঘটিয়েছে এবং দেখিয়ে দিয়েছে যে, শ্রমজীবী জনগণকে আরো বেশি বেশি ক্ষেত্রে, চরমতম কষ্ট স্বীকার করেও লড়াই করার জন্য সংগঠিত করা যায়। অন্যদিকে আলমবাজার, টাটা, ইলেকট্রিক, ট্রাম ইত্যাদির ক্ষেত্রে দেখা গেল যে, আমরা, যারা শ্রমজীবী শ্রেণির অগ্রণী বাহিনী তাদের মধ্যে 'আঘাত এবং ক্রমাগত আঘাত' এই মনোভাবের অভাব ছিল এবং সেজন্য সাফল্যের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী এবং ধারাবাহিক সংগ্রামের পথে পরিচালিত করার জন্য যে বলিষ্ঠ নীতি ও কৌশলের প্রয়োজন ছিল তা কার্যকর করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি।"

এমন একটা সময় যখন বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রভাবে শ্রমিক শ্রেণি ভেতরে ভেতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে, যখন প্রতিদিন শ্বেত সন্ত্রাস আরো তীব্রতর হয়ে উঠছে, তখন এই প্রস্তাবনায় 'সাহসী নীতি ও কৌশল'-এর পক্ষে ঢালাওভাবে সওয়াল করা হচ্ছে, প্রতিটি ধর্মঘটকে একটি 'দীর্ঘস্থায়ী' যুদ্ধে পরিবর্তিত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গির থেকেই ২৮শে জানুয়ারি, ১৯৪৯-এর ৮ নং প্রাদেশিক কমিটির সমাচার পত্রে (কমরেড সূর্যের খসড়া) '৪৮-এর ডিসেম্বরের ট্রাম-ধর্মঘট পরিচালনার বিষয়ে সমালোচনা করা হয়। সোস্যালিস্ট নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার পরেও ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যে ব্যর্থতা তার সমালোচনা করে প্রাদেশিক কমিটি বলল, "সাধারণভাবে বলতে গেলে,

এটা অবশ্যই জোর দিয়ে বলা যায় যে, সমস্ত পার্টি সদস্য এবং ট্রামের জঙ্গী কমরেডরা যদি একটা সাহসী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পদক্ষেপ নিতেন, তাহলে ২২ তারিখ সকালেও ধর্মঘট ভেঙে-যাওয়া এড়ানো যেত....। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে, সমস্ত রকম নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও আমাদের অগ্রণী কমরেডরা ভয় পেয়ে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন।"

এইভাবে, ঠিক যখন সরকারি নিগ্রহের হাত থেকে অগ্রণী শ্রমিক কমরেডদের বাঁচানোর জন্য সমস্ত রকমের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেবার দায়িত্ব ছিল পার্টি নেতৃত্বের, তখন সেই কমরেডরা নিজেরাই নিজেদের বাঁচিয়েছে বলে তাঁদের নিন্দা করা হচ্ছে।

এরই অল্প কিছুদিন পরে, এল মার্চের ৯ তারিখ এবং শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম পরিচালনার জন্য একটা নতুন লাইনের খসড়া তৈরি করা হল। কী সেই নতুন লাইন? II নং কমিউনিস্ট বুলেটিনের ভাষায় ঃ "ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেবার সময়, কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই সিদ্ধান্তকে মেনে নেবে কিনা সেকথা বিচার করবে না, বরং শ্রমিকদের স্বার্থের দিক থেকে, তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়ানোর জন্য এটা প্রয়োজনীয় কি না সে কথাই বিচার করবে।" একবার এই লাইন গ্রহণ করার পর কলকাতার রাস্তায় প্রতিটি সংঘর্ষের ঘটনাতেই পার্টি, শ্রমিকদের 'সাধারণ ধর্মঘট'-এর আহ্বান জানিয়ে নির্দেশ জারি করে। ধর্মঘট হোক বা না হোক, পরবর্তী ক্ষেত্রে প্রতিটি ধর্মঘটের ডাক সব সময় সঠিক বলে মনে করা হল। উপর্যুপরি রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়ে চললো পার্টি—১৯৪৯ সালের এপ্রিলে, জুনে আর ডিসেম্বরে, পঞ্চাশের জানুয়ারিতে এইরকম পরপর—কিন্তু ব্যাপকতম শ্রমিকরা কখনোই তাতে সাড়া দিল না (কয়েকটি হাতে-গোনা ছোট ছোট কারখানা ছাড়া)।

এমনকি ৯ই মার্চের ব্যর্থতাব অব্যবহিত পরেও, কলকাতা শহর এবং শহরতলীর শ্রমিকরা কংগ্রেসী ও সোস্যালিস্টদের বিভেদমূলক কাজ, সরকারি নিপীড়নকে অগ্রাহ্য করেছে। হাওড়া ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা, জয়া ইঞ্জিনীয়ারিং, পানাগড় অর্ডন্যান্স ডিপো, ব্রেথওয়েট, ক্যালেডোমান, কামারহাটি, শিবপুর, বাউড়িয়া আর অন্যান্য সমস্ত চটকল তাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে বারবার আন্দোলিত হয়েছে। কিন্তু এইসব সংগ্রাম থেকে পার্টি নেতৃত্ব কী শিখলেন?

৬ই মে-র **ট্রেড ইউনিয়ন ইনফরমেশন ডকুমেন্ট**-এ (কমরেড সূর্য্য-র তৈরি খসড়া) তাঁরা লক্ষ্য করলেন, "যদি কোন ধর্মঘট সফলভাবে পরিচালিত করা যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে আরো বেশি জনসমষ্টিকে এই সাধারণ লড়াই-এর আওতায় এনে, ১৪৪ ধারা এবং নিষেধাজ্ঞামূলক আইন অমান্য করে, মেশিন এবং কাজের জায়গা জোর করে দখল করে নিয়ে, ছাঁটাই-এর আদেশকে একসাথে অমান্য করে আর যেখানে সম্ভব সেখানে ধর্মঘটের কার্যসূচি গ্রহণ করে লড়াইকে আরো উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে।"

যেসব ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী এই পথে সংগ্রাম পরিচালিত করা অসম্ভব বলে মনে করছে তাদের প্রসঙ্গ টেনে, **ইনফরমেশন ডকুমেন্ট**-এ বলা হল ঃ "এই সংগ্রামের অগ্রগতির ক্ষেত্রে এবং নেতৃত্বের প্রশ্নে সবচেয়ে গভীর যে দুর্বলতা চোখে পড়ছে তা হল সংশোধনবাদী দোদুল্যমানতা, তার সঙ্গে ভীরুতার মনোভাব এবং এই মনোভাব এখনো পর্যন্ত আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন এবং কর্মীদের বিরাট অংশকে দখল করে রেখেছে।"

মে-জুন মাসে, পটারি, অ্যালেন বেরি, টেক্সম্যাকো, ন্যাশনাল কার্বন এবং অন্যত্র শ্রমিকদের সংগ্রাম শুরু হল। তাদের সবকটিই সেই একই মনোভাবে পরিচালিত হল যে,

সরকারের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী এবং প্রয়োজনীয়। ৩ নং ট্রেড ইউনিয়ন অর্গানাইজার-এ এই কৌশল অভিব্যক্ত হলো এইভাবে ঃ "কারখানাকে যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে ধরে নিয়ে যেখানে ছোটখাটো গৃহযুদ্ধ চালাতে হবে, সেখানে সর্বহারা শ্রেণির প্রথম এবং শেষ স্লোগান অবশ্যই হবে 'আক্রমণ, আক্রমণ আর আক্রমণ'।"

অক্টোবরে কর্পোরেশনের কর্মচারীরা ধর্মঘটে নামল। কর্মচারীদের জঙ্গী মনোভাব আর ঐক্যবদ্ধতার কারণে আই এন টি ইউ সি নেতৃত্ব অন্তত লোক-দেখানোর জন্যেও ধর্মঘটের পক্ষে দাঁড়াতে বাধ্য হল। কিন্তু সুরেশ ব্যানার্জীর বিভেদকামী কার্যবিধিকে পরাস্ত করতে আমরা ব্যর্থ হলাম। ৯ দিনের পর আর ধর্মঘট চালানো গেল না। যে-সব শ্রমিক-কর্মচারী কংগ্রেসের খপ্পরে রয়েছে তাদের সন্দেহের চোখে দেখার যে সংকীর্ণ মনোভাব পার্টির সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে ছিল, সেই মনোভাবই এই ব্যর্থতার জন্য আরো একবার দায়ি হয়ে রইল। একবারে নীচের তলা থেকে শ্রমিক-কর্মচারীদের সমস্ত অংশ নির্বিশেষে একটা সার্বিক অভেদ্য ঐক্য গড়ে তোলার সুযোগ ছিল। কিন্তু পার্টি নেতৃবৃন্দ তাঁদের এই দায়িত্ব অবহেলা করলেন। পার্টির সমস্ত অংশকে এই ধর্মঘটের সমর্থনে সংগঠিত করতে পার্টি ব্যর্থ হল; সমস্ত স্তরের পার্টি কমরেডদের সামনে শ্রমিক শ্রেণির ব্যাপকতম একতার নিদর্শন হিসেবে এই ধর্মঘটের গুরুত্ব বোঝাতে ব্যর্থ হল। এই ঘটনা থেকে যে মৌলিক শিক্ষা পাওয়া গেল যেমন, সর্বাত্মক একতার ভিত্তিতে শ্বেত সন্ত্রাসের সময়েও ধর্মঘট পরিচালনা করা যায়, পুঁজিবাদী আক্রমণ ঠেকাতে মিছিল, বিক্ষোভ এই সমস্ত কর্মসূচিও গ্রহণ করা সম্ভব—কিন্তু কর্পোরেশনের ধর্মঘটের পর্যালোচনায় (কমরেড নিতাই-এর খসড়া) এই শিক্ষাকে অভিবাদন জানানো হল না।

মে মাসে, চটকলের বড়কর্তারা যখন আক্রমণ শুরু করল, তখন চটকল শ্রমিকদের সাধারণ অংশের সঙ্গে পার্টির যোগসূত্রকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ধর্মঘটসহ নমনীয় নানান পদ্ধতি প্রয়োগ করে স্থিরভাবে সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তোলার পক্ষে একটা অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হল। কিন্তু এসবের বদলে, প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক একটা স্লোগান তুললেন, "ছাঁটাই হোগি তো পিটাই হোগি"।

এর পরিণতি হল এই যে, সরকারি মদতপুষ্ট মালিকদের আক্রমণের মুখে, আমাদের অসংখ্য কমরেডকে প্রাণ দিতে হল আর সাধারণ কর্মচারীদের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র আগের চেয়ে আরো দুর্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু এতসব কিছুর পরেও ৮ই নভেম্বর পাটশিল্পে সাধারণ ধর্মঘট 'আহ্বান' করা হল। ফ্যাসিস্ট অত্যাচারের যে বাস্তব পরিস্থিতি তার সামনে দাঁড়িয়ে জঙ্গী শ্রমিক-কর্মচারীরা সঠিকভাবেই কোনো আইনি ধর্মঘট কমিটিতে যোগ দিতে ইতস্তত করল এবং অনেক জায়গায় সংগঠকেরা বেআইনি এবং গোপন ধর্মঘট কমিটির মাধ্যমে কাজ করার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল। ৮ই নভেম্বরের পর্যালোচনায়, প্রাদেশিক কমিটির নেতৃবৃন্দ এইসব কমরেডদের আক্রমণ করে বললেন, "অনেক জায়গায় গোপন ধর্মঘট কমিটি গড়া হয়েছে, এবং একেবারে প্রথম দিন থেকেই এমনকি কর্মচারীদের কাছ থেকেও এই কমিটির কথা গোপন রাখা হয়েছে"।

আক্রমণের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য পার্টি কর্মীদের পরিচয় গোপন রাখার বদলে, তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হল মিলের গেটে, ঠেলে দেওয়া হল বেআইনি বিক্ষোভের মাঝখানে। ফলে, সাধারণ শ্রমিকদের সঙ্গে আমাদের অবশিষ্ট শেষ যোগসূত্রও ধ্বংসে হয়ে গেল। কিন্তু এই

বিধ্বংসী ফলাফলকে প্রাদেশিক কমিটির নেতৃত্ব এমনভাবে ব্যাখ্যা করল যেন বিশাল কিছু পাওয়া গেছে (সূত্র ঃ ৮ই নভেম্বরের পাটকল ধর্মঘটের পক্ষে প্রচারাভিযানের পর্যালোচনা) (কমরেড সূর্যের খসড়া)। একেবারে ঠিক একইরকমভাবে ৩ নং টি ইউ সি অর্গানাইজারে প্রমাণ করা হল যে, ২রা জানুয়ারি (১৯৫০) সারা দেশের কাপড় কলে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া উচিত এবং কেশোরাম কটন মিলে এই ধর্মঘট সফল করা সম্ভবও হল। কিন্তু অন্য সমস্ত কারখানাগুলোতে এই ধর্মঘট যে ব্যর্থ হল, আবার তার দায় গিয়ে পড়ল ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের ওপর।

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসেও এই হঠকারী ট্রেড ইউনিয়ন নীতি গ্রহণ করা হল।

সাম্রাজ্যবাদের দালালরা সবসময় অবশ্যই অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন ও ব্যাহত করার চেষ্টা চালাচ্ছিল। সেই বিচ্ছিন্নবাদী শক্তি টি ইউ সি-র নামে কুৎসা ছড়াতে, কলঙ্ক রটাবার জন্য একটা নতুন অস্ত্র পেয়ে গেল টি ইউ সি নেতৃত্ব যখন তাদের ট্রটস্কিপন্থী নীতি ও কৌশল প্রয়োগ করতে শুরু করল, তখন টি ইউ সি-র ডাকা প্রত্যেকটি বিক্ষোভ এবং মিটিং শেষপর্যন্ত পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র লড়াই-এ পর্যবসিত হত, তখন যে-কোন সামান্য ছুতোয় টি ইউ সি মুহুর্মুহু দায়িত্বজ্ঞানহীন সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিতে শুরু করল।

নতুন প্রাদেশিক কমিটি তৈরি হবার আগেই এম কে বোস এবং অন্যান্য 'বাম' নেতারা 'বিশ্বাসঘাতক' হিসেবে 'বহিষ্কৃত' হলেন। এই বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ এবং পার্টির ট্রটস্কিপন্থী নীতির পূর্ণ সুযোগ নিয়ে রায় মন্ত্রিসভা তাদের অত্যাচার অনেক অনেক বেশি তীব্রতর করে তুলতে সক্ষম হল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের বিপুল সংখ্যায়, এমনকি 'সত্যাগ্রহী'-র কায়দায় গ্রেপ্তার করা হল।

এ আই টি ইউ সি (১৯৪৯)-এর বম্বে অধিবেশনের সময় বাংলার প্রতিনিধিদের এমন একটা ধারণা দিয়ে পাঠানো হয়েছিল যেন তাঁরা নেহরু সরকারের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করতে যাচ্ছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই সার বুঝেছিলেন যে, সম্মেলন হোক আর না হোক, 'সংঘর্ষ' একটা হবেই। সরকারের প্ররোচনার ঘটনায়, বোম্বের নেতৃত্বে অন্যান্য প্রদেশের প্রতিনিধিরা শান্তিপূর্ণভাবে সম্মেলনে চালানোর পক্ষে দাঁড়িয়ে যখন সংঘর্ষের বিরোধিতা করেছিলেন, তখন বাংলার প্রতিনিধিরা অত্যন্ত উত্তেজিত ভঙ্গিমায় অসম্মতি প্রকাশ করে তাঁদের 'সংশোধনবাদী' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে এমনই বুর্জোয়া প্রাদেশিকতার ধারণায় এমন মোহগ্রস্ত ছিলেন যে, তাঁরা ভাবতেন, "বাংলার কমরেডরা ছাড়া আর কেউই যোদ্ধা নয়"। পরে যখন প্রাদেশিক কমিটি এই অধিবেশনের পর্যালোচনা করল তখন অত্যন্ত অসততার সঙ্গে নিজেদের দায়িত্বের বিষয়ে একটি কথাও বলল না এবং পুরো দোষ চাপিয়ে দিল প্রতিনিধিদের ওপর। তাদের 'পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবী' বলে ভর্ৎসনা করা হল। ("পশ্চিমবাংলায় সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর।")

এইভাবে, ট্রেড ইউনিয়নে ট্রটস্কীয় নীতি প্রয়োগের ফলে, সমস্ত ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটিগুলি তুলে দেওয়া হল। ইউনিয়ন এবং শিল্পসমূহে পার্টির যে ফ্র্যাকশনগুলি ছিল বারেবারেই তাদের পুনর্গঠিত করতে হল আবার তারা নানান নিপীড়নে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে লাগল। ট্রেড ইউনিয়নের দৈনন্দিন কাজে এবং খুঁটিনাটিতে পার্টির দখলদারি ক্রমশ বাড়তে লাগল। প্রতিটি ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নিত উচ্চতর কমিটি এবং তা 'কার্যকরী' করার দায়িত্ব ছিল

পার্টি কমিটি এবং অ্যাকশন কমিটির ওপর। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই কমিটি শ্রমিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, তাদের অনেক সিদ্ধান্ত বাস্তবানুগ ছিল না, ট্রেড ইউনিয়ন কমরেডদের ওপর জোর করে ধর্মঘট চাপিয়ে দেওয়া হয়। অথচ সেই ধর্মঘটের অসাফল্যের দায় গিয়ে পড়ত ঐ কমরেড-দেরই ওপর। প্রায়শই তাদের গায়ে 'সংশোধনবাদী' এই মার্কা লাগানো হয়। তাদের যথেচ্ছভাবে এক শিল্প থেকে কিংবা একটি অঞ্চল থেকে অন্যত্র স্বেচ্ছাচারী, আমলাতান্ত্রিক কায়দায় সরিয়ে দেওয়া হয়। পেটি-বুর্জোয়া সংগঠকদের দায়িত্বশীল পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

শ্রমিক শ্রেণির সংহতি, তাদের সংঘবদ্ধ করা, শিল্প কারখানার কমিটি, জঙ্গী গ্রুপ ইত্যাদি প্রশ্নে পার্টি নেতৃবৃন্দ পুরোপুরি খোঁড়া, যান্ত্রিক মনোভাব তৈরি করেছিলেন। শ্বেত সন্ত্রাসের রক্তচক্ষুর সামনে যে পটারি শ্রমিকরা এমন এক বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, দীর্ঘ ছয় মাস ধরে ধর্মঘট প্রলম্বিত করে তাদের লড়বার ক্ষমতাকেই ধ্বংস করে দেওয়া হল। বিভেদের চেষ্টা সত্ত্বেও ট্রাম-শ্রমিকরা তাঁদের সর্বস্তরের কর্মীদের মধ্যে নানান কর্মসূচিতে ঐক্য বারেবারে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু পার্টি তাদের কাছে এই প্রশ্ন তুলল যে, এই ঐক্য শর্তসাপেক্ষ না শর্তহীন অর্থাৎ তাঁরা পার্টির নীতিকে পুরোদস্তুর গ্রহণ করছেন কিনা। একটা সময় যখন শ্রমিকরা অত্যাচারের কথা মনে করে খোলাখুলি কারখানায় ছোট দল কিংবা জঙ্গী দল গড়ে তুলতে চাইছিলেন না, তখন পার্টি প্রকাশ্য সভা থেকে সেইসব কমিটি আর গ্রুপ নির্বাচিত করার নির্দেশনামা পাঠিয়েছিল।

প্রতিক্রিয়াশীল ইউনিয়নের ভেতরে কাজ করা, আই এন টি ইউ সি এবং সোস্যালিস্ট দল পরিচালিত ইউনিয়ন শ্রমিকদের ওপর যাদের বেশ প্রভাব আছে তাদের মধ্যে গোপন ফ্র্যাকশনাল কার্যকলাপ চালানো—এইসব কাজ একেবারেই অবহেলা করা হয়েছিল—বিচ্ছিন্ন দু-একটি ক্ষেত্রে করা হয়েছিল দায়সারা ভাবে। পূর্ব পাকিস্তানেও ঐ একই চেহারা। অথচ শ্বেত সন্ত্রাস এবং সাধারণ ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপকেও কার্যত বেআইনি বলে ঘোষণা করা, এরকম একটা পরিস্থিতিতে শ্রমিক শ্রেণির সংহতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই ধরনের কৌশল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আসানসোলের কমরেডরা বার্ণপুর ইঞ্জিনীয়ারিং শ্রমিকদের মধ্যে এই কৌশল অবলম্বন করে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটিয়েছিলেন, কিন্তু প্রাদেশিক কমিটি এরকম কোন ব্যাপারে তাঁদের কোনো পথনির্দেশ করেনি। পশ্চিমবাংলার শ্রমিক শ্রেণির একটা বেশ বড়োসড়ো অংশে বিহারী, উত্তরপ্রদেশী, ওড়িয়া এবং অন্যান্য প্রদেশের জাতিগোষ্ঠীর শ্রমিক রয়েছেন, যাঁরা একত্রে পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক শ্রেণির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। তাঁদের প্রতি যে মনোভাব দেখানো হয়েছে সেটি বুর্জোয়া-প্রাদেশিক ধ্যানধারণার আর একটা উল্লেখযোগ্য, জ্বলন্ত উদাহরণ। এই অবাঙালী শ্রমিকদের ব্যাপকতর অংশকে পার্টির রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক প্রভাবের আওতায় আনতে না পারলে শ্রেণি-সংহতি গড়ে তোলা অসম্ভব। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণির সংহতির প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা বিষয়ে প্রাদেশিক কমিটির সংকীর্ণ উপলব্ধিতে যে কার্যসূচি গ্রহণ করল তাতে কার্যত ঐ শ্রেণির শ্রমিকদের সঙ্গে পার্টির যে যৎসামান্য যোগাযোগ ছিল তা আরো ক্ষীণ হয়ে গেল। বিশেষ করে হিন্দুস্থানী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই ঘটনা বেশি করে ঘটল। পার্টির খুব কম কাগজপত্রই হিন্দীতে প্রচারিত হত আর উর্দুতে তো আরো কম। ঐসব ভাষায় বৈধ পত্রিকা প্রকাশের বিষয়টি কখনও গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়নি। হিন্দী 'স্বাধীনতা' পত্রিকাকে অত্যন্ত খারাপভাবে অবহেলা করা হয়েছে এবং অনেকদিন পর্যন্ত শুধুমাত্র বাংলা পত্রিকাটির অনুবাদ

ছাড়া এতে আর কিছুই থাকতো না। পার্টির অনেক গুরুত্বপূর্ণ দলিল অনূদিত হত না, ফলে হিন্দী ভাষাভাষী কমরেডরা সেই দলিলের বিষয় থেকে বঞ্চিত হত, হিন্দী ভাষাভাষী জঙ্গী কর্মীদের কখনো পার্টিতে জায়গা দেওয়া হয়নি, উল্টে তারা যাতে নিষ্ক্রিয় হয় সে চেষ্টা করা হয়েছে। এইসব শ্রমিকদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কংগ্রেসের প্রতি যে জোরালো মোহগ্রস্ততা ছিল তার বিরুদ্ধে কখনই সচেতনভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে লড়াই চালানো হয়নি।

পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা শ্রেণি হিসেবে 'অবিশ্বস্ত'—এই ধারণার মোহে পড়ে, প্রাদেশিক কমিটি সরকারি এবং সওদাগরী কর্মচারীদের আন্দোলনকে কেবলমাত্র অবহেলাই করেনি, এমনকি তাকে ভেতরে ভেতরে দুর্বল করে দিয়েছে, অন্তর্ঘাত চালিয়েছে। সরকারি ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, রেল এইসব ক্ষেত্রের কর্মচারীরা, শিক্ষক, অধ্যাপক, এরা সকলেই বারবাব পার্টির নেতৃত্বে অনেক বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়েছেন। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাদেশিক কমিটি আন্দোলনের নেতৃবর্গকে গণসংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, 'পথ-সংঘর্ষ'-ই তাদের প্রধান কাজ এই বলে এই ধরনের ঘটনায় তাদের জড়িয়ে ফেলেছে। যখনই কর্মচারী কমরেডরা সমস্ত স্তরের কর্মচারীদের সার্বিক ঐক্যের প্রয়োজন অনুভব করে কোনো পদক্ষেপ নেবার চেষ্টা করেছেন, তখনই তাঁদের 'সংশোধনবাদী' বলে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

'অর্থনৈতিক ধর্মঘটকে রাজনৈতিক যুদ্ধে পরিণত করতে হবে', 'বিপ্লবী পদ্ধতিতে ৮০ টাকার ন্যূনতম মজুরি 'জয় করে নিতে হবে' ইত্যাদি ইত্যাদি সব বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও, বাস্তবে প্রাদেশিক কমিটি যে গোটা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে অরাজনৈতিক পথে পরিচালিত করেছিল সে কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সর্বহারা শ্রেণির ভূমিকা বিষয়ে সম্পূর্ণ বিকৃত ধারণা পোষণ করার জন্য, গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবে শ্রমিক-কৃষক জোটকে দেখতে পাওয়ার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অন্ধত্ব, এই সবের কারণেই শহরের আন্দোলনকে কখনোই গ্রামাঞ্চলের সশস্ত্র সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করা যায়নি। শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে কৃষক সংগ্রামকে, এমনকি তেলেঙ্গানা, কাকদ্বীপ এবং ময়মনসিংহের পাহাড়ী অঞ্চলের কৃষক সংগ্রামকেও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য কোন গভীর প্রচেষ্টা চালানো হয়নি। জনগণতান্ত্রিক সংগ্রামে তার সবচেয়ে দৃঢ়, নির্ভরযোগ্য যে সাথী, একমাত্র ক্ষেতমজুর সম্মেলনের বিচ্ছিন্ন একটা ঘটনা ছাড়া, সেই বিপ্লবী কৃষক আন্দোলনকে শ্রমিকশ্রেণি কখনো নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেনি।

ছাত্র আন্দোলনে সংকীর্ণতা ও হঠকারিতা

জঙ্গী মনোভাব এবং ব্যাপকতার বিচারে গত দু'বছরের ছাত্র আন্দোলন যে '৪২ সালের ছাত্র-অভ্যুত্থানকে ছাপিয়ে গেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। অমৃতবাজার পত্রিকা এবং বন্দরের ধর্মঘটীদের সমর্থনে সেপ্টেম্বরের (১৯৪৮) সংগ্রাম, ১৪৪ ধারার বিরুদ্ধে এবং উদ্বাস্তুদের সমর্থনে জানুয়ারির ১৮ই-১৯শে (১৯৪৯)-এর সংগ্রাম, কর্তৃপক্ষের পরীক্ষা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে মেডিক্যাল ছাত্রদের সংগ্রাম, বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রদের লড়াই এবং তাদের প্রতি সহমর্মিতায় ও দমনপীড়নের বিরুদ্ধে সাধারণ ধর্মঘট, ধর্মঘটরত শিক্ষকদের সমর্থনে এবং বর্ধিত মাইনের বিরুদ্ধে ধর্মঘট—এই সমস্তই বাংলার ছাত্র সংগ্রামে নতুন ইতিহাস রচনা করেছে। এই সবকটি লড়াই-এর অগ্রভাগে ছিল পার্টির ছাত্র কমরেডরা।

কিন্তু এ সমস্ত সত্ত্বেও, ছাত্র আন্দোলন এবং সংগঠন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল কেন? 'ছাত্র-ফ্রন্ট' বলতে কেন শুধুমাত্র পার্টি সদস্য আর দরদীদের কথাই বোঝানো হয়? পার্টি কংগ্রেসের থিসিসে এ ধারণাই জন্ম দিয়েছিল যে, 'সমাজতন্ত্র'-এর জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত নয় এমন কোনও ছাত্রের ছাত্র ফেডারেশনে জায়গা নেই। সংশ্লিষ্ট পলিটব্যুরোর দলিলের থেকে এই লাইন তৈরি হল যে, শাসক শ্রেণিতে এখন রয়েছে 'বুর্জোয়ারা', এবং ছাত্ররা নিজেরাই বুর্জোয়া শ্রেণি থেকে আসছে। তাই এরা কখনোই শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে সংগ্রামে নির্ভরযোগ্য মিত্র হয়ে উঠতে পারবে না। জানুয়ারির ১৮ই-১৯শে-র লড়াই-এর পর্যালোচনায় (কমরেড রবির খসড়া) পার্টি নেতৃবৃন্দ বললেন যে, এই লড়াই-এর সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণি যুক্ত না হবার কারণেই এটি ক্ষমতা দখলের শেষ পরিণতিতে পৌঁছতে পারেনি।

এই বোঝাপড়ার বশবর্তী হয়েই পার্টি নেতৃবৃন্দ ছাত্র আন্দোলনকে কেবলমাত্র 'মার্ক্সবাদী' ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন, শ্বেত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কোনোরকমের সতর্কতা ছাড়াই চেষ্টা করেছিলেন 'পথ-সংঘর্ষ'-এ তাদের 'যাচাই' করে নিতে (জানুয়ারির সংগ্রামের পর্যালোচনায় শ্বেত সন্ত্রাসের বিষয়ে কোনো সতর্কবাণী ছিল না)। ছাত্র আন্দোলনকে পরিচালিত করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে যার ওপর দায়িত্বভার ন্যস্ত ছিল, সেই কমরেড যতীন ২২.১০.৪৬ তারিখে কমরেড নন্দনকে লিখেছিলেন যে, ছাত্র ফেডারেশন এবং ছাত্র ফ্র্যাকশনের মধ্যে কোন পার্থক্য টানার দরকার নেই, কেননা ছাত্র ফেডারেশনের মধ্যে পার্টির বাইরের কোন ছাত্র নেই। বরং এইরকম পার্থক্য টানলেই বৃহত্তর আন্দোলনের কাজে বাধা আসবে। কমরেড রণদিভের 'ছাত্র সংগ্রাম প্রসঙ্গে টীকা'তে সাধারণ ছাত্রদের 'দোদুল্যমানতা'-র আরো বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং পুঁজিবাদ-বিরোধী ছাত্র ফ্রন্টের ধারণাকে আরো সংকীর্ণ করে তোলা হয়েছে।

ছাত্র ফেডারেশন যেন একটা 'পার্টি' ফ্রন্ট এরকম ভাবে ভাবা হত এবং সেরকম ব্যবহারও করা হত। যখনই 'অভ্যুত্থান' ঘটানোর উদ্দেশ্যে কোন সংগ্রাম শুরু করা হত, তখনি সাধারণ ছাত্রদের মনোভাবকে পরোয়া না করে পার্টির ছাত্রদের সেই সংগ্রামের মুখে ঠেলে দেওয়া হত। সাধারণ ছাত্রদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পার্টির ছাত্ররা মিটিং করতো, বিক্ষোভ সমাবেশ করতো, পুলিশের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠত, 'বিশেষ' স্কোয়াডের সঙ্গে মিলে থানা আক্রমণে অংশ নিত, রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড গড়ে তুলতো। এমনকি যখন এই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে তখনো কমরেড নন্দন (সামগ্রিকভাবে প্রাদেশিক কমিটি কখনোই ছাত্র সংগ্রামকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখেনি) ৩.১.৫০ তারিখে একটা সার্কুলার জারি করলেন, **"সবদিক থেকে আক্রমণ কর, নিজেকে সশস্ত্র কর, বিক্ষোভের আগে এবং বিক্ষোভ চলাকালীন সকলকে সশস্ত্র কর, নিজেদের একটুও ক্ষতি না করে শত্রু শিবিরে বিপুল ক্ষতি ডেকে আনো,.....কমরেড সব, সতর্ক থাকো, যখন যেখানে সম্ভব পুলিশের হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নাও।"**

চীনের অপরাজেয় ছাত্র আন্দোলনের অভিজ্ঞতা আমাদের গোচরে ছিল। এটাও জানা ছিল কেমন করে চীনের কমরেডরা আমেরিকার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপকভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐক্য গড়ে তুলেছিল, খাদ্য, শিক্ষা আর গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে গড়ে তুলেছিল চিয়াং-বিরোধী জোট। ১৯৪৮-৪৯ সালের প্রধান প্রধান

ছাত্র-আন্দোলনগুলিতে এখানেও স্বতস্ফূর্তভাবে এই ধরনের সংহতি অর্জন করা যেতো কিন্তু পার্টি নেতৃত্বের সংকীর্ণ মনোভাবের জন্য এই বিরাট সম্ভাবনা প্রায় শেষ হয়ে গেল।

পার্টি লক্ষ লক্ষ শক্তিশালী সাধারণ ছাত্রদের অচ্ছুৎ করে রাখল, 'জঙ্গী'-দের একটা সংকীর্ণ বৃত্তের মধ্যে নিজেকে আটকে রাখল আর তাদের একেবারে বিচ্ছিন্নভাবে বারবার সংঘর্ষের মুখে ঠেলে দিল। কৃষক ফ্রন্ট এবং ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টে যেসব ছাত্রদের পাঠানো হল তাদের না দেওয়া হল মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষা, না দেওয়া হল ঐ ফ্রন্ট সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতার চেতনা, যাতে তারা এইসব আন্দোলনে স্রষ্টা এবং সংগঠক হিসেবে সত্যিকারের সক্ষম হয়ে উঠতে পারে। যেমন করে হোক শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে 'জঙ্গী' কার্যকলাপে জড়াতে হবে আর 'সংঘর্ষে' লিপ্ত হতে হবে এই ধারণা মগজে পুরে তাদের পাঠানো হয়েছিল। এই নীতি ছাত্রদের মধ্যে শ্রমিক-কৃষক শ্রেণি অভিমুখী চেতনা জাগ্রত তৈরি করতে পারেনি তো বটেই, বরং কখনো কখনো এর ঠিক উল্টো ঘটনা ঘটেছিল। শ্রমিক এবং কৃষকরা, ছাত্রদের তুলনায় 'কম' বিপ্লবী এরকম একটা তত্ত্ব তাদের মনে তৈরি হয়েছিল।

এই বাম হঠকারিতা ছাত্র আন্দোলনে বিভেদকামীদেরই সুবিধা করে দিয়েছিল। ছাত্র ফেডারেশনকে আক্রমণ করার এই সুযোগ তারা কাজে লাগাল (বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ৯ই অগস্টের ঘটনা) আর সাধারণ 'বাম' ছাত্রদের মনে বিভ্রান্তি জাগিয়ে তুলল। আমাদের সংকীর্ণ মনোভাব থেকে তখন বলা হত "যদি তুমি পার্টির নীতি একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মেনে না নাও তবে তুমি দালাল"। এরই জন্য সর্বস্তরের ছাত্রদের নিয়ে একটা 'সংযুক্ত অ্যাকশন কমিটি' গড়ে তোলার প্রচেষ্টা বারবার ব্যর্থ হল। এই ক্রমবর্ধমান অনৈক্য, প্রতিটি ছাত্র মিটিং বা বিক্ষোভকে পুলিশের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে পরিণত করার ক্রমবর্ধমান হঠকারী প্রচেষ্টা, এরই সুযোগ নিয়ে সরকার ছাত্র ফেডারেশনকে বেআইনি ঘোষণা করার সাহস পেল, অগ্রণী ছাত্র কমরেডদের গ্রেপ্তার করল, আর সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে ছাত্র ফেডারেশন বিরোধী বিভ্রান্তিকর প্রচার চালাতে লাগল।

দমনপীড়ন এবং বিভেদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর কর্মসূচি নেবার বদলে, পার্টি নেতৃবৃন্দ ছাত্রদের 'অনির্দিষ্টকালের' জন্য 'সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘটে' সাড়া দিতে বললেন। ২ নং পার্টি চিঠি ২২.১২.৪৯ (কমরেড নন্দনের খসড়া)-তে লেখা হল, "নিরবচ্ছিন্ন সাধারণ ধর্মঘট, জঙ্গী মিছিল আর আক্রমণাত্মক বিক্ষোভের মাধ্যমে হাজার হাজার ছাত্র, শিক্ষক এবং অধ্যাপকদের সম্মিলিত শক্তি অবশ্যই ঝড় তুলবে। এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করতেই হবে যাতে রায় মন্ত্রিসভা ছাত্র, শিক্ষক আর অধ্যাপকদের প্রধান প্রধান দাবিগুলি হয় মেনে নিতে বাধ্য হবে, নয়ত তাদের ক্ষমতা থেকে হঠিয়ে দেওয়া হবে" এ বিষয়টি সাধারণ এই আহ্বানের সঙ্গে বাস্তবের কোন যোগ ছিল না এবং তাই ব্যাপকতম ছাত্র ও শিক্ষকরা যে তা বুঝতে পারেননি এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

নারী আন্দোলনে বাম সুবিধাবাদ ও আরো কয়েকটি বিষয়

আরো কদর্যভাবে এবং অনেক বেশি দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে প্রাদেশিক কমিটি নারী আন্দোলনকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেছিল।

বাংলায় বরাবরই নারী আন্দোলনের প্রধান ভিত্তি ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মহিলারা। খাদ্য

এবং অন্যান্য দাবিতে প্রচারাভিযানের মাধ্যমে নাগরিক পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণির একটা বিশাল অংশে পার্টি তার প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। ঠিক যে সময়ে এই অর্থনৈতিক সংকট আরো গভীর হল সেই সময়ে এই প্রভাবকে আরো সংহত এবং বিস্তৃত করা সম্ভব হয়ে উঠতে পারত। আর তখনই পার্টি সম্পাদকমণ্ডলী নির্দেশনামা জারি করল, "মহিলা সেলগুলি ভেঙে দাও ঃ সমস্ত মহিলা কমরেডরা হয় শ্রমিকদের মধ্যে কিংবা কৃষক ফ্রন্টে কাজ করবে"। প্রাদেশিক মহিলা 'টিমে' মধ্যবিত্ত শ্রেণির মহিলাদের সংখ্যা কমিয়ে, সেখানে কৃষক ও শ্রমিক মহিলা কমরেডদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করে, বাহিনীগুলি পুনর্গঠিত করা হল। সুতরাং মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্ভাবনা রুদ্ধ হয়ে গেল। মহিলা ফ্রন্টে কেবলমাত্র গুটিকয়েক পার্টি সদস্য এবং দরদি রইলেন।

পার্টির প্রতিটি শ্লোগান এবং সিদ্ধান্ত ঘোষণার মঞ্চ হিসেবে আত্মরক্ষা সমিতির নাম ব্যবহৃত হতে শুরু করল। আত্মরক্ষা সমিতির নামে ডাকা প্রতিটি মিটিং কার্যত পুলিশের সাথে সংঘর্ষে গিয়ে ঠেকছে এই দেখে সাধারণ মহিলাদের মধ্যে কম এগিয়ে-যাওয়া একটা অংশ আরো বেশি বেশি করে ভয় পেতে লাগলেন। সমিতির বৈধ পত্রিকাটিতে সেইসময় কেবলই গাদা গাদা 'মারো-কাটো' জাতীয় আবর্জনা বের হচ্ছে। এই নীতিতে যাঁরা অসম্মতি প্রকাশ করলেন—বেশির ভাগই পার্টির বাইরের মহিলারা—তাঁদের দুর্বলচিত্ত, ভীরু বলে ভর্ৎসনা করা হল।

৯নং কমিউনিস্ট বুলেটিন (কমরেড নিতাই-এর খসড়া)-এ বলা হল, "আজকের দিনে দোদুল্যমান পেটি-বুর্জোয়া মহিলাদের ওপর নির্ভর করে, উচ্চ শ্রেণির মহিলাদের সঙ্গে সমঝোতা করে আন্দোলন করা অসম্ভব....আমাদের মহিলা কমরেডদের অবশ্যই শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলনে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং শ্রমিক এবং কৃষক মহিলাদের সবচেয়ে ভাল অংশটিকে পার্টিতে আনতে হবে"।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কী ঘটল? বিরাট গ্রামাঞ্চল জুড়ে, কৃষক রমণীরা বারবার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন, অতুলনীয় বীরত্ব দেখিয়েছেন, নিজেদের জীবনের বিনিময়ে পার্টি কর্মীদের বাঁচাতে পুলিশের বুলেটের সামনে বুক পেতে দিয়েছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে কাজ করার জন্য মহিলা কমরেডদের পাঠানো হয়নি, আর এইসব বীরাঙ্গনাদের আত্মরক্ষা সমিতিতে নেওয়া হয়নি। 'পথ সংঘর্ষের' মাধ্যমে অভ্যুত্থান ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে কমরেডদের একটা বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে কলকাতায় আটকে রাখা হয়।

পটারির মহিলা শ্রমিক, কলকাতা হাসপাতালের নার্স প্রমুখরা বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সংগঠিত করলেন। কিন্তু এখানেও, পার্টি নেতৃত্বের উগ্র বামপন্থায় নার্সদের আন্দোলন এবং সংগঠন বারেবারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হল, ধ্বংস হয়ে গেল। নার্সদের সাহসোচিত সংগ্রাম ব্যর্থতায় শেষ হল, সবচেয়ে ভাল কমরেডরা হয় গ্রেপ্তার হল কিংবা বিচ্ছিন্ন হয়ে হারিয়ে গেলেন। এইভাবে বামপন্থী হঠকারিতা পার্টিকে কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকেই বিচ্ছিন্ন করল না, তাকে একইভাবে শ্রমিক, কৃষক এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মহিলাদের থেকেও বিচ্ছিন্ন করে দিল।

বুদ্ধিজীবী শ্রেণির মধ্যে

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলার বুদ্ধিজীবী শ্রেণি কেবল সংখ্যায় বেশি ছিলেন তাই নয়, এঁদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন প্রগতিশীল শক্তির সঙ্গে। লেখক, শিল্পী, ডাক্তার,

আইনজীবী, অধ্যাপক, শিক্ষক ইত্যাদি বুদ্ধিজীবী শ্রেণির সমস্ত অংশের মধ্যে পার্টির যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

কিন্তু জাতীয় মুক্তি অর্জনের আন্দোলনে এই গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণির ভূমিকা বিষয়ে দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের থিসিসে একটি শব্দও ছিল না। আর পার্টি নেতৃত্ব ট্রটস্কীয় নীতি ও কৌশলের পথ গ্রহণ করার পর থেকেই বুদ্ধিজীবীদের সন্দেহের চোখে দেখা শুরু হল। অন্যান্য 'দোদুল্যমান মধ্যবিত্ত ফ্রন্ট'-এর মতো সাংস্কৃতিক ফ্রন্টকেও খাটো করে দেখা হল। একটা কবিতা লেখা কিংবা একটা নাটক লেখার চেয়ে একটা পথ সংঘর্ষ কি একটা জ্বলন্ত ইশ্‌তেহার বিলি করার কাজকে অনেক বেশি 'বৈপ্লবিক' মনে করা হবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

এই পরিস্থিতিতে পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট সাম্রাজ্যবাদ আর সামন্তবাদকে তার আক্রমণের মূল লক্ষ্য বলে মনে করল না। গান্ধীবাদী এবং 'ইসলামীয় সমাজবাদ'-এর বিরুদ্ধে লড়াই করার বদলে, 'প্রগতিশীল লেখক'-দের গ্রুপের বিরুদ্ধে তাদের সমস্ত আক্রমণ কেন্দ্রীভূত হল। 'মার্ক্স-বাদী'-তে প্রকাশ রায়ের নিবন্ধে দক্ষিণপন্থী সোস্যালিস্টদের সঙ্গে 'প্রগতিশীল' লেখকদের একটা যান্ত্রিক সাযুজ্য টানা হল। সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও রবীন্দ্র গুপ্তের 'বাংলার প্রগতিশীল সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' নামক নিবন্ধটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য বিষয়ে অন্তঃপার্টি আলোচনার একটা ভিত্তি গড়ে তুলল। কিন্তু প্রাদেশিক কমিটি এই নিবন্ধকে অন্ধভাবে, কোন সমালোচনা ছাড়াই গ্রহণ করে কার্যত সমস্ত আলোচনার কণ্ঠরোধ করল। 'পরিচয়'-এর যে তদানীন্তন সম্পাদকমণ্ডলী নিঃশর্তে রবীন্দ্র গুপ্তের নিবন্ধটি মেনে নিতে অস্বীকার করল, সেই সম্পাদক-মণ্ডলী ভেঙে দেওয়া হল এবং নতুন লেখকদের নিয়ে তা পুনর্গঠিত হল। অবাধ বল্গাহীন বাম-সুবিধাবাদের পথে সরাসরি পার্টি কেন্দ্র থেকে 'পরিচয়' পরিচালিত হতে শুরু করল।

অন্যান্য সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট, বিশেষ করে ভারতীয় গণনাট্য সংঘেও এই ধরনের ঘটনাই আরো বেশি ঘটতে লাগল। এই বিষয়ে প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক একটি সার্কুলারে বললেন, 'প্রাদেশিক কমিটির অ্যাজিট-প্রপ বিভাগে তাদের সমস্ত নাটক আগে অবশ্যই জমা দিতে হবে'। সেই অনুসারে, কিছু নাটক জমা পড়ল আর স্বাভাবিকভাবেই প্রাদেশিক কমিটির দপ্তরে সেগুলো পড়ে থেকে থেকে নষ্ট হতে লাগল—হাতে গোনা ক'জন পার্টি নেতা ছাড়া আর কারোরই সেগুলো 'বিচার' করার ক্ষমতা ছিল না। একদিকে পার্টির বাইরের অনেক শিল্পীদের 'সংশোধনবাদী' বলে চিহ্নিত করে তাদের প্রতি উপেক্ষার মনোভাব দেখিয়ে শত্রু করে তুলেছিল, অন্যদিকে পার্টির ভেতরে যারা ছিল তাদের উদ্যমকে সার্কুলারের পর সার্কুলার দিয়ে একেবারে শেষ করে দেওয়া হল। শ্রমিক-কৃষকদের সপক্ষে 'জঙ্গী' আন্দোলন আর সংস্কৃতির নামে, ভারতীয় গণনাট্য সংঘের মত শ্রমিক শ্রেণির এত শক্তিশালী হাতিয়ারকে ক্রমশ নষ্ট করে ফেলা হল।

ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র, নারী কিংবা অন্যান্য ফ্রন্টের মত সাংস্কৃতিক ফ্রন্টেও একটা জোরালো দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদী ঝোঁক বহমান ছিল। সাংস্কৃতিক আন্দোলনে 'এখানে কোন পার্টি লাইনের দরকার নেই ঃ পার্টির সাংস্কৃতিক কর্মীদের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা' ইত্যাদি শ্লোগানে সেই প্রবণতা প্রকাশিত হত। এইসব শ্লোগানের বিরুদ্ধে তাত্ত্বিকই লড়াই চালানোর বদলে, পার্টি নেতৃত্ব অন্যান্য সব ফ্রন্টের মত এখানেও সাংগঠনিক 'পদ্ধতি' অবলম্বন করতে শুরু করল। যাঁরা যাঁরা রবীন্দ্র গুপ্তের নিবন্ধের সমালোচনা করলেন তাঁদের সকলকে সরিয়ে দেওয়া হল,

কখনো কখনো বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণির হাতে 'সংশোধন' করার জন্য তাঁদের ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

পার্টির প্রচারমাধ্যম পরিচালনা

শত্রুকে ছোট করে দেখা, বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে একত্রিত করার কাজকে ছোট করে দেখা—বাম হঠকারিতার এইসব দৃষ্টিভঙ্গি পার্টির আইনি, বেআইনি মুখপত্র এবং প্রকাশনায় অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রকাশিত হল।

বারেবারে বেআইনি 'গরম গরম' নিবন্ধ ছাপিয়ে একটা নিয়মিত মুখপত্র প্রকাশের আইনি সুযোগকে নষ্ট করে দেওয়া হল। পার্টির ছাপাখানার বৈধতা নিশ্চিত করতে আইনের দ্বারস্থ হওয়ার প্রচেষ্টাকে 'সংশোধনবাদী' কাজ বলে বিবেচিত হল।

বিক্ষোভ-প্রচারাভিযানের কাজে যুক্ত কমরেডদের এক সভায় কমরেড রবি ব্যাখ্যা করলেন যে, প্রচার এবং বিক্ষোভের কাজে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের স্বরূপ উন্মোচন করা এখন আর আসল কাজ নয়, আমাদের পাঠকরা এখন কমিউনিস্ট পার্টির 'লড়বার উদ্যম' দেখতে চায়। একেবারে বাধ্য ছেলের মতো এই শ্লোগানকে মেনে নিয়ে পার্টি প্রেস প্রতিটি লড়াই-এর ঘটনাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে উপস্থাপিত করতে লাগল, এমনকি যারা দূর থেকে আন্দোলনকে দেখছে তাদেরকেও পুলিশের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসাবে তুলে ধরা হল। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীরা হল 'জঙ্গী' সংগ্রামী। পুলিশ বা মিলিটারীর মধ্যে সামান্যতম অসন্তুষ্টি দেখলেই তাকে 'অভ্যুত্থান'-এর মুহূর্তে জনগণের পক্ষে সশস্ত্র ফৌজের চলে আসার স্পষ্ট লক্ষণ বলে সোচ্চারে প্রচার করা হল। এইরকম সব সাংঘাতিক ফোলানো-ফাঁপানো সংবাদ পরিবেশিত হতে লাগল—যেমন, ২৬শে জানুয়ারির ঘটনা এবং গ্রামাঞ্চলে প্রতিটি সংঘর্ষই সেই এলাকাকে 'মুক্তাঞ্চল' হিসেবে বর্ণনা করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল; ধর্মঘটের ডাক ব্যর্থ হওয়াকে 'সাফল্য' বলে বর্ণনা করা হল।

কোন সাংবাদিক যদি ঘটনাকে ফাঁপিয়ে তুলতে অস্বীকার করতেন, কোন পাঠক যদি এই অত্যুক্তির প্রতিবাদ করতেন, তাহলেই তাঁদের 'সংশোধনবাদী' বলে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দেওয়া হত। ফলে, জেলা থেকে পাঠানো রিপোর্টগুলির সত্যের অতিশয়োক্তি ক্রমেই বাড়তে লাগল।

একদিকে, বিক্ষোভ-প্রচারের কাজের গুরুত্বকে ছোট করে দেখা, বিক্ষোভ-প্রচারের কর্মীদের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া, এর সম্পাদকীয় দায়িত্বকে অবহেলা করা এবং রাজনৈতিক বিষয়ে বিক্ষোভ-প্রচারের কাজ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট প্রস্তাবের অভাব আর অন্যদিকে ফোলানো-ফাঁপানো সংবাদ ছাপানো আর সংঘর্ষ সংক্রান্ত সংবাদগুলো সতর্ক হয়ে নির্বাচন করা, কেবলমাত্র এইভাবে পার্টি নেতৃত্ব সাধারণ সদস্যদের বাস্তব অবস্থা এবং ট্রটস্কীয় নীতি ও কৌশলের যে পথ তার ভয়ানক পরিণতি সম্পর্কে অন্ধ করে রাখার চেষ্টা করেছিল।

পূর্ব বাংলায় আন্দোলন ধ্বংস হওয়া

পশ্চিমবাংলার কৃষক অধ্যুষিত জেলাগুলোর মত পূর্ব বাংলা (পূর্ব পাকিস্তান)-ও ঐ একই অবহেলার শিকার হয়েছিল।

দুই বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে একত্রিত করার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলার জন্য দুটি আলাদা পার্টি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। কিন্তু কংগ্রেসের পর দেখা গেল, দুই পার্টির মধ্যে সহযোগিতার অভাবে কার্যত দুটি স্থানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঐক্য আগের চেয়ে আরো দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে, পলিটব্যুরো আবার একবার বাংলার পার্টিকে শক্তিশালী করার জন্য কিছু পদক্ষেপ নিল—প্রথমে কমরেড অজিত এবং কবীরকে (পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক কমিটির) পশ্চিমবাংলার প্রাদেশিক কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করার অনুমতি দিল এবং পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক কমিটি ভেঙে দিয়ে সমগ্র বাংলার জন্য একটা সংযুক্ত প্রাদেশিক কমিটি গঠন করল। পশ্চিম বাংলার তদানীন্তন প্রাদেশিক কমিটিতে কমরেড আজাদ এবং যদুকে যুক্ত করে এই কাজ করা হল।

কিন্তু আজ পর্যন্ত, বাংলার সাধারণ পার্টি সদস্যরা জানেন না যে, পূর্ব বাংলা থেকে কেন ঐ বিশেষ কমরেডদের যুক্ত করা হল আর কেনই বা বাকিদের বাদ দেওয়া হল। এ বিষয়ে প্রাদেশিক কমিটি কোন প্রস্তাব কখনো প্রকাশ করেনি।

পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক কমিটির পুরোনো দলিল ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে যে, কয়েকজন সদস্য কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সঠিক অবস্থান নেবার চেষ্টা করেছিলেন, অবশ্য সামগ্রিকভাবে মৌলিক রাজনৈতিক পথের ক্ষেত্রে তাঁরা তা পারেননি। যেমন, কমরেড কবীরের 'জমিদারী ব্যবস্থা উচ্ছেদ' নামক নিবন্ধে একেবারে সঠিকভাবে দেখানো হয়েছে যে, চরিত্রগতভাবে পূর্ব বাংলার শাসকশ্রেণি 'পুঁজিবাদী' নয়, তারা প্রধানত সামন্ততান্ত্রিক। কাজেই জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনে মধ্য কৃষকদের অবশ্যই শক্তিশালী মিত্র হিসেবে ধরতে হবে।

কিন্তু 'নীতি ও কৌশল' সম্পর্কে পলিটব্যুরো তার প্রতিবেদন প্রকাশ করার পরেই, পূর্ব বাংলার নেতৃত্ব একযোগে এবং বেপরোয়াভাবে পলিটব্যুরোর পথকে মেনে নিলেন এবং তখন তাঁদের যে প্রধান কেন্দ্র সেই কলকাতা থেকে যথেচ্ছভাবে তাকে প্রয়োগ করতে শুরু করলেন। ফলে এই উগ্র জঙ্গীপনা এবং হঠকারী কৌশলে জেলাগুলির অধিকাংশ পার্টি ইউনিট ধ্বংস হয়ে গেল। পার্টি কার্যত পঙ্গু হয়ে পড়ল।

ঠিক তখনই পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক কমিটি ভেঙে দেবার সময়, কমরেড রবি একটা নোট প্রকাশ করলেন, যাতে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হল যে, পূর্ব বাংলার শাসককুলের শ্রেণিচরিত্র সামন্ততান্ত্রিক নয়, পুঁজিবাদী। লেনিন থেকে উদ্ধৃত করে এই নোটে একটা জোরালো পর্যবেক্ষণ প্রকাশিত হল যে, গোটা পার্টি কমিটি নষ্ট হওয়াতে উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই। সংগ্রাম চললে নতুন কমরেডদের অভাব হবে না কখনো।

বাংলার সংযুক্ত প্রাদেশিক কমিটির প্রথম অধিবেশনেই ঢাকায় জোনাল কমিটি গঠনের প্রশ্নে জোরালো মতবিরোধ দেখা গেল। প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক কমরেড মল্লিক প্রস্তাব করলেন যে, জোনাল কমিটি গঠন করার বদলে, পূর্ব বাংলার আন্দোলনের দৈনন্দিন পরিচালনার গোটা দায়িত্বভার সংযুক্ত প্রাদেশিক কমিটির হাতেই থাকা উচিত। পলিটব্যুরোর মধ্যস্থতায় এবং প্রাদেশিক কমিটির সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে শেষ পর্যন্ত জোনাল কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। কিন্তু 'কমরেডের অভাব'-এর অজুহাতে (অর্থাৎ শ্রমিক এবং কৃষক কমরেডের অভাব) জোনাল কমিটিতে মাত্র দু'জন কি তিনজন কমরেড রইলেন

এবং এইভাবে তাকে পঙ্গু করে রাখা হল। তার কাজের এলাকাও তিন কি চারটি জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হল।

পূর্ব বাংলার শ্বেত সন্ত্রাসের মাত্রাকে খাটো করে দেখে, প্রাদেশিক কমিটি একেবারে বাস্তবতাহীন ভঙ্গিতে পশ্চিমবাংলায় যে কৌশলগত পথ অনুসৃত হয়েছে পূর্ব বাংলাতেও তা প্রয়োগ করল। দাঙ্গা ও নানাবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যেসব প্রবীণ 'হিন্দু' পেটি-বুর্জোয়া কমরেডরা তাঁদের শক্ত হাতে লাল পতাকা উড্ডীন রেখেছিলেন, তাঁদের সবাইকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়ে পূর্ব বাংলার জেলা কমিটিগুলো 'পুনর্গঠন' করা হল। উত্তরবঙ্গের জেলা কমিটি পুনর্গঠনের কাজে পাঠানো হল কমরেড বিরাটকে। পুরোপুরি আমলাতান্ত্রিক কায়দায় সে কাজ করা হল। উত্তরবঙ্গের জেলা কমিটির সংগঠন বিষয়ে প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদকমণ্ডলী কিংবা জোনাল কমিটি কেউই গুরুত্ব দিয়ে কোন আলোচনা করল না। সামগ্রিকভাবে প্রাদেশিক কমিটির একাজ করা তো দুরে থাক, এর পরিণতি হল বিপর্যয়কর। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বেশিরভাগ 'পুনর্গঠিত' জেলা কমিটিগুলো অকেজো হয়ে পড়ল। পশ্চিম বাংলার মতো বাম-হঠকারিতায় একই পথে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত গোটা পার্টি দ্রুত ধ্বংসের পথে চলল।

কমরেড নিতাই এবং কমরেড যদুকে (পূর্ব বাংলার যে দু'জন কর্মী কমরেডকে প্রাদেশিক কমিটিতে নেওয়া হয়েছিল) ঢাকায় পাঠানো হল। সেই সময় পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক কমিটি এবং পুরোনো জেলা কমিটিগুলো পুরোদমে ট্রটস্কীয় পথে চলেছে। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে ডাকা বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে শহরের প্রায় সব সক্রিয় পার্টি কমরেডরা গ্রেপ্তার হয়ে গেছেন। ছাত্র, রেল এবং বস্ত্র শিল্পের শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বারবার সাধারণ ধর্মঘটের 'আহ্বান' জানানো হচ্ছে। এই হঠকারী পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য ঢাকার কমরেডদের সমালোচনা করার বদলে, কমরেড নিতাই এবং যদু তাঁদের প্রশংসা করলেন এবং আরো বেশি উৎসাহিত করলেন। যখন একটার পর একটা দুর্ঘটনা ঘটেই চলল, ঢাকার জেলা কমিটি প্রায় ধ্বংসের মুখে, কেবল তখন প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তাঁরা অংশত সচেতন হলেন। পার্টিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে জোনাল কমিটিকে 'কমরেডদের রক্ষা করার' নির্দেশ দেওয়া হল না।

'পার্টির ভেতরে হিন্দু জাতীয়তাবাদী প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে লড়াই কর—মুসলিম কমরেডদের মধ্যে পার্টির প্রভাব ছড়িয়ে দাও'—কমরেড রবির এই সঠিক শ্লোগানকে বিকৃত করা হল এবং ভুলভাবে একে প্রয়োগ করা হল। 'হিন্দু' কমরেডদের দায়িত্বশীল পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু অন্যদিকে পার্টি 'ইসলামী সমাজতন্ত্র', 'ইসলামী ঐক্য', 'প্যান ইসলামী মতবাদ' ইত্যাদি যেসব বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী শ্লোগান ছিল, যেগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করা ছাড়া মুসলিম জনগোষ্ঠীকে কিছুতেই পার্টির মধ্যে আনতে পারা যাচ্ছিল না, সেইসব শ্লোগানের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালাতে অস্বীকার করল। দেশভাগের অস্ত্রের সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যে আরো বেশি টিকে থাকছে সে কথা বুঝতে না পেরে, প্রাদেশিক কমিটি দেশভাগ এবং তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ফলাফল সম্পর্কিত কোনরকম লেখা পার্টির পত্রপত্রিকায় ছাপানো কার্যত বন্ধ করে দিল। আকস্মিক দাঙ্গার আক্রমণে পার্টির যে সমূহ ক্ষতি হয়ে গেল তার জন্য এই অন্ধত্বই দায়ি।

যুক্ত বাংলা প্রাদেশিক কমিটি কার্যত পশ্চিমবাংলার কমিটিতে পর্যবসিত হয়েছিল—এর সমস্ত সার্কুলার, দলিল, লেখা এর প্রমাণ বহন করছে। ময়মনসিংহের পাহাড়ী সীমান্ত অঞ্চল,

জয়দেবপুর, নাচোল, কালিশিরা, রঙপুর, সিলেট ইত্যাদি এলাকার সশস্ত্র কৃষক আন্দোলনকে অবহেলা করা হল, তাদের বলি দেওয়া হল কলকাতার স্বার্থে—পার্টি নেতৃত্বের বক্তব্য অনুযায়ী বিপ্লবের সেই 'ঝটিকা-কেন্দ্রের' জন্য। কাজেই যুক্ত বাংলা প্রাদেশিক কমিটি তার যে উদ্দেশ্য, দুই বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সংহতি আনতে সাহায্য করা, সেই উদ্দেশ্যের বদলে কেবল তাদের ঐক্য আরো নষ্ট করল।

পার্টি সংগঠনে আমলাতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র

'দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই' করার নামে সাংগঠনিক বিষয়ে পলিটব্যুরো যে আতংকের নীতি গ্রহণ করেছিল, পশ্চিমবাংলার প্রাদেশিক কমিটি পুনর্গঠনের বিষয়ে পলিটব্যুরোর নিজের প্রস্তাবনাতেই তার প্রমাণ মেলে। ঐ প্রস্তাবনা নিজেই ঘোষণা করে—সাবধান, নতুন প্রাদেশিক কমিটিতে সংশোধনবাদীরা আছে।

প্রাদেশিক কমিটির মধ্যে 'নজরদারি'-র এই আহ্বান প্রতিটি পদক্ষেপে কাজে পরিণত করা হল। প্রাদেশিক কমিটির সমস্ত সদস্য যেহেতু বিশ্বাসযোগ্য নয়, তাই কার্যত সম্পাদকমণ্ডলী প্রাদেশিক কমিটির সমস্ত অধিকার কার্যত কুক্ষিগত করল; প্রাদেশিক কমিটি এবং সম্পাদকমণ্ডলী উভয়ের ক্ষমতাই কেন্দ্রীভূত হল সম্পাদকের হাতে। প্রতিটি পদক্ষেপে যে প্রাদেশিক কমিটির মধ্যে মতবিরোধ চলতে লাগল, রাজনৈতিক ঐক্যের অভাবই তার কারণ। পলিটব্যুরো 'ফতোয়া' জারি করে এইসব বিরোধের নিষ্পত্তি করত। পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড গৌর সকাল সন্ধে প্রাদেশিক কমিটির কেন্দ্রীয় দপ্তরে বসে থাকতেন, প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক ও সম্পাদকমণ্ডলীকে তিনি পথনির্দেশ করতেন।

রাজনৈতিক ঐক্যের অভাব আর প্রতি মুহূর্তে একজনের অন্যজনকে 'সংশোধনবাদী' বলে সন্দেহ করা, এর ফলে অবস্থা এমন হয়ে উঠল যে, বেশির ভাগ রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করার বিষয়টিকে প্রাদেশিক কমিটি সাধারণভাবে এড়িয়ে যেতে লাগল। যেমন, ছাত্রদের, মহিলাদের কিংবা প্রচারাভিযান সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব প্রাদেশিক কমিটি কখনো নেয়নি কিংবা এসব নিয়ে একবারও আলোচনা করেনি। যে প্রাদেশিক সাব-কমিটিগুলি পুনর্গঠনের সময় কমরেড রণদিভে নিজে তার সমস্ত সদস্য পছন্দ করেছিলেন, (যেমন, ট্রেড ইউনিয়নের সাব-কমিটি ঃ কমরেড মল্লিক, আমানুল্লা, সাধু, সূর্য্য এবং পরে যদু; কৃষক সাব-কমিটি ঃ কমরেড বিরাট, নিতাই, নন্দন পরে আজাদ; প্রচার-বিক্ষোভের সাব-কমিটি ঃ কমরেড নিতাই, নন্দন, আমানুল্লা, সাধু এবং এইরকম সব)। সেই কমিটিগুলো কখনো কাজ করেনি। এইভাবে সমষ্টিগত চিন্তা এবং সমষ্টিগত আলোচনার বিষয়টিই প্রাদেশিক কমিটির অজানা রয়ে গেল। এর সদস্যদের মনের মধ্যে একদিকে 'বিভাগীয়' মনোভাব গড়ে উঠল, নিজের ফ্রন্টটুকু ছাড়া অন্য কোন ফ্রন্ট নিয়ে ওঁরা মাথা ঘামাতেন না; অন্যদিকে বিভিন্ন লড়াই-এ এবং প্রচার-অভিযানে তাঁরা পরস্পরবিরোধী নির্দেশনামা জারি করতে লাগলেন; তাঁদের পরস্পরবিরোধী মতামতে সাধারণ সদস্যদের মধ্যে সংশয় ছড়িয়ে পড়ল; চূড়ান্ত আত্মশ্লাঘা দেখা দিল; একই সময়ে প্রত্যেকে তাঁর 'নিজস্ব' মতামতকে সবার আগে স্থান দিলেন।

প্রাদেশিক কমিটির সমস্ত ক্ষমতা সম্পাদক কোন পথে অন্যায়ভাবে কার্যত কেড়ে নিয়েছিলেন, তাঁর ৫৩ নং 'নোট'-এ তা দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক

এবং সাংগঠনিক প্রশ্নে, যেমন তেভাগার দাবির 'অশুদ্ধতা', পৃথক নারী ইউনিট ভেঙে দেওয়া, স্থানীয় কমিটির জায়গায় 'অ্যাকশন' কমিটিকে আনা ইত্যাদি সব গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক প্রশ্নে প্রাদেশিক কমিটির অন্য কোন সদস্যের সঙ্গে আলোচনা না করেই তাঁর এই নোট সমস্ত প্রাদেশিক কমিটিগুলিতে বিজ্ঞাপিত হয়। একবার প্রাদেশিক কমিটির এক সভায় কমরেড সূর্য্য যখন এইভাবে চালানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন তখন প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক এটা তাঁর 'সহজাত' অধিকার এই বলে নিজের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন।

'পশ্চিমবাংলায় সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর'—এই দলিলে বলা হল, সাংগঠনিক কাজকর্ম সাংঘাতিক পিছিয়ে পড়ছে। সব কাজগুলো নিয়ে একসাথে পরিকল্পনা করা, সেগুলো বন্টন করা—এর বদলে প্রাদেশিক কমিটির সদস্যরা কেবল একা একা এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়িয়েছেন। ফলে প্রাদেশিক কমিটির অনেক সদস্য কেবল 'সব বিষয়ে জানেন কিন্তু কোন বিষয়েই গভীরভাবে জানেন না' এমন হয়ে উঠেছেন। যেহেতু প্রাদেশিক কমিটির সদস্যদের 'সংশোধনবাদী' দুর্বলতার কারণে, দায়িত্ব বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনার ভরসা করা যায়নি, তাই প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক কেবলি তাদের এক ফ্রন্ট থেকে অন্য ফ্রন্টে, এক জেলা থেকে অন্য জেলায় বদলি করে দিয়েছেন। সর্বোপরি তিনি বেশির ভাগ কাজের দায়িত্বভার নিজের কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন।

গুরুত্বপূর্ণ যেসব বিষয়ে প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে রেখেছিলেন, নীচে তাদের উল্লেখ করা হল ঃ তহবিল, কারিগরী, বই-এর দোকান, প্রাদেশিক কমিটির সেলগুলি, জেল সংক্রান্ত বিষয়, মহিলা ফ্রন্ট ইত্যাদি। ফাংশনিং-এর এই অতি কেন্দ্রীভবনের ফলটা কী হল?

তহবিল সংক্রান্ত বিষয়ে কখনোই নিয়মিত এবং সুব্যবস্থিত কোন বাজেট ছিল না, হিসাব পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না এবং তহবিল নিরাপদ স্থানে রক্ষণাবেক্ষণের কোন সতর্কতা ছিল না। এই সমস্ত ব্যাপারে সম্পাদকমণ্ডলী কিংবা প্রাদেশিক কমিটি কেউ কোন মনোযোগ দিত না। তহবিলের বিশাল পরিমাণ অংশ এই মাথাভারি ব্যবস্থাপনার কারণে জলের মত খরচ হয়ে যেত।

টেকনিক্যাল বিষয়ে বাম-সুবিধাবাদই প্রধান হয়ে উঠল। প্রত্যেকেই তার নিজের মত করে যে নিয়মকানুনে তার অসুবিধা হবে সেটি অমান্য করত। এটাই 'নিয়ম' হয়ে দাঁড়াল। এই প্রসঙ্গে কমরেড গৌর একবার একটি ঘটনায় প্রাদেশিক কমিটির কয়েকজন সদস্যকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়মকানুন ভাঙার জন্য তীব্র তিরস্কার করেছিলেন। প্রাদেশিক কমিটি, গোটা টেকনিক্যাল লোকজন সেই একজন কি দু'জন কমরেডের সমর্থনে একজোট হল। এইসব টেকনিক্যাল কমরেডদের শিক্ষার বিষয়টি অবহেলা করার অপরাধও ঘটল।

বই-এর দোকানের বিষয়ে, প্রকাশনা সংক্রান্ত কোন পরিকল্পনার ছক কষা হল না, এর টাকাপয়সা পুরোপুরি পার্টি তহবিলের মধ্যে একাকার করে রাখা হত। ফলে প্রকাশনার কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হল। গত ছয়মাস ধরে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের বিষয়ে দু'টি-তিনটির 'বেশি বই ছাপানো সম্ভব হয়নি। জেলায় জেলায় হাজার হাজার টাকা মূল্যের বইপত্তর 'প্রোলেট'-এর মাধ্যমে ধারে পাঠানো হয়েছে। টাকা শোধ না করায় বিলের স্তূপ জমেছে বই-এর দোকানগুলোতে। এই সমস্ত কিন্তু একসঙ্গে সাংঘাতিক সংকটের সৃষ্টি করেছে।

প্রাদেশিক কমিটির সেলগুলোর কাজকর্ম ক্রমশ থেমে যেতে যেতে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এফ এস ইউ সেল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আগে যে সার্কুলারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তারই ফলে আই পি টি এ-র কাজকর্ম বন্ধ। প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সংঘের অবস্থাও একই।

জেলাগুলোকে আর একটা গণফ্রন্ট হিসেবে ধরা হত। পলিটব্যুরোর ভয়ানক পথের অনুসরণে প্রাদেশিক কমিটি প্রবল সংঘর্ষের পক্ষে জেল আন্দোলন চালাবার কথা বলে বন্দীদের উদ্দেশ্যে বারবার সার্কুলার পাঠাত। ২৭শে জানুয়ারি সম্পাদকীয়তে "For a lasting peace" আবেদন প্রকাশ হওয়ার পরেও বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে চেতনা হল না। প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক বক্সায় বন্দীদের বদলির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠিত করার নির্দেশ পাঠালেন (অবশ্য সেই নির্দেশ খুব তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে নেওয়া হল।)

সম্পাদকমণ্ডলীর বাকি দুই সদস্য কমরেড নিতাই আর বিরাটও কাজের এই কেন্দ্রীভবনের জন্য কম দায়ি নয়, কেননা এই ধরনের কেন্দ্রীভবনের বিরুদ্ধে তাঁরা কখনো একটা কথাও বলেননি।

জেলা কমিটিগুলো, ফ্রাকশন ইত্যাদি পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে, প্রাদেশিক কমিটি এবং সম্পাদকমণ্ডলীর আমলাতান্ত্রিকতা এমনভাবে প্রকাশিত হল যে, তা বেদনাদায়ক। পশ্চিমবাংলার প্রাদেশিক কমিটি পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে পলিটব্যুরো যা যা করেছিল, জেলা কমিটিগুলো পুনর্গঠনের সময় প্রাদেশিক কমিটিও সেই একই সুবিধাবাদী এবং নিয়মহীন নীতি অনুসরণ করল।

পশ্চিমবঙ্গ কমিটি সম্পর্কিত প্রস্তাবে পলিটব্যুরো লিখল, "যে পার্টি বেআইনি তার সঙ্গে তুলনা করলে বৈধ পার্টির নিয়মকানুনে, তার সংগঠনের রূপে অনেক পার্থক্য থাকতে পারে, দেশে যখন নগ্ন ফ্যাসিবাদী আইন চালু আছে তখন অবশ্যই পার্টিগুলোর কাজকর্মের আলাদা রূপ, আলাদা নিয়ম থাকতে পারে.... যদিও সমস্ত পার্টির অন্তর্নিহিত মৌলিক নীতি একই"।

পলিটব্যুরোর এই ঘোষণার ব্যাখ্যা করা হল এইভাবে যে, জেলা কমিটি এবং ফ্রাকশনগুলোর পুনর্গঠনের প্রশ্নে, লোকাল কমিটিগুলো ভেঙে দেওয়া এবং তার স্থানে যথেচ্ছভাবে 'অ্যাকশন' কমিটি বসিয়ে দেওয়া, ফ্রাকশনগুলো ভেঙে আবার তার জায়গায় 'টিম' গড়ে তোলা, ইত্যাদি নানান সব বিষয়ে পার্টি সদস্য, এমনকি কোনো নেতৃস্থানীয় সদস্যের সঙ্গেও কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই। কোন একজনের একান্ত ব্যক্তিগত ইচ্ছায় পার্টির সংবিধান অমান্য করার অধিকার আছে, পার্টি দলিল এমন পরামর্শই দিল।

কলকাতা জেলা কমিটির পুনর্গঠন হল তারই একটা দৃষ্টান্ত। পুরোনো জেলা কমিটির মতামত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হল। বেশি সংখ্যায় শ্রমিকদের নিয়ে নতুন জেলা কমিটি তৈরি হল। বুদ্ধিজীবীদেরও কমিটিতে রাখার দরকার একথা মেনে নিয়ে দু'জন পেটি-বুর্জোয়া কমরেডকে নেওয়া হল। আসলে কিন্তু কমরেডদের নির্বাচনের সময় পুরোনো সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের বাদ দেওয়া হল। ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং পুরোনোদের সঙ্গে নতুনদের মিলিয়ে-মিশিয়ে দেওয়ার যে লেনিনীয় পদ্ধতি সেটি প্রত্যাখ্যান করা হল।

কলকাতার শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের ইতিহাস অনেক পুরোনো। এই বীর সর্বহারা শ্রেণি অনেক লড়াকু এবং যোগ্য কমরেডের জন্ম দিয়েছে, যোশী এবং তার সংস্কারবাদিতার সময় তাঁদের বরাবর উপেক্ষা করা হয়েছিল, অবহেলা করা হয়েছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, পার্টি

কমিটিতে শ্রমিক কমরেডদের অন্তর্ভুক্তি অবশ্যই একটা সঠিক নীতি। কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে 'ধর্মযুদ্ধ' চালাবার জন্য, তাদের ওপর 'বিপ্লবী' নজরদারি করার উদ্দেশ্যে এদের আনা হচ্ছে এই মনোভাবই পার্টির পক্ষে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হল। এক বছর পরে আজ তার স্পষ্ট পরিণতি দেখা যাচ্ছে। পুরোপুরি গোটাটাই শ্রমিক নেতৃত্বের পক্ষে চলে আসার বদলে, অনেক জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, পুরোনো শ্রমিক-বিরোধী মনোভাব মাথা চাড়া দিচ্ছে।

কমিটিতে 'প্রতি দু'জন বুদ্ধিজীবী পিছু আটজন শ্রমিক থাকবে'—লেনিনের এই শ্লোগান অত্যন্ত যান্ত্রিকভাবে এবং গোঁড়ামীর সঙ্গে অনুসরণ করলেন পার্টি নেতৃত্ব। পশ্চিম ইওরোপের দেশে যেখানে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বেশ ভাল মাত্রায় রয়েছে, তার সঙ্গে তুলনায় পেছিয়ে-পড়া দেশগুলোতে শ্রমিকদের পক্ষে নিজেদের চেষ্টায় বিপ্লবী তত্ত্বের জ্ঞান অর্জন করা সহজ নয়—লেনিনের এই শিক্ষা তাদের মনে রইল না। মার্কসবাদ হল বিজ্ঞান। শ্রমিক কমরেড নিজে নিজে এতে শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে না, যতক্ষণ না তাদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

নতুন জেলা কমিটিতে বেশি সংখ্যায় শ্রমিক-কৃষক কমরেডদের আনা তো হল, কিন্তু তাঁদের শিক্ষিত করে তোলার প্রশ্নে প্রাদেশিক কমিটির নেতৃবৃন্দকে আমরা কী করতে দেখলাম? দেড় বছরে দেড়খানা স্কুল চালানো হল। আর সেখানেও খুবই কম সংখ্যক শ্রমিক-কৃষক কমরেডকে আনা গেল। জেলার পুরোনো বুদ্ধিজীবী কমরেডদের শিক্ষক হিসেবে কাজে লাগানো হল না, কেননা তাঁদের 'সংশোধনবাদী' বলে সন্দেহ করা হচ্ছে (হাওড়ার উদাহরণ)। জেলার সামনের সারির শ্রমিক কমরেডরা যখনই পড়াশুনার জন্য চীৎকার-চেঁচামেচি করতেন, তখন তাঁদের এই বলে কঠোর ভর্ৎসনা করা হত যে, "**ওরা না শেখে পার্টির দলিল পড়ে, না শেখে জনগণের কাছ থেকে, তবু 'পার্টি শিক্ষা'-র নাম করে চেঁচামেচি করে**"। (প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদকের ৩৪ নং নোট)। এইরকম দানবীয় পদ্ধতিতে, শ্রমিক-কৃষক কমরেডদের এই কথা ঘোষণা করে দাবিয়ে রাখা হত যে, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের থেকে শেখবার কিছু নেই, শিখতে হবে পার্টি নেতাদের মুখের বাণী থেকে।

সমস্ত জেলা কমিটি পুনর্গঠনে আমলাতন্ত্র আর সুবিধাবাদের চেহারা প্রকট হয়ে পড়ল। কোন কমিটিতে যখনি কোন পদ খালি হত, অমনি সাধারণ পার্টি সদস্যদের সঙ্গে কোন আলোচনা না করেই 'ওপর থেকে' সেটা ভর্তি করা হত।

এইরকম যথেচ্ছভাবে জেলা কমিটিগুলো গঠন করে, প্রাদেশিক কমিটি কেবল 'স্বেচ্ছাসেবক' হিসেবে তাদের কাজে লাগাতে চাইল, আর কিছু না। 'নীতি'র যোগান দেবেন প্রাদেশিক কমিটির নেতৃত্ব আর 'হাতেনাতে কাজে' তা প্রয়োগ করবে জেলা কমিটিগুলো—এই চালু বুর্জোয়া অভ্যেস পার্টির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হল। প্রতিটি ব্যাপারে ওপর থেকে নাক গলিয়ে, নিজেদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়ে, প্রাদেশিক কমিটি জেলা কমিটির সমস্ত উদ্যমকে ধ্বংস করে দিল, তার রাজনৈতিক জীবন অস্থির করে তুলল।

'নাগরিক অভ্যুত্থান' নামক তত্ত্বের ভারে মফস্বল জেলা কমিটিগুলির কাজকর্মকে সাংঘাতিক অবহেলা করা হল। প্রায়শই তাদের চিঠি এবং রিপোর্টের উল্লেখ করা হত না, এমনকি প্রাপ্তি স্বীকারও করা হত না। জেলাগুলিতে ঘনঘন যাবার বদলে, প্রাদেশিক কমিটির সদস্যরা সাধারণত জেলার কমরেডদের কলকাতায় ডেকে পাঠিয়ে আর তাদের সঙ্গে অল্প

কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করেই তাঁদের দায়িত্ব 'খালাস' করে দিতেন। জেলাগুলোর জন্য পাঠানো প্রাদেশিক কমিটির বেশির ভাগ নির্দেশই কার্যক্ষেত্রে যে অচল বলে বোঝা গেল, তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

পার্টি সদস্যদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবার ব্যাপারে চূড়ান্তরকমে আমলাতান্ত্রিকতা প্রকাশ পেল। প্রাদেশিক কমিটি পুনর্গঠনের সময়, সামনের সারির অনেক কমরেডকে পলিটব্যুরো তাদের দুর্বলতার জন্য, পুলিশের দালালদের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা চালানোর জন্য সঠিকভাবেই আক্রমণ করল। অনেক কমরেড হয় বহিষ্কৃত হলেন, কিংবা অনির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেণ্ড করা হল এই সন্দেহে যে তাঁরা পুলিশের চর। যদিও তাঁদের বিরুদ্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছিল না। এই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া তখনই যুক্তিযুক্ত হয় যখন পার্টির অভ্যন্তরে চরের অনুপ্রবেশ একটি প্রকৃত বিপদ হিসাবে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সরকারের গৃহীত নীতি হিসাবে দেখা দেয়।

কিন্তু ৯ই মার্চের পর থেকে পার্টির এমন কোন দলিল পাওয়া যায়নি যেখানে 'সংশোধনবাদীদের' পার্টি থেকে বের করে দেবার কথা বলা হয়নি। কথা হল, সেই নীতি কাজে পরিণত করা হল কীভাবে?

বিরাট সংখ্যক ক্ষেত্রে, পার্টি সদস্যদের বিরুদ্ধে আনা শাস্তির ব্যাপারে উচ্চতর কমিটির কাছে তাদের আবেদন করতে দেওয়া হল না। যেখানে সামান্য একটু সতর্ক করলেই যথেষ্ট হত, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সেখানে অনির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেণ্ড করা হল। ব্যবস্থা নেবার আগে যেখানে গোটা প্রাদেশিক কমিটির সঙ্গে কথা বলা এবং তদন্ত কমিশন গঠন করার প্রয়োজন ছিল, সেখানে প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদকমণ্ডলী কিংবা সম্পাদক একাই সিদ্ধান্ত নিলেন। সংশ্লিষ্ট কমরেডকে তাঁর ত্রুটি, তাঁর দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে, নিজেকে উন্নত করার সাহায্য করা—শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পেছনে এসব কোন উদ্দেশ্য ছিল না, বরং পার্টির মধ্যে এমন একটা আতংকের রাজত্ব সৃষ্টি করাই ছিল আসল উদ্দেশ্য যাতে কোন পার্টি সদস্য পার্টি নেতৃত্ব বা তাদের নীতি নিয়ে কিছু বলার সাহস না পান।

একদিকে, পার্টির অভ্যন্তরে আতংক সৃষ্টি করার ট্রটস্কীয় পদ্ধতি, অন্যদিকে সংঘর্ষের পরীক্ষায় পার্টি সদস্যপদকে শর্তাধীন করে তোলা—এসবের অবশ্যম্ভাবী ফল ফলল। নতুন লড়াকু কমরেডরা দেখলেন তাঁদের সামনে পার্টির দরজা বন্ধ। এই সময়ে অতি দ্রুত পার্টি সদস্যের সংখ্যা কমে গেল।

পুরোনো কমরেডদের প্রতি প্রাদেশিক কমিটির মনোভাবের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। পলিটব্যুরোর দলিলে বেশির ভাগ পুরোনো পেটি-বুর্জোয়া পার্টি নেতাদের সংশোধনবাদী বলে সমালোচনা করা হল। এইভাবে পার্টির সাধারণ স্তরের কর্মীদের মনে তাঁদের সম্পর্কে একটা সন্দেহের মনোভাব সৃষ্টি করা হল। নতুন কমরেডদের পদোন্নতির নামে তাঁদের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ করা হল। বেশির ভাগ সময়ে স্বেচ্ছাসেবকদের চেয়ে সামান্য উঁচু কোন পদের দায়িত্ব তাঁদের দেওয়া হল না।

ট্রটস্কীয় পথের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক কমিটির মধ্যে ক্ষীণ প্রতিবাদ

পলিটব্যুরো আর প্রাদেশিক কমিটির ভয়-দেখানো নানান ব্যবস্থা সত্ত্বেও, পার্টির সাধারণ কর্মীরা বারবার পার্টির নীতি, পরিচালন পদ্ধতি, আর কৌশল নিয়ে নানান প্রশ্ন তুলেছে, সংশয় প্রকাশ

করেছে। তাদের মধ্যে একাংশ কখনই নেতৃত্বের এই অভ্যুত্থান-এর নীতি গলাধঃকরণ করতে পারেনি—৯ই মার্চের রেল ধর্মঘট থেকে শুরু করে পরবর্তী সমস্ত সংঘর্ষের ক্ষেত্রেই তাই ঘটেছে। মাও-এর 'জনগণতান্ত্রিক একনায়কত্ব' ও লিও শাও চি-র 'জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ' প্রকাশিত হবার পরে, সাধারণ পার্টি কর্মীর একটা বিরাট অংশ এ দেশে জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা নিয়ে গভীরভাবে ভাবনাচিন্তা শুরু করল। শহরে হঠকারিতার নীতিতে যে বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করতে হল, সে বিষয়ে অনেক জেলা কমিটি নানান আলোচনায় পার্টির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করল।

এসব কিছু সত্ত্বেও প্রাদেশিক কমিটির রাজনৈতিক সতর্কতা জাগল না কেন? কেন পলিটব্যুরোর ট্রটস্কীয় নীতি ও কৌশলকে তারা চ্যালেঞ্জ করলেন না?

খুব স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্ন মনে আসার কথা। পলিটব্যুরোর নীতিগত ও কৌশলগত পথ নিয়ে প্রাদেশিক কমিটির ভেতরে কখনোই কোন প্রশ্ন ওঠেনি এ কথা পুরোপুরি সত্য নয়। মৌলিক রাজনৈতিক বিচ্যুতির (উল্লেখ্য : বিপ্লবের স্তর, বুর্জোয়াদের ভূমিকা ইত্যাদি) ক্ষেত্রে অন্ধ থাকার জন্য প্রাদেশিক কমিটির সদস্যরা কখনোই পলিটব্যুরোর বিরুদ্ধে 'লড়াই' করার অবস্থায় পৌঁছতে পারেনি। অপরদিকে, যখনই তাঁরা কৌশলগত নানান বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কিংবা পরস্পরের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন তখনি পলিটব্যুরোর সদস্যরা সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্যাপারটা যাহোক করে মীমাংসা করে দিয়েছেন। সমালোচনা এবং আত্মসমালোচনার মাধ্যমে সমস্যাগুলোর সমাধান করা হয়নি, পলিটব্যুরো 'ফতোয়া' দিয়ে সেটা মেটানো হয়েছে। পলিটব্যুরোর রক্তচক্ষুর সামনে সব যুক্তিতর্কই নীরব হয়ে গেছে। কয়েকটা উদাহরণই যথেষ্ট হবে।

জুনের লড়াই-এর পর কমরেড সূর্য্য লিখলেন (টি ইউ অর্গানাইজার, নং ৩) "শ্রীরামপুর অঞ্চলে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে সাধারণ মানুষকে সমবেত করার পরেই পুরো আন্দোলন 'নারোদনিক' পথে বিপথগামী হয়ে গেল। বস্ত্রশিল্প ও চটশিল্পের সহস্রাধিক শ্রমিকের মধ্যে, ধর্মঘটের পক্ষে তাদের আনার উদ্দেশ্যে গণসমাবেশ, বিক্ষোভ-সংঘর্ষ এইসব কাজকে আরো তীব্রতর করার বদলে, রিষড়া আর মানকুণ্ডু স্টেশনে আচমকা অবরোধ করার মতো বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত কর্মসূচিতেই পার্টি শাখাগুলো ব্যস্ত হয়ে রইল"।

চটশিল্পে পার্টির এত ক্ষয়ক্ষতি দেখে, প্রাদেশিক কমিটির সভায় কমরেড নিতাই এই বলে সতর্ক করলেন যে, সমস্ত পার্টি সদস্যকে বিক্ষোভ সমাবেশে অংশ নেবার জন্য যদি এইভাবে অবিরত সার্কুলার পাঠাতে হয়, তাহলে পার্টি শেষ হয়ে যাবে। কমরেড আমানুল্লা সতর্ক করে বললেন যে, সার্কুলারের মাধ্যমে পার্টি সদস্যদের সক্রিয় করা যেতে পারে, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণিকে কখনো হুকুম দিয়ে ধর্মঘটে নামানো চলবে না, এ অভ্যেস পাল্টাতে হবে।

কমরেড রবির 'পশ্চিমবাংলায় সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই'—এই লেখায় এই সমস্ত কমরেডদের একহাত নেওয়া হল। এতে তিনি লিখলেন : কিছু নির্দেশিকা এবং দলিলকে ঠিকমত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এমনকি কৌশলগত পথ এবং অন্যান্য সমালোচনাপূর্ণ নোটের ওপর প্রস্তাব নেওয়া সত্ত্বেও, টি ইউ অর্গানাইজারের তিন নম্বর সংখ্যায় অগ্রণী বাহিনীর বিচ্যুতির কথা বলা হল। এমনকি, প্রাদেশিক কমিটির সভা বিবরণীগুলোর বিষয়ে পলিটব্যুরোর পর্যালোচনার পরেও (যে বিবরণীতে কমরেড রবি, কমরেড নিতাই, কমরেড আমানুল্লাকে

সংশোধনবাদী মনোভাব দেখানোর জন্য নিন্দা করেছেন) সেই দলিল (৩ নং টি ইউ অর্গানাইজার) প্রেস থেকে ফিরিয়ে আনানো হল না। এই রচনাটি লেখার আগে কমরেড রবির সুনির্দিষ্ট নির্দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে টি ইউ অর্গানাইজারের প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হল।

মেদিনীপুরের কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে 'মার্ক্সবাদী'-তে একটা নিবন্ধ লেখার দায়িত্ব কমরেড নিতাইকে দেওয়া হয়েছিল। লেখাটির নানান ত্রুটি সত্ত্বেও, এই নিবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছিল যে, মেদিনীপুরের লড়াই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এতটা উচ্চ পর্যায়ে উন্নত হয়েছিল তার কারণ হল, সেখানকার কৃষককুল মূলত সামন্ততান্ত্রিক এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণের শিকার ছিল। কমরেড রবি এবং কমরেড গৌর এই নিবন্ধটি ফিরিয়ে দিলেন এবং 'কৃষক প্রশ্নে' পলিটব্যুরোর বক্তব্যের ভিত্তিতে সেটিকে আবার লেখা উচিত একথা বললেন। মেদিনীপুরে জমিদারদের খাজনা না দেবার সপক্ষে একটা প্রচারাভিযান চালান উচিত, এই প্রস্তাব দেবার জন্য কমরেড বিরাটকে 'সংশোধনবাদী' বলে সমালোচনা করা হল।

বাণিজ্য শাখার ছাত্রদের ধর্মঘটের পর, কমরেড নন্দন পেটি-বুর্জোয়া বৈপ্লবিক প্রবণতাকে নিন্দা করলেন এবং অবিরত রাজনৈতিক ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার শ্লোগানের বিরুদ্ধে আপত্তি জানালেন। পলিটব্যুরোর পক্ষে ছাত্র ফ্রন্টের দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড যতীন, কমরেড নন্দনকে একজন সংশোধনবাদী বলে অভিহিত করলেন। প্রধানত কমরেড যতীনের নির্দেশেই অবিরত রাজনৈতিক ধর্মঘটের সপক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

শান্তি কংগ্রেসের পর, কমরেড সূর্য্য, কেবলমাত্র যারা অক্ষরে অক্ষরে আমাদের পার্টির নীতি গ্রহণ করবে তাদের শান্তি কমিটিতে রাখার মনোভাবের বিরোধিতা করে কমরেড রবিকে চিঠি লিখলেন। শান্তি সম্বন্ধে কমরেড সূর্য্যের ধারণা 'সংশোধনবাদীতা'-র নামান্তর এই বলে সমালোচনা করে কমরেড রবি চিঠির উত্তর দিলেন। কমরেড সূর্য্য তাঁর দ্বিতীয় চিঠিতে যখন তাঁর যুক্তির সমর্থনে কমিনফর্ম ব্যুরোর মুখপত্র থেকে উদ্ধৃতি দিলেন, তখন সে চিঠির কোন উত্তর পেলেন না।

এই সমস্ত মতবিরোধকে মাথায় রেখে, পলিটব্যুরো প্রাদেশিক কমিটির সদস্যদের মধ্যে পার্টি শিক্ষা প্রচারের সিদ্ধান্ত নিল। কমরেড রবি নিজেই হলেন শিক্ষক। সেই সমস্ত ক্লাসের একটা প্রধান বিষয় ছিল 'যোশিবাদ এবং তার নানা ঝোঁক'। কমরেড রবি দেখাবার চেষ্টা করলেন যে, প্রাদেশিক কমিটির সদস্যদের প্রধান ত্রুটি হল যে, তারা 'কেন্দ্রিকতা' (অর্থাৎ পলিটব্যুরো)-র প্রতি অবিশ্বস্ত। প্রধান অপরাধী হিসেবে যাঁদের ধরা হল তাঁরা হলেন, কমরেড গৌর, সূর্য্য, নিতাই আর কবীর।

'অন্ধভাবে কেন্দ্রকে মান্য কর'—পার্টি ক্লাস থেকে এই শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রাদেশিক কমিটির সদস্যরা পার্টির একেবারে নিম্নস্তরের কমিটি পর্যন্ত সেই শ্লোগানকে ছড়িয়ে দেবার কাজে এগিয়ে গেলেন।

নতুন লাইনের সপক্ষে সংগ্রাম

অবস্থা এমনই হল যে পলিটব্যুরোর ট্রটস্কীয় পরিচালন পদ্ধতি এবং কৌশলের জন্য এবং প্রাদেশিক কমিটিতে মার্ক্সবাদী-লেলিনবাদী বোধের সম্পূর্ণ অভাব থাকায় পার্টি ক্রমশ ছোট হয়ে গেল।

একদিকে, প্রাদেশিক কমিটির কিছু সদস্য পলিটব্যুরোর অন্ধ ভক্ত আর বাকিরা ভয়ে সমঝোতার সুবিধাবাদী নীতি গ্রহণ করায়, প্রাদেশিক নেতৃত্ব পার্টির সাধারণ কর্মী আর সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা লৌহ কঠিন আমলাতান্ত্রিক গোষ্ঠীতে পরিণত হওয়ায়, অন্যদিকে পার্টির সাধারণ কর্মীরা বেশির ভাগ স্থানে পার্টির নীতি বিষয়ে সন্দিহান হয়ে উঠল। বেশির ভাগ স্থানে পার্টি এবং গণসংগঠনগুলো নামেই টিকে আছে। এর একেবারে বিপরীত অবস্থানে শ্রমিক-কৃষকদের আন্দোলন আরো বেশি বেশি করে সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ নিচ্ছে। মরিয়া হয়ে শাসকশ্রেণি দাঙ্গা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। এমন এক পরিস্থিতিতে 'For a lasting peace'... এই ঐতিহাসিক সম্পাদকীয় সামনে এল।

যদিও প্রাদেশিক কমিটির বেশির ভাগ সদস্য বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই সম্পাদকীয় এক নতুন পথের ইঙ্গিত দিচ্ছে, তবু প্রথমে কিছু কৌশলগত বদল প্রয়োজন এইভাবেই তাঁরা এটাকে দেখেছিলেন। ভেবেছিলেন যে, পার্টির রাজনৈতিক তত্ত্ব, এর প্রধান পরিচালন পদ্ধতি এসব ঠিকই আছে। পলিটব্যুরোর সিদ্ধান্তের জন্য তাঁরা অপেক্ষা করেছিলেন।

প্রাদেশিক কমিটির একটা সভায় (সেখানে কমরেড আজাদ, যদু এবং সাধু অনুপস্থিত ছিলেন) কমরেড রবি পলিটব্যুরোর প্রথম বক্তব্যটি ব্যাখ্যা করেন। এই সভায় যদিও রাজনৈতিক তত্ত্বের ত্রুটিপূর্ণ সূত্রায়ন বিষয়ে কিছু প্রশ্ন উঠেছিল, তবু প্রাদেশিক কমিটি কোন প্রস্তাব গ্রহণ করেনি।

পার্টির সাধারণ সদস্যদের মধ্য থেকে পলিটব্যুরোতে প্রথম বক্তব্যের বিরুদ্ধে যখন প্রতিবাদের ঝড় উঠল, তখন পলিটব্যুরো এবং প্রাদেশিক কমিটির সদস্যরা প্রথমে এর মধ্যে যোশিবাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী হাত দেখতে পেলেন। বোম্বে গিরনি কামদার ইউনিয়ন কিছু বিদ্রোহীর দখলে বিচ্ছিন্নভাবে চলে যাবার ঘটনা উল্লেখ করে কমরেড রবি এখানকার যোশিবাদীদের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক কমিটিকে সাবধান হবার জন্য সতর্ক করে দিলেন। যোশিবাদীদের কাজকর্মের রিপোর্ট সংগ্রহ করার জন্য কমরেড রবি আর গৌর বারবার প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীকে চাপ দিতে লাগলেন। পার্টির মুখপত্রে যোশির চরিত্র উন্মোচনে দেরি হওয়ায় কমরেড গৌর একটি চিঠিতে তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। বারেবারে এইরকম খোঁচা মারার জন্য প্রাদেশিক কমিটি, বিশেষ করে সম্পাদকমণ্ডলী অপ্রয়োজনীয়, ভারসাম্যহীন মাত্রায় যোশিবাদীদের ওপর নজরদারি করতে শুরু করেন।

বৈধ মুখপত্রে নিবন্ধ ছাপিয়ে, ১৬নং বিজ্ঞপ্তি (কমরেড নিতাই-এর খসড়া, প্রাদেশিক কমিটির অন্যান্য অংশ এবং কমরেড গৌরের অনুমোদিত) প্রচার করে সাধারণ সদস্যদের সতর্ক করা হল। 'For a lasting peace.....'-র সম্পাদকীয় আসার আগে তিন নং ছাত্র অর্গানাইজারের খসড়া করলেন কমরেড নন্দন। পরে ওপর ওপর এটাকে সংশোধন করা হল, দেখানো হল সম্পাদকমণ্ডলীকে। এটি ছাপাবার বিষয়ে কমরেড নিতাই-এর আপত্তি থাকায় কিছুদিন এটা পড়ে রইল। কিন্তু পরে আবার ছাপার জন্য পাঠানো হল।

পলিটব্যুরোর বক্তব্য বিজ্ঞপ্তি নং ১৬ এবং ছাত্র অর্গানাইজার নং তিন—এই দুটি বিষয়ে সাধারণ সদস্যদের সঙ্গে অনেক আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণ করে, প্রাদেশিক কমিটির অনেক সদস্য তাদের ত্রুটিগুলো বোঝার চেষ্টা করতে শুরু করলেন (যদিও সাধারণভাবে তাঁরা পলিটব্যুরোর পক্ষ সমর্থনকারীর ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হতেন)। এই প্রচেষ্টার প্রথম প্রকাশ দেখা

গেল, পলিটব্যুরোর বক্তব্য বিষয়ে প্রাদেশিক কমিটির খসড়া প্রস্তাবে (কমরেড নিতাই-এর খসড়া)। এই খসড়ায় পলিটব্যুরোর বক্তব্যকে পুরোপুরি বাতিল করা হল, পলিটব্যুরোর পরিচালন পদ্ধতি ও কৌশলকে 'ট্রটস্কীয়' বলে চরিত্রায়িত করা হল, সাম্রাজ্যবাদকে নস্যাৎ করা, 'উপনিবেশ উৎখাতে'র তত্ত্বকে প্রচার করা—এই সমস্ত কিছুর জন্য গত দু'বছরে কিছু অর্জন করার বদলে কেবল অঘটনই ঘটেছে একথার ওপরই জোর দেওয়া হল।

কিন্তু এই খসড়াটি যখন প্রাদেশিক কমিটির সভায় পেশ করা হল, তখন দেখা গেল যে, কমবেড মল্লিক-এর প্রতি অক্ষরের বিরোধী, কমরেড বিরাট-এর আংশিক বিরোধিতা করছেন, আর প্রাদেশিক কমিটির বাকি সদস্যরা একটা শর্তে এটা মেন নিতে রাজি, তা হল, পলিটব্যুরোর মন্তব্যের প্রত্যাখ্যান আর 'ট্রটস্কীয়বাদ'-এর উল্লেখের জায়গাটুকু বাদ দিতে হবে, আর গত দু'বছেরের সাফল্যের কথাও লিখতে হবে। এইরকম সুবিধাবাদী সমঝোতা করা প্রস্তাবটি কার্যত গৃহীত হল এবং শেষ পর্যন্ত কমরেড আজাদও একে সমর্থন করলেন।

প্রাদেশিক কমিটির সদস্যরা একেবারে নীচুতলার সাধারণ কর্মীদের কাছে নিজেদের ব্যক্তিগত মতামত জানাবার অনুমতি চাইলেন। কমরেড মল্লিক এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্যদের বিরোধিতায় সে অনুমতি তাঁদের কাছে পৌঁছল না।

পলিটব্যুরোর দ্বিতীয় বক্তব্যে (প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি) বাম-সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়ের রাস্তা খুলে দিল। এর মধ্যে প্রাদেশিক কমিটির বেশির ভাগ বুঝে গেছেন যে, পলিটব্যুরোর এই দলিল পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করার বদলে কেবল তাকে আরো ছিন্নবিচ্ছিন্ন করবে। প্রাদেশিক কমিটি পলিটব্যুরো ভেঙে দেবার জন্য আর প্রধান প্রধান প্রাদেশিক কমিটিগুলোকে পুনর্গঠন করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে আবেদন জানিয়ে একটা ঐক্যমত্য প্রস্তাব গ্রহণ করল (কমরেড নিতাই আর নন্দনের খসড়া)। এই দাবি করার আগে প্রাদেশিক কমিটির উচিত ছিল আত্মসমালোচনা করা, এই সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত হওয়া সত্ত্বেও এ কাজ করতে তাঁরা পারলেন না।

সাধারণ সদস্যদের বেশির ভাগ চিঠি, প্রস্তাব এবং আলোচনায় যে প্রাদেশিক কমিটি এবং জেলা কমিটিগুলি সম্পর্কে অনাস্থা সুর শোনা যেত, তার জন্য দায়ি হল, পলিটব্যুরোর আচরণ সম্পর্কে প্রাদেশিক কমিটির প্রস্তাবে আত্মসমালোচনার অনুপস্থিতি, দাঙ্গার বিরুদ্ধে, শান্তির জন্য এবং প্রতিদিনকার প্রচার এবং সংগ্রামে প্রাদেশিক কমিটির নেতৃত্ব দানের অক্ষমতা।

এই অবস্থায়, পার্টি সদস্যদের একাংশ শ্লোগান তুললেন—প্রাদেশিক কমিটি পদত্যাগ করতে রাজি নয়—কাজেই সাধারণ কর্মীদের মধ্য থেকেই আমাদের নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে অর্থাৎ 'নীচের স্তর' থেকে 'কেন্দ্র' গড়ো। হাওড়ার জেলা কমিটি এই শ্লোগানের চাপে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করল আর কলকাতা জেলা কমিটিতে আত্মসমর্পণের মনোভাব দেখা দিল। প্রাদেশিক কমিটির মধ্যে কেবলমাত্র কমরেড নন্দনের মধ্যে কিছুটা আত্মসমর্পণের মনোভাব দেখা গেল।

প্রাদেশিক কমিটি 'পার্টি সদস্যদের প্রতি আবেদন'-এ (আত্মসমালোচনামূলক অংশটি কমরেড নন্দনের খসড়া আর বাকি অংশটি কমরেড নিতাই-এর) নির্দিষ্টভাবে সাধারণ সদস্যদের এই বলে আশ্বস্ত করল যে, তাদের সামনে কমিটি তার আত্মসমালোচনা পেশ করবে। সমালোচনা আর আত্মসমালোচনা বাম গোষ্ঠীতন্ত্র এবং দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদ উভয়ের

বিরুদ্ধে লড়াই-এর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় কমিটি অবশ্যই প্রাদেশিক কমিটিকে নতুন করে গড়ে তুলবে।

কিন্তু এই আবেদন সত্ত্বেও, প্রাদেশিক কমিটি গোঁড়া এবং যান্ত্রিকভাবে কেন্দ্রিকতার ওপর জোর দিল। পার্টির নীতিকে সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে এই কেন্দ্রিকতা যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সে কথা স্পষ্ট ভাষায়, বিশ্বাসজনকভাবে ব্যাখ্যা করার যে ব্যর্থতা, তারই পরিণতিতে সাধারণ স্তরের কর্মীদের অবিরত সন্দেহের জন্ম হতে লাগল। পরবর্তী অগ্রগতির একটা প্রাথমিক শর্ত হিসেবে সমগ্র পার্টি নেতৃত্ব একটা পরিবর্তনের সাগ্রহ প্রতীক্ষায় রইল।

এইভাবে অন্তঃপার্টি সংগ্রাম, সময়মত হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে প্রাদেশিক কমিটির ব্যর্থতা, পলিটব্যুরোর ভ্রান্ত পদ্ধতির প্রতি এর সমর্থন, পলিটব্যুরোর আচরণবিধি সম্পর্কে কমরেড মল্লিকের বিভ্রান্তিকর রিপোর্টের প্রতি এর আস্থা, বাম-সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাহসের সঙ্গে সাধারণ স্তরের কর্মীদের ওপর আস্থা না রাখতে পারা, গত দেড় বছরের কার্যকলাপ সম্বন্ধে নিজেদের আত্মসমালোচনামূলক রিপোর্ট অতি দ্রুত তৈরি করা এবং সাধারণ কর্মীদের সামনে তা পেশ করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা—পার্টিকে আজ প্রতিমুহূর্তে যে কড়া সমালোচনার মুখোমুখি হতে হচ্ছে, তার জন্য এসব কিছুই দায়ি।

অন্তঃপার্টি সংকটের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পার্টি সদস্যদের সাহায্য করতে, এই সংকট অতিক্রম করার পথ সুগম করতে, প্রাদেশিক কমিটি বর্তমান সমালোচনা এবং আত্মসমালোচনাটি পেশ করছে।

সমালোচনা এবং আত্মসমালোচনা থেকে আরব্ধ কিছু পাঠ

প্রাদেশিক কমিটির এই সমালোচনা আর আত্মসমালোচনা থেকে কি শিক্ষা অর্জন করা যাবে?

প্রথমত, প্রাদেশিক কমিটি সামগ্রিকভাবে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ থেকে, কিংবা পার্টি সদস্যদের কাছ থেকে, অথবা মানুষের কাছ থেকে কখনো কিছু শেখবার চেষ্টা করেনি। ঔপনিবেশিক মুক্তি আন্দোলন বিষয়ে লেনিন-স্ট্যালিনের দেওয়া উপদেশ থেকে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতাদের নানান রচনা থেকে, কমিনফর্ম ব্যুরোর মুখপত্র থেকে, সর্বোপরি চীন কমিউনিস্ট পার্টি এবং মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে পরিচালিত বিজয়ী চীন বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু শেখবার সামান্যতম চেষ্টাও কমিটি করেনি।

সাধারণ স্তরের কর্মীদের প্রতি প্রাদেশিক কমিটির সর্বক্ষণের মনোভাব ছিল উদ্ধত, অসন্তুষ্ট শিক্ষকের মতো। পার্টি সদস্যরা যখনই কোন প্রশ্ন তুলেছেন তখনি প্রাদেশিক কমিটি তাঁদের থেকে কোন পাঠ নেবার পদলে তাঁদেরই শেখাতে চেষ্টা করেছে। উচ্চতর কমিটির নেওয়া সমস্ত সিদ্ধান্ত এমন করে উপস্থাপিত করা হয়েছে যেন তা অকাট্য। তবু যাঁদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করা যায়নি তাঁদের নীরবে উপহাস করা হয়েছে কিংবা তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

সাধারণ শ্রমিক-কৃষক জনতা বারবার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে, গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়েছে। অথচ আমরা কখনো যুদ্ধরত জনতার-র কাছ থেকে এই প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইনি; কেন এগিয়ে যাবার ক্ষেত্রে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি; কেন আমাদের গণ-সংগঠনগুলি প্রতিদিন আরো শক্তিশালী হবার বদলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, নতুন নতুন লড়াকু সদস্য পার্টিতে আসার

বদলে দিনদিন কেন পার্টি আরো দুর্বল হয়ে যাচ্ছে? আমরা শুধু 'ফতোয়া' জারি করে সাধারণ জনতাকে সংগ্রামে ঠেলে দিতে চেষ্টা করেছি।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, প্রাদেশিক কমিটি সদস্যরা অর্ধশিক্ষিত অফিস কেরানিদের মতো আচার-আচরণ করেছে। সাধারণভাবে কর্মী এবং জনতার সামনে তারা যতটা রক্তচক্ষু দেখিয়েছে, ঠিক সেইরকম ব্যবহারই তারা উচ্চতর কমিটি, পলিটব্যুরো এদের কাছ থেকে পেয়েছে। কার্যপদ্ধতি এবং কৌশলের বিষয়ে পলিটব্যুরোর রিপোর্ট থেকে শুরু করে এমন একটা মৌলিক দলিল পাওয়া যাবে না, যার উপরে প্রাদেশিক কমিটি সমষ্টিগত আলোচনার ব্যবস্থা করেছে, প্রস্তাব পাশ করেছে। সাধারণ কর্মীদের মতামতকে পরীক্ষা করা, তা নিয়ে আলোচনা করা, তাকে সমর্থন করা এসবের বদলে, সাধারণ কর্মীদের আক্রমণ করা আর সর্বক্ষণ পলিটব্যুরোকে সমর্থন এটাই প্রাদেশিক কমিটির অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এইভাবে, সমালোচনা এবং আত্মসমালোচনার অস্ত্রকে পরিহার করে, পার্টির মধ্যে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে হত্যা করে, প্রাদেশিক কমিটি বাংলায় পলিটব্যুরোর ট্রটস্কীয় পথ প্রয়োগ করার জন্য উর্বর মাটি আর আদর্শ ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। এ কারণেই বাংলায় পার্টিকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে হল।

দ্বিতীয়ত, বাংলায় পার্টির বেশির ভাগ অংশ পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণি থেকে আসা। লেনিন আমাদের এই বলে সতর্ক করেছেন যে, পেটি-বুর্জোয়া আর সর্বহারা শ্রেণির মধ্যে কোন চীনের পাঁচিল নেই, (মার্ক্স, এঙ্গেলস, মার্ক্সবাদ)। পেটি-বুর্জোয়া প্রাধান্যের সুযোগে, সবসময় বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ বাম কিংবা দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের চেহারায় পার্টির মধ্যে ঢুকে পড়তে চেষ্টা করে।

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের অস্ত্রে তাত্ত্বিক লড়াই প্রবল করে তোলার বদলে সোজাসাপ্টা কয়েকজন শ্রমিক কমরেডকে পার্টির নেতৃত্ব দেবার মত পদে বসিয়ে দিয়ে, পার্টি নেতৃত্ব কার্যত বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের কাছেই আত্মসমর্পণ করেছে। যোশিবাদ আর দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার বিষয়ে বড় বড় কথার কোন অভাব ছিল না, কিন্তু পার্টি সাহিত্যের কোথাও যোশিবাদের মুখোশ খুলে দেওয়া কিংবা তার ব্যাখ্যা করা, এসব কিছু দেখতে পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে, বাম-সুবিধাবাদের বৃদ্ধির সুযোগে, পার্টিকে আক্রমণ করা যোশিপন্থীদের পক্ষে তুলনামূলকভাবে সহজ হয়ে গেল। পার্টিকে নিষ্ক্রিয় করে, পঙ্গু করে, দল উপদলে ভেঙে ধ্বংস করে ফেলার উদ্দেশ্যে, পার্টি শৃঙ্খলা, তার গঠন, তার কেন্দ্রিকতাকে আক্রমণ করা আর এদের দুর্বল করে দেবার উদ্দেশ্যে, বিভেদকামীরা কোন পার্টি সদস্যের ন্যায্য রাগকে কাজে লাগাবার জন্য সেগুলো খুঁজে খুঁজে বেড়াত।

আজ একথা দিনের আলোর মত পরিষ্কার যে, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে নির্দয়, তাত্ত্বিক প্রচারের ভিত্তি ছাড়া বাংলায় পার্টিকে জোটবদ্ধ করতে পারা যাবে না।

তৃতীয়ত, যদিও গোটা প্রাদেশিক কমিটিই বাম-সুবিধাবাদের পাঁকে ডুবে গিয়েছিল, তবু ব্যক্তিগত স্তরে প্রাদেশিক কমিটির সদস্যদের অপরাধের মাত্রায় একটা পার্থক্য টানা যায়। ট্রটস্কীয় পথে চলার ক্ষেত্রে পলিটব্যুরোর প্রধান সহায় ছিলেন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা। তাঁরা সকলেই বর্ষীয়ান কমরেড। পার্টির ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে নানান নীতির মধ্যে মতবিরোধের সংগ্রামের সম্পর্কে প্রাদেশিক কমিটির অন্যান্য সদস্যদের চেয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও, বর্তমান সদস্যরা কখনো কখনো সচেতনভাবে পলিটব্যুরোর নীতি প্রয়োগ করেছেন, অন্য সময়ে তার সঙ্গে সমঝোতা করেছে। এমনকি 'For a lasting peace'-র সম্পাদকীয় প্রকাশিত হবার পরেও তাঁরা পলিটব্যুরোর পক্ষে সাধারণ কর্মীদের বিরুদ্ধে বন্দুক তাক করেছেন। এইভাবে অন্তঃপার্টি সংগ্রামকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করতে সাহায্য করেছেন।

গত দু'বছরের সংগ্রাম চলাকালে যত ভুলক্রটি হয়েছে তার প্রায় কোন দায়ই যে শ্রমিক কমরেডদের (কমরেড আমানুল্লা, সাধু এবং যদু) ওপর গিয়ে পড়বে না সে কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রাদেশিক কমিটির অন্তর্ভুক্ত হবার কয়েক সপ্তাহ পরেই সাধু ট্রটস্কীয় পথের শিকার হয়ে গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। প্রাদেশিক কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তে যদুর কিছু করার অবকাশ ছিল না। কমরেড আমানুল্লা প্রথমে তাঁর সুনির্দিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে পার্টির পথকে যুক্ত করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু ক্রমশ তাঁর গভীর শ্রমিক শ্রেণিগত সহজাত প্রবৃত্তি পলিটব্যুরো এবং প্রাদেশিক কমিটির অন্ধ হঠকারিতায় এমনভাবে বিকৃত হয়ে গেল যে, তিনি প্রায়শই সাধারণ জনতা সম্বন্ধে তাঁর এতদিনের অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করতে শুরু করলেন, নিজের সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে কৌশলগত যে পথ নেওয়া হয়েছে তাকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করলেন। তাঁকে এবং কমরেড যদুকে শিক্ষিত করার কোন চেষ্টাই করেনি প্রাদেশিক কমিটি, কেবলমাত্র যে দুটো স্কুলে তাঁরা উপস্থিত থাকতে পেরেছিলেন, (সে দুটো পলিটব্যুরো চালাত) সেখানে শুধু একটাই চেষ্টা চালানো হয়েছে কি করে তাদের মগজে বাম-সুবিধাবাদ ঠেসে দেওয়া যায়।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই দু'বছরে এই দু'জন শ্রমিক কমরেড যে মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরেছেন, অন্য কোন কমরেড দশ বছরেও সে সুযোগ পাবেন না।

চতুর্থত, শহরে শ্রমজীবী শ্রেণি, ছাত্র, পেটি-বুর্জোয়াদের সংগ্রাম আর গ্রামাঞ্চল জুড়ে কৃষক সংগ্রাম-এর থেকে দেখা গেল যে, আমাদের সাংঘাতিক সব ভুলক্রটি এবং ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও আজ আমরা একটা নতুন স্তরে পৌঁছেছি—তা হল সশস্ত্র সংগ্রামের স্তর। বাংলার অপরাজেয় শ্রমিকদের প্রতিটি ধর্মঘট, বীর ছাত্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিটি গণ-উত্থান, গ্রামের প্রতিটি সংঘর্ষ সাম্রাজ্যবাদী আর তাদের দালাল নেহরু-প্যাটেল সরকারের মনে আতংক সৃষ্টি করেছে। টাটা আর বিড়লা অকারণে 'বিপদ' 'বিপদ' বলে শোরগোল তুলছে না। তাদের মুনাফার স্বর্গে আঘাত পড়েছে। বাংলার সীমান্ত অঞ্চল চীন আর বর্মার মুক্তাঞ্চলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। ময়মনসিংহের পাহাড়ী অঞ্চল গেরিলা ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। মেদিনীপুর এবং অন্য এলাকার জঙ্গী কৃষকরা স্থির প্রতিজ্ঞায় সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার জন্য প্রস্তুত।

যত তাড়াতাড়ি একের নীচের তলা থেকে ওপর পর্যন্ত পার্টিকে পুনর্গঠিত করা যাবে, 'For a lasting peace' —সম্পাদকীয়ের ভিত্তিতে, পিকিং WFTU সম্মেলনের ইশ্‌তেহার এবং কমরেড মাও এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতাদের নানান লেখার ভিত্তিতে, একটা নতুন লেনিনীয় কর্মপদ্ধতি ও কৌশলের ভিত্তিতে, সর্বস্তরের সাধারণ কর্মীদের সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার ভিত্তিতে যত তাড়াতাড়ি পার্টিকে একত্রিত করা যাবে, তত তাড়াতাড়ি আমাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন জয়যুক্ত হবে। কমরেড ষ্ট্যালিনের নেতৃত্বে আজ সারা পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক শিবির অপরাজেয় হয়ে উঠেছে। চীন বিপ্লবের বিজয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে জনগণের মুক্তি আন্দোলন প্রত্যাঘাত করতে শুরু

করেছে। সাফল্যের সঙ্গে অন্তঃপার্টি সংগ্রাম শেষ করে, ঔপনিবেশিক এবং আধা-ঔপনিবেশিক দেশের জনগণের সর্বগ্রাসী মুক্তির লড়াই-এ আমরাও নিঃসন্দেহে আমাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে পারব।

এই আত্মসমালোচনামূলক রিপোর্ট থেকে প্রতিটি পার্টি সদস্য দেখতে পাবেন যে, প্রাদেশিক কমিটি কীরকম গুরুতর অপরাধ করেছে। এই সমস্ত অপরাধ সম্পর্কে সচেতন থেকে, প্রাদেশিক কমিটি নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে এই প্রস্তাব পেশ করছে যে, প্রাদেশিক নেতৃত্ব থেকে এই মুহূর্তে আমাদের অপসারিত করা হোক। কেন্দ্রীয় কমিটি অথবা নতুন প্রাদেশিক কমিটি যে শাস্তি দিতে চায়, প্রাদেশিক কমিটির প্রতিটি সদস্য নির্দ্বিধায় তা মেনে নেবে। কেন্দ্রীয় কমিটি এবং নতুন প্রাদেশিক কমিটির কাছে আমাদের আবেদন এই যে, সাধারণ মেহনতী জনগণের মধ্যে কাজ করে, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের পথে আত্মসমালোচনা করে আমরা আবার নতুন করে ফিরে আসার চেষ্টা করব। যে নির্দয় সশস্ত্র সংগ্রাম আমাদের সামনে, সেই সংগ্রামে স্বাধীনতাপ্রিয় সাধারণ জনতার পাশে কাঁধে কাঁধ দিয়ে লড়াই করার সুযোগ থেকে যেন আমাদের বঞ্চিত করা না হয়, এই আমাদের একমাত্র অনুরোধ।

(১ জুলাই ১৯৫০ তারিখে
প্রাদেশিক কমিটির সভায় অনুমোদিত)

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

টিকা 'রবি' ভবানী সেনের, 'নিতাই' নৃপেন চক্রবর্তীর, 'গৌর' সোমনাথ লাহিড়ীর এবং 'সূর্য' ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত'র ছদ্মনাম' (—সম্পাদক)

তৃতীয় পার্টি কংগ্রেস সম্পর্কে

তৃতীয় পার্টি কংগ্রেস ডাকার সপক্ষে পি-বি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন; ছয় মাসের মধ্যে সি-সি প্লেনামের অধিবেশন ডাকার জন্য সি-সি পূর্বে যে সিদ্ধান্ত নিয়াছিলেন, তাহার পরিবর্তন করিয়া পি-বি'র এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য পি-বি সি-সি'র নিকট সুপারিশ করার প্রস্তাব করিতেছেন।

পার্টি কংগ্রেসের পরিবর্তে সি-সি প্লেনাম ডাকার জন্য সি-সি যে সিদ্ধান্ত নিয়াছিলেন, তাহার কারণ কি ছিল?

১৯৫০ সালের ২৭শে জানুয়ারীর "লাষ্টিং পিসের..." সম্পাদকীয়, পিকিং সম্মেলনে কমরেড লিউ শাউ-চি'র উদ্বোধনী বক্তৃতা, এশিয়া ও অষ্ট্রেলেশিয়ার দেশসমূহের ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনের ম্যানিফেষ্টো এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলের ভিত্তিতে সি-সি (পুরাতন) তাহার গত মে মাসের অধিবেশনে পুরাতন পি-বি কর্তৃক অনুসৃত ট্রটস্কীবাদী রাজনৈতিক লাইনের এবং টিটোবাদী সাংগঠনিক পদ্ধতির মুখোশ একেবারে খুলিয়া ফেলেন এবং তাহাদের মূল উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে "বামপন্থী বিচ্যুতি" সম্পর্কিত রিপোর্ট এবং পুরাতন পি-বি ও সি-সি'র কার্যকলাপ সম্পর্কিত সাংগঠনিক রিপোর্ট গ্রহণ করেন। পুরাতন সি-সি তাহার মে মাসের অধিবেশনে নতুন চেতনার ভিত্তিতে একটি সম্পূর্ণ এবং সুসমঞ্জস রাজনৈতিক লাইন সম্পর্কে কোনো সুবিস্তৃত রাজনৈতিক দলিল রচনা করিতে পারেন নাই। কিন্তু, উপরোক্ত দলিলগুলিতে যে লাইন দেওয়া হইয়াছে, ভারতের ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োজনের সাধারণ ভাষ্য সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটি একই চিন্তাধারায় এবং সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন। ভারতের বিপ্লবের স্তর, রণনীতি ও রণকৌশল সম্পর্কে সি-সি কর্তৃক যেসব বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, তাহারই মধ্যে চেতনার এই ঐক্য প্রকাশ পাইয়াছে।

অতীতের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক ভুল ত্রুটি সম্পর্কে এবং পার্টির ভবিষ্যত রাজনৈতিক লাইন সম্পর্কে চিন্তাধারার ও সিদ্ধান্তের এই ব্যাপক মতৈক্য থাকার ফলে সি-সি খুবই আশান্বিত ছিলেন যে, পার্টির মধ্যে গভীর আলোচনা চালাইয়া সমগ্র পার্টির র‍্যাঙ্ককে ঐক্যবদ্ধ করা যাইবে এবং সি-সি প্লেনাম সভার মধ্য দিয়াই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলিলকে পাকাপাকিভাবে রচনা করা ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গড়িয়া তোলা যাইবে। সে সময়ে সি-সি'র ভিতরে অথবা বাইরে কোনো মূল বিষয় সম্পর্কে কোনো মতভেদ না থাকার জন্য সি-সি তাহার মে অধিবেশনে পার্টি-কংগ্রেসের সপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই।

দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক-সাংগঠনিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া সি-সি নতুন লাইনের ভিত্তিতে যাহাতে সমগ্র পার্টিকে কাজে চালু করা যায়, অতীতের ভুলের জন্য যে নিদারুণ ক্ষতি হইয়াছে, তাড়াতাড়ি তাহা পূরণ করা যায় এবং যাহাতে সংগ্রামী ও উদ্বেলিত জনতার পুরোভাগে আমাদের স্থান আবার তাড়াতাড়ি গ্রহণ করিতে পারি, সেজন্য খুব উদ্‌গ্রীব ছিলেন। পার্টি কংগ্রেস ডাকার সিদ্ধান্ত নিলে স্বভাবতই সারা দেশ জুড়িয়া পার্টি সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে একটার পর একটা সম্মেলন করা প্রয়োজন এবং বর্তমান অবস্থায় তাহার প্রস্তুতির জন্য তলা হইতে উঁচু পর্যন্ত গোটা পার্টির সমস্ত শক্তি, মনোযোগ ও সম্পদকেই একাজে নিয়োগ করা দরকার। ফলে যে গণ- আন্দোলন এবং গণসংগ্রামের প্রতি এখনই নজর দেওয়া দরকার, সেদিক হইতে পার্টি র‍্যাঙ্ক ও নেতৃত্বের দৃষ্টি অন্যদিকে বিক্ষিপ্ত ও পরিচালিত হইতে বাধ্য। এই বিক্ষেপকে যতদূর সম্ভব এড়াইতেই সি-সি চাহিয়াছিলেন।

তৃতীয় যে কারণের জন্য সি-সি পার্টি কংগ্রেসের বদলে সি-সি প্লেনামের সপক্ষে ছিলেন তাহা হইল, পার্টির বে-আইনি অবস্থা এবং শাসকচক্র কর্তৃক উন্মুক্ত শ্বেত সন্ত্রাসের রাজত্ব। এই অবস্থায় সারা দেশ জুড়িয়া একটার পর একটা সম্মেলন করা এবং পার্টি-কংগ্রেস আহ্বান করার মধ্যে প্রচণ্ড বিপদ রহিয়াছে এবং সি-সি যতদূর সম্ভব তাহা এড়াইতে চাহিয়াছিলেন। সি-সি প্লেনাম ডাকার সপক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়া সি-সি এইরূপ বিপদের সম্ভাবনাকে যতদূর সম্ভব সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহিয়াছিলেন।

কিন্তু গত সি-সি মিটিংয়ের পর, পার্টির ভিতরকার অবস্থা ভিন্নপথে চলিয়াছে এবং সি-সি'র আশা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। পার্টি আজ এক সর্বব্যাপী সংকটের—রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও আর্থিক সংকটের সম্মুখীন।

গত সি-সি মিটিংয়ের অব্যবহিত পরেই কয়েকজন সি-সি সভ্য (পুরাতন সি-সির) এবং প্রধান পার্টি নেতা জেল হইতে মুক্ত হইয়াছেন। বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার জন্য সদ্যমুক্ত প্রধান কমরেডদের কয়েকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। অবশ্য পার্টি-নীতি সম্পর্কিত জরুরি বিষয়গুলি সম্বন্ধে এইসব কমরেডদের মতামত জানিবার মত অবস্থায় পি-বি এখন আসিতে পারিয়াছেন।

পুরাতন এবং নতুন সি-সির রাজনৈতিক-সাংগঠনিক সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে প্রধান প্রধান পার্টি ইউনিট এবং অন্যান্য কমরেডরাও তাহাদের মতামত প্রকাশ করিয়াছেন।

সি-সির যে-অধিবেশনের পর গত কয়েক মাসের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যাইতেছে যে, পার্টির ভিতরকার রাজনৈতিক পার্থক্যগুলি ক্রমশ ক্রমশ দুইটি মোটামুটি সুস্পষ্ট ধারা (Trend) গ্রহণ করিতেছে এবং সেই ধারার মধ্যে দানা বাঁধিতেছে। আজ আমাদের দেশের বিপ্লব এবং পার্টির সম্পর্কে যতগুলি জরুরি রাজনৈতিক-সাংগঠনিক প্রশ্ন রহিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিকে ভিত্তি করিয়াই এই ঘটনা আত্মপ্রকাশ করিতেছে। আগের অনুসৃত লাইনের পরিবর্তে পার্টির এখনকার যে রাজনৈতিক লাইন রহিয়াছে তাহার ভিত্তি হইল পিকিং সম্মেলনে কমরেড লিউ-শাও-চির উদ্বোধনী বক্তৃতা, পিকিং ম্যানিফেস্টো, "লাস্টিং পিসে."র সম্পাদকীয় এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলিল; এই দলিলগুলির মোটামুটিভাবে পৃথক দুই রকমের ভাষ্য করা হইতেছে; উপরোক্ত দলিলগুলির মধ্যে যে নির্দেশ রহিয়াছে তাহার বাস্তব বিশ্লেষণ (Concretisation) ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমশ বেশি বেশি ভাবে দুইটি লাইন ফুটিয়া উঠিতেছে। ফলে,

সি-সির রাজনৈতিক-সাংগঠনিক সিদ্ধান্তগুলিকে প্রায়ই চ্যালেঞ্জ করা হইতেছে এবং কার্যত পার্টির কাজে অচল অবস্থা দেখা দিয়াছে, সঠিক রাজনৈতিক লাইন ঠিক করার কাজেও মন্থরতা আসিয়াছে এবং বিপ্লবী সংগ্রামের ক্ষেত্রে পার্টি তাহার উদ্যোগ শ্রেণিশত্রুর কাছে হারাইয়া ফেলিতেছে।

নতুন পুনর্গঠিত সি-সি ও পি-বি তাহাদের দলিলে, প্রস্তাবে এবং সার্কুলারে যে রাজনৈতিক লাইন ও সংগ্রামের কৌশল প্রচার করিয়াছেন, তাহা হইল একটি ধারা; এবং এই ধারাকে আক্রমণ করিয়া যে সব সমালোচনা করা হইতেছে, তাহা হইল অপর বিরোধী ধারা; অবশ্য এই দুই পরস্পরবিরোধী ধারার মধ্যে অন্য অনেক রকমের মতামত রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে এই কথা বলা দরকার যে সি-সি এখন পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ রণনৈতিক লাইন সম্বলিত রাজনৈতিক প্রস্তাব (পলিসি সম্পর্কে বিবৃতি) পাকাপাকিভাবে তৈরি করেন নাই; বিরোধী ধারার কমরেডরাও এখন পর্যন্ত সি-সির কাছে তাহাদের মতামত সমগ্র ও পূর্ণাঙ্গভাবে পেশ করেন নাই। তাহা সত্ত্বেও, এই দুইটি সুস্পষ্টভাবে পৃথক ও বিকাশোন্মুখ ধারাকে বুঝিবার মত যথেষ্ট তথ্য সি-সি'র হাতে রহিয়াছে এবং "পার্টি ফোরাম" ও অন্যান্য ইনফরমেশন ডকুমেন্ট ইত্যাদির মারফত সি-সি এইসব তথ্য পার্টি কমরেডদের নিকট পেশ করিবেন। ইতিমধ্যে, পার্টির বিতরকার যে গুরুতর রাজনৈতিক মতবিরোধের জন্য পার্টি-কংগ্রেস ডাকার এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে, সে সম্পর্কে পি-বি তাহার মতামত পার্টি র‍্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত করা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেছেন। মোটামুটিভাবে এবং সংক্ষেপে তাহা হইল এইরূপ ঃ

(১) পি-বি মনে করেন যে, ১৯৫০-এর মে মাসের পুরাতন সি-সি মিটিংয়ের ভিত্তিতে নবগঠিত সি-সি ও পি-বি তাহাদের রচিত ও প্রচারিত বিভিন্ন প্রস্তাব ও দলিলে যে রাজনৈতিক লাইন ও রণকৌশল উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা মূলত ঠিক লাইনেই আছে, যদিও এসবের পূর্ণতর ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও সুনির্দিষ্টকরণ দরকার। বিরোধী ধারার মত হইল, মে মাসে পুরাতন সি-সি যেসব রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নিয়াছেন এবং নতুন সি-সি ও পি-বি যাহা অনুসরণ করিতেছেন, তাহা মূলত সেই পুরোনো-সংকীর্ণতাবাদী লাইনেই চলিয়াছে; যদিও এইসব সিদ্ধান্তের মধ্যে এখানে সেখানে কিছু কিছু সঠিক কথা বলা হইয়াছে বলিয়া তাহারা মনে করেন।

(২) সি-সি এবং পি-বি একথা দৃঢ়ভাবে মনে করেন, বর্তমান গভর্নমেন্ট জনতার মঙ্গল করিতে পারে—জনগণের এই ধরনের মোহ সম্পূর্ণ নষ্ঠ হইয়াছে; জনগণ এবং গভর্নমেন্টের মধ্যে এখন বিরাট ব্যবধান রচিত হইয়াছে, ভারতের বর্তমান প্রতিবিপ্লবী শাসন ব্যবস্থা এখন একমাত্র সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতির সাহায্যেই টিকিয়া থাকিতে পারে—এবং ভারতের বর্তমান শাসক শ্রেণি এখন সেই পদ্ধতিই গ্রহণ করিয়াছে। বিরোধী ধারার কমরেডরা এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেন এবং তাঁহারা মনে করেন যে, কংগ্রেস শাসন সম্পর্কে জনগণের মধ্যে এখনও জোরদার মোহ রহিয়াছে।

(৩) সি-সি এবং পি-বি দৃঢ়ভাবে এইমত পোষণ করেন যে, কৃষি-বিপ্লব এবং সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের জন্য ভারতের বাস্তব অবস্থা এখন প্রস্তুত; কিন্তু বিরোধী ধারা বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ করিয়া এই যুক্তি দেয় যে, বর্তমানে সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ শুরু করা ভুল হইবে।

সি-সি এবং পি-বি মনে করেন যে, ভারতের বিপ্লবী মুক্তি আন্দোলনের সম্মুখে সশস্ত্র

গেরিলা প্রতিরোধ ইতিমধ্যেই এবং ক্রমশঃ বেশি বেশি করিয়া সংগ্রামের প্রধান পদ্ধতিরূপে দেখা দিয়াছে ও দিতেছে এবং এই পদ্ধতি ছাড়া বিপ্লবের আরও অগ্রগতি অসম্ভব; বিরোধী ধারা বড় জোর এইটুকু স্বীকার করিতে প্রস্তুত যে ভারতের অত্যন্ত মুষ্টিমেয় কতকগুলি ছোট ছোট এলাকায় (Pockets) সশস্ত্র প্রতিরোধ হয়ত সম্ভব ও প্রয়োজন এবং সংগ্রামের এই পদ্ধতিকে অন্যান্য আরও অনেক পদ্ধতির অন্যতম মাত্র বলিয়া হয়ত মনে করা যাইতে পারে, কিন্তু ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সম্মুখে ইহাকেই প্রধান পদ্ধতি বলিয়া বর্ণনা করা সম্পূর্ণ ভুল। বিরোধী ধারা এ ব্যাপারে একমত নন যে, বিপ্লবের সাফল্যের জন্য সংগ্রামের অন্যান্য পদ্ধতি অপরিহার্য হইলেও, তাহারা এই প্রধান পদ্ধতিরই পরিপূরক মাত্র।

জমি, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ ও জনগণের গণতন্ত্রের জন্য লড়াইয়ে সশস্ত্র সংগ্রামই যে সবচেয়ে কার্যকরী হাতিয়ার—আমাদের দেশের গোটা জনগণের কাছে এই শ্লোগান প্রচার করা এবং একাজের জন্য আইনি, আধা আইনি ও বে-আইনি সর্বপ্রকার উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বন করা বর্তমান অবস্থায় একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া সি-সি এবং পি-বি মনে করেন; কিন্তু বিরোধী ধারার কমরেডরা দাবি করেন যে, আমাদের পার্টির ভিতরকার দলিল ও চিঠিপত্রাদি হইতেও "সশস্ত্র সংগ্রামের" কথাগুলিকে বাদ দিতে হইবে, কারণ তাহাদের মতে এই শব্দ ব্যবহার করিলে পার্টির "আইনি" অবস্থার সুযোগ নষ্ট হইয়া যাইবে এবং আইনি ভাবে কাজের সুযোগ বাড়িবার যে সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহাও পয়মাল হইয়া যাইবে।

সি-সি এবং পি-বি মনে করেন, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্র প্রভৃতি যেসব এলাকায় সশস্ত্র-সংগ্রাম (Partisan Struggle) চলিতেছে, সেগুলিকে শক্তিশালী করা দরকার এবং আরও নতুন নতুন এলাকায় ছড়াইয়া দেওয়া দরকার; কিন্তু বিরোধী ধারার কমরেডরা তেলেঙ্গানার সশস্ত্র লড়াইকে চালাইয়া যাওয়া সম্পর্কে হতাশ এবং অন্ধ্রের গেরিলা লড়াই ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ কিনা, সে সম্পর্কে তাহারা সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন।

সি-সি এবং পি-বি বিশ্বাস করেন, বিশেষত যুদ্ধোত্তর যুগে পার্টি নেতৃত্ব কর্তৃক অনুসৃত দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী এবং বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদী নীতির ফলে যদিও নিদারুণ ভাঙ্গন ঘটিয়াছে এবং ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও পার্টির বর্তমান শক্তি এবং পার্টির পিছনে সংঘবদ্ধ জনতার শক্তি আমাদের দেশের কতকগুলি এলাকায় ও অঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করুতে ও ছড়াইয়া দিতে সক্ষম; কিন্তু বিরোধী ধারার মতে তাহা ঠিক নয় এবং তাহারা মনে করে না যে, পার্টি আজ এত দুর্বল যে এই কাজ শুরু করা সম্ভব নয়।

সি-সি এবং পি-বি অনুভব করেন, কংগ্রেস গভর্নমেন্টের সশস্ত্র প্রতি-বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রধানত পার্টির শক্তিকেই স্বাধীনভাবে চাঙ্গা করিয়া এবং সশস্ত্র প্রতিরোধের পথে পরিচালিত করিয়াই পার্টি নিজেকে রক্ষা করিতে পারে, নিজের অস্তিত্বকে বজায় রাখিতে পারে এবং পার্টি ও তাহার গণভিত্তিকে প্রসারিত করিতে পারে; কিন্তু অপর ধারাটা উল্টো যুক্তি উপস্থিত করেন।

৪। সি-সি এবং পি-বি এই বিশ্বাস পোষণ করেন যে, পার্টি এবং পার্টি কর্তৃক স্বাধীনভাবে পরিচালিত জনশক্তি (ইউনাইটেড ফ্রন্টের ভ্রূণাবস্থা) যদি কার্যত সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠিত না করে ও তাহা পরিচালনা না করে, যদি সংগ্রামের এই পদ্ধতির নির্ভুলতা সম্পর্কে হাতে কলমে প্রমাণ না দেয় ও মিত্রদের মনে বিশ্বাস যদি না জাগায় এবং শুধুমাত্র প্রচারের দ্বারা নয় (যদিও তাহা জরুরি এবং প্রয়োজনীয়), প্রধানত এই বাস্তব প্রমাণের সাহায্যে বুর্জোয়া মতাদর্শ ও

বুর্জোয়া কায়দায় লড়াই চালানো সম্পর্কে মোহকে যদি চুরমার না করে—তাহা হইলে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, বিশেষ করিয়া সশস্ত্র সংগ্রামের ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়িয়া তোলা যায় না। বিরোধী ধারা মনে করেন, এইরূপ সশস্ত্র সংগ্রামের কায়দা গ্রহণ করিলে মিত্ররা শ্রমিক শ্রেণি ও কমিউনিস্ট পার্টির নিকট হইতে ভয়ে দূরে সরিয়া যাইবে; সেজন্য তাহারা দাবি করেন, সমস্ত গণতান্ত্রিক শ্রেণি, দল ও গ্রুপ সমূহের নিকট যে ধরনের সংগ্রাম গ্রহণযোগ্য ও 'অধিগম্য' হইবে, কেবলমাত্র সেই ধরনের সংগ্রাম করিতে হইবে এবং ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের ভিতরকার সমস্ত পার্টি ও শ্রেণিসমূহ যতক্ষণ না একমত হইতেছেন, ততক্ষণ সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলা বন্ধ রাখিতে হইবে।

৫। সি-সি এবং পি-বি'র বিবেচনায় আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে বাস্তব রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন এবং পার্টির উপরে বর্তমানে যা বিধিনিষেধ, ফ্যাসিষ্ট দমননীতি ও বে-আইনি অবস্থা চাপানো রহিয়াছে, তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া পার্টিকে পুরাপুরি এবং সম্পূর্ণভাবে বে-আইনি করার জন্য, পার্টিকে ধ্বংস করার জন্য গভর্নমেন্ট, সাম্রাজ্যবাদী ও তাহাদের তাঁবেদাররা বদ্ধপরিকর। কিন্তু বিরোধী ধারার কমরেডরা মনে করেন, বর্তমানে পার্টির আইনি অস্তিত্বের যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং আইনি কাজের অধিকতর সম্ভাবনা হয়ত আরও বেশি বেশি বাড়িতে পারে। ফলে, একদিকে যখন সি-সি এবং পি-বি আইনি কাজের যেসব সুযোগ রহিয়াছে তাহার পুরাপুরি সদ্ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে বে-আইনি কাজের পদ্ধতিকে নিখুঁত করিয়া পুরাদস্তুর বে-আইনি পার্টি গঠনের উপর জোর দিতেছেন, তখন বিরোধী মতাবলম্বীরা পার্টির আইনি অবস্থা ও আইনসঙ্গতভাবে কাজ করার সুযোগের উপরই জোর দিতেছেন এবং কেন্দ্রের পুনঃপুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও কয়েকজন প্রধান পার্টি নেতা ইউ-জি যাইতে অস্বীকার করিতেছেন।

৬। সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেও দুইটি ধারা সুস্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে। সি-সি এবং পি-বি মনে করেন, পার্টির ভিতরকার এই বর্তমান সংকট আজ যখন আমাদের জড়াইয়া ধরিয়াছে এবং যখন একটি মাত্র দুর্বল অংশ ছাড়া গোটা পার্টিই উপর হইতে তলা পর্যন্ত সংকীর্ণতাবাদী লাইনে চলিয়া গিয়াছিল, তখন পার্টি কমিটিগুলিকে পুনর্গঠন করার সময় বর্তমান কমিটিগুলিকে ব্যাপকভাবে সরাইয়া দেওয়া ও ব্যাপক ভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার মনোভাব ঠিক নয়; কারণ, উঁচু হইতে নীচু পর্যন্ত প্রত্যেক স্তরের সমস্ত পার্টি কমিটিগুলিকে যদি বাতিল করিয়া দেওয়া—বিশেষত, সঠিক রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক লাইনের সপক্ষে কোনো কমরেডই যখন লড়াই চালান নাই, অথবা মুষ্টিমেয় কয়েকজন কমরেডই মাত্র লড়াই চালাইয়াছেন—তাহা হইলে সমস্ত পার্টির কাজ ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইবে। যদি কোনো কমরেড তাহার ভুলকে শোধরাইতে অস্বীকার করেন এবং সংশোধনের অযোগ্য হন এবং যদি কেহ পুরাপুরিভাবে পার্টি বিরোধী বা শত্রুর চরে পরিণত হয়, কেবলমাত্র তখনই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা উঠিতে পারে। যেসব কমরেড সংকীর্ণতাবাদী লাইনে নেতৃত্ব দিয়াছেন এবং তাহা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাদিগকে বিভিন্ন পার্টি কমিটির নেতৃস্থানীয় পদ হইতে সরাইবার ব্যবস্থা উঁচু হইতে নীচু পর্যন্ত 'পাইকারীভাবে' গ্রহণ করা ঠিক হইবে না; পার্টি কাঠামোর বিভিন্ন স্তরের পি-বি, সি-সি, পি-সি, ডি-সি, এল-সি সেল—গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া, প্রত্যেকের রাজনৈতিক যোগ্যতা বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন ভ্রান্ত কমরেড সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যবস্থা

গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু বিরোধী ধারার কমরেডরা ভিন্ন মত পোষণ করেন। কয়েকজন পি-বি সভ্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করার জন্য তাহারা সি-সি ও পি-বি'র বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন; সংকীর্ণতাবাদের যুগে যে সব কমিটি ছিল, তাহাদের প্রত্যেকটিকে খারিজ করার সাংগঠনিক নীতি ইহারা ঘোষণা করিতেছেন এবং এইসব কমিটিতে এমনসব কমরেডদের বসাইবার জন্য ইহারা সুপারিশ করিতেছেন, যাহাদের এইসব কমিটিতে থাকার যোগ্যতা বিচার করা হইতেছে না—কি পার্টির বর্তমান রাজনৈতিক লাইনের প্রতি তাহাদের মনোভাবের মাপকাঠিতে, কি অতীতের সংকীর্ণতাবাদী বা দক্ষিণপন্থী লাইনের সময় তাহারা কি ভূমিকা গ্রহণ করিয়া ছিলেন, তাহার মাপকাঠিতে!

পার্টি নেতৃত্ব সমূহের অতীতের ভুলের জন্য পার্টি ধ্বসিয়া পড়ার অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল এবং পার্টির মধ্যে বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দিয়াছিল; তাহার উপর এই পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও অন্যান্য মধ্যবর্ত্তী মতামত ও মত-বিরোধ আত্মপ্রকাশ করার ফলে পার্টির সাংগঠনিক কার্যকলাপে আরও ধাক্কা লাগিতেছে। কিছু কিছু ব্যতিক্রম থাকা সত্ত্বেও পার্টির মধ্যে এখন সাধারণ চিত্র হইল—আধা পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থা এবং তার ফলে গণ-আন্দোলনের অভাব। সি-সি'র গত মে অধিবেশনের পর হইতে পার্টির ভিতরকার সংকট আরও ঘোরালো হইয়াছে এবং তাহা অত্যন্ত কঠিন আকার ধারণ করিয়াছে—পার্টি সংগঠনের প্রত্যেকটি স্তরে সাংগঠনিক অচল অবস্থা ও চূড়ান্ত আর্থিক সংকট দেখা দিয়াছে। নীচে তাহার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল।

(১) পার্টির মধ্যে যে পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক ধারা রহিয়াছে, প্রধানত তাহার জন্যই কেন্দ্রীয় পার্টি তহবিল কার্যত আটক হইয়া পড়িয়াছে; পার্টি কেন্দ্রের এক্তিয়ারে যেসব পার্টি সম্পত্তি রহিয়াছে, তাহার কতকগুলি দ্রুত বিলি ব্যবস্থা করা দরকার বা ঢালিয়া সাজান দরকার, কিন্তু এই কাজকেও চ্যালেঞ্জ করা হইয়াছে। বর্তমানে সি-সি এক আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হইয়াছেন এবং পার্টির কিছু মূল্যবান সম্পত্তি শত্রুর কবলে গিয়া পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। ছত্রভঙ্গ অবস্থার জন্য এবং গণআন্দোলন নাই বলিয়া পি-সি, ডি-সি ইত্যাদি ইউনিটগুলিও চূড়ান্ত আর্থিক অসুবিধার মধ্য দিয়া যাইতেছে।

(২) কেন্দ্রের সঙ্গে যখনই কোন রাজনৈতিক বিরোধ দেখা দিতেছে তখনই পার্টির অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের নাম করিয়া সমস্ত কেন্দ্রীকতাকেই দুর্বল এবং চ্যালেঞ্জ করা হইতেছে। বোম্বাই পার্টি হেড কোয়ার্টারের সমস্ত কমরেডগণ কর্তৃক বেশ কিছু দিন পর্যন্ত বহিষ্কারের বিরুদ্ধে পি-সি যোশীর আবেদন সম্পর্কিত সি-সি'র প্রেস বিবৃতিকে চাপিয়া রাখা, পার্টির আইনি মুখপত্রে সি-সি'র প্রেস বিবৃতি প্রকাশের সময় আইনি অবস্থার দোহাই দিয়া স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে তাহার বিকৃতি সাধন, আইনি অবস্থার দোহাই দিয়া আমাদের আইনি মাসিক পত্রিকার মাও-সে-তুঙ সম্পর্কিত সি-সি প্রস্তাব ছাপিতে বিলম্ব করা—এই ধরনের অনেক উদাহরণের মধ্যে মাত্র এ কয়টি উল্লেখ করা হইল।

(৩) পার্টির কেন্দ্রীয় আইনি মুখপত্র কার্যত এক স্বাধীন ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে এবং ইহা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নীতিকে আর প্রতিফলিত করিতেছে না।

(৪) পার্টির সামনে যে কর্তব্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহা পালন করার জন্য এবং পার্টির নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য যে সর্ব নিম্ন শৃঙ্খলা থাকা দরকার, কোন কোন পার্টি ইউনিটের

মধ্যে তাহারও অভাব দেখা যাইতেছে। বিভিন্ন প্রদেশে এবং বিভিন্ন স্তরে পার্টির মধ্যে উপদলীয় চক্র গঠিত হইতেছে বলিয়া দেখা যাইতেছে। পার্টি শত্রু এবং তাহার চরেরা পার্টির ভিতরকার এই বিশৃঙ্খল অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিতেছে এবং ফলে কোন কোন প্রদেশে মূল্যবান ক্যাডার এবং পার্টি নেতারা শত্রুর হাতে ধরা পড়িতেছেন।

পার্টির ভিতরকার সংকটের চূড়ান্ত ঘোরালো অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য উপরোক্ত উদাহরণগুলিই যথেষ্ট। কিন্তু এই রাজনৈতিক বিভ্রান্তি ও সাংগঠনিক সংকটের মধ্যেও কিছু কিছু পার্টি ইউনিট ও কমরেড দৃঢ়তার সঙ্গে জনতার সাথে রহিয়াছেন—দুর্ভিক্ষ ও অনাহারের বিরুদ্ধে, বেতন কাটা ও ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে, বোনাস ও অন্যান্য দাবি আদায়ের জন্য, স্কুলের বেতন বাড়াইবার বিরুদ্ধে, জমি ও জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধলিপ্সুদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে শান্তির জন্য সংগ্রামে তাহারা জনতার সঙ্গে রহিয়াছেন। কিন্তু কিছু কিছু পার্টি ইউনিট ও অনেক পার্টি সভ্যের আপ্রাণ ও ঐকান্তিকতম চেষ্টা সত্ত্বেও প্রকৃত ঘটনা হইল এই যে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবী ঘটনাবলী যেভাবে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে ভারতের পার্টি তাহার অনেক পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে এবং পার্টি আজ এক সর্বব্যাপী সংকটের—রাজনৈতিক, সাংগঠনিক আর্থিক সংকটের সম্মুখীন।

গত মে ও জুন মাসের সি-সি মিটিংগুলির সময় বিভিন্ন প্রদেশের কোন রিপোর্টই কার্যত হাতে না থাকার জন্য, পুরাতন ও নতুন সি-সি বর্তমান সাংগঠনিক সংকটের গভীরতা সম্পর্কে এবং উপর্যুপরি ভুল রাজনৈতিক লাইন ও সাংগঠনিক পদ্ধতি গ্রহণের ফলে সংগঠনের ক্ষেত্রে যে বিপর্যয় হইয়াছে, তাহার ব্যাপকতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করিতে ব্যর্থকাম হইয়া ছিলেন। সেই সময়েই পার্টির মধ্যে যে রাজনৈতিক মত পার্থক্য রহিয়াছিল, মে ও জুন মাসের সি-সি মিটিংগুলিতে তাহাও প্রতিফলিত হয় নাই।

বর্তমানে পুরাতন ও নতুন সি-সি'র একেবারে মূল সিদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধে এই চ্যালেঞ্জ, পুনর্গঠিত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সম্পর্কেই এই চ্যালেঞ্জ পার্টির ভিতরকার সংকটকে চূড়ান্তভাবে বাড়াইয়া তুলিয়াছে—পার্টির ঐক্যকে পর্যন্ত বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে।

সি-সি মিটীংগুলির পরেই নতুন পি-বি যতই বিভিন্ন স্তরের ও অঞ্চলের বাস্তব অবস্থা ও অবস্থার গতির সঙ্গে পরিচিত হইতেছিলেন, এবং যতই বিভিন্ন পার্টি ইউনিট ও পার্টি সভ্য নতুন পার্টি, নীতি সম্পর্কে মতামত দিতে শুরু করিলেন—ততই পি-বি উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে, পার্টি কংগ্রেস ছাড়া অন্য কিছু দ্বারাই এবং পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তুতির মধ্য দিয়া সকল স্তরে নতুন লাইনের ভিত্তিতে ও সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার ভিত্তিতে আলোচনার মারফত গোটা পার্টিকে তলা হইতে উপর পর্যন্ত আগাগোড়া গণতান্ত্রিক উপায়ে পুনর্গঠিত না করিলে—পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করা যাইবে না এবং এই বদ্ধ জলা হইতে পার্টিকে উদ্ধার করা যাইবে না।

পার্টির বে-আইনি অবস্থা ও শ্বেতসন্ত্রাস শুধু যে চলিতেছে তাহাই নয় মে মাসের গত সি-সি মিটিংয়ের সময়ের তুলনায় তাহা আরও তীব্র হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও পি-বি তৃতীয় পার্টি কংগ্রেস ডাকার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন—কারণ, রাজনৈতিক মতপার্থক্য ও বিভ্রান্তি এবং তার ফলে সাংগঠনিক বিশৃঙ্খলা ও অচল অবস্থার জন্য যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী দল হিসাবে পার্টির অস্তিত্বকেই বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে।

তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের সপক্ষে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি পি-বি পার্টি ইউনিট ও সমস্ত পার্টি সভ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন ঃ

(১) সি-সি প্লেনামের অধিবেশন ডাকার সিদ্ধান্ত সি-সি মিটিংয়ে নেওয়া হইয়াছিল। পি-বি সি-সি'র সেই সিদ্ধান্ত বদল করিতে পারেন না। সুতরাং তৃতীয় পার্টি কংগ্রেস ডাকার পরামর্শ পি-বি সি-সি'র নিকট উপস্থিত করিবেন। পি-বি আশা করেন, সি-সি এই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন।

(২) বে-আইনি ও শ্বেত সন্ত্রাসের অবস্থার মধ্যে—পার্টি কংগ্রেস করার যথেষ্ট বিপদ রহিয়াছে বলিয়া পার্টি কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সংখ্যা খুবই সীমাবদ্ধ করিতে হইবে। প্রতিনিধিদের মোট সংখ্যাও প্রত্যেক প্রদেশের প্রতিনিধি সংখ্যা কত হইবে, সি-সি তাহা ঠিক করিবেন।

(৩) প্রাদেশিক সম্মেলন ডাকিয়া উপযুক্ত প্রাদেশিক নেতৃত্ব নির্বাচিত করার জন্য পি-বি ইতিমধ্যেই অধিকাংশ পি-সি ও পি-ও-সি'কে নির্দেশ দিয়াছেন। পার্টির মধ্যে যথাসম্ভব ব্যাপকতম আলোচনার ভিত্তিতে সকল জিলা ও প্রাদেশিক সম্মেলন সমূহ করার জন্য এবং বিভিন্ন স্তরের পার্টি কমিটিগুলিকে নির্বাচিত করার জন্য পি-বি এখন সমস্ত পি-সি ও পি-ও-সি'কে আহ্বান জানাইতেছেন। সি-সি কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে পার্টি কংগ্রেস ডাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যন্ত প্রাদেশিক ইউনিটগুলির অপেক্ষা করার দরকার নাই; তাহারা পার্টি লাইনের ভিত্তি আলোচনা ও পার্টি কমিটিগুলির পুনর্গঠনের কাজে অগ্রসর হোন। পার্টি কংগ্রেসের জন্য কোন্ প্রদেশ কতজন প্রতিনিধিকে নিজ নিজ প্রাদেশিক সম্মেলনে নির্বাচিত করিবেন, প্রাদেশিক সম্মেলনগুলি ডাকার আগেই পি-বি, তাহা বিভিন্ন প্রাদেশিক ইউনিটকে জানাইয়া দিতে সক্ষম হইবেন।

যেসব প্রদেশে পার্টি শত্রুর সঙ্গে জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত রহিযাছে এবং সম্মেলন ডাকা যেখানে অত্যন্ত বিপজ্জনক হইবে বা যেখানে সম্মেলন করিলে জনগণের সংগ্রাম হইতে পার্টি ইউনিটগুলির দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইতে পারে, সেইসব প্রদেশকে সম্মেলন ডাকার দায়িত্ব হইতে সি-সি বাদ দিতে পারেন এবং সেইসব প্রদেশ যাহাতে পার্টি কংগ্রেসে তাহাদের কোটা অনুযায়ী প্রতিনিধি পাঠাইতে পারেন, সেজন্য সি-সি অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বলিতে পারেন।

(৪) ঠিকভাবে পার্টির ভিতরে আলোচনা চালাইবার জন্য এবং পার্টি কংগ্রেস ডাকিবার জন্য যেসব প্রাক্তন সি-সি সভ্য বিভিন্ন কারণে পুরাতন সি-সি, মিটিংয়ে যোগ দিতে পারেন নাই, তাহাদের "সক্রিয় অংশ গ্রহণের" জন্য পি-বি, সি-সি'র নিকট সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন।

পুনর্গঠিত পি-সি'তে যে দুইটি আসন খালি রহিয়াছে তাহা পূরণ করার জন্য পুরাতন সি-সি'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পি-বি, মৌখিক সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন।

(৫) সাধারণভাবে সি-সি সভ্যদের, বিশেষ করিয়া পুরাতন পি-বি সভ্যদের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে পুরাতন সি-সি সে সময়ে এ সম্পর্কে যতটা সম্ভব অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। পি-বি'র সাংগঠনিক কার্যকলাপে বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদ সম্পর্কিত রিপোর্টে এই অনুসন্ধানের ফলাফল জানানো হইয়াছে। গত মে মাসের সি-সি মিটিংয়ের যে বিবরণী (minutes) র‍্যাঙ্কের জন্য প্রচার করা হইয়াছে, তাহার মধ্যেও পুরাতন পি-বি সভ্য ও সি-সি

সভ্যদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তথ্য রহিয়াছে। পুরাতন সি-সি মিটিংয়ে উত্থাপিত কতকগুলি বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে নতুন সি-সি "পার্টির কেন্দ্রীয় যন্ত্রের (apparatus) তরফ হইতে টিটোর চরদের প্রতি সতর্কতার অভাব সম্পর্কে অনুসন্ধানের একটী কমিশন" নিয়োগ করেন। এই ধরনের চারটি ঘটনা সি-সি'র নজরে আসিয়াছে এবং তাহা কমিশনের নিকট পেশ করা হইয়াছে। পুরাতন অথবা নতুন যে কোন পি-বি সভ্য বা সি-সি সভ্যের বিরুদ্ধে, কেন্দ্রীয় পার্টি যন্ত্র বা নিম্নতর ইউনিটের (পি-সি, ডি-সি, পুরাতন বা নতুন) যেকোন সভ্যের বিরুদ্ধে যদি এমন কোন নির্দিষ্ট তথ্য বা অভিযোগ থাকে, যার সাহায্যে টিটোর এজেন্টদের সম্পর্কে সতর্কতার অভাবের আভাস পাওয়া যায় বা টিটোর এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেইসব অভিযোগ ও তথ্য পি-বি'র মারফৎ উক্ত কমিশনের নিকট পাঠাইবার জন্য পি-বি সমস্ত কমরেডদের আহ্বান করিতেছে। এইসব তথ্য ও অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য সি-সি যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। যদি কোন কমরেড তাহার অভিযোগ সমূহ প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলেও তাহার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না বলিয়া পি-বি, সি-সি'র পক্ষ হইতে স্পষ্ট ঘোষণা করিতেছেন। কমরেডদের শুধু এই কথা খেয়াল রাখা উচিত যে, কোন কমরেডের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ যদি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত উপযুক্তভাবে তদন্ত ও প্রমানিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সেইসব অভিযোগ তথ্য যেন প্রচারিত না হয়।

(৬) সি-সি'র পুনর্গঠনের অব্যবহিত পরেই যেসব অপরিহার্য টেকনিক্যাল ও সাংগঠনিক অসুবিধা দেখা দেয়, তাহার ফলে সি-সি ফোরাম বাহির করিতে দেরি হওয়ার জন্য পি-বি দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। আগামী ১০ দিনের মধ্যেই সি-সি ফোরামের প্রথম সংখ্যা বাহির হইবে।

সি-সি ফোরাম ছাড়াও, পার্টির ভিতরকার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পি-বি "ইনফরমেশন ডকুমেন্ট" প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। তেলেঙ্গানা, অন্ধ্র, ময়মনসিংহের পার্বত্য অঞ্চলের এবং ত্রিপুরার সংগ্রামের তথ্যমূলক রিপোর্ট সি-সি ইনফরমেশন ডকুমেন্ট হিসাবে সমস্ত পার্টি ইউনিটের নিকট প্রচার করা হইবে। উপরোক্ত দলিলগুলির ছাপাইবার জন্য তথ্যাদি প্রস্তুত করা হইয়াছে।

(৭) সি-সি তহবিলের সংকটজনক অবস্থা ও তাহার কারণ সম্পর্কে এই সার্কুলারে পূর্বেই বলা হইয়াছে। বর্তমান কঠিন অবস্থার মধ্যে পার্টি কংগ্রেস ডাকার জন্য বিরাট অর্থনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। মোটামুটি হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পার্টি কংগ্রেস নিরাপদে এবং সফলভাবে করার জন্য কমপক্ষে ৩০০০০ টাকা (ত্রিশ হাজার টাকা) দরকার। সমস্ত পার্টি ইউনিট ও পার্টি সভ্যের সমষ্টিগত চেষ্টার সাহায্যেই এই টাকা তুলিতে হইবে। পি-বি "তৃতীয় পার্টি, কংগ্রেসের জন্য ত্রিশ হাজার টাকার স্পেশাল ফান্ড" নামে একটী তহবিল খুলিতেছেন। আগামী তিন মাসের মধ্যে এই তহবিল পূর্ণ করার জন্য প্রত্যেক পার্টি ইউনিট ও পার্টি সভ্য কে কত টাকা তুলিবেন, নিজেরাই তাহার কোটা ঠিক করার জন্য পি-বি আহ্বান জানাইয়াছেন।

কমরেডগণ! জনতার অভিযান আগাইয়া চলিয়াছে, সঠিক লাইনের জন্য পার্টি এক কঠিন অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের মধ্যে রহিয়াছে, পার্টির রাজনৈতিক বিভ্রান্তি ও সাময়িক সাংগঠনিক শিথিলতার সুযোগ নিয়া শত্রু ও তাহার চরেরা পার্টিকে ধ্বংস করার জন্য বিশ্বাসঘাতকতা-মূলক এবং নির্মম আঘাত হানিতে উদ্যত হইয়াছে। শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতের

শ্রমজীবি জনগণের, বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের মধ্য দিয়া, ভারতের শ্রমিক শ্রেণি ও শ্রমজীবী জনগণের বীর পুত্রকন্যাদের হাজার হাজার পার্টি সভ্য ও সমর্থকদের শত শত শহীদের রক্ত ও দুঃখবরণের মধ্যে পুষ্ট হইয়া আমাদের এই পার্টি গড়িয়া উঠিয়াছে। শান্তি, স্বাধীনতা ও জনগণের গণতন্ত্রের জন্য ভারতীয় জনগণের মুক্তি সংগ্রামের পুরোভাগে আমাদের পার্টি তাহার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করিবেই। বাস্তব অবস্থা যথেষ্ট পরিপক্ক; আজ প্রয়োজন হইল, শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বের পরিচালনাধীন সঠিক রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে এক ঐক্যবদ্ধ পার্টি। তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের মধ্য দিয়া আসুন আমরা সঠিক পার্টি লাইন ও পার্টি ঐক্য গড়িয়া তুলি। সঠিক লাইন, ঐক্যবদ্ধ পার্টি ও শক্তিশালী নেতৃত্ব গড়িয়া তোলার কাজে লেনিনবাদী-ষ্ট্যালিনবাদী নীতির ভিত্তিতে নির্মম সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা এবং নতুন লাইনের উপর পার্টির মধ্যে গভীর আলোচনাই আমাদের হাতিয়ার। পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তুতি এবং নতুন লাইন সম্পর্কে আলোচনা চালাইবার সঙ্গে সঙ্গে আসুন গণ-সংগ্রামের আগুনে এই লাইনকে আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখি—সংগ্রামী ও উদ্বেলিত জনতার পুরোভাগে আমাদের স্থান করিয়া লই!

—মহান শিক্ষক মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন, ষ্ট্যালিনের শিক্ষার ভিত্তিতে;

—মহান ও গৌরবময় চীন বিপ্লবের শিক্ষাকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া এবং তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া;

- সঠিক পার্টি লাইনের জন্য!
- ঐক্যবদ্ধ পার্টির জন্য!!
- শক্তিশালী ও যোগ্য নেতৃত্বের জন্য!!!
- তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের জন্য প্রস্তুত হোন!

সর্বদা বিপ্লবী সতর্কতার সাহায্যে শত্রুর বিশ্বাসঘাতকতামূলক আক্রমণকে ব্যর্থ করুন!

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্য দীর্ঘজীবর হউক?

১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৫০

পি. বি. সার্কুলার
পলিটব্যুরো, কেন্দ্রীয় কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটির বিবৃতি
আশু কাজ এবং সাংগঠনিক নীতি অনুসরণ

প্রিয় কমরেডগণ—

পলিটব্যুরোর ১লা ও ১৪ই সেপ্টেম্বরের (১৯৫০) সার্কুলারের নির্দেশ অনুযায়ী পশ্চিমবাংলা প্রাদেশিক সংগঠন কমিটি তৈরি হয়েছে। যেভাবে এই পি-ও-সি সংগঠিত হল তা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক না হলেও, বর্তমান গুরুতর অবস্থায় একটি প্রাদেশিক পার্টি কেন্দ্রের জরুরি প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে পি-ও-সি-তে নির্বাচিত কমরেডরা দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজি হয়েছেন।

পুরাতন ট্রটস্কীবাদী পলিটব্যুরোর নিজেদের খেয়ালমত জোর করে এবং সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত প্রাদেশিক কমিটিকে বাতিল করে দিয়ে আর একটি প্রাদেশিক কমিটি মনোনীত করেছিলেন। ট্রটস্কীবাদী পলিটব্যুরোর সৃষ্ট ঐ প্রাদেশিক কমিটির কার্য পদ্ধতি পার্টির পক্ষে এবং পার্টির মহান আদর্শের পক্ষে প্রচুর ক্ষতির কারণ হয়েছে। এই প্রাদেশিক কমিটি পার্টির ভেতরকার সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা, অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র এবং রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা একেবারে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন এবং বাংলা দেশের পার্টিতে দস্তুরমত একটা ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিলেন। যাঁরা তাঁদের সাথে একমত হতে পারতেন না পাক্কা টিটোবাদী কায়দায় তাঁদের সবাইকে তাঁরা (পি-সি) চেপে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন।

১৯৫০ সালের ২৭শে জানুয়ারী 'লাস্টিং পীস'-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর প্রাদেশিক কমিটি পূর্বতন পার্টিনীতির মধ্যে যে মারাত্মক গলদ ছিল তার প্রকৃতি, গুরুত্ব ও গভীরতা খাটো করে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন, এবং যাঁরাই প্রাদেশিক কমিটির চেতনা ও ধারণার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের সবাইকে যোশীবাদী, বিভেদকারী বলে গালাগালি দিয়েছেন। কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির ইনফরমেশন ব্যুরোর মুখপত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধের উপর পুরাতন পলিটব্যুরোর প্রথম বিবৃতির সকল সমালোচনাকে প্রাদেশিক কমিটি তখনও কমিয়ে দেবারই চেষ্টা করেছেন।

প্রাদেশিক কমিটি পার্টির ভেতরকার আলোচনা চালাতে এবং পরিচালনা করতে অস্বীকার করেন। সমস্ত বাধা নিষেধ (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ) ভীতি প্রদর্শন, নিন্দা প্রচার, সত্ত্বেও পার্টির সাধারণ কমরেডরা তবু রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকলেন—একটি সঠিক পলিসি (নীতি) স্থির করার জন্য এবং তখনকার ট্রটস্কীবাদী টিটোপন্থী নেতৃত্বের বদলে একটি বোলশেভিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য। প্রাদেশিক কমিটি তাঁদের মধ্যে দৃঢ়মূল আমলাতান্ত্রিকতা,

অহমিকা এবং পার্টি র‍্যাংকের প্রতি তাচ্ছিল্যের সব লক্ষণগুলিই দেখিয়েছেন। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার প্রতি নামে মাত্র সমর্থন জনিয়ে, তাঁরা কার্যত তাকে পায়ে দলে চললেন, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অপব্যাখ্যা করে চললেন। এমনকি বিশেষ মুহূর্তেও তাঁরা তাঁদের অমার্জনীয় অপরাধগুলো দেখতে চাইলেন না, ফলে তাঁদের ওপর থেকে বেশির ভাগ পার্টি কর্মীদের বিশ্বাস একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। প্রদেশের পার্টি সংগঠনকে রাজনৈতিক ভাবে এবং ব্যবহারিকভাবে (দৈনন্দিন কাজে) পরিচালনা করার অযোগ্যতাই প্রাদেশিক কমিটি প্রমাণ করেছেন। পশ্চিমবাংলার পার্টিকে প্রাদেশিক কমিটি একেবারে পঙ্গু করে ফেলেছেন, তাকে নামিয়ে নিয়ে এসেছেন একেবারে অক্ষমতা ও অযোগ্যতার স্তরে, তথাপি তাঁদের একগুঁয়েমী শেষ হল না, কিছু তাঁরা শিখতে চাইলেন না, না পার্টি র‍্যাঙ্কের কাছ থেকে, না জনসাধারণের কাছ থেকে।

পি-ও-সি, প্রাদেশিক কমিটির কাছ থেকে পেয়েছেন একটি ভাঙ্গাচোরা পার্টি সংগঠন, জনসাধারণের নিকট হতে এ-সংগঠন বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, যার ওপর বর্তমানে শত্রু এর ওপর প্রচণ্ড শক্তিতে আক্রমণ চালাতে শুরু করেছে। একদা বাংলাদেশের পার্টি ছিল সমগ্র ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গৌরব, আজ সেই পার্টি দুর্বল, ভগ্নপ্রায় হয়ে পড়েছে, তার জন্য দায়ি হল ঐ প্রাদেশিক কমিটি এবং পুরাতন পলিটব্যুরো। নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোও বাংলাদেশে পার্টির এ দুরবস্থা বর্তমান থাকার জন্য তাঁরাও অংশতঃ দায়ি।

আজ আমাদের উল্লেখযোগ্য কোন ট্রেড ইউনিয়ন এবং ছাত্র সংগঠন নেই, এবং বস্তুত কোন কৃষক সভার অস্তিত্বই নেই। অধিকাংশ বয়স্ক ও অভিজ্ঞ কমরেড জেলে। কপর্দক শূন্য অবস্থায় পি-ও-সি'র কাজ শুরু করতে হচ্ছে একটা বিরাট দেনার বোঝা মাথায় করে। টেক্ যন্ত্র দুর্বল, আমাদের কোন নিরাপদ শেলটার, ডেন বা এমন কি মিটিংয়ের জায়গা নেই। এই প্রচণ্ড অসুবিধাজনক অবস্থায়, পি-ও-সি'র প্রধান আশু কাজ হল ঃ

(ক) সঠিক পার্টি লাইন স্থির করার জন্য অবাধ অভ্যন্তরীণ পার্টি আলোচনা, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা সংগঠন করা ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া; (খ) বর্তমানের জীবন্ত আশু সমস্যাগুলোর উপর গণ-আন্দোলন পরিচালনার দৈনন্দিন কাজকর্ম সংগঠিত করা, উন্নত করা ও বাড়িয়ে তোলা; (গ) শত্রুর শয়তানী পরাস্ত করার জন্য পার্টির গোপন ব্যবস্থা এবং টেক যন্ত্র সংগঠিত করা; এবং (ঘ) আগামী চারমাস বা কাছাকাছি সময়ের মধ্যে স্থানীয় জেলা এবং প্রাদেশিক পার্টি সম্মেলন সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও টেকনিক্যাল প্রস্তুতি সুনিশ্চিত করা।

পশ্চিমবাংলায় পার্টি সংগঠনকে নতুন করে গড়ে তুলবার জন্য উপরের ঐ সব জরুরি ও প্রধান কাজগুলো সফল করে তোলার উদ্দেশ্যে আমরা নিম্নলিখিত পার্টি-সাংগঠনিক নীতি অনুসরণ করব ঃ

১। আমরা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছি যে একমাত্র পার্টি কংগ্রেসই সঠিক রাজনৈতিক পলিসির নিরূপণ করতে পারে এবং উপযুক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। বর্তমানে পার্টি কংগ্রেস ছাড়া অন্য কিছুই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে না। পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তুতি হিসাবে, আমাদের সবিশেষ প্রচেষ্টা হবে পার্টির ভেতরকার আলাপ আলোচনা এমনভাবে সংগঠিত করা ও চালানো যাতে তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসে পার্টি নীতি রূপায়িত করার কাজে পশ্চিমবাংলার পার্টি ইউনিট যেন তার সর্বোৎকৃষ্ট রাজনৈতিক অবদান

নিয়ে উপস্থিত হতে পারে।

২। পার্টির মধ্যে সকল প্রকার রাজনৈতিক হুঁশিয়ারী ও সতর্ক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বাড়িয়ে তুলবার জন্য পি-ও-সি সংগ্রাম করবে এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ট্রটস্কী-টিটো পন্থার রাজনৈতিক শিকড় অনুসন্ধান ও তদন্ত দাবি করবে। পি-ও-সি মনে করে যে, যেসব নেতার ও উচ্চতর কমিটির সক্রিয়ভাবে ট্রটস্কী-টিটো পন্থা চালানর দায়িত্ব রয়েছে তাদের আড়াল করা চলবে না, তাদের আসল রূপ প্রকাশ করে দিতে হবে, এবং প্রয়োজন হলে এইসব নেতা ও কমিটির বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পি-ও-সি তাই তাদের সমস্ত কার্যকলাপের উপযুক্ত অনুসন্ধান ও তদন্ত দাবি করবে। এর সাথে সাথে যে সমস্ত কমরেড ট্রটস্কী-টিটোর বিষাক্ত মতবাদের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন, অথবা তার নিষ্ক্রিয় সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন, তাঁদের শোধরানোর জন্য পি-ও-সি কোন চেষ্টারই ক্রটি করবেন না।

৩। পুরাতন পি-ও-সি তার নেতৃত্বাধীন বিভিন্ন জেলা কমিটিগুলি যেসব শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করেছিলেন—পি-ও-সি ও ডি-সি কমিশন সেই সমস্ত যথাসম্ভব দ্রুত পুনর্বিচার (রিভিউ) করবে। এ সম্পর্কে দ্রুত ব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন (শাস্তিপ্রাপ্ত) কমরেডদের অনুরোধ করা হচ্ছে, তাঁরা যেন অবিলম্বে উপযুক্ত কমিটির নিকট তাঁদের আবেদন পাঠিয়ে দেন।

৪। পি-ও-সি পার্টি সভ্যদের এই নিশ্চিত আশ্বাস দিচ্ছে যে, পার্টির মধ্যে রাজনৈতিক আলাপ আলোচনার সমস্ত সুযোগ দেওয়া হবে। বাংলা, হিন্দী, উর্দুতে পার্টি ফোরাম প্রকাশ করা হবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতের সমর্থকদের নিয়ে মাঝে মাঝে বৈঠকও করবে, যে সমস্ত মতামত পার্টি সভ্যপদেব সাথে খাপ খায় না বলে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এমন সব মতামত ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক চিন্তা ও মতামতকে স্তব্ধ করে দেওয়া চলবে না। পার্টির মধ্যে আলাপ আলোচনাকে পি-ও-সি সব চাইতে প্রথমে স্থান দেয় এবং এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ বাড়িয়ে তুলবার জন্য পি-ও-সি বিশেষ প্রচেষ্টা চালাবে।

৫। পি-ও-সি মনে করে বর্তমান পরিস্থিতিতে যদি কোন নেতৃস্থানীয় কমিটি পার্টি লাইন সম্পর্কে তার নিজের মত নিম্নতর কমিটি বা কমরেডদের উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে চায় তাহলে তা পার্টির রাজনৈতিক ঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। অতএব কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পি-ও-সি তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত কোন কমিটি বা কমরেডের উপর চাপিয়ে দেবে না। বিভিন্ন ইউনিট বা কমরেডদের সাথে একমত হবার জন্য আলোচনা ও পরামর্শ করে নেবে। এই মুহুর্তেই পি-ও-সি সভ্যদের নিজেদের মধ্যেও পূর্ণ রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে স্বভাবতই এমন আশা করা যায় না। যথাসম্ভব মতৈক্যের ভিত্তিতে পি-ও-সি কাজ চালিয়ে যাবে, পি-ও-সি সভ্যরা অভ্যন্তরীণ আলোচনায় ব্যক্তিগতভাবেও অংশগ্রহণ করতে পারেন।

৬। পি-ও-সি মনে করে যে পার্টির মধ্যে শৃঙ্খলা হবে সচেতন এবং স্বেচ্ছামূলক; এবং এই প্রকৃত শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা হতে পারে কাজ ও চিন্তার ঐক্যের মধ্যে দিয়ে। পি-ও-সি বিশ্বাস করে যে কাজে ও চিন্তায় এই ঐক্য গড়ে তুলবার জন্য তাকে চলতে হবে পার্টি সভ্যদের সহযোগিতায়। পি-ও-সি বিশ্বাস করে পার্টি সভ্যরা পার্টি শৃঙ্খলা কায়েম করার জন্য পি-ও-সি বা অন্য যেকোন নেতৃস্থানীয় কমিটির মত সমানই আগ্রহশীল।

৭। পার্টির অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র রক্ষার জন্য পার্টির সকল সভ্যের আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহের ব্যর্থ মূল্যায়ন পি-ও-সি স্বীকার করে এবং পি-ও-সি এই আশ্বাস দিচ্ছে যে পশ্চিমবাংলার বে-

আইনি অবস্থায় গোপন কাজকর্ম প্রভৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পার্টির ভিতরকার এই গণতন্ত্র পুরোপুরি নিশ্চিত করা হবে।

৮। পি-ও-সি বিশ্বাস করে যে জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলন না চালালে পার্টি পুনর্জীবিত হতে পারে না, সঠিক লাইনও তা ছাড়া তৈরি হতে পারে না; অতএব পি-ও-সি যথাসম্ভব দ্রুত এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে সকল স্তরে বিভিন্ন সংগঠনের পার্টি ফ্র্যাকশনগুলি (যথা—টি-ইউ-সি, কিষান, ছাত্র, আশ্রয়প্রার্থী ইত্যাদি) সংগঠিত করবে। এর সাথে সাথে জরুরি প্রয়োজন হলে জেলা সম্মেলনের আগেই যথাসম্ভব গণতান্ত্রিক উপায়ে জেলা কমিটির যথাযোগ্য সাংগঠনিক পরিবর্তন সাধন করা হবে। দৈনন্দিন নানান রকম কাজকর্ম চালানোর জন্য পি-ও-সি বিভিন্ন ব্যুরো ও সাব কমিটিও—যেমন টি-ইউ ব্যুরো, এজিট-প্রপ সাব কমিটি ইত্যাদি—তৈরী করবে, পি-ও-সি'র সদস্য এবং পি-ও-সি'র বাইরে অন্যান্য কমরেডদের নিয়ে।

এইসব ব্যুরো ও সাব কমিটি তৈরি করার সময় পি-ও-সি লক্ষ্য রাখবে যাতে এই সবের মধ্যে বিভিন্ন প্রধান প্রধান রাজনৈতিক চিন্তা ও মতের প্রতিনিধি থাকে এবং তাঁরা সকলে মিলে সুষ্ঠুভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে এইসব ব্যুরো ও সাব কমিটিতে কাজ করতে পারেন। প্রদেশের পার্টি নেতৃত্বের কাজকর্মে পার্টি সভ্যরা যাতে সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ করতে পারেন তার জন্য পি-ও-সি সর্বদাই সচেষ্ট থাকবে।

৯। পি-ও-সি উপলব্ধি করে যে সমগ্র পার্টির রাজনৈতিক ও আদর্শগত চেতনার স্তর যদি উন্নত না করা হয় তবে পার্টির মধ্যে মার্ক্সবাদ বিরোধী চিন্তাধারা ঢুকে পড়ার বিপদ থেকেই যাবে। মার্ক্সবাদী-লেলিনবাদী শিক্ষার অভাব থাকলেই বিরুদ্ধ রাজনৈতিক চিন্তা বেড়ে উঠতে পারে। অতএব, পি-ও-সি সমস্ত পার্টি-সভ্য, বিশেষ করে শ্রমিক ও কৃষক কমরেডদের, মার্ক্স-লেনিনের মতবাদে শিক্ষিত করবার জন্য পার্টিস্কুল এবং পাঠচক্র শুরু করার প্রস্তাব করছে।

১০। আমলাতান্ত্রিকতা, অহমিকা, ঔদ্ধত্য ও গোঁড়ামী এবং তোষামোদ ও চাটুকারিতার সমস্ত ধরন ও প্রকাশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে পি-ও-সি দৃঢ় সংকল্প। পি-ও-সি চায়, এমনি করে পার্টি-চেতনা (পার্টি-স্পিরিট) গড়ে তুলতে এবং সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার ভিত্তিতে পার্টির মধ্যে উপযুক্ত কমরেড-সুলভ সম্পর্ক গড়ে তুলতে।

বহুদিনকার পার্টি-সংকট সত্ত্বেও আমাদের পার্টির অধিকাংশ সভ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন এবং ইতিমধ্যেই তাঁদের অনেকেই সংঘবদ্ধভাবে জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলন চালাতে শুরু করেছেন। ইহা বাস্তবিকই খুব উৎসাহজনক লক্ষণ এবং পার্টির ও বিপ্লবের একটি সম্পদ। এই সম্পদ পি-ও-সি'কে দায়িত্ব গ্রহণে সাহস ও প্রেরণা যোগাচ্ছে।

আমরা খুবই সচেতন যে, উপরের এইসব দায়িত্ব পালনে পি-ও-সি একা মোটেই সক্ষম নয়। সমস্ত পার্টি ইউনিট ও ব্যক্তিগত কমরেডদের সমালোচনা, মতামত ও পরামর্শ-ই হবে আমাদের শক্তি ও প্রেরণার উৎস। সমস্ত পার্টি সভ্য ও দরদীদের নিকট পি-ও-সি সহযোগিতার আবেদন জানাচ্ছে। আমরা জানি ও বিশ্বাস করি, আমাদের সম্মুখে করণীয় সমস্ত কাজগুলো সফল করার জন্য সকল পার্টি সভ্য ও দরদীদের কাছ থেকে পর্যাপ্ত সহযোগিতা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৫০

বিপ্লবী অভিনন্দনসহ
পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

কলিকাতা জেলা কমিটির পূর্নগঠন সম্পর্কে পি.ও.সি.-র প্রস্তাব

পি-ও-সি সিদ্ধান্ত করিতেছে যে অবিলম্বে কলিকাতা জেলা কমিটিকে বাতিল করিয়া তাহার স্থানে একটি জেলা সংগঠনী কমিটি গঠন করিতে হইবে। বর্তমানে জেলা কমিটি নিজেই সর্বসম্মতিক্রমে পি-ও-সি কে ইহা অনুরোধ করিয়াছে। কলিকাতার পার্টি সভ্যদের প্রায় সকলেই ইহাই চায়।

এই উদ্দেশ্যে পি-ও-সি নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করিবে স্থির করিয়াছে।

(ক) পি-ও-সি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কলিকাতার কমরেডদের মতামতের ভিত্তিতে জেলা সংগঠন কমিটি গঠন করিবে।

(খ) তাহার পূর্বে কয়েকজন কমরেডদের একটি তালিকা বা প্যানেল কলিকাতার সমস্ত সেল, লোক্যাল ও ফ্রাকশনের নিকট প্রচার করা হইবে এবং এই প্যানেলের ভিতর হইতে ৭ জন পর্যন্ত কমরেডদের নাম বাছিয়া তাহারা পি-ও-সি কে জানাইবেন। প্যানেলের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক কমরেড সম্পর্কে খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে মোটামুটি পরিচয় দেওয়া হইবে।

(গ) তাহারও পূর্বে প্যানেলের জন্য নাম স্থির করার উদ্দেশ্যে সমস্ত সেল প্রভৃতির নিকট হইতে প্রস্তাব চাওয়া হইবে। পি-ও-সি এই পদ্ধতি অবলম্বন করিতেছে কারণ পার্টির বর্তমান সংকটে যখন পুরাতন পার্টি লাইন সাংঘাতিকভাবে ভুল প্রমাণিত হইয়াছে এবং নতুন পার্টি লাইন নির্ধারিত করার সংগ্রাম চলিতেছে, যখন বেশিরভাগ পার্টি সভ্যের আস্থাভাজন নেতৃত্ব নাই—এবং সম্মেলন ও কংগ্রেসের প্রস্তুতির ভিতর দিয়া নতুন লাইন ও নেতৃত্ব গঠন করার প্রস্তুতি চলিতেছে তখন শুধু মাত্র নিজের বিবেচনা অনুসারে DOC মনোনয়ন করিয়া দেওয়া পি-ও-সির পক্ষে সম্ভব নয়, উচিতও নয়। যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি DOC গঠন করা দরকার ঠিকই কিন্তু এই অল্পসময়ের মধ্যেই যতদূর সম্ভব ব্যাপকভাবে পার্টি সভ্যদের মতামত সংগ্রহ করিয়া তাহারই ভিত্তিতে DOC গঠন করিলে সেই কমিটির উপর পার্টি সভ্যদের অনাস্থা থাকিবে না এবং যোগ্যতা সম্পন্ন নতুন কমরেডদের সন্ধান পাওয়া এবং কমিটিতে লওয়াও সম্ভব হইবে। নেতৃস্থানীয় কমিটি গঠন করার এই পদ্ধতি নর্মাল বা স্বাভাবিক না হইলেও পার্টি নীতির বিরোধী নহে বরং বর্তমান অবস্থায় প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত করার পূর্বে যথাসম্ভব ব্যাপকভাবে পার্টি সভ্যদের পরামর্শ নেওয়াই পার্টি নেতৃত্বের অবশ্য কর্তব্য। ইহা পার্টির বাহ্যিক (ফর্ম্যাল) ঐক্য রক্ষা করিয়া পার্টির ভিতর সঠিক নীতি নির্ণয় ও উপযুক্ত নেতৃত্ব গঠন করার সংগ্রামে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিবে। অপরদিকে পার্টি বর্তমান অবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পার্টির সভ্যদের পরামর্শ না নিয়েই নিজেদের খুশিমত সিদ্ধান্ত করিলে তাহা

পার্টির বাহ্যিক ঐক্যকেও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে। সুতরাং কলিকাতার জেলা সংগঠনী কমিটি গঠনের জন্য প্রস্তাবিত পদ্ধতি স্বাভাবিক না হইলেও পার্টি রীতি সম্মত এবং বর্তমান অস্বাভাবিক অবস্থার পক্ষে উপযোগী এই পদ্ধতির অনেক গলদ আছে। প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত কমরেডদের সকলেরই পার্টির লাইন সম্বন্ধে মতামত এবং অতীতের কার্যকলাপ সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য রিপোর্ট অথবা আত্মসমালোচনা ইত্যাদি প্রচার করা সম্ভব হইবে না। পার্টি লাইন সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক প্রস্তাব এখনো পাওয়া যায় নাই। এই অবস্থায় লাইন সম্বন্ধে নিজেদের বিস্তৃত মতামত গঠন করিতে পারা এবং পারিলেও তাহা তাড়াতাড়ি লিখিয়া ফেলিতে পারা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, তারজন্য জিদ করাও চলে না, করিলেও তাহা পাইতে ও ছাপাইয়া প্রচার করিতে অনেক সময় লাগিবে। আত্মসমালোচনা সম্বন্ধে ইহা আরও বেশি প্রযোজ্য কারণ প্রকৃত আত্মসমালোচনা করিতে পারা আদৌ সহজ নয় এবং আত্মসমালোচনাকে সমবেতভাবে চেক আপ না করিয়া প্রচার করিলে তাহা বিভ্রান্ত করিতে পারে। জেলা সম্মেলন হইতে ... নিয়মিত জেলা কমিটি নির্বাচিত করার সময় এইগুলি অবশ্য প্রয়োজন হইবে। কিন্তু তাড়াতাড়ি একটি অস্থায়ী কমিটি গঠন করার পূর্বে ইহা সম্ভব নয়।

এই অসুবিধা সত্ত্বেও প্যানেলের অন্তর্ভুক্ত কমরেডদের সম্বন্ধে যতটুকু জানাশুনা আছে এবং যতটুকু পরিচয় পাওয়া যাইবে তাহারই ভিত্তিতে বিভিন্ন নেতাকে নিজেদের মতামত দিতে হইবে। হয়ত কোনও সেল মতামত দিতে পারিবেন না। কিন্তু যে সমস্ত সেল মতামত দিতে পারিবেন তাহাদের সে সুযোগ দেওয়া অবশ্য প্রয়োজন। তাহার ভিত্তিতেই পি—ও-সি অস্থায়ী জেলা সংগঠনী কমিটি গঠন করিবে। এই নীতি অনুযায়ী পি-ও-সি সিদ্ধান্ত করিতেছে ঃ

(ক) আগামী ৯ই অক্টোবরের মধ্যেই কলিকাতা জেলায় বিভিন্ন সেল, লোক্যাল ও ফ্রাকশন ২০ জন পর্যন্ত কমরেডদের নামের প্যানেল প্রস্তাব করিয়া এবং কেন তাহাদের নাম প্রস্তাব করা হইতেছে সংক্ষেপে তাহার কারণ দর্শাইয়া পি-ও-সিকে পাঠাইবেন।

(খ) ইহার উপর ভিত্তি করিয়া পি-ও-সি সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ ২০ জন কমরেডের নামের তালিকা আগামী ১৪ অক্টোবর প্রচার করিবেন। বিভিন্ন সেল প্রভৃতি এই প্যানেলের মধ্য হইতে ৭ জন পর্যন্ত কমরেডের নাম বাছিয়া ২১ অক্টোবরের মধ্যেই পি-ও-সিকে পাঠাইবেন।

(গ) ইহার ভিত্তিতে পি-ও-সি কলিকাতা জেলা সংগঠনী কমিটি গঠন করিয়া তাহার সভ্যদের নাম ২৫ অক্টোবর ঘোষণা করিবেন।

এইভাবে নাম নির্বাচন করিতে কমরেডরা খুবই কম সময় পাইবেন। বিশেষত কলিকাতা জেলার ডাকব্যবস্থা তৎপর না বলিয়া কমরেডরা হয়ত আরও কম সময় পাইবেন, কিন্তু বেশি দেরি করিলে কলিকাতার পার্টি সংগঠনের সাংঘাতিক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে বলিয়া এই সিদ্ধান্ত নিতে পি-ও-সি বাধ্য হইতেছে। পি-ও-সি আশা করে সার্কুলার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন লোক্যাল (বা ফ্রাকশন) কমিটির এবং ফ্রাকশনের সম্পাদকরা বিভিন্ন কমিটির ও সেলের মিটিং ডাকিবার ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে সময় কম পাওয়া সত্ত্বেও বেশির ভাগ সেল তাহাদের মতামত পাঠাইতে পারেন। কমরেডরা নিজেদের বিবেচনা অনুযায়ী DOC-এর জন্য নাম প্রস্তাব করিবেন। কিন্তু পি-ও-সি-র কর্তব্য এ বিষয়ে তাহাদের যথাসম্ভব সাহায্য করা, পি-ও-সি মনে করে নাম প্রস্তাব করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বিবেচনা করা উচিত।

গণ আন্দোলন অথবা পার্টি সংগঠন গড়িবার ও পরিচালনা করিবার কিছুটা অভিজ্ঞতা

যাহাদের আছে, বর্তমান বে-আইনি অবস্থায় গোপন থাকা ও কাজ করার পক্ষে যাহারা উপযোগী, পার্টি সভ্যপদের সঙ্গে অসঙ্গত মতামত ছাড়া পার্টি লাইনের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন ঝোঁক DOC-এর মধ্যে প্রতিফলিত হইলে ক্ষতি নাই, বরং তাহাতে মতামতের সংঘর্ষ ও পরীক্ষা চলিতে পারে, অথচ যতটুকু একমত হওয়া সম্ভব তাহার ভিত্তিতে কাজ হইতে পারে।

উৎসাহী ও অভিজ্ঞ পুরাতন কমরেডদের মিলাইয়া DOC গঠন করা উচিত। DOC এমন হওয়া উচিত যাহাতে সমবেতভাবে বিভিন্ন ফ্রন্টকে তাহা নেতৃত্ব দিতে পারে। কমপক্ষে তিনজন উপযুক্ত শ্রমিক কমরেড এবং একজন উপযুক্ত ছাত্র কমরেডকে DOC-তে লওয়া সম্ভব এবং উচিত বলিয়া DOC মনে করে।

১ অক্টোবর ১৯৫০

বিপ্লবী অভিনন্দনসহ
পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠন কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

সওয়াল-জবাব,
পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি
P.O.C.-র প্রথম বিবৃতি সম্পর্কে বহু কমরেডের বক্তব্যের জবাবে

POCর প্রথম বিবৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন কমরেড ও ইউনিট তাদের কথা বলেছেন। বহু কমরেড ও ইউনিট এই বিবৃতিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাদের মতে বিবৃতিটি মোটামুটিভাবে ভালই হয়েছে। আবার কেহ কেহ এই বিবৃতির কমবেশি সমালোচনাও করেছেন। আমরা সকলকেই এজন্য ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাদের মতামত আমাদের চিন্তাধারা ও কাজকে সাহায্য করবে।

POCর বিবৃতি সম্পর্কে আলোচনা-সমালোচনা এবং একে ভিত্তি করে যে সব প্রশ্ন উঠেছে তা সব প্রকাশ করতে গেলে দস্তুর মত একটি পুস্তক বের করতে হয়। ... তাই আমরা অধিকাংশ কমরেড ও ইউনিট যেসব প্রশ্ন তুলেছেন তার কয়েকটি এখানে আলোচনা করছি। চিন্তাধারা ও ভাবের আদান-প্রদানের দিক থেকে আমাদের কথাটাও বলা বোধ হয় দরকার। এইভাবে হয়ত পার্টি সভ্য সাধারণের বৃহত্তর অংশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে অনেকখানি সক্ষম হবে। বহু সময় অনেকেই তাদের বক্তব্য লিখে পাঠান না এবং আমাদের পক্ষেও সকলের সঙ্গে দেখা করে তাদের কথা শুনে নেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই সওয়াল-জবাব এর মারফৎ আমরা সকল কমরেডদের সঙ্গে পার্টি জীবনের খুঁটিনাটি নানা সমস্যা নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে চেষ্টা করব। আশাকরি এতে POCর সঙ্গে সকল পার্টি কমরেডদের পার্টি সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হবে। তাদের সমালোচনা আমাদের কাজে সাহায্য করবে। আমাদের কথাও তারা বিচার করে দেখতে পারতেন।

বহু কমরেড দাবি করেছেন আমাদের 'পলিসি' কি তা ঘোষণা করতে, অন্তত পক্ষে CC চিঠির উপর POCর মতামত জানাবে। POCর প্রথম বিবৃতিতে রাজনৈতিক 'পলিসি'র কোন্ উল্লেখ না থাকাতে কেহ কেহ আপত্তি করেছেন।

গোড়াতেই বলা দরকার যে POCর গঠন হবার পর প্রথম মিটিং-এ এই বিবৃতি তৈরি করা হয়। এটাকে পলিসি বিবৃতি বলে POC কখনও পাশ করেনি। ধরে নেবারও কারণ নেই। এই বিবৃতির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সাংগঠনিক বর্তমান অভ্যন্তরীণ মতবাদগত সংগ্রাম ও সংঘর্ষের মধ্যে পার্টি সংগঠন কি সাংগঠনিক নীতির ভিত্তিতে চলবে শুধুমাত্র তা বলে দেওয়া। এর প্রয়োজন ছিল বলেই POCর তখন ধারণা ছিল, আজও আছে। কারণ গত ক'মাস পার্টির

অচল অবস্থা নানারকম সংশয় ও হতাশার সৃষ্টি করে। কমরেডরা নিজেদের উদ্যোগে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র কতকটা কায়েম করলেও পুরোনো PC তা স্বীকার করে নেয় নি। আমরা মনে করি অভ্যন্তরীণ মতবাদগত সংগ্রাম ও তজ্জনিত মতানৈক্য এবং পার্টির সাংগঠনিক অচল অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে কতগুলি নীতির উপর জোর দেওয়া উচিত যে নীতি গুলি কমরেডদের উদ্যোগ ও উৎসাহ স্তিমিত না করে বরং বাড়াবে এবং পার্টি পুনর্গঠনের কাজে সাহায্য করবে। মতবাদগত মীমাংসা না হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে পার্টির গণ-আন্দোলনের কাজ এখনি আরম্ভ করা যায় তার জন্যেও কতগুলি অবস্থাপোযোগী সাংগঠনিক ব্যবস্থা বা পদ্ধতির প্রয়োজন আছে। POC তার প্রথম বিবৃতিতে শুধু তাই বলতে চেষ্টা করেছে। পুরোনো ট্রটস্কীবাদী-টিটোবাদী কায়দায় যে সংগঠন চলবে না সেজন্যে অতি মৌলিক ব্যবস্থা না করে কোন নেতৃত্বের পক্ষেই কিছু করা সম্ভব নয়। পুরোনো নেতৃত্ব সে সম্পর্কে গত ক' মাসে কিছু করেছিলেন বলে আমরা জানি না। বরং প্রথমে তাঁরা পার্টির ভিতরকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে বাধা সৃষ্টি করেন, পরে যখন পার্টির সভ্য সাধারণ আরো এগিয়ে যান, তখন তাঁরা অনেকটা হাল ছেড়ে দিয়ে বসে পড়েন। প্রাদেশিক কমিটি নামে মাত্র থেকে যায় এবং তার কোন নেতৃত্বের লেশমাত্র থাকে না। ফলে পার্টির যে কতদূর ক্ষতি হয় তা আমরা এখন আরো বেশি বুঝতে পারছি। কমিনফর্ম সম্পাদকীয় বের হবার পর সাতটি মূল্যবান মাস নষ্ট করে পার্টির অভ্যন্তরীণ সংকটকে অভাবনীয়ভাবে জটিল করে তোলা হয়। সুতরাং টিটোবাদী কায়দায় আর পার্টি চলবে না এবং পার্টিতে সর্ব স্তরে অভ্যন্তরীন গণতন্ত্র স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত হবে একথাটা জোর গলায় বলা দরকার। এখন আমাদের তা কাজে পরিণত করতে হবে। তারই প্রাথমিক ধাপ হিসাবে বিবৃতিতে কতকগুলি সাংগঠনিক গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে।

এখন পলিসির কথা। একটা সম্যক রাজনৈতিক লাইন দেওয়া তখন কেন আজও পি-ও-সি'র পক্ষে সম্ভব নয়। সারা ভারতের জন্য লাইন সম্পর্কে কোন কিছু করতে গেলে প্রথমেই দরকার ভারতের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে আবশ্যকীয় সকল প্রকার তথ্যের বিচার বিশ্লেষণ।

লাইন বলতে এখানে আমরা অবশ্য রণকৌশল বা ট্যাকটিক্যাল লাইনের কথাই বুঝছি। কারণ বাস্তব অবস্থার বিভিন্ন দিক বিচার না করে কখনও কোন রণকৌশল ঠিক করা যায় না। স্বভাবতই পি-ও-সির পক্ষে সে কাজে হাত দিতেও অনেক বাধা রয়েছে। অনেকে হয়ত বলবেন পশ্চিমবাংলার জন্য একটা পলিসি তো ঠিক করা যেত। বাধা কম হলেও এখানেও একই প্রশ্ন। বাংলাদেশের আন্দোলনের জন্য একটা সমগ্র পলিসি ঠিক করতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন অতীতের রিভিউ এবং বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ। বর্তমান পার্টির সংকটাকীর্ণ অবস্থায় যোগাযোগ রাখা কঠিন। রিপোর্ট ইত্যাদি সংগ্রহ করা তো দূরের কথা। তবুও যে সমস্ত রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে তার ভিত্তিতে বিভিন্ন আন্দোলনের জন্য কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পি-ও-সি যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। যেমন তেভাগা সংক্রান্ত সার্কুলার।

কেহ কেহ মনে করেন যে 'পলিসি' ঠিক না করে আন্দোলনে কি করে নেতৃত্ব দেওয়া যায়। প্রথমেই বলা দরকার যে, পলিসি আমাদের একেবারেই নেই একথাটা ঠিক নয়। কারণ কমিনফর্ম সম্পাদকীয় এবং পিকিং ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলে মূলনীতি কি হওয়া উচিত তার নির্দেশ আছে। অর্থাৎ আমাদের সামনে রণনীতি (স্ট্রাটেজি) রয়েছে। এখন কথা হল কি করে এই রণনীতিকে আমাদের দেশের বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী সঠিক বিচ্যুতিহীন রণকৌশল

(ট্যাকটিকস) অবলম্বন করে কার্যকরী এবং সফল করা যায়। এ নিয়েই চলছে বর্তমান মতবাদগত সংগ্রাম। এখানেই মতের তীব্র সংঘর্ষ এবং অনৈক্য দেখা দিয়েছে।

পার্টি জীবনের এই রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক বাস্তব অবস্থার প্রতি নজর রেখে আমরা যতদূর সম্ভব ঐক্যের ভিত্তিতেই পশ্চিম বাংলায় আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব নির্দেশিত রণনীতি সফল করে তুলতে চেষ্টা করব। আমাদের লক্ষ্য হবে এদিকে যথাসম্ভব সমষ্টিগত রাজনৈতিক বিচার বিশ্লেষণ এবং ঐক্যের ভিত্তিতে বর্তমান মুহূর্তের জন্য রণকৌশল নির্ধারণ করা এবং অপরদিকে মতবাদগত আলোচনা ও জীবন্ত আন্দোলনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক ঐক্যসাধনের দিকে অগ্রসর হওয়া। কেহ কেহ শুধুমাত্র 'মেজরিটি-মাইনরিটি'র ভিত্তিতে কাজ চালাবার পরামর্শ দিয়েছেন। আন্দোলনের আশু সমস্যার উপর যেখানে এমনি ঐক্য সম্ভব নয় সেখানে 'মেজরিটি-মাইনরিটি'র ভিত্তিতেই কাজ চলবে সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে বর্তমানে সারা পার্টিতে চলছে প্রচণ্ড মতবাদগত সংগ্রাম। কোন একটি বিশেষ ইউনিটের ভোটাভুটির মধ্যে পার্টির সমষ্টিগত চিন্তাধারা হয়ত ঠিক প্রতিফলিত নাও হতে পারে। হয়ত দেখা গেল পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ ইউনিট বা পার্টি সভ্য একভাবে ভাবছেন আর পি-ও-সি সাত জনের চারজন ভাবছেন ভিন্নভাবে। এখানে শুধু মেজরিটি দিয়ে DOC প্রথমে প্রস্তাব পাস করে তারপর সারা পার্টিতে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নাম করে তা চাপিয়ে দেওয়া পার্টি ও আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতির কারণ হতে পারে। সাধারণ অবস্থায় পার্টির একটা রণকৌশল থাকে এবং তার উপরেই পার্টি নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন এধরনের অসঙ্গতির সম্ভাবনা তেমন থাকে না। বর্তমানে আমাদের পার্টির সে অবস্থা নেই। এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করা মানে আসলে রাজনৈতিক ঐক্যসাধনের পথে বাধা সৃষ্টি করা। বর্তমানের ন্যায় অভ্যন্তরীণ সংকটের সময় শুধু একটা কমিটির 'মেজরিটি মাইনরিটি'র চেয়ে সমষ্টিগত আলোচনা ও মতামতের উপরই বেশি জোর দেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার, গণতন্ত্রের উপরই নির্ভর করা বেশি আবশ্যক। তাহলে ভুল হবার সম্ভাবনা কম। আমাদের আসল কথাটা হল এই। সাধারণত মেজরিটি-মাইনরিটি'র ভিত্তিতেই আজও কাজ চলবে। কিন্তু যেখানে নীতির মূল ব্যাখ্যা বা কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় মতবিরোধ দেখা দেবে তখন আমরা পি-ও-সি'র পরিসীমা ছাড়িয়ে সাধারণ পার্টি সভ্যদের নিকটই উপস্থিত হবে। নীচের কমিটি গুলির যথাসম্ভব এই নীতিতে চলা উচিত। পার্টি জীবনের সংকট মুহূর্তে সাধারণ পার্টি সভ্য ও জনতার নিকটই পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হতে হয়। এটা হলো আন্তর্জাতিক আন্দোলনেরই শিক্ষা। যেসব কমরেডরা মনে করেন যে আমরা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতাকে অস্বীকার করছি তারা বর্তমান পার্টির ভিতরকার নিদারুণ অভ্যন্তরীন রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সংকটকে হিসাবের মধ্যে রাখছেন বলে মনে হয় না।

কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠির উপর POC'র মতামত দাবি করাটা অতি ন্যায়সঙ্গত বলেই আমরা মনে করি। এ সম্পর্কে POC নোটে ইতিপূর্বেই আমাদের কথা জানানো হয়েছে। শীঘ্রই POC'র বক্তব্য পেশ করা হবে।

POC'র প্রথম বিবৃতি পড়ে কোন কোন কমরেড জানিয়েছেন যে, POC, CC-র চিঠি গ্রহণ করল না বর্জন করল সে কথাটা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। CC-র চিঠি কোন রাজনৈতিক প্রস্তাব বা থিসিস নয় যদিও এতে রাজনৈতিক লাইন সম্পর্কে নির্দেশ এবং সাংগঠনিক প্রশ্ন সব

কিছুই রয়েছে। আসলে কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠিকে POC কমিউনিস্ট পার্টি লাইনের একটি আলোচনা সাপেক্ষ ব্যাখ্যা হিসাবেই গ্রহণ করেছে এবং তার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে। POC এই ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাদের মতামত এখন পর্যন্ত উপস্থিত করতে পারেনি। অবশ্য কমরেড বলাই ও উপেন POC গঠন হবার বহু পূর্বেই তাদের মতামত লিখে CC-কে পাঠিয়েছেন। বিশদ রাজনৈতিক আলোচনা ছাড়া CC-র চিঠির উপর POC'র মতামত দেওয়া ঠিক হবে না বলেই তা আমরা এতদিন আলোচনা সাপেক্ষ স্থগিত রাখি। এখানে শুধু গ্রহণ বা বর্জনের কথাটা মোটেই বড় নয়। CC-র চিঠির উপর পি-ও-সি'র উপযুক্ত যুক্তিসহ POC'র মতামতটাই হল বড় কথা।

তাই যথাসম্ভব ভাল করে আলোচনার পর POC CC-র চিঠির উপর মতামত উপস্থিত করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এতে দেরি না হয়ে উপায় ছিল না। কারণ পার্টির কাঠামোকে রক্ষা করার কাজে POC-কে ভয়ানক ভাবে ব্যস্ত হতে হয়। এখনও তাই হতে হচ্ছে। আশাকরি এই বিলম্বের জন্য পার্টি কমরেড ও সমর্থকরা ভুল বুঝবেন না।

অভিনন্দনসহ—

উপেন (POC)

২২ অক্টোবর ১৯৫০

টিকা : 'উপেন' ভূপেশ গুপ্তর এবং 'বলাই' রণেন সেন-এর ছদ্মনাম। (—সম্পাদক)

১৯৫০ সালের পয়লা জুন তারিখে প্রদত্ত "সমস্ত পার্টিসভ্য ও সমর্থকদের নিকট নয়া কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠি" সম্পর্কে পশ্চিমবাংলা প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটির প্রস্তাব

দাম এক আনা

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

১৯৫০ সালের পয়লা জুন তারিখে প্রদত্ত "সমস্ত পার্টিসভ্য ও সমর্থকদের নিকট নয়া কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠি" সম্পর্কে পশ্চিমবাংলা প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটির প্রস্তাব

[কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠি সম্পর্কে পশ্চিম বাংলার প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটির সর্বসম্মত মহামত নিম্নলিখিত প্রস্তাবে সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে। এই সম্পর্কে পি-ও-সি সভ্যগণের ব্যক্তিগত মতামতও বিস্তারিতভাবে পার্টির সভ্যসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করা হইতেছে।

পি-ও-সি শীঘ্রই রাজনৈতিক লাইন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট (পসিটিভ বা ইতিবাচক) প্রকৃতির একখানা দলিলও পার্টির মধ্যে আলোচনার জন্য উপস্থিত করিবে। —২রা নভেম্বর, ১৯৫০]

পশ্চিমবাংলা প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি (পি-ও-সি) নয়া কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠি আলোচনা করিয়াছে। পি-ও-সি মনে করে যে কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠিতে যে লাইন ও সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা গ্রহণযোগ্য নহে। পি-ও-সি'র মতে এই সি-সি চিঠি একটি "বামপন্থী" সংকীর্ণতাবাদী ও হঠকারী প্রকৃতির দলিল যাহা পুরাতন পলিটব্যুরোর ট্রটস্কীবাদ-টিটোবাদের সহিত নয়া কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক-সাংগঠনিক আপসই নিঃসন্দেহে প্রতিফলিত করে। নিম্নলিখিত প্রধান বিষয়-সমূহ বিবেচনা করিলেই এই চিঠির রাজনৈতিক চরিত্র অনাবৃত হইবে।

ক) রাজনৈতিক

(১) রণকৌশলগত লাইন দেওয়ার চেষ্টা করিতে গিয়া, সি-সি চিঠি গোটা দেশের মধ্যে বিদ্যমান বাস্তব অবস্থার নির্ভুল লেনিনবাদী পরিমাপ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের আন্দোলনের প্রকৃত অবস্থার সম্মুখীন হইতে অস্বীকার করিয়া, পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ গোঁড়ামীপূর্ণ এবং মনগড়া ধারণার ভিত্তিতে এই চিঠি রাজনৈতিক লাইন স্থির করিতে গিয়াছে। এইভাবে সি-সি চিঠি রণকৌশল নিরুপণের লেনিনবাদী নীতির নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়াছে।

গণ-আন্দোলনের এবং জনতার চেতনা ও অভিজ্ঞতার যে অসম বিকাশের প্রতি বহুসংখ্যক প্রামাণ্য আন্তর্জাতিক দলিল মারফৎ আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠি এমনকি তাহাও লক্ষ্য করিতে অস্বীকার করিয়াছে। কমরেড বালাবুশেভিচ্ এবং ডিয়াকভ-এর মত মর্যাদাসম্পন্ন সোভিয়েত লেখকদের বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করিয়া সি-সি চিঠি লক্ষ্যই করিতে চাহে নাই যে, প্রকাশ্য গান্ধীবাদই হউক বা মধ্যবিত্ত নেতাদের "বামপন্থা"ই হউক, বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রভাব এখনও জনসাধারণের উপর যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। এই বাস্তব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে সি-সি চিঠির অনিচ্ছার অর্থ হইবে কার্যত সকল প্রকার বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রভাবের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মতাদর্শগত সংগ্রাম বর্জন করা। সি-সি চিঠি বিশেষ করিয়া গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামের গুরুত্ব ও অত্যাবশ্যকতা উপেক্ষা করিয়াছে—অথচ আমাদের সোভিয়েত কমরেডরা এই সংগ্রামের প্রতি আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

একথা সম্পূর্ণ সত্য যে ব্যাপক জনতা কংগ্রেস রাজ সম্পর্কে দ্রুত মোহমুক্ত হইতেছে।

তথাপি "কংগ্রেস তাহাদের অবস্থা উন্নততর করিবে, তাহাদের এরূপ সমস্ত পুরাতন মোহ সম্পূর্ণ ভাঙিয়া গিয়াছে" এই কথা বলা অতিশয়োক্তি মাত্র। সি-সি চিঠির মতে, জনতা কেবলমাত্র মোহমুক্তির ফলেই বিপ্লবের দিকে চলিয়া আসিবে; এই ধারণা ভুল। সি-সি চিঠি বুঝিতে পারে নাই যে কোন একটি বিশেষ গভর্নমেন্ট সম্পর্কে জনতার মোহভঙ্গ হইয়াছে মাত্র এই কারণেই জনসাধারণ বিপ্লবের দিকে চূড়ান্তভাবে চলিয়া আসে না; যদিও বিপ্লবী আন্দোলনে জনসাধারণকে টানিয়া আনিবার কাজে এই মোহমুক্তি অনিবার্যভাবে বিপ্লবী পার্টিকে সাহায্য করে, আবার অন্যদিকে, বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার ফলে জনতার মোহমুক্তির গতিও ত্বরান্বিত হয়।

(২) কোন ব্যতিক্রম না রাখিয়া সমস্ত শ্রেণির পারস্পরিক সম্পর্কের নির্ভুল ধারণা সঠিক বিপ্লবী লাইন নির্দ্ধারণের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু সি-সি চিঠি শ্রেণি সমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের মূল্য বিচার করিতেই শুধু ব্যর্থ হয় নাই—পরন্তু ইহা আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সমূহেরও পরিবর্তন করিয়াছে।

ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের সংগঠক এবং নেতা হিসাবে শ্রমিকশ্রেণির ভূমিকা সি-সি চিঠি প্রায় সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছে। শ্রমিক আন্দোলনের সম্ভাবনা ফলত নাকচ করিয়া দিয়া সি-সি চিঠি স্বভাবতই শ্রমিকশ্রেণির ঐক্যের বিপুল তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে ব্যর্থ হইয়াছে—যে ঐক্য ব্যতীত শ্রমিক শ্রেণি জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টে সমগ্র গণতান্ত্রিক শ্রেণি সমূহের মিলন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব সার্থকভাবে সম্পাদন করিতে পারে না। ইহার অর্থ অবশ্য এই নয় যে যতক্ষণ না পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণির পূর্ণ ঐক্য প্রতিষ্ঠা হইতেছে ততক্ষণ সর্বহারার পার্টি ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট গড়িয়া তোলার কাজ শুরু করিতে পারিবে না এবং সেইকাজে অনেকখানি সাফল্যলাভ করিতে পারিবে না। কিন্তু, সি-সি চিঠি শ্রমিকশ্রেণির ঐক্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সমেত শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন আশু করণীয় কাজগুলির প্রতি প্রায় কোন মনোযোগই দেয় নাই। এই বিষয়ে সি-সি চিঠি আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের শিক্ষা প্রকাশ্যে বর্জন করিয়াছে। সর্বহারার নেতৃত্ব সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির ধারনা সম্পূর্ণ ভুল, কেননা, ইহা বুঝিতে পারে নাই যে সর্বহারার নেতৃত্বের অর্থ আদর্শগত, রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক নেতৃত্ব।

ঐক্যবদ্ধ জাতীয় ফ্রন্টের ভিত্তির উল্লেখ করিয়া সি-সি চিঠিতে "শ্রমিকশ্রেণি ও শ্রমজীবি কৃষকের ঐক্য"র কথা বলা হইয়াছে, অথচ ইনফরমেশন ব্যুরোর পত্রিকা, কমরেড মাও-সে-তুং, চু-তে, লিউ শাও-চি সকলেই শ্রমিকশ্রেণির সহিত সমগ্র কৃষকের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার উপরই গুরুত্ব দিয়াছেন। ইনফরমেশন ব্যুরোর পত্রিকার ২৭শে জানুয়ারীর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "শ্রমিকশ্রেণির সহিত সমগ্র কৃষকের ঐক্য শক্তিশালী করিতে আমাদের নির্দেশ দিয়াছে"। পিকিং ম্যানিফেস্টোতে একই কথা বলা হইয়াছে।

ক্ষেত মজুররা ক্রমবর্ধমান কৃষি বিপ্লবের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শক্তি এই কথা জোর দিয়া বলা অবশ্যই বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু সি-সি চিঠি গ্রামাঞ্চলে অগ্রণীর ভূমিকা কেবলমাত্র ক্ষেতমজুরদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়াছে অথচ বাস্তবিক পক্ষে, ক্ষেতমজুর সমেত সমগ্র গরীব কৃষক-ই হইল কৃষক জনতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা জঙ্গী অংশ।

সি-সি চিঠি আমাদের ঔপনিবেশিক বিপ্লবের বর্তমান স্তরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের বিরাট বিপ্লবী সম্ভাবনা অস্বীকার করিয়াছে এবং শ্রমিক শ্রেণির বলিষ্ঠ মিত্রশক্তি

হিসাবে জনতার এইসব অংশকে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে সামিল করিবার কাজে কোন নেতৃত্ব দিতে পারে নাই।

মাঝারী বুর্জোয়াদের অবস্থান সি-সি চিঠি যান্ত্রিকভাবে বিচার করিয়াছে। প্রথমত, বড় বুর্জোয়াদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক বা অন্য কোন সম্পর্কের ভিত্তিতে মাঝারী বুর্জোয়াদের শ্রেণি-সংস্থা নিরুপণ করা ভুল। অবশ্য যদি বলা হয় যে মাঝারী বুর্জোয়াদের মধ্যে কেহ কেহ বা কোন কোন গ্রুপ বড় বুর্জোয়াদের সহিত এমনভাবে জড়িত যে তাহারা হয়ত এই বন্ধন ছাড়াইতে পারিবে না, তবে এই কথা সত্য। কিন্তু ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের সহিত একটি সামাজিক শ্রেণির অংশ হিসাবে মাঝারী বুর্জোয়াদের সম্পর্ক মূলত নির্ধারিত হইবে সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় বড় বুর্জোয়াদের প্রভুত্বাধীন সংকট-জর্জর ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় শ্রেণি হিসাবে উহাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান দ্বারা।

দ্বিতীয়ত, সি-সি চিঠি মাঝারী বুর্জোয়াদের অস্থির চিত্ততার ও অনির্ভরযোগ্যতার কথা উল্লেখ করিয়াছে, কিন্তু উপলব্ধি করিতে পারে নাই যে পার্টির দায়িত্ব হইল, যেমন কমরেড ষ্ট্যালিন বলিয়াছেন, "মিত্র সাময়িক, দোদুল্যমান, অস্থিরচিত্ত, অনির্ভরযোগ্য এবং সর্তসাপেক্ষ হইলেও, গণ-মিত্র লাভ করিবার জন্য প্রত্যেকটি এমনকি সামান্যতম সুযোগও" গ্রহণ করা। সি-সি চিঠি এই বিষয়টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছে যে ক্রমবর্ধমান ঔপনিবেশিক সংকট সাম্রাজ্যবাদ ও বড় বুর্জোয়াদের সহিত মাঝারী বুর্জোয়াদের গুরুতর বিরোধ না সৃষ্টি করিয়াই পারে না, এবং উহার ফলে আমাদের মিত্রশক্তি সংগ্রহের বাস্তব সম্ভাবনা সৃষ্টি হইতে পারে। এই প্রধান বিষয়টির উপলব্ধি না থাকার ফলেই সি-সি চিঠি দেখিতে চায় নাই যে যতই অস্থির চিত্ত ও দোমনা হউক না কেন, মাঝারী বুর্জোয়াদের গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে সামিল করিবার বাস্তব ভিত্তি রহিয়াছে। একটা শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে এইসব মিত্রদের সপক্ষে আনিবার তাৎপর্য লক্ষ্য না করা খুবই ক্ষতিকর।

বর্তমান ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় শ্রেণিসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধের এই সংকীর্ণ উপলব্ধি আমাদের বিপ্লবের বর্তমান স্তরের মূল রণনীতিকেও অবশ্যম্ভাবীরূপে সংকীর্ণ করিয়া ফেলে এবং ইহার পরিসর ও ব্যাপ্তি সীমাবদ্ধ করে।

(৩) আমাদের আন্দোলনের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ ও প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের এবং বিশেষত চীন বিপ্লবের শিক্ষা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া সি-সি চিঠি গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের অতিশয় গুরুতর প্রয়োজনের কথা অস্বীকার করিয়াছে এবং ইহা গড়িয়া তুলিবার জন্য একেবারেই কোন নেতৃত্ব দেয় নাই। চীনের মুক্তি আন্দোলনের শিক্ষা, একটি মূল কাজ হিসাবে "শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ জাতীয় ফ্রন্ট" গঠনের বিষয় উপস্থিত করিয়াছে। কিন্তু সি-সি কার্যত চীনের অভিজ্ঞতার এই প্রধান বিষয়টি অগ্রাহ্য করিয়াছে, সেই কারণেই সি-সি'র চিঠি হইতে গণত্যান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রশ্নে কোন নেতৃত্ব বাহির হইয়া আসে নাই। "দুই দিকের কাজ" বিবৃত করিতে গিয়া সি-সি'র চিঠি এমন কি গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের উল্লেখ পর্যন্ত করে নাই, যদিও চিঠির শেষ দিকে এই সম্পর্কে কিছু উল্লেখ আছে।

সি-সি চিঠিতে শহরাঞ্চলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সম্ভাবনা ও ভূমিকাকে ছোট করিয়া দেখানোর মধ্যেও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের তাৎপর্য উপলব্ধির অভাব প্রকাশ পাইয়াছে। সি-সি'র চিঠি লক্ষ্য করিতে চাহে নাই যে সমস্ত রকমের দমননীতি সত্ত্বেও আজিকার ভারতবর্ষে শহর ও

নগরগুলি এখনও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে বর্তমান রহিয়াছে।

ভুল লাইন অনুসরণ করার দরুণই সি-সি'র চিঠি বিশেষ করিয়া বামপন্থী পার্টিগুলির তাৎপর্য বুঝিতে পারে নাই। ইহা বুঝিতে পারে নাই যে বামপন্থী পার্টিগুলির বিপ্লবী সম্ভাবনা এখনও একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায় নাই এবং আমাদের ঔপনিবেশিক মুক্তি আন্দোলনের বর্তমান স্তরে তাহারা এখনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

অতএব দেখা গেল যে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সম্পর্কে সি-সি চিঠির বক্তব্য আসলে ফাঁকা বুলি মাত্র।

(৪) বিজয়ী চীনা গণবিপ্লবের অভিজ্ঞতা উপনিবেশ এবং অর্ধ উপনিবেশ সমূহের মুক্তি সংগ্রামের প্রধান রূপ হিসাবে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রশ্ন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে। যে সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাহাদের দালালরা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে শয়তানী আক্রমণ করিতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রায় সবগুলি দেশেই এক্ষণে সশস্ত্র সংগ্রাম চালাইতেছে। ইহা সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যতীত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সশস্ত্র প্রতিরোধ ব্যতীত ঔপনিবেশিক পরাধীন দেশগুলি প্রকৃত মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে না।

"আমাদের দেশে তেলেঙ্গানায় এবং অন্যান্য কোন কোন অঞ্চলে ইতিমধ্যেই সশস্ত্র সংগ্রাম সৃষ্টি হইয়াছে। এখন আমাদের দায়িত্ব হইল এমনভাবে আন্দোলনকে উন্নত করা, এমন প্রস্তুতি করা এবং এমন সঠিক নেতৃত্ব দেওয়া যাহাতে সশস্ত্র সংগ্রাম বাড়িয়া উঠিতে পারে ও আমাদের জনসাধারণের মুক্তি আন্দোলনের প্রধান সংগ্রামরূপ হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

কিন্তু সি-সি'র চিঠি বাহ্যত চীনের পথের গুণগান করিলেও সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনৈতিক তাৎপর্য ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সহিত ইহার সম্পর্ক একেবারেই বুঝিতে পারে নাই। যাহা বলিতে জনগণের নিজস্ব সশস্ত্র সংগ্রাম বুঝায় সি-সি'র চিঠি তাহাকে কেবল পার্টি সভ্য ও পার্টি জঙ্গীদের সামরিক দুঃসাহসিক কার্যমাত্রে পর্যবসিত করিয়াছে।

রণকৌশল সম্পর্কে সমস্ত বলশেভিক শিক্ষার বিরুদ্ধে, সি-সি'র চিঠি সশস্ত্র সংগ্রামে জনতার অংশ গ্রহণ ও সক্রিয় সমর্থনের বিষয় অগ্রাহ্য করিয়াছে এবং যাহাকে সি-সি'র চিঠি "সাধারণ সমর্থন" ও "স্বাভাবিক সহানুভূতি" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে তাহারই ভিত্তিতে সশস্ত্র সংগ্রামের আওয়াজ উঠাইতে চাহিয়াছে।

অথচ চীনের অভিজ্ঞতা আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে সশস্ত্র সংগ্রামকে অবশ্যই হইতে হইবে জনগণেরই নিজস্ব সশস্ত্র সংগ্রাম। কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রামে জনতার অংশ গ্রহণ ও সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা কার্যত অস্বীকার করিয়া সি-সি'র চিঠি চীনের অভিজ্ঞতার এই মৌলিক শিক্ষাই অগ্রাহ্য করিয়াছে।

চীনের নেতৃবৃন্দ আমাদের এই শিক্ষা দেন যে সশস্ত্র সংগ্রাম সমগ্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শ্রেণির যুক্তফ্রন্ট হইতে অবিচ্ছেদ্য, শ্রমিক শ্রেণি হইতে অবিচ্ছেদ্য, পার্টি হইতে এবং পার্টির সঠিক রাজনৈতিক লাইন হইতে অবিচ্ছেদ্য। সি-সি'র চিঠি এই সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া সশস্ত্র সংগ্রামকে উপস্থিত করিয়াছে একটি বিচ্ছিন্ন সামরিক সংগ্রাম হিসাবে। প্রকৃতপক্ষে, সশস্ত্র সংগ্রামের নাম করিয়া সি-সি'র চিঠি যুক্তফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করিয়াছে, অথচ এই যুক্তফ্রন্ট ব্যতীত সশস্ত্র সংগ্রাম কখনই তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে না।

কেবলমাত্র পার্টির আগ্রহ, মতামত ও প্রস্তুতির দ্বারাই সংগ্রামের ধরন কখনো নির্ধারিত হইতে পারে না এই মৌলিক বলশেভিক শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া, আমাদের দেশের বাস্তব অবস্থা

এবং আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবাস্তব বিচারের ভিত্তিতে সি-সি'র চিঠি সশস্ত্র সংগ্রামের আওয়াজ উপস্থিত করিয়াছে। কিন্তু এই লেনিনবাদ বিরোধী মত অবলম্বন করিতে গিয়া সি-সি'র চিঠি এমন কি পার্টি সংগঠনের বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত নির্ভুল বিচার করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

পার্টির শ্লোগানকে জনতার নিজস্ব শ্লোগানে পরিণত করিতে হইবে—পার্টির এই ভূমিকা বুঝিতে না পারাই সি-সি'র চিঠিতে পার্টির সংগঠনের বর্তমান অবস্থা বিচার করিবার অনিচ্ছার কারণ। এইভাবে সি-সি'র চিঠি লেনিনবাদের অন্যতম প্রধান প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং চীনের গণমুক্তি আন্দোলনের অভিজ্ঞতা বর্জন করিয়াছে। সি-সি'র চিঠির এই যুক্তিহীন ভুল এবং মনগড়া ধারণার নিশ্চিত ফল হইবে বাস্তবে প্রাথমিক রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্তব্য সমূহ পূরণ না হওয়া, যাহা না হইলে সশস্ত্র সংগ্রাম কেবল একটা বেপরোয়া হঠকারিতায় পর্যবসিত হইতে পারে। সি-সি'র চিঠি ভুলিয়া গিয়াছে যে বিপ্লবী সংকট যে সমস্ত সুযোগ সৃষ্টি করে তা বিপ্লবী আন্দোলনের বাস্তবে রূপান্তরিত হইতে পারে প্রধানত পার্টির সঠিক রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়া। পার্টির এবং তাহার রাজনৈতিক লাইনের এই গুরুতর ভূমিকা অমান্য করার অর্থ ফলত ন্যূনতম প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করিতে অস্বীকার করা—যে ন্যূনতম ব্যবস্থা ছাড়া সশস্ত্র সংগ্রাম সার্থকভাবে কখনোই চালানো যায় না।

সি-সি'র চিঠিতে পার্টির ভূমিকা সম্পর্কে উপর উপর উল্লেখ থাকিলেও, চিঠিতে যে ব্যবহারিক কাজ সমূহ নির্ধারিত হইয়াছে তাহার মধ্যে কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রামের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া পার্টির ভূমিকার তাৎপর্য আদৌ দেখান হয় নাই। শুধু যে পার্টির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারের মধ্যেই সি-সি'র চিঠি সমস্ত "আশু ন্যূনতম কর্তব্য সমূহ" সীমাবদ্ধ করিয়াছে তাহাই নয়, ইহাতে এমনও বলা হইয়াছে যে শত্রু যখন আক্রমণ করিবে। তখন তাহার সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু করিবার জন্য এই আশু ন্যূনতম কাজ সমূহ ও সম্পন্ন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। বর্তমানে পার্টির অবস্থা এবং জনসাধারণের নিকট হইতে ইহার বিচ্ছিন্নতার কথা বিবেচনা করিলে ইহা জাজ্জ্বল্যমান হইয়া ওঠে যে সি-সি চিঠির লাইন আন্দোলনের সমস্ত প্রকৃত অবস্থা পরিপূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়া প্রত্যক্ষভাবে হঠকারী কার্যকলাপে উৎসাহ দিতেছে।

সি-সি'র চিঠির এই মারাত্মক হঠকারী দৃষ্টিভঙ্গি আরও বিশেষভাবে প্রকট হইয়া ওঠে যখন একদিকে ইহা সংগ্রামের অন্যান্য সমস্ত রূপকে স্পষ্টত অবহেলা করে, আবার অন্যদিকে গোঁড়ামীর সহিত ঘোষণা করে যে "কেবলমাত্র গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই পার্টি শক্তিশালী এবং বিস্তৃত হইবে"। সঠিকভাবে চালু করিলে সশস্ত্র সংগ্রাম জনসাধারণকে আরো বেশি উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করিতে পারে এবং পার্টিকেও শক্তিশালী করিতে পারে, একথা অবশ্যই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যেভাবে সি-সি'র চিঠি বিষয়টি উপস্থাপিত করিয়াছে তাহার অর্থ বুঝায় এই যে পার্টি এবং আন্দোলনের অবস্থা যাহাই থাকুক না কেন, গেরিলা সংগ্রাম ব্যতীত পার্টি শক্তিশালীও হইতে পারে না বা বিস্তৃতও হইতে পারে না। অর্থাৎ যেখানে উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি হয় নাই সেখানে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করিলে পার্টি বর্ধিত ও শক্তিশালী হইবার বদলে সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়াও যাইতে পারে—সি-সি'র চিঠি এই বিপদের কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছে।

কেবলমাত্র গেরিলা যুদ্ধের মারফৎ "পার্টিকে শক্তিশালী ও বর্ধিত করিবার" বিকৃত

ধারণা আসলে পার্টিকে পুনর্গঠিত করিবার নামে প্রকৃতপক্ষে উন্মত্ত হঠকারিতারই আহ্বান মাত্র। এই গোঁড়ামীর দৃষ্টিভঙ্গি যদি কার্যে প্রয়োগ করা হয় তবে পার্টি ও গণ-আন্দোলনের এখনও যা কিছু অবশিষ্ট আছে তাহাও সব নিঃশেষ হইয়া যাইবে।

অতএব, সি-সি'র চিঠি বাস্তবিক যাহা করিয়াছে তাহা হইল বহুলাংশে পুরাতন পলিটব্যুরোর ট্রটস্কীবাদী-টিটোবাদী লাইনের সংকীর্ণতাবাদ এবং হঠকারীতা আঁকড়াইয়া থাকা এবং চীনের গণবিপ্লবের মূল শিক্ষা বর্জন করা। সমগ্রভাবে ধরিলে, সি-সি'র চিঠি হইতে দেখা যায় আমাদের আন্দোলনের জীবন্ত অবস্থায়, আমাদের দেশের মাটিতে চীনের পথ কী করিয়া প্রয়োগ না করিতে হয়। (অতএব) ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই যে ইহার লেনিনবাদ বিরোধী হঠকারী নীতি দাঁড় করাইবার প্রচেষ্টায়, সি-সি'র চিঠি ইনফরমেশন ব্যুরোর পত্রিকার ২৭শে জানুয়ারী তারিখের সম্পাদকীয় প্রবন্ধের এবং পিকিং সম্মেলনের ম্যানিফেস্টো ও রিপোর্ট সমূহের বিশ্লেষণ বিকৃত করিয়াছে।

(৫) আমাদের মত একটি বহু জাতিক অর্ধ ঔপনিবেশিক দেশের মুক্তি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে জাতি সমস্যার পরিপূর্ণ বিপ্লবী তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সি-সি'র চিঠি ব্যর্থ হইয়াছে। সি-সি'র চিঠি দেখিতে চাহে নাই যে শ্রমিক শ্রেণি এবং একমাত্র শ্রমিক শ্রেণিই যে নির্যাতিত জাতিসমূহের কোনও কোনও দাবির সমর্থক হিসাবে দাঁড়াইতে পারে এবং তাহাকে দাঁড়াইতেই হইবে শুধু তাহাই নয়, এইরকম জাতিসমূহের ক্রমবর্ধমান আন্দোলনগুলির সহিত জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী যুক্ত ফ্রন্টের যোগসাধন করিয়া শ্রমিক শ্রেণিকেই এই জাতীয় জাগরণকে একটা নির্দিষ্ট বিপ্লবী লক্ষ্য এবং নেতৃত্ব দিতে হইবে।

(৬) সি-সি'র চিঠির সংকীর্ণতাবাদের একটি প্রধান উদাহরণ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে বিশ্বব্যাপী শান্তির সংগ্রাম সম্পর্কে ইহার মনোভাবের মধ্যে। আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সাফল্য যে শান্তির দুনিয়াব্যাপী ফ্রন্টকে প্রভূত শক্তিশালী করিবে ইহা তো অনস্বীকার্য। কিন্তু এখানে আমাদের দেশে আজ বিশেষভাবে যে কথাটা জোর দিয়া বলা প্রয়োজন তাহা হইল এই যে আমাদের জনসাধারণের ভবিষ্যৎ, তাহাদের জমি, রুটি ও প্রকৃত স্বাধীনতার সংগ্রাম নির্ভর করে শান্তির জন্য বিশ্বব্যাপী এই ঐতিহাসিক সংগ্রামেরই উপর। এই বিষয়ে সি-সি'র চিঠি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে।

এই কথাও বারবার জোরের, সহিত বলা দরকার যে শান্তির জন্য বিশ্বব্যাপী ঐতিহাসিক সংগ্রামে আমাদের জনসাধারণের ব্যাপকতম অংশকে অবশ্যই সমাবেশ করিতে হইবে, যাহা আমাদের জাতীয় যুক্তফ্রন্টকে ব্যাপক ও শক্তিশালী করিতে প্রভূত সাহায্য করিবে এবং আমাদের জনসাধারণকে জাতীয় মুক্তির পথে আগাইয়া নিবে।

আমাদের দেশের জনতার সম্মুখে সর্বদাই ইহা রাখিতে হইবে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের ও বর্তমান যুগের মহত্তম নেতা কমরেড জে. ভি. ষ্ট্যালিনের নেতৃত্বে পরিচালিত দুনিয়া জোড়া শান্তির ফ্রন্ট জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আমাদের দেশের জনসাধারণের সম্মুখে অভূতপূর্ব বৈপ্লবিক সম্ভাবনা উপস্থিত করিতেছে। কিন্তু সি-সি'র চিঠি তাহা করিতে পারে নাই।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠি এখনও একটি সংকীর্ণ হঠকারী লাইন সমর্থন করিয়া চলিয়াছে অথচ সমগ্র পার্টির পক্ষে এখন বিশেষ জরুরি প্রয়োজন হইল পুরাতন পলিটব্যুরোর সর্ব প্রকারের ট্রটস্কীবাদ-টিটোবাদ

চূড়ান্তভাবে বর্জন করা। পুরাতন পলিটব্যুরোর বিরুদ্ধে মৌলিক প্রতিবাদ সত্ত্বেও, আন্তর্জাতিক আন্দোলনের শিক্ষার প্রতি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, এখানে ওখানে কয়েকটি ভাল ভাল কথা ব্যবহার করা সত্ত্বেও সি-সি'র চিঠি পুরাতন ট্রটস্কীপন্থী পলিটব্যুরোর সংকীর্ণতাবাদ ও হঠকারিতা রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে নাই এবং আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের নির্দেশ হইতে, কোন সঠিক শিক্ষাও ইহা গ্রহণ করে নাই। ইহা প্রতীয়মান হয় এই ঘটনায় যে, সি-সি'র চিঠি নীতি নির্ণয় করিতে চাহিয়াছে পুরাতন অপদস্থ ট্রটস্কীপন্থী টিটোপন্থী নেতৃত্বের সহিত আপস ও মীমাংসার ভিত্তিতে। ইহা হইতে আরো বুঝা যায় কেন রাজনৈতিক লাইন স্থির করার দায়িত্ব পুরাতন পলিটব্যুরোর উপর দেওয়া হইয়াছিল, যে রাজনৈতিক লাইন কিছু কিছু সংশোধন-সহ—এই সংশোধনও হইয়াছে পুরাতন কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিংয়ে—বর্তমান, নয়া কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই লাইনই হইল নয়া কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠির ভিত্তি।

খ) সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গি

সি-সি'র চিঠিতে যে সাংগঠনিক সিদ্ধান্তগুলি ও দৃষ্টিভঙ্গি জাহির করা হইয়াছে তাহাতে নয়া সি-সি'র আরো আরো দৃশ্যতঃ প্রমাণিত হয়। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করিতে হইবে।

(১) সি-সি'র চিঠি অনুমোদনের সহিত জানাইয়াছে যে কেন্দ্রীয় কমিটির তিনজন সদস্যকে মিটিংয়ে উপস্থিত হইতে দেওয়া হয় নাই। পার্টি কংগ্রেসে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির এই তিনজন সদস্যকে মিটিং হইতে বাদ দেওয়া কেবল পার্টি কংগ্রেসের নির্দেশের ডাহা অমান্য করাই মাত্র নয়, পরন্তু ইহা পার্টি সংগঠনের সর্বপ্রকার সুপরিচিত রীতি নীতিরও অমান্য করা। এই পার্টি বিরোধী কাজ আরও বীভৎস মনে হয় যখন দেখা যায় যে ট্রটস্কীবাদী-টিটোবাদী অপরাধে অংশীদার না হইয়াও এই কমরেডরা মিটিং হইতে বাদ পড়িলেন অথচ যাহারা অসংখ্য ট্রটস্কীবাদী টিটোবাদী অপরাধ করিয়াছিল তাহাদের শুধু যে সি-সি মিটিংয়ে উপস্থিত থাকিতেই দেওয়া হইল তাহাই নহে, এমনকি নতুন লাইন নির্ণয় করিতে এবং কেন্দ্রীয় কমিটিকে পুনর্গঠিত করিতেও তাহাদের দেওয়া হইল। এই একটিমাত্র ঘটনা দেখাইয়া দিয়াছে যে কিভাবে উক্ত কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং পুরাতন ট্রটস্কীবাদী-টিটোবাদী পলিটব্যুরো ও তাহাদের গোঁড়া সমর্থকদের হুকুমের নিকট নতি স্বীকার করিয়াছে, যাহারা প্রধানত কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং হইতে এই (তিনজন) কমরেডকে স্বেচ্ছাচারীভাবে বাহিরে রাখিবার জন্য দায়ি ছিল।

(২) ট্রটস্কীবাদ-টিটোবাদের অপরাধে যাহারা সর্বাপেক্ষা বেশি অপরাধী কেন্দ্রীয় কমিটি হইতে তাহাদের অপসারণ করিবার বদলে এবং অন্যান্য যে সি-সি সভ্যরা টিটোবাদী অপরাধ হইতে মুক্ত ছিলেন তাহাদের সমাবেশ করিবার পরিবর্তে পুরাতন কেন্দ্রীয় কমিটি, বরং বলা উচিত যেভাবে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা হইল তাহা, পুনর্গঠনের নামে পার্টির নির্বাচিত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে ভাঙিয়া দিলেন। যে সকল নির্বাচিত সি-সি সভ্য ট্রটস্কীবাদী-টিটোবাদী অপরাধ হইতে মুক্ত ছিলেন, জেলে থাকুন আর বাহিরেই থাকুন, তাঁহাদের অপসারিত করার একমাত্র অর্থ সেই ট্রটস্কীবাদী-টিটোবাদী পলিটব্যুরোর নির্দেশ পালন করা।... পার্টির নিয়মকানুন অনুসারে অথবা বৈধ রাজনৈতিক কারণ না দেখাইয়া নির্বাচিত সদস্যদের, তাঁহারা জেলে থাকুন আর না থাকুন, কেন্দ্রীয় কমিটি হইতে অপসারণ করিবার কোন অধিকার কাহারও নাই।

অতএব, এই তথাকথিত পুর্নগঠন আসলে বিভেদমূলক ও বিলোপকারী দৃষ্টিভঙ্গি লইয়াই কল্পনা করা হইয়াছে এবং কার্যত ইহা সম্পাদন করা হইয়াছে টিটোবাদ-ট্রটস্কীবাদের সহিত আপসের ভিত্তিতে এই টিটোবাদ-ট্রটস্কীবাদের প্রধান কয়েকজন প্রতিভূকে কেবলমাত্র বাহ্যত অলক্ষ্যে রাখা হইয়াছে। নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির পুনর্গঠন আদৌ রাজনৈতিক ভাবে বৈধ নয়। ইহা ট্রটস্কীবাদ-টিটোবাদের সহিত সাংগঠনিক বন্দোবস্ত মাত্র।

পুনর্গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি, ট্রটস্কীবাদী-টিটোবাদী নেতাদের নিকট তাহা যতই প্রীতিকর হউক না কেন, একটী সর্বভারতীয় মার্ক্সবাদী-লেলিনবাদী পার্টি নেতৃত্বের উপযোগীতার পক্ষে আদৌ যথেষ্ট নয়। যে নীতি এই পুনর্গঠনের পথ প্রদর্শন করিয়াছে তাহা হইল রাজনৈতিক সুবিধাবাদের নীতি, ট্রটস্কীবাদ-টিটোবাদের সহিত প্রচ্ছন্ন আপসের প্রয়োজন দেখা দিলে যে সুবিধাবাদ অপরিহার্য্য হইতে বাধ্য।

বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল এই যে যখন পার্টি লাইন অন্তঃপার্টি আলোচনার পর্যায়ে রহিয়াছে তখন ঐ সি-সি'র চিঠির লাইনকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করাকেই নয়া কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য মনোনয়নের প্রথম শর্ত করা হইয়াছে। পার্টি গঠনতন্ত্রের ও পার্টির ঐক্যসাধনের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অপ্রীতিকর ও ক্ষতিকর আর কিছু হইতে পারে না।

পুরাতন পলিটব্যুরোর নিকট হইতে অর্জিত গোঁড়ামি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সাংগঠনিক থিসিসের বিধি অমান্য করিয়াছে; এই থিসিসের ৪৭ নং ধারায় বলা হইয়াছে যে রণকৌশল সম্পর্কে মত পার্থক্যসমূহ, যদি গুরুতর প্রকৃতির হয়, তবে তাহা কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব পাওয়া উচিত। এই নিয়ম দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করার প্রয়োজন যদি কখনও ভারতবর্ষে জরুরি হইয়া দেখা দিয়া থাকে তবে তাহা আজই দিয়াছে। কিন্তু সি-সি'র চিঠি প্রমাণ করিয়াছে যে বর্তমান নেতৃত্ব এই নীতি উপেক্ষা করিতেছে।

(৩) পার্টির সর্বোচ্চ স্তরে পার্টির অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র জলাঞ্জলি দিয়া, কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টির সভ্যসাধারণের উপর তাহাদের সিদ্ধান্ত এবং দৃষ্টিভঙ্গি চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে এমন একটা সময়ে যখন পার্টি একটা গুরুতর সংকটের মধ্যে পড়িয়াছে এবং যখন পর্যন্ত ট্যাকটিক্যাল লাইন নির্ধারণ করা বাকি আছে। সি-সি'র চিঠি বুঝিতে চাহে নাই যে বর্তমানে আমাদের পার্টির অভ্যন্তরীণ অবস্থায় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা বাড়াইয়া তুলিবার সংগ্রাম দাবি করে প্রথমতঃ এবং প্রধানত পরিপূর্ণ অন্তঃপার্টি গণতন্ত্র, শুধু কথায় নয়, কাজে। যাঁহারা "দ্বিধাহীনভাবে নতুন লাইন গ্রহণ করেন" কেবল তাঁহাদের লইয়া গঠিত নয়া কেন্দ্রীয় কমিটি অন্তঃপার্টি গণতন্ত্র সম্পর্কে সি-সি'র চিঠির উচ্ছ্বাসপূর্ণ কথাবার্তাকে একেবারে গোড়া হইতেই অসার বলিয়া প্রমাণ করিতেছে।

নতুন লাইন স্থির করিবার পর সি-সি'র চিঠি পার্টির সভ্যসাধারণের অভিমতের অপেক্ষা রাখে নাই—অভ্যন্তরীণ পার্টি আলোচনা ও গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়া ইহাকে যাচাই করিয়া লইবার জন্য অপেক্ষা করে নাই। প্রায় সেই একই পুরাতন ট্রটস্কীবাদী-টিটোবাদী ভঙ্গীতে সি-সি'র চিঠি ইহার নিজস্ব লাইনের ভিত্তিতে অবিলম্বে উপর হইতে পার্টি শৃঙ্খলা প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছে—এইভাবে ইহা এই বিষয়টি খেয়াল করে নাই যে যখন রাজনৈতিক লাইন লইয়া পার্টির মধ্যে গুরুতর এবং ব্যাপক মতবিরোধ বিদ্যমান রহিয়াছে সে অবস্থায় এইভাবে উপর হইতে চাপাইয়া দিয়া পার্টি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। যে লাইন সম্বন্ধে এখনও অভ্যন্তরীণ পার্টি

সংগ্রাম চলিতেছে তাহারই ভিত্তিতে পার্টি শৃঙ্খলা প্রয়োগ করিবার চেষ্টা অন্তঃপার্টি আলোচনাকে শুধু বিফল করিয়াই দিতে পারে এবং সত্যিকার পার্টি শৃঙ্খলাকে আরো নষ্ট করিতেই পারে।

(৪) অন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা লইয়া গালভরা বুলি আওড়াইতে থাকিলেও সি-সি'র চিঠি পার্টির সভ্যসাধারণের প্রতি একটা অসহিষ্ণু মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে এবং তাহাদের সমালোচনা ও দাবি সমুহ বুঝিতে চেষ্টা করিবার পরিবর্তে তাহাদের বিকৃত ও হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছে।

(৫) পার্টির অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির প্রকৃত অবস্থার প্রতি এই যুক্তিহীন অন্ধতা আরও প্রকাশ পাইয়াছে সি-সি'র চিঠি কর্তৃক পার্টি কংগ্রেসের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার মধ্য দিয়া, যে পার্টি কংগ্রেস ইতিপূর্বেই পার্টির সভ্যসাধারণের ব্যাপক দাবি হইয়া উঠিয়াছিল।

(৬) টিটোবাদী চরদের বিরুদ্ধে সতর্ক দৃষ্টির অভাব সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিশন নিয়োগের কথা সি-সি'র চিঠি আমাদের জানাইয়াছে। কিন্তু ট্রটস্কীবাদ টিটোবাদের শিকড় ও ইতিহাস এবং আমাদের পার্টির মধ্যে ইহার প্রধান অনুরাগীদের সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ রাজনৈতিক তদন্ত চালাইতে ইহা অস্বীকার করিয়াছে। এমন কি এই সীমাবদ্ধ পরিসরের মধ্যেও, যাহারা ট্রটস্কীবাদী রাজনৈতিক লাইন চাপাইয়া দিবার ও 'টিটো টার্কিস" (অত্যাচারী) পদ্ধতি অবলম্বন করিবার অপরাধে অপরাধী, প্রস্তাবিত তদন্তের আওতার মধ্যে সেই গোটা পার্টি নেতৃত্বকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। টিটোবাদী-ট্রটস্কীবাদী অপরাধের বিরুদ্ধে সাধারণ পার্টি সভ্যদের যা কিছু প্রমাণ আছে তাহা উপস্থিত করিবার জন্য তাহাদের নিকট কোন আহ্বান জানানো হয় নাই—এই ঘটনাও দেখাইয়া দিতেছে যে এই তদন্ত একটি লোকদেখানো ব্যাপার মাত্র হইয়া উঠিবে এমন সম্ভাবনা রহিয়াছে। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের পর হইতে আমাদের বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া যে রকম তদন্ত নিশ্চিত আবশ্যকরূপে দেখা দিয়াছে নয়া কেন্দ্রীয় কমিটি এইভাবে তাহা কার্যত পরিত্যাগ করিয়াছে।

(গ) একটি প্রস্তাব

পি-ও-সি নয়া কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট আবেদন জানাইতেছে যে এখনও এত দেরিতেও তাহারা পার্টি-জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করুন এবং ট্রটস্কীবাদ-টিটোবাদের সহিত তাঁহাদের দৃশ্য অদৃশ্য সর্ব প্রকার বন্ধন ছিন্ন করিয়া এমন বলিষ্ঠ সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করুন যাহার ফলে, সংকট হইতে পার্টিকে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে সর্ব প্রকার উপায় অবলম্বনের জন্য যথাসম্ভব বোঝাপড়ার ভিত্তিতে পার্টির একটি উপযুক্ত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে, যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সমষ্টিগতভাবে পার্টির সভ্যসাধারণের বৃহত্তম অংশের আস্থাভাজন হইবেন। এই আবশ্যক পরিবর্তন না করিয়া পূর্বাবস্থা বজায় রাখিবার যেকোন চেষ্টা পার্টির মধ্যে আরো বেশি করিয়া ফাটল ধরাইবে এবং পুরাতন পলিটব্যুরোর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করিবে।

অতএব, অবিলম্বে কার্যকরী করিবার জন্য পি-ও-সি নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছে, যাহাতে আর বৃথা কাল হরণ না করিয়া বর্তমান অন্তঃপার্টি পরিস্থিতির সংশ্লিষ্ট অবস্থায় ন্যূনতম দায়িত্ব পালন করিবার যোগ্যতাসম্পন্ন সাময়িক কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সৃষ্টি হইতে পারে। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের নির্বাচিত সমস্ত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের, তাঁহারা জেলে থাকুন আর বাইরে থাকুন, সভ্যপদের পূর্ণ অধিকার নয়া কেন্দ্রীয় কমিটিকে অবিলম্বে স্বীকার

করিতে হইবে, যে সমস্ত নির্বাচিত সদস্য গুরুতর ট্রটস্কীবাদ-টিটোবাদের অপরাধে অপরাধী কেবলমাত্র তাহাদেরই বাদ দিতে হইবে। এইভাবে ট্রটস্কীবাদ-টিটোবাদের গুরুতর অপরাধে অপরাধী সদস্যদের সকলের—ট্যাকটিক্যাল লাইন সম্বন্ধে তাঁহাদের যে রাজনৈতিক মত পার্থক্যই থাকুক না কেন—অন্তর্ভুক্তির দ্বারা পুনর্গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি সাময়িক কেন্দ্রীয় পার্টি নেতৃত্ব হিসাবে অবিলম্বে কাজ চালাইতে শুরু করিবে।

কেন্দ্রীয় কমিটি এইরূপ সঙ্গতভাবে পুনর্গঠিত হইলে এই গ্যারান্টি পাওয়া যাইবে যে গত দুই বৎসর ধরিয়া যাহারা ট্রটস্কীবাদী-টিটোবাদী লাইনের সাহায্যে পার্টিকে এবং গণ-আন্দোলনকে ধ্বংস করিবার জন্য সব কিছুই করিয়াছে, তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের পূর্বে তাহাদের উপর প্রকাশ্যে অথবা অন্তরালে পার্টি নেতৃত্বের কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হইবে না। অপরদিকে এমন বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক মতাদর্শগত সংগ্রামে এবং গণ-আন্দোলনের কাজে—যে গণ-আন্দোলনকে সর্বপ্রকারে এবং কাল বিলম্ব না করিয়া এখনই পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে—কেন্দ্রীয় কমিটি রাজনৈতিক মতভেদ নির্বিশেষে পার্টির প্রতি অনুরক্ত সমস্ত সভ্যদের সমাবেশ করিবেন।

রাজনৈতিক লাইন সম্বন্ধে বিভিন্ন মতধারা স্বভাবতই কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে থাকিবে, এই কেন্দ্রীয় কমিটি রাজনৈতিক লাইনের উপর প্রকাশিত প্রধান প্রধান মতামতের প্রতিনিধি লইয়া একটি ড্রাফটিং কমিটি (খসড়া প্রস্তুতকারী কমিটি) নিয়োগ করিবে। এই ড্রাফটিং কমিটি আমাদের রাজনৈতিক-আদর্শগত মত পার্থক্যের প্রকৃতি ও চাহিদা অনুযায়ী একটি বা একাধিক রাজনৈতিক প্রস্তাব পার্টির সভ্য সাধারণের নিকট উপস্থিত করিবে এবং এইভাবে উপস্থিত করিবে এবং এইভাবে উপস্থাপিত এক বা একাধিক প্রস্তাবই হইবে তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের পূর্ববর্তী অন্তঃপার্টি আলোচনার ভিত্তি। এইভাবে সমগ্র পার্টি র‍্যাঙ্ককে এই মুহূর্তের অতি প্রয়োজনীয় কাজে সমাবেশ করা যাইবে এবং অন্তঃপার্টি সংগ্রামে একটি সঠিক ও গঠনমূলক রাজনৈতিক আদর্শগত লক্ষ্য নির্দেশ করিয়া দেওয়া যাইবে।

যাঁহারা গুরুতর ট্রটস্কীবাদী-টিটোবাদী পাপের জন্য দোষী নন নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির এমন সকল সদস্যকে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে জমায়েত করিবার উদ্দেশ্যে, সংশ্লিষ্ট সকলকার মধ্যে কিছু কিছু প্রাথমিক আলাপ আলোচনা করা অপরিহার্য প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। উপরোক্ত উদ্দেশ্য এই ধরনের পারস্পরিক আলাপ আলোচনার সুবিধার জন্য কমরেড বলাই, কমরেড মৌলানা এবং পি-বি'র একজন প্রতিনিধির উপর ভার দেওয়া দরকার যাহাতে তাঁহারা নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অথচ যাঁহাদের নবগঠিত কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান দেওয়া হয় নাই, এমন কয়েকজন খ্যাতনামা কমরেডের সহিত ব্যক্তিগতভাবে বা অন্য কোন উপায়ে যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারেন।

এই ব্যবস্থার আরো বিশেষ করিয়া প্রয়োজন হইয়াছে কারণ বর্তমান অন্তঃপার্টি সংকটের অবস্থায় এইসব বিশিষ্ট পরীক্ষিত এবং প্রবীণ পার্টি নেতাদের সহযোগিতা বাদ দিয়া কোন পার্টি কেন্দ্রই পার্টি-র সভ্যসাধারণের প্রতি এবং গণ-আন্দোলনের প্রতি এমন কি তাহার প্রাথমিক দায়িত্বও পরিপূরণ করিতে পারে না।

২ নভেম্বর ১৯৫০

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

প্রাদেশিক
পার্টি আলোচনা

[শুধু পার্টি সভ্যদের জন্য]

নব পর্য্যায়, ৪র্থ সংখ্যা] ১৮ই নভেম্বর, ১৯৫০ [দাম : দুই আনা

মানুষ সৃষ্টি করে নিজ ইতিহাস, কিন্তু নিজেদের ঠিক যেমন খুশি তেমনভাবে করে না এই সৃষ্টি ; নিজেদের পছন্দসই পরিস্থিতিতে মানুষ এই সৃষ্টি করে না,—অতীত থেকে পাওয়া, অতীতে নির্দিষ্ট এবং সরাসরি অতীত থেকে চালান হয়ে আসা পরিস্থিতিতে মানুষ এই ইতিহাস সৃষ্টি করে। —কার্ল মার্কস

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক

পার্টি সভ্য ও দরদীদের নিকট কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠি সম্পর্কে

[নীচে প্রাচীর ইউনিটের 'সমালোচনা' প্রকাশ করা হল। বাংলা অনুবাদটি ইউনিট নিজেই করে পাঠিয়েছেন। এই সমালোচনা নাকি ইংরাজীতে জুলাই মাসেই নেতৃত্বের নিকট পাঠানো হয়। কিন্তু আমরা তার কোন ইংরাজী কিংবা বাংলা কপি পুরোনো নেতৃত্বের থেকে পাইনি। বর্তমান অনুবাদটি আমরা মাত্র গতকাল পেয়েছি। তাই কয়েকমাস আগেকার এই লেখাটি দেরিতে প্রকাশ করা হল। পুরোনো প্রাদেশিক কমিটির নিকট প্রেরিত কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠি সম্পর্কে অতি সামান্য কয়টি লেখামাত্র আমরা পেয়েছি। বাকি সব লেখা এখনও ঘটনাচক্রে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তাই পুরোনো প্রাদেশিক কমিটির নিকট যারা লেখা পাঠিয়েছিলেন তাঁদের হয়ত আবার নতুন করে লেখা (বাংলায়) পাঠানো দরকার হতে পারে। কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠির উপর পুরোনো প্রাদেশিক কমিটির নিকট প্রেরিত যে সমস্ত লেখা আমাদের হাতে এসেছে তার প্রায় সবকয়টিই ইতিমধ্যেই ছাপানো হয়ে গিয়েছে। সুতরাং কোন লেখা আমাদের হাতে এখন পর্যন্ত আসেনি তা সহজেই সংশ্লিষ্ট পার্টি ইউনিট বা কমরেড অনুমান করে নিতে পারেন।

২৯শে অক্টোবর '৫০, সম্পাদক প্রাদেশিক পার্টি আলোচনা।]

পার্টির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের উৎকণ্ঠা ঘোচানো ত দূরে থাকুক, এই চিঠি আমাদের উদ্বেগ বাড়িয়েই দিয়েছে, আমাদের আশাভঙ্গ করেছে। ২৭শে জানুয়ারী লাষ্টিং পীসের সম্পাদকীয় প্রকাশিত হবার পর থেকে পার্টি বিশৃঙ্খলার পাঁকে ডুবেছিল, নতুন লাইনের তাৎপর্য ধরতে পি-বি পরিষ্কার অপরাগ হওয়ায় সাধারণ সভ্যরা পি-বি ও তার নির্বাচিত কমিটিগুলির উপর আস্থা হারিয়ে ফেললেন; এই অবস্থায় তাঁরা দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে নির্বাচিত সি-সি'র দিকে উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে ছিলেন, তাদের আশা ছিল খুব সম্ভব সি-সি পার্টিকে উদ্ধার করে আবার সঠিক পথে নিয়ে আসবে।

কিন্তু সি-সি'র চিঠি এটি পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি রাজনীতিতে নিজেদের বামপন্থী গোঁড়ামী মুছে ফেলতে সক্ষম হয়নি। তাঁদের সাংগঠনিক সিদ্ধান্তগুলি থেকেও দেখা যাচ্ছে যে পুরোনো আমলাতান্ত্রিক মনোভাব এখনও বর্তমান; সাধারণ সভ্যদের দাবি ও হৃদয়াবেগের প্রতি কান দেওয়া হয়নি।

রাজনৈতিক লাইন— এই চিঠিতে যে রাজনৈতিক লাইন দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে পরিষ্কার নতুন বোতলে পুরান মদ। এই চিঠি পড়লে ধারণা হয় যে আমরা শহরে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলাম এবং গ্রামাঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে ঐ সংঘর্ষ করিনি—এই মাত্রই যেন আমাদের ভুল হয়েছিল।

এ কথা কেউ অস্বীকার করে না যে, "ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সব চাইতে কার্যকরী রূপ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ" (১৯শে মে'র লাষ্টিং পীস)। কিন্তু এই সাথে আমাদের কমিনফর্ম ব্যুরোর এই নির্দেশও পড়তে হবে—যখন প্রয়োজনীয় অবস্থাগুলি অনুকূল হবে, তখন জনগণের মুক্তিফৌজ গড়তে হবে। (বড় হরফ আমাদের) ভারতের বিভিন্ন অংশে জনগণের রাজনৈতিক চেতনার অসম বিকাশ না দেখা, জনসাধারণের সমর্থনের পরিমাণ বিচার না করা, জাতীয় সংযুক্ত মোর্চায় প্রলিটারিয়েটের প্রাধান্য প্রকৃতই প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে কিনা সেকথা বিচার না

করেই "সামান্য কয়েকটি জায়গা ছাড়া" সারা ভারতেই আমরা সশস্ত্র সংগ্রামের পথে চলতে পারি—এ কথা মনে করা আগেকার বামপন্থী দুঃসাহসিকতার লাইন ছাড়া আর কিছুই নয়।

সি-সি'র উচিত ছিল—সশস্ত্র সংগ্রামই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সব চাইতে কার্যকরী পথ—এই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে, যাতে যত কম সময়ের মধ্যে সম্ভব সারা ভারতে গেরিলা প্রতিরোধ প্রসারিত করা যায় তার জন্য অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য উদ্দীপনাময় আহ্বান জানান। এই অবস্থাগুলি কি সে কথা লি-সাউ-চি চীনের পথ সম্পর্কে যে সাধারণ সূত্র দিয়েছেন তাতে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে—

(১) "অন্য যে সব শ্রেণি, পার্টি, গ্রুপ, সংগঠন ও ব্যক্তিবিশেষ, সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহীদের অত্যাচারের বিরোধিতা করতে ইচ্ছুক, শ্রমিকশ্রেণিকে বিস্তৃত জাতীয় মোর্চা গঠন করার জন্য এদের সবার সাথেই মিলিত হতে হবেই এবং সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহীদের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম চালাতে প্রস্তুত হতে হবে।

(২) "এই জাতীয় সংযুক্ত মোর্চাকে শ্রমিকশ্রেণির—যে শ্রমিকশ্রেণিই সব চাইতে দৃঢ় সংকল্প, সাহস ও আত্মত্যাগের সাথে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করে থাকে—সেই শ্রমিক শ্রেণির এবং তার রাজনৈতিক পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত হতেই হবে। শ্রমিক শ্রেণি এবং কমিউনিস্ট পার্টি—উভয়কেই এই মোর্চার প্রাণকেন্দ্র হ'তে হবেই।

(৩) "শ্রমিক শ্রেণি আর তার রাজনৈতিক পার্টি—কমিউনিস্ট পার্টি যাতে সকল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিগুলিকে মিলিত করতে সমর্থ হয়, এই জাতীয় মোর্চাকে সাফল্যের সাথে জয়ের পথে নিয়ে যেতে পারে তার জন্য মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ তত্ত্বে অভিজ্ঞ, রণনীতি রণকৌশলে নিপুণ, আত্মসমালোচনা ও কঠোর শৃঙ্খলা ব্যবহারকারী এবং জনসাধারণের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার জন্য ধৈর্যের সাথে সংগ্রাম চালান দরকার।

(৪) "যখনই সেখানে সম্ভবপর হবে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শক্তিশালী ও শত্রুর সাথে সংগ্রামে দক্ষ মুক্তিফৌজ গড়ে তুলতে হবে। সাথে সাথে এই ফৌজের পরিচালনার জন্য শক্ত ঘাঁটি তৈরি করতে হবে; সশস্ত্র সংগ্রামের সাথে শত্রু অধিকৃত এলাকার জনসাধারণের সংগ্রামগুলির সমন্বয় সাধন করতে হবে। অধিকন্তু, সশস্ত্র সংগ্রামই হচ্ছে অনেকগুলি উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশ দেশে সংগ্রামের প্রধান রূপ।"

কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠি শুধু এই কথাই বলে না, এমন কি যারা পূর্ব শর্ত সৃষ্টি করার কথা বলেছেন তাঁদের এই কথা বলে উপহাস করা হয়েছে—"আর এক অংশের কমরেডরা মৌখিকভাবে চীনের পথকে স্বীকার করে নিয়ে এইভাবে যুক্তি দেন যে কতকগুলি এলাকা ছাড়া সব জায়গায় সশস্ত্র গেরিলা সংগ্রাম চালাবার মত অবস্থা ওঠেনি এবং প্রচারের দ্বারা জনসাধারণের ঐক্য গঠন করে বেশির ভাগ জনসাধারণকে পক্ষে এনে প্রথম পূর্ব শর্তগুলি ধীরে ধীরে সৃষ্টি করতে হবে। তারপর একদিন সুন্দর প্রভাতে ইত্যাদি ইত্যাদি ......।"

"ধীরে ধীরে পূর্ব শর্তগুলি সৃষ্টি করতে হবে" "প্রচারের দ্বারা জনসাধারণের ঐক্য গঠন করে" "একদিন সুন্দর প্রভাতে ইত্যাদি..."—এইভাবে প্রকাশ করে যদিও এই সমস্ত কমরেডদের মতকে বিকৃত করবার চেষ্টা করা হয়েছে তবুও আমাদের মনে হয় যে গত দুবছর ধরে আমরা যেভাবে অতি বিপ্লবী পন্থায় চলেছি সেই কথা মনে রাখলে এই সমস্ত কমরেডদের সাবধানবাণী ন্যায়সঙ্গত।

এর কোন প্রয়োজন নেই যে পূর্ব শর্তগুলি "ধীরে ধীরে" তৈরি করতে হবে। বর্তমানে যে রকম অনুকূল অবস্থা রয়েছে তাতে অনেক জায়গাতেই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রয়োজনীয় পূর্ব শর্তগুলি তৈরি করা যেতে পারে। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে এই যে এই কর্তব্যকে এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। জয়লাভ করার কোন সংক্ষিপ্ত পথ নেই (Short Cut)। এই সমস্ত কর্তব্যকে এতকাল অবহেলা করেছি এবং সেই জন্যই আমরা পেছিয়ে পড়েছি। দশ বছর ধরে সংস্কারবাদী ভুল এবং গত দু বছর ধরে অতি বিপ্লবী ভুল যদি আমরা না করতাম তাহলে এতদিনে আমরা বর্মা, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশকে নিশ্চয়ই ছাড়িয়ে যেতাম। যদি আজও আমরা এই কর্তব্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করি এবং কেবল সশস্ত্র সংগ্রামের বুলি কপচাই তাহলে আর দু বছর পরে আমাদের অবস্থা আরও কাহিল হয়ে দাঁড়াবে।

একথাও আমরা বলছি না যে কেবল প্রচারের মধ্য দিয়েই জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য গঠন করতে হবে। রাশিয়ার বলশেভিক পার্টি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আহ্বান দিয়াছিল ১৯১৭ সালে নভেম্বর মাসে। এর মানে এই নয় যে পূর্বের বৎসরগুলিতে তাঁরা কেবল প্রচারের দ্বারা ঐক্য গঠন করেছিলেন। জনসাধারণকে তাদের নিজেদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বৈপ্লবিক অবস্থানে (Position) নিয়ে যাবার যে পথ সেই খাঁটি লেনিনবাদী পথ তাঁরা অনুসরণ করেছিলেন। জনসাধারণকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত করার পূর্বে প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠানগুলিতে (যেগুলি সাময়িকভাবে জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল) অংশ গ্রহণ করা, প্রতিক্রিয়াশীল ডুমায় যোগ দেওয়া প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে স্ট্রাইকের সংগ্রাম, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ পর্যন্ত সমস্ত ধরনের সংগ্রাম তাঁদের চালাতে হয়েছিল। আজিকার দিনেও জনসাধারণের অসংখ্য দৈনন্দিন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আমাদের ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। তার মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ পর্যন্তও অগ্রসর হতে পারে। কিন্তু সেগুলি এবং সশস্ত্র গেরিলা প্রতিরোধ এক জিনিস নয়।

অপরদিকে কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠিতে এমন কতকগুলি সিদ্ধান্ত আছে যেগুলিকে সন্ত্রাসবাদী ও অতি বিপ্লবী কাজ করার আহ্বান বলে ধরা যেতে পারে। উদাহরণ হিসাবে দেখুন—"বেশির ভাগ জনসাধারণ নিজেরাই রাস্তায় বেরিয়ে আসছে কিনা এবং পার্টির রাজনৈতিক প্রোগ্রাম সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করছে কিনা ইত্যাদি—জনসাধারণের সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি (readiness) বিচার করার এই পুরাতন মাপকাঠি আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে। এই বিষয়টিতে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে জনসাধারণের সাধারণ সমর্থনের উপর ভিত্তি করেই ফ্যাসিষ্ট সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমাদের গেরিলা প্রতিরোধ শুরু করতে হবে।" এবং আবার "...কংগ্রেস সরকারের এবং রক্তচোষাদের শ্বেত বিভীষিকার বিরুদ্ধে আমাদের যে কোন অংশ থেকে যে কোনও প্রতিরোধ জনসাধারণের ব্যাপক অংশের স্বতঃপ্রবৃত্ত সহানুভূতির সৃষ্টি করবে।"

আমরা জানি "যে কোন প্রতিরোধ" স্বতঃপ্রবৃত্ত সহানুভূতির সৃষ্টি করে এই ধরনের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করেই কলকাতার পথে পথে এবং পশ্চিমবাংলার অন্যান্য অঞ্চলে প্রকাশ্য এবং নির্লজ্জ সন্ত্রাসবাদ চালানো হয়েছে। সেইজন্য এই ধরনের সিদ্ধান্ত আমাদের মনে ভীষণ সন্দেহের সৃষ্টি না করে পারে না।

এই সূত্রে সংগ্রামের ধরন সম্বন্ধে লেনিনের "পার্টিজান ওয়ারফেয়ার" থেকে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি উপযুক্ত বলে মনে হয়—"সংগ্রামের ধরন সম্বন্ধে বিচার করতে গিয়ে প্রত্যেক মার্ক্সবাদী

কি কি মূল জিনিস চাইবে? প্রথম কথা হচ্ছে, প্রাচীন সমাজতন্ত্রবাদ থেকে মার্ক্সবাদ এই কারণে বিভিন্ন যে মার্ক্সবাদ কখনও আন্দোলনকে একটি বিশেষ ধরনের সংগ্রামের সাথে বেঁধে দেয় না। মার্ক্সবাদ সংগ্রামের বিভিন্ন রকমের ধরনকে স্বীকার করে। মার্ক্সবাদ সাজায় না (Concoct) বরং বিপ্লবী শ্রেণির আন্দোলনের গতির মধ্যে দিয়েই সংগ্রামের যে সমস্ত ধরন ফুটে ওঠে মার্ক্সবাদ তারই সাধারণ সূত্র বার করে এবং তাকেই সংগঠিত করে সচেতন রূপ দেয়।" এর সঙ্গে তুলনা করুন কেন্দ্রীয় কমিটির বক্তব্য যাতে বলেছে জনসাধারণ কার্যত কি করেছে বা কি করতে চাইছে একথা বিবেচনা না করেই "সাধারণ সমর্থনের" উপর সশস্ত্র গেরিলা প্রতিরোধ চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা।

এই চিঠিতে যে পীড়াদায়ক (Sickening) আত্মসন্তুষ্টির ভাব ফুটে উঠেছে তা আরো মারাত্মক। আমরা জানি যে আত্মকেন্দ্রিক (Subjectivism) মনোভাবে বাস্তব অবস্থাকে নির্ভুলভাবে পরিমাপ করার অক্ষমতার মধ্যেই গলদের অন্যতম মূল কারণ রয়ে গেছে। নীচের উদ্ধৃত সিদ্ধান্তের (Formulation) মধ্যে থেকে এখনও সেই একই জিনিস বেরিয়ে এসেছে।

"এই কয়েক বছরের কংগ্রেসী রাম রাজত্ব জনসাধারণের কাছে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এ সরকার জনগণের সরকার নয়, এটা রক্তচোষাদের সরকার, কংগ্রেস তাদের কপাল ফিরিয়ে দেবে অতীতের এ মোহ তাদের একেবারে চুরমার হয়ে গেছে। ...প্রধানত বেয়নেটের জোরেই আজ কংগ্রেস সরকার তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। জনগণ এই শয়তানী রাজের অবসান চায়।" এই সিদ্ধান্তেই আবার বলা হয়েছে—"(সশস্ত্র গেরিলা আক্রমণের জন্য) মূল প্রাথমিক অবস্থা (Pre-Condition) যা দরকার অর্থাৎ শাসন ক্ষমতাকে খতম করার জন্য জনগণের আকাঙ্ক্ষা এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জনসাধারণের একটা মোটা অংশ বিপ্লবের পথে পা বাড়িয়েছে তা ইতিমধ্যেই উপস্থিত হয়েছে"। [বড় হরফ আমাদের।]

"কংগ্রেস সরকার যে রক্তচোষাদের হাতের পুতুল (Tool) এটা সমগ্র জনসাধারণের সামনে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে, এমন কি তাদের নিজেদের অনুগামীদের কাছেও পরিষ্কার হয়ে পড়েছে। জনসাধারণ সশস্ত্র সংগ্রামের পথে এখনও নামেনি, তাদের মনে এখনও নিয়মতান্ত্রিকতার মোহ আছে বটে কিন্তু তারা এই ফ্যাসিষ্ট সরকারের পতন চায়। কোন শক্তি সাহসের সাথে তাদের পরিচালনা করতে পারলেই হয়, সশস্ত্র সংগ্রামের পথে বাড়ান কেবল সামান্য সময়ের অপেক্ষা মাত্র। আমাদের ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টি জনসাধারণের সামনে মেহনতী জনগণের স্বার্থে আপসহীন নির্ভীক যোদ্ধার মত দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে বিরাট প্রভাব রয়েছে এবং তাদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে (Enjoys)।

এখন যদি স্বীকার করে নিই যে কংগ্রেস রাজ সম্পর্কে জনসাধারণের ব্যাপকভাবে মোহমুক্তি ঘটেছে তা হলেও প্রশ্ন থাকে—সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালদের বিরোধী সমস্ত সংগঠন দল ও শ্রেণি প্রভৃতির উপর কি কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণি নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে? "ব্যাপক প্রভাব ও সম্মান" এইটি যদি সত্যই হয়, তাহলেও জনগণের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত গণসংগঠন ও গণ পার্টির বিকল্প হিসাবে কি "ব্যাপক প্রভাব ও সম্মানকে গ্রহণ করা যায়? শ্রমিক শ্রেণি ও তার অগ্রগামী দল কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা অত সোজা জিনিস নয়। লি-সাও-চি বলেছেন "শ্রমিক শ্রেণির পক্ষে গোটা জাতির নেতা হওয়া অবশ্যই খুব সোজা কথা নয়। তার মানে হল পার্টিকে সমস্ত প্রয়োজনীয় গুণাবলীর

অধিকারী হতে হবে, যার প্রথমটি হল মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের নীতি সম্পর্কে পুরাপুরি পোক্ত হওয়া; বিপ্লবী রণনীতি রণকৌশল সম্পর্কে জ্ঞান এবং পরিবেশের (Environment) সঙ্গে সম্যক (Profound) পরিচয়; তবেই পার্টি কর্মসূচী, শ্লোগান এবং সংগ্রাম ও সংগঠনের কায়দা (Form) সঠিকভাবে বাতলাতে সক্ষম হবে এবং জনগণের বিপ্লবী লড়াইয়ের বিভিন্ন পর্যায়গুলি পরস্পরের সাথে যোজনা (Co-ordinate) করতে পারবে। একই সঙ্গে জনগণের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত থেকে আত্মসমালোচনা ও কঠোর শৃঙ্খলা প্রয়োগ করেই (Practising) পার্টি জনগণের ব্যাপক অংশকে বাস্তব সংগ্রাম করতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে এবং সংগ্রামের ভিতর তাদের মধ্যে সংগঠন ও শৃঙ্খলার চেতনা দিতে সক্ষম হবে।"

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ আমাদের শিখিয়েছে বিপ্লব সফল করার জন্য বাস্তব অবস্থা পরিপক্ক হওয়াই যথেষ্ট নয়। সাংগঠনিক দিকটাও (Subjective factor) অর্থাৎ পার্টি এবং তার নেতৃত্বে গণসংগঠনও জরুরি প্রয়োজন। গণসংগঠন গড়ে তোলা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠি এরকম কিছু বলেন নি বললেই হয় (Practically nothing)।

সমস্ত নজরটাই (Reliance) প্রায় স্বতঃস্ফূর্ততা এবং সাধারণ সমর্থনের উপর ফেলা হয়েছে। পার্টি যে আজ ঐক্যবদ্ধ নয় এ সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই—বিরাট জনসাধারণ পার্টি নেতৃত্ব এখন স্বীকার করে না এবং যা কিছু গণসংগঠন আমরা গড়ে তুলেছিলাম তাও দু'বছরের বামপন্থী সংকীর্ণতার ফলে আজ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

সব থেকে আজ যা জরুরি—শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে পার্টি আজ কোন জায়গায় তা অনুসন্ধান (See) করা প্রয়োজন। আত্মপ্রবঞ্চনা করা বা ঘটনার প্রতি চোখ বুজিয়া থাকবার দরকার কি? ভারতীয় ইউনিয়নে অন্যতম শিল্পোন্নত পশ্চিমবাংলা সম্পর্কে আমরা দৃঢ় বিশ্বাসে (Definiteness) বলতে পারি যে এখানে যা কিছু সামান্য গণভিত্তির ঘাটি ছিল তাও আমাদের ভুল রাজনীতির জন্য ধ্বংস হয়ে গেছে। যদিও জনগণ দ্রুত মোহমুক্ত হচ্ছে তবুও কিছু কিছু জায়গায় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সংগঠিত অনুগামী (Follower) আছে। অথচ শ্রমিকশ্রেণিকেই সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে এবং পরিচালনা করতে হবে। লি লি-সান তাঁর রিপোর্টে কি বলছেন লক্ষ্য করুন ঃ

'চীনের শ্রমিকশ্রেণি কি করে বিপ্লবে সাফল্যের সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়েছে তার তৃতীয় এবং সব চাইতে মৌলিক কারণই হচ্ছে যে চীন দেশের শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনে বরাবরি কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে।" এ বিষয়ে আমাদের একবার বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে দেখা দরকার এবং সোজাসুজি স্বীকার করা দরকার যে, সমগ্র জাতির কথাতো ছেড়েই দিলাম শ্রমিক শ্রেণির মধ্যেও সে স্থান অর্জন করার কাছ থেকে অনেক আমরা দূরে। একথা সত্য যে জনসাধারণের মধ্যে মোহমুক্তি ঘটছে এবং কংগ্রেসের উপর থেকে জনসাধারণের সকল আস্থা চলে যাচ্ছে।

কিন্তু এটাও আমাদের দেখা প্রয়োজন কোন পথে তারা চলে যাচ্ছে। কংগ্রেস ছেড়ে যাঁরা চলে যাচ্ছেন তাদের মধ্যে অনেকেই "বিশুদ্ধ গান্ধীবাদকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে" এই আওয়াজ তুলেছেন। সোশ্যালিস্ট পার্টিও সোজাসুজি ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালালের কাজ করছে এবং এরাই জনসাধারণের কাছে গান্ধীবাদ প্রচার করে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে। ভারতের কৃষক জনসাধারণের এক বিরাট অংশ এমন কি শ্রমিক শ্রেণির কোন কোন অংশের উপর যে গান্ধীবাদের গভীর প্রভাব রয়েছে একথা ডিয়াকভ ও অন্যান্যেরা উল্লেখ করেছেন।

জনসাধারণের এই স্বতঃস্ফূর্ত মোহমুক্তির উপর খুব বেশি ভরসা করা উচিৎ নয়, যদি না আমরা এই মোহমুক্ত জনসাধারণকে আমাদের প্রভাবে আনতে পারি। সঠিক নেতৃত্বের অভাবে এই মোহমুক্ত জনসাধারণ প্রায়ই চরম প্রতিক্রিয়ার হাতের যন্ত্রে পরিণত হতে পারে। ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দেয়, হিটলারবাদের আর্বিভাব আমরা দেখেছি। আমাদের দেশেও গত কয়েক বছরের এই অভিজ্ঞতাই আমাদের সামনে রয়েছে—জনসাধারণের কংগ্রেস বিরোধী মনোভাবকে বারে বারে সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীলরা কাজে লাগিয়েছে।

সি-সি'র এই চিঠিতে বাস্তবতার অভাব, স্বতস্ফূর্ততার উপর নির্ভরশীল হওয়া, সংগঠনের কাজকে ছোট করে দেখা এবং দুঃসাহসী কাজের পথ খুলে যায় এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় আর একবার এই কথাই প্রমাণ করে যে—এখনও গত দু'বছরের ভুল, সাধারণ কর্মীদের অভিমত (Suggestion) এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতাদের লেখা থেকে আমাদের নেতারা উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি। জনসাধারণের মোহমুক্তি সম্পর্কে আমাদের একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে যে এই সরকার যে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল—এই গোড়ার কথাটা আমাদের দেশের জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ এখনও বুঝতে পারেনি। এমনকি বর্তমান সরকারের উপরই যারা অসন্তুষ্ট তাদের সকলেই একথাটা পরিষ্কার বোঝে না। এমন কি এই সেদিন পর্যন্তও কমিউনিস্ট পার্টি এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল না—একমাত্র কমিনফর্মের সম্পাদকীয় আমাদের এই বিষয়ে চোখ খুলে দিয়েছে। এই যদি হয় সবচাইতে অগ্রণী অংশের অবস্থা তাহলে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে জনসাধারণ আজ কোথায়।

এইসব কারণেই "দিগন্তে রাঙ্গা প্রভাতের সূচনা দেখা দেওয়ার" কথাকে অবাস্তব এবং নেহাৎ মনকে বুঝ দেওয়া বলে মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে এই কথাও বলা প্রয়োজন যে আমরা নিঃসন্দেহে মনে করি যে তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রের সশস্ত্র লড়াই একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। এবিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ একমত যে এ রাস্তাই আমাদের অনুসরণ করতে হবে এবং সঠিকনীতি গ্রহণ করলে আমরা অল্পদিনের মধ্যেই একটির জায়গায় একাধিক (Several) তেলেঙ্গানা, তৈরি করতে পারব। কিন্তু আমরা ইতিমধ্যে করণীয় কাজগুলিকে মোটেই ছোট দেখতে চাইনা।

তেলেঙ্গানা, ময়মনসিংহের পাহাড়ী এলাকা ইত্যাদি সম্পর্কে আসল অবস্থার একটা বাস্তব বিবরণ (রিপোর্ট) আজও আমাদের কাছে প্রচার করা হোল না। এর ফলে এইসব এলাকার আন্দোলনের অমূল্য অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার সম্ভাবনা থেকে এখনও আমরা বঞ্চিত। এই সঙ্গে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে—সশস্ত্র লড়াইয়ের পর্যালোচনা যখন করা হবে—তখন কাকদ্বীপের অভিজ্ঞতা থেকেও যেন আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি—এই কাকদ্বীপকেই না একদিন পার্টি পত্রিকায় বড় গলায় প্রচার করা হয়েছিল যে এখানে জনসাধারণের গণতন্ত্রী রাষ্ট্র কায়েম হতে চলেছে।

গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তোলা সম্পর্কে

এখানে আমরা সি-সি সিদ্ধান্তের সংকীর্ণতার পরিচয় পাই "সংযুক্ত ফ্রন্ট গড়ে উঠবে—ঐক্যের জন্য লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে। ... এবং এই ফ্রন্ট গড়ার সবচাইতে কার্যকরী পথই হচ্ছে—নীচে থেকে ঐক্য গড়ে তোলা।" এই ধরনের সিদ্ধান্ত পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাবেও বলা

হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা কেন ভুল পথে চললাম? আমরা যে ভুল করেছিলাম তার কারণ আমরা অন্যের সঙ্গে ঐক্য গড়ার চেয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার দিকে বেশি করে জোর দিয়েছিলাম। এই প্রসঙ্গে জাতীয় বুর্জোয়ার সঙ্গে মিতালী গড়ে তোলা সম্পর্কে লি-লি সানের বক্তব্য তুলনা করা যেতে পারে : "চীনের শ্রমিক শ্রেণি সংযুক্ত ফ্রন্ট গড়ে তুলতে পেরেছিল তার কারণ চীন দেশে জাতীয় বুর্জোয়ার সঙ্গে ঐক্য গড়ে তোলার নীতি তারা সঠিকভাবে গ্রহণ করেছিল—সে নীতি হল—একই সঙ্গে দুটোই অর্থাৎ জাতীয় বুর্জোয়ার সঙ্গে ঐক্য গড়ে তোলা এবং লড়াই চালিয়ে যাওয়া কিন্তু প্রধানত ঐক্যই গড়ে তোলার নীতি।"

শুধুমাত্র বিভিন্ন "ইস্যুর" ভিত্তিতে নয়, একটা সাধারণ গণতান্ত্রিক প্রোগ্রামের ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদারদের বিরোধী সমস্ত প্রতিষ্ঠান, পার্টি, দল ও ব্যক্তি নিয়ে সংযুক্ত মোর্চা গঠন করার কাজে কমিউনিস্ট পার্টিকে উদ্যোগী হতে হবে। কেন্দ্রীয় কমিটি স্বীকার করবেন এবং স্বীকার করছেনও যে এই ধরনের বহু প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরাট জনসাধারণ আছেন যাঁরা মূলত সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বড় বুর্জোয়া বিরোধী। তবুও তাদের সঙ্গে সাধারণ ফ্রন্ট গড়ে তোলার কাজে অগ্রণী হতে এই ইতস্তত ভাব কেন? এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে (Organisation) আমাদের নেতৃত্ব সহজেই কায়েম হবে কারণ একমাত্র আমাদেরই সঠিক রণনীতি ও রণকৌশল আছে এবং সমস্ত পার্টিগুলির মধ্যে একমাত্র আমরাই অবিচলিত বিপ্লবী।

এই কাজকে ছোট করে দেখা এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তলা থেকে ঐক্য গড়ে তোলার উপর সমস্ত জোর দেওয়ার অর্থ হচ্ছে সংকীর্ণতাকে আবার প্রশ্রয় দেবার পথ খুলে রাখা। তলায় সংগ্রাম করে উপরের ঐক্যকে সুদৃঢ় করার বা দৈনন্দিন কার্যকলাপ এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সুবিধাবাদী নেতৃত্বের মুখোশ খুলে দেবার গুরুত্বকে আমরা অস্বীকার করছি না। কিন্তু আমাদের সংকীর্ণতাবাদী নীতির কথা মনে রেখে আসল জোর আজকে দিতে হবে ঐক্য গড়ে তোলার উপর—আমাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার উপর নয়।

সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্ব কার্যকরী করার প্রশ্ন

মজুর শ্রেণির নেতৃত্বকে দৈহিক (সংগ্রামে দৈহিক অংশ গ্রহণ করা) ও রাজনৈতিক এইরূপ ২টি সম্পর্কহীন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অংশে ভাগ করার চেষ্টা এবং এই উপনিবেশ দেশে মজুর শ্রেণি সংগ্রামে নিজে প্রত্যক্ষ দৈহিক অংশ গ্রহণ না করেই মজুর শ্রেণির নেতৃত্ব কার্যকরী করবে একথা বলা 'চীনের পথ'কে শুধু অতি সহজ করে নেওয়াই নয় বিকৃত করাও বটে। এমন কি চীনেও সশস্ত্র গেরিলা লড়াইয়ের পেছনে সংগঠিত মজুর শ্রেণির দৃঢ় সমর্থন সব সময়েই ছিল। এই সমর্থন না থাকলে গেরিলা লড়াই টিকে থাকতে পারতো না। ট্রেড ইউনিয়নের সাহসী কর্মীরা ক্রমাগত গ্রামের গেরিলা যোদ্ধাদের দল বৃদ্ধি করতেন এবং প্রত্যক্ষ (Physical) নেতৃত্ব দিতেন। সশস্ত্র গেরিলাদের এবং মুক্তিফৌজকে নানাভাবে মজুর শ্রেণি সাহায্য করছে এইরূপ বহু উদাহরণ ইন্দোনেশিয়া, বর্মা, ভিয়েৎনামের মত দেশগুলিতে আমরা পাই। ব্যাপক মজুর আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সমর্থন ছাড়া কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কথা বলা রামকে বাদ দিয়ে রামায়ণের মতই দাঁড়ায়। এছাড়াও, ভারতবর্ষের মত দেশে—যেখানে অন্যান্য উপনিবেশ দেশের চাইতে মজুরের সংখ্যা অনেক বেশি—সেখানে মজুর শ্রেণির ভূমিকা নিশ্চয়ই যথেষ্ট পরিমাণে থাকবে যদিও মূলত চীনের পথই অনুসরণ করতে হবে।

শান্তি আন্দোলন

যদিও সি-সি'র পত্রে এই বিষয়ে অনেক সঠিক সিদ্ধান্ত আছে তবুও আমাদের মনে হয় শান্তি আন্দোলনের ভূমিকার উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়নি বিশেষ করে শহরে।

বিশ্বশান্তি ফ্রন্টে ঔপনিবেশিক দেশের প্রধান অবদান যেমন মুক্তি সংগ্রামকে তীব্রতর করা তেমনি একথাও তুলে ধরা দরকার যে সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে জনগণের ব্যাপকতম অংশকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে শান্তি আন্দোলন আমাদের হাতে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। বর্তমান সরকারের গোলামী চরিত্র এবং এই সরকার যে সম্পূর্ণ ভাবে ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধজোটের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে তা ফাঁস করে দেবার জন্য আমাদের সামনে যেসব মোক্ষম উপায় আছে শান্তি সংগ্রাম তার মধ্যে একটি।

কাশ্মীর ও পাখতুনীস্থানের প্রশ্ন

আজকের দিনে ভারত সম্বন্ধে যে কোন রাজনৈতিক প্রস্তাবে দেশের জনসাধারণের সামনে যে দুটি বড় প্রশ্ন এসেছে অর্থাৎ পাখতুনীস্থান আন্দোলন এবং কাশ্মীর সমস্যা সেই সম্বন্ধেও আলোচনা থাকা উচিৎ। যদিও আজ পাঠানদের স্বাধীনতার প্রেরণার সুযোগ নিয়ে কোন কোন মহল স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় আছে তবুও আমাদের মনে হয় আজাদ পাখতুনীস্থানের আন্দোলনকে আমাদের সমর্থন করা উচিৎ। এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করলে এবং একে সঠিক রূপ দেওয়া ও ঠিক পথে পরিচালনার উদ্যোগ নিলে আমরা সরল পাঠানদের প্রতিক্রিয়াশীল সর্দার এবং তার পেছনে যে সাম্রাজ্যবাদীরা রয়েছে তাদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারব।

অনুরূপ কারণে আমরা মনে করি যে স্বাধীন কাশ্মীর গঠনের দাবি জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। অবশ্য পাকিস্তানের শাসকশ্রেণী যে আজাদ কাশ্মীর সরকার স্থাপন করেছে তার সঙ্গে আমাদের তফাৎ কোথায় তা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে হবে।

সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত

সংগঠন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি সাধারণ কর্মীদের হতাশ করবে এবং নিম্নোক্ত কারণে এই সিদ্ধান্তগুলি বর্তমান অবস্থার প্রয়োজন মিটাবার পক্ষে সম্পূর্ণভাবে অসন্তোষজনক বলে পরিগণিত হবেই।

(ক) পুনর্গঠন বিষয়ে প্রদেশগুলির মতামত জানবার কোন চেষ্টাই করা হয়নি।

(খ) যদিও কোন কোন পুরোনো পি-বি সভ্যের ঘাড়ে দোষ চাপান হয়েছে (Scape Goat) তবুও যেভাবে অদল বদল করা হয়েছে তা থেকে পুরোনো নেতৃত্ব খিড়কীর দুয়ার দিয়ে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটিকে পরিচালনা করতে থাকবেন এই সন্দেহ করবার অবকাশ আছে।

(গ) নতুন কেন্দ্রীয় কমিটিতে বাংলার একজন সভ্য আছেন যিনি আগে পি-বি সভ্য ছিলেন। সমস্ত ঘটনাবলী থেকে দেখা যায় যে তিনজন কমরেড পুরোনো পি-বি'র দিগ্‌ বিদিক জ্ঞানশূন্য দুঃসাহসিক নীতির জন্য দায়ি ইনি তাঁদের একজন এবং বাংলাদেশে যে তুর্কীপন্থী হুকুমৎ স্থাপন করা হয়েছিল এবং এই প্রদেশে যে সন্ত্রাসবাদী রাস্তা অনুসরণ করা হয়েছিল তারজন্য ইনিই মুখ্যত দায়ি।

(ঘ) ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নেতৃত্বে এসেছেন এমন একজন সদস্যও নতুন পি-বি'তে নেই। এই থেকেই বুঝা যায় যে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি মজুর শ্রেণির ভূমিকা সম্পূর্ণ ভুলভাবে বুঝেছেন।

নতুন পি-বি'তে আসামের একজন সদস্য আছেন। এঁকে নেওয়ার বিশেষ যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয় না। আসামে তাঁর নেতৃত্বে এমন কোন গণ-আন্দোলন হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই যা থেকে তাঁকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উচ্চতম কমিটিতে নেওয়ার সমর্থন পাওয়া যায়।

(ঙ) ভারতের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে পাকিস্তান পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সংগঠনের নীতির সঙ্গে খাপ খায় না।

(চ) পুরোনো কেন্দ্রীয় কমিটির যে দুইজন সদস্যকে নগণ্য কারণে ও গঠনতন্ত্র বিরোধীভাবে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে পুরোনো পি-বি সরিয়ে দেন তাঁদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় কেন ডাকা হয়নি তার কৈফিয়ৎ নিশ্চয়ই দেওয়া উচিত।

(ছ) পি-বি ও সি-সি সদস্যদের আত্মসমালোচনা সাধারণ সভ্যদের মধ্যে প্রচার না করার সিদ্ধান্তের মধ্যে আমলাতন্ত্রের গন্ধ ও সাধারণ কর্মীদের বিশ্বাস করতে নারাজ হওয়ার মনোভাব পাওয়া যাচ্ছে। এই সমস্ত আত্মসমালোচনার রিপোর্ট প্রচার না করা হলে নতুন নেতৃত্ব গড়ে তোলার কাজে সাধারণ কর্মীদের অংশ গ্রহণ করা অসম্ভব। এর দ্বারা এই অত্যাবশ্যকীয় কাজে পার্টির সাধারণ সভ্যদের সাহায্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করার মনোবৃত্তিই প্রকাশ পাচ্ছে।

(জ) নতুন পথ বের করা এবং নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন করার জন্য পার্টি কংগ্রেস বা পার্টি কনফারেন্স ডাকতে অস্বীকার করার অর্থ কেন্দ্রীয় কমিটি সাধারণ কর্মীদের মতামতে কান দিতে রাজি নয়।

(ঝ) পুরোনো পি-বি দ্বারা মনোনীত প্রাদেশিক কমিটিগুলি তলা থেকে নির্বাচন করে (উপরের তত্ত্বাবধানে) পুনর্গঠন করার সিদ্ধান্ত না হওয়ায় বিভেদপন্থীদের অবাধ সুযোগের রাস্তা খোলাই থেকে যাবে। সাধারণ কর্মীদের আস্থাভাজন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নেতৃত্ব না থাকলে আমাদের পার্টি ও জনগণের সামনে যে সংকটাপন্ন পরিস্থিতি রয়েছে তাকে কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব হবে। সুতরাং আমরা প্রস্তাব করছি যে আগামী তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে পার্টি কংগ্রেস বা পার্টি কনফারেন্স ডাকার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা করা হোক। পার্টি কংগ্রেস বা কনফারেন্সের ডেলিগেটরা সাধারণ কর্মীদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। বে-আইনি অবস্থার জন্য ডেলিগেট সংখ্যা খুব কম হওয়া চলতে পারে। বে-আইনি অবস্থার জন্য এই ধরনের ব্যবস্থা করা যাবে না—একথা আমরা মানতে রাজি নই। কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভা (Plenum) হলেও সমস্ত প্রদেশের প্রতিনিধিদের একসঙ্গেই তো বসতে হবে? প্রায় সেই একই সংখ্যক কমরেড নির্বাচিত ডেলিগেট হিসাবেইত আসতে পারেন।

প্রয়োজন হলে কনফারেন্স বা কংগ্রেস এলাকা ভিত্তিতে বিভিন্ন জায়গায় হতে পারে। দুই বা তিনজন সি-সি সদস্য পৃথক পৃথক এলাকার কনফারেন্সগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করবেন।

পার্টি নেতৃত্ব বা পার্টির গোপন সংগঠনকে বিপদগ্রস্ত করতে আমরা নিশ্চয়ই চাই না কিন্তু

বিশেষ অবস্থায় বিশেষ ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয়। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে কমিনফর্মের নির্দেশ সম্বন্ধে সমস্ত পার্টি সভ্যদের মতামতের উপর ভিত্তি করে নতুন পথ বের করা এবং সাধারণ কর্মীদের আস্থাভাজন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নেতৃত্ব নির্বাচন করা অসম্ভব হবে না।

এই মুহূর্তে এইটাই সবচাইতে জরুরি কাজ। এর সমাধানের উপরেই ভারতীয় জনগণের মুক্তি সংগ্রামের জয়ের অন্যান্য আবশ্যকীয় কাজগুলির সফলতা নির্ভর করছে।

১৫ই জুলাই ১৯৫০ প্রাচীর ইউনিট
দমদম

নূতন কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠির উপর সমালোচনা

"কেন্দ্রীয় কমিটি আশা করে যে এই চিঠিতে (নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠি— লেখক) পার্টির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনাদের উদ্বেগের অবসান হবে।" নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির এই আশ্বাসবাণী সত্ত্বেও, সত্য কথা বলতে গেলে বলতে হবে যে আমাদের উদ্বেগের অবসান এখনও হয়নি। কথায় আছে "ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডড়ায়"। আমাদেরও বোধ হয় তাই হয়েছে দক্ষিণপন্থী 'যোশী' যুগ থেকে আরম্ভ করে বামপন্থী বা টিটোপন্থী রণদিভে যুগ পর্যন্ত আমাদের একমাত্র কাজ ছিল নেতাদের এইরূপ চিঠি সার্কুলার ইত্যাদি পেয়ে সমস্ত উদ্বেগের অবসান ক'রে, 'His Masters Voice' (প্রভুর হুকুম) এর মত তা অনুসরণ করা। এর দুটো কারণ ছিল—(১) নেতাদের রাজনৈতিক জ্ঞান ও সততায় বিশ্বাস এবং (২) আমাদের মার্ক্সবাদ বা লেনিনবাদে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা বা মূর্খতা। কিন্তু আজ প্রথম কারণটি জলের মত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, তাঁদের উপর নির্জলা বিশ্বাস নেই—তাঁদের হিমালয় পর্বতের মত ভুলের পর ভুল এই মোহ কেটেছে। সুতরাং সকল বিষয়েই আজ আমাদের অল্প জ্ঞানের ভিতর দিয়েও বাজিয়ে নেবার মত প্রবৃত্তি জেগেছে।

সঠিক বর্ণনা

কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠির প্রথম দুই পৃষ্ঠায় পার্টির দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির সম্বন্ধে ও দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে তার বিরুদ্ধে যে সাফল্যপূর্ণ লড়াই হয়েছিল তার বিবরণের বিরুদ্ধে বোধ হয় কারও বিশেষ কিছু বলার নেই।

সমস্ত দোষ পলিটব্যুরোর

কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠি পড়লে মোটামুটি এই ধারণা হবে যে পার্টিতে যা কিছু বামপন্থী-টিটোবাদ হয়েছে তার জন্যে একমাত্র দায়ি পি-বি। যথা গণ অভ্যুত্থানের অবস্থা এসে গেছে বলে পি-বি'র ধারণা, হঠকারী নীতি চালু করা, ৯ই মার্চের রেল হরতাল প্রভৃতি আলোচনা করে সত্যই সি-সি পি-বি'র মুখোশ খুলে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও নিজেদের একেবারে দোষমুক্ত করা সম্ভব নয় বলে প্রাদেশিক কমিটিগুলিকেও দলে টেনে নিয়ে মৃদু মন্দ ভাবায় স্বীকার করেছেন যে তাঁরা নিজের কর্তব্য পালন করলে পলিটব্যুরোর বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদের এবং তার "বিশ্ববিখ্যাত দলিল

তিনখানির কবরে পরিণত করা যেত এবং পার্টি তার বর্তমান দুরবস্থা থেকে রক্ষা পেত।" একে আত্মসমালোচনা বলে না, একে আত্ম-প্রশংসা (Self aggrandisement) বলে। আজ পার্টি সভ্যদের স্বতই মনে হতে পারে এবং হচ্ছে যে তাঁরা নিজেরাও ঐ দলভুক্ত ছিলেন। এবং প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে ঐ টিটোবাদী নীতিকে সমর্থন করাই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। তাই দু'বছর ধরে সি-সি মিটিং না হওয়া সত্ত্বেও তারা কোনরূপ সক্রিয় প্রতিবাদ করেননি। তাছাড়া সব থেকে বড় কথা হচ্ছে তাঁরা পি-বি'কে বাঁচানর জন্যে প্রথমত পি-বি'র মেম্বর'দর আত্মসমালোচনার উপর একটা কথাও বলেন নি। কেবলমাত্র লিখেছেন—"কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যরা এই রিপোর্টগুলি সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখেছেন এবং তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন।" কিন্তু সেই আত্মসমালোচনাতে কি লেখা আছে তার এক লাইনও "চিঠিতে" নেই বা আজ তিন মাসের মধ্যে তা বার করাও হয়নি। শুনলাম "র‍্যাঙ্ক এন্ড ফাইলের" চাপে নতুন পি-বি স্বীকার করেছেন যে শীঘ্রই তা বার করা হবে। কয়েকদিন পূর্বে হঠাৎ আমি ঐ সমালোচনাগুলি পড়ার সুযোগ পাই, এবং পড়ে স্তম্ভিত হয়ে যাই। তার কয়েকটির সারমর্ম এখানে লিখছি সাধারণ মেম্বররা বিচার করে দেখবেন যে এইগুলি চেপে রেখে সি-সি নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন কি না?

(১) প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন (রণদিভে সহ) যে তাঁরা যুগোস্লাভ ডেলিগেটদের দ্বারা ও টিটোপন্থার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

(২) বিশেষ করে রবি ও প্রফেসরের আত্মসমালোচনাতে স্বীকৃত হয় যে পার্টি কংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্বে পলিটিক্যাল থিসিসের আলোচনার সময় যুগোস্লাভ ডেলিগেটদের সেখানে ডাকা হয় এবং তাঁদের কথামত থিসিস বদলান হয়। তখন নাকি ধারণা ছিল তারা টিটোপন্থী নয়। কিন্তু যখন খবর আসলো যে টিটো তার দালালদের পার্টি কংগ্রেসে পাঠিয়েছিল, তখনও থিসিস বদলানো ত দূরের কথা পার্টির কাউকেও এ সম্বন্ধে জানানো হয়নি।

(ক) যুগোস্লাভকে যখন কমিনফর্ম থেকে "শত্রুদেশ" বলে অভিহিত করলো, তার পরেও ক্রস-রোডের প্রতিনিধি সেখানে ছিল এবং G.S.-এ সম্বন্ধে কাউকেও কিছু জানান নি। কেবলমাত্র... ধমকী খাবার পর তাকে সরান হয়েছে।

(খ) ফিরে আসার সময় যুগোস্লাভের লেখা কমিনফর্মের জবাব যা কমিনফর্ম থেকে কোনও কমিউনিস্ট পার্টিতে প্রচার করা মানা ছিল—তাই পার্টি প্রেস থেকে ছাপিয়ে বিলি করা হয়। রবি বলেছেন G.S.-এর (সাধারণ সম্পাদকের) অনুমতি ছাড়া কি করে ছাপা হল তিনি বোঝেন না।

(গ) বাইরে থেকে জরুরি চিঠি আসে যে উচ্চতম কমিটির একজন বিশেষ দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন লোককে পিকিং সম্মেলনে পাঠাতে হবে এবং এমনকি তাঁর যাতায়াতের নিরাপত্তার ব্যবস্থাও তারা করবেন। G.S. সে সম্বন্ধে কোনও কিছুই করেন নি—শেষে A.I.T.U.C.-র একজন প্রতিনিধি (অবশ্য পি এম) G.S. (সাধারণ সম্পাদক) দ্বারা মনোনীত হয়ে যান এবং পিকিং সম্মেলনে সোভিয়েত ও চীনের বিরুদ্ধাচরণ করেন। তিনি ফিরে আসার পর এ সম্বন্ধে পার্টির মধ্যে কিছুই জানান হয়নি।

উক্ত স্বীকারোক্তিগুলি কি এতই সাধারণ যে সি-সি এ সম্বন্ধে কেবলমাত্র "সূক্ষ্মভাবে বিচার করেই" ছেড়ে দিলেন?

দ্বিতীয়ত বিভিন্ন প্রদেশে পি-বি তাদের পেটোয়া লোক দিয়ে প্রাদেশিক কমিটি পুনর্গঠন করা সম্বন্ধে সি-সি কেবলমাত্র এই সমালোচনা করলেন যে তাঁরা (পি-বি) অযথা "সংস্কারবাদের গাদ" "সাহসিক ধর্মঘটের ডাকে বানচাল" "শ্রমিক পার্টিতে পরিণত করা" ইত্যাদি যুক্তি দিয়ে প্রাদেশিক কমিটিগুলিকে পুনর্গঠন করেছেন। কিন্তু আসল কথা পার্টির গঠনতন্ত্রের কোন ধারায় আছে যে পি-বি এই পুনর্গঠন কাজ করতে পারে? "পার্টির সংগঠন" উপধারা (৪)-এর তৃতীয় প্যারাগ্রাফে এবিষয়ে সুস্পষ্ট লেখা আছে। সাধারণ সভ্যদের এই সন্দেহ অমূলক বলে সি-সি কেমন করে প্রমাণ করবেন যদি তারা বলে যে প্রত্যেক টিটোপন্থী কাজের মূলে নিশ্চয়ই সি-সি'র সমর্থন ছিল। উপধারা (৫)-এ লেখা আছে অন্তত তিন মাসে একবার সি-সি মিটিং হবে। কিন্তু দু'বছরে কেন মিটিং হল না—তার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ "চিঠির" কোথাও নেই।

তৃতীয়ত "চিঠিতে" সি-সি পুনর্গঠন যেভাবে করা হয়েছে তার মধ্যে পার্টির গঠনতন্ত্রের আইনকানুন কিছুই মানা হয়নি। গঠনতন্ত্রের প্রথমেই "ব্যাখ্যামূলক" মন্তব্যের মধ্যে লেখা আছে "কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করিতেছে যে অতঃপর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন সমূহ ভারতীয় ইউনিয়নের ভূমির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে"। সুতরাং কেমন করে হাজং এলাকার নেতা সি-সি'তে আসলেন?

এই সমস্ত কাজের জন্যে এবং সি-সি কলকাতায় এসে "র‍্যাঙ্ক এন্ড ফাইলকে" বাদ দিয়ে যেভাবে বিশেষ বিশেষ নেতাদের সঙ্গে দেখা করেছেন তা থেকে মনে হয় যে—যে কোনও একটা আপস করে নিজেরা টিকে থাকতে পারলেই হল। কমরেড স্ট্যালিন লিখেছেন, "মধ্যপন্থা একটি রাজনৈতিক ধারা। ইহার মতবাদ হইল সামঞ্জস্য ঘটাইবার মতবাদ। একটি দলেরই মধ্যে সর্বহারা স্বার্থকে পেটি বুর্জোয়া শ্রেণি স্বার্থের বশবর্তী করার মতবাদ। লেনিনবাদের দৃষ্টিতে এ মতবাদ হইল সম্পূর্ণ বিরোধী ও অগ্রাহ্য।"—সোভিয়েট ইউনিয়নের ইতিহাস—১৭২।

পার্টির মধ্যে দুইভাগ বা দল

"চিঠিতে দেখান হয়েছে যে "চীনের পথ"-এর উপর পার্টির মধ্যে দুটো বিভাগ বা দল হয়েছে। প্রথম দল অর্থাৎ সি-সি মতাবলম্বীরা মনে করেন চীনের পথ গ্রহণ হবে—গ্রামে গ্রামে এখনি সশস্ত্র বিপ্লব আরম্ভ করার মত অবস্থা বর্তমান। দ্বিতীয় দল, "যারা লোক দেখানভাবে চীনের পথকে গ্রহণ করেন তারা যুক্তি উপস্থিত করে বলেন যে খুব অল্প কয়েকটি এলাকা ছাড়া আর কোথাও গেরিলা প্রতিরোধ চালাবার মত অবস্থা সৃষ্টি হয়নি। এবং ধীরে ধীরে জনসাধারণের বহুলাংশকে জয় করে এনে ও প্রচার মারফৎ জনসাধারণের ঐক্য গড়ে তুলে প্রথম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে হবে।" আমি কয়েকদিন আগে কলকাতায় ফিরে আসার পর প্রাদেশিক কমিটির নেতার কাছেও শুনি যে দুটি দল হয়ে গিয়েছে। ১নং সশস্ত্র প্রতিরোধ চায়। ২নং সশস্ত্র প্রতিরোধ চায় না। তাঁর কাছে আরও জানলাম যে কমরেড ডাঙ্গে বোম্বের হেড-কোয়ার্টার্স দখল করে বসেছেন। ছাপাখানা ক্রসরোড তাঁদের হাতে। সি-সি চিঠিতে তথাকথিত দ্বিতীয় দলটিকে কিছু ঠাট্টা তামাসাও করা আছে। এই রকম দুই দল চিন্তা করার অর্থ যান্ত্রিক (mechanical) চিন্তা। ভারতের পার্টির ঐতিহ্যই মেকানিক্যাল চিন্তা। তাই আজ পার্টির ভরাডুবি হয়েছে। প্রথমত সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়োজন নেই একথা কোন কমিউনিস্ট বলতে পারে না। যে বলে তার

স্থান জয়প্রকাশের দলে। কিন্তু যদি কেউ সশস্ত্র বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুতির কথা বলে তাহলেই সে "লোকদেখান" চীনা পথ গ্রহণ করেছে বলাও সম্পূর্ণ যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। কেবলমাত্র "কংগ্রেসরাজ সম্বন্ধে জনগণের অসন্তোষ ও মোহমুক্তির ভীরতা" দেখলেই প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। তাছাড়া "যেকোনও অঞ্চলে কংগ্রেস গভর্নমেন্টের ও রক্তচোষাদের শ্বেত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যেকোন প্রতিরোধই জনসাধারণের ব্যাপক অংশের এমন কি দেশের রাজনীতির দিক থেকে সবচেয়ে অনুন্নত অংশের জনসাধারণের সহানুভূতি আপনাআপনি জাগিয়ে তোলে," এ বলার অর্থ—"সহানুভূতি" কথার ভিতর দিয়ে পুরোনো টিটোপন্থী লাইন [অর্থাৎ "নতুন মজুরচাষী শ্রেণি যা হোক করে লড়াই লাগিয়ে দিলেই সবাই আসবে"] চালানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তাই যদি হোত তবে মেদিনীপুর, কাকদ্বীপ প্রভৃতি গ্রামঅঞ্চলে আজ এমন অবস্থা কেন?

উপযুক্ত ক্ষেত্র—"কয়েকটি অঞ্চল বাদ দিয়ে ভারতবর্ষকে সমগ্রভাবে ধরলে দেখা যায় যে গেরিলা প্রতিরোধ শুরু করার জন্য আজ বাস্তব অবস্থা বিদ্যমান।" সি-সি'র চিঠির এই উক্তি স্বীকার করলে ভারতের অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন ও গতিকে অস্বীকার করা হয়। বালাবুশেভিচ বলেছেন—"তবে এটা লক্ষ্য করতে হবে যে যদিও কতকগুলি জেলার কৃষক আন্দোলন বেশ উচ্চস্তরে উঠেছে, তবু এখনও তার বিশেষত্ব হচ্ছে অসমতা এবং তা এখনও সারা ভারতীয় রূপ নিতে পারেনি। * * *" "জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বশালী উপরের স্তরের বেইমানি ও বিশ্বাসঘাতকতা সত্বেও কংগ্রেস এখনও কৃষক জনগণের উপর প্রচুর প্রভাব রাখতে পেরেছে। এবং প্যাটেল ও নেহরুর চরদের দ্বারা পরিচালিত সারা ভারত কিষাণ কংগ্রেস (রঙ্গ এন্ড কোং) যে এখনও কৃষকদের মধ্যে তাদের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কাজ চালাবার ক্ষেত্র পাচ্ছে তা' শুধু এই দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় যে জাতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে মোহ এখনও দূর হয়নি। সোশ্যালিষ্ট নেতারাও কৃষকদের মধ্যে তাদের বিভেদমূলক কাজ চালাবার চেষ্টা করছে।**"

তারপর "চিঠি" লিখছেন "জনগণ শারীরিকভাবে রাস্তায় নেমে আসছে কিনা এবং পার্টির পূর্ণ রাজনৈতিক প্রোগ্রাম গ্রহণ করছে কিনা—জনগণের প্রস্তুতি সম্বন্ধে এই পুরোনো মাপকাঠি আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে। যে জিনিষটি লক্ষ্য করতে হবে সেটি হচ্ছে এই যে জনগণের সাধারণ সমর্থনের উপর ভিত্তি করে ফ্যাসিষ্ট সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গেরিলা প্রতিরোধ শুরু করা যায় ও শুরু করতে হবে।" এই কায়দা ও পুরোনো টিটোপন্থী কায়দা একই বললে অত্যুক্তি হয় না। একটিমাত্র কথার মারপ্যাঁচ আছে, সেটি হচ্ছে "সশস্ত্র প্রতিরোধের" পরিবর্তে "গেরিলা প্রতিরোধ"। যেন গেরিলা প্রতিরোধ লড়াই 'ইন্‌সারেক্সন্' লড়াই নয়। ইন্‌সারেক্সন্ সম্বন্ধে লেনিন বলেছেন,—To be successful insurrection must be based not on conspiracy, not on Party, but on the **advanced class** (bold mine). This is the first point.

Insurrections must be based on the revolutionary upsurge of the people. This is the second point. Insurrections must be based on the turning point on the history of the maturing revolutions when the actions of the Vanguard of the people is at its hight and when there is most

vacillations in the ranks of the enemies and in the ranks of the weak, half hearted, irresolute friends of the revolution. (Lenin—Marxism & Uprising)

"সাফল্য লাভ করতে হলে সশস্ত্র অভ্যুত্থানকে নির্ভর করতে হবে অগ্রগামী শ্রেণির উপর (বড় হরফ আমার), কেবল পার্টির উপর নয়, একটা গুপ্ত চক্রান্তের উপর নয়। এই হল প্রথম কথা।

জনসাধারণের বিপ্লবী জাগরণের উপরই হবে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সমূহের ভিত্তি। এই হল দ্বিতীয় কথা। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ভিত্তি হবে বিপ্লবের ক্রম পূর্ণতার ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ যখন অগ্রগামী জনতার সংগ্রাম উচ্চ শিখরে উন্নত হয়েছে, যখন শত্রুদের মধ্যে অনিশ্চিত ও চাঞ্চল্য চরম রূপ নিয়েছে এবং যখন বিপ্লবের দুর্বল, অনির্ভরশীল মিত্র শক্তির মধ্যে দোলায়মান মনোভাব সব চাইতে বেশি বেড়ে উঠেছে।" (লেনিন—মার্ক্সবাদ ও সশস্ত্র অভ্যুত্থান)।

Mao Tse-tung (মাও-সে তুং) বলেছেন, It is absolutely necessary for the partisans to win the **support & participation** (bolds mine) of the peasant masses only by implementing itself deeply in the heart of the people, only by fulfilling the demand of the masses, only by **consolidating a base in the peasants Soviets** (bold mine) and only by **sheltering in the shadow of the masses** can partisan warfare bring revolutionary victory. Tactics are important but we could not exist if majority of people did not support us. We are nothing but fist of the people beating their oppression. [Red Star Over China, Page 304-5]

"পার্টিজানদের পক্ষে কৃষক জনতার **সমর্থন ও অংশ গ্রহণ** সুনিশ্চিত করতেই হবে জনসাধারণের হৃদয়ের গভীরে দৃঢ় আসন প্রতিষ্ঠা করে, জনতার দাবি সকল পূর্ণ করে, **কৃষক, সোভিয়েট সমূহের মধ্যে এক শক্ত ঘাঁটি সংহত করে এবং জনতার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে** কেবল পার্টিসান যুদ্ধ জয়লাভ করতে পারে। রণকৌশলের গুরুত্ব অবশ্যই আছে কিন্তু অধিকাংশ জনসাধারণ যদি আমাদের সমর্থন না করত তবে আমাদের অস্তিত্বই বজায় থাকত না। আমরা হলাম নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত জনতার শক্ত মুষ্টিবদ্ধ হাত মাত্র।" [রেড স্টার ওভার চায়না, পৃ ৩০৪-৫]

আর আমাদের সি-সি যাঁরা মাও-এর একচেটিয়া অনুগামী—তাঁরা বলছেন জনসাধারণ পূর্ণ সমর্থন করছে কিনা দেখার দরকার নেই। নিতান্ত জনসাধারণকে বাদ দিলে চলে না, তাই "সাধারণ সমর্থন" পেলেই হবে। Consolidating base in the peasants, [কৃষকদের মধ্যে ঘাঁটি সংহত করা] support and participation of the peasants, [কৃষক জনতার সমর্থন ও অংশ গ্রহণ] এবং implementing deeply in the hearts of the people [জনতার হৃদয়ে গভীর আসন প্রতিষ্ঠা] এর জন্যে কোনও সংগঠন ও সময় চাইলে "লোক দেখান চীনের পথ গ্রহণ করা হবে।" People's China কাগজে লি সাও-চি লিখেছেন The vanguard will isolate itself from the masses of the peole if it fails to make the masses realise the correctness of the party's slogans through their

own experiences and at accordingly. In other words, commandism, adventurism and closed-doorism would invariably lead to isolate from the masses.

"জনতার থেকে অগ্রগামী নেতৃত্ব বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে যদি জনসাধারণকে নিজেদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পার্টি শ্লোগানের নির্ভুলতা উপলব্ধি না করানো যায় এবং তদনুযায়ী কাজে না নামানো যায়। অর্থাৎ হুকুম চালানো, হঠকারিতা এবং "রুদ্ধ দ্বার" [রুদ্ধ সংকীর্ণতার] নীতির ফলে জনতার মধ্য থেকে নিয়তই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে।"

আর আমাদের সি-সি বলছেন, "জনসাধারণ পার্টির পূর্ণ প্রোগ্রাম গ্রহণ করছে কিনা" দেখার দরকার নেই। সি-সি'র একথা খুব সত্য যে "শুধুমাত্র প্রচার কার্য দ্বারা আমরা সফল হব না। কিন্তু যেভাবে রণকৌশল উপস্থাপিত করেছেন সেটার মধ্যে বহুল পরিমাণে বামপন্থী হঠকারিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

অবশ্য সি-সি লিখছেন যে "এর অর্থ এই নয় যে আমরা যেখানেই আছি এবং অবস্থা যাই হোক না কেন, অবিলম্বে আমরা সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করব। বিভিন্ন এলাকার জনগণের চেতনার স্তরের উপর ভিত্তি করে পার্টি সাহসের সঙ্গে গণসংগ্রাম শুরু করবে। সশস্ত্র গেরিলা প্রতিরোধের সঙ্গে এই সংগ্রামকে যুক্ত করবেহুন্ন তার মনে এই দাঁড়ায় যে গেরিলা সংগ্রাম এখনই আরম্ভ করা এবং তা' বিভিন্ন এলাকার চেতনার স্তরের সঙ্গে জুড়ে দাও। অর্থাৎ ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দাও। যা করতে হবে সেটা হচ্ছে বিভিন্ন এলাকার জনসাধারণের চেতনার স্তর ও গণসংগ্রাম বাড়াও এবং উপযুক্ত সময় মত তাদের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তাকে গেরিলা সংগ্রামে রূপান্তরিত কর।

People's China পত্রিকাতে লি সাও-চী লিখেছেন, They (some comrades) did not believe that it was the masses who were emancipating themselves. Instead, they stood above the masses to fight in their stead, to bestow emancipation on the masses and to issue orders. Such Comrades suffered from impetuosity. Being only superficially active, they did not know how to transform party's slogans tasks into those of the people, or how to enlighten the masses, properly wait for the awakening. Nor did they know how to take steps to bring about a natural revolutionization of the masses. They tried to compel the masses to accept the Party's slogans and tasks simply by issuing orders and forcing the masses into action. Thus they isolated the voluntary principles of the masses.

"তাঁরা [কতিপয় কমরেড] বিশ্বাস করেন নি যে জনতাই নিজেদের মুক্ত করছে। তার বদলে তাঁরা জনতার থেকে উপরে উঠে দাঁড়ালে তাদের হয়ে লড়াই করার জন্য, জনতার উপর মুক্তির আশীষ বর্ষণ করার জন্য এবং হুকুম চালাবার জন্য। এই ধরনের কমরেডদের মধ্যে উগ্রতা দোষ দেখা দিল। শুধু মাত্র বাহ্যতঃ সক্রিয় হওয়ার দরুণ তাঁরা জানতেন না কি করে পার্টির শ্লোগান ও কর্তব্যকে জনসাধারণের শ্লোগান ও কর্তব্যে পরিণত করতে হয়। জানতেন না কি করে জনতাকে সচেতন করতে হয় এবং জন জাগরণের জন্য কি রকম উপযুক্ত ভাবে

অপেক্ষা করতে হয়। কি করে জনতার মধ্যে স্বাভাবিক বিপ্লবীকরণ সম্পাদন করার ব্যবস্থা নিতে হয় তাও তাঁরা জানতেন না। শুধু হুকুম জারি করে এবং জোর করে জনতাকে সক্রিয় করে তাদের দিয়ে পার্টির শ্লোগান ও কর্তব্য সমূহ মানিয়ে নিতে বাধ্য করার জন্যই তাঁরা চেষ্টা করেছেন। এমনি করে তাঁরা জনতার স্বেচ্ছামূলক কাজের নীতিসমূহ লঙ্ঘন করেছেন।

"সশস্ত্র প্রতিরোধ চাইনা"—ভুল

সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রয়োজন নেই এরকম কথা কোনও কমরেড বলেন কিনা জানিনা। তা বল্লেতো তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য থাকারই উপযুক্ত নন—সে কথা আমি আগেই বলেছি।

আসল প্রশ্ন হচ্ছে—সশস্ত্র প্রতিরোধ চাই বলে তার জন্যে সাংগঠনিক ও অন্যান্য প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে কিনা বা দেশ কাল পাত্র বিবেচনা না করে তা আরম্ভ করা যায় কিনা? বামপন্থী হঠকারিতার জের টেনে বর্তমান সি-সিও যেন "এখনি-লাগাও" পন্থার উপর জোর দিচ্ছেন বলে মনে হয় এবং যারা তার বিরুদ্ধে বলেছে তাদেরই দক্ষিণপন্থী আখ্যা দেবার চেষ্টা করছেন। সশস্ত্র সংগ্রাম মুখে বল্লেইতো হবে না—এর ব্যবস্থাদি অন্তত অতি অল্প হলেও করার জন্যে সংগঠন দরকার। Stalin এক সময়ে বলেছিলেন, —We require three things—1st arms, 2nd arms, 3rd arms "আমাদের তিনটি জিনিষের প্রয়োজন, প্রথম অস্ত্র, দ্বিতীয় অস্ত্র, তৃতীয় অস্ত্র।" People's China পত্রিকায় An armed people opposes an armed counter revolution প্রবন্ধে বলা হয়েছে,—In a colony or semicolony if the peoples have no arms to defend themselves they have northing. "উপনিবেশ বা অর্দ্ধউপনিবেশে জনসাধারণের যদি আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রই না থাকল তবে আর কিছুই থাকল না।" তাছাড়া সংগঠনগুলি সম্বন্ধেও হুঁশিয়ার করে বলা হয়েছে,—The existence and development of proletariat, organisation and the existence and development of a national united front is ultimately linked to the existence of such an armed struggle. It (armed struggle) can by no means be conducted in every colony and semi-colony at any time without the necessary condition and preparations. "সর্বহারার সংগঠন-এর অস্তিত্ব ও বিকাশ এবং যুক্ত ফ্রন্টের অস্তিত্ব ও বিকাশ এই ধরনের সশস্ত্র সংগ্রামের অস্তিত্বের সাথে সংযুক্ত .... ইহা (সশস্ত্র, সংগ্রাম) উপযুক্ত, প্রস্তুতি ও বাস্তব অবস্থা না থাকলে যে কোন সময়ে প্রত্যেক উপনিবেশ ও অর্ধউপনিবেশ কোন প্রকারেই চালানো যায় না।" ভারতে সশস্ত্র সংগ্রাম উচিৎ ধরে নিলেও "necessary conditions and preparations" কে কেমন করে বাদ দেওয়া যায় বুঝলাম না। এই প্রস্তুতি সফল করার জন্যেই ষ্ট্যালিন বলেছেন, "প্রত্যেক দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে সর্বহারা শ্রেণির জন্যে ব্যাপকভাবে সহযোগী সংগ্রামের সামান্যতম সুযোগকেও কাজে লাগাতে হবে—সে সহযোগী যদি ক্ষণস্থায়ী, দ্বিধাগ্রস্থ আর দোদুল্যমান হয়, যদি নির্ভরযোগ্য না হয় তবুও।" চীনের বিজয়ের কারণ হিসাবে লি লি-সান বলেছেন "চীনের শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম পরিচালনার নির্ভুল কৌশল, সময়োপযোগী শ্লোগানের প্রয়োগ, সাম্রাজ্যবাদ এবং তার দালালদের অত্যাচারে পীড়িত সমস্ত শ্রেণি, রাজনৈতিক দল, গ্রুপ, সংগঠন এবং ব্যক্তি বিশেষকে একত্রিত করে সাম্রাজ্যবাদেরই বিরুদ্ধে এক বিরাট জাতীয়

মিলিত ফ্রন্ট গঠনের কাজ অগ্রণী অংশ নিয়েছিলেন বলেই আজ তা সম্ভব হয়েছে।"

তেলেঙ্গানা ও হাজং এলাকা :— সি-সি চিঠিতে ঠিকই লেখা হয়েছে "তেলেঙ্গানার অন্ধ্র প্রদেশে, মৈমনসিং জেলায় পাহাড়ী সীমান্ত অঞ্চলে ইতিমধ্যেই জনসাধারণ তাদের নিজেদের পথে চলতে শুরু করেছে—তারা গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে—প্রকৃতপক্ষে এগুলোকে ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আরম্ভ ব'লে অভিহিত করা যেতে পারে।" সত্যই তেলেঙ্গানা আজ প্রত্যেক পার্টি সভ্যের চোখের মণির মত। তাঁদের বীরত্ব রণকৌশল ও সাহসিকতার জন্যে আজ নেহরু-গভর্নমেন্ট শত শত লোককে ফাঁসি, জেল ও দেখামাত্র গুলি করে মেরেও তাঁদের লড়াইকে থামাতে পারেনি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মার্ক্সীষ্ট দৃষ্টি দিয়ে আজ তেলেঙ্গানাকে বিচার করা প্রত্যেক কমরেডের প্রয়োজন। তেলেঙ্গানা রিপোর্ট যা পার্টি থেকে ছাপান হয়েছে তাতে দেখা যায় যে সেখানে সাধারণ কমরেড ও নেতাদের মধ্যে মতদ্বৈধতা আরম্ভ হয়েছে পার্টির নতুন কি রণকৌশল হবে তার উপর। "তেলেঙ্গানা ডকুমেন্টস" এর Introductory note-এ লেখা হয়েছে The first letter in Feb 49. When in face of military offensive of the combined forces of the Indian Union and of the Nizam the party began to reel under the heavy blows of the enemy and different trend of deviations had raised their heads.... (i) desperate adventurism and armed resistance (ii) total retreat. "৪৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে লেখা প্রথম চিঠি : যখন ভারতীয় ইউনিয়ন ও নিজামের মিলিত বাহিনীর আক্রমণের মুখে শত্রুর প্রচণ্ড আঘাতে পার্টির টলায়মান অবস্থা এবং নানা ধরনের বিচ্যুতি মাথা তুলেছে... (i) "বেপরোয়া অবিমৃষ্যকারীতা এবং সশস্ত্র প্রতিরোধ" (ii) "ব্যাপক পশ্চাদপসরণ"। সেপ্টেম্বরের ৪৯-এর দ্বিতীয় চিঠিতে পাওয়া যায়, When after the failure of March 9 Rly. Strike etc. was witnessed another wave of depression and demoralisation cropped up and the majority of the middle leadership including all area committees excepting one or two, in Telangana and some leading district committees in Andhra areas, raised all sorts of doubts on the continuation of armed struggle... "৯ই মার্চের রেল ধর্মঘটের পর দেখা দিল আর এক প্রস্থ ভগ্নোদ্যম এবং হতাশা, এবং তেলেঙ্গানায় ২/১টি বাদে সমস্ত আঞ্চলিক কমিটি ও অন্ধ্রের নেতৃস্থানীয় কয়েকটি জেলা কমিটিসহ মাঝারী নেতৃত্বের একটা বড় অংশ সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া সম্পর্কে নানারকম সংশয় তুললেন।

কিন্তু এই অবস্থাকে অন্ধ্র প্রাদেশিক কমিটি গতানুগতিক যুক্তি দিয়ে নাকচ করলেন যথা— When the critical situation came some organisers and squad members coming from exploiting classes betrayed the revolutionary cause and joined the enemy camp...

"সংকট সময় যখন এল, তখন শোষকশ্রেণি থেকে আগত কয়েকজন সংগঠক ও স্কোয়াড সভ্য বিপ্লবী আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রু শিবিরে যোগ দিল..." টিটোবাদী বামপন্থী নেতৃত্বের এই পুরাতন যুক্তি পার্টি সভ্যদের ভাল করে বিচার করতে হবে। কিন্তু পার্টি নেতৃত্ব আমাদের ছত্রভঙ্গ অবস্থাকে ঢাকতে পারেন নি, যদিও "বিশ্বাসঘাতকতা"

ইত্যাদি বিশেষণে নিজেদের যুক্তিকে শক্তিশালী করতে চেষ্টা করেছেন। যথা *** the organisation of the Party and the mass organisation had to be started from ABC. On account of the betrayal of the organisers, squad leaders, squad members and on account of falling prey to shootings and arrests, area committee organisers were left isolated without contact with each other... the meagre organisation that is left, is also in great confusion.

"... পার্টি ও গণ সংগঠন পুনরায় সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করতে হয়েছিল একেবারে গোড়া থেকে। সংগঠক, স্কোয়াড নেতা ও সভ্যদের বিশ্বাসঘাতকতা, গুলি ও গ্রেফতারের শিকার হওয়া প্রভৃতির দরুন এলাকা কমিটি সংগঠকেরা যোগাযোগ হারিয়ে নিজেদের মধ্যে একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন।... সামান্য যেটুকু সংগঠনের অস্তিত্ব টিকে আছে তার মধ্যে প্রচুর বিভ্রান্তি" (পৃ. ৩১)।

মনখোলা কমরেডরা বলছেন, "There is no party organisation at all" ["কোন পার্টি সংগঠনের অস্তিত্বই নাই"] হুজুর নগর কমরেডরা বলেছেন, the people are not yet prepared to enter the area and make a brave stand against the enemy. "জনসাধারণ এখনও এলাকায় প্রবেশ করে শত্রুর বিরুদ্ধে সাহস নিয়ে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত নয়"। তাঁরা বর্তমান অবস্থাতে "self defence" [আত্মরক্ষা] করার যৌক্তিকতা দেখান। কিন্তু পুরোনো পি-বি এবং তার সঙ্গে অন্ধ্র নেতৃত্বও ঘোষণা করলেন যে উক্ত বিশ্লেষণ পরাজয় মনোভাব প্রসূত এবং শ্লোগান দিলেন—our party should adopt only tactics of offensive "শুধু আক্রমনাত্মক কৌশলই আমাদের পার্টির গ্রহণ করা উচিত"। এইখানে আমি আবার "Peoples China"তে দেখি লি সাউ-চি'র উক্তি—যা আগেই প্রকাশ করা হয়েছে—সেই সম্বন্ধে সমস্ত কমরেডদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। অর্থাৎ জনসাধারণ এগুতে চাইছে না, তথাপি তাকে জোর করে ঠেলে দেবার পদ্ধতি।

চীনের 1st Red Army Commander কমরেড পি-তে হুয়াই লিখেছেন—"Partisans must not fight any loosing battle. Unless there are strong indications of success, they should refuse any engagement... A careful and detailed plan of attack and especially of reteat must be worked out before any engagement (Red star over China, Page 301).

"যুদ্ধে হেরে যাওয়া পার্টিসানদের কখনই চলবে না, সাফল্যের খুব জোর সম্ভাবনা না থাকলে তাদের সংঘর্ষ পরিহার করা উচিত।"..."কোন সংঘর্ষের পূর্বে আক্রমণের এবং বিশেষ করে পশ্চাদপসরণের একটি সতর্ক ও বিস্তৃত পরিকল্পনা নিয়ে নিতে হবে।" (রেড ষ্টার ওভার চায়না—পৃঃ ৩০১)

সুতরাং শত্রুর প্রচণ্ড চাপে যদি কেহ "self defence" বা retreat-এর কথা বলে তাকে এক কোণে ঝেড়ে দেওয়া মানে লেনিনবাদ নয়—বামপন্থী হঠকারিতা। এইরূপ বামপন্থী হঠকারিতা সম্বন্ধে কমরেড মাও সে-তুং বলেছেন—A vigorous struggle (4th Red army Conference 1929) was begun against them and several were deprived of their party positions and army command. Of these Len

Enking, an army commander was typical. It was found that they intended to destroy the Red army by leading it into difficult position in battles with enemies (Ibid p-174). "তাদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী লড়াই শুরু হল [৪র্থ রেড আর্মি কনফারেন্স, ১৯২৯] এবং কয়েকজনের পার্টি ও সৈন্যবাহিনীর অবস্থান থেকে পদচ্যুতি ঘটল। এদের মধ্যে একজন সেনাধ্যক্ষ লেন এনকিংয়ের ঘটনা দৃষ্টান্তস্থল। বুঝতে পারা গেল যে এরা শত্রুর সাথে যুদ্ধে অসুবিধাজনক অবস্থায় চালিয়ে নিয়ে লাল ফৌজকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল।" [আর-এস ও-সি, পৃঃ ১৭৪]

এই ক্ষেত্রে কমরেড মাও-এর শ্লোগান বিশেষ করে মনে রাখতে হবে এবং নতুন করে তেলেঙ্গানা পরিস্থিতি বিচার করতে হবে এই শ্লোগানের উপর, যথা—(1) when the enemy advances we retreat (2) when the enemy halts and encamps, we trouble them (3) when the enemy seeks to avoid battle we attack (4) when the enemy retreats we persue.

(১) যখন শত্রু এগিয়ে আসে আমরা পশ্চাদপসরণ করি, (২) শত্রু থেমে গিয়ে শিবিরে আশ্রয় নিলে আমরা তাদের বিরক্ত করি, (৩) শত্রু যখন যুদ্ধ চায় না আমরা তখন আক্রমণ করি, (৪) শত্রু যখন পশ্চাপসরণ করে আমরা তখন পশ্চাৎধাবন করি।

বামপন্থী আকর্ষণ ঃ—কথায় আছে "মরিয়া না মরে রাম একি বড় বৈরী।" দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি ধরা পড়ার পরেও অনেক দক্ষিণপন্থী "নতুন লাইনের" আওতায় দক্ষিণপন্থা চালানর চেষ্টা করেছেন। আবার টিটোপন্থা ধরা পড়ার পরেও "চীনের পথ"-এর নাম দিয়ে অনেক বামপন্থী পুরোনো রাস্তা চালাবার চেষ্টা করবেন বা করছেন এটা খুবই স্বাভাবিক। রুশ বিপ্লবের ইতিহাস পড়লেও আমরা জানতে পারি—যখন ট্রটস্কীর মুখোশ খুলে গিয়েছে—সমস্ত পার্টি সভ্য ও রুশবাসী তাকে ঘৃণার চক্ষে দেখতে আরম্ভ করেছে, তখন জিনোভিভ, ক্যামেনভ প্রভৃতি ট্রটস্কিপন্থীরা, লেনিনিষ্ট ও ষ্ট্যালিনিষ্টদের থেকে বেশি গালাগালি দিয়েছিল ট্রটস্কীকে খোলাখুলিভাবে এবং এই ধোঁকা দিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির গদিতে বসেছিল। কিন্তু সেখানে ষ্ট্যালিনের মত নেতা আছেন, সেখানে তাদের মুখোস খুলতে আর ক'দিন সময় লাগে? অতি সত্বর তারা ভাঙা-ফোড় হয়ে গেল—বিচারে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হোল। আমাদের দেশে ষ্ট্যালিন বা মাও-এর মত নেতা নেই। তাই সাধারণ সভ্যদের হুঁশিয়ার থাকতে হবে। কমিউনিস্ট পার্টির বা কোন নেতার ভুল করা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ভুল সংশোধন না করে ধামা চাপা দেওয়া বা পুরোনো ভুলকে নতুন কায়দায় টেনে নিয়ে যাওয়া ভীষণ অন্যায়। এই জিনিষ আমাদের পার্টিতে হচ্ছে বলে অনেকের সন্দেহ হয়—উপরিউক্ত কারণগুলি, ঘটনা ও যুক্তিদ্বারা তা কিছুটা বোঝা যাবে। এই সম্বন্ধে কমরেড লেনিন বলেছেন, The mistake our Party has made is obvious. It is not dangerous for the fighting Party of the advanced class to make mistakes. It is dangerous however, to persist in errors, to refuse out of false pride to admit and correct mistakes (Lenin-Colected Works)

"আমাদের পার্টি যে ভুল করেছে তা স্পষ্ট। অগ্রণী শ্রেণির সংগ্রামী পার্টির ভুল করাটা বিপজ্জনক নয়। কিন্তু ভুল আঁকড়ে থাকাটা ও মিথ্যা গর্বের জন্য ভুল স্বীকার করে তাকে সংশোধন করতে রাজী না হওয়াটা খুব বিপজ্জনক।" (লেনিন, কলেকটেড ওয়ার্কস্)

এখন কি করতে হবে?

প্রথমত, আমাদের পার্টির শক্তি এত বেশি নয় যে এখনি সারা ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে আমরা গেরিলা লড়াই-এর জন্য এমনকি প্রস্তুতির কাজও আরম্ভ করতে পারি। বিশেষত অসম অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দুর্বলতাও এইভাবে কাজ আরম্ভ না করার আর একটা মূল কারণ। দ্বিতীয়ত—ভৌগোলিক পরিস্থিতি, জাতীয় বৈশিষ্ঠ্য এবং ভারতের সহিত সংলগ্ন মুক্ত ও সশস্ত্র এলাকাসমূহ সম্বন্ধে বিচার করে লড়াইএর বিশেষ বিশেষ অঞ্চল ঠিক করে নিতে হবে এবং সেই অঞ্চলের উপর শক্তিশালী অঞ্চল গড়ে তোলার জন্য পার্টির মুখ্য শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। অন্যান্য এলাকাতে জনসাধারণের নিত্তনৈমিত্তিক দুঃখ ও অর্থনৈতিক সংকটের উপর ভিত্তি করে সাধারণ কাজ—সেখানে যতখানি সম্ভব—এখুনি আরম্ভ করতে হবে।

[ভৌগলিক পরিস্থিতির অর্থ—যে সমস্ত অঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ বা নদী নালা খাল ইত্যাদির জন্যে দুর্গম বা পাহাড় পর্বত বেষ্টিত। জাতীয় বৈশিষ্ট্য অর্থ—আমাদের বিশেষ জোর দিতে হবে প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের উপর এবং সেই জাতির বিশেষ দাবির উপর শ্লোগান দিতে হবে। ভারতের সহিত সংলগ্ন মুক্ত ও সশস্ত্র এলাকাসমূহ অর্থ ঃ— ভারতের যে সমস্ত অঞ্চল সোভিয়েত, চীন, তিব্বত ও বর্মার বর্ডারের সহিত সংযুক্ত।

একথা সত্য এবং আমি আগেই দেখিয়েছি যে এখনই গ্রামে গ্রামে গেরিলা লড়াই আরম্ভ করা হঠকারিতা; কিন্তু আজ আমরা যুক্তফ্রন্ট গঠন, গণ-আন্দোলন ও পার্টি সাংগঠনিক যে কোন কাজই করি না তার মূল লক্ষ্য (perspective) হবে মজুর নেতৃত্বে সমস্ত কৃষকের গেরিলা লড়াই—সাম্রাজ্যবাদ ও তার টাট্টু বৃহৎ ধনিক ও জমিদারদের বিরুদ্ধে। এই মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে আমরা সত্যিকারের সচেতন থাকলেই উপরিউক্ত অঞ্চল ভাগ ও তার উপর এখন হতেই বিশেষ জোর দেবার কারণ উপলব্ধি করা যাবে।

গেরিলা লড়াই শুরু করে তার সঙ্গে সঙ্গে গণ-আন্দোলন জুড়ে দেবার কর্মপন্থা ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দেবার মত তা আমি আগেই বলেছি। আজ আমাদের সর্বপ্রথম মুখ্য কাজ হবে যুক্তফ্রন্ট গড়া। মাথার উপর নেতাদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট ত'গড়তেই হবে, তার সঙ্গে গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠবে। আজ তার হাজার রকমের সুযোগ এসেছে।

১) আশু দুর্ভিক্ষ—এই আন্দোলনের উপর আজ প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিশ্চিত মিলিত হ'বে।—বিভিন্ন কারণে যথা আগামী ইলেকসন্ দল-বাড়ানো ইত্যাদি।

২) বাস্তুহারা আন্দোলন আজ সমস্ত বাংলায় বিষ ফোঁড়ার মত গজিয়ে উঠেছে। যে পার্টি বা দল এদের সাহায্যে এগিয়ে না আসবে তাকে ভবিষ্যতে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে না, শ্যামাপ্রসাদের প্রতিক্রিয়াশীল ও স্বার্থপ্রণোদিত আন্দোলনকে আজ সকল প্রগতিশীল পার্টির ডাণ্ডাকোড় করছে। সুতরাং যুক্তফ্রন্ট এর ভিতর দিয়ে অতি সত্বর গড়ে উঠবে।

৩) সমস্ত দেশের মধ্যবিত্ত ও গরীব সম্প্রদায় ভাবী যুদ্ধের জন্যে ত্রস্ত হয়ে আছে। শান্তি সম্মেলনের নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত দেশে সহি সংগ্রহ করা যদি আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে আরম্ভ করি, তার মধ্য দিয়েও মিলিত ফ্রন্ট গড়ে উঠবে।

৪) বৃহৎ জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমস্ত চাষীকে একত্রিত করা ও ধনিকে বিরুদ্ধে

মজুরের ছোট বড় লড়াই-এর মধ্যে বিভিন্ন প্রগতিশীল ট্রেড ইউনিয়ন দলকে একত্রিক করার ভিতর দিয়েও যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠবে। বোম্বাই ধর্মঘটে সোস্যালিষ্ট পার্টি নেতৃত্বের কঠোর বিরোধিতা সত্ত্বেও সাধারণ মজুরের মধ্যে এই মিলিত ফ্রন্ট গড়েছে।

পার্টির মধ্যে এক অংশ হয়ত মনে করতে পারেন যে এই সমস্ত কাজ করে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তারপর গেরিলা যুদ্ধ—সে ত অনেকদিন লাগবে, সে ত দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি। আমরা তাদের আশ্বাস দিতে পারি যদি আমাদের বিপ্লবী পার্টি বর্তমান অন্তর্দ্বন্দ্বকে সত্বর মিটিয়ে Inner Party Democracy (পার্টির ভেতরকার গণতন্ত্র) এবং Democratic Centralism (গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা) এর ভিত্তিতে নতুন করে পার্টিকে পুনর্জীবিত করে সক্রিয়ভাবে কাজে লাগে, তাহলে উক্ত আইনি আন্দোলনসমূহ অতি শীঘ্রই ফলপ্রসূ হবে। তার কারণ জাতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমাদের পক্ষে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোচনীয় অবস্থার পরিণামে দেশে দুর্ভিক্ষের ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। পুঁজিবাদী শোষণের নগ্নরূপ আজ হাজার হাজার মানুষের ক্রন্দনের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে—কংগ্রেস নেতাদের তথাকথিত জনদরদী ভাবমূর্তি দ্রুত অপসারিত হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং দেশীয় ধনবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করা এই শাসকবর্গের] সাধ্য নেই জনতার কোন অভাব বা দাবি মেটায়। তাই দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে দ্বিতীয় পর্যায়ে জমিদার-জোতদারের ধানের গোলা দখল করা এবং তৃতীয় পর্যায় জমি দখল করা—এই আন্দোলনের ভিতর দিয়ে কৃষক তার নিজের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের জন্যে সৃষ্টি করবে ভলান্টিয়ার। এর নেতৃত্ব দিতে হবে পার্টিকে—কেমন করে ধাপে ধাপে এই লড়াই গেরিলা লড়াইয়ের পর্যায়ে যাবে তার বিচার করতে হবে পার্টিকে। জনসাধারণের ধাপে ধাপে কিন্তু দ্রুত পরিবর্তনশীল এই অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পার্টির correct slogans [সঠিক শ্লোগান] এর মধ্যে যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন দল বা ব্যক্তি যে কতখানি যেতে চায় তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যুক্তফ্রন্টের অর্থ এই নয় যে পার্টি তার নিজস্ব কর্মধারা বিসর্জন দেবে। ঠিক এইরকম, বাস্তুহারা কৃষক ও মজুর আন্দোলনকেও ধাপে ধাপে যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে Constitutional [নিয়মতান্ত্রিক] আন্দোলন থেকে গেরিলা আন্দোলনে রূপান্তরিত করার দায়িত্ব পার্টির—অবশ্য আসল জোর দিতে হবে গ্রামে। এর জন্যে নিশ্চয়ই সংগঠন চাই, চাই প্রস্তুতি, চাই যুক্তফ্রন্ট। চীন স্বাধীন হল, কোরিয়া হয় হয়, ভিয়েতনাম হতে চললো, মালয়, বর্মা লড়ছে, আর আমরা পিছিয়ে পড়েছি—সুতরাং আজই গেরিলা যুদ্ধ লাগাও এইরকম দিবাস্বপ্ন দেখে আনন্দ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু বিপ্লব সফল হয় না।

পরিশেষে আমরা বক্তব্য আজ পার্টির মধ্যে "Armed struggle" [সশস্ত্র লড়াই] ও "No armed struggle" [সশস্ত্র লড়াই চাই না] এর প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন, বর্তমান ট্যাকটিক্স কি হবে? টিটোবাদী বামপন্থী হঠকারিতার ফলে আজ সমস্ত পার্টি খণ্ড বিখণ্ড। সুতরাং আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সমস্ত সাধারণ সভ্যদের পরামর্শানুযায়ী ঠিক করতে হবে। মাথার উপর নেতাদের উপর দৃঢ় বিশ্বাস না থাকতে—তাদেরও উচিত "সেন্ট্রালিজম" বা কেন্দ্রিকতার নাম দিয়ে ডিক্টেটরী না চালানো।

৪ অক্টোবর প্রাপ্ত —মঙ্গল

নোট : পলিটব্যুরোর মেম্বরদের আত্মসমালোচনা সম্বন্ধে বা আমি প্রবন্ধে লিখেছি তার মধ্যে একটা খবর ভুল দেওয়া হয়েছে। পরে সেটা ধরা পড়েছে। আমার প্রবন্ধে আছে—ক্রসরোডের প্রতিনিধি যিনি যুগোস্লাভিয়াতে ছিলেন তাঁহাকে সময়মত ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়নি। কিন্তু আসলে এটা হবে রমেশ থাপ্পর "ঢাংজুং"এর প্রতিনিধি হিসাবে বাহাল ছিলেন বোম্বাইতে। আর একটি জরুরি ঘটনা এখানে বলা প্রয়োজন। যুগোস্লাভ টিটো সরকারের ট্রেড ডেলিগেশনকে পার্টি হেডকোয়ার্টার্স দেখান হয়েছিল একথা GS স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। টীটো সরকারের প্রেরিত লোক টিটোপন্থী নয় এই আজগুবী কথা পি-বি'র নেতারা কেমন করে বিশ্বাস করলেন তা সাধারণের বুদ্ধির অগোচর—বিশেষতঃ যখন টীটো সরকার সমস্ত দিক দিয়ে সমাজবাদী দেশসমূহের প্রকাশ্য শত্রুতা আরম্ভ করেছে।

টিকা : প্রাদেশিক পার্টি আলোচনার এই লেখাটির মাঝের একটি পৃষ্ঠা না থাকাতে সেই অংশটুকু ([ ]) অনিল বিশ্বাস সম্পাদিত সংশ্লিষ্ট বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৭৫ পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া হয়েছে। (—সম্পাদক)

পার্টির অভ্যন্তরীণ সংকট ও তাহার সমাধানের পথ
অন্তঃপার্টি সংগ্রামের পর্যালোচনা

(২)

লেখক—প্রাণেশ (সম্পাদক, কলকাতা ডি.ও.সি.) এবং ইলিয়াস (কলকাতা ডি.ও.সি. সভ্য)

[ভারতের পার্টির বিভিন্ন সময়ের বিচ্যুতির বা সংকটের ঐতিহাসিক মূল অন্বেষণ করা বা বিচার করা, অথবা তাহার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের পার্টি গঠনের ইতিহাস আলোচনা করা এই দলিলের উদ্দেশ্য নহে। শিরোনামায় যাহা লেখা হইয়াছে তাহাতেই ইহার উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ পার্টির সংকট সমাধানের পথের আলোচনা করা, অন্তঃপার্টি সংগ্রামের পর্যালোচনা করা ও সংকট সমাধানের পথ হিসাবে সঠিক অন্তঃপার্টি সংগ্রামের পথ নির্দেশ করা। মনে রাখিতে হইবে কলিকাতার অন্তঃপার্টি সংগ্রামেরই পর্যালোচনা ইহাতে করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি পার্টি সভ্যকে ও প্রতিটি ইউনিটকে এই দলিলটি আলোচনা করিতে ও ইহার উপর তাঁহাদের মতামত জানাইতে আমরা অনুরোধ জানাই]

"লাষ্টিং পীস"-এর ২৭শে জানুয়ারীর সম্পাদকীয় প্রকাশিত হওয়ার পর দীর্ঘ দশমাস অতিবাহিত হইয়াছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবের চরিত্র, স্তর ও রণনীতি বিচারে কি কি মূল ট্রটস্কীবাদী-টিটোবাদী ভুল করিয়াছে—তাহা এই সম্পাদকীয়, পিকিং ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনের ইস্তাহার, সোভিয়েত ও চীনের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের দলিলগুলি নির্দেশ করিয়াছে। শুধুমাত্র তাহাই নহে মার্ক্সবাদ-সম্মত পদ্ধতিতে বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনার ভিত্তিতে রণকৌশল কি হইবে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্বের এইসকল গুরুত্বপূর্ণ দলিলগুলি তাহারও মোটামুটি ও মূল নির্দেশ দিয়াছে।

তাহার পর এই দীর্ঘ সময়ে ইহাই আশা করা স্বাভাবিক ছিল যে এই সকল দলিলের উপর ভিত্তি করিয়া অন্তঃপার্টি সংগ্রামের মধ্য দিয়া ভারতের পার্টি সঠিক ঐক্যবদ্ধ রণনীতি ও রণকৌশল স্থির করার পথে ও তাহারই ভিত্তিতে সাংগঠনিক ঐক্য ও আস্থাভাজন নেতৃত্বের পুনর্গঠন করার কাজে অনেকখানি অগ্রসর হইতে পারিবে, পার্টির অভ্যন্তরীণ সংকট সমাধানের পথে বহুল পরিমাণে অগ্রসর হইবে।

কিন্তু তাহা না হইয়া পার্টির অভ্যন্তরীণ সংকট গুরুতর আকার ধারণ করিয়া আজ চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। পার্টির সম্মুখে আজ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, টুকরা টুকরা হইয়া যাইবার বিপদ উপস্থিত।

কেন এইরূপ বিপরীত পরিস্থিতি হইল? "লাষ্টিং পিস"-এর সম্পাদকীয় প্রকাশিত হইবার পর আন্তর্জাতিক দলিলগুলির উপর ভিত্তি করিয়া ঐক্যবদ্ধ সঠিক রণকৌশল স্থির করা ও

আস্থাভাজন, যোগ্য নেতৃত্ব পুনর্গঠন করা, এবং এই উদ্দেশ্যেই অন্তঃপার্টি সংগ্রাম চালানো— ইহাই পার্টির সামনে অন্যতম প্রধান কর্তব্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে গত দশমাস এই অন্তঃপার্টি সংগ্রামই (IPS) করা হইয়াছে। পার্টির পুনর্গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি ও পি.বি. হইতে শুরু করিয়া মধ্যবর্তী স্তরের ও জিলা স্তরের নেতারা ও সাধারণ পার্টি সভ্যের অধিকাংশই বলিবেন যে— অন্তঃপার্টি সংগ্রামে তাঁহারা সকলেই কমবেশী অংশগ্রহণ করিয়াছেন।

তাহা সত্ত্বেও এইরূপ ফল হইল কেন? তাহার পর্যালোচনা ও বিচারের প্রয়োজন আছে। তাহা না হইলে পার্টির অভ্যন্তরীণ সংকট সমাধানের সঠিক পথের সন্ধান মিলিবে না, সমাধান হওয়া তো দূরের কথা। এই দলিলে তাহাই করা হইয়াছে ও অন্তঃপার্টি সংগ্রামের সঠিক পথের সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাতে কোন রাজনৈতিক মতামতের বা প্রশ্নের অবতারণা করা হয় নাই বা তাহার আলোচনা সমালোচনাও করা হয় নাই। তাহা করা এই দলিলের উদ্দেশ্য নহে।

অন্তঃপার্টি সংগ্রাম : প্রথম পর্যায় : সভ্য-সাধারণের ভূমিকা

পুরোনো পি.বি'র ট্রটস্কীবাদী-টিটোবাদী নীতি বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার বিপর্যয়কারী ফলাফল, শ্রমিকশ্রেণি সহ অধিকাংশ গণতান্ত্রিক জনতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পার্টি ভাঙ্গিয়া বিলুপ্ত হইবার বিপদ, গণ-সংগঠনগুলি চুরমার হইয়া যাওয়ার চিত্র চোখের সামনে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছিল। কেন্দ্রিকতা ও শৃঙ্খলার নামে স্বৈরতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতা ও উৎপীড়নের যাঁতাকলে পিষ্ট হইয়া পার্টি সভ্যরা ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন। এই সময়ে "লাষ্টিং পীস"-এর সম্পাদকীয় যেন কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল। মূল ভুলগুলি ধরাইয়া দিয়া পার্টির সভ্যদের সঠিক পথের সন্ধান দিল। তাঁহারা ট্রটস্কীবাদী-টিটোবাদী নীতি ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিলেন।

পুরোনো পি.বি'র প্রথম বিবৃতিতে "লাষ্টিং পীস"-এর সম্পাদকীয় গ্রহণ করার নামে তাহার বিকৃত ট্রটস্কীবাদী ব্যাখ্যা দিয়া পুরোনো নীতি ও নেতৃত্বকে চালু রাখার জঘন্য অপচেষ্টাকে তাঁহারা ঘৃণায় দূরে নিক্ষেপ করিলেন, দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করিলেন—এখানে ওখানে সামান্য ভুল নয়। বিপ্লবের চরিত্র ও স্তর বিচারে; শ্রেণি বিন্যাস, রণনীতি ও রণকৌশল স্থির করণে সবকিছুই ভুল হইয়াছে। কেন্দ্রিকতা ও শৃঙ্খলার নামে সমস্ত অন্তঃপার্টি গণতন্ত্রকে পিষিয়া মারিয়া পার্টিতে স্বেচ্ছাচারী সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হইয়াছে।

পার্টি সভ্যদের নিকট হইতে সাধারণভাবে দাবি উঠিল

১) সঠিক ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক পলিসি ও আস্থাভাজন নেতৃত্ব সৃষ্টি করার জন্য তৃতীয় পার্টি-কংগ্রেস ও সর্বস্তরে পার্টি কন্‌ফারেন্স করিতে হইবে।

২) দ্বিতীয় পার্টি-কংগ্রেসের থিসিস বাতিল করিয়া অবিলম্বে একটি খসড়া মূল রাজনৈতিক প্রস্তাব পার্টিতে প্রচার করিতে হইবে। ইহার ভিত্তিতে ব্যাপক আলোচনা ও মত বিনিময়ের সুবিধার জন্য পার্টির বেআইনি অবস্থায় সম্ভাব্য সর্বাধিক পরিমাণ সুযোগ সুবিধার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া অন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(ইহার অর্থ : পার্টিনীতি স্থির করা ও নেতৃত্বের পুনর্গঠন করার কাজে পার্টির সভ্য সাধারণকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিতে দিতে হইবে। উপর হইতে কিছু চাপানো চলিবে না। পার্টিতে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চাই।)

৩) অবিলম্বে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা আহ্বান করিয়া পুরোনো পি.বি. ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। অন্তবর্তীকালের জন্য একটি অস্থায়ী পি.বি. অথবা "ষ্টিয়ারীং ড্রাফটিং কমিটি" চাই যাহারা উপরোক্ত কর্তব্যগুলি সম্পাদন করিবে।

ট্রটস্কীবাদ-টিটোবাদের প্রধান প্রধান পাণ্ডাদের কেন্দ্রীয় কমিটি হইতে বহিষ্কার করিতে হইবে।

৪) পুরোনো পি.বি. কর্তৃক সৃষ্ট পি.সি.ডি.সি. প্রভৃতি নিম্নতর কমিটিগুলি অবিলম্বে ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে ট্রটস্কীবাদ-টিটোবাদের ধ্বজাধারী প্রধান প্রধান চেলাদের বাদ দিয়া যথাসম্ভব গণতান্ত্রিক উপায়ে পার্টি সভ্যদের মত নিয়া সমালোচনা আত্মসমালোচনার ভিত্তিতে, অন্ততপক্ষে নিম্নতম আস্থাভাজন অন্তর্বর্তীকালীন পি.সি.ডি.সি. প্রভৃতি গঠন করিতে হইবে।

(৩ এবং ৪-এর অর্থ হইতেছে কেন্দ্রিকতাকে অস্বীকার করা হইতেছে না। রাজনৈতিক প্রস্তাব উপস্থিত করা, পার্টি-কংগ্রেস ও কন্‌ফারেন্সগুলি আহ্বান করা ও ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা দ্বারা তাহার প্রস্তুতি করার কাজে উপরন্তু অন্তর্বর্তীকালীন কমিটিগুলির নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে ১, ২, ৩ ও ৪ এর মিলিত অর্থ হইতেছে অন্তঃপার্টি সংগ্রামের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার বাস্তব প্রয়োগ।)

৫) বাম-বিচ্যুতির উৎসমূল খুঁজিয়া বাহির করার জন্য পুরোনো পি.বি. সি.সি. পি.সি. ডি.সি'র আত্মসমালোচনামূলক রিপোর্ট চাই।

৬) ট্রটস্কীপন্থী-টিটোপন্থী নেতৃত্বের দ্বারা কৃত সকল শাস্তিমূলক ব্যবস্থার পুনর্বিবেচনা চাই।

৭) পার্টির উচ্চতম কমিটিগুলির মধ্যে সচেতন টিটোবাদী সাম্রাজ্যবাদী চর আছে কিনা খুঁজিয়া বাহির করার জন্য একটি "অনুসন্ধান কমিটি"র নিয়োগ চাই।

অন্তঃপার্টি সংগ্রামের এই পর্যায়ে—অর্থাৎ পুনর্গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠির পূর্বে পার্টির সভ্যসাধারণের আলোচনা-সমালোচনার ভিতর দিয়া যে কয়টি সিদ্ধান্ত ও অন্তঃপার্টি সংগ্রামের যে পদ্ধতির দাবি ব্যক্ত হয় তাহা মোটামুটি এই। এই সময়েই পার্টির সভ্যসাধারণের ব্যাপকতম অংশ অন্তঃপার্টি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। এই সময়ে অন্তঃপার্টি সংগ্রাম ছিল বলিষ্ঠ পর্যায়ে এবং গুণগতভাবে উচ্চস্তরে। পার্টি সভ্যসাধারণ এইজন্য স্বভাবতই গর্ব অনুভব করিতে পারেন।

সঙ্গে সঙ্গে এই পর্যায়েই দুইটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে

প্রথমত—এই পর্যায়ে আলোচনা-সমালোচনা সীমাবদ্ধ ছিল প্রধানত নেতিবাচক স্তরে। অর্থাৎ বিপ্লবের চরিত্র, স্তর ও রণনীতির বিচারে কি কি মূল ভুল হইয়াছে আলোচনা তাহাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রকৃতপক্ষে "লাষ্টিং পীস"-এর সম্পাদকীয়ই এই মূল ভুলগুলি নির্দেশ করিয়া দিয়াছিল। তাই এই বিষয়ে ও পুরোনো নেতৃত্বগুলির সমালোচনায় তাহাদের অপসারিত করার দাবিতে স্বভাবতই ঐকমত্য ছিল। এই ঐকমত্য ছিল নেতিবাচক সিদ্ধান্তগুলিতে এবং সমালোচনাতে।

তখনও পর্যন্ত ইতিবাচক আলোচনা শুরু হয় নাই অথবা সেই কর্তব্য সামনে আসে নাই। অর্থাৎ সঠিক রণকৌশল স্থির করা, অন্তর্বর্তীকালের নেতৃত্ব গঠন করা প্রভৃতি কর্তব্যগুলি ও

তাহার আলোচনা পিছনেই ছিল। সুতরাং অন্তর্নিহিত তীব্র মতবিরোধের অস্তিত্ব থাকলেও তাহা পরিস্ফুট হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ—এই সময়ই একটি ধারা (Trend) দেখা যায় যাহার বক্তব্য ছিল—কেন্দ্রীয় কমিটি কংগ্রেস আহ্বান করিবে না; বা শেষ পর্যন্ত চাপে পড়িয়া আহ্বান করিলেও কংগ্রেস তাহাদের লোকের দ্বারাই পূর্ণ থাকিবে; অতএব কংগ্রেসেও বিশেষ কিছু হইবে না। সুতরাং সর্বপ্রকার কেন্দ্রকে কার্যত অস্বীকার করিয়া নীচে হইতে স্তরে স্তরে পার্টিকে পুনর্গঠন করা ও পার্টিনীতি স্থির করার দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। এই প্রসঙ্গে নরওয়ের পার্টির সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতাও বিকৃত করিয়া উপস্থিত করা হয়।

এই সময় এই ধারা (Trend) খুব প্রবল না হইলেও ইহার শক্তিশালী অস্তিত্ব ছিল।

অপরপক্ষে অধিক সংখ্যক পার্টি সভ্যের ও প্রবলতর ধারা (Trend) যেটি ছিল তাহা এই—পার্টি কংগ্রেস ছাড়া সংকটের সমাধান হইবে না। বাস্তব অবস্থা হইতেই কংগ্রেসের দাবি জন্ম নিয়াছে; সুতরাং এই দাবি গৃহীত হইবেই। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার হাতিয়ারের শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি পার্টি কংগ্রেস। তাহারই মারফৎ নীতি স্থির করিতে হইবে, নেতৃত্ব পুনর্গঠন করিতে হইবে ও সংকটের সমাধান করিতে হইবে। পার্টি-কংগ্রেসকে ছোট করিয়া দেখা বা সর্বপ্রকার কেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করাটা ভেদপন্থা।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ পুনর্গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠি ঃ অন্তঃপার্টি সংগ্রামে কেন্দ্রীয় কমিটি ও নতুন পি.বি'র ভূমিকা

এই চিঠিতে লিপিবদ্ধ রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সিদ্ধান্তগুলি পুরোনো কেন্দ্রীয় কমিটির সভায়ই গৃহীত হয় তাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

এই চিঠির—বিশেষ করিয়া ইহার রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলির বিস্তারিত সমালোচনা করা যদিও এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য নয়, তাহা হইলেও এই কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় এই চিঠি সকলকেই হতাশ করিয়াছে।

দেশের বাস্তব পরিস্থিতি, বিপ্লবী আন্দোলনের গভীরতা ও তাহার প্রকৃত স্বরূপ, গণসংগঠন ও পার্টির অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য সম্বলিত বিস্তৃত বাস্তব পর্যালোচনা না করিয়া নিতান্তই অসংবদ্ধ ও খাপছাড়া রূপে (Form) রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি (Conclusion) ও রণকৌশল উপস্থিত করা হইয়াছে। বিপ্লবী রণকৌশলের সকল সমস্যার ইহাতে আলোচনা অথবা উল্লেখ পর্যন্ত করা হয় নাই। যেসকল সিদ্ধান্ত বা যে রণকৌশল উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতে প্রচুর প্রতিবাদ, সন্দেহ ও সমালোচনা করার অবকাশ আছে। একটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক খসড়া প্রস্তাব উপস্থিত করার পরিবর্তে এই চিঠির প্রচার পার্টিতে বিপর্যয় ডাকিয়া আনিয়া অভ্যন্তরীণ সংকটকে গভীরতর করিয়া তুলিয়াছে।

এই চিঠিতে বর্ণিত সাংগঠনিক সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণযোগ্য নয়।

(১) পার্টি-কংগ্রেসের দাবি, পার্টির নীতি নির্ধারণে ও নেতৃত্বের পুনর্গঠনের কাজে পার্টির সভ্যসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের ভূমিকা ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে অস্বীকার করিয়া ইহাতে পুরোনো কায়দায় কেন্দ্রিকতা চালাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এইভাবে ব্যাপক অন্তঃপার্টি নীতিগত আলোচনা-সমালোচনার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

(২) পার্টির ভিতর মতবাদের সংগ্রাম ও মতবিরোধের সংঘর্ষকে অস্বীকার করা হইয়াছে। এমনকি কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের সাংগঠনিক থিসিসের নীতিকে অগ্রাহ্য করিয়া দাবি করা হইয়াছে, কেন্দ্রীয় কমিটির গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাব কায়মনবাক্যে গ্রহণ করা কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য হইবারও মাপকাঠি।

(৩) পার্টি নীতি স্থির করিবার জন্য যখন ব্যাপক ও তীব্র অন্তঃপার্টি সংগ্রাম চলিতেছে, একাধিক মতের ধারা অপরিচ্ছন্নভাবে হইলেও যখন নিশ্চিতরূপে ফুটিয়া উঠিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে, সেই সময় কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠি তাহাদের গৃহীত নীতি জবরদস্তি পার্টির উপর চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া তাহারই ভিত্তিতে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা দাবি করিয়াছেন। ইহাও পুরোনো কায়দা ও পার্টি সভ্যসাধারণের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করা ব্যতীত আর কিছু নয়।

(৪) পার্টির সংকটের গভীরতা বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া পার্টি সভ্যদের সমালোচনাকে, তাহাদের দাবি ও ন্যায্য বিক্ষোভকে উপস্থিত করা হইয়াছে বিকৃতরূপে।

(৫) পার্টি-কংগ্রেসের ঘোষণা তো করা হইলই না—প্রাদেশিক স্তরেও খোলাখুলি কনফারেন্সের ঘোষণা করা হয় নাই। অন্তর্বর্তীকালে প্রাদেশিক ও জিলা নেতৃত্বগুলি কিভাবে পুনর্গঠিত হইবে সেকথা কৌশলে চাপিয়া যাওয়া হইয়াছে।

(৬) অত্যন্ত অন্যায়ভাবে পুরোনো কেন্দ্রীয় কমিটির তিনজন সভ্যকে সভা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। অথচ ট্রটস্কীবাদ-টিটোবাদের প্রধান প্রধান উদ্যোক্তা ... ও চেলারা সভায় স্থান পাইলেন। রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণে অংশ লইলেন। যাহাদের ডাকা হইল না ঘটনাচক্রে তাহারা ট্রটস্কীবাদী-টিটোবাদী নীতি ও কার্যকলাপের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন না।

দ্বিতীয় পার্টি-কংগ্রেসে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটিকে অত্যন্ত হঠকারিতার সহিত ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনর্গঠন করা হইল। ট্রটস্কীবাদী-টিটোবাদী নীতি ও প্রধান প্রধান অপরাধীকে অপসারিত করিয়া অন্যান্য যাহারা ট্রটস্কীবাদী-টিটোবাদী অপরাধ হইতে মুক্ত ছিলেন তাহাদের সমবেত করিবার পরিবর্তে, জেল হইতে যাহারা কোন কোন বিষয়ে ট্রটস্কীবাদের প্রতিবাদ করেছিলেন ও বাহিরে যাহারা ট্রটস্কীবাদ-টিটোবাদী অপরাধগুলি হইতে মুক্ত ছিলেন তাহাদেরও পর্যন্ত অপসারিত করা হইল।

অপরপক্ষে টিটোবাদী পি.বি'র একজন প্রধান পাণ্ডা কমরেড গৌরকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান দেওয়া হইল। আসামের কমরেড মাধব, যিনি আসামে সংস্কারবাদী বিচ্যুতি বই লিখিয়া রণদিভের উপরও টেক্কা মারিয়াছেন তাঁহাকে রাখিয়া পি.বি'তে স্থান দেওয়া হইল।

(৭) এই চিঠিতে আত্মসমালোচনার সঠিক মনোভাবের অভাব রহিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আড়াল করিবারও চেষ্টা করা হইয়াছে।

(৮) একমাত্র অন্তঃপার্টি ও আন্তর্জাতিক দলিল চাপিয়া রাখা ও সেগুলি বিকৃত করিয়া উপস্থিত করার অপরাধের জন্যই রণদিভে ও অধিকারীকে সাসপেণ্ড করা উচিত ছিল। এগুলি তখনই প্রমাণিত হইয়া গিয়াছিল। আর অধিকারীর তো ইহা একটি দীর্ঘকালের অর্জিত অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা করা হয় নাই।

(৯) আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভিজ্ঞতা, অলঙ্ঘনীয় নীতি ও গৃহীত পদ্ধতি অনুযায়ী পার্টির উচ্চতম নেতৃত্বে টিটোবাদী সাম্রাজ্যবাদী চরের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে কিনা তাহা গুরুত্ব দিয়া ও যত্নসহকারে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি উপযুক্ত অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত

করা উচিত ছিল। তাহার পরিবর্তে যে অনুসন্ধান কমিটির কথা বলা হইয়াছে তাহা ধোঁকার টাটি মাত্র।

তৃতীয় পর্যায় ঃ পি. ও. সি. সংগঠন

এইভাবে কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠিতে উপস্থাপিত নীতি, সিদ্ধান্তগুলি ও অন্তঃপার্টি সংগ্রামের পদ্ধতি পার্টি সংকটের সমাধানের সার্থকপথে পরিচালিত না করিয়া সংকটকে আরও গভীর করিল, পার্টিকে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ঐক্যের পথে পরিচালিত না করিয়া সাহায্য করিল বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতাকে, ভেদপন্থী ধারাকে (Trend)। কেন্দ্রীয় কমিটির উপর ও অন্ধ্র নেতৃত্বের উপর আস্থা বহুল পরিমাণে ধূলিস্যাৎ হইল।

পার্টির সভ্যসাধারণের মতামত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াই পি.বি. প্রাদেশিক সাংগঠনী কমিটি মনোনয়নের কাজে লাগেন।

কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠির পর স্বভাবতঃই পি.বি. কর্তৃক পি.ও.সি. মনোনয়নে সভ্যসাধারণ আপত্তি জানান। তাঁহারা মত প্রকাশ করেন ঃ—

(১) অবিলম্বে মল্লিক পি.সি'কে অপসারণ করিতে হইবে।

(২) পি.বি. কর্তৃক পি.ও.সি. মনোনয়ন করা চলিবে না।

(৩) মল্লিক পি.সি'র কাহাকেও পি.ও.সি'তে লওয়া চলিবে না।

(৪) মোটামুটি যোগ্য ও আস্থাভাজন পি.ও.সি. গঠন করার জন্য আত্মসমালোচনামূলক রিপোর্ট ও নিজ নিজ রাজনৈতিক মত সম্বলিত লেখাসহ কতগুলি নাম পার্টি সভ্যদের নিকট প্রচার করা হউক। তাহার ভিত্তিতে যথাসম্ভব মত গ্রহণ করিয়া ন্যূনতম গণতান্ত্রিক উপায়ে পি.ও.সি. গঠন করা হউক।

পার্টি সভ্যসাধারণের একটি বৃহৎ অংশের এই মতামত উপেক্ষা করিয়া, তাহাদের বিচারের উপর সামান্যমাত্র ভরসা না করিয়া পি.বি. তথাকথিত প্রাচীন নেতাদের (Veteran) সহিত আপস আলোচনা অর্থাৎ দর কষাকষিতে লাগিয়া গেলেন। সমস্ত ব্যাপারটি অত্যন্ত নক্কারজনক সুবিধাবাদে পরিণত হইল। অবশেষে আপত্তিজনক, সুবিধাবাদী, অসাধু ও পরস্পর বিরোধী এক সার্কুলারে পি.বি. ঘটনাটি পার্টির সামনে উপস্থিত করেন। জুন মাসের শেষ হইতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্য পর্যন্ত এই কুৎসিৎ দর কষাকষি চলিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত পি.বি. সিদ্ধান্ত চাইলেন ঃ— রাজনৈতিক মতামত, গুণাগুণ, অথবা যোগ্যতা বিচার করিয়া নয়— দ্বিতীয় পার্টি-কংগ্রেসের পূর্বেকার নির্বাচিত ৩০ জনের পি.সি'র অবশিষ্ট সভ্যরা ও পি.বি'র মনোনীত প্যানেলের ব্যক্তিরা একত্রে একটি পি.ও.সি নির্বাচিত করিবেন। এই প্রকারেই পি.ও.সি. গঠিত হইল।

কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠি ও পি.বি'র পি.ও.সি. গঠনের পদ্ধতি ও তৎসম্পর্কিত কার্যকলাপ পার্টির অভ্যন্তরীণ সংকটকে এই পর্যায়ে গুরুতর করিয়া তোলে। অন্তঃপার্টি সংগ্রাম এই সময় হইতেই গুণগতভাবে খুবই নীচুস্তরে নামিয়া যায়।

অন্তঃপার্টি সংগ্রামের মূল কথা ঃ—পার্টিকে রাজনৈতিক ও সাংগঠিক ভাবে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সঠিক রাজনীতি স্থির করার উদ্দেশ্য, আদর্শ ও মতবাদগত সংগ্রাম পরিচালনা করা।

এই পর্যায়ে দু'এক ক্ষেত্রে মতবাদগত সংগ্রাম চালাইবার ও সেই উপলক্ষ্যে লিখিত ও মৌখিক মত বিনিময়ে সামান্য দুর্বল প্রচেষ্টা হইলেও একথা সাধারণভাবেই বলা যাইতে পারে যে অন্তঃপার্টি সংগ্রাম আত্মসমালোচনা, মতাদর্শ বিচার ও সঠিক রণকৌশল লইয়া আলোচনার খাত ছাড়িয়া প্রবাহিত হইল ভিন্ন খাতে।

মধ্য (প্রাদেশিকা) স্তরের ভূমিকা

এই পর্যায়ে কিছু পুরোনো নেতা—তথাকথিত Veteran খুবই সক্রিয়ভাবে অন্তঃপার্টি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ছিলেন মল্লিক পি.সি'র প্রত্যক্ষ সংগঠক ও যন্ত্র হিসাবে ট্রটস্কীবাদী নীতির চরম সমর্থক ও পরিচালক। এমনকি "লাষ্টিং পীস"-এর সম্পাদকীয় উপর রণদিভে পি.বি'র প্রথম বিবৃতিকে আস্তিন গুটাইয়া সমর্থন করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ ছিলেন যাহারা ট্রটস্কীবাদী-টিটোবাদী কার্যকলাপ হইতে মুক্ত থাকিলেও প্রথম পর্যায়ে রণদিভে পি.বি'র নীতি ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এবং তাহাদের অপসারণের দাবি উঠাইবার জেহাদে সরাসরি অংশগ্রহণ করিতে ভয় পাইয়াছেন ও অস্বীকার করিয়াছেন। রণদিভে পি.বি'র পরিবর্তে মল্লিক পি.সি'র বিরুদ্ধে সমগ্র আক্রমণের ধার নিযুক্ত করিবার সুবিধাবাদী "কৌশল" অবলম্বন করিয়াছিলেন।

পূর্বের ভূমিকা যাহাই হউক না কেন ও নিজেরা আত্মসমালোচনা না করিলেও ইহারা যখন সক্রিয়ভাবে অন্তঃপার্টি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিলেন তখন আশা করা গিয়াছিল যে, প্রথমত ইহারা অন্তঃপার্টি সংগ্রামকে সঠিক নীতি স্থির করিবার উদ্দেশ্যে মতবাদগত বিরোধের রাজনৈতিক স্তরে উন্নীত করিবেন। দ্বিতীয়ত্ব সাথে সাথেই পার্টির আন্দোলনগত দৈনন্দিন অতি সাধারণ কাজ পর্যন্ত যাহা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার প্রধান দায়িত্ব লইবেন। ইহা তাহাদের নিঃসন্দেহে কর্তব্য ছিল।

কিন্তু তাহা হইল না। ইহারা যে ধরনের অন্তঃপার্টি সংগ্রাম করিলেন তাহার সার তাৎপর্য দাঁড়াইল—পি.ও.সি. কাহাকে লইয়া হইবে ও কিভাবে হইবে; ও ইহাদের পি.ও.সি'তে যাওয়া সম্পর্কে সাধারণ সভ্যদের একটা নির্ভরযোগ্য সমর্থন আছে কিনা।

একদিকে এই ধরনের অন্তঃপার্টি সংগ্রাম চলিতে লাগিল, অপরদিকে চলিতে লাগিল পি.বি'র সহিত আপস-আলোচনা, দর-কষাকষি।

এইসব পুরোনো নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে কেহ কেহ অসংখ্য সাধারণ সভ্যের সহিত দেখা করিয়াছেন, তাহাদের লইয়া ছোট ছোট অজস্র মিটিং করিয়াছেন কিন্তু পার্টিতে আন্দোলনগত দৈনন্দিন সক্রিয়তা ফিরাইয়া আনা, কাজকর্ম পুনরায় চালু করা, অথবা অন্তঃপার্টি সংগ্রামকে মতবিরোধগত আলোচনার রাজনৈতিক স্তরে প্রতিষ্ঠিত করার বিশেষ কোন প্রচেষ্টাই করেন নাই বলা চলে।

সাধারণ সভ্যদের ভূমিকা— অন্তঃপার্টি সংগ্রাম বুর্জোয়া নির্বাচন দ্বন্দ্বে ও ভোট সংগ্রহের নিম্নতম সাংগঠনিক পর্যায়ে নামিয়া আসিল। মিথ্যা কুৎসা রটনা, অপপ্রচার বিদ্বেষ-প্রচার প্রকট হইয়া প্রবল আকারে দেখা দিল। দেখা যাইতে লাগিল বিভেদ, বিচ্ছিন্নতা ও উপদলীয় চক্র গঠন করিবার ঝোঁক। স্থানে স্থানে দেখা যাইতে লাগিল পার্টির আনুষ্ঠানিক ঐক্যের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বী কেন্দ্র গঠনের চিন্তা। গোপন পার্টির নিরাপত্তার প্রাথমিক নিয়মকানুনও চুলায় দিয়া গুরুতর

টেক কাজে নিযুক্ত গোপন কর্মীদের এই ধরনের অন্তঃপার্টি সংগ্রামে যথেচ্ছ ব্যবহার করা হইতে লাগিল। টেকে দেখা দিল গুরুতর বিশৃঙ্খলা। পুরোনো নেতৃস্থানীয় কমরেডও কেহ কেহ এই মারাত্মক পার্টি-বিরোধী পরামর্শ দিতে লাগিলেন যে জুলাই মাসের মধ্যে মল্লিক পি.সি'কে অপসারিত না করিলে অগস্ট মাস হইতে পার্টিতে টাকা দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে। কোন কোন স্থানে আন্দোলনের চেষ্টাকেও সক্রিয় ও সচেতনভাবেই সাবোটাজ করা হইল। কোন স্থানে পি.বি'র খাদ্য ও শান্তি আন্দোলন সম্পর্কে সার্কুলার দুইটি বিতর্কমূলক প্রশ্নে ভরা, ভুল ও বোগাস বলিয়া শান্তি ও খাদ্য আন্দোলনে বাধা দেওয়া হইল।

আন্দোলনগত সমস্ত কাজ স্তব্ধ, সভ্যসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ বসিয়া পড়িয়াছেন, পার্টির অর্থনৈতিক সংকট চরমে—টাকা দেওয়াও বন্ধ হওয়া শুরু হইল। পার্টির মধ্যে পরস্পরে সন্দেহ ঢুকিয়া পড়িল, টেকযন্ত্র হইয়া পড়িল বিপন্ন। এই ধরনের অন্তঃপার্টি সংগ্রামের জোয়ারে নিরাপত্তার সমস্ত নিয়ম অগ্রাহ্য করিবার ফলে ৭/৮ জন পুরোনো নেতা শত্রুর হাতে ধরাও পড়িলেন।

কেন্দ্রিকতার সামান্যতম প্রয়োজনও অনেক আগেই অস্বীকৃত হইয়াছিল, এবারে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র ও পেটি-বুর্জোয়া নৈরাজ্যবাদের প্রবল ধারা দেখা দিল। পার্টি ভাঙ্গি য়া পড়িয়া টুকরো টুকরো হইয়া যাইবার উপক্রম হইল।

এই প্রকারের অন্তঃপার্টি সংগ্রামের বিরোধী ব্যক্তিরা বা ইউনিটগুলিও এই ধারার সক্রিয় প্রতিবাদে আগাইয়া আসিলেন না। সঠিক পথ প্রদর্শন করিয়া তাহার পিছনে পার্টিকে সমবেত করার দায়িত্ব তাহারা লইলেন না। এই ধরনের অন্তঃপার্টি সংগ্রাম হইতে বিরত হইয়া, পরাজয় ও পলায়নের মনোভাব লইয়া তাহারা নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করিলেন মাত্র।

এইভাবে পি.ও.সি. যখন গঠিত হইল তখন পার্টির সংকট চরমে উঠিয়াছে। স্বভাবতই পি.ও.সি. পার্টিতে কোন নতুন উৎসাহের সঞ্চার করিতে পারিলেন না।

ভেদপন্থী ধারা : পি.ও.সি. কর্তৃক ডি.ও.সি. সংগঠন

উপরের বর্ণিত ধরনের অন্তঃপার্টি সংগ্রামের মধ্য দিয়া বিচ্ছিন্ন ও বিভেদমূলকভাবে সমস্ত প্রকার কেন্দ্রিকতাকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবলমাত্র নীচে হইতে পার্টি সংকট সমাধানের প্রচেষ্টার যে ধারা (Trend) জন্মলাভ করিয়াছিল—প্রথম পর্যায় হইতেই প্রকৃতপক্ষে যাহার অস্তিত্ব ছিল—পি.ও.সি. কর্তৃক ডি.ও.সি. গঠনের পদ্ধতি ও কার্যধারার মধ্য দিয়া তাহা প্রবলতর হইয়া প্রায় একটি উপদলের রূপ নিল।

আত্মসমালোচনা, যোগ্যতা এবং রাজনৈতিক মতামত ও মত বিরোধের সকল প্রশ্ন অগ্রাহ্য করিয়া একটি প্যানেল লইয়া শুরু হইয়া গেল ভোট সংগ্রহের এবং উপদল সংহত করিবার ক্যাম্পেন।

এই ধারার (Trend) রাজনৈতিক মত কি তাহা নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। নেতিবাচক মত যেটুকু জানা যায় তাহা এই ঃ—কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠিতে উপস্থাপিত সকল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও সমগ্র রণকৌশল বর্জন করাই ইহাদের নীতি, ইহাদের মতে সাধারণভাবেই ভারতবর্ষে সশস্ত্র সংগ্রামের অবস্থা বর্তমানে নাই।

ভেদপন্থীধারার (Trend) অন্তঃপার্টি সংগ্রামের পদ্ধতি—

পার্টির অভ্যন্তরীণ সংকট সমাধানের উদ্দেশ্যে অন্তঃপার্টি সংগ্রাম চালাইবার সাংগঠনিক নীতি হিসাবে ইহাদের মত যাহা জানা গিয়াছে তাহা নিম্নরূপ—

(১) পুনর্গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পি.বি. ট্রটস্কীবাদী-টিটোবাদী। রণদিভে উপযুক্ত শিষ্যদের হাতেই তাঁহার কর্মভার ন্যস্ত করিয়াছেন; রণদিভের আপশোষ করিবার কিছুই নাই। ইহারা যে পার্টি কংগ্রেস আহ্বান করিবেন তাহা হইবে পার্টির সংখ্যালঘিষ্ঠদের মতকে অন্যায়ভাবে চাপাইয়া দেওয়ার হাতিয়ার। পি.বি. এই রাস্তাই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা যে রাস্তা লইযাছেন তাহা পার্টিকে ভাঙ্গিয়া দেওয়ার রাস্তা। তাঁহারা পার্টির মধ্যে একটি বিভেদমূলক সংখ্যালঘিষ্ঠের চক্রান্তে পরিণত হইয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে যে বর্তমান বিভেদকারী কেন্দ্রীয় কমিটির বা পি.বি'র নিকট হইতে পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করার পথে কোন সাহায্য আশা করা যায় না।

এক কথায় বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটি ও পি.বি. একটি শত্রু কেন্দ্র। সুতরাং ইহাকে সর্বতোভাবেই অগ্রাহ্য কর।

(২) কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পি.বি'র সম্পর্কে আমাদের বিচার ও সিদ্ধান্ত এবং অন্তঃপার্টি সংগ্রামে আমাদের পদ্ধতিকে পি.ও.সি. মানিয়া না লইলে বুঝিতে হইবে তাহারা শত্রুকেন্দ্রে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পি.বি'র তল্পীবাহক অনুচরমাত্র। একই পর্যায়ে তাহাদের স্থান। সুতরাং তাহাদেরও সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করিতে হইতে পারে। (পি.ও.সি. ইহাদের ভেদপন্থী নীতি মানিযা লইবেন বলিয়া মনে হয় না।—লেখকরা)

(৩) কেন্দ্রীয়করণ আর কার্যকরী নাই। পার্টি আজ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন—পার্টি নাই। কতগুলি চক্রে পরিণত হইয়াছে।

এই পরিস্থিতিতে পার্টির সঠিক নীতি নির্ধারণ করা ও উপযুক্ত নেতৃত্ব সৃষ্টি করার ব্যাপাবে কর্তব্য কি? অর্থাৎ এই উদ্দেশ্যে অন্তঃপার্টি সংগ্রাম কি পদ্ধতিতে চালাইতে হইবে?

(৪) উপরের প্রতি ভরসা না করিয়াই, সর্বপ্রকারের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে অগ্রাহ্য করিয়াই সভ্য সাধারণকে পার্টি কংগ্রেসের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। উপরের নেতৃত্বের হাত হইতে উদ্যোগ কাড়িয়া লইয়া কংগ্রেসের পথে অগ্রসর হইবার উদ্যোগ নিজেদের হাতে লইতে হইবে।

কায়দাটা কি?

(৫) প্রথমেই লোকাল কমিটিগুলি নিজেরাই নিজেদের কনফারেন্স সংগঠিত করুন। কোন সুসংবদ্ধ, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক থিসিস নাই বা থাকিল, তাহাতে কিছুই যায় না। কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠি, অপরদিকে কমরেড ডাঙ্গে প্রভৃতির দলিল এরই ভিত্তিতে লোকাল কনফারেন্স করিতে হইবে। এই কনফারেন্সের মধ্য দিয়া লোকাল নেতৃত্ব গড়িয়া তুলিতে হইবে।

(কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠির সকল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও রণকৌশল ইহারা ইতিপূর্বেই বাতিল করিয়াছেন। অপরপক্ষে বোম্বের তিন কমরেড-এর দলিল প্রধানত কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনীতি সংগঠন নীতির সমালোচনামূলক দলিল। ইহাতে তাঁহারা কোন সুসংবদ্ধ এবং সম্পূর্ণ রাজনৈতিক নীতি ও রণকৌশল উপস্থিত করেন নাই, ইহা তাঁহারা নিজেরাই লিখিয়াছেন। অথচ এই ধারার (Trend) বাহকদের মতে এই দুইটি দলিলের ভিত্তিতেই লোকাল কনফারেন্স হইতে জিলা কনফারেন্স ডাকিতে হইবে!! (লেখকরা)

(৬) এইসব লোকাল কনফারেন্স হইতে জিলা কনফারেন্স করিতে হইবে। পি.ও.সি. বা উপরের প্রতি কোন ভরসা না করিয়াই বা তাহাদের কোন তোয়াক্কা না রাখিয়াই এই একই কায়দায় জিলা কনফারেন্স করিতে হইবে।

(৭) আরও উচ্চতর স্তরেও এই একই কায়দা প্রয়োগ করিয়া একই ব্যাপার ঘটাইতে হইবে। এইভাবে স্তরে স্তরে, পরের পর, পরের পর কনফারেন্স, কংগ্রেস ইত্যাদি হইবে। সুতরাং পার্টি-সংকটের অবসান হইবে।

(৮) প্রশ্ন উঠতে পারে ঃ এই ধরনের সম্মেলন করা কি সম্ভব? জবাবে বলা হইতেছে—নিশ্চয়ই সম্ভব। লোকাল এবং জিলা স্তরে তো বটেই কারণ এই কায়দায় জিলা কমিটি নিজেরাই উদ্যোগ লইবেন এইরূপ আশা করিবার হেতু আছে।

(এই পদ্ধতিতে অন্তঃপার্টি সংগ্রাম পরিচালনা যাহারা সমর্থন করেন ডি.ও.সি.টি. তাহাদের কবলিত করার জন্য ভোট সংগ্রহের ক্যাম্পেন করা হইয়াছে। যাহারা এই পদ্ধতির বিরোধী এবং ইহাতে অংশগ্রহণ করেন নাই, তাঁদের যোগ্যতা, পুরোনো অভিজ্ঞতা যতই প্রচুর এবং মূল্যবান হোক না কেন তাহাদের বাহিরে রাখিবারই চেষ্টা হইয়াছে। (—লেখকরা)

(৯) প্রশ্ন উঠতে পারে এই ধরনের সম্মেলনের দ্বারা সর্বভারতীয় ঐক্য গড়িয়া তুলিবার কাজে কোন সাহায্য হইবে কি? জবাবে বলা হইয়াছে ঃ মাভৈঃ! কায়দাটা একটু কঠিন বটে! কিন্তু হইয়া যাইবে; একদিন না একদিন সারা ভারতের পার্টিই এই পদ্ধতির পশ্চাতে জড়ো হইবে এবং ইহারই মারফৎ পার্টি ঐক্যবদ্ধ হইবে। বিশ্বাস রাখো—তর্ক করো না।

(১০) তবু যদি কেহ তর্ক তুলিয়া প্রশ্ন করে—যাহারা এখনই এই পদ্ধতি মানেন না তাহাদের সংখ্যাও তো কম নয়। তাহাদের কী হইবে? জবাবে এই ধারার (Trend) যুক্তিতে (Logic) এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য যে—সেই সকল ব্যক্তি এবং ইউনিট হইতে পৃথক হইয়া যাইতে হইবে, সাময়িকভাবে হইলেও।

অর্থাৎ Split—বিভেদ—পার্টিতে ডাকিয়া আনিতে হইবে। ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই কথাই আসিয়া পড়ে, সেই প্রতিদ্বন্দ্বী কেন্দ্র, প্রতিদ্বন্দ্বী পার্টি। তাহাই এই পদ্ধতি এবং যুক্তির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

(শ্রমিকশ্রেণী এবং অন্যান্য শোষিত জনতার ৩০ বৎসরের অমর আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়া যে পার্টির জন্ম, বৃদ্ধি, পরিপুষ্টি এবং সারা ভারতের পার্টিতে কেন্দ্রীভূত পরিণতি লাভ ঘটিয়াছে, ২০ বৎসরের অক্লান্ত সচেতন প্রচেষ্টা, অপরিমেয় ত্যাগ এবং বহু শহীদের রক্তদানের মধ্য দিয়া যে পার্টি কেন্দ্রীভূত সারা ভারতের রূপ পাইয়াছে, এই তীব্র অভ্যন্তরীণ পার্টি সংকটের পরিস্থিতিতেও যে পার্টিকে সারা ভারতের কেন্দ্রীভূত পার্টিরূপে রক্ষা করিয়াই সংকট সমাধানের চেষ্টা যখন প্রত্যেকটি সাচ্চা পার্টি সভ্যেরই অবশ্য কর্তব্য, তখন এই ধারার (Trend) বাহক এবং প্রচারকরা প্রথম পদক্ষেপেই পার্টিতে বিভেদ আনিয়া, পার্টিকে টুকরো করিয়া দিয়া ঐক্যবদ্ধ করিবার পথে অগ্রসর হইতে চান।! ইহাদের মতে ইহাই নাকি অন্তঃপার্টি সংগ্রামের সংকট সমাধানের সঠিক পদ্ধতি।!)

(১) মুখে অন্যরকম বলিলেও এই ধারা (Trend) পার্টিতে মতভেদ বরদাস্ত করিতে রাজি নন। মতবিরোধের স্থান এই ধারার নীতির মধ্যে নাই। অন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের বুলিটি মৌখিক মাত্র।

(২) ইহাদের পরিকল্পিত কনফারেন্সে অথবা ডি.সি. বা অন্যান্য কমিটিতে এই পদ্ধতি যাহারা সমর্থন করেন না তাহাদের স্থান নাই। ইতিমধ্যেই যাহারা ইহা সমর্থন করেন না তাহাদের ডি.ও.সি'তে পাঠানো উচিত নয় বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে।

(৩) এই পদ্ধতি পার্টির ন্যূনতম শৃঙ্খলা, যাহা বেআইনি পার্টির নিরাপত্তা রক্ষার জন্যও প্রয়োজন—তাহা সবই বিসর্জন দিয়া পূর্ণ বিশৃঙ্খলা এবং অরাজকতা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ইহা এইভাবে বেআইনি পার্টিকে শত্রুর আক্রমণের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিবে।

(৪) এই ধারা (Trend) অন্তঃপার্টি সংগ্রাম ও রাজনৈতিক ঐক্যের নামে রাজনৈতিক বিভ্রান্তি, মতাদর্শহীনতা এবং রাজনৈতিক আত্মহত্যার মধ্যে পার্টিকে নিক্ষেপ করিবে। কোন সম্পূর্ণ থিসিসের ভিত্তি ছাড়াই ইহারা কনফারেন্স ইত্যাদি করিতে প্রস্তুত।

এক কথায় এই ধারা (Trend) ২০ বছর আগের পার্টি গঠনের পূর্বেকার যুগে পার্টি গঠনের আদিম স্তরে, পার্টিকে আজ টানিয়া নামাইতে চায়।

অন্তঃপার্টি সংগ্রামের বর্তমান পর্যায়ে কলিকাতায় এই ধারাটি (Trend) নীচের তলায় স্থানে স্থানে বেশ দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। এইভাবে পার্টি সংকট আজ চরমে উঠিয়া পার্টি জীবনে বিপর্যয় ডাকিয়া আনিয়াছে। ইহার চেহারা অল্পাধিক পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে।

দায়িত্ব কাহার—

"লাস্টিং পীস"-এর সম্পাদকীয় প্রকাশিত হইবার দশমাস পরেও সংকট সমাধানের পথে অগ্রসর না হইয়া উল্টা এই বিপর্যয়ের জন্য দায়িত্ব কাহাদের?

ইহার প্রধান দায়িত্ব পুরোনো কেন্দ্রীয় কমিটির পুনর্গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির ও পি.বি'র তাহা নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করা যায়। তাহাই এই দলিলে বলা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় কমিটির সভার ছয়মাস পরেও অন্তঃপার্টি আলোচনার জন্য এবং পার্টি কংগ্রেসের মতবাদগত প্রস্তুতির জন্য কোনও সুসংবদ্ধ ও সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রস্তাব প্রচার না করিয়া পার্টির ঐক্য গঠনের কাজকে তাহারা গুরুতররূপে ব্যাহত করিয়াছেন এবং প্রচুর অনিষ্ট করিয়াছেন।

কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে মধ্যবর্তী স্তরের নেতাদের এবং নীচের তলায় আমরা সাধারণ সভ্যরা একেবারে দায়মুক্ত, গঙ্গা জলের মত শুদ্ধ পবিত্র। আমাদের নিজেদের দায়িত্বও বুঝিতে হইবে। সেই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়াই অন্তঃপার্টি সংগ্রামের এই সমালোচনা লেখা। সমালোচনা-আত্মসমালোচনার নামে কেবলমাত্র অপরের সমালোচনা করা এবং ভুল ত্রুটি বিচ্যুতির বোঝাটি অপরের স্কন্ধেই চাপানো একটি ফ্যাশান হইয়াছে। এই বাম সংকীর্ণ ফ্যাশন চালু করিয়াছিলেন রণদিভে; তাহার জের এখনও চলিতেছে।

ট্রটস্কীবাদী-টিটোবাদী, রণদিভের সুযোগ্য শিষ্য, বিভেদমূলক সংখ্যালঘিষ্ঠের চক্র ইত্যাদি আখ্যা দিয়া অপরিণত, দায়িত্বজ্ঞানহীন, লঘু চিত্তে অন্ধ নেতৃত্বকে ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দেওয়ার অভ্যাসটি পরিহার করা কর্তব্য। ভুলিয়া গেলে চলিবে না—১৯৪৪ সাল হইতে ইহারা যোশীর নীতির বিরোধিতা করিয়াছেন; দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে পার্টিকে সংস্কারবাদের পাঁক হইতে তুলিয়া বিপ্লবী নীতিতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টায় ইহাদের দান অপরিসীম। মনে রাখিতে হইবে পার্টি কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে ইহারা "অন্ধ্রের খসড়া নোট"-এর

মত উল্লেখযোগ্য দলিল প্রস্তুত করেন, যে দলিল মূলত ছিল সঠিক, যে দলিলে বলা হইয়াছিল মাও-এর নীতি ও চীনের পথ গ্রহণের কথা, যে দলিল সঠিক নীতি গ্রহণের অন্তঃপার্টি সংগ্রামে একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই দলিল ভুল ইহা প্রমাণ করিয়া বিধ্বস্ত করিবার উদ্দেশ্যেই রণদিভে তাঁহার "রণকৌশল", "কৃষক সমস্যা", "জনগণতন্ত্র" এই তিনটি দলিল প্রস্তুত করিয়া পুরো ট্রটস্কীবাদী-টিটোবাদী নীতি খাড়া করেন। মনে রাখিতে হইবে ইহারা প্রথম হইতেই রণদিভে অনুসৃত নীতির কখনও কখনও ক্ষীণভাবে হইলেও বিরোধিতা করিয়াছেন ক্রমাগত। বোম্বের তিন কমরেড তাহাদের সাম্প্রতিক দলিলেও অন্তঃপার্টি সংগ্রামে ইহাদের ভূমিকার কথা স্বীকার করিয়াছেন; ইহাদের রচিত "ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে বাম বিচ্যুতি" (ইংরাজি) পুস্তকটির প্রথমভাগের অকুণ্ঠিত প্রশংসা করিয়াছেন।

অন্ধ্র নেতৃত্বই বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির ও পি.বি'র প্রধান শক্তির মেরুদণ্ড। তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণ ও সুসংবদ্ধ দলিলের দাবি করার, তাহা পড়া এবং বিচার করার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। তাঁহাদের মতামত শ্রবণ করিতে হইবে, আরো কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য সহকারে বিচার করিতে হইবে ধীরভাবে। রণদিভের ট্রটস্কীবাদী শিক্ষার গুণে মাও হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীশুদ্ধ সকলকেই নস্যাৎ করিবার কায়দাটি আমরা আয়ত্ত করিয়াছি বেশ ভালভাবে।

ইহা স্মরণ রাখা দরকার অন্ধ্র সেক্রেটারিয়েট এবং তাহার বাহিরে সামান্য দু'একটি ক্ষেত্রে ছাড়া সারা ভারতের পার্টির আমরা সকলেই পুরোনো কেন্দ্রীয় কমিটির ট্রটস্কীবাদী নীতি মানিয়া লইয়াছিলাম—নীতিগতভাবে কোন প্রতিবাদ করি নাই এবং নীচের তলায়ও আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ছিলেন এই নীতির অন্ধ, উগ্র ও উন্মাদ সমর্থক।

তাই উপরের তলার আত্মসমালোচনা দাবি করার সাথে সাথেই নীচের তলায় আমাদেরও নিজ নিজ ব্যাপক আত্মসমালোচনার কিঞ্চিৎ প্রয়োজন আছে; এবং সে কার্যে অবহেলা করাটা সুবিধাবাদ বলিয়াই মনে হয়।

সমাধানের সাহায্যে নতুন ঘটনা—

সংকটের সমাধানে সাহায্য করিবে এইরূপ কতগুলি ঘটনা সম্প্রতি দেখা যাইতেছে।

১। ইতিমধ্যে পার্টির নীচের তলায় সুস্থ মনোভাব নিজেকে ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত করিতেছে।

২। কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠির উপর তাহাদের সাম্প্রতিক দলিলে পি.ও.সি. পার্টির সংকট সমাধানের জন্য মূল্যবান পরামর্শ দিয়াছেন।

৩। এতদিন পরে পি.বি. পার্টি সংকটের গভীরতা এবং অন্তঃপার্টি মতবিরোধের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া পার্টি কংগ্রেসের উপর তাহাদের সার্কুলারে জানাইয়াছেন—".... একমাত্র পার্টি কংগ্রেস ব্যতীত এবং পার্টি কংগ্রেসের প্রক্রিয়ার (Process) মধ্য দিয়া পার্টির সকল স্তরে নতুন নীতির আলোচনা, সমালোচনা এবং আত্মসমালোচনার ভিত্তিতে উপর হইতে নীচ পর্যন্ত সকল স্তরে সমগ্র পার্টির সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন ছাড়া পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার এবং এই পঙ্ক হইতে টানিয়া তুলিবার আর কোন রাস্তা নাই।" যথেষ্ট বিলম্বে হইলেও পার্টি কংগ্রেস ডাকার তাহাদের এই ঘোষণাকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

৪। সম্প্রতি মুক্ত পুরোনো কেন্দ্রীয় কমিটির তিনজন বিশিষ্ট সভ্য আন্তরিকতা ও উদ্যোগের সহিত পার্টির সংকট সমাধানের চেষ্টায় অন্তঃপার্টি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

ইহারা তিনজনই ট্রটস্কীবাদী-টিটোবাদী কার্যকলাপ হইতে মুক্ত ছিলেন এবং জেল হইতে ইহার কোন কোন নীতির তীব্র সমালোচনা ও প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইহারা পুরোনো, অভিজ্ঞ, পরীক্ষিত এবং বহু জনমান্য নেতা। অন্তঃপার্টি সংগ্রামে ইহাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ইতিমধ্যেই ইহারা তিনজন একটি মূল্যবান দলিল পার্টির মধ্যে প্রচার করিয়াছেন।

সমাধানের পথ ঃ অন্তঃপার্টি সংগ্রামের সঠিক পদ্ধতি

যথাযোগ্য অনুসন্ধান মারফৎ যাহারা শত্রুপক্ষের চর, টিটোবাদী চর বলিয়া প্রমাণিত হইবে এবং যাহারা অসৎ ও অসাধু তাহাদের বাদ দিয়া বাকি সকলকে লইয়া, মতবিরোধ যতই থাকুক না কেন, সমগ্র পার্টির সমবেত চেষ্টায়ই বর্তমান পার্টি সংকটের সমাধান, সঠিক নীতি এবং নেতৃত্ব গঠন করিবার প্রচেষ্টা করিতে হইবে।

ঐক্যবদ্ধ করার শ্লোগানের আড়ালে যাহারা ভেদপন্থা লইবে, অন্তঃপার্টি সংগ্রামে উপদলীয় বিভেদের পদ্ধতি চালু করার চেষ্টা করিবে, তাহাদের প্রবল প্রতিরোধ করিতে হইবে, বুঝাইয়া সঠিক পথে আনার চেষ্টা করিতে হইবে।

পার্টির মধ্যে মিথ্যা ব্যক্তিগত কুৎসা রটনা, সন্দেহ, ঘৃণা, বিদ্বেষ ছড়ানোকে কঠোর হস্তে সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে। ইহা পার্টিকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করার জন্য প্রত্যক্ষ শত্রু চরেরই কাজ।

১। যাহারা গুরুতর ট্রটস্কীবাদী-টিটোবাদী অপরাধে অপরাধী কেবলমাত্র তাহাদেরই বাদ দিয়া দ্বিতীয় কংগ্রেসে নির্বাচিত অন্য সকল কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যকে—কী জেলের ভিতর কী জেলের বাহিরে—অবিলম্বে আনুষ্ঠানিকভাবে বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে হইবে। বর্তমান অবস্থায় একমাত্র এইভাবে পুনর্গঠিত হইলেই কেন্দ্রীয় কমিটি সারা ভারতের পার্টি সংকট সমাধানের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং কার্যকরী কেন্দ্রীয় কমিটি হইতে পারিবে।

এইভাবে পুনর্গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টির মধ্যে মত বিরোধের দুইটি প্রধান ধারাকে বাস্তবে প্রতিবিম্বিত করিবে এবং নীতি এ মতবাদগত সংগ্রাম সুষ্ঠু, গণতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত করিতে পারিবে।

বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট আমরা ইহা জরুরি দাবি হিসাবে উপস্থিত করিতেছি।

২। কমরেড গৌরকে কেন্দ্রীয় কমিটি হইতে অপসারিত করিতে হইবে।

আন্তর্জাতিক এবং অন্তঃপার্টি দলিল চাপিয়া রাখা, বিকৃত করা—যাহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে—শুধুমাত্র এই অপরাধের জন্যই রণদিভে এবং অধিকারীকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য সাসপেণ্ড কবিতে হইবে। অন্যান্য ব্যাপারে অনুসন্ধান তো আছেই।

৩। মতবাদগত ভিত্তিতে ব্যাপক আলোচনা এবং অন্তঃপার্টি সংগ্রাম চালাইয়া ঐক্যের পথে অগ্রসর হইবার জন্য, পার্টি কংগ্রেস ও সকল স্তরে কনফারেন্সের মতবাদ প্রস্তুতির জন্য উল্লিখিতরূপে পুনর্গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটিকে অবিলম্বে এক বা একাধিক সুসংবদ্ধ এবং সম্পূর্ণ রণনীতি এবং রণকৌশলগত দলিল পার্টির মধ্যে প্রচার করিতে হইবে।

৪। ইতিমধ্যে বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠি প্রত্যাহার করিতে হইবে। ইহার রাজনীতি জবরদস্তি চাপানো চলিবে না।

৫। পঙ্গু, জড় ও নিশ্চেষ্ট অবস্থা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া পার্টিতে দৈনন্দিন কর্মের পুনরুজ্জীবন এবং সক্রিয়তা সৃষ্টি করার দায়িত্ব প্রাদেশিক এবং জিলা নেতৃত্বগুলির সহযোগিতা ও সাহায্যে উল্লিখিতরূপে পুনর্গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটিকে লইতে হইবে। ইহা পারস্পরিক সহযোগিতার ব্যাপার এবং প্রাদেশিক ও জিলা নেতৃত্বগুলির অবশ্যই উদ্যোগী হইয়া আগাইয়া আসিতে হইবে।

মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও ইহা অবশ্যই সম্ভব। গণসংগঠনগুলি পুনর্গঠন করা, নাগরিক অধিকার ও দমননীতির বিরুদ্ধে, তেলেঙ্গানা, নিম্নতম বেতন ও মাগ্নীভাতা বৃদ্ধি, বাস্তুহারা সমস্যা, শান্তি আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়ে অবিলম্বে নিম্নতম কাজ শুরু করিতেই হইবে।

৬। পার্টি সংকটের এবং অন্তঃপার্টি মতবিরোধের যাবতীয় সংবাদ এবং এ সম্পর্কিত যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্বের নিকট পাঠাইতে হইবে। পার্টির সংকট সমাধানে এবং রণনীতি নির্দ্ধারণে তাঁহাদের ভ্রাতৃত্বমূলক সাহায্য চাহিতে হইবে।

এইভাবে আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের সাহায্যে, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাহায্যে ও পথনির্দেশে, নীচে সভ্যসাধারণের নীতি স্থির করার আলোচনায় ব্যাপক, সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়া অন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের পূর্ণ প্রয়োগ দ্বারা, সকল স্তরে কনফারেন্স ও পার্টি কংগ্রেসের মারফৎ পার্টি নীতি নির্দ্ধারণ করা এবং সকল স্তরে পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নেতৃত্বের পুনর্গঠন করা; সাথে সাথে বাস্তব ক্ষেত্রে আন্দোলন ও কাজের মধ্য দিয়া প্রয়োগের সাহায্যে (Practice) বাস্তবের পরীক্ষাগারে নীতির সত্যাসত্য যাচাই করিয়া লওয়া—পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার, সংকটের সমাধান করিবার বর্তমান অবস্থায় ইহাই একমাত্র পথ বলিয়া আমরা মনে করি। কমিউনিস্ট পার্টিকে বাঁচাইয়া রাখিবার শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার—সমালোচনা-আত্মসমালোচনাকে এইভাবেই প্রয়োগ করিতে হইবে। অন্তঃপার্টি সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি, অন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের ব্যাপক প্রয়োগ, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সক্রিয় অভিব্যক্তি বলিতে আমরা উল্লিখিতরূপে কনফারেন্স ও পার্টি কংগ্রেস করাই বুঝি।

৭। মতবাদগত আলোচনা, সমালোচনা এবং আত্মসমালোচনায় মতামত বিনিময়ের সবরকম সুবিধা করিয়া দিতে হইবে, সকল সম্ভাব্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। প্রত্যেক স্তরের নেতৃত্বেরই এটা দায়িত্ব।

এইজন্য জেলা নেতৃত্ব পর্যন্ত সকল স্তরের উচ্চতর কমিটিগুলিকে নিয়মিত আলোচনা পত্রিকা প্রকাশ করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন মতগুলিকে ইহাতে যথাযোগ্য স্থান দিতে হইবে।

৮। কেন্দ্রীয় কমিটির এবং অন্য প্রদেশের মূল্যবান দলিলগুলি ইংরাজিতে এবং প্রাদেশিক ভাষায় অতি সত্বর পার্টির মধ্যে ব্যাপক প্রচার করা প্রাদেশিক নেতৃত্বের অন্যতম প্রাথমিক ও অপরিহার্য দায়িত্ব। বোম্বে কমরেডদের দলিলটি ছাপাইয়া পি.ও.সি. একটি ভাল কাজ করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে এ পর্যন্ত যাহা করা হইয়াছে তাহা খুব সামান্য। প্রসঙ্গত বলা যাইতে পারে কেন্দ্রীয় কমিটির কতকগুলি মূল্যবান দলিল, যথা—(1) Report on Left-Deviation. (2) Report on Left-Sectarianism in the organisational activities of the PB. (3) Telengana Documents. (4) Telengana Report [Recent]. (5) Classification of village population & study of rural conditions. (6) Self-critical Reports of the members of the PB. এইসব দলিলগুলি প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদ হইয়া প্রচার হওয়া তো দূরের কথা ইংরাজিতেও সামান্যই প্রচার করা হইয়াছে। অর্থ

সংকটের কথা খুবই সত্য। তা সত্ত্বেও আরো করা যায়। কতকগুলি জিনিস তাহারা ছাপিয়াছেন যাহার মূল্য সন্দেহজনক। একটি তো ক্ষতিকর।

যে সব ইউনিট বা সভ্য নিজেদের রাজনৈতিক মতামতের ব্যাপক প্রচার করিতে চান তাহাদের নিকট ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য বিশেষ চাঁদার আবেদন করা যাইতে পারে। যাহারা নিজেরা প্রচার করিয়া থাকেন তাহাতেও খরচা আছে। এইভাবে অর্থ সংকটের কিছুটা আনুকূল্য হইতে পারে।

৯। যতদিন পর্যন্ত পার্টির বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বের উদ্যোগে আলোচনা পত্রিকাগুলি এবং অন্তঃপার্টি দলিলগুলির ব্যাপক প্রচারের মারফৎ অন্তঃপার্টি সংগ্রামের আলোচনার চাহিদা না মিটিতেছে ততদিন পর্যন্ত নীচের তলায় সভ্যদের মত বিনিময়ের জন্য পরস্পরের দলিলপত্রাদি আদানপ্রদান চলিতে থাকিবে এবং বিভিন্ন ইউনিটের বা এলাকার কর্মী হইলেও পরস্পরে একত্রে বসিয়া আলোচনা চলিতে থাকিবে। ইহা খুবই সঙ্গত এবং বাস্তব অবস্থার চাহিদা হইতেই অন্তঃপার্টি সংগ্রামের এই রূপের (form) উদ্ভব হইয়াছে। নেতৃত্বের পক্ষ হইতে জবরদস্তি ইহাকে চাপিয়া দিবার বিফল চেষ্টা না করিয়া সাহায্য করিতে হইবে; পরস্পর আলোচনার সুবিধা করিয়া দিতে হইবে; ভিন্ন মতের নেতৃস্থানীয় প্রচারকের বক্তব্য প্রত্যক্ষ শুনিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে।

নেতৃত্বের উদ্যোগে আলোচনা পত্রিকা এবং অন্তঃপার্টি দলিলগুলির ব্যাপক এবং নিয়মিত প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ এই রূপের (form) প্রয়োগ কমিয়া প্রয়োজন নিঃশেষ হইয়া যাইবে।

১০। এই রূপের (form) প্রয়োগের সময় সর্বদা মনে রাখিতে হইবে পার্টির নিরাপত্তার প্রশ্নকে। শত্রুর আক্রমণ হইতে হুঁশিয়ার থাকিতে হইবে; টেক নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে।

১১। টেক কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ গোপন কাজে নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের বেলায় এই রূপের (form) প্রয়োগ খাটিবে না, ব্যতিক্রম হইবে। টেকের সর্বপ্রথম নিয়ম হইতেছে কাজের মারফৎ ছাড়া সাধারণভাবে পার্টির অন্যান্য কর্মীদের নিকট টেক কর্মীরা অজ্ঞাত, অপরিচিত এবং গোপন থাকিবেন। একমাত্র কাজের মারফৎ ছাড়া পরস্পরের নিকটও টেক কর্মীরা অজ্ঞাত, অপরিচিত এবং গোপন থাকিবেন। পার্টির নিরাপত্তা রক্ষার অপরিহার্য কর্তব্য হিসাবে তাঁহাদের এই নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। অন্তঃপার্টি সংগ্রামে, আলোচনায় তাঁহারা কেবলমাত্র নিজের নিজের ইউনিটের মারফৎ অংশ গ্রহণ করিবেন। ভিন্ন মতের কোন নেতৃস্থানীয় কর্মীর মতামত প্রত্যক্ষভাবে শুনিবার প্রয়োজন হইলে তাঁহারা সংশ্লিষ্ট উচ্চতর কমিটিকে জানাইবেন। যাহারা কোন ইউনিটের সহিত সংশ্লিষ্ট নন তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইবে।

টেক কর্মীদের একাকীত্বের (Isolation) কথা মনে রাখিয়া তাহাদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা উচ্চতর কমিটিগুলির অবশ্য কর্তব্য।

১২। দৈনন্দিন আন্দোলন ও সংগঠনগত কাজ চালাইবার জন্য ন্যূনতম শৃঙ্খলা পার্টিতে ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

১৩। ব্যক্তিগত কুৎসা রটনা, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও সন্দেহ ছড়ানোকে তীব্র বাধা দিতে হইবে। কোন সভ্যের নিকট কেহ অন্য কোন সভ্যের নামে ইহা করিলে তিনি অবিলম্বে তাহাকে ইহা প্রমাণ করিবার জন্য আহ্বান করিবেন, নিজের ইউনিটে এবং উচ্চতর ইউনিটে এবং সংশ্লিষ্ট

সভ্যের নিকট ঘটনা জানাইবেন।

পার্টিতে সুস্থ অন্তঃপার্টি জীবন ফিরাইয়া আনার জন্য, পার্টি বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য প্রত্যেক পার্টি সভ্যের ইহা একটি দায়িত্ব।

১৪। নিজের ইউনিটে মতবাদগত আলোচনা সমালোচনা করা প্রত্যেক সভ্যের প্রথম কর্তব্য। প্রত্যেক ইউনিটের কমবেশি ইহা করার যোগ্যতা আছে মনে রাখিতে হইবে।

কমরেডস্‌, দুনিয়ার জনগণের শান্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের আন্দোলন আগাইয়া চলিয়াছে বিপুল বন্যার বেগে। সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়ার শিবির আজ ভীত, সন্ত্রস্ত, মরিয়া হইয়া আক্রমণের ষড়যন্ত্রের পর্যায় হইতে সরাসরি আক্রমণ শুরু করিয়াছে। যুদ্ধের আগুনকে ছড়াইয়া সমস্ত দুনিয়াকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের হত্যালীলায় নিক্ষেপ করিয়া সভ্যতাকে ধ্বংস করার জন্য তাহারা হইয়া উঠিয়াছে উন্মাদ।

শত অত্যাচার, উৎপীড়ন ও সন্ত্রাসের ভিতর দিয়াও ভারতের জনগণের অজেয় বিপ্লবী আন্দোলন অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। শান্তি, স্বাধীনতা এবং জনগণতন্ত্রের জন্য ভারতের জনগণের মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব লইবার ঐতিহাসিক দায়িত্ব আমাদের পার্টিকে পালন করিতে হইবে।

ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করিবার জন্য সঠিক পন্থায় পার্টির নীতি ও নেতৃত্ব স্থির করিয়া পার্টির সংকট সমাধানের কর্তব্যে এবং সাথে সাথে সংগ্রামী জনগণের পুরোভাগে স্থান লইবার কাজে আপনারা সমবেতভাবে অগ্রসর হন এই আমাদের আবেদন—

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্য দীর্ঘজীবী হোক!

(২)

লেখক - অভয় ও সমর

"লাস্টিং পীস"-এর ২৭শে জানুয়ারীর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে সঠিক রাস্তার সন্ধান দেবার পর ১০ মাস কেটে গেল, কিন্তু একটি সর্বজন গৃহীত কর্মকৌশলের ভিত্তিতে ও আস্থাভাজন কেন্দ্রের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে পার্টি আজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েছে। আজ তাই যে প্রশ্ন সমস্ত সাচ্চা কমিউনিস্টকে ভাবিয়ে তুলেছে, বিব্রত করে তুলেছে তা হল সঠিক রাস্তার নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও কেন এই অবস্থা এবং তার সমাধানের পথ কি? আজ পার্টি-জীবনের সংকট এমন এক অবস্থায় এসেছে যে এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর ছাড়া এক পাও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

মতবাদগত সংগ্রাম

সংঘর্ষই সজীব জীবনের ধর্ম এবং সংঘর্ষের ভেতর দিয়েই জীবনের বিকাশলাভ ঘটে। পার্টি জীবনের পক্ষেও এই কথা প্রযোজ্য। পার্টির ভেতরে মতবাদগত সংঘর্ষের ভেতর দিয়েই পার্টি-জীবনের সজীবতা প্রকাশ পায় ও পার্টির বিকাশলাভ হয়। বিভিন্ন দেশের পার্টি গঠন ও পার্টির বিকাশের ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দেয়।

উৎপাদনের বিকাশ, উৎপাদনের ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্বন্ধ মতবাদের জন্ম দেয়। ধনতন্ত্রবাদের উৎপত্তির সাথে সাথেই তার বিরোধী শ্রেণি—শ্রমিকশ্রেণির জন্ম হয়েছে এবং সাথে সাথেই জন্ম নিয়েছে এই পরস্পর বিরোধী শ্রেণির সংঘর্ষ। ধনিকশ্রেণির সাথে শ্রমিকশ্রেণির এই প্রাথমিক সংঘর্ষই মার্ক্সবাদ জন্ম নেবার বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু যেহেতু পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার ভেতর থেকেই তার বিকাশলাভ ঘটেছে, সেই হেতু সেই পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার মতবাদের রোগ নানাভাবে সব সময় এই মতবাদকে আক্রমণ করতে চেয়েছে। শ্রমিকশ্রেণির মতবাদকে তাই ক্ষয়িষ্ণু পুরাতন শ্রেণির মতবাদের দূষিত ছোঁয়াচের বিরুদ্ধে সচেতন ভাবে সংগ্রাম করেই অগ্রসর হতে হয়েছে। কিন্তু নতুন জীবনের প্রাণশক্তিতে ভরপুর শ্রমিকশ্রেণির এই মতবাদের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়নি। বরং এই সংগ্রামের ভিতর দিয়েই ক্রমাগত বিকাশলাভ করে আজ সে এক দুর্বার শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

ধনিকশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণির সংঘর্ষের ভেতর দিয়েই শ্রমিকশ্রেণির সর্বাপেক্ষা সুসংগঠিত ও অগ্রণী বাহিনী কমিউনিস্ট পার্টি জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার ধ্বংসের এই অগ্রদূতকে জন্ম নিতে হয়েছে এই সমাজের গর্ভ থেকেই এবং স্থান করে নিতে হয়েছে এরই বিরোধী শক্তি হিসাবে এবই অভ্যন্তবে। পার্টিকে যে কেবল পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জন্ম নিতে হয়েছে তাই নয়, পার্টির অভ্যন্তরেও এই মতবাদ অনুপ্রবেশ করতে, স্থান করে নিতে ও পার্টিব জীবনকে দূষিত কবতে যে চেষ্টা করেছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম কবেই তাকে এগিযে যেতে হযেছে। পার্টির অভ্যন্তরে মতবাদগত সংঘর্যতাই অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী। যে পার্টিতে এই সচেতন সংগ্রামের অভাব ঘটে সেই পার্টিই অন্য শ্রেণির দূষিত মতবাদের আক্রমণে সজীব প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে ও সে তার বিপ্লবী ভূমিকা গ্রহণ করতে অক্ষম হয়।

পার্টির অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের দ্বিতীয় দিক হল শত্রু শ্রেণির ভাড়াটিয়া চরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। শত্রুশ্রেণির পার্টিকে শুধু বাইরে থেকে সরাসরি আঘাত করে ধ্বংস করতে চেষ্টা করছে তাই নয়, পার্টির ভেতর তাদের ভাড়াটিয়া গুপ্তচরদেব ঢুকিয়ে পার্টিকে ভেতর থেকে ধ্বংস করারও ষড়যন্ত্র করে। ধ্বংসকারী ট্রটস্কীবাদী ষড়যন্ত্রের আবিষ্কারের পর থেকে এই চক্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রত্যেকটি পার্টির অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের এক অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে দেখা দিল। সাম্প্রতিক সময়ে টিটোবাদ সম্বন্ধে ঐ একই কথা প্রযোজ্য।

ক্ষয়িষ্ণু শ্রেণিগুলির মতবাদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে কিভাবে কমিউনিস্ট পার্টি জন্মগ্রহণ করে ও অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে কিভাবে কমিউনিস্ট পার্টি এক অজেয় শক্তিতে পরিণত হয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস তার এক জাজ্বল্যমান উদাহরণ। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নারদনিকদের বিরুদ্ধে তীব্র মতবাদগত সংগ্রামের ভেতর দিয়ে রুশ দেশে একটি কেন্দ্রীয় পার্টি গঠনের মতবাদগত ভিত্তি প্রস্তুত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটি কেন্দ্রীভূত পার্টি গঠনের কাজ সফল হয় না। এর পরে বুদ্ধিজীবী শ্রেণি থেকে আগত, বহু লোক পার্টির ভেতর সুবিধাবাদ বহন করে আনে। মার্ক্সবাদের নামে এরা শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রামকে অর্থনৈতিক সংগ্রামের গণ্ডীর ভেতর আবদ্ধ রাখতে চাইল। লেনিন পরিচালিত "ইস্ক্রা" এই সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করল এবং লেনিনের "কর্তব্য কি?" নামক বই এই সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে মোক্ষম আঘাত হানলো। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে পার্টির দ্বিতীয়

কংগ্রেস হয়। এই কংগ্রেসে লেনিনবাদী নীতির জয় হয় ও একটি কেন্দ্রীভূত পার্টির জন্ম নেয় এবং লেনিনবাদীরা কেন্দ্রীয় কমিটিতে সংখ্যাধিক্য লাভ করেন। কিন্তু পরে প্লেখানভ ও আরও দুইজন কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য মেনশেভিকদের পক্ষে ভিড়ে পড়ায় মেনশেভিকরা কেন্দ্রীয় কমিটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে ও "ইস্ক্রা" মেনশেভিকদের করতলগত হয়। এর পর পার্টির অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম এক চরম পর্যায়ে পৌঁছাল। বলশেভিকরা পার্টির ভেতর স্বতন্ত্র কেন্দ্র মারফৎ মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকলেন। তাঁরা দাবি করলেন যে যেহেতু পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি আর পার্টির অধিকাংশের গৃহীত নীতির প্রতিনিধিত্ব করে না সেইহেতু পার্টির সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস মারফৎই একমাত্র এই সংকট সমাধান সম্ভব এবং তারা কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে তৃতীয় কংগ্রেস আহ্বানের দাবি জানালেন। বলশেভিকরা তাঁদের স্বতন্ত্র কাগজও বার করলেন। বাহ্যতঃ পার্টি এক থাকলেও বস্তুতঃ পার্টি দুই অংশে ভাগ হয়ে গেল এবং এই দুই অংশ দুই স্বতন্ত্র কেন্দ্রের অধীনে পরিচালিত হতে লাগল। মেনশেভিকরা তৃতীয় কংগ্রেস আহ্বান করতে অস্বীকার করায় বলশেভিকরা নিজেদের উদ্যোগেই কংগ্রেস আহ্বান করলেন ও ট্রানস্‌ককেশিয় ও আর দুইটি কমিটি কংগ্রেসের উদ্যোগ আয়োজনের ভার নেন। বলশেভিরা অধিকাংশ পার্টি সংগঠনগুলিকে স্বমতে আনতে সক্ষম হন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস হয়। বলশেভিকরা মেনশেভিকদেরও এই কংগ্রেসে যোগদানের আহ্বান জানান। কিন্তু তারা যোগ দিতে অস্বীকার করে ও অল্প সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে পৃথক সম্মেলন করে। এরপরও পার্টির ভেতর মেনশেভিক ও ট্রটস্কীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভেতর দিয়েই বলশেভিক পার্টিকে শক্তি সংগ্রহ করতে হয়েছে ও দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ভেতর দিয়ে ট্রটস্কীবাদ ও ট্রটস্কীবাদীদের উচ্ছেদ করতে হয়েছে। ট্রটস্কীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বুলগেরিয়ার পার্টিও আমাদের এক অভিজ্ঞতা শিখিয়েছেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কমরেড ডিমিট্রভ যখন জেলে সেই সময় ট্রটস্কীপন্থীরা উগ্রবামপন্থীদের সহযোগিতায় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি দখল করে। জেল থেকে মুক্তি পাবার পরই কমরেড ডিমিট্রভ ও কমরেড কোলারভ ট্রটস্কীবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই সংগ্রাম করেন ও দীর্ঘ পাঁচ বছরের সংগ্রামের ভেতর দিয়ে পার্টিকে ট্রটস্কীবাদ ও ট্রটস্কীবাদীদের কবল থেকে মুক্ত করে পার্টিকে লেনিনবাদী নীতিতে ঐক্যবদ্ধ করেন।

মাও সে-তুং-এর নেতৃত্বে চীনের পার্টি প্রথমে চেন তু সিউর দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদ ও পরে ট্রটস্কীবাদী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে এক অমর ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

ভারতের পার্টির সংকটের মূল ও তার গভীরতা

১। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণি এক রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। রুশ বিপ্লব ঔপনিবেশিক জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনের উপর এক বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করে। এইভাবে ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হওয়ার আগে বিভিন্ন মার্ক্সবাদী চক্র গড়ে ওঠে। পরে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের হস্তক্ষেপের ফলে এইসব চক্রের মিলনের ভেতর দিয়ে একটি কেন্দ্রীভূত পার্টি জন্ম নেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পার্টির ইতিহাস আলোচনার সময় আমরা দেখেছি যে এই মিলনের জন্য ব্যাপক মতবাদগত প্রস্তুতি

চালাতে হয় ও কেন্দ্রীভূত পার্টি গঠনের পরও এই মতবাদগত সংগ্রাম সমানে চলতে থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে এই চক্রগুলি মিলনের পূর্বে কোন ব্যাপক মতবাদগত প্রস্তুতি চলে না, কোনওরকমে জোড়াতালি দিয়ে এক কেন্দ্রীভূত পার্টি গঠন করা হয়। পার্টি গঠনের পরও পার্টির ভেতরে মতবাদগত সংগ্রাম কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে পারেনি। অপরপক্ষে তীব্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাবের ফলে কমিউনিস্ট মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণি থেকে বহুলোক পার্টিতে প্রবেশ করায় পার্টির ভেতর পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লববাদ ও বুর্জোয়া জাতীয় সংস্কারবাদের প্রবেশের রাস্তা পরিষ্কার হয়।

এই সমস্ত কারণে, যদিও জনগণের প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের ফলে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাস রাখার ফলে, শোষিত জনগণের উপর আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন, বিশেষ করে সোভিয়েত সমাজ ব্যবস্থার সাফল্যের প্রভাবের ফলে ভারতের পার্টি জাতীয় রাজনৈতিক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়েছে। তা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে ভারতের পার্টি অপরশ্রেণির দূষিত মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে ও তাদের প্রভাবকে ধ্বংস করার কাজে কোনও দিনই মার্ক্সবাদ লেনিনবাদের অস্ত্রের সঠিক প্রয়োগ করতে পারেনি। এই পার্টির জন্মের থেকে আজ পর্যন্ত বার বার সঠিক রাস্তার দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা করা সত্ত্বেও ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত একবার বাম ও একবার দক্ষিণপন্থীর দিকে ঝুঁকেছে ও শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঘৃণ্য শত্রু ট্রটস্কীবাদ-টিটোবাদ পার্টিকে গ্রাস করতে সক্ষম হয়।

২। অন্য শ্রেণির মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সঠিক মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী নীতি নির্ধারণে মার্ক্সবাদ লেনিনবাদের ধারাল অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জনগণের উপর থেকে শত্রু শ্রেণির মতবাদকে ধ্বংস করে কমিউনিস্ট পার্টিকে জনগণের ভিতর প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে সমালোচনা আত্মসমালোচনার বিপ্লবী অস্ত্রের ব্যবহার পার্টির জীবনের এক স্বাভাবিক নিয়ম। এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে সে পার্টিকে শত্রু শ্রেণির মতবাদ গ্রাস করবেই, আর জনগণ থেকে সে পার্টি বিচ্ছিন্ন হবেই।

"... The Communist Parties cannot maintain themselves as revolutionary parties if they commit to oblivion and violate one of the basic principles of their existence—criticism & self-criticism—which would mean severing ties with the masses, would mean destroying the Party." (Lasting Peace, Feb. 3, 1950)

অর্থ হল—"কমিউনিস্ট পার্টিগুলি আর বিপ্লবী পার্টি হিসাবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না যদি তারা তাদের অস্তিত্বের একটী মূলনীতি—সমালোচনা ও আত্মসমালোচনাকে পরিত্যাগ করে ও অমান্য করে; এর অর্থ হবে জনগণের সঙ্গে সমস্ত সংযোগ ছিন্ন হওয়া ও পার্টিকে ধ্বংস করা।" (লাষ্টিং পীস, ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০)

আমাদের পার্টির ইতিহাস এই কথা প্রমাণ করে যে পার্টির অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য এই মূলনীতিকে পার্টি বরাবর অমান্য করে এসেছে। কি বামপন্থী নেতৃত্বে, কি দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব, এই অস্ত্রের ব্যবহার পার্টির ভেতর নিষিদ্ধ করে এসেছে। যখনই কোন বিষয়ে গুরুতর ভুল ধরা পড়েছে কেবলমাত্র তখনই এক একবার আনুষ্ঠানিক চেষ্টা হয়েছে এই অস্ত্র ব্যবহারের,

আনুষ্ঠানিক এইজন্যই বলা হচ্ছে যে পার্টি তার ভুলের মূল অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করেনি। অর্থাৎ পার্টির ভিতর বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রভাবই যে ভুলের মূল কারণ ও এই ভুলের বিরুদ্ধে সংগ্রামই যে প্রধানতঃ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক তত্ত্বগত লড়াই—এই পদ্ধতি অবলম্বন না করে ভুলের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার নামে প্রধানত ২/১ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত করা হয়েছে। ফলে পার্টির মতবাদগত দুর্বলতা কোনদিনই দূর হল না, এই অবস্থায় ট্রটস্কীবাদ-টিটোবাদ যে পার্টিকে গ্রাস করবে তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কি আছে?

৩। আমাদের পার্টির সংকটকে বুঝতে হলে আর একটা কথা বুঝতে হবে যে পার্টির ভিতর শত্রু প্রেরিত চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সতর্কতার অভাব আমাদের পার্টিতে বরাবরই হয়েছে। এই অবস্থায় এইটাই স্বাভাবিক যে ঝানু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করবে ও পার্টির মোক্ষম স্থানে তাদের চরেরা স্থান করে নেবে। বিশেষ করে ট্রটস্কীবাদ-টিটোবাদ সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে যখনই কোন পার্টির ভিতর ট্রটস্কীবাদী-টিটোবাদী নীতির প্রাধান্য বা কোন কোন ক্ষেত্রে তার প্রভাব দেখা গিয়েছে, তখনই অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তার পিছনে সচেতন গুপ্ত চক্রান্তের হাত রয়েছে। মতবাদগত দৈন্য ও সমালোচনার অভাব এদের রাস্তা আরও পরিষ্কার করে দেয়।

৪। আমাদের পার্টির ইতিহাস আমাদের আর একটি জিনিস শিক্ষা দেয় তা হল সাধারণ অবস্থায় তো দূরের কথা, এমন কি যখন কোন বড় রকমের ভুল ধরা পড়েছে তখনও এই ভুলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ও সঠিক নীতি নির্ধারণের সংগ্রামে পার্টির সাধারণ সভ্য সমেত সমগ্র পার্টিকে এই সংগ্রামে নামাবার কোন চেষ্টাই হয়নি, যে নেতৃত্ব পার্টিকে ভুলের ভিতর ডুবিয়েছেন তারাই আবার ভুলের বিরুদ্ধে "সংগ্রামে" একচেটিয়া অধিকার হস্তগত করেছেন। এর ফল হয়েছে সেই নেতৃত্ব একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছেন আর সাধারণ সভ্যরা রাজনৈতিক চেতনায় আর মতবাদগত সংগ্রামে পশ্চাৎপদতার ভিতর পড়ে আছেন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, পার্টির সংকটের ব্যাপকতা ও গভীরতাকে বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে যে পার্টির জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব গ্রহণ করতে, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার নীতি গ্রহণ করতে, বিপ্লবী সতর্কতা দেখাতে এবং মতবাদগত সংগ্রামে সমগ্র পার্টিকে অংশ গ্রহণ করাতে অক্ষমতার ফলে পার্টিকে গ্রাস করেছিল ট্রটস্কীবাদী নীতি, যে নীতি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের কাছে কোন মতবাদগত নীতি বলে বিবেচিত হয় না, বিবেচিত হয় সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটিয়া এক চক্রান্তকারী পন্থা হিসাবে, যে নীতি অবশ্যম্ভাবী রূপে পার্টিকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং পার্টিকে ধ্বংসের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। সুতরাং মনে রাখতে হবে যে পার্টিকে এই বিষ থেকে মুক্ত করার সংগ্রাম অত্যন্ত কঠোর ও দীর্ঘস্থায়ী হতে বাধ্য।

"লাস্টিং পীস"-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও তারপর

"লাস্টিং পীস"-এর ২৭শে জানুয়ারির প্রবন্ধ পার্টির ইতিহাসে এক নতুন জিনিস সৃষ্টি করল। পার্টির অতি সাধারণ সভ্যরা এযাবৎ পর্যন্ত কোন মতবাদগত সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার সুযোগ

পাননি, যারা এই সেদিনও টিটোবাদী 'শৃঙ্খলার' জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছিলেন তাঁদের প্রাণে এক নতুন সাড়ার 'সঞ্চার' করল। পার্টির জীবনে এই সর্বপ্রথম যখন সাধারণ সভ্যদের এক বিরাট অংশ এগিয়ে এলেন পার্টিকে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংগ্রামে, তাঁরা বিশ্লেষণ করলেন যে পার্টির ভুল কেবলমাত্র রণকৌশলগত নয়, রাজনীতিগত অর্থাৎ পার্টি যে কেবল সংগ্রামের কৌশলের ক্ষেত্রেই হটকারী নীতি গ্রহণ করেছে তাই নয়, পার্টি বিপ্লবের স্তর নির্ণয় করতে ভুল করেছে এবং শ্রেণি সমাবেশের ক্ষেত্রে শ্রমিক কৃষক মৈত্রীকে ক্ষুণ্ণ করে ও জাতীয় বুর্জোয়ার এক অংশের সাথে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের কথা অস্বীকার করে পার্টি নেতৃত্ব পার্টিকে ট্রটস্কীবাদী নীতিতে পরিচালনা করেছেন। অন্যদিকে তারা বলতে চাইলেন যে যেভাবে সমালোচনা আত্মসমালোচনাকে অস্বীকার করা হয়েছে, যেভাবে যে কোন মতভেদের টুটী টীপে ধরা হয়েছে, যেভাবে কমরেডদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে, যেভাবে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্বকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে, অন্যান্য দেশের পার্টি, বিশেষ করে চীনের পার্টি ও তার মহান নেতা কমরেড মাও সে-তুংকে কুৎসা করা হয়েছে, "লাষ্টিং পীস"-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধকে যেভাবে চেপে রাখতে চেষ্টা হয়েছে, ষ্ট্যালিনের প্রবন্ধকে যেভাবে বিকৃত করার চেষ্টা হয়েছে, মস্কো রেডিও ভারতে টিটোবাদী চক্রান্তকারী কার্যকলাপ সম্বন্ধে যে হুঁশিয়ারী দিয়েছেন, তাতে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে যে পার্টির এই অবস্থার পিছনে টিটোপন্থীদের হাত আছে।

তাই তারা দাবি করলেন যে একমাত্র পার্টি কংগ্রেসই এই সংকট থেকে পার্টিকে বাঁচাতে পারে। কংগ্রেস মারফৎ তাঁরা চাইলেন ঃ—

১। প্রকৃত সমালোচনা-আত্মসমালোচনার মারফৎ পার্টির মতবাদগত দুর্বলতার মূল খুঁজে বার করতে।

২। একটি সঠিক ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক (রণনীতি ও কৌশলগত) পলিসি ঠিক করতে।

৩। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পার্টির নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে।

৪। সচেতন টিটোপন্থীদের অনুসন্ধান করে তাদের পার্টি থেকে বার করে দিতে ও বিপ্লবী সতর্কতাকে পার্টির ভিতর জিইয়ে রাখার প্রয়োজনে একটি স্থায়ী সংগঠন গঠন করতে।

তাঁরা আরও দাবি করলেন ঃ—

১। কংগ্রেসের আগে ব্যাপক মতবাদগত প্রস্তুতি করা হোক, বিভিন্ন মতকে সাধারণ সভ্যদের সামনে উপস্থিত করা হোক, তাদের মতামত বিনিময়ের রাস্তা খুলে দেওয়া হোক পার্টির আলোচনা পত্রিকা মারফৎ।

২। অন্তর্বর্তীকালের জন্য সমস্ত নেতৃস্থানীয় কমিটিগুলিকে পুনর্গঠিত করা হোক।

৩। শাস্তিমূলক ব্যবস্থার পুনর্বিবেচনা করা হোক।

৪। পার্টির ভিতর সচেতন টিটোপন্থী ষড়যন্ত্রের অস্তিত্বের সন্ধানের জন্য এক অস্থায়ী অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হোক।

হয়ত সবাই খুব পরিষ্কারভাবে এবং সুসংবদ্ধভাবে এই দাবিগুলি উত্থাপন করতে পারেননি। কিন্তু যারা এই সংগ্রামে নামলেন তাদের বক্তব্যের বিষয়বস্তু যে এই ধরনেরই ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এইভাবে "লাষ্টিং পীস"-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ এক পুঞ্জীভূত শক্তির উৎস খুলে দিল।

কিন্তু প্রশ্ন হল, তাই যদি হয় তাহলে এই অচল অবস্থা কেন, কেন আমরা একটা ঐক্যবদ্ধ নীতি ও কৌশল ঠিক করতে পারছি না, কেন আমরা পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারছি না, কেন জনগণকে সংগঠিত ও সংগ্রামে পরিচালিত করতে পারছি না, বরং আমরা জনগণ থেকে ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি ও পার্টি আরও বেশি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। তার মূল কারণ হল যে পুঞ্জীভূত শক্তির উৎস আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব খুলে দিলেন পার্টি নেতৃত্ব সেই শক্তিকে ঠিক রাস্তায় পরিচালনা করা তো দূরের কথা সে অফুরন্ত শক্তির স্ফুরণের পথে এক বাধা সৃষ্টি করল। এই বিরাট জীবন্ত শক্তির গতি রুদ্ধ করা সম্ভব নয়, তাই সে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ছড়িয়ে গিয়ে বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হল।

পার্টির ভুল ধরা পড়লে সাধারণত অন্যান্য কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়? পার্টির নেতৃত্ব সেই ভুলকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা তো দূরের কথা সেই ভুলকে খুঁটিয়ে বিচার করেন, কোন অবস্থায় সেই ভুলের উৎপত্তি হয়েছে তা বিশ্লেষণ করেন ও পার্টির ভিতরকার মতবাদগত সংঘর্ষকে চাপা না দিয়ে ব্যাপক রাজনৈতিক আলোচনার পথ খুলে দেন। এইটাই ভুলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের লেনিনবাদী কৌশল। কমরেড লেনিনের মতে—

"The attitude of a Political Party towards its own mistakes is one of the most important and surest criteria of the seriousness of the Party and of how it fulfils in practice its obligations towards its class and towards the masses. To admit a mistake openly, to disclose its reasons, to analyse the conditions which gave rise to it, to study attentively the means of correcting it–these are the signs of a serious Party; this means the performance of its duties; this means educating and training its class and subsequently the masses."

অর্থ "নিজের ভুলের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিই একটি রাজনৈতিক দলের আন্তরিকতা ও কৃতসংকল্পতা বিচারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রকৃষ্টতম মাপকাঠি ও কিভাবে সেই পার্টি বাস্তবে নিজের শ্রেণি ও জনগণের প্রতি তার কর্তব্য পালন করে তার নিরিখ। খোলাখুলি ভাবে একটি ভুল স্বীকার করা, তার কারণ খুলে ধরা, যে বাস্তব অবস্থা সেই ভুলের জন্ম দিয়েছিল তার বিশ্লেষণ করা এবং ভুল সংশোধন করার উপায় অনুধাবন করা—এই হচ্ছে আন্তরিকতা ও কৃতসংকল্পতার লক্ষণ; এর অর্থ হল তার (পার্টির) কর্তব্য সম্পাদন করা; এর মানে হল নিজের শ্রেণি ও পরে জনগণকে শিক্ষিত ও অনুশীলিত করে তোলা।"

কিন্তু আমাদের পার্টি নেতৃত্ব তার সম্পূর্ণ বিপরীত রাস্তাই গ্রহণ করলেন। পার্টির ভুল খোলাখুলিভাবে স্বীকার করা তো দূরের কথা, তদানীন্তন পি.বি. সেই ভুলকে চাপা দিতে চাইলেন। প্রথমে তারা "লাষ্টিং পীস"-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধকে চেপে দিলেন, ভারতের সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণিই যে বিপ্লব বিরোধী এই কথা প্রমাণ করার জন্য কমরেড ষ্ট্যালিনের বক্তব্যের বিকৃত অর্থ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু যখন এইভাবে আর "লাষ্টিং পীস"-এর প্রবন্ধকে চাপা দেওয়া সম্ভব হল না তখন মৌখিকভাবে ইনফরমেশন ব্যুরোর প্রবন্ধকে অভিনন্দন জানিয়ে তাদের বক্তব্যকে বিকৃত করার চেষ্টা করলেন। পি.বি. তার প্রথম বিবৃতিতে সাফল্যের ফিরিস্তি দিয়ে তাঁরা তাঁদের নেতৃত্বের সঠিকতা বোঝাতে চাইলেন আর পার্টির সভ্যসাধারণকে ভাঁওতা

দেওয়ার জন্য "কিছু কিছু ভুল", "রণকৌশলের ভুল" ও "পিছিয়ে থাকার" কথা উল্লেখ করলেন। আর যাঁরা তাদের এই নীতির তীব্র সমালোচনা করছিলেন তাদেরই যোশীবাদী টিটোবাদী বলে ইঙ্গিত করলেন। বাংলা প্রাদেশিক কমিটি ও কলিকাতা জিলা কমিটিও পিছিয়ে রইলেন না। তারাও পি.বি'র এই পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ সমর্থন করলেন ও "যোশীপন্থী টিটোবাদী"-দেয় বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। অন্যদিকে বাংলাদেশে তখন দাঙ্গা চলছে তার সম্বন্ধে কোন সঠিক কর্মকৌশল বা কর্মোদ্যোগ নেতৃত্বের তরফ থেকে না আসায় পার্টির সভ্যসাধারণ বিভ্রান্তি ও হতাশার কবলে পড়লেন ও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে লাগলেন। এইভাবে পি.বি. থেকে ডি.সি. পর্যন্ত নেতৃস্থানীয় কমিটিগুলি সাধারণ সভ্যদের সুস্থ উদ্যোগের পথ রুদ্ধ করে দিতে চাইলেন ও পার্টির মধ্যে মত প্রকাশের অধিকারকে অসাধু উপায়ে দমন করার চেষ্টা করলেন।

পি.বি'র "প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ" প্রস্তাবে সেই পুরাতন বামপন্থা বিচ্যুতিকে নতুন বাক্য-জালের আড়ালে পরিবেশন করা হল, পার্টির অভ্যন্তরীণ অবস্থার কোন চিত্র দেওয়া হল না, জনগণের সঙ্গে যোগাযোগের কোন কর্মকৌশল ও শ্লোগান দেওয়া হল না ও পার্টিতে যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধানের কোন পথনির্দেশই করা হল না।

পার্টিতে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের মৃত্যু অনেক আগেই হয়েছিল আর কেন্দ্রিকতার নামে চলছিল চরম স্বেচ্ছাচারিতা। "লাষ্টিং পীস"-এর প্রবন্ধ বেরোবার পর এমন কোন পলিসি নেতৃত্ব দিলেন না যাতে করে কেন্দ্রের নেতৃত্বে সমগ্র পার্টি একই রাস্তায় সংকটের সমাধানের পথে অগ্রসর হতে পারে। অর্থাৎ পার্টিতে সেই অবস্থায় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার আর কোন ভিত্তিই থাকল না।

এই নেতৃত্ববিহীন অবস্থায় নিজেদের মতকে স্বচ্ছতর ও স্পষ্টতর করে তোলা, বাস্তব কাজ আরম্ভ করার পন্থা নির্দ্ধারণ করা ও পার্টির ভিতরকার সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার বাস্তব প্রয়োজনেই পার্টির সাধারণ সভ্যরা সমস্ত বাধাকে চূর্ণ করে দিয়েই যতদূর সম্ভব পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করা ও মত বিনিময়ের রাস্তা করে নিলেন পার্টির নেতৃস্থানীয় কমিটিগুলি ও তাদের মুষ্টিমেয় অনুচরবর্গ তখনও পার্টির সাধারণ সভ্যদের এই সুস্থ উদ্যোগকে, এই প্রাণশক্তির স্পন্দনকে পার্টির শৃঙ্খলাবিরোধী ও কেন্দ্রিকতার বিরোধী বলে জিগীর তুলতে ত্রুটি করেন নি। অবশ্য কিছু কমরেড পার্টি কাঠামোর (Form) প্রতি তাদের মমত্ব ও বেআইনি পার্টির নিরাপত্তার জন্য তাদের উৎকণ্ঠার জন্যই সততার সঙ্গেই এই উদ্যোগকে অবাঞ্ছিত বলে মনে করেন। কিন্তু যে প্রচণ্ড শক্তির উৎস একবার ছাড়া পেয়েছে তাকে রুখবে কে? কিন্তু এই শক্তিরও বড় দুর্বলতা ছিল—এর কোন কেন্দ্রীয় পরিচালনা ছিল না—এ শক্তি ছিল বিচ্ছিন্ন।

কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠি ও তারপর

কেন্দ্রীয় কমিটি মে মাসে বৈঠক করলেন ও রাজনৈতিক সাংগঠনিক সিদ্ধান্তসমূহ প্রচার করলেন। তারা আশা করেন যে তাঁদের সিদ্ধান্তসমূহ পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করবার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সত্য কি তাই হয়েছে, না এই আশা করার কোন ভিত্তি ছিল? নিশ্চয়ই ছিলনা। কারণ—মূলত

১। কেন্দ্রীয় কমিটি আমাদের দেশের মুক্তি আন্দোলনের বর্তমান পর্যায়ে সোভিয়েত

ইউনিয়নের কোন ভূমিকার উল্লেখ করেন নি। এটা কোন মামুলী ঘটনা নয়, এর সাথে জড়িত আছে একটা দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন। টিটোবাদের সোভিয়েতের ভূমিকাকে ছোট করে দেখার অর্থ আজ আর কারো কাছে অস্পষ্ট নয়। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের পাঁকে যারা ডুবে আছে একমাত্র তারাই আজ সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকাকে গুরুত্ব না দিতে পারে। কিন্তু টিটোবাদী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন বলে যারা দাবি করেন তাদের পক্ষে নিশ্চয়ই এটা স্বাভাবিক নয়।

২। কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টির বিচ্যুতির গভীরতা বুঝতে চাইলেন না, সেই চিরাচরিত প্রথায় নেতৃত্বের একাংশ বিচ্যুতি সম্বন্ধে দায়িত্ব এড়াতে চেষ্টা করলেন ও বিচ্যুতির কারণগুলির মূল অনুসন্ধান করার চেষ্টা না করে কয়েকজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অগ্নি উদ্‌গীরণ করলেন। সমালোচনা-আত্মসমালোচনার ভিতর দিয়ে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা না করে পার্টির ভিতরে থেকে ট্রটস্কীবাদ-টিটোবাদের মূলকে উপড়ে ফেলতে কার্যত তারা অস্বীকার করলেন।

৩। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শ্রেণি সমাবেশের ব্যাপারে তাঁরা "লাষ্টিং পীস"-এর সমস্ত কৃষকের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার নির্দেশকে সংশোধন করলেন এই নির্দেশ দিয়ে যে, যে ধনী কৃষক সামন্ততান্ত্রিক প্রথায় শোষণে অংশগ্রহণ করে সে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের শত্রু। এটা জানা কথা যে ভারতবর্ষের মত একটা আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশে ধনী কৃষক তো বটেই এমন একটা অংশ মধ্যবিত্ত কৃষক আছে যারা ধান বা টাকা কর্জা দেওয়া, জমি প্রজা বিলি দেওয়া প্রভৃতি সামন্ততান্ত্রিক শোষণের সাথে জড়িত। ফলে, কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী অধিকাংশ ধনী কৃষক তো বটেই একাংশ মধ্যবিত্ত চাষীকেও আমাদের শত্রু বলে ঘোষণা করতে হয়।

জাতীয় বুর্জোয়ার সাথে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের ব্যাপারেও তাঁরা যে বাধানিষেধ আরোপ করেছেন সে সম্বন্ধে ঐ একই কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ "লাষ্টিং পীস"-এর প্রবন্ধের নির্দেশ অমান্য করে তাঁরা সেই একই ট্রটস্কীবাদী শ্রেণি সমাবেশের নির্দেশ দিয়েছেন।

৪। ভারতীয় জনগণের এক ব্যাপক অংশের উপর বিশেষ করে কৃষকদের উপর বুর্জোয়া সংস্কারবাদের প্রভাবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেই কেন্দ্রীয় কমিটি নির্দেশ দিয়েছেন যে সমগ্র জনসাধারণ আজ কংগ্রেস সরকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত এবং আমাদের নেতৃত্বে জনসাধারণের এক ব্যাপক অংশ ইতিমধ্যেই সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ করেছেন ও সমগ্র জনসাধারণ এমন কি সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া অংশও সশস্ত্র সংগ্রামকে সমর্থন করার জন্য প্রস্তুত—কেবল অপেক্ষা আমাদের নেতৃত্বের—রণদিভের নীতির সাথে কি আশ্চর্য সাদৃশ্য।

৫। কেন্দ্রীয় কমিটি আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে শত্রুর আক্রমণের সামনে আমাদের প্রস্তুতি থাক বা না থাক তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ চালাতে হবে। ফলে যেহেতু কেন্দ্রীয় কমিটির মতে আমাদের দেশে এক শ্বেত সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছে সেইহেতু অবস্থা থাক বা নাই থাক এখনই আমাদের সশস্ত্র প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। পুরাতন পি.বি'র হঠকারী নীতির সঙ্গে এর তফাৎ কোথায়?

৬। কেন্দ্রীয় কমিটির মতে পুরাতন পি.বি'র হঠকারী নীতির একমাত্র অর্থ হল যে পি.বি. গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রামের তাৎপর্য না বুঝে, শহরে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথে ক্ষমতা দখলের কৌশল গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং এখন মুখটা ঘুরিয়ে গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ করাই হঠকারী নীতিকে শোধনের রাস্তা, অর্থাৎ জনসাধারণের চেতনার স্তর, প্রস্তুতি প্রভৃতি সম্বন্ধে

পুরাতন পি.বি. ও কেন্দ্রীয় কমিটির ভিতর কোন মতপার্থক্য নাই।

৭। কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠিতে ভারতের প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা না করেই পার্টি, গণসংগঠন ও সম্মিলিত ফ্রন্ট প্রভৃতি অবস্থা বিবেচনা না করেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে সমগ্র ভারতেই সাধারণভাবে সশস্ত্র সংগ্রামের অবস্থা বিদ্যমান। কারণ কেন্দ্রীয় কমিটির ধারণা কেবলমাত্র জনগণের সাধারণ সমর্থন ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করেই সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলা সম্ভব। অথচ আমরা মাও সে-তুং ও লিউ সাও-চির লেখা থেকে চীনের অভিজ্ঞতার কথা যা জানি তাতে পরিষ্কার যে, জনগণের ব্যাপক সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা না থাকলে গেরিলা লড়াই চালান যায় না। কেন্দ্রীয় কমিটির ধারণা অনুযায়ী চললে পার্টির যা কিছু অবশিষ্ট আছে তাও ধ্বংস হয়ে যেতে বাধ্য—আর নতুনভাবে জনগণের কোন অংশের কোন গণসংগঠন গড়ে তোলার কথাতো কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠিতে নেই। অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রাম করার নামে সশস্ত্র সংগ্রামের সমস্ত সম্ভাবনাই পণ্ড হয়ে যাবে।

৮। গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণির ভূমিকা ও শহরের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে কোন গুরুত্ব না দিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি বস্তুত এদের ভূমিকাকে অস্বীকার করেছেন।

৯। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের ভূমিকা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় কমিটি কোন গুরুত্বই দেননি, কেবল চিরাচরিত প্রথায় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সম্বন্ধে কতগুলি মামুলি কথা বলা হয়েছে মাত্র।

১০। কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠনের যে মূল নীতি তাঁরা অনুসরণ করেছেন তাতেই তাঁদের ট্রটস্কীবাদ-টিটোবাদেব বিরুদ্ধে সংগ্রামের শপথ যে কত ভুয়া তা প্রমাণ করে। যারা উন্মত্তের ন্যায় ট্রটস্কীবাদী-টিটোবাদী নীতি চালিয়ে গিয়েছেন, যারা "লাষ্টিং পীস"-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বেরোবার পরও নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করার দরকার মনে করেন নি, সাধারণ সভ্যদের তীব্র সমালোচনার পরও যারা নিজেদের সংশোধন প্রয়োজন মনে করেন নাই, এই ধরনের লোকদের তাঁদের কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান দিতে আপত্তি হয়নি, কেননা এরা যে কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় "আত্মসমালোচনা" (!) করেছেন।

১১। ট্রটস্কীবাদী-টিটোবাদী নীতির ধারক ও বাহকদের নিজেদের পক্ষপুটে আশ্রয় দিতে যে তাদের কোন আপত্তি নেই, ভূতপূর্ব পলিটব্যুরো মেম্বার গৌরকে আড়াল করার চেষ্টা তার আর একটি উদাহরণ।

১২। সন্দেহজনক বহু ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরও টিটোবাদী চক্রান্ত অনুসন্ধানের জন্য তাঁরা কোন ব্যাপক তদন্ত চালাবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করে, তারা ট্রটস্কীবাদ-টিটোবাদকে জিইয়ে রাখবার ভাল ব্যবস্থাই করলেন।

১৩। অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র সম্বন্ধে তাদের যে কি মনোভাব তা তাঁরা ব্যক্ত করেছেন সাধারণ সভ্যদের গণতান্ত্রিক উপায়ে পার্টি গঠনের দাবিকে বিকৃতভাবে উপস্থিত করে তাকে বিভেদকারী আখ্যা দিয়ে।

১৪। অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য অন্যান্য নেতৃস্থানীয় কমিটিগুলির অস্থায়ী পুনর্গঠনের কথা স্বীকার না করে তাঁরা সাধারণ সভ্যদের দাবির প্রতি চরম উপেক্ষা তো দেখালেনই, সঙ্গে সঙ্গে ট্রটস্কীবাদী পি.বি'র তৈরি নেতৃত্বকেই বজায় রাখতে চাইলেন। তার মানে হল সংগঠনের ক্ষেত্রে সংকট সমাধানের পথকে বন্ধ করে দেওয়া।

১৫। আন্তর্জাতিক নেতাদের দলিল চাপা দেওয়া ও বিকৃত করার ঘৃণ্য অপরাধ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও চৌধুরী ও প্রফেসারের উপর কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তারা আন্তর্জাতিকতার প্রতি শ্রদ্ধার চরম অভাব দেখালেন অর্থাৎ তারা যে এখনও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি তা প্রমাণ করলেন।

১৬। সর্বোপরি তাঁরা যে পার্টি কংগ্রেস আহ্বান পার্টির ভিতরকার বাস্তব অবস্থারই দাবি তাকে এক কলমের খোঁচায় উড়িয়ে দিয়ে তাঁরা এই কথাই প্রমাণ করলেন যে তাঁরা পার্টির সংকটের গভীরতা উপলব্ধি করেননি ও তাকে সমাধানের আন্তরিক ও সঠিক প্রচেষ্টাও তাঁরা করছেন না।

কেন্দ্রীয় কমিটির বক্তব্যের পূর্ণ সমালোচনা করা ও বর্তমান অবস্থায় নীতি ও কৌশল কি হওয়া উচিত তা বিবৃত করার স্থান এ নয়। এখানে উপরোক্ত বিষয়গুলি দিয়ে এই কথাই প্রমাণ করতে চাই যে কি আত্মসমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গিতে, কি রণনীতির ক্ষেত্রে, কি রণকৌশল ঠিক করার ব্যাপারে, কি সাংগঠনিক অচল অবস্থা দূর করার ব্যাপারে, কেন্দ্রীয় কমিটি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা মূলত সেই পুরাতন নীতির জের ছাড়া আর কিছুই নয় এবং স্বভাবতই তা পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে না এবং পার্টির মধ্যে ব্যাপক কর্মোদ্যোগের প্রেরণা আনতে পারে না। এক কথায় কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠির প্রকাশ পার্টির সংকটের সমাধানের পথ পরিষ্কার তো করলই না বরং সংকটকে আরও গভীরতর করল।

নূতন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হওয়ার পর তাদের কার্যকলাপও এই কথারই সাক্ষ্য দেয়—

১। কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক হওয়ার পর ৬ মাস কেটে গেল, কিন্তু কোন রাজনৈতিক থিসিসের খসড়া তাঁরা আজও উপস্থিত করতে পারলেন না। ব্যাপক রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা চালাবার যে প্রতিশ্রুতি তাঁরা দিয়েছিলেন তা আন্তরিক নয় বলে প্রমাণ হচ্ছে।

২। কেন্দ্রীয় কমিটি যখন তাঁদের চিঠি বার করেন তখন তাঁরা বলেন যে এটা একটা সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক লাইন নয়। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই যোশী সম্বন্ধে তাঁদের সার্কুলার মারফৎ তাঁরা পার্টি সভ্যদের জানিয়ে দিলেন যে এইটাই কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক লাইন। এই লাইনের বিরুদ্ধে এমনকি যারা মতবিরোধ প্রকাশ করবে তাদের পার্টিতে স্থান নাই।

৩। কমরেড ডাঙ্গের বিবৃতি পার্টি পত্রিকায় স্থান পায় না যেহেতু কমরেড ডাঙ্গের মত কেন্দ্রীয় কমিটির মতের বিরোধী। অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের চমৎকার নমুনা সন্দেহ নেই।

৪। পুরাতন পি.বি'র কয়েকজনের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় কমিটির অগ্নি উদ্‌গীরণ যে কতই অন্তঃসারশূন্য ও ভাঁওতা দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা তা প্রমাণিত হয় যখন শুনি যে কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগে স্থান পেয়েছেন রবি ও প্রফেসর। ট্রটস্কীবাদ-টিটোবাদের বিরুদ্ধে আদর্শগত লড়াইয়ের নেতৃত্বের জন্য সারা ভারতে কি তাদের ছাড়া অন্য কোন উপযুক্ত লোক কেন্দ্রীয় কমিটি পেলেন না?

৫। পি.ও.সি. গঠনের ব্যাপারে যখন সাধারণ সভ্যরা দাবি করলেন যে সমালোচনা আত্মসমালোচনার ভিত্তিতে অস্থায়ী প্রাদেশিক কমিটি গঠন করতে হবে, তখন পি.বি. সময় কমের অজুহাতে তা এড়িয়ে গেলেন, অথচ মাত্র কয়েকজন কমরেডের সাথে আলাপ আলোচনায় দীর্ঘদিন অতিবাহিত করতে আপত্তি হল না। পি.ও.সি. গঠনের ব্যাপারে পি.বি'র পদ্ধতির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদ হওয়া সত্ত্বেও পি.বি. সেই পার্টি সংগঠনের নীতি বিরোধী

পদ্ধতি সাধারণ সভ্যদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। বাংলাদেশের পার্টিকে ছত্রভঙ্গ করার কাজে এই ঘটনা যে বিশেষ অংশ নিয়েছে সেটা খুবই স্পষ্ট।

৬। পি.বি. প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে পার্টির ভিতর ব্যাপক রাজনৈতিক আলোচনার ব্যবস্থা করা হবে। কি ব্যবস্থা হয়েছে জানতে চাইবার অধিকার নিশ্চয় আমাদের আছে।

৭। পার্টি কংগ্রেস সম্বন্ধে পি.বি'র সার্কুলার আর একবার প্রমাণ করল যে বর্তমান পি.বি. ও সি.সি. পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। কারণ—

(ক) পি.বি. আমাদের সামনে এই মূল্যবান তথ্য হাজির করেছেন যে সি.সি. মিটিং-এর সময় ভিতরে ও বাইরে কোন মূল বিষয় সম্পর্কে মতবিরোধ না থাকার জন্য সি.সি. তার মে অধিবেশনে পার্টি কংগ্রেসের সপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই।

পার্টি সভ্যদের মতামত সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকার চমৎকার নমুনা! "লাষ্টিং পীস"-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বেরোবার পর ও পুরাতন পি.বি'র "প্রধান বৈশিষ্ট্য" প্রস্তাবের পর বহু ইউনিট ও কমরেড যে মতামত জানিয়েছেন তাতেই এই মতবিরোধের ধারা সুস্পষ্ট ছিল বলে আমাদের ধারণা সি.সি'র এ সম্বন্ধে না জানার কোন কারণই ছিল না। এ সম্বন্ধে এ মন্তব্যই করতে হয় যে, হয় পি.বি. সত্যের অপলাপ করেছেন, না হয় অন্যান্য সভ্যদের মতামত জানার প্রয়োজনও তাঁরা মনে করেন না। এর যে কোনটাই সত্য হোক এই ঘটনা এই কথাই প্রমাণ করে যে এই নেতৃত্ব মতবাদের সংঘর্ষকে চেপে রাখারই চেষ্টা করেছেন।

(খ) পি.বি. এই কথাই সাধারণ সভ্যদের বোঝাতে চেয়েছেন যে পার্টি কংগ্রেস হলে আন্দোলনের দিক থেকে নজর সরে যাবার বিপদ ছিল তাই তাঁরা পার্টিকে কংগ্রেসের ভিতর ফেঁসে যেতে দিতে চাননি। অদ্ভুত যুক্তি! পি.বি'কে আমরা এই প্রসঙ্গে রুশ পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসের আগের অবস্থা একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। এই কংগ্রেসের আগে মতবাদগত সংগ্রাম পার্টির ভিতরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এই সংগ্রামের সাথে সাথেই বলশেভিকদের সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল মেনশেভিকদের প্রভাব থেকে শ্রমিকদের মুক্ত করার জন্য। এ কাজে তারা বহুল পরিমাণে সফলও হয়েছিলেন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য যে মতবাদগত সংগ্রামের প্রয়োজন, যা না হলে পার্টির পক্ষে জনগণের নেতৃত্ব করা সম্ভব নয়— মতবাদগত সংগ্রামকে তারা সেই গুরুত্বই দিতে চাননি।

যদি তারা এই কথা বুঝতেন তাহলে "লাষ্টিং পীস"-এর প্রবন্ধ বেরোবার ১০ মাস পর আর এই বিলাপ করতে হত না যে সি.সি'র আশা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

(গ) পি.বি. যে এখনও প্রকৃত মতবাদগত সংগ্রাম চান না তা তাঁরা প্রমাণ করেছেন যেভাবে বিরোধী ধারাকে তুলে ধরা হয়েছে তার ভিতর দিয়ে। পি.বি'র সততা প্রমাণিত হত যদি তাঁরা বিরোধী মত পোষণ করেন এমন কারও কারও লেখা সাধারণ সভ্যদের সামনে হাজির করতেন। তাদের ভেতর থেকে এখনও হয়ত কেউ রাজনৈতিক থিসিসের খসড়া পেশ করেন নি, কিন্তু তাদের মত জানার মত যথেষ্ট মালমশলা তাঁদের হাতে যখন আছে তাহলে তাঁরা সেই সব পার্টি সভ্যদের সামনে উপস্থিত না করে তাঁদের সমালোচনায় অগ্রসর হলেন কেন? এর সঙ্গে রণদিভের অন্ধ্র সম্পাদকমণ্ডলীর দলিলের সমালোচনার পদ্ধতির সাদৃশ্য সত্যই আশংকাজনক। এই ব্যাপারে পি.বি. যে অসাধুতা দেখিয়েছেন তা একটিমাত্র উদাহরণ থেকেই যথেষ্ট প্রমাণিত হবে। "বিরোধী ধারা জোর এইটুকু স্বীকার করতে প্রস্তুত যে ভারতের

অন্যান্য কতগুলি মুষ্টিমেয় ছোট ছোট এলাকায় (pockets) সশস্ত্র প্রতিরোধ হয়ত সম্ভব ও প্রয়োজন ও সংগ্রামের এই পদ্ধতিকে অন্যান্য আরও অনেক পদ্ধতির অন্যতম মাত্র বলিয়া হয়ত মনে করা যাইতে পারে, কিন্তু ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সম্মুখে ইহাকেই প্রধান পদ্ধতি বলিয়া বর্ণনা করা সম্পূর্ণ ভুল। বিরোধী ধারা একমত নন যে বিপ্লবের সাফল্যের জন্য অন্যান্য পদ্ধতি অপরিহার্য হইলেও তাহারা এই প্রধান পদ্ধতির পরিপূরক মাত্র।"

অর্থাৎ পি.বি. সাধারণ সভ্যদের এই কথা বোঝাতে চান যে পার্টির ভেতর এমন এক প্রবল ধারা আছে যে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে সশস্ত্র সংগ্রাম প্রধান পদ্ধতি তো দূরের কথা এমনকি আদৌ তার প্রয়োজন আছে কিনা সে বিষয়ে তার সন্দেহ আছে। আমরা যতদূর জানি এরকম কোন প্রবল ধারার অস্তিত্ব পার্টির মধ্যে নাই। তবে একথা সম্পূর্ণ সত্য যে পার্টির মধ্যে একটি প্রবল ধারা আছে যার মতে বিপ্লবের সাফল্যের জন্য ভারতের মুক্তি সংগ্রামের প্রধান রূপ যে সশস্ত্র সংগ্রামের রূপই নেবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রামকে কার্যকরী ও সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে যে বাস্তব অবস্থা ও প্রস্তুতি থাকা দরকার, যথা শাসকশ্রেণী ও তার সরকার সম্বন্ধে জনগণের মোহমুক্তি, গণ আন্দোলন, গণ সংগঠন, সংগ্রামের বিশিষ্ট রূপের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জনগণের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, পার্টি সংগঠন, পার্টি ও সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি জনগণের ব্যাপক সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগ ইত্যাদি— সাধারণভাবে সমগ্র ভারতবর্ষে এখনই তা নেই। বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ না করেই, আন্দোলনের স্তরের বিচার না করেই সমগ্র ভারতবর্ষে সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকৃতপক্ষে সশস্ত্র সংগ্রামের ভবিষ্যতকে পণ্ড করছেন বলে আমরা মনে করি।

কিন্তু পি.বি. যেভাবে বিরোধী ধারাকে দেখিয়েছেন সেটা যে বিরোধী ধারাকে সংস্কারবাদী ধারা বলে হেয় প্রতিপন্ন করে তাদের হঠকারী, ট্রটস্কীবাদের সাথে আপসকারী নীতি চাপিয়ে দেওয়ার এক দুরভিসন্ধিমূলক অপচেষ্টা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

(ঘ) পি.বি. পরোক্ষভাবে সাধারণ সভ্যদের বোঝাতে চেয়েছেন যে পার্টিতে যে সাংগঠনিক অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য অন্যান্যের কেন্দ্র বিরোধী কার্যকলাপই দায়ি, পার্টির ভিতরকার সংকটের গভীরতা উপলব্ধি করতে চেষ্টা না করে বা এড়িয়ে যাওয়া, বিভিন্ন মতকে সাধারণ সভ্যদের সামনে উপস্থিত করতে অস্বীকার করা, এইভাবে মতবাদগত সংগ্রামকে চাপা দিয়ে ট্রটস্কীবাদ-টিটোবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে অস্বীকার করে পার্টির সংকটের গভীরতর করার দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে চাপাবার এই অপচেষ্টা পার্টির সংকটকে আরও গভীরতর না করে পারে না।

(ঙ) কংগ্রেসের দাবি স্বীকার করার সাথে সাথে পি.বি. এই কথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে "কংগ্রেসের প্রতিনিধি সংখ্যা খুব সীমাবদ্ধ হইবে; একথা কেউ অস্বীকার করে না যে বর্তমান অবস্থায় প্রতিনিধি সংখ্যা সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। কিন্তু এই কংগ্রেসের আগে যদি বিভিন্ন মতকে সমস্ত পার্টি সভ্যদের সামনে তুলে ধরে মতবাদগত প্রস্তুতি না চালান হয়, অপরপক্ষে বিরোধী ধারাকে হীন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়, তা হলে সেই কংগ্রেস প্রকৃত পার্টি কংগ্রেস হবে না। সেই কংগ্রেস হবে পার্টির সংখ্যালঘিষ্ঠের মতকে অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেবার হাতিয়ার হিসাবে।" পি.বি. এই রাস্তাই গ্রহণ করেছেন।

কংগ্রেস আহ্বানের পরও পি.বি'র এই ধরনের কার্যকলাপ এই কথাই প্রমাণ করে যে বর্তমান পি.বি. ও সি.সি. পার্টির ভিতর প্রকৃত মতবাদগত সংগ্রাম চান না। তাঁরা যে রাস্তা নিয়েছেন তা পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করার রাস্তা নয়, পার্টিকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার রাস্তা। কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক সাংগঠনিক নীতির ভিত্তিতে পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে, সংকট সমাধানের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে অস্বীকার করে, পি.বি. ও সি.সি. এই কথাই প্রমাণ করেছেন যে তাঁরা আর সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের ধারক ও বাহক নন, তাঁবা পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করার কেন্দ্র হিসাবে কাজ করতে অক্ষম, তাদের নীতি ও কার্যকলাপ পার্টির ভিতর একটি বিভেদকারী সংখ্যালঘিষ্ঠের চক্রের কার্যকলাপের পর্যায়ে পড়ে।

বর্তমান অবস্থা ও আমাদের কর্তব্য

কেন্দ্রীয় কমিটির নীতির অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ পার্টি আজ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। কিন্তু তাসত্ত্বেও আমরা মনে করি না যে কমিউনিস্ট পার্টির আর কোন অস্তিত্ব নাই। ২০ বৎসরের ঐক্যবদ্ধ পার্টির ঐতিহ্য, ইনফরমেশন ব্যুরো যে রণনীতি ও রণকৌশলের নির্দেশ দিয়েছেন, তার প্রতি আমাদের আনুগত্য, অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টি, বিশেষ করে সোভিয়েত ও চীনের মহান পার্টির প্রতি আমাদের গভীর ভ্রাতৃত্বমূলক শ্রদ্ধা ও আস্থা, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি আমাদের গভীর আনুগত্য এখনও আমাদের পার্টিকে এক বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে। এই জন্য নতুন পার্টি গঠনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। এই কথা অস্বীকার করার অর্থ পার্টির ভিতরকার সুস্থ শক্তিকে ছোট করে দেখা, আমাদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে হতাশার সৃষ্টি করা, পার্টির ভিতরকার বর্তমান অবস্থার এই পরস্পর বিরোধিতার কথা মেনে নিয়েই আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

অন্যান্য দেশের পার্টির অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের অভিজ্ঞতা আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে যখনই কেন্দ্রীয় কমিটি সমগ্রভাবে পার্টির সংকট সমাধানের নেতৃত্ব দিতে অস্বীকার করেছেন বা অক্ষম হয়েছেন, তখনই নেতৃস্থানীয় কমরেডদের একাংশ কেন্দ্রীয় কমিটির বিরোধিতা সত্ত্বেও পার্টির সংকট সমাধানের নেতৃত্ব দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে যে আমাদের পার্টিতে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এমন কোন নেতৃত্ব এখন পর্যন্ত কার্যকরীভাবে দেখা দেয় নাই।

এই অবস্থায় কিভাবে পার্টি ঐক্যবদ্ধ হবে?

১। পার্টির এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার পথ সব থেকে সোজা হয় যদি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্ব সাহায্য করেন। জাপানের পার্টির প্রতি চীনের পার্টির ভ্রাতৃত্বমূলক উপদেশ আমাদের মনে এক নতুন আশার সঞ্চার করে এবং আমরা আশা করতে পারি যে ভারতীয় পার্টির সংকট মুহূর্তে তারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। আন্তর্জাতিক নেতৃত্বকে আমাদের জানানো প্রয়োজন যে তাদের সাহায্যকে আমরা সাদর অভিনন্দন জানাবো।

২। তার অর্থ এই নয় যে পার্টির ভিতরকার শক্তি নিষ্ক্রিয় থাকবে। "লাস্টিং পীস"-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বেরোবার পর এই দশ মাসের ইতিহাস অকাট্যভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে যে পার্টির সাধারণ সভ্যদের শক্তি, তার বহু দুর্বলতা ও ত্রুটি সত্ত্বেও, পার্টিতে ট্রটস্কীবাদ-টিটোবাদী নীতি চালিয়ে যাবার বা তার জের টেনে চলার যে কোন প্রচেষ্টা বা ঝোঁকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে আর কেন্দ্রীয় কমিটির নীতি পার্টিকে সংকট থেকে বের করে নিয়ে

যাবার প্রচেষ্টার পথে এক শৃঙ্খল হিসাবে কাজ করেছে। এই অচল অবস্থার মূল কারণ সেইখানেই। এই অচল অবস্থাকে দূর করার জন্য সাধারণ সভ্যদের এমন এক উদ্যোগ দেখাতে হবে যে উদ্যোগ কেন্দ্রীয় কমিটিকে ঐক্যবদ্ধ করার কেন্দ্রে পরিণত করবে ও প্রকৃত পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠান করতে বাধ্য করবে। এই উদ্যোগ দেখাবার অর্থ হল পার্টি কংগ্রেসের প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু করা।

(ক) বিভিন্ন এলাকা ও জিলাগত ভাবে নিজেদের আত্মসমালোচনামূলক রিপোর্ট তৈরি করতে শুরু করতে হবে।

(খ) যে সমস্ত মত পাওয়া গেছে, যেমন একদিকে কেন্দ্রীয় কমিটির মত ও অন্যদিকে কমরেড ডাঙ্গে প্রভৃতির মতের ভিত্তিতে ব্যাপক রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা শুরু করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাব পাওয়ার জন্য সি.সি'র কাছে দাবি তুলতে হবে।

(গ) পার্টি সভ্যের হিসাব, পার্টি সংগঠনের প্রকৃত অবস্থা, গণ আন্দোলন ও গণ সংগঠনের প্রকৃত অবস্থা এবং সেই এলাকার জনগণ ও অন্যান্য পার্টি বা তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত গণ সংগঠনের অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট তৈরি করতে হবে।

(ঘ) নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে এই প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে হবে।

কেন্দ্রীয় কমিটি যদি সঠিক নীতি ও সাংগঠনিক নেতৃত্ব দেন ও পার্টির কাঠামোর মারফৎ অন্তঃপার্টি সংগ্রামকে ও কংগ্রেসের প্রস্তুতিতে সংগঠিত করেন, তবেই ঐ কাজ সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় ও সমস্ত পার্টি সভ্য উহাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন। অন্যান্য নেতৃস্থানীয় কমিটিগুলির সবল নেতৃত্ব ও উদ্যোগ এই কাজকে সহজ করে তোলে, কিন্তু প্রধানত বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির অক্ষমতা ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় কমিটিগুলির দুর্বলতার ফলে অন্তঃপার্টি সংগ্রামে যে বিশৃঙ্খলা ও পার্টিতে ভাঙনের সৃষ্টি হয়েছে তার থেকে পার্টিকে বাঁচাতে গেলে এমন এক কেন্দ্রীয় কমিটি প্রয়োজন যে কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করার কেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে, যে কেন্দ্রের নেতৃত্ব সমগ্র পার্টিকে এক সুস্থ সবল অন্তঃপার্টি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এক প্রকৃত পার্টি কংগ্রেসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সাধারণ সভ্যদের এই উদ্যোগই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এই পরিবর্তনকে অনিবার্য করে তুলতে পারে এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় কমিটিগুলির দুর্বলতা দূর করে তাহাদের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করতে পারে।

১। বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটি তাদের নীতি ও কার্যকলাপ দ্বারা এই কথাই প্রমাণ করেছেন যে তারা পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করার ভূমিকা গ্রহণে অক্ষম। কেউ কেউ বলেন যে যে মুহূর্তে কেন্দ্রীয় কমিটির কাজকে বিভেদমূলক আখ্যা দেওয়া হবে সেই মুহূর্তে পার্টির আনুষ্ঠানিক ঐক্যের ভিত্তিতে যে কাঠামোটুকু আছে তাও ভেঙ্গে পড়বে ও পার্টি একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। সুতরাং এই কথা যারা বলেন তারাই প্রকৃতপক্ষে বিভেদকারী। অর্থাৎ অন্য কথায় বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটিই হলেন ঐক্যের প্রতীক। মূল্যবান তথ্য সন্দেহ নাই। আমাদের মতে পুরাতন পি.বি'র ট্রটস্কীবাদী-টিটোবাদী নীতি পার্টিতে যে ভাঙন এনেছিল, বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনীতি ও সাংগঠনিক নীতি এই ট্রটস্কীবাদ-টিটোবাদের সাথে আপস করে পার্টির অনৈক্যকে আরও গভীর করেছে, পার্টির ভাঙনকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। পার্টির সংকট সম্বন্ধে যারা অন্ধ তারা ছাড়া আর কেউই এই বাস্তবকে অস্বীকার করতে পারে না। কেন্দ্রীয় কমিটির এই কার্যকলাপ সত্ত্বেও যে ঐক্যটুকু বজায় আছে তার কৃতিত্ব কেন্দ্রীয় কমিটির নয়।

তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্বের ও আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের প্রতি সাধারণ সভ্যদের অগাধ বিশ্বাসের ও শ্রদ্ধার। পুরাতন পি.বি. ও কেন্দ্রীয় কমিটির বিভেদকারী নীতি সত্ত্বেও এই কাঠামো ভাঙ্গেনি আর নেতৃত্বের কার্যকলাপকে বিভেদমূলক আখ্যা দিলেও এই কাঠামো থাকবে। যদি কংগ্রেসের প্রস্তুতির ভিতর দিয়ে সাধারণ সভ্যদের উদ্যোগকে মুক্ত করা যায় তাহলেই বরং এই কাঠামো আরও দৃঢ় হবে। বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির পরিবর্তন ছাড়া কেন্দ্রের নেতৃত্ব আশা করা বৃথা, তাই আমাদের দাবি করতে হবে—

(ক) কেন্দ্রীয় কমিটির ভিতর থেকে গৌরসহ যাঁরা ট্রটস্কীবাদ-টিটোবাদের ধারক ও বাহক ছিলেন তাদের কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বাদ দিতে হবে। ডাঙ্গে, ঘাটে ও ঘোষকে কেন্দ্রীয় কমিটির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কিন্তু এটাই যথেষ্ট বলে আমরা মনে করি না। সাধারণ সভ্যদের ভিতর থেকে যারা বামপন্থী নীতির রণনীতি না হলেও রণকৌশলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন এবং "লাষ্টিং পীস" বেরোবার পর থেকে যারা ট্রটস্কীবাদ-টিটোবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তাঁদের ভিতর থেকেও কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান করে দিতে হবে। নতুনের সংস্পর্শে আসা ছাড়া পুরাতনের দুর্বলতা দূর হতে পারে না। ট্রটস্কীবাদ-টিটোবাদের ধারক ও বাহকদের বাদ দিয়ে, অপর তিনজন নেতৃস্থানীয় কমরেডদের নিয়ে পুনর্গঠিত অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি ঠিক করবেন কাদের এই কেন্দ্রীয় কমিটিতে গ্রহণ করা যায়।

(খ) কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠি তুলে নিতে হবে ও এইভাবে পুনর্গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির পদ থেকে এক বা একাধিক রাজনৈতিক থিসিসের খসড়া পেশ করতে হবে।

(গ) কংগ্রেস সম্বন্ধে পি.বি'র দুরভিসন্ধিমূলক ও বিভেদকারী সার্কুলার প্রত্যাহার করতে হবে ও কিভাবে প্রকৃত কংগ্রেসের পথে অগ্রসর হওয়া যায় তার পথনির্দেশ করতে হবে।

(ঘ) ভিন্ন ভিন্ন মতের প্রতিনিধি নিয়ে কেন্দ্রীয় ফোরামের সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত করতে হবে ও মতবাদের সংগ্রামকে এক নতুন পর্যায়ে তুলতে হবে।

২। প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠি প্রত্যাখ্যান করে অন্তঃপার্টি সংগ্রামে সুস্থ শক্তিকে শক্তিশালী করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে যে পার্টি সংকট সমাধানের কোন সামগ্রিক ও বলিষ্ঠ পথনির্দেশ তারা করতে পারেন নি। কলিকাতা জেলা সংগঠনী কমিটি গঠনের যে পদ্ধতি তারা গ্রহণ করেছিলেন ও জিলা সংগঠনী কমিটির গঠন সম্পর্কিত সার্কুলারে কমরেড সমর সম্বন্ধে যে দৃষ্টিভঙ্গি তারা দেখিয়েছেন তাতে অনৈক্যকে বাড়াতেই সাহায্য করেছে। পি.ও.সি'র এই দুর্বলতা দূর করার জন্য আমরা দাবি করছি ঃ—

(ক) দীর্ঘদিন পার্টির কার্যকলাপ থেকে বিচ্ছিন্ন ও নিষ্ক্রিয় থাকা সত্ত্বেও পি.ও.সি.তে গৃহীত কমরেড উপেনকে পি.ও.সি. থেকে বাদ দেওয়া হোক। পি.ও.সি'র সভ্য সংখ্যা বাড়িয়ে ৯ জন করা হোক, এবং সাধারণ সভ্যদের ভেতর যারা ট্রটস্কীবাদ-টিটোবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন এই রকম তিনজন কমরেডকে পি.ও.সি.তে স্থান দেওয়া হোক। এইভাবে পি.ও.সি'র ভিতরেও যতক্ষণ নতুনের স্থান করে না দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ পুরাতনের দুর্বলতা সম্পূর্ণভাবে দূর হতে পারে না।

(খ) পার্টির সংকট সমাধানের পথ কি সে সম্বন্ধে তারা পথনির্দেশ করুন।

(গ) বিভিন্ন জেলার বাস্তব অবস্থার রিপোর্ট প্রচারের ব্যবস্থা করুন।

(ঘ) বিভিন্ন মতের দলিলপত্রের বাংলা, হিন্দী, উর্দু প্রভৃতি ভাষায় প্রচার করার চেষ্টা করুন।

(ঙ) প্রদেশগতভাবে ও নিজেদের সমালোচনা ও আত্মসমালোচনামূলক রিপোর্ট প্রস্তুত করুন।

৩। জিলা কমিটিগুলি যেহেতু সাধারণ সভ্যদের সবথেকে কাছাকাছি আছেন, সেই হেতু সাধারণ সভ্যদের উদ্যোগকে মুক্ত করার কাজে তারা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। বিশেষ করে কলিকাতা জিলা সমগ্র পার্টিতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে আছে এবং কলকাতা জিলার কমরেডরা অন্তঃপার্টি সংগ্রামে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। কলিকাতা জিলা সংগঠনী কমিটির এক বিশেষ দায়িত্ব আছে। কলিকাতা জিলা সংগঠনী কমিটিকে অবিলম্বে এই উদ্যোগ দেখাতে হবে। তাকে নিম্নলিখিত কাজগুলি করতে হবে।

(ক) বিশেষ করে আমাদের পার্টিতে যে মতবাদগত পশ্চাদপদতা রয়েছে সে ক্ষেত্রে মত-বাদগত প্রস্তুতি ছাড়া কোন প্রকৃত পার্টি সম্মেলন হতে পারে না। এই মতবাদগত প্রস্তুতির জন্য জিলা সংগঠনী কমিটির কাজ হবে—একটি শিক্ষা টিম গঠন করা, যে শিক্ষা টিমের কাজ হবে ঃ

(অ) বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা বুঝতে গেলে যে বিষয়গুলির বোঝা দরকার—যেমন সাম্রাজ্যবাদ কি, সামন্ততন্ত্র কাকে বলে, ঔপনিবেশিক দেশের বিশেষত্ব কি, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অর্থ কি, ট্রটস্কীবাদ-টিটোবাদ কি? ইত্যাদি বুঝবার সুবিধার জন্য একটি পুস্তিকা তৈরি করা।

(আ) যে বিভিন্ন মত হাতে এসেছে তার উপর আলোচনার জন্য বিভিন্ন ইউনিটকে সাহায্য করা।

(খ) বামপন্থী যুগের পর্যালোচনা তৈরি করার জন্য একটি খসড়া কমিটি তৈরি করা যার কাজ হবে বিভিন্ন ইউনিট থেকে পার্টি সংগঠন এবং গণ আন্দোলন ও গণ সংগঠনের রিপোর্ট ও তার ভিত্তিতে একটি খসড়া তৈরি করা।

(গ) বর্তমান ডি.ও.সি. সভ্যদের আত্মসমালোচনামূলক রিপোর্ট তৈরি করা।

(ঘ) মত বিনিময়ের রাস্তা খুলে দেওয়ার জন্য ও বিভিন্ন এলাকার সম্মেলনের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য জিলা সংগঠনী কমিটির তরফ থেকে আলোচনা পত্রিকা প্রকাশ করা। এই আলোচনা পত্রিকার জন্য বিভিন্ন মতের প্রতিনিধি নিয়ে একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করতে হবে।

(ঙ) বিভিন্ন এলাকার আত্মসমালোচনামূলক রিপোর্ট ইত্যাদি তৈরি করার জন্য তাঁদেরকে সাহায্য করা।

(চ) বাস্তব গণ আন্দোলন আরম্ভ করার জন্য একটি নিম্নতম প্রাথমিক কার্যক্রম প্রস্তুত করা ও তাকে কাজে পরিণত করার জন্য নিম্ন ইউনিটগুলিকে সাহায্য করা।

মত বিনিময়ের পন্থা

মতবাদগত ঐক্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য মত বিনিময়ের প্রয়োজন অপরিহার্য। যে পার্টি সাধারণভাবে মতবাদগতভাবে পিছিয়ে পড়া, বর্তমানে যে পার্টিতে মতবাদগত বিভ্রান্তি অত্যন্ত ব্যাপক সেখানে ঐকমত্য গঠনের জন্য মত বিনিময় ও পরস্পরের সাহায্যের প্রয়োজন আরও বেশি। এই মত বিনিময়ের রাস্তা কি?

(ক) পার্টির উচ্চতর কমিটিগুলি পরিচালিত আলোচনা পত্রিকা এই কাজের জন্য সব থেকে কার্যকরী হাতিয়ার; যদিও উচ্চতর কমিটিগুলি, প্রধানত কেন্দ্রীয় কমিটি এ ব্যাপারে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন, তা সত্ত্বেও এই পত্রিকাগুলিকে নিয়মিত বার করার জন্য ও এতে

পরস্পর বিরোধী ধারাকে স্থান দেওয়ার জন্য দাবি করতে হবে।

(খ) বিভিন্ন ইউনিটের কমরেডদের প্রত্যক্ষ আলোচনা আর একটি প্রধান পদ্ধতি। "লাস্টিং পীস"-এর সম্পাদকীয় বেরোবার পর তদানীন্তন পি.বি'র দুরভিসন্ধিমূলক কার্যকলাপের ফলে যখন মত প্রকাশ মত বিনিময়ের পথ ভীষণ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল তখন বিভিন্ন ইউনিটের সাধারণ পার্টি সভ্যরা সমস্ত বাধাকে চূর্ণ করে পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে মত বিনিময়ের রাস্তা খুলে নিয়েছিলেন, বাস্তব অবস্থার প্রয়োজনে। আমরা মনে করি যে বাস্তব অবস্থার কোন গুণগত পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত এ প্রয়োজন থাকবেই এবং একে বন্ধ করা না করা কারও ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকলাপ যখন বিভেদ সৃষ্টি করেছে, পি.ও.সি. যখন এখনও কোন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হননি ও ডি.ও.সি.ও যখন এখন পর্যন্ত তেমন ব্যাপক কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করতে পারেনি, তখন অবস্থার কোন গুণগত পরিবর্তন হয়েছে বলে আমরা মনে করি না। কাজেই বর্তমানে আবার কেন্দ্রিকতার দোহাই পেড়ে এই পন্থায় মত বিনিময়ের বিরুদ্ধে যে প্রচার ও প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে তা সফল হওয়ার অর্থ পার্টির ভিতরকার এই সুস্থ শক্তিকে আবার অন্ধকারের অতল গহ্বরে ডুবিয়ে দেওয়া। তাই এর বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি দিয়ে লড়তে হবে। যারা একে পার্টিবিরোধী চক্রান্ত বলে তাঁরা বাস্তব অবস্থাকে উপলব্ধি না করে অলীক কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করছেন ও তাঁরা পার্টিকে আরও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে সাহায্য করবেন। এই ধরনের যোগাযোগ তখনই চক্রান্তের পর্যায়ে পড়ে, যখন পার্টিতে অধিকাংশের আস্থাভাজন ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গৃহীত কোন পলিসি ও নেতৃত্ব থাকে ও মত আদানপ্রদানকারীরা ঐ রকম নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কার্যকলাপে লিপ্ত হন।

উচ্চতর কমিটিগুলি যখন কমরেডদের বৈঠকে মিলিত হয়ে আলাপ আলোচনার সুযোগ করে দেবেন, তখন আর কমরেডদের ব্যবস্থার ভার নিজেদের গ্রহণের প্রয়োজন থাকবে না, পার্টির বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে এই কথা প্রযোজ্য।

(গ) মত বিনিময়ের অপর একটি পথ হল বিভিন্ন ইউনিট ও কমরেডদের দলিলপত্রাদি আদানপ্রদান। কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে পূর্বতন জিলা কমিটি পর্যন্ত এই কাজ করতে কার্যত অস্বীকার করেছেন। আর্থিক অভাব ও অন্যান্য অসুবিধা ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন অন্যান্য বহু দলিলপত্রাদিও বেরিয়েছে তখন নেতৃত্বের মতের বিরোধী কোন মতই প্রচার করা হল না এই কথা আমরা বিশ্বাস করি না। তাঁদের এই ব্যর্থতার ফলে বিভিন্ন কমরেড ও ইউনিট তাদের লিখিত দলিলপত্রাদি নিজেদের দায়িত্বে যতখানি সম্ভব প্রচার করার উদ্যোগ নিজেদের হাতে নিয়েছেন। তাদের এই প্রচেষ্টা যদিও প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট ছিল না, তা সত্ত্বেও এই ধরনের মতের আদানপ্রদান যে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এটা আরও সফলভাবে হতে পারে যদি নেতৃস্থানীয় কমিটিগুলি সততার সাথে এই দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না এ ব্যাপারে উদ্যোগ হাতে নেওয়ার আন্তরিক চেষ্টা তারা করছেন ততক্ষণ নিজেদের দায়িত্বে মত বিনিময়ের এই অধিকারকে ত্যাগ করা যায় না। কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক বা জিলা যে স্তরের উচ্চতর কমিটি এই দায়িত্ব পালন করবেন সেই স্তরে নিজেদের দায়িত্বে এ কাজ করার আর কোন প্রয়োজন থাকবে না।

মত বিনিময়ের এই সমস্ত রাস্তা খুলে দেওয়ার ব্যাপারে যদি কোন উচ্চতর কমিটি তাদের সততা ও আন্তরিকতার পরিচয় দিতে পারেন তবে টেক, আর্থিক প্রভৃতি অসুবিধার জন্য

প্রচেষ্টার সীমাবদ্ধতা সাধারণ সভ্যদের নিশ্চয়ই স্বীকার করে নিতে হবে ও সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর কমিটিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার চেষ্টা করতে হবে।

বাস্তব কাজকর্ম

জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পার্টির অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম চলতে পারে না। কমিউনিস্ট পার্টি প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি থাকে না যখন সে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই কারণেই পার্টির অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম ও জনগণের সাথে সংযোগ সাধনের ও জনগণকে নেতৃত্ব দেওয়ার কাজ এক ও অবিচ্ছেদ্য। তাই পার্টির অভ্যন্তরীণ সংগ্রামকে এক নতুন পর্যায়ে তোলার সাথেই আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে জনগণের সাথে সংযোগ স্থাপনের কাজে। শান্তি আন্দোলনের মারফৎ, জনসাধারণের দৈনন্দিন অভাব অভিযোগের ভিত্তিতে আন্দোলন প্রভৃতির মারফৎ জনগণের সাথে আমাদের বিচ্ছিন্নতা ঘোচাতে হবে। বাস্তবের পরীক্ষাগারে প্রমাণ করতে হবে কোন কর্মকৌশল জনগণকে পার্টির পতাকাতলে সমবেত করতে সক্ষম হয় এবং তাই হবে সঠিকতর মাপকাঠি।

অভ্যন্তরীণ সংগ্রামে সাধারণ সভ্যদের ভিতরকার দুর্বলতা

পার্টির অভ্যন্তরীণ সংগ্রামে কোন শক্তি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা এতক্ষণ দেখান হয়েছে। কিন্তু আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না এবং অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম সঠিকভাবে চলবে না যদি আমরা যে সুস্থ শক্তি অভ্যন্তরীণ সংগ্রামে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে সেই সাধারণ সভ্যদের ভিতর যে দুর্বলতা ছিল বা যে দুর্বলতা আত্মপ্রকাশ করেছে তা না দেখি ও তা শোধরাতে চেষ্টা না করি। প্রধান প্রধান দুর্বলতাগুলি হল ঃ

১। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পার্টির বিরাট সংখ্যক সাধারণ কমরেডদের, বিশেষ করে শ্রমিক কৃষক কমরেডদের রাজনৈতিক চেতনার মানকে উন্নীত করার চেষ্টার ভিতর দিয়ে তাদের এই সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবার চেষ্টা প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই যথেষ্ট নয়, অনেক জায়গায় আদৌ এই চেষ্টা হয়নি। অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন প্রধানত মধ্যম স্তরের কর্মীরা। এর ফলে পার্টির রাজনৈতিক পশ্চাদপদতা থেকে গেছে। এবং আরও হয়েছে যে অনেক সাধারণ সভ্যদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে ও মধ্যম স্তরের কর্মীদের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে ও অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের প্রতিই এক বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে। এই অবস্থা এই কথাই প্রমাণ করে যে আমলাতান্ত্রিকতা নীচের স্তরকেও বিশেষ দূষিত করেছে। আজ পার্টির অভ্যন্তরীণ সংগ্রামকে এক উচ্চতর পর্যায়ে তোলার প্রথম ধাপ হওয়া উচিত সাধারণ কমরেডদের শিক্ষা ব্যবস্থা করা ও নীচের স্তরেও যে আমলাতান্ত্রিকতার অস্তিত্ব রয়েছে তার বিরুদ্ধে সচেতনভাবে সংগ্রাম করা।

২। বাস্তব কর্মদ্যোগের অল্পতা বা অভাব আর একটি প্রধান দুর্বলতা। একথা ঠিক যে পার্টির নীতি ঠিক না হলে একটি সামগ্রিক আন্দোলন দানা বাঁধতে পারে না এবং বাস্তব কাজের নাম করে পার্টির ভিতর নীতিগত আলাপ আলোচনা বন্ধ করে দেওয়ার একটি ভ্রান্ত চেষ্টাও চলেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও পার্টির কর্মকৌশল ঠিক করার জন্যও যে যেভাবে নীতি বুঝেছিলেন সেইভাবেই বাস্তবে সেই নীতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করা উচিত ছিল। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত

সংগ্রামের মধ্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার ছিল। রাজনৈতিক আলাপ আলোচনার সাথে বাস্তব কাজকর্মকে যুক্ত করার ভিতর দিয়ে সঠিক কর্মকৌশল স্থির করার পথ পরিষ্কার হোত। দ্বিতীয়ত এই বাস্তব কাজের মারফৎ পার্টির বামপন্থী বিচ্যুতি জনগণ থেকে আমাদের যে বিচ্ছিন্নতা এনে দিয়েছে সেই বিচ্ছিন্নতা দূর করার ভিতর দিয়ে পার্টিতে নতুন প্রাণের সৃষ্টি হত। কিন্তু বহু জায়গায় এই বাস্তব কর্মদ্যোগের ও জনগণের সাথে সংযোগ সাধনের কাজকে গুরুতরভাবে অবহেলা করা হয়েছে, অথবা যে জায়গায় চেষ্টা হয়েছে তাও প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম। এর ফল হয়েছে যে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পার্টি তার প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলেছে, আর সাধারণ কমরেডদের এক বড় অংশের মধ্যে এনে দিয়েছে এক হতাশা। বহু ক্ষেত্রে সাধারণ কমরেডরা রাজনৈতিক সংগ্রামকে জনগণের আন্দোলনের পথে বাধা হিসাবে দেখতে আরম্ভ করেছেন ও অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম বিরোধী এক ঝোঁক দেখা দিয়েছে। বাস্তব কাজকর্মের দিকে নজর দিয়ে এই উভয় বিচ্যুতি থেকে পার্টির অভ্যন্তরীণ সংগ্রামকে বাঁচাতে হবে।

৩। কমরেডদের রাজনৈতিক স্তরকে উন্নত না করে শত্রুর চক্রান্তের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে নানা থিসিস প্রচার অথবা বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে ব্যক্তির বিরুদ্ধে নানা শিথিল উক্তি নানা কুৎসা রটনার দ্বার খুলে দিয়েছে এবং টিটোবাদী যুগে যে কুৎসা ও সন্দেহ ছড়ানো হত আজ সাধারণ কমরেডদের ভিতরই এই অসুস্থ মনোভাব আত্মপ্রকাশ করেছে। শত্রু চক্রান্তকে খুঁজে বার করা হবে, নীতিহীনতার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই সংগ্রাম করতে হবে, কিন্তু কোন কমরেড সম্বন্ধে যেকোন দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি বা প্রচারের বিরুদ্ধে সাহসের সাথে দাঁড়াতে হবে। পাইকারী হারে কুৎসা প্রচার চলতে থাকলে তারই আড়ালে প্রকৃত শত্রুরা গা ঢাকা দিয়ে থাকবে।

৪। মত বিনিময়ের জন্য পরস্পরের সাথে যোগাযোগ ও মেলামেশার প্রয়োজন ছিল এবং এখনও আছে। কিন্তু এটা অনেক ক্ষেত্রে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যার ফলে বেআইনি পার্টির সংগঠনের সমস্ত নিয়মকানুন ধ্বংস করে সমগ্র পার্টিকে শত্রুর সামনে উন্মুক্ত করে দেওয়ার বিপদ সৃষ্টি করেছে। কোন কথাই আজ আর সামান্য সময় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না বা পার্টির ভিতর আবদ্ধ থাকে না। শত্রুর চরেরা পার্টির গোপনীয়তাকে ধ্বংস করছে একথা ঠিক; কিন্তু কে প্রকৃত শত্রুর চর তা আমরা খুঁজে বার করব কি করে যদি আমরা আমাদের দুর্বলতা দূর করতে না পারি? তাই এই ঢিলেমী দূর করার জন্য সচেতনভাবে চেষ্টা করতে হবে এবং এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে যাতে প্রকৃত অসৎ লোকদের খুঁজে বার করা যায়।

৫। বিরোধী মতের প্রতি অসহিষ্ণুতা আমাদের আর একটি বড় দুর্বলতা এবং অনেক ক্ষেত্রে অনেকে দুইটি মত থাকার ফলে পরস্পরকে শত্রু হিসাবে গণ্য করতে আরম্ভ করেছেন। আমাদের বুঝতে হবে যে যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রকৃত মতবাদগত সংগ্রাম ও বাস্তব কর্মের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক পলিসি উদ্ভব করা যাচ্ছে, ততদিন রাজনৈতিক মতভেদ থাকতে বাধ্য, এমন কি তার পরেও হয়ত কিছু কিছু মতপার্থক্য থাকবে। কিন্তু একথা বুঝতে হবে যে মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও মতবিরোধ দূর করার পন্থা সম্বন্ধে ঐকমত্য হওয়া সম্ভব, যে পন্থা অনুসরণ করে আমরা শেষ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারব। এইটাই পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করার সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি। এর পাল্টা দৃষ্টিভঙ্গি হল রাজনৈতিক

মতবিরোধের প্রতি অসহিষ্ণুতা বা ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষের মনোভাব গ্রহণ করা। এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলে এই কথাই মেনে নিতে হয় যে পার্টিতে রাজনৈতিক মতবিরোধ হওয়ার অর্থই হল পার্টি টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ অন্য কথায় পার্টিতে রাজনৈতিক মতবিরোধেরই স্থান নাই। যারাই রাজনৈতিক মতবিরোধের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবেন বা গ্রহণ করতে সাহায্য করবেন, তাঁরা বুঝে হোক, না বুঝে হোক পার্টিকে ভাঙনের পথে এগিয়ে দিতেই সাহায্য করবেন।

অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম চালাবার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ব্যর্থতা ও সাধারণ সভ্যদের অনভিজ্ঞতাই এই সব দুর্বলতার কারণ। কিন্তু আজ যখন অভ্যন্তরীণ সংগ্রামকে আমরা এক নতুন পর্যায়ে তুলতে যাচ্ছি তখন এই সব দুর্বলতাকে দূর করেই এগোতে হবে।

কমরেডস্, আমাদের পার্টির সংকট যতই গভীর হোক না কেন, সমগ্র দুনিয়ার কমিউনিস্ট আন্দোলন এমন এক পর্যায়ে উঠেছে যাতে অবস্থা আমাদের অনুকূলে। পার্টির ভিতরও সুস্থ শক্তির অভাব নাই। যদি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কঠোর সংকল্প নিয়ে, আন্তর্জাতিক নেতাদের শিক্ষাকে প্রকৃতভাবে প্রয়োগ করে আমরা উদ্যোগী হতে পারি তাহলে আমরা পার্টি কংগ্রেসকে প্রকৃত পার্টি কংগ্রেসে পরিণত করতে পারব। মতবাদের সংঘর্ষকে আমরা এড়িয়ে যাব না, তাকে আমরা অভিনন্দন জানাব। জনগণের সঙ্গে জীবন্ত যোগাযোগ ও মতবাদের সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে জন্ম নেবে এমন এক সঠিক রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক নীতি, জন্ম নেবে এমন এক সুস্থ সবল নেতৃত্ব যার দ্বারা পরিচালিত হয়ে আমাদের পার্টি এগিয়ে চলবে একটি প্রকৃত বলশেবিক পার্টিতে পরিণত হওয়ার দিকে যার আদর্শ সৃষ্টি করেছেন মহান লেনিন ও মহান ষ্ট্যালিন ও তাদের সুযোগ্য শিষ্য কমরেড মাও সে-তুং।

কলিকাতা জেলা সংগঠনী কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

টিকা : 'গৌর' সোমনাথ লাহিড়ী এবং 'রবি' ভবানী সেনের ছদ্মনাম। (—সম্পাদক)

প্রাদেশিক পার্টি আলোচনা

[শুধু পার্টি সভ্যদের জন্য]

নব পর্য্যায়, ৫ম সংখ্যা] ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৫০ [দাম : দুই আনা

"বিপ্লবী মতবাদ কোন প্রাণহীন শাস্ত্রবাক্য নয়। সত্যি-কারের বিপ্লবী, সত্যিকারের গণ আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলে তবেই তাকে চূড়ান্তভাবে সূত্রবদ্ধ করা সম্ভব হয়।"

—লেনিন

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক
সংগঠনী কমিটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্রাদেশিক পার্টি আলোচনা

কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠির উপর পি.ও.সি'র সভায় প্রদত্ত মতামত

[পি.ও.সি'র আলোচনা সভায় পেশ করা হয়, ৩০শে অক্টোবর]

[সি.সি. চিঠির উপর পি.ও.সি. সভায় প্রদত্ত কমরেড মহেশ এবং কমরেড সুখেনের রিপোর্ট দুটি নীচে প্রকাশ করা হল। বড় রিপোর্ট অনুবাদ এবং যথাভাবে তাহা তাড়াতাড়ি ছাপাবার অসুবিধার দরুনই কমরেড রামনরেশের রিপোর্ট হিন্দীতে ছাপিয়ে এবং কমরেড উপেনের রিপোর্টটি ইংরাজীতেই সাইক্লো করে আপাততঃ প্রকাশ করার ব্যবস্থা হচ্ছে।—পঃ প্রাঃ পাঃ আঃ]

[১]

কেন্দ্রীয় কমিটির জুন চিঠি প্রকাশিত হবার পর ৫ মাসের মধ্যেও কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক প্রস্তাবটি আমাদের হাতে পৌঁছায় নাই। সুতরাং বর্তমানে সেই চিঠি ও তারপর থেকে বিভিন্ন সমস্যার ওপর কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন সার্কুলার ও সাংগঠনিক কার্যকলাপ থেকেই আমাদের রাজনৈতিক আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে হচ্ছে। রাজনৈতিক প্রস্তাব পাওয়ার পর আবার বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব হবে।

১লা জুনের চিঠির ভিতর বহু দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও ট্রটস্কীবাদ-টিটোবাদের আকারে বামপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে পার্টির প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এই চিঠিকে অনেকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তার পরবর্তী যুগে কেন্দ্রীয় কমিটির যে সকল কার্যকলাপ—রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে—লক্ষ্য করা গেছে তা থেকেই ঐ চিঠির গভীর রাজনৈতিক দুর্বলতা ধরা পড়তে শুরু করে।

চিঠিতে ট্রটস্কীবাদ ও টিটোবাদের বিরুদ্ধে বহু কড়া কড়া কথা লেখা হলেও তার রাজনীতি ও সাংগঠনিক কায়দাকে সমূলে উৎপাটিত করার কোন প্রচেষ্টাই আমরা দেখতে পাই নাই। চিঠির উদ্ধৃতি দিয়ে সমগ্রভাবে তার বিশ্লেষণ করতে গেলে হয়তো বলা হবে যে—রাজনৈতিক প্রস্তাবে ঐসব বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যাবে। কিন্তু মোটামুটি ভাবে ঐ চিঠি ও তৎপরবর্তী কর্মপদ্ধতি থেকেই আমাদের আলোচনা করতেই হবে। কতকগুলি মূল রাজনৈতিক বিষয় এই চিঠিতে পরিষ্কার না হওয়াতেই পরবর্তী কার্যকলাপে কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক বিচ্যুতির স্পষ্ট প্রকাশ দেখতে পাওয়া গেছে।

রাজনৈতিক ত্রুটি-বিচ্যুতি

রাজনীতিগতভাবে যে সব মূল বিষয় চিঠিতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকলে তার প্রয়োগের প্রচেষ্টা অবশ্যম্ভাবী ভাবে দেখা যেত সেগুলি কি কি তা দেখা যাক :—

(১) আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সোভিয়েত রুশ ও অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাব ও তারই পটভূমিতে চীনের শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়টির একেবারেই উল্লেখ নাই। বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

(২) ভারতের ঔপনিবেশিক বিপ্লবের বর্তমান স্তরের সঠিক উল্লেখ থাকলেও সেই

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সামন্ততন্ত্র বিরোধী, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের রণকৌশল পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা হয় নাই। কমিনফর্ম ব্যুরোর নির্দেশকে ভিত্তি করে তার ব্যাখ্যা বাস্তব না হয়ে, পি.বি'র নিজস্ব মনগড়া ছাঁচে তা করা হয়েছে অর্থাৎ মুখ্য ও গৌণ বিষয়ের ভিতর গোলমাল করে দেওয়া হয়েছে। এই সূত্রে চীনের শিক্ষাকে জোর দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে সত্য, কিন্তু সেই শিক্ষাকে ভারতের মাটিতে প্রয়োগ করার জন্য ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে কোন আলোচনাই চিঠিতে স্থান পায় নাই। অথচ ভারতের জাতীয় ক্ষেত্রে বিশিষ্ট চরিত্রগুলি পরিষ্কার করতে না পারলে বাস্তব রণকৌশল স্থির করতে গেলে তা অত্যন্ত মামুলী ও সাধারণ কায়দায় করা হতে বাধ্য এবং তা সকলের মাথার ওপর দিয়েই চলে যেতে বাধ্য।

ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিয়ে জাতীয় মুক্তির আন্দোলনের রণকৌশল স্থির করার কোন সার্থকতাই নাই।

বৈশিষ্ট্য হিসাবে কয়েকটি বিষয়ের প্রাথমিক উল্লেখ আছে সত্য; কিন্তু সেই সব বৈশিষ্ট্যের আসল রাজনৈতিক চরিত্র কি এবং তাকে ভিত্তি করে বিপ্লবের রণকৌশলের কোন্ কোন্ মোড় ঘুরে সঠিক পথে গিয়ে দাঁড়াবে তার আলোচনা চিঠিতে নাই।

চীনের পার্টি-প্রদর্শিত সশস্ত্র সংগ্রামের কায়দা অনুসরণ করতে হবে—একথা বলাই যথেষ্ট নয়। এই সংগ্রামের কায়দাটি আয়ত্ত করা এবং তাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করার মত শিক্ষা যদি আমরা না পাই তাহলে "চীনের পথ আমাদের পথ" এ শুধু কথার কথাই থেকে যায়।

এ বিষয়ে চীনের মূল শিক্ষা কয়েকটিকে অবলম্বন করে ভারতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা না করলে আজকের দিনে ভারতের পার্টির সঠিক রণনীতি ও রণকৌশল বুঝতে পারা একেবারেই অসম্ভব।

(ক) শ্রমিক শ্রেণির পার্টি কমিউনিস্ট পার্টিকে পুরোদস্তুর মার্ক্সীয় শিক্ষায় মজবুত করতে হবে।

এ উদ্দেশ্যে পার্টির ভিতর থেকে সবরকমের বিচ্যুতিকে সংগ্রাম করে নির্মূল করতে হবে। তা আমরা করতে পারছি কি না এবং তা করতে হলে কি করা প্রয়োজন তার পথনির্দেশ ব্যতিরেকে পার্টিকে ভারতীয় বিপ্লবের সুযোগ্য নেতৃত্বে পরিণত করা অসম্ভব। গত দু'বছর ধরে পার্টি নেতৃত্ব কঠোর ট্রটস্কীপন্থা ও টিটোপন্থায় পার্টিকে পরিচালনা করেছে। তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই—একদিকে আন্তর্জাতিক দলিলগুলি ও লাস্টিং পীসের প্রবন্ধ এবং অপরদিকে সাধারণ পার্টিসভ্যের সচেতন সংগ্রামই আমাদের প্রথম পথ প্রদর্শন করে। পুরাতন কেন্দ্রীয় কমিটি বা সর্বভারতীয় নেতৃত্ব এবিষয়ে সম্পূর্ণ অযোগ্যতা দেখিয়েছেন, তাঁরা ঐ বিচ্যুতিকে সাহায্যই করে এসেছেন। পার্টিকে সঠিক রাজনীতিতে নিয়ে যাবার ও সঠিক যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সাধারণ পার্টি সভ্যদের অবদানকে অগ্রাহ্য করে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছেন। এবং এই কারণেই তাঁরা অতীতের সংস্কারবাদী ও বর্তমানের ট্রটস্কীবাদ রূপে বামপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই-এ সভ্যসাধারণের সহযোগিতা নেবার জন্য পার্টি-কংগ্রেসের রাজনীতিক প্রয়োজনীয়তা পর্যন্ত তাঁদের মিটিং-এর সময়ে উপলব্ধি করতে পারেন নাই। (পার্টি কংগ্রেসের দাবিকে গ্রহণ করে তার ওপর যে পরবর্তী পি.বি. সার্কুলার প্রকাশিত হয়েছে তাতেই এর নিদর্শন পাওয়া যাবে)। তত্ত্বমূলক মৌলিক মার্ক্সবাদী হাতিয়ারকে অবলম্বন করে পার্টির বিচ্যুতিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে কেন্দ্রীয় কমিটি যদি প্রস্তুত হতেন

তাহলে সে সংগ্রামে তাঁরা পার্টিসভ্যদের সকলকে নিয়েই অগ্রসর হতেন। একাজ তাঁরা নিজেরাই করতে চেয়েছেন এবং নিজেরাই যোগ্য মনে করেন। অথচ সে রাজনৈতিক যোগ্যতা তাঁরা ট্রটস্কীবাদের যুগে দেখাতে পারেন নাই, পরবর্তী যুগেও নয়। এর কারণ তাঁরা ট্রটস্কীবাদী বিচ্যুতিকে একটা মামুলী বামপন্থী বিচ্যুতি হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামের মৌলিক ঘোষণা করে কার্যত কোন কিছুই করতে চান নাই। তাঁরা এই সর্বগ্রাসী ট্রটস্কীবাদী-টিটোবাদী বামপন্থী বিচ্যুতির সাথে আপস করেই আসছেন। তার প্রমাণ যেন চিঠির বহু অংশে (রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দুই অংশেই) পাওয়া যায়, তেমনি আবার পরবর্তী কার্যকলাপের ভিতরেও তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তাঁরা আমাদের দেশে ট্রটস্কীবাদ ও টিটোবাদের মূল কারণ পর্যন্ত খুঁজে বার করতে নারাজ; কোনরকম সত্যকার ব্যাপক অনুসন্ধান করার জন্য পার্টির ভিতরে কোন সংগঠন করতে তাঁরা নারাজ। একথা তাঁরা পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা ভাবেন পুরাতন কেন্দ্রীয় কমিটির মে সভাতেই তাঁরা ট্রটস্কীবাদের জড় পর্যন্ত নির্মূল করে দিতে পেরেছেন। আশ্চর্য কথা! যে কমিটির অযোগ্যতার জন্য ভারতের পার্টিতে এতবড় একটা বিচ্যুতি ঘটে গেল সেই কমিটির শেষ বৈঠকে এই বিচ্যুতির জড় যেন শেষ হয়ে গেল! তারজন্য যারা পার্টির সভ্য সাধারণের মার্ক্সবাদী শিক্ষা ও বিপ্লবী কার্যকলাপের অভিজ্ঞতাকে একত্রীভূত করে সর্বভারতীয় সামগ্রিক রাজনৈতিক আলোচনাকে (কংগ্রেস) আমাদের অগ্রগতির মূল বিষয় হিসাবে গ্রহণ করতে দ্বিধা প্রকাশ করার হেতু খুঁজে বের করতে হবে। পার্টির অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক আলোচনা ছাড়া খাঁটি মার্ক্সবাদী পার্টি তৈরি করার স্বপ্ন দেখা অত্যন্ত মারাত্মক বিচ্যুতি। ইহা একটি মার্ক্সবাদী বিরোধী নীতি। কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষত্ব এই পার্টি গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ নীতি অনুসরণ করেই বেড়ে ওঠে। বিশেষ করে সঠিক নীতি ও কৌশল নির্ধারণের সময় যখন কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্ব অক্ষম তখন এই নীতিকে কার্যত বাদ দিয়ে, উপেক্ষা করে সঠিক পার্টি নেতৃত্ব গড়ে উঠতে পারে না। মুখে এই নীতি স্বীকার করে তারপর কাজের বেলায় পার্টি সভ্যদের দাবি অগ্রাহ্য করা এবং সভ্য সাধারণের ইচ্ছা ও আগ্রহকে পদদলিত করা—সম্পূর্ণ কমিউনিস্ট নীতি বিরুদ্ধ ব্যাপার। চিঠিতে সভ্য সাধারণের নীচে থেকে পুনর্গঠনের দাবি (সংগঠনকে সভ্য সাধারণের আস্থাভাজন করবার উদ্দেশ্যে তলা থেকে পুনর্গঠন করার প্রোগ্রাম) প্রভৃতিকে কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছে। জোর করে আস্থা ও বিশ্বাস আদায় করার মত হাস্যকর জিনিস আর কিছু কি হতে পারে? কেন্দ্রীয় চিঠিতে তারই প্রচেষ্টা স্পষ্টতই দেখা যায়।

পার্টি সংগঠন শক্তিশালী করতে হলে শ্রমিক শ্রেণির ভিতরে পার্টির কাজ যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা সবাই জানে। চিঠিতে তার বিশেষ উল্লেখ নাই। শ্রমিক শ্রেণির ভূমিকাকে সর্বোপরি স্থান না দিলে কমিউনিস্ট পার্টিকে তৈরি করা যায় না। শ্রমিক শ্রেণির ঐক্য শুধু একটা বুলি নয়। এর তাৎপর্য্য যাঁরা বুঝবেন না তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টি গড়তে চান না।

চিঠির ভিতর কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার ও শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে পার্টির বিস্তার করার কোন প্রোগ্রাম আছে কি?

দ্বিতীয়ত, পার্টিকে শক্তিশালী করা, পার্টি নেতৃত্বকে বিপ্লব পরিচালনার উপযোগী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে শ্রমিক শ্রেণি ও কৃষক সমাজের মৈত্রীকে ফুটিয়ে তোলা হয় নাই এই চিঠিতে। এটির তাৎপর্য্য পুরোপুরি না বুঝলে কমিউনিস্ট পার্টিকে বিপ্লবের নেতৃত্বের আসনে

সুপ্রতিষ্ঠিত করার কোন প্রচেষ্টাই ফলবতী হতে পারে না। সে বিষয়ে চীনের শিক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে কি? শ্রমিক কৃষকের মিতালীর গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক ভূমিকা সম্পর্কে কোন বিশেষ উল্লেখ নাই। এই বিপ্লবী মিতালী গড়ে তোলার কাজের কায়দা সম্পর্কে কোন ইঙ্গিতই নাই। শুধু শ্রমিকেরা সশরীরে গ্রামাঞ্চলে যাবে, না তাদের প্রোগ্রাম কৃষকদের মধ্যে দেবে—এই নীরস ও অবাস্তব যুক্তির আলোচনা করা হয়েছে।—এইভাবে চীনের শিক্ষার প্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয়টিকে "চিঠি"তে একেবারেই উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

(খ) সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী ভূমি বিপ্লবের জন্য ভারতের সমস্ত শ্রেণির ও স্তরের জনসাধারণের সম্মিলিত গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন।

এই ডেমক্রেটিক ফ্রন্ট গঠনের জন্য ন্যূনতম কার্য পদ্ধতির (ডেমক্রেটিক ফ্রন্টের প্ল্যাটফর্ম অব অ্যাকশন) ওপর সবিশেষ জোর দিয়ে চিঠিতে ব্যাপক আহ্বান নাই। জাতীয় মুক্তির জন্য সারা ভারতের নরনারীকে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানানোর মত বিপ্লবী প্রোগ্রাম চিঠির মূল বস্তু হওয়া উচিত ছিল। পূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রামে জনতার সংগঠনের নেতা হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টিকে দাঁড় করানোর প্রচেষ্টা চিঠিতে বিশেষ নাই বা থাকলেও তা অত্যন্ত মন্থর। জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি ভাল করে বিচার না করলে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের ও সেই ফ্রন্টের সংগ্রামের আহ্বান দেওয়ার কাজে সফলকাম হওয়া অসম্ভব।

জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের ভিতর বাস্তব ক্ষেত্রে কোন্ রাজনীতি ও কোন্ রাজনীতিক সংগঠনে প্রভাব কতখানি তার পর্যালোচনা ছাড়া এই ফ্রন্ট গঠন করা স্বপ্ন বিলাস মাত্র। মোটামুটি এইসব বিষয়ের আলোচনা এই ক্ষেত্রে থাকা প্রয়োজন ছিল ঃ—

(১) জাতীয় সংস্কারবাদী রাজনীতি—গান্ধীবাদ প্রভৃতি বুর্জোয়া ভাবধারার প্রভাব কতটুকু। তার সংগঠন কংগ্রেস জনতার মধ্যে এখনো প্রভাব বিস্তার করে কিনা এবং তা করলে কতটুকু করে ইত্যাদি বিষয়ে কোন বিশ্লেষণ নাই। তাহলে জনতাকে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে আনার কায়দা আমরা বুঝতাম। এক কথায় বলা হয়েছে—সমস্ত জনতা কংগ্রেসের প্রতি সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হয়ে গেছে। তা যদি সত্য হতো তাহলে আন্তর্জাতিক দলিলগুলিতে গান্ধীবাদ ও জাতীয় সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে প্রবল রাজনৈতিক ও তত্ত্বমূলক সংগ্রাম চালাবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উল্লেখ থাকতো না। এই প্রভাবকে কাটাবার জন্য একদিকে জনতার স্থানীয়, আংশিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগ্রাম পরিচালনার প্রয়োজন হয়, অন্যদিকে পার্টির পক্ষ থেকে জাতীয় সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে তত্ত্বমূলক রাজনৈতিক সংগ্রাম চালাতে হয়। যেহেতু ধরে নেওয়া হয়েছে—সমস্ত জনতা জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রভাবমুক্ত, সেইজন্যই গত ৫ মাসে কেন্দ্রীয় কমিটি একখানিও দলিল প্রকাশ করে এই মতবাদের সংগ্রামের পরিচালনা করার প্রয়োজনও মনে করেন নাই। মোহমুক্তিকে কেউ অস্বীকার করে না, তবে মোহমুক্ত ও বিপ্লবমুখী এক কথা নয়।

(২) শ্রমিকশ্রেণির ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে সংস্কারবাদী নেতৃত্বের কতটুকু প্রভাব—ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে কমিউনিস্ট প্রভাবাধীন বা কমিউনিস্টদের পরিচালনায় চলে—এসম্বন্ধে কোন বাস্তব বিচার চিঠিতে নাই। 'শ্রমিকশ্রেণির ঐক্য চাই'—বুলিটি আওড়ানো হয়েছে সত্য, কিন্তু তা কার্যে পরিণত করার পদ্ধতি সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য নাই। ভারতবর্ষ একটি সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পোন্নত উপনিবেশ—একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

(৩) কৃষক সমাজের ভিতর বিভিন্ন ভাবধারার প্রভাব সম্বন্ধে কোন বিচার বিশ্লেষণ নাই। তাদের জমির দাবি ও আংশিক দাবি দাওয়ার সংগ্রামগুলিকে কমিউনিস্ট সংগ্রাম-কায়দা হিসাবে, সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের সর্বাত্মক ঐক্য স্থাপনের প্রয়াস মোটেই সাবলীলভাবে বলা হয় নাই। এর ভিতরেও নানা স্বার্থ-সংঘাতকে সামনে এনে সম্মিলিত ফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তার মূল্যকে ছোট করে দেখানো হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তির সংগ্রামের সর্বশ্রেণির কৃষকের সর্বাত্মক আকর্ষণকে ছোট করে দেখানো হয়েছে। সর্বশ্রেণির কৃষকের স্বার্থের মিলকে বড় করে না দেখিয়ে ভিতরকার বিভিন্ন স্তরের সংঘাতকে বড় করে দেখানোর অর্থ দাঁড়ায় সম্মিলিত ফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা। কৃষকের বিভিন্ন স্তরের বিচার বিশ্লেষণ নিশ্চয়ই প্রয়োজন; কিন্তু তা কখনোই তাদের ঐক্যের তাগিদ ও প্রয়োজনীয়তাকে আড়াল করবে না। "সামন্তবাদের লেজ" কথাটি ঢুকিয়ে কৃষক ঐক্যের সমুদ্রকে গোষ্পদে পরিণত করা হয়েছে।

(৪) জাতি সমস্যার বিষয়ে বিশেষ কোন উল্লেখ নাই। অথচ এই সমস্যার সমাধানের পরিকল্পনা পেশ ও প্রচার না করলে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের ভিতর সমস্ত প্রদেশের সর্বস্তরের মানুষকে টেনে আনা সম্ভব নয়।

(৫) তাছাড়া, ভারতের শিল্প, কৃষি প্রভৃতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ না করলে সঠিক প্রোগ্রাম নেওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। শিল্পের শ্রমিক ও কৃষির উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক তথ্য বিশ্লেষণ করে আমাদের সেই মত শ্রেণি-বিন্যাসের কায়দা প্রতি পদে পদে শিখতে হবে। এরই ভিত্তিতে ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও তার রাজনীতির প্রকাশ সম্পর্কে সবিশেষ বিচার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এছাড়া, জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের অগ্রগতির ধাপগুলি বোঝা অসম্ভব এবং একটি ধাপ থেকে আর একটি ধাপে পৌঁছানোর কায়দাও আয়ত্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

(৬) বড় বড় পুঁজিপতিদের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে যেসব প্রগতিশীল ও বামপন্থী ব্যক্তি ও পার্টিগুলি কাজ করছে তাদের রাজনীতি, প্রকৃতি এবং সংগ্রামের কায়দা সম্বন্ধে বিশ্লেষণ না থাকলে ডেমক্রেটিক ফ্রন্টে সমস্ত দলকে একত্রিত করার কাজ সুচারুরূপে সমাধা করা যায় না। এইসব ব্যক্তি, পার্টি ও দল সম্পর্কে সংগ্রামের ময়দানে একত্রিত করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও তাদের বিষয় পুরোপুরি আলোচনা না থাকলে তা বাস্তবে রূপ নেয় না। তাদের সাথে আমাদের মিল কতখানি সেইটিই বড় কথা; নতুবা গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করা অবাস্তব।

এই সমস্ত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে ভাগ করে তুলে না ধরলে সর্বাত্মক গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন ও সেই ফ্রন্টের সংগ্রাম পরিচালনায় কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব করবে কেমন করে? এগুলিকে বাদ দিয়ে শুধু জনতা ও পার্টি এই সহজ নিয়মে বিবেচনা করলে এই ফ্রন্ট গঠনের কষ্টসাধ্য কাজকে অস্বীকার কারই হয়। এইভাবে বিচার না করার অর্থ চীনের শিক্ষা গ্রহণকে অত্যন্ত .... মামুলী বলেই ধরে নেওয়া।

এবিষয়ে "চিঠি"র ব্যর্থতা অবশ্য স্বীকার্য।

উপরের সমস্ত পয়েন্টগুলি ভাল করে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় চিঠি অত্যন্ত সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। এ সংকীর্ণতা বামপন্থার প্রকাশ।

জনতার বিরাট অংশের বিভিন্ন দিক, বিভিন্ন সমস্যা, বিভিন্ন রাজনৈতিক বিন্যাস—এসব কিছুই চিঠির মধ্যে রেখাপাত করে নাই। তারা মোহমুক্ত, সংগ্রাম চালালেই সব হুড় হুড় করে ... তার ভিতর এসে সব জুটে যাবে—এই ভাবধারাই চিঠিতে ছড়িয়ে আছে। পুরাতন পি.বি'র সাথে তাহলে পার্থক্যটা কোথায়?

উদ্ধৃতি দিয়ে লেখাটা বাড়াতে চাই না। কারণ, উদ্ধৃতি সবরকমই দুই এক লাইন করে এখান সেখান থেকে দেওয়া যায় এবং সেসব উদ্ধৃতি দুই তরফকেই প্রমাণ করার জন্য তর্কের জালও বোনা যায়। সমগ্রভাবে চিঠিটি পড়ে তবেই তার ভিতর থেকে প্রধান ভাবধারাকে ভিত্তি করে আলোচনা করার সার্থকতা আছে। বিশেষত পরবর্তী বাস্তব কার্যকলাপ যখন আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে তখন তা প্রমাণ করাও সহজ। উদ্ধৃতির প্যাঁচে পড়তে গেলে তর্কের শেষ হবে না। রাজনীতিক মূল বিষয়গুলি ও তার পরবর্তী অধ্যায়ে সাংগঠনিক সিদ্ধান্তগুলিকে ধরে নিয়েই আমাদের বক্তব্য পেশ করছি—সে সবকথা আগেই বলেছি।

(গ) সশস্ত্র সংগ্রাম ও গণমুক্তি ফৌজ গঠন

এ না হলে ঔপনিবেশিক ভারতের মুক্তি নাই। একথা যারা অস্বীকার করেন তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যই থাকতে পারেন না। অথচ কেন্দ্রীয় কমিটি ও পি.বি'র মনোভাবটা যেন এই যে—এই বিষয়েই পার্টির ভিতরে সংঘর্ষ চলছে। এটা সর্বৈব মিথ্যা কথা। যাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে ভারতের জাতীয় বিপ্লব ঘটাতে চান তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টিতে নাই—একথা পি.বি'র বোঝা উচিত। সংস্কারবাদী বিচ্যুতি থাকতে পারে অনেকের ভিতর; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, পার্টিসভ্যদের ভিতর সশস্ত্র সংগ্রাম ও তার কায়দা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে তার মূল খুঁজত হবে—তাঁরা সংস্কারবাদী কি না। এই "সংস্কারবাদ"-এর ভূত পুরাতন পি.বি'র ঘাড়ে চেপেছিল—সে ভূত এখনো পার্টি নেতৃত্বের মাথা থেকে নামে নাই। সশস্ত্র সংগ্রামের কায়দা, প্রোগ্রাম, স্থান-কাল সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলেই তাকে ধরে নিতে হবে ভারতের বর্তমান অবস্থায় এই সংগ্রামের সঠিক রণকৌশল কি হবে সেই নিয়েই সভ্যরা মাথা ঘামাচ্ছেন এবং সেইজন্যই সমস্যা তুলছেন। "ঘুরে ফিরে আবার সংস্কারবাদে ফিরে যেতে চাইছে"।—এই মনোভাব নিয়ে সামনে এলে পার্টির রাজনীতিক লাইন তৈরির সংগ্রামকেই তুচ্ছ করা হবে। (পার্টি কংগ্রেসের সার্কুলারে পি.বি. ঠিক সেই মনোভাবেরই পরিষ্কার প্রমাণ দিয়েছেন)।

চীনের শিক্ষায় জানা যায় যে—সশস্ত্র সংগ্রাম, গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ও পার্টি—এই তিনটিকে আলাদা করে দেখা যায় না। তিনটি একসাথে ওতপ্রোতভাবে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। একটিকে বাদ দিয়ে আর একটির কথা বলার অর্থ অমার্ক্সীয় পদ্ধতিতে প্রশ্ন হাজির করা।

কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠিতে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে বাদ দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম, গেরিলা সংগ্রাম ইত্যাদিকে পৃথকভাবে দেখার চেষ্টা হয়েছে। অথবা শুধু গেরিলা সংগ্রাম চালিয়েই গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট তৈরি করা যায় এইভাবের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। "গেরিলা সংগ্রাম চালিয়ে যাও যেখানে সম্ভব"—একথা বলার কোন অর্থই নাই। গেরিলা-সংগ্রাম এভাবে হয় না। চীনের শিক্ষায় কি দেখা যায়? সশস্ত্র গেরিলা সংগ্রাম সর্বদাই কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালনা ও পরিকল্পনা করে তবেই কার্যত চালু করা যায়। সর্বভারতীয় সামরিক নেতৃত্বই তা পরিকল্পনা ও পরিচালনা করবে। সর্বভারতীয় সামরিক নেতৃত্ব রাজনৈতিক নেতৃত্বও বটে। দেশের যেকোন অংশে গেরিলা সংগ্রাম

চালাতে হলে তা সেই নেতৃত্বকেই পরিচালনা করতে হবে। জনসাধারণ নিজের উদ্যোগে শত্রুর সশস্ত্র আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য যে সব কায়দা গ্রহণ করে তা অন্য জিনিস। সেই জিনিসটাকে সংগঠিত কমিউনিস্ট গেরিলা-সংগ্রাম বলে না। গেরিলা সংগ্রামের সুনির্দিষ্ট সামরিক পদ্ধতি আছে, তার প্রয়োগ করার জন্য সর্বভারতীয় সামরিক নেতৃত্বের পরিচালনা প্রয়োজন হয়। যেমন খাদ্যের সার্কুলারে বলে দেওয়া হল—যেখানে সম্ভব গেরিলা কায়দায় সংগ্রাম চালাবে। এর কোন অর্থ নাই। সেটি গেরিলা যুদ্ধ নয়। চীনের নেতারা এধরনের কোন উক্তি কোথায়ও করেন নাই। গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতি ও উপাদান সম্বন্ধে চীনের নেতাদের লেখাগুলি পড়লেই ভাল করে বোঝা যাবে, যেকোন অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধের পরিচালনা পার্টি গ্রহণ করবে তা সর্বভারতীয় সামরিক নেতৃত্বকেই গ্রহণ করতে হবে। তাঁদেরই ঠিক করতে হবে কোন্ পরিবেশে, কোন্ সংগঠিত জনতা ও কোন্ সমস্যার ওপর কোন্ অঞ্চলে এই গেরিলা যুদ্ধ শুরু ও পরিচালনা করা যায়। স্থানীয় নেতৃত্ব বা জেলা নেতৃত্ব ইত্যাদির ওপর নির্দেশ জারি করে দিলেই গেরিলা যুদ্ধ কোন অঞ্চলে করা যায় না। পার্টির সামরিক নেতৃত্বকেই তার সবকিছু স্থির করে দিতে হয় ও পরিচালনা করতে হয়। হ্যাঁ, তবে প্রথমে শুরু করার সময় স্থানীয়, জেলা, প্রদেশ প্রভৃতির উদ্যোগেই তা শুরু হয়ে থাকে, পরে তা সর্বভারতীয় নেতৃত্বে সংগঠিত রূপ গ্রহণ করে। তেলেঙ্গানা ও অন্যান্য অঞ্চলে এতদিন ধরে গেরিলা-সংগ্রাম চলার পর আমরা আশা করতে পারি যে সে ধরনের সামরিক নেতৃত্ব সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে; কিন্তু তার নিদর্শন এখনো আমরা পাই নাই। এখনো নির্দেশ দেবার সময় সেই পুরাতন কায়দায় ঢালাও হুকুম আসে—স্থানীয়ভাবে গেরিলা যুদ্ধ চালাও, এর চেয়ে অবাস্তব ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না।

ডেমক্রেটিক ফ্রন্ট গঠন, জনতার অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়কে উপেক্ষা করে চললে ঐ ধরনের ট্রটস্কীপন্থী বামপন্থী কায়দায় সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলা ছাড়া উপায় থাকে না। রাজনৈতিক দিকটা বাদ দিয়ে জনতার অংশগ্রহণ ও জনতার সক্রিয় সমর্থন ইত্যাদি বিষয়কে গৌণ বলে ধরলে সশস্ত্র সংগ্রাম আমরা কোনদিনই চালাতে পারব না।

বর্তমান সংকটজনক অবস্থায় পার্টি সংগঠনের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে আরো প্রমাণিত হয় যে অবিলম্বে তেলেঙ্গানা ছাড়া আর কোন অঞ্চলেই গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করার মত বাস্তব অবস্থা নাই, সেরকম উপযুক্ত সামরিক নেতৃত্ব নাই, পরিকল্পনা ও পরিচালনা করার মত বাস্তব অবস্থাও নাই। তেলেঙ্গানার মুক্তিফৌজ ও সংগ্রামকে পার্টির সর্বভারতীয় সামরিক নেতৃত্বে প্রসারিত করতে হবে সত্য; কিন্তু তা নির্ভর করবে কোথায়, কতখানি কি পরিমাণে, জনগণের সম্মিলিত ফ্রন্ট তৈরি হল এবং তার উপর ভরসা করে উপযুক্ত সামরিক নেতৃত্ব যোগ্যতার সঙ্গে তা পরিচালিত করতে পারবে কি না। বলে দিলাম "যেখানে পার গেরিলা-যুদ্ধ চালাও" "মোটামুটি সংগঠন থাকলেই চলবে"—এটা কমিউনিস্ট পার্টির গেরিলা লড়াই নয়। এ জনগণের নিজস্ব সংগ্রাম মাত্র, তা জনগণের প্রতিরোধ সংঘর্ষ, মোটামুটি স্বতঃস্ফূর্ত আকারেই হবে মাত্র। উপরের নেতৃত্ব সংগঠিত না করলে, পরিচালিত না করলে তা গেরিলা-লড়াই হয় না।

আজকের পার্টির অবস্থাতে ভারতের বহুস্থানে এই সংগঠিত সশস্ত্র চালান যায় না। তার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে—তার রাজনৈতিক কর্তব্যগুলি সম্পন্ন করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে এই উদ্দেশ্যে আমাদের কাজ করে চলতে হবে।

কেন্দ্রীয় চিঠিতে এই সংগ্রামকে অত্যন্ত সহজভাবে ধরে নিয়ে মামুলি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার ফলে দাঁড়িয়েছে এগুলি সেই আগের মত ট্রটস্কীবাদী যুগের সংগ্রাম-কায়দারই অনুকরণ মাত্র। এটা মারাত্মক বামপন্থী বিচ্যুতি।

চিঠির সাংগঠনিক বিচ্যুতি

উপরিউক্ত রাজনীতি গ্রহণ করার ফলে চিঠির ভিতর যতগুলি সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত আছে তা সবই ঐ একই বিচ্যুতির ফলস্বরূপ দাঁড়িয়েছে। রাজনীতিতে যখন ট্রটস্কীবাদের ভাবধারার সঙ্গে আপস করা হয়েছে তখন সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রকাশিত হবে সেই একই জিনিস। ফলে প্রত্যেকটি সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত থেকে পার্টির সংকট আরো বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে—কোন স্থানে কোন বিষয়ে সংকট কমে নাই, ক্রমশই তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। সভ্য সাধারণের সজাগ দৃষ্টিতে এখনো পার্টির কাঠামো টুকরো টুকরো হতে পারে নাই—টিকে আছে কোন রকমে মাত্র। "চিঠি"র লাইনে কাজ করে পার্টি শেষ হতে চলেছে। কি প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি গড়ার ক্ষেত্রে, কি কোন রাজনৈতিক সমস্যায়, কি অন্য কোন সংগঠনের বিষয়ে একই ভাবধারায় কাজ চলবে।

সংকট থেকে পার্টিকে মুক্ত করার পরিবর্তে চলেছে উল্টো মুখে—সংকট গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় ট্রটস্কীবাদী-টিটোবাদীদের বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত সভ্যদের নিয়ে কাজ চালাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল। তাছাড়া পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য কোন সদস্যকেই কমিটি থেকে বাদ দেওয়ার কোন অধিকার বা যুক্তি ছিল না। রাজনৈতিক সংকটে জর্জরিত কেন্দ্রীয় কমিটি, মারাত্মক বিচ্যুতির বাহক এই কমিটির কোন যোগ্যতাই ছিল না সঙ্গে সঙ্গে প্লেনাম ডাকার আগে এক পাও অগ্রসর হবার। সমগ্র পার্টির কাছে এই কমিটির সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা উচিত ছিল। মে-জুন মাসেই প্লেনাম ডেকে তার পরবর্তী ধাপ ঠিক করা দরকার ছিল।

মূলে গলদ বলেই সাংগঠনিক সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে আর আলোচনা করা নিরর্থক।

এক কথায়, কেন্দ্রীয় কমিটির এই চিঠি ট্রটস্কীবাদ ও টিটোবাদের সাথে আপস-রফার একটি জ্বলন্ত নিদর্শন মাত্র।

২২ অক্টোবর ১৯৫০ —সুখেন

[২]

নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গত ১লা জুন সমস্ত পার্টি মেম্বর ও দরদীদের প্রতি যে চিঠি লিখেছিলেন, তার সম্বন্ধে পরিষ্কার করে এখন আমার মতামত প্রকাশ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

অবস্থা গতিকে আমি এই চিঠি পেয়েছিলাম, চিঠিখানা বেরোবার প্রায় দু মাস পরে। পুরোনো নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনীতিক প্রস্তাব বেরোতেও বেশি বিলম্ব হবে না, চিঠিখানা থেকে এই ধারণা পেয়ে তার অপেক্ষা করছিলাম, যাতে সমগ্র প্রস্তাবটা পড়ে তার ওপর মতামত প্রকাশ করতে পারি। কিন্তু ঐ চিঠির সাড়ে চার মাস পরেও আজ পর্যন্ত সে

প্রস্তাবের কোন দেখা নাই। কাজেই ঐ প্রস্তাব সম্পর্কে সি.সি. চিঠি থেকে যেটুকু জানা গেছে তার মধ্যে কোন কোন বিষয়ের ওপর এখন আমার মত প্রকাশ করব। প্রধানত পার্টি লাইন সম্পর্কে যে বিষয়গুলি নিয়ে এখন বিতর্ক চলছে সেই সম্বন্ধেই আমার বক্তব্য বলব। কাজেই এ লেখাটা সি.সি. চিঠি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হবে না। চিঠিতে যেসব সাংগঠনিক প্রশ্ন আছে সে বিষয়ে আমার অনেক সমালোচনা ও আপত্তি থাকলেও এর মধ্যে বিশেষ কিছু আলোচনা করব না।

নতুন সি.সি'র চিঠিখানাকে অনেকটা অরাজনৈতিক দলিল বলা চলে। পুরোন সি.সি'র প্রধান রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলোকে যেভাবে এর মধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাকে একটা মার্ক্সবাদী-লেলিনবাদী পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপযুক্ত রাজনীতিক পদ্ধতি বলা কঠিন। পরিস্থিতির বাস্তব বিশ্লেষণ, তাকে ব্যাখ্যা করার যুক্তি এবং তার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এ মন্তব্য কমবেশি খাটে।

পুরোনো সি.সি'র রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলিকে রণদিভে নেতৃত্বের সঙ্গে আপসের নীতি না বলে উপায় নাই। কেননা এইসব সিদ্ধান্তের মধ্যে ট্রটস্কীবাদের পরিচয় বেশ পাওয়া যায়। (সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও তা প্রতিফলিত হয়েছে।) এই মন্তব্য সম্পর্কে আমার যুক্তি পরে দিচ্ছি।

প্রধানত এই দুই কারণে, বর্তমান কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পুরোনো সি.সি'র সিদ্ধান্তগুলিকে মনেপ্রাণে মেনে নেওয়ার ফলে, তাঁরা আগেকার ট্রটস্কীবাদী নীতি ও পথকে বর্জন করতে পারছেন না, বরং পার্টি র‍্যাংকের দাবি অগ্রাহ্য করে তাঁদের উপর নিজেদের রাজনীতিক ও সাংগঠনিক মত চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন, যদিও সে চেষ্টা সফল হচ্ছে না। সফল যে হচ্ছে না তার একটা প্রমাণ এই যে ১লা জুনের চিঠিতে পার্টি কংগ্রেস ডাকবার জন্য পার্টি র‍্যাংকের যে দাবিকে মেনে নিতে ভরসা পান না বলে তাঁরা বাতিল করেছিলেন, সাড়ে তিন মাস পরে অবস্থা অনেক বেশি জটিল ও বিপজ্জনক হওয়া সত্ত্বেও সেই দাবিকেই তাঁরা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এই ধরনের অসঙ্গত ও বিলম্বিত সিদ্ধান্ত পার্টির ভেতরকার সংকটকে প্রায় চরম পর্যায়ে এনে ফেলেছে। জুন মাসের ঐ চিঠিতে যদি পার্টি কংগ্রেস ডাকবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হত, তাহলে সংকট এতদূর তো গড়াতোই না, বরং তখন সংকটের অবস্থা যতটা খারাপ ছিল আজ ততটা থাকত না, তার থেকে অবস্থার অনেক উন্নতিই হত। (পার্টি কংগ্রেস ডাকার বিষয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করব।)

নতুন সি.সি'র ও নতুন পি.বি'র সামনে যে সমস্ত জরুরি কাজ ছিল তা করা হচ্ছে না— রাজনীতিক প্রস্তাব এই সাড়ে চার মাসের মধ্যেও বেরোয়নি; বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে পার্টি আলোচনার সুযোগ দেবার জন্য যে ফোরাম বার করবার কথা ছিল তা এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আজ পর্যন্ত (যতদূর আমি জানি), বার করা হয়নি। পার্টি শিক্ষার কোন ব্যবস্থা হয়েছে বলে শুনি নি; গান্ধীবাদের ও অন্যান্য ধরনের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে কোনরকম নিয়মিত সংগ্রাম শুরু করা হয়নি (চিঠিতে অবশ্য এর প্রতিশ্রুতিও নাই, যদিও সোশ্যালিস্ট পার্টি সম্পর্কে তার একটু আভাষ আছে মাত্র)। এসবের ফলে পার্টিকে ভাঙনের পথে আরো এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। নতুন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ভুল রাজনীতি পার্টির সংগঠনের ক্ষেত্রেও ভুল পথেই প্রকাশ পাচ্ছে।

আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতির ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে চিঠিতে প্রথমেই একটা ভুল করা হয়েছে যখন তার মধ্যে রুশিয়ার নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উল্লেখ করা হয়নি। অথচ সারা দুনিয়ার ইতিহাসে বর্তমান বিপ্লবী যুগের সূত্রপাতই হল এই বিজয়ী নভেম্বর বিপ্লব এবং এই যুগান্তকারী ঘটনাই আমাদের বর্তমান বিপ্লবী নীতির মূল উৎস। তেমনি ভারত বিভাগের ঘটনাকেও তার উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা হয়নি।

ভারতের বর্তমান বিপ্লব সম্পর্কে যে মত এই চিঠিতে প্রকাশ করা হয়েছে—জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য ঔপনিবেশী বিপ্লবের স্তর, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে মূল বিপ্লবী সংগ্রাম এবং এই সংগ্রামের লক্ষ্য সাম্রাজ্যবাদী-সামন্তবাদী বড় বুর্জোয়া জোটকে উচ্ছেদ করে জনতার গণতন্ত্র কায়েম করা ও কৃষি বিপ্লবকে সফল করা—সে বিষয়ে আমার মতভেদ নাই।

এই বিপ্লবী লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ হিসাবে "চীনের পথ" নির্দেশ করা হয়েছে। এই মতও আমি ঠিক মনে করি। কমরেড মাও গত বছর অক্টোবর মাসে নিজেই সরাসরিভাবে আমাদের জন্য এই পথ নির্দেশ করে দিয়েছিলেন—১লা অক্টোবর (১৯৪৯) চীনে গণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমাদের পার্টি তাঁর কাছে যে অভিনন্দন বাণী পাঠিয়েছিল তার জবাব দিতে গিয়ে। কিন্তু চীনের পথকে ভারতে প্রয়োগ করতে হলে চীন ও ভারতের বাস্তব অবস্থার মধ্যে পার্থক্য কোথায় ও কী পরিমাণে আছে তা বিচার করা প্রয়োজন। সি.সি'র চিঠিতে তা করা হয়নি। তাছাড়া, চীনের পথ মেনে নেওয়া মানে যে রুশ বলশেভিক নীতিকে তার মূল নীতি হিসাবে স্বীকার করা, তা এই চিঠিতে পরিষ্কার হয় না।

এখন চীনের পথ বলতে ঠিক কি বুঝায়? সি.সি'র চিঠিতে চীনের পথের ব্যাখ্যা করা হয়েছে দুটো সারবস্তু দিয়ে। প্রথম সম্মিলিত জাতীয় ফ্রন্ট, দ্বিতীয় সশস্ত্র সংগ্রাম—গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ, মুক্ত এলাকা ও মুক্তিফৌজ তৈরি করা, তার সাহায্যে শেষ পর্যন্ত শহর সমেত সারা দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা।

সম্মিলিত জাতীয় ফ্রন্ট কাদের নিয়ে তৈরি হবে? শ্রমিক শ্রেণি ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এই ফ্রন্ট সংগঠিত হবে। সেজন্য প্রথমেই দরকার শ্রমিকশ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে সত্যিকার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতি ও কৌশলে প্রয়োগে দক্ষ সুসংগঠিত পার্টি হিসাবে গড়ে তোলা। এই সম্মিলিত ফ্রন্টের ভিত্তি হবে শ্রমিক ও কৃষকের মিতালি এবং তার মধ্যে থাকবে, শ্রমিক ও কৃষক ছাড়া, শহরের ও গ্রামের মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী, ছোট ও মাঝারি বুর্জোয়া শ্রেণি, তারমধ্যে থাকবে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ বিরোধী শ্রেণি, পার্টি, দল, সংগঠন ও ব্যক্তি। এই ফ্রন্টকে সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রামের উদ্দেশ্যে এবং সেই সংগ্রামের সাহায্যে এমন ব্যাপক করে তুলতে হবে যাতে দেশের সমগ্র জনতাকে তার মধ্যে এনে ফেলা যায়।

কমিনফর্ম ব্যুরো, পিকিং ইস্তাহার, লিউ শাও চি ও বালাবুশেভিচের মতে আমাদের দেশে বিপ্লবের বর্তমান পর্যায়ে এই ধরনের সম্মিলিত জাতীয় ফ্রন্ট ও তার নেতৃত্ব গড়ে তোলাই হচ্ছে সর্বপ্রধান কর্তব্য। আমাদের দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসও সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাকে উল্টে দিয়েছিলেন আগেকার পি.বি.। পুরোনো সি.সি. এবং নতুন সি.সি.ও. এ বিষয়ে পুরোনো পি.বি'র সঙ্গে আপস করার পথ বেছে নিয়েছেন।

সেই আপস নীতির পরিচয় পাওয়া যায় সি.সি'র চিঠির মধ্যে যেখানে বলা হয়েছে

জাতীয় ফ্রন্টের বুনিয়াদ হবে শ্রমিক শ্রেণি ও "মেহনতকারী কৃষকদের" মিতালি, শ্রমিক শ্রেণি ও সমস্ত কৃষকদের মিতালি নয়। এই "মেহনতকারী" শব্দটার উদ্দেশ্য যে পুরোনো বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদীকে বজায় রাখা তাতে কোন সন্দেহ নাই।

মাঝারি বুর্জোয়াদের সম্পর্কেও সি.সি. চিঠিতে যা বলা হয়েছে তার পরিণাম হবে তাদের জাতীয় ফ্রন্টের দিকে টেনে আনার চেয়ে শত্রু শিবিরের দিকে ঠেলে দেওয়াই বেশি। এও সংকীর্ণতাদের আর এক নজির।

সি.সি'র চিঠিতে পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের, ছাত্র ও নওজোয়ানদের শিক্ষক ও অন্যান্য বৃত্তিজীবীদের জাতীয় ফ্রন্টে আনার সম্বন্ধে এবং বর্তমান স্তরের বিপ্লবে তাদের গুরুত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি। অথচ উপনিবেশী দেশের অনগ্রসর ও অশিক্ষিত জনতার মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলন চালাবার কাজে মধ্য শ্রেণির ছাত্র, নওজোয়ান, শিক্ষক ইত্যাদির বিপ্লবী গুরুত্বকে মোটেই উপেক্ষা করা চলে না।

চিঠিতে ক্ষেতমজুরদের সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তারাই হচ্ছে কৃষি বিপ্লবের অগ্রণী। আমাদের দেশে সাধারণভাবে বলতে গেলে গ্রামাঞ্চলে কৃষি বিপ্লবের অগ্রণী শুধু ক্ষেতমজুর নয়, সমস্ত গরীব কৃষক—ক্ষেতমজুর সমেত; ঔপনিবেশী দেশে বিশেষ বাংলার মত জমিদারি প্রধান দেশে সামন্তবাদ বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবী সংগ্রামে জমিহীন ক্ষেতমজুর ও প্রায় জমিহীন গরীব কৃষকের মধ্যে শ্রেণি স্বার্থগত পার্থক্য খুবই কম, নামমাত্র। এখানেও সি.সি'র নীতির মধ্যে সংকীর্ণতাবাদ দেখা যাচ্ছে।

জাতীয় ফ্রন্ট গঠনের কাজে সমস্ত গণতন্ত্রী দল ও মতের সঙ্গে মিলিত হওয়ার উপর চিঠিতে জোর দেওয়া হয়েছে খুবই কম, বরং ক্ষেত্র বিশেষে তার প্রয়োজনকে অস্বীকার করা হয়েছে। সংকীর্ণতাবাদের এ আর এক নমুনা।

এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করলে সি.সি. চিঠিতে সম্মিলিত ফ্রন্ট সম্বন্ধে যে নীতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার ওপর বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বামপন্থী সুবিধাবাদের ও ট্রটস্কীবাদের মূলোচ্ছেদ করবার উদ্দেশ্যে যে নীতি নির্দ্ধারণ করা হয়েছে তার মধ্যেও যদি বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদকে এইভাবে জিইয়ে রাখা হয় এবং তাকেই "পার্টির বর্তমান রাজনীতিক লাইন" বলে চালাবার চেষ্টা হয়, তাহলে ট্রটস্কীবাদের সঙ্গে মিতালিই করা হয়, সরষের মধ্যেই ভূত পুরে রাখা হয়। এই মিতালির মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে প্রতিবিপ্লবী শক্তির বিরুদ্ধে সমস্ত বিপ্লবী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ না করার মনোভাব এবং শ্রমিক শ্রেণি সঠিক নীতিতে পরিচালিত হলে যে সেই সমস্ত বিপ্লবী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে, শ্রমিক শ্রেণির সেই শক্তিতে বিশ্বাসের অভাব। একে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টি বলা যায় না। সেদিক থেকে এর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে লেনিনবাদ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি।

সি.সি. চিঠি অনুসারে চীনের পথের দ্বিতীয় সারবস্তু হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ। সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষে সি.সি'র চিঠির যুক্তি : কংগ্রেস সরকারের "শ্বেত সন্ত্রাস" ও "ঘরোয়া যুদ্ধ" জনতাকে সশস্ত্র প্রতিরোধের মুখে এনে ফেলেছে, কংগ্রেসী রামরাজ্য সম্পর্কে জনতার "সমস্ত পুরোনো মোহ" "সম্পূর্ণ চুরমার" হয়ে গেছে, সাধারণভাবে "সমগ্র ভারতে" আজ গেরিলা প্রতিরোধ চালাবার মত বাস্তব অবস্থা দেখা দিয়েছে, এবং একমাত্র সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ করেই পার্টিকে জোরদার ও বিস্তৃত করা যাবে।

এই যুক্তিগুলো বাস্তব তথ্যের দিক থেকে এবং বিপ্লবী নীতির দিক থেকে নিতান্ত অসার। আমরা রাজনীতিক ও সাংগঠনিক দিক থেকে যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, "শ্বেত সন্ত্রাস" ও "ঘরোয়া যুদ্ধের" অজুহাতে আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামই করতে হবে, এ হচ্ছে হঠকারিতার কথা। এই "শ্বেত সন্ত্রাস" ও "ঘরোয়া যুদ্ধ" বর্তমান কংগ্রেস গভর্ণমেন্টের নীতি হতে পারে; সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে হিসাবে এই গভর্ণমেন্ট কোন রকম গণতন্ত্রী আন্দোলনকে মোটেই আমল দিতে চায় না। কিন্তু এর আর একটা দিকও আছে। ট্রটস্কীবাদী হঠকারিতার ফলে সরকার তার এই গণতন্ত্র বিরোধী নীতিকে কাজে লাগাবার সুযোগ পেয়েছে বেশি, কেননা তাতে জনতার বাধা পেয়েছে কম; এবং এই নীতিকে কাজে লাগিয়ে জনতার আন্দোলনকে বহু ক্ষেত্রেই ভেঙ্গে দিতে পেরেছে, সেকাজে ট্রটস্কীবাদী নীতি তাকে সাহায্য করেছে। কিন্তু লেনিন-ষ্ট্যালিনের এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ও মাওয়ের নির্ভুল কৌশল ধরে ব্যাপক জনতাকে জাতীয় ফ্রন্টের মধ্যে এনে আমাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন চালাতে পারলে সরকারের পক্ষে তার সন্ত্রাসবাদী নীতি প্রয়োগ করা অত্যন্ত কঠিন হত এবং জনতার আন্দোলনকে ভেঙ্গে দেওয়া যেত না। কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট জনতা থেকে অনেক বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত, জনতার ঐক্য বেড়ে যেত।

কংগ্রেসের রামরাজ্য সম্বন্ধে জনতার মোহ এখনো সম্পূর্ণ কাটেনি। তার চেয়েও কম কেটেছে দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণি সম্বন্ধে এবং গান্ধীবাদ সম্বন্ধে। গান্ধীবাদের প্রভাব কৃষকদের মধ্যে এখনো ব্যাপক, অনেক শ্রমিকের মধ্যেও তা আছে। তবে এ মোহ দ্রুত কেটে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ কেটে গিয়ে থাকলে কংগ্রেস জনতার সমর্থন বেশি পেত না, কিন্তু সমগ্র দেশের কথা বিবেচনা করলে দেখা যায় এখনো অন্য সমস্ত পার্টির চেয়ে কংগ্রেস ঢের বেশি ভোট পায়, ঢের বেশি সমাবেশ করতে পারে।

তাছাড়া, কংগ্রেস সরকারের সম্বন্ধে মোহ কেটে গেলেই যে জনতা বিপ্লবী নেতৃত্ব মেনে নেবে তা নাও হতে পারে; বর্তমানে হিন্দু মহাসভার মতো প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে জনতার উপর বেড়েই যাচ্ছে। আর মোহমুক্তি হলেই যে তার জায়গায় রাজনীতিক ঘৃণা দেখা দেবে, এমন কখনও বলা চলে না; সেজন্য রাজনীতিক প্রচার ও শিক্ষা চাই।

কাজেই এ ধরনের অবাস্তব তথ্য ও যুক্তি দিয়ে পার্টি র‍্যাংকের মনে কেবল উল্টো মোহই সৃষ্টি করা হয়, তাতে ট্রটস্কীবাদই প্রশ্রয় পায়, প্রতিক্রিয়ারই সুযোগ বাড়ে। এ কৌশল লেনিনবাদ বিরোধী।

সমগ্রভাবে ভারত আজ গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র গেরিলা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত—তথ্য ও যুক্তি হিসাবে এ একটা মারাত্মক কথা। সমগ্রভাবে ভারতে ফিউডাল অর্থ ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থার প্রভাব খুব বেশি থাকলেও এবং সাধারণভাবে সারা ভারতের জনতা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরোধী হলেও, দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন পরিমাণে সে প্রভাব ও বিরোধিতা দেখা যায়। ভূমি ব্যবস্থার মধ্যেও কোথাও পুরো ফিউডাল জায়গীরদারী প্রথা আছে, কোথাও আধা ফিউডাল জমিদারি প্রথার প্রভাব বেশি, আবার কোথাও বা তার চেয়ে কম ফিউডাল রায়তওয়ারী প্রথা চলছে। এই তফাতগুলো এত বাস্তব যে তাকে সংগ্রামী কৌশল স্থির করবার সময় উড়িয়ে দেওয়া মার্ক্সবাদী নীতির খেলাপ।

তেমন, শিল্প কারখানার প্রভাব সর্বত্র সমান না থাকায় সে প্রভাবের অসমানতাও একটা

বিচার্য বিষয়। আবার রাজনীতিক মুক্তি আন্দোলনের ঐতিহ্য এবং শ্রমিক শ্রেণির ও কৃষক সমাজের চেতনার স্তর ও সাংগঠনিক অবস্থা অসমান থাকায় তাকেও উপেক্ষা করা যায় না। সকল দিক বিবেচনা করলে একথা বলা চলে না যে শুধু সাংগঠনিক প্রস্তুতি হলেই সারা ভারত আজই সশস্ত্র গেরিলা সংগ্রামের ক্ষেত্র হতে পারে। তা পারে না, এবং পারে না বলে কেবল সংগ্রামের সাংগঠনিক প্রস্তুতি নয়, মতবাদগত ও রাজনীতিক প্রস্তুতিরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। সে প্রস্তুতিকে অস্বীকার করলে ট্রটস্কীবাদকেই সমর্থন করা হয়। তবে যদি কোন এলাকা থাকে যেখানে সকল দিক বিবেচনা করলে আজই সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করা অবাস্তব হবে না, অথবা তেলেঙ্গানার মতো যেখানে তা এখনি চলছে, তার কথা স্বতন্ত্র। সেটা এখন ব্যতিক্রমের ব্যাপার, সারা ভারতের সাধারণ নিয়ম তা নয়। কেবল সাংগঠনিক প্রস্তুতির দ্বারাই আজই সারা ভারতকে তেলেঙ্গানায় পরিণত করা যায় না।

"একমাত্র" সশস্ত্র গেরিলা সংগ্রামের পথেই পার্টিকে বড় ও শক্তিশালী করা যায়—এটাও লেনিনবাদ বিরোধী কথা। কারণ পার্টিকে বড় ও শক্তিশালী করতে সকল ধরনের গণ আন্দোলনই সাহায্য করে, তা সশস্ত্রই হোক আর অশস্ত্রই হোক, তবু যদি সেই আন্দোলনকে জনতার বাস্তব প্রয়োজনের ভিত্তিতে এবং সঠিক মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী নীতি ও কৌশল অনুসারে পরিচালনা করা হয়।

সি.সি'র এই যুক্তিগুলির মূলে আছে প্রধানত একটি জিনিস—বিপ্লবী বাস্তবতার বদলে এতে জোর দেওয়া হয়েছে মনগড়া "বিপ্লবী" পরিস্থিতিতে সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষে মোহ সৃষ্টি করার ওপর। এ হল স্পষ্ট ট্রটস্কীবাদী ঝোঁক। এ ঝোঁক মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের বিরোধী, স্ট্যালিন ও মাওয়ের পথের বিরোধী, চীনের পথের বিরোধী। একে এগিয়ে যেতে সাহায্য করলে আমরা সোজা গিয়ে পৌঁছব রণদিভে নেতৃত্বের ট্রটস্কীবাদী ফাঁদে।

সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষে সি.সি. চিঠিতে অন্য যুক্তিও কিছু আছে—যেমন, জনতার "স্বতঃস্ফূর্ত সহানুভূতি", "সাধারণ সমর্থন"। এই যুক্তির মধ্যে বিপ্লবের জন্য সচেতন ও সংগঠিত জনতার গুরুত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে। এই সমর্থন ও সহানুভূতির রাজনীতিক মূল্য বিচার না করায় লেনিনবাদী বিপ্লবী কৌশলকে উপেক্ষা করা হয়েছে। কারণটা একই মনে হয়।

আমাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে চূড়ান্ত বিজয়ের পথ যে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ, তা স্বীকার করতেই হবে; এখন অন্তত নীতি হিসাবে কোন কমিউনিস্ট তা অস্বীকার করে বলে জানি না। তাই বলে যে কোন স্থানে, যে কোন সময়ে এবং যে কোন আন্দোলনে সশস্ত্র সংগ্রাম সম্ভব এবং কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, একথা বলা যায় না। এ হল অতি বামপন্থী কথা, বিপ্লব না চাওয়ার কথা, সম্মিলিত ফ্রন্ট অস্বীকার করার কথা।

বর্তমান অবস্থায় আমাদের দেশে সশস্ত্র সংগ্রামই হচ্ছে সকল আন্দোলনের প্রধান রূপ, একথাও ঠিক নয়। অবশ্য বর্তমান স্তরের বিপ্লবকে চূড়ান্ত সাফল্য দিতে হলে সশস্ত্র সংগ্রামকে সচেতনভাবে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রধান রূপে পরিণত করতে হবে, কিন্তু এখনো তা প্রধান রূপে পরিণত হয়নি। সশস্ত্র সংগ্রাম সাধারণভাবে সারা দেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রধান রূপ হবে তখনি যখন ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণির এবং সংগঠিত ও শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে, শ্রমিক কৃষক মিতালির ভিত্তিতে ব্যাপক জনতার সম্মিলিত জাতীয় ফ্রন্ট গড়ে উঠবে; যখন

সেই ফ্রন্টের চেষ্টায় সারা দেশের গণ আন্দোলনগুলো প্রচণ্ড শক্তিতে এগিয়ে যেতে থাকবে; যখন প্রতিক্রিয়াশীল গভর্ণমেন্ট জনতা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ও কোণঠাসা হয়ে পড়বে এবং তার শাসন ব্যবস্থা জনতার মনে ঘৃণার উদ্রেক করবে। সে অবস্থায় গণমুক্তি ফৌজের সাহায্যে বিপ্লবের বড় বড় ঘাঁটি ও সত্যিকার মুক্ত এলাকাও তৈরি হতে থাকবে। সে অবস্থা চূড়ান্ত বিজয়ের দিনকে আসন্ন করে তুলবে।

সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কে পিকিং-এর "জনতার দৈনিকের" সম্পাদক ১৬ই জুন তাঁর এক পাঠকের চিঠির উত্তরে যেসব মত প্রকাশ করেছিলেন তা অত্যন্ত মূল্যবান ("জনতার চীন", ১/৭/৫০, নং ১)। তিনি লিউ শাও চির বিখ্যাত পিকিং বক্তৃতা থেকে এই অংশ উদ্ধৃত করেছেন ঃ "কোন উপনিবেশ বা আধা উপনিবেশে জনতার অস্ত্র না থাকে তো কিছুই নাই। সর্বহারা সংগঠনগুলির অস্তিত্ব ও বিকাশ এবং জাতীয় সম্মিলিত ফ্রন্টের অস্তিত্ব ও বিকাশ এ রকম সশস্ত্র সংগ্রামের অস্তিত্ব ও বিকাশের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। অনেক উপনিবেশী ও আধা উপনিবেশী জনতার জন্য তাদের স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামে এই হল একমাত্র পথ।"

তারপর সম্পাদক বলেছেন ঃ "অনেক কলোনি বা আধা কলোনির মুক্তির পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম অনিবার্য। কিন্তু এই ধরনের বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রাম চালাবার জন্য স্থান ও কাল নির্ধারণ করতে হবে প্রকৃত অবস্থা অনুসারে। কোন কলোনি বা আধা কলোনিতে কোন সময়ে প্রযোজনীয় অবস্থা ও প্রস্তুতি ছাড়া তা কিছুতেই পরিচালনা করা চলবে না। যে সকল দেশে বাস্তব অবস্থার এই সশস্ত্র সংগ্রাম চলতে পারে, সেখানে সশস্ত্র সংগ্রাম বিজয়ী হবে কিনা তা স্থির হবে এই শর্তের দ্বারা—সে সব দেশের জনতাকে নেতৃত্ব দেবার জন্য শ্রমিক শ্রেণির পার্টি আছে কিনা এবং তার নেতৃত্ব সঠিক কিনা! ...."

এই দুটি উদ্ধৃতি থেকে চীনের গণবিপ্লবের অভিজ্ঞতা এইভাবে প্রকাশ পাচ্ছে ঃ আমাদের দেশে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করতে হলে শ্রমিক শ্রেণির সংগঠন ও ঐক্য চাই, জনতাকে সংগঠিত করবার ও সঠিক নেতৃত্ব দেবার যোগ্য পার্টি চাই, এবং শ্রমিক শ্রেণির ও পার্টির নেতৃত্বে জাতীয় সম্মিলিত ফ্রন্ট চাই। উপযুক্ত পার্টির ও সম্মিলিত ফ্রন্টের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সংগঠন না থাকলে বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রাম সফল হতে পারে না।

কমিনফর্ম ব্যুরোর পত্রিকায় ২৭শে জানুয়ারির সম্পাদকীয় থেকেও এই ধারণাই পাওয়া যায়। তাতেও বলা হয়েছে ঃ চীনের জনতার বিজয়ী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অভিজ্ঞতা এই শিক্ষা দেয় যে শ্রেণি, পার্টি, দল ও সংগঠনগুলি সাম্রাজ্যদের ও তাদের ভাড়াটেদের বিরুদ্ধে লড়তে এবং শ্রমিক শ্রেণির ও তার অগ্রণী কমিউনিস্ট পার্টির .... নেতৃত্বে বিস্তৃত, জাতিব্যাপী সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠন করতে ইচ্ছুক, তাদের সকলের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে...।

কমিনফর্ম ব্যুরোর পত্রিকার মতে বর্তমান অবস্থায় ভারতীয় কমিউনিস্টদের কাজ হচ্ছে এই সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠন করা এবং সে কাজের জন্য উপযুক্ত পার্টি তৈরি করা। সারা ভারতে এটাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ, সশস্ত্র সংগ্রামের কথা তারপরে। যদিও আগে পরে বললে ভুল বোঝার আশংকা থাকে এবং সেজন্য বলতে হয় দুই কাজই এক সঙ্গে চলবে, তবুও প্রশ্ন ওঠে—সশস্ত্র সংগ্রাম চালাবার যোগ্য পার্টি ও সম্মিলিত ফ্রন্ট আমাদের দেশে আজ আছে কি? সেজন্য যে গণচেতনা ও গনসংগঠন একান্ত প্রয়োজন তা আছে কি? না থাকলে সারাদেশে

এখন সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার শ্লোগান অবাস্তব হয়ে পড়ে না কি? এই অবাস্তব শ্লোগান আমাদের ট্রটস্কীবাদের পাঁকের মধ্যে পড়ে থাকতেই সাহায্য করবে না কি?

মোট কথা, নেতৃত্ব দেবার যোগ্য পার্টি এবং সম্মিলিত ফ্রন্ট না থাকলে সশস্ত্র সংগ্রাম হতে পারে না, কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রাম না হলেও পার্টি ও সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠনের কাজ সংগ্রামের অন্যান্য রূপের ভিতর দিয়েও চলতে পারে।

সাধারণভাবে সারা ভারতে (ও পাকিস্তানে) এখনি সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করা সম্পর্কে এই আমার মত ও ধারণা। চীনের পথ বলতেও বর্তমান অবস্থায় আমি এই কথাই বুঝি।

সি.সি. কিন্তু চীনের পথ থেকে শিক্ষালাভ করে যে দুটি আশু কাজ সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন তার অর্থ মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সি.সি'র মতে এই কাজ দুটি হচ্ছে:

"প্রথমত, সংকীর্ণতাবাদ ও সংস্কারবাদের সমস্ত আবর্জনা পরিষ্কার করা এবং সুস্পষ্ট রণনীতি ও রণকৌশল বের করা।"

"দ্বিতীয়ত, অবিচলিতভাবে পার্টিকে গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে দাঁড় করান এবং শ্রমিক কেন্দ্রে ও শহরগুলিতে নতুন লাইন ও নতুন কৌশলের ভিত্তিতে আন্দোলনগুলিকে পুনর্গঠন করা।"

এই দুটো কাজের মধ্যে প্রথমটাকে ধরে নেওয়া যেতে পারে পার্টি গঠনের কাজ বলে; অবশ্য এখানে শ্রমিক শ্রেণির ঐক্যের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু যে সম্মিলিত ফ্রন্ট না হলে ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-বিরোধী গণ আন্দোলন আজ সম্ভব নয়, বিপ্লবী গণ আন্দোলনের হাতিয়ারই পাওয়া যাবে না, সি.সি'র কাছে সেই সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠন একটা আশু কাজ নয়। সি.সি. বোধহয় আশংকা করেছেন যে সশস্ত্র সংগ্রাম পার্টি ছাড়া আর কেউ করবে না এবং সম্মিলিত ফ্রন্টকে দিয়ে সে কাজ হবে না।

তাহলে তার মানে দাঁড়ায় এই যে সশস্ত্র সংগ্রামে জনতাকে আনা চলবে না, কেননা সম্মিলিত ফ্রন্ট বলতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগঠিত ও সংগ্রামী জনতাকেই বোঝায়। তাহলে কি জনতাকে বাদ দিয়ে পার্টি একাই করবে সশস্ত্র সংগ্রাম? তাহলে রণদিভে নেতৃত্বকে সরাবার প্রয়োজনটা কি ছিল? অথবা সরান হয়েছে শুধু নামকেওয়াস্তে?

এ হল ট্রটস্কীবাদের সাথে সমঝোতা নয়, তার কাছে মারাত্মক আত্মসমর্পণ।

মনে হয় সি.সি'র কাছে প্রকৃতপক্ষে চীনের পথের একমাত্র অর্থ হচ্ছে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ, তার জন্য স্থানকাল বিবেচনার কোন প্রয়োজন নাই, তার মধ্যে সম্মিলিত ফ্রন্টেরও কোন স্থান নাই। তাই সম্মিলিত ফ্রন্টের কথা বলতে গেলে পাছে জনতার অনিচ্ছার দরুণ সশস্ত্র সংগ্রাম ভেঙ্গে যায়, সেইভাবে সি.সি. তাঁদের নিজেদেরই ব্যাখ্যা করে। চীনের পথের দুটি সারবস্তুর মধ্যে কাজের বেলায় প্রথমটিকে বাদ দিয়ে দ্বিতীয়টিকে বেছে নিয়েছেন।

সি.সি. চিঠিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্ব সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে সারা শ্রমিক শ্রেণির পক্ষে সশরীরে সংগ্রামে যোগদানের ধারণা ভুল। "সারা" শ্রমিক শ্রেণির উল্লেখ করলেও একথার দ্বারা ধারণা দেওয়া হচ্ছে যেন কোন শ্রমিকেরই সশরীরে যোগদানের কোন গুরুত্ব নাই। এতে জাতীয় মুক্তি বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণির ভূমিকাকে অযথা ছোট করে দেখান হয়—যেন আমাদের উপনিবেশী দেশের শ্রমিক সাধারণত কৃষক ও "মধ্যবিত্ত" ঘরের ছেলে হলেও সাধারণ অ-শ্রমিক কৃষক বা মধ্যবিত্তের সঙ্গে তার কোন পার্থক্য নাই; যেন

শ্রমিকের শ্রেণিগত মতবাদ এবং বিপ্লবী নীতিটাই সব, ব্যক্তি হিসাবে শ্রমিকের অভিজ্ঞতায় কোন শ্রেণিগত তাৎপর্য্য নাই। সাংগঠনিকভাবে শ্রমিকের নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হলে তাকে যথেষ্ট মার্ক্সবাদী শিক্ষা দিয়ে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার গুরুত্ব ও প্রয়োজনকে অস্বীকার না করে বলা যেতে পারে যে কোন শ্রমিক শ্রেণির পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষে এরকম শ্রমিক-বিরোধী ধারণা পোষণ করা উপেক্ষার বিষয় নয়।

এই ধারণা থাকার ফলেই বোধহয় সি.সি'র চিঠিতে শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম ও শহরের আন্দোলনে তার ভূমিকা সম্পর্কেও বিশেষ কিছু ব্যাখ্যা করা হয়নি—যেন আমাদের দেশের মুক্তি সংগ্রামে শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী প্রভাবের তেমন কোন গুরুত্ব নাই।

তেমনি কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সি.সি. চিঠিতে কিছু না বলায় মনে হয় যেন হাজার হাজার বছরের পুরোনো সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে যে বিপ্লব তার ক্ষেত্রেও সংস্কৃতির কোন গুরুত্বই নাই!—সংস্কৃতি তো "রাজনীতি" নয়। এই ধারণার উৎপত্তি হয়েছে অরাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। কমরেড মাওয়েব "নতুন গণতন্ত্র" ইত্যাদি এই দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিরোধী। চীনের পথকে সি.সি. চিঠিতে যেভাবে স্বীকার করা হয়েছে তাতে তাকে এক্ষেত্রে অস্বীকারই করা হয়েছে।

এইভাবে আর একটা ক্ষেত্রে গুরুতর অরাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে যে পার্টির নতুন লাইন স্থির করার কাজে পার্টি র‍্যাংককেও নিয়ে আসতে হবে, সেখানে আছে, পার্টির ভিতরে ব্যাপক আলোচনা চালাতে হবে "আন্তর্জাতিক দলিলগুলির এবং পুরোনো ও নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির দলিলগুলির ভিত্তিতে" (জোর দেওয়া আমার—মঃ)—অর্থাৎ মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী প্রামাণ্য তত্ত্বের ভিত্তিতে নয় এবং আন্তর্জাতিক ও পার্টি নেতৃত্বের দলিলগুলির আলোতে নয়। এই ভুল একটি মাত্র শব্দ নিয়ে হলেও তার গুরুত্ব কম নয়। এর ভিতর দিয়ে একটা গোটা দৃষ্টিভঙ্গি বেরিয়ে আসছে।

পুরোনো বা নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি পাকিস্তানকে ভারতের বাইরের একটা দেশ বলে মনে করেন না, নিজেদের দেশের একটা অংশ বলেই বিশ্বাস করেন। এই বিশ্বাস সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নীতির একটা অঙ্গ। তা সত্ত্বেও এটা বিস্ময়ের বিষয় যে সি.সি'র এই চিঠিতে পাকিস্তানের কোন প্রশ্নের একটা উল্লেখ পর্যন্ত করা হয়নি, আলোচনা বা নির্দেশ তো দূর কী বাত—যেন পাকিস্তান সম্বন্ধে পার্টির কোন দায়িত্ব বা কর্তব্য নাই! বাস্তুহারা সমস্যা এই চিঠিতে একটা বিচার্য বিষয়ই নয়। দুই বাংলা যে একই জাতি সে গুরুতর প্রশ্নও এইভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। এর থেকেও অরাজনীতিক মনোভাবের পরিচয় ফুটে বেরোয়।

রাজনীতিক সমালোচনার বিষয় হিসাবে আরো অনেক প্রশ্ন রয়েছে এই চিঠির মধ্যে। সে সবের আর আলোচনা করব না এখানে। কেবল একটি কথা বলতে চাই। পুরোনো কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড রণদিভে সম্বন্ধে সি.সি. চিঠিতে যে সমস্ত সাংঘাতিক ট্রটস্কীবাদী-টিটোবাদী অভিযোগ আনা হয়েছে তা দেখে মনে হয় তাঁর ট্রটস্কীবাদ-টিটোবাদ ছিল অত্যন্ত সচেতন ও সক্রিয়। ১৯৫০ সালে, মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী নীতি অনুসারে, এই ধরনের সচেতন ও সক্রিয় ট্রটস্কীবাদী-টিটোবাদীর স্থান কোন কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে হতে পারে কিনা, সে বিষয়ে আমার মনে প্রশ্ন জাগছে। এটা কোন তদন্তের বিষয় নয়। যে অভিযোগকে কমরেড রণদিভে সমেত কেন্দ্রীয় কমিটি নিজে তাঁদের সবার মধ্যে সাব্যস্ত করেছেন, সেই অভিযোগের

দায় থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তিকে মার্ক্সবাদী পার্টির মধ্যে আজকের দিনে স্থান দেওয়া কি পার্টির মূল নীতির বিরোধী নয়? কমরেড ষ্ট্যালিনের এ কথা কি আমরা অস্বীকার করতে পারি যে, ট্রটস্কীবাদ "প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া শ্রেণির অগ্রণী অংশ"? নতুন পি.বি'র নিকট তার উত্তর পেতে ইচ্ছা করি।

মোটের ওপর, সি.সি'র চিঠি পার্টিকে তার সংকট থেকে উদ্ধার করতে সাহায্য না করে সংকটকে আরো গভীর ও ব্যাপক করতে এবং পার্টির মধ্যে একতার পরিবর্তে ভাঙ্গনকে বাড়িয়ে দিতেই সাহায্য করেছে ও এখনো করছে। সেই কারণে আমি মনে করি গুরুত্বপূর্ণ পার্টি দলিল হিসাবে এই চিঠির নীতি গ্রহণযোগ্য নয়।

—মহেশ

১৬ অক্টোবর ১৯৫০

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

কেন্দ্রীয় কমিটির ডিসেম্বরের অধিবেশন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি

এই মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির যে অধিবেশন হল তার সিদ্ধান্ত এবং আলোচনাসমূহ পি-ও-সি কে জানান হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের প্রধান লাভ কি হয়েছে সে সম্পর্কে পি-ও-সি'র নিজের ধাবণা পার্টি র‍্যাঙ্কের কাছে সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন মনে করছে।

একথা স্মরণ করতে হবে যে জুন মাসের কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠির উপর প্রস্তাবে পার্টি নেতৃত্বের সামনে উপস্থিত নির্দিষ্ট কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রের জরুরি প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে পি-ও-সি সুস্পষ্ট ভাষায় জোর দিয়েছিল। এ রকম একটি ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্র গঠন করার পক্ষে পি-ও-সি কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রস্তাবও দেয়।

বৈঠকের কর্মপদ্ধতির কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও একথা আজ সকলেই জানেন যে দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস দ্বারা নির্বাচিত এবং যে ট্রটস্কি-টিটোবাদী অপরাধসমূহ সম্প্রতি আমাদের পার্টিকে কলংকিত করেছে তার থেকে মুক্ত কয়েকজন কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যসহ কেন্দ্রীয় কমিটির ডিসেম্বরের অধিবেশন হয়। এই কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যদের, যাদের কেন্দ্রীয় কমিটির আগের পুনর্গঠনের সময় অন্যায়ভাবে বাদ দেওয়া হয়েছিল তাদের, একটি সম্মিলিত কেন্দ্র সৃষ্টি করার ব্যাপারে নির্দিষ্ট এবং প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সে সুযোগ যতই সীমাবদ্ধ হউক, এই সম্মিলিত কেন্দ্রই শুধু পার্টির ভাঙ্গন রোধ করতে পারে এবং আমাদের সকলকে বর্তমান সংকট কাটানর জন্য চেষ্টা করার সময় এবং সুযোগ দিতে পারে। কেন্দ্রীয় কমিটির ডিসেম্বরের বৈঠকের প্রধান লাভ হচ্ছে ঠিক এইটুকু যে এই বৈঠক সমষ্টিগত নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর একটা ভিত্তি তৈরি করেছে, সে ভিত্তি যতই দুর্বল হক, এবং কমরেডরা যে ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভর করেছিলেন পার্টিকে তা দিয়েছে। সুতরাং আমাদের আজিকার অন্তঃপার্টি সংগ্রামে একটা আশ্বাসজনক ব্যবস্থা হিসাবে পি-ও-সি এই সম্মিলিত কেন্দ্র গঠনকে তার সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও অভিনন্দন জানাচ্ছে। পার্টি র‍্যাঙ্কের এখন কাজ হবে এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার তাৎপর্য বোঝা এবং সমস্ত সম্ভবপর উপায়ে সম্মিলিত কেন্দ্রকে শক্তিশালী করা।

নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যদের নিয়ে শুধু কেন্দ্রীয় কমিটিকেই বাড়ান হয় নাই পি-বিও পুনর্গঠিত, হয়েছে। এ কথা সকলেই জানেন যে পুনর্গঠিত পি-বি'তে এমন কোন কোন উল্লেখযোগ্য পার্টি নেতা আছেন যারা জুনমাসের পুনর্গঠনের বিরুদ্ধে এবং জুন সি-সি'ব

চিঠির লাইনের মূলে ট্রটস্কিবাদ-টিটোবাদের সাথে যে রাজনীতিক এবং সাংগঠনিক আপস ছিল তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রশংসনীয় উদ্যোগ দেখিয়েছিলেন। এই কমরেডদের পি-বি'তে আসার ফলে পার্টি র‍্যাঙ্ক নিশ্চয়ই অনুপ্রাণিত হবেন। এই সম্মিলিত কেন্দ্রের মধ্যে পার্টির ভিতরের প্রধান ভাবধারাগুলির প্রতিনিধি রয়েছে বলে এবং তার উপর সারা পার্টি র‍্যাঙ্কের ব্যাপক আস্থা থাকা উচিৎ বলে তার নেতৃত্বে আদর্শগত ও রাজনীতিক সংগ্রামের কাজকে এগিয়ে নিতে এই কেন্দ্র পার্টি র‍্যাঙ্ককে সাহায্য করবে। পার্টি কমরেডরা সকলেই এতে অত্যন্ত আনন্দিত হবেন যে কেবল আদর্শগত রাজনীতিগত সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়াই নয়, গণ-আন্দোলনকে পুনর্জীবিত করা এবং নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এবং পার্টি কংগ্রেস করার জন্যও পার্টি নেতৃত্ব দেওয়া যায় এমন একটি পার্টি কেন্দ্র কায়েম হয়েছে। পার্টি র‍্যাঙ্কের সামনে জনসাধারণের জীবন্ত আন্দোলনের মধ্যে আদর্শগত প্রচেষ্টার এবং বাস্তব কার্যাবলীর একটা নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এটাও ডিসেম্বরের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের অপর এক গুরুত্বপূর্ণ লাভ।

তাই পি-ও-সি পার্টি র‍্যাঙ্কের নিকট আবেদন জানাচ্ছে যে তারা যেন এই ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রের সমর্থনে মিলিত হন এবং পার্টির মধ্যে ও গণ-আন্দোলনে যে মারাত্মক অচল অবস্থা রয়েছে তাকে ভাঙ্গবার জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করেন। কারণ একমাত্র এই পথেই পার্টির ভিতরের আদর্শগত রাজনীতিগত সংগ্রামকে এবং গণ-আন্দোলনে বাস্তব কাজগুলিকে প্রকৃত কমিউনিস্ট কার্যকলাপের সাধারণ প্রবাহের মধ্যে এনে মিলিয়ে দেওয়া যায়।

ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি এবং কমরেড পাম দত্ত আমাদের বহুদিনের বন্ধু ও পরিচালক। আমাদের পার্টির অভ্যন্তরীণ সংকট সমাধানের জন্য তাদের নিকট হতে যে ভ্রাতৃত্বমূলক সাহায্য এসেছে তার জন্য পি-ও-সি তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। ভারতে আমাদের আন্দোলনকে এবং আমাদের পার্টিকে সাহায্য দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি এবং কমরেড পাম দত্তের প্রতি পি-ও-সি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি এবং বিশেষভাবে কমরেড পাম দত্ত আমাদের লাইন সংশোধন করার জন্য যে উদ্যোগের পরিচয় দিয়েছেন এবং কমরেড পাম দত্ত আমাদের কাছে যে চিঠি পাঠিয়েছেন তার থেকে আমাদের দুটী পার্টির মধ্যে যে স্থায়ী ভ্রাতৃত্ববন্ধন রয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

পুরোনো পি-বি পূর্ণ দু' মাসকাল ব্রিটিশ পার্টির এই মূল্যবান দলিলটাকে যে পার্টি র‍্যাঙ্ক থেকে এবং পার্টির প্রাদেশিক নেতৃত্ব থেকে পর্যন্ত আটকে রেখেছিলেন সে জন্য এই প্রসঙ্গে পি-ও-সি পুরোনো পি-বি'র এই কাজের তীব্র নিন্দা না করে পারে না। পুরোনো পি-বি'র এই অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং পার্টি-বিরোধী কাজের দ্বারা পার্টির প্রকৃত ক্ষতি করা হয়েছে। পার্টি সভ্যরা যখন এই আগ্রহের সাথে অন্যান্য দেশের পার্টিগুলোর দিকে পরিচালনা ও সাহায্যের জন্য তাকিয়েছিল সেই সময় তুচ্ছ এবং অযোগ্য অজুহাত দেখিয়ে এত দীর্ঘ সময় ধরে এই চিঠি চেপে রাখা পার্টি র‍্যাংককে ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনকে অপমান করা ছাড়া আর কিছু নয়। পুরোনো পি-বি'র এই ব্যবহার নিশ্চয়ই এমন সব রাজনীতিক বিচার বিবেচনা দ্বারা অনুপ্রাণিত যার সাথে, আজ আমাদের পার্টির ভিতরকার অবস্থার আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐতিহ্যের কোন সংগতি নাই।

পুরোনো পি-বি এবং জুনের কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠির সমর্থকরা যে যতই পোষণ করুন না কেন পি-ও-সি মনে করে ২৭শে জানুয়ারির কমিনফর্ম পত্রিকার সম্পাদকীয় সম্বন্ধে ব্রিটিশ

কমিউনিস্ট পার্টির ব্যাখ্যা ব্রিটিশ পার্টির দলিলের আলোতে সেই সম্পাদকীয়কে আমাদের বুঝবার জন্য আবার যাচাই করার পক্ষে যথেষ্ট প্রামান্য। পি-ও-সি দেখে খুশি হয়েছে যে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির দলিল পি-ও-সি গত ২রা নভেম্বর জুনের কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠি সম্পর্কে যে প্রস্তাব নেয় তার মধ্যেকার মতকে প্রধান প্রধান বিষয়ে অনুমোদন করেছে। এই দলিল সমভাবে পশ্চিমবঙ্গের পার্টি র‍্যাঙ্কের অত্যধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের জুনের কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠির উপর যে মত তাকে সমর্থন করেছে।

পি-ও-সি বিশ্বাস করে যে আমাদের প্রদেশের পার্টি র‍্যাঙ্ক কমরেড পাম দত্তের চিঠি থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে এবং শিক্ষা গ্রহণ করে পার্টি ঐক্য কায়েম করার জন্য এবং আজিকার এই সংকটজনক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে তাদের উপর যে বিরাট দায়িত্ব পড়েছে তা সম্পন্ন করার জন্য এখন উচ্চতর পর্যায়ে আদর্শগত রাজনীতিক সংগ্রামের পথে এগিয়ে যাবেন।

পরিশেষে আমাদের মহান প্রিয় শিক্ষক ও নেতা কমরেড স্ট্যালিনের প্রতি এবং সাম্যবাদের আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার দরুণ তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য যে অস্থায়ী ঐক্যবদ্ধ পার্টি কেন্দ্রের প্রতি আহ্বান এসেছে তাকে পি-ও-সি পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা দেবে বলে লিখিত জানাচ্ছে।

২১ ডিসেম্বব ১৯৫০

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

বিশেষ তদন্ত কমিশন সম্পর্কিত সার্কুলার

ট্রটস্কীবাদ-টিটোবাদের উন্মত্ত আত্মপ্রকাশ হয়েছিল পশ্চিমবাংলায়। এই প্রদেশে জঘন্যতম ট্রটস্কীবাদী-টিটোবাদী অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। তদানীন্তন ট্রটস্কীবাদী-টিটোপন্থী পলিট ব্যুরোর দ্বারা মনোনীত হয়েছিল অতীতের যে প্রাদেশিক কমিটি তারা পশ্চিমবাংলায় পার্টির ও গণ-আন্দোলনের উপর বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। সেই ট্রটস্কীবাদী-টিটোপন্থী পি-সি'র অপরাধের জন্য এখানে পার্টির এখনও পর্যন্ত রক্তমোক্ষম হয়ে চলেছে।

উক্ত প্রাদেশিক কমিটির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক উভয়বিধ কার্যকলাপের উপযুক্ত তদন্ত না হলে তাদের এবং দূরবিস্তৃত শাখা-প্রশাখা খুঁজে বার না করতে পারলে, এই প্রদেশের পার্টি সংগঠনের ও কার্যকলাপের মধ্যে প্রতি বিপ্লবী ট্রটস্কীবাদ-টিটোপন্থার অবাধ গতির পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল যে সমস্ত অবস্থা তা উপলব্ধি না করতে পারলে, ইহার সমস্ত বিস্তৃত রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক শাখা-প্রশাখা নগ্ন করে প্রকাশ করতে না পারলে ট্রটস্কীবাদ-টিটোপন্থীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম তার আশানুযায়ী ফললাভ করতে পারবে না।

এই উদ্দেশ্য লক্ষ্যে রেখে পুরাতন মনোনীত পি-সি'র সমস্ত কার্যকলাপের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত সম্পূর্ণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে কারণ, ইহার অবাধ ট্রটস্কীবাদী-টিটোপন্থী নেতৃত্বের যুগে পার্টি ও গণ-আন্দোলন ভাঙবার কাজে তদানীন্তন পি-বি'র পরই স্থান নিয়েছে পশ্চিমবাংলার পি-বি।

এতদুদ্দেশ্যে পি-ও-সি তাই আশু তদন্ত শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একটি বিশেষ তদন্ত কমিশনের উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করা হবে। এই কমিশন বিবেচনা ও উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য তার রিপোর্ট প্রাদেশিক পার্টি সম্মেলনের সামনে পেশ করবে।

১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মনোনীত পুরাতন পি-সি'র সামগ্রিক কার্যকলাপ এবং তার প্রত্যেকটি সভ্য সম্পর্কে তদন্ত এই কমিশনের আওতার আসবে। যারাই কার্যত কমিশনের কাজে সাহায্য করতে পারবেন, তাঁদের সকলের সাক্ষ্য প্রমানই গ্রহণ করা ও পরীক্ষা করার ক্ষমতা কমিশনকে দেওয়া হচ্ছে। যদি পি-ও-সি'র এক্তিয়ারের বাইরে কোন সাক্ষী থাকেন তখন কমিশনকে এমন সুযোগ দেওয়া হবে যাতে উপযুক্ত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত নিশ্চিত হতে পারে।

কমিশনের নিকট উপযুক্তভাবে প্রদত্ত, মৌখিক বা লিখিত বিবৃতি, দলিলগত বা অন্যান্য প্রমাণ প্রভৃতি সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে।

যে সমস্ত বিষয়ে (item) তদন্ত চালানো হবে তার একটি পূর্ণাঙ্গ লিস্ট পেশ করা খুবই

দুরূহ ব্যাপার। তার কারণ অনুষ্ঠিত অপরাধের পরিমাণ সংখ্যাতীত। তথাপি, যে সমস্ত রিপোর্ট পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে এবং পার্টি সভ্যদের সাধারণ অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, তদন্তের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি (heads) উল্লেখ করা যেতে পারে। ইহার দ্বারা কিন্তু কমিশনের তদন্তের পরিধি সংকুচিত করা হচ্ছে না, প্রয়োজন হলে তদন্তের কাজ চালাতে গিয়ে কমিশন আরো অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন।

বিষয়গুলি হল ঃ

১। ১৯৪৭ সালের শেষভাগে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পার্টি সম্মেলনে নির্বাচিত পি-সি'কে স্বৈরাচারী উপায়ে ভেঙ্গে দেওয়ার সাথে জড়িত ব্যাপার।

২। ১৯৪৯ সালের প্রথম দিকে ট্রটস্কীবাদী-টিটোপন্থী পলিটব্যুরো কর্তৃক পুরাতন পি.সি. মনোনয়নের সাথে সংযুক্ত বিষয়াবলী।

৩। কমরেড বি.টি. রণদিভে কর্তৃক মনোনীত পি.সি'র সম্পাদক হিসাবে কমরেড মল্লিকের নাম প্রস্তাব করা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ। পি.সি. সম্পাদকমণ্ডলীর সভ্য বাছাই করা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ।

৪। পি.বি. কর্তৃক অপসারিত নির্বাচিত পি.সি'র সদস্যদের প্রতি মনোনীত নতুন পি.সি'র মনোভাব।

৫। "রণকৌশলের লাইন" এবং ট্রটস্কীবাদী-টিটোপন্থী পি.বি'র অন্যান্য প্রস্তাব সম্পর্কে মনোনীত পি.সি'র মনোভাব, বাংলাদেশের পার্টির উপর এই লাইন জোর করে চালানোর ব্যাপারে ইহার অংশ এবং এই ব্যাপারে প্রযুক্ত পদ্ধতিসমূহ।

৬। ৯ই মার্চের প্রস্তাবিত রেলওয়ে সাধারণ ধর্মঘটের ব্যাপারে মনোনীত পি.সি'র ভূমিকা এবং ধর্মঘট ব্যর্থ হবার পূর্ববর্তী সময়ে ইহার কার্যকলাপ।

৭। জেলা কমিটি সমূহের এবং অন্যান্য পার্টি ইউনিটের পুনর্গঠন এবং তদুদ্দেশ্যে প্রযুক্ত পদ্ধতিসমূহ।

৮। ট্রেড ইউনিয়ন, কিষান সভা, ছাত্র ফেডারেশন, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি প্রভৃতি গণসংগঠনের প্রতি এই পি.সি'র মনোভাব। গণ-আন্দোলনের নেতাদের প্রতি মনোভাব এবং গণ-সংগঠনগুলি ও তার নেতাদের পরিচালনা করার পদ্ধতি।

৯। পার্টির প্রচার আন্দোলন (agit-prop) বিভাগের পরিচালনা এবং এ বিষয়ে প্রযুক্ত পদ্ধতিগুলি।

১০। ট্রটস্কীবাদী-টিটোপন্থী পি.বি. ও পি.সি. যাদের উপর সন্তুষ্ট ছিল না এমন সমস্ত পার্টি নেতা এবং অন্যান্য পার্টি কমরেডদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অপবাদ প্রচার (কেবল প্রাসঙ্গিক বা বিচ্ছিন্ন মন্তব্য মাত্র নহে)। পার্টি সভ্য ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে সাধারণ অপপ্রচার।

১১। সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার বিকৃতিকরণ।

১২। অন্তঃপার্টি গণতন্ত্র দলন এবং এই দলন কার্যকরী করার জন্য প্রযুক্ত পদ্ধতিসমূহ।

১৩। পার্টি সভ্যদের হতাশ ও সন্ত্রাসিত করার জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলি।

১৪। পার্টি নেতা ও পার্টি সভ্যদের দস্তুরমত কয়েদ করা এবং বিচ্ছিন্ন করা।

১৫। পার্টি মেম্বারদের উপর গুপ্তচরবৃত্তি।

১৬। পার্টি মেম্বারদের ভীতি প্রদর্শন।

১৭। পার্টি মেম্বারদের একেবারে অপসারিত করার উদ্দেশ্যে হত্যার ষড়যন্ত্র।

১৮। এক দল পার্টি মেম্বারকে আর এক দলের বিরুদ্ধে লাগানো। বিশেষ উল্লেখযোগ্য— শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠার মিথ্যা বাগাড়ম্বর, নওজোয়ান ও ছাত্রদের কপট প্রশংসা।

১৯। প্রবীন ও বয়স্ক পার্টি কমরেডদের প্রতি ধারাবাহিক অবমাননা এবং অপমান।

২০। ট্রটস্কীবাদী-টিটোপন্থী লাইন চালু করার উদ্দেশ্য নিয়ে মিথ্যা, বিকৃতি ঘটনা ও দলিল গোপন করা, প্রতারণা এবং ষড়যন্ত্রের কায়দায় মিথ্যা প্রচার প্রভৃতিতে প্রশয় দেওয়া।

২১। সহোদর পার্টিগুলির ও তার নেতাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, বিশেষ উল্লেখযোগ্য চীনের ও ব্রিটিশ পার্টির বিরুদ্ধে নিন্দা প্রচার।

২২। উপদলীয় চক্রান্ত।

২৩। অল্পবয়স্ক ক্যাডারদের দূষিত করা এবং একদল তোষামোদকারী ও "ঝটিকা বাহিনী" সৃষ্টি করা।

২৪। স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্ব।

২৫। পার্টি ইতিহাসকে বিকৃত করা এবং পার্টির অতীত ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা।

২৬। পার্টি গঠনতন্ত্র ও নিয়মকানুন লঙ্ঘন করা।

২৭। পার্টি ফাণ্ডের অপব্যয় করা।

২৮। "স্পেশাল কাজের" সংগঠন এবং ইহা কার্যকরী করার জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি ও লোকজন।

২৯। পি.সি. ও তার নানাবিধ কার্যকলাপের সাথে বাংলাদেশের ২ জন পি.বি. সভ্য কমরেড রবি ও গৌরের সম্পর্ক। ট্রটস্কীবাদী-টিটোপন্থী পি.বি'র সদস্যদের সাথে সমগ্র প্রাদেশিক কমিটি অথবা তার কোন্ কোন্ সদস্যের চক্রান্ত।

৩০। গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসমূহ এবং এই বিষয়ে অনুসৃত পদ্ধতিসমূহ।

৩১। শ্রমিক-কৃষক এবং গণতান্ত্রিক জনসাধারণের অন্যান্য অংশের বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শন এবং বলপ্রয়োগ।

৩২। পার্টি সমর্থক ও দরদীদের প্রতি মনোভাব।

৩৩। সম্পাদকের কাজ চালানোর ধরন।

৩৪। প্রাদেশিক কেন্দ্রের কাজকর্মের সাথে জড়িত অন্যান্য কমরেডদের সাথে পি.সি সদস্যদের সম্পর্ক।

৩৫। জেলা কমিটিগুলি এবং জেলার নেতাদের প্রতি মনোভাব।

৩৬। পি.বি'র সাথে প্রকৃত সম্পর্ক।

৩৭। পি.সি. 'ডেন'গুলিতে জীবনযাপনের অবস্থা।

৩৮। পি.সি'র 'টেক' সংগঠন এবং টেক ক্যাডারদের প্রতি ব্যবহার।

৩৯। শত্রুপক্ষের মধ্যে "সহানুভূতিশীল"দের সাথে যোগাযোগ এবং 'খবর' প্রভৃতি পাওয়ার সূত্র।

৪০। জেল কমরেডদের প্রতি নির্দেশাবলী এবং তাহার ফলাফল।

উপরে বর্ণিত বিষয়গুলি (heads) থেকে বোঝা যাবে কোন লাইন ধরে কমিশনকে তার কাজ চালাতে হবে। কিন্তু সমস্ত পার্টি সভ্যদের সক্রিয় সহযোগিতার উপরই এই তদন্তের

সাফল্য নির্ভর করে। কারণ সঠিক রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্য কমিশনকে উপযুক্ত তথ্যাবলী একমাত্র তাঁরাই যোগাতে পারেন। সাক্ষ্য দেবার সময় কমরেডরা এই তদন্তের প্রধান রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রতি যেন সর্বদাই লক্ষ্য রাখেন। অপ্রধান ও গৌণ বিষয়সমূহের দ্বারা চালিত হয়ে যেন কমরেডরা লক্ষ্যভ্রষ্ট না হন।

মৌখিক বা লিখিত যে ভাবেই কমিশনের নিকট বিবৃতি দিন, বিবৃতি দেওয়ার সময় কমরেডরা তাঁদের বিবৃতির সাথে সম্পর্কিত স্থান, কাল ও পাত্রের কথা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করবেন। সর্বপ্রযত্নে অতিশয়োক্তি পরিহার করতে হবে এবং শুধুমাত্র যথাযথ ঘটনাবলীই বিবৃত করতে হবে। লিখিত বিবৃতি পেশ করার সময়, সাক্ষ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির (item) প্রত্যেকটির জন্য আলাদা আলাদা কাগজ ব্যবহার করবেন। কাগজের মাথায় নির্দিষ্ট বিষয়ের (head) সংখ্যাটি উল্লেখ করা দরকার। (অর্থাৎ ফাণ্ডের অপব্যবহার সম্পর্কে লিখিত বিবৃতি দেবার সময় কাগজের মাথায় "২৭" সংখ্যাটি উল্লেখ করতে হবে।) সঠিক সংকলনের জন্য এই পদ্ধতি খুবই প্রয়োজন। লিখিত বিবৃতি এবং অন্যান্য দলিল প্রভৃতি পাঠাতে হবে বিশেষ তদন্ত কমিশন C/o পি.ও.সি. এই নামে, খামে 'গোপনীয়' লিখে দিতে হবে।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অথবা নিজেদের জানা বিষয় থেকেই কমরেডদের সাক্ষ্য দেওয়া দরকার। যেখানেই সম্ভব সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে অনুরূপ ব্যক্তিগত পরিচয় ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে এমন অন্যান্য প্রত্যেক কমরেড দ্বারা অথবা পার্টি কমিটি দ্বারা এই রকম বিবৃতিগুলি সমর্থিত হওয়া দরকার। শোনা কথা একেবারে বাদ দিতে হবে যদি না তা থেকে অধিকতর তদন্তের সূত্র পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস এই যে পার্টি কমরেডরা এই তদন্তের তাৎপর্য সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করবেন এবং পার্টি সভ্যপদের যোগ্য উপযুক্ত রীতি অনুযায়ী নিজেদের দায়িত্ব পালন করবেন।

অভিনন্দনসহ—

২৭ ডিসেম্বর ১৯৫০

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

টিকা : 'মল্লিক' মহম্মদ ইসমাইলের
'রবি' ভবানী সেনের ও
'গৌর' সোমনাথ লাহিড়ীর ছদ্মনাম।

সহায়ক তথ্য - ৪৭

পার্টি সভ্য ও ইউনিটেব জন্য—

পার্টি-শিক্ষা সম্পর্কে পি-ও-সি'র খসড়া দলিল

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির
পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি

১লা ডিসেম্বর ১৯৫০।

পার্টি-শিক্ষা সম্পর্কে পি.ও.সি'র খসড়া দলিল

পার্টি-শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা চাই

আমরা নীচে পার্টি-শিক্ষা সম্পর্কে পি.ও.সি'র একটি খসড়া দলিল প্রকাশ করিলাম। এই দলিলের উপর বিভিন্ন ইউনিট ও কমরেডের মতামত পাইলে একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল আমরা পরে প্রকাশ করিব।

প্রত্যেক জেলা কমিটি বা সংগঠনী কমিটি এই দলিলের ভিত্তিতে পাঠচক্র ও স্কুল পরিচালনার জন্য শিক্ষকদের নাম সংগ্রহ করিয়া কাজ শুরু করিয়া দিবেন ইহা আমরা আশা করি। শিক্ষকদের নাম বাছাই করিয়া প্রাদেশিক কেন্দ্রে পাঠাইবেন।

এই বিষয়ে ইউনিটগুলিকে "প্রাদেশিক পার্টি-শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত" কমরেডের সাথে যোগাযোগ রাখিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

পঃ বঃ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

১০ই নভেম্বর, ৫০

পার্টি-শিক্ষা সম্পর্কে পি.ও.সি'র খসড়া দলিল

ভূমিকা ঃ বর্তমান সময়ে পার্টি-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কারণ বুনিয়াদি পার্টি শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকার কি পরিণাম তাহা আমরা সকলেই এখন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছি। উপযুক্ত পার্টি-শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকার দরুন আমরা পার্টি সভ্যদের মার্ক্স-লেনিনবাদে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারি নাই। অতীতের সংস্কারবাদী রাজনীতি এবং পরবর্তীকালের ট্রটস্কীবাদ উভয়েরই লক্ষ্য ছিল পার্টির ভিতরকার মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষাকে বানচাল করিয়া দেওয়া। বর্তমানে ইহারই জের আমাদের টানিতে হইতেছে।

ইহা আজ দিনের আলোর মত স্পষ্ট যে পার্টির সভ্যসাধারণের জন্যে পার্টি-শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিয়া পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ বা সুসংহত করা আর সম্ভব নয়। পার্টি সভ্যের মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষা ও জ্ঞানের স্তর উন্নত না করিয়া আজিকার দিনে জনসাধারণ ও বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালন অসম্ভব। সাধারণ পার্টি সভ্যদের মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষায় দ্রুত শিক্ষিত করিতে না পারিলে নানাপ্রকার বিচ্যুতির সম্ভাবনা বরাবরই যথেষ্ট থাকিয়া যাইবে।

অতীত দিনের মারাত্মক সব রাজনৈতিক বিচ্যুতি এবং বিশেষভাবে বর্তমানের অভ্যন্তরীণ পার্টি-সংকট হইতে আমরা সকলেই পার্টি-শিক্ষার আশু প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন। কিন্তু কেবলমাত্র সচেতন হইলেই কোন কাজ হইবে না। সামর্থ অনুযায়ী সর্বত্র পার্টি-শিক্ষার এখনি সকল প্রকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। হয়ত এই মুহূর্তেই বড় একটা কিছু করিয়া ফেলা সম্ভব হইবে না। কিন্তু যেহেতু আদর্শস্বরূপ কোন ব্যবস্থা আপাতত করা অসুবিধা তাই একেবারেই কোন কিছু না করা মোটেই সঙ্গত হইবে না। বরং ইহাতে ভয়ানক ক্ষতি হইবে।

কাজ করিতে গিয়া ভুলত্রুটি হয় হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া জরুরি কাজ স্থগিত রাখার কোন অর্থ হয় না। পার্টি-শিক্ষার ব্যাপারে এইকথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কারণ অতীতে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিবার নাম করিয়া শেষ পর্যন্ত কিছুই করা হয় নাই। ফলে যেটুকু সম্ভাবনা ও সামর্থ ছিল তাহাও কাজে লাগানো হয় নাই। এই অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি এবং কার্যত পরাজয়ের মনোভাব বর্জন করিয়া পার্টি-শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের সচেষ্ট হইতে হইবে।

প্রাদেশিক স্কুল ঃ ন্যূনতম ব্যবস্থাদি সম্ভবপর হইলেই প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি কেন্দ্রীয় পার্টি-স্কুলের পরিকল্পনা কার্যকরী করিবে। বর্তমানে নিদারুণ আর্থিক সংকট কেন্দ্রীয় পার্টি-স্কুলের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে। এই আর্থিক অনটন না থাকিলে ইতিমধ্যেই পার্টি-স্কুল চালু করিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু অর্থাভাবে বেআইনি সংগঠনটাই প্রায় বিকল হইতে বসিয়াছে। এমতাবস্থায় স্বভাবতই নতুন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা অসম্ভব এবং বিপজ্জনক। আশা করি সকল কমরেডই ইহা বুঝিতে পারিবেন। তবুও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কেন্দ্রীয় পার্টি-স্কুল শুরু করিবার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি হইবে না।

কিন্তু কেন্দ্রীয় স্কুলের অপেক্ষায় পার্টি-শিক্ষা অন্য সব উপায় স্থগিত থাকিতে দেওয়া চলে না। বরং জেলা কমিটি, সেল এবং এমনকি ব্যক্তিগতভাবে কমরেডদের উদ্যোগী হইয়া নিজেদের চেষ্টায় সমগ্র পার্টিতে পার্টি-শিক্ষার জন্য একদিকে অভ্যন্তরীণ ক্যাম্পেন এবং অন্যদিকে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। প্রতিটি ইউনিটেরই নিজ নিজ ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত পার্টি সভ্য ও জঙ্গীদের পার্টি-শিক্ষার জন্য সাধ্যমত ব্যবস্থা করিবার দায়িত্ব রহিয়াছে। আজ বিশেষ করিয়া এই দায়িত্ব পালনের দিন আসিয়াছে। কারণ এই কাজের সঙ্গে পার্টির অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট সমাধান এবং ইহার ভবিষ্যৎ নিবিড়ভাবে জড়িত। পার্টি-শিক্ষা বাদ দিয়া মতবাদগত সংগ্রাম কখনও অগ্রসর হইতে পারে না। পার্টি-শিক্ষা বাদ দিয়া রাজনৈতিক বা সাংগঠনিক ঐক্য সাধন অসম্ভব। পার্টি-শিক্ষা বাদ দিয়া অচল অবস্থার অবসান কিংবা নতুন করিয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়িয়া তোলা কোনটাই সম্ভব নয়। সুতরাং পার্টি সাধারণ সভ্য ও স্থানীয় ইউনিট যেমন নিজেরাই উদ্যোগী হইয়া মতবাদগত সংগ্রামে আগাইয়া আসেন আজও তেমনি তাঁহাদের আবার পার্টি-শিক্ষার ব্যাপারে উদ্যোগ ও কর্মতৎপরতা দেখাইতে হইবে। পার্টির বর্তমান সংকটাবস্থায় গতানুগতিক উপায়ে বিশেষ কিছু করা যাইবে না। পার্টি সংগঠনের যে অবস্থা তাহাতে অনুরূপ আশা করাও ঠিক নয়। যাহাতে পার্টি সভ্যরা নিজেরাই পার্টি-শিক্ষার কাজ আরম্ভ করিয়া দিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে আমরা কতকগুলি প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি। আশা করি এই প্রস্তাবগুলি জেলা কমিটি হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য সকল ইউনিটই বিবেচনা করিয়া যথাসম্ভব কার্যকরী করিতে চেষ্টা করিবেন। প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি আমরা কমরেডদের লক্ষ্য রাখিতে বলিতেছি।

স্থানীয় শিক্ষক ঃ প্রথমেই বলা দরকার যে, আমাদের শিক্ষকের অভাব একটি মস্ত বড় সমস্যা। পার্টি শিক্ষক তৈরি করিবার উদ্দেশ্যেই কেন্দ্রীয় স্কুল বিশেষভাবে সচেষ্ট হইবে। কারণ উপযুক্ত সংখ্যক পার্টি-শিক্ষক তৈরি না করিতে পারিলে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় স্কুলের একক চেষ্টায় পার্টি-শিক্ষার কোনই সমাধান হইতে পারে না। বিশেষ করিয়া বর্তমান বেআইনি অবস্থায়। সুতরাং পার্টি-শিক্ষার সাংগঠনিক দিক হইতে বিকেন্দ্রীকরণের একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত কমরেডদের বাছিয়া একদল শিক্ষক প্রচারক (টিচার প্রোপাগ্যাণ্ডিস্ট) পার্টিতে

অনতিবিলম্বে অবশ্যই সৃষ্টি করিতে হইবে। তাহাদের প্রধান কাজ হইবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিভিন্ন এলাকায় পার্টি-শিক্ষা দেওয়া। পার্টি-শিক্ষার কাজের ভার যাহারা গ্রহণ করিবেন একমাত্র তাঁহাদেরই প্রথমে কেন্দ্রীয় স্কুলে নেওয়া হইবে। জেলা কমিটি ও স্থানীয় ইউনিটকে সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির সহিত পরামর্শ করিয়া উপযুক্ত কমরেডদের এখন হইতে মনোনয়ন করা দরকার।

যাই হউক, এখনি হয়ত অনেক জেলা কমিটির পক্ষে স্থানীয় উদ্যোগে জেলা পার্টি-স্কুল সংগঠিত করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু একটু চেষ্টা করিলেই "পাঠচক্র" বা "স্টাডি সার্কেল" চালু করিয়া দেওয়া যায়। পাঠচক্র পরিচালনার আসল ভার স্থানীয় কমরেডদেরই। কিন্তু জেলা কমিটি এই ব্যাপারে যাহাতে প্ল্যান মাফিক কাজ হয় এবং এক ইউনিট অপর ইউনিটকে অবশ্যই নানারকম সাহায্য করিতে পারে। বিভিন্ন ইউনিটের সহযোগিতার খুবই প্রয়োজন হইবে।

স্থানীয় পাঠচক্র ঃ প্রতিটি স্থানীয় ইউনিট জেলা কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শিক্ষকের লিস্ট বা প্যানেল তৈরি করিবেন। প্রয়োজনবোধে উপযুক্ত পার্টি দরদীদেরও "পাঠচক্র" পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া যাইতে পারে। অনেকক্ষেত্রে হয়ত খুব ভাল শিক্ষক পাওয়া যাইবে না। কিন্তু মোটামুটিভাবে "পাঠচক্র" পরিচালনা করিতে পারেন এমন পার্টিসভ্য ও দরদী প্রায় সর্বত্রই কিছু না কিছু পাওয়া যাইবে। হয়ত 'পাঠচক্র'-এর দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে তাহাদের নিজেদের আবার একটু ভাল করিয়া পড়াশুনা করা দরকার হইতে পারে। মোটের উপর কথাটা হইল যে, যাহাদের এখনি এই কাজের জন্য পাওয়া যায় তাহাদের লইয়াই কাজ আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে।

কোন্ বিষয়ে "পাঠচক্রে" আলোচনা হইবে তাহা আগে থেকেই ঠিক করা দরকার। কমরেডরা সেই অনুযায়ী পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইবেন। যাহাতে উপযুক্ত সাহিত্য কমরেডরা পান সেজন্যে 'পাঠচক্র' সংগঠকদের বিশেষভাবে নজর দিতে হইবে। কারণ নিজেরা না পড়িয়া আসিলে শুধুমাত্র "পাঠচক্র"-এর আলোচনায় ফল হইবে না। অবশ্য যে সমস্ত কমরেড পড়িতে জানেন না তাহাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে। কোন কমরেড তাঁহাদের পড়িয়া শোনাইবেন। ইহা একান্ত দরকার। সংগঠকদের এদিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে। তাহা না হইলে পার্টি-শিক্ষা শুধুমাত্র লেখাপড়া জানা কমরেডদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যাইবে। ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত পার্টি সাহিত্য বাংলায় বা অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করিয়া পড়িয়া শোনানো বর্তমানে অপরিহার্য। কারণ অনেক কিছু মূল সাহিত্যও এখন পর্যন্ত আমাদের নিজের মাতৃভাষায় প্রকাশ হয় নাই। এখানে মনে রাখা দরকার যে, অনুবাদ করিয়া পড়ার অর্থ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা নয়। প্রতিটি ছত্র সঠিকভাবে অনুবাদ করিয়া কমরেডদের শোনাইতে হইবে। প্রয়োজন মত ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু আসল লেখার কাটছাট কিছুতেই করা চলিবে না। পাঠচক্রের আলোচনার পূর্বে কমরেডদের যথেষ্ট সময় দিতে হইবে, যাহাতে এই কাজগুলি করা সম্ভব হয়। এই কারণেই পাঠচক্র পরিচালনার চেয়ে পাঠচক্র সংগঠিত করার কাজ কোন অংশেই ছোট নয়। পাঠচক্রের সাফল্য কি করিয়া ইহা সংগঠিত করা হয় তার উপরই যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করিবে।

পাঠচক্রের ব্যাপারে বিভিন্ন ইউনিট যথাসম্ভব নিজের উপরই নির্ভর করিতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই তাহা হয়ত সম্ভব নয়। তাই বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার দরকার হইবে। স্থানীয় পার্টি নেতৃত্ব এই সহযোগিতা ও

সমন্বয়ের কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করিবে। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে একাধিক সেল একত্রে যৌথভাবে তাহাদের পার্টি শিক্ষার কাজ সংগঠিত করিতে পারেন।

ইউনিটের কাজ ঃ এখন পার্টি-শিক্ষা সংগঠকদের কথা বলা দরকার। প্রতিটি ইউনিট বা সেল অন্ততপক্ষে একজন কমরেডকে এই কাজের দায়িত্ব দেবেন। সংগঠক কমরেডের কাজ হইবে স্থানীয় অবস্থা ও সঙ্গতি অনুযায়ী পার্টি-শিক্ষার জন্য কার্যকরী প্ল্যান তৈরি করা। বড় বা উৎকৃষ্ট কিছু করিতে যাইয়া যেন যাহা এখনি করা সম্ভব তাহাও যেন শেষ পর্যন্ত কার্যত অবহেলা না করা হয়। সংগঠকের একদিকে যেমন কাজ সংশ্লিষ্ট পার্টি নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করিয়া শিক্ষক এবং এখনি কোন্ কোন্ বিষয় পড়া হইবে তাহা ঠিক করা, অন্যদিকে তাহার কাজ হইবে আবশ্যকীয় সাহিত্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা। এজন্যে তাহাকে শিক্ষক ও অন্যান্য কমরেডদের সঙ্গে রীতিমতো যোগাযোগ রক্ষা করিতে হইবে।

পাঠচক্র পরিচালনার কায়দা ঃ সাধারণত একজন কমরেড (শিক্ষক বা পরিচালক) পূর্ব নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর উপযুক্ত সাহিত্যের ভিত্তিতে আলোচনার অবতারণা করিবেন। অন্য সকল কমরেড (যাহারা অবশ্য আগেই সে বিষয় নিজেরা পড়িয়াছেন) এই আলোচনায় যোগ দিবেন। তাঁহাদের বক্তব্য এবং প্রশ্ন সব কিছুই আলোচিত হইবে। ক্রমে ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন কমরেডদের বিভিন্ন বিষয়ে এই আলোচনা শুরু করিবার ভার দেওয়া হইবে। লক্ষ্য হইবে যাহাতে কমরেডরা পরে নিজেরাও আলোচনা চালাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পাবে। পাঠচক্রের প্রতিটি সদস্যেরই এইভাবে, শিক্ষকের কাজেও কিছুটা হাত দিতে হইবে। তাঁহারা শুধু শ্রোতার ভূমিকায় যেন থাকিয়া না যান। মনে রাখতে হইবে আমরা সকলেই কমিউনিজমের প্রচারক ('প্রোপাগ্যাণ্ডিস্ট')। প্রচার করা আমাদের সকলেরই কাজ। পাঠচক্রের উদ্দেশ্য শুধু নিজেদের জ্ঞান উন্নত করাই নয়, প্রচার করিবার শক্তিকেও বাড়াইতে হইবে। সাধারণত সপ্তাহে একটি করিয়া পাঠচক্রের ক্লাসেব ব্যবস্থা করা দরকার। তাহা এখনি সম্ভব না হইলে মাসে অন্ততপক্ষে তিনটি ক্লাস যাহাতে করা যায় সেদিকে নজর দিতে হইবে। নিয়মিত ও ধারাবাহিকভাবে যাহাতে ক্লাস চলে তাহার উপর বিশেষ জোর দিতে হইবে। কারণ এলোমেলো বা বিক্ষিপ্তভাবে ক্লাস হইলে তেমন কোন লাভ নাই। পার্টি-শিক্ষার অবিচ্ছিন্নতা ধারাবাহিকতা অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে।এখানে শ্রমিক ও কৃষক কমরেডদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্ আবশ্যক। অতীতে দেখা গিয়াছে যে, যেটুকুই বা পার্টি-শিক্ষার ব্যবস্থা হয় তাহা হইতে শ্রমিক এবং কৃষক কমরেডরা প্রায় বাদ পড়িয়া যান। ইহা আমাদের একটি মারাত্মক বিচ্যুতি। খুব সচেতনভাবে এই বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যদি না শ্রমিক ও কৃষক কমরেডদের যথেষ্ট পরিমাণে পার্টি-শিক্ষার মধ্যে টানিয়া আনিতে না পারি তবে পার্টি-শিক্ষার কোন মূল্যই নাই। তাই বুদ্ধিজীবী কমরেডদের আজিকার দিনে বিশেষ দায়িত্ব হইবে শ্রমিক ও কৃষক কমরেডদের শিক্ষিত করিয়া তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। ইহাতে এই বুদ্ধিজীবী কমরেডরা নিজেরাও অনেক কিছু শিক্ষালাভ করিবেন। স্থানীয় পার্টি নেতৃত্বের একটি প্রধান কর্তব্য হইবে ছাত্র, শিক্ষক ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবী শ্রেণির পার্টি সভ্য ও দরদীদের শ্রমিক ও কৃষক কমরেডদের শিক্ষাদানের কাজে বিশেষভাবে নিয়োজিত করা। বুদ্ধিজীবী কমরেডদের পার্টি ইউনিটের (যেমন শিক্ষক সেল) কার্যপরিক্রমার মধ্যে এইটি একটি অন্যতম কাজ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এই ধরনের প্রতিটি ইউনিটই পার্টি-শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে নিশ্চয়ই অগ্রসর হইতে পারেন। কোন একটা ইউনিটের বিভিন্ন কমরেডের উপর

যেমন ভিন্ন ভিন্ন কাজের ভার থাকে, তেমনি প্রতিটি ইউনিটের বিশেষ বিশেষ কমরেডকে এই কাজেরও ভার দেওয়া দরকার। এইভাবে এক ইউনিট অপর ইউনিট পার্টি-জীবনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাহায্য করিবেন, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত কমরেডরা অন্যদের বিশেষ করিয়া শ্রমিক ও কৃষক কমরেডদের সাহায্য করিবেন। কলিকাতায় অনেক বুদ্ধিজীবী পার্টিসভ্য ও দরদী আছেন যাহাদের এখনিই এই কাজে নিয়োজিত করা যাইতে পারে। কলিকাতার শ্রমিক কমরেডদের পার্টি-শিক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা একেবারে অপরিহার্য। তাই আমাদের শ্লোগান হইবে শিক্ষকতার কাজে সক্ষম এমন সব বুদ্ধিজীবী কমরেডদের পার্টি-শিক্ষার জন্য শ্রমিক ও কৃষক কমরেডদের নিকট পাঠাইতে হইবে। জেলা এবং লোকাল কমিটি এই ব্যাপারে আবশ্যকীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

শিক্ষার বিষয়বস্তু ঃ পাঠচক্র কি কি বিষয় লইয়া এখনি আরম্ভ করা যাইতে পারে? প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, পাঠচক্রের আসল লক্ষ্য হইবে পার্টির ভিতর মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের বুনিয়াদী শিক্ষা শুরু করা। তাই মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের মূল সাহিত্যের উপরই বিশেষ জোর দিতে হইবে। চীনের সফল মুক্তি সংগ্রামের শিক্ষা আমাদের পক্ষে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই চীনের বিপ্লবী সাহিত্য আমাদের ভাল করিয়া পড়িতে হইবে। তাহা ছাড়া আন্তর্জাতিক আন্দোলন ও নেতৃত্ব কর্তৃক প্রকাশিত প্রামাণ্য সাহিত্যও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে পড়া অত্যাবশ্যক। এইভাবে মূল শিক্ষার ভিত্তিতে আমাদের আদর্শগত রাজনৈতিক চেতনার স্তরের উন্নতিসাধন করিতে হইবে। ইহা আজ সমগ্র পার্টিরই একটি অন্যতম প্রাথমিক বিরাট কর্তব্য।

এই মূল শিক্ষার জন্য পাঠচক্রগুলি নিম্নলিখিত সাহিত্য লইয়াই তাহাদের কাজ শুরু করিয়া দিতে পারেন। এখানে আবশ্যকীয় সাহিত্যের কোন পূর্ণ তালিকা দেওয়া হইতেছে না। শুধুমাত্র যাহা আমাদের এখনি পড়া দরকার এবং যে সমস্ত পুস্তকাদি সহজে পাওয়া যাইবে কেবল তাহাই উল্লেখ করা হইতেছে। তাই অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থই এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইল না।

শ্রমিক-কৃষক ক্যাডারদের জন্য বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন তাঁহাদের ভূগোল ও ইতিহাস সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়া হয়। মানচিত্র ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের সাহায্যে বুদ্ধিজীবী কমরেডরা একাজ অতি সহজেই করিতে পারেন।

সাহিত্যের তালিকা ঃ

(ক) *মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের মূল তত্ত্ব সম্পর্কে—*

১। আমাদের সকলেরই প্রথমে বিশেষ গভীরভাবে পড়া দরকার মহান স্ট্যালিনের নিজের লেখা **সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ইতিহাস**। এই পুস্তকখানা আমাদের বার বার পড়িতে হইবে। ইহার প্রতিটি কথা গভীরভাবে চিন্তা করিতে হইবে। সুতরাং পাঠচক্রগুলি এই ঐতিহাসিক গ্রন্থ লইয়াই পার্টি-শিক্ষা শুরু করিবেন।

২। সঙ্গে সঙ্গে **কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো** বা "কমিউনিস্ট ইস্তাহার" পড়া দরকার। প্রথমে "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো" পড়িয়া নিতে পারিলেই সবচেয়ে ভাল। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো পড়িতে হইলে ইতিহাসের জ্ঞান একটু থাকা দরকার। যিনি কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো পড়াইবেন তিনি অমিত সেনের **ইতিহাসের ধারা** এবং **কমিউনিজমের উৎপত্তি** এই দুইটি বইয়ের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন। ইহাতে ব্যাখ্যা করিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। অন্যান্য অনেক পুস্তক আছে।

কিন্তু তাহা সহজে পাওয়া যায় না। তাই সেগুলির আর উল্লেখ করা হইল না।

৩। বর্তমানে রণনীতি ও রণকৌশল ও সাংগঠনিক নানা সমস্যা লইয়া পার্টিতে আলোচনা চলিতেছে। সুতরাং এখনি আমাদের এ সম্পর্কে ষ্ট্যালিনের রচিত মূলগ্রন্থ বিশেষভাবে পড়া দরকার। বইটি হইল "প্রবলেমস অফ লেনিনিজম"। কিন্তু বইটির বাংলা বা আমাদের প্রদেশে প্রচলিত অন্য ভাষায় কোন অনুবাদ নাই। কিছুদিন পূর্বে এই পুস্তকের কতকাংশের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হয়। তাহা বাজারে পাওয়া যায়। অনুবাদ দুইটি হইল ঃ (ক) লেনিনবাদের ভিত্তি; (খ) লেনিনবাদের সমস্যা (উভয়েই নিউ পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত)। ইংরাজী গ্রন্থখানাও পাওয়া যায়। ইংরাজী গ্রন্থে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ পার্টি কংগ্রেসে প্রদত্ত ষ্ট্যালিনের রিপোর্টে দুইটি রিপোর্টই আছে। তাহাও পড়া দরকার।

৪। বিপ্লবের কৌশলের বিশ্লেষণ সম্পর্কীয় লেনিনের ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'টু ট্যাকটিস অফ সোশ্যাল ডেমোক্রেসি' এই পুস্তকখানা পড়া একান্ত দরকার। বাংলায় ইহার কোন অনুবাদ পাওয়া যায় না। তাই ইংরাজী অনুবাদের আশ্রয় না লইয়া উপায় নাই।

৫। কৃষক সমস্যা সম্পর্কে লেনিনের "টু দি রুরেল পুওর" বা গ্রামের গরীবদের প্রতি। বাংলা অনুবাদ পাওয়া যায়।

৬। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনের রচিত ইম্পিরিয়ালিজম, দি হাইয়েস্ট স্টেজ অফ ক্যাপিটেলিজম। বাংলা অনুবাদ নাই।

৭। লেনিনের "রাষ্ট্র ও বিপ্লব"—"দি স্টেট এণ্ড রিভল্যুশন"-এর বাংলা অনুবাদ।

৮। লেনিনের "লেফট উইং কমিউনিজম, এন্ড ইনফ্যানটাইল ডিসঅর্ডার"। ইহার কোন বাংলা অনুবাদ নাই; এই বইখানা প্রকাশের ত্রিংশতিতম বার্ষিকী উপলক্ষে "বলশেভিকে" লিখিত কমরেড ভি. গ্রিগোরিয়ানের লিখিত প্রবন্ধ সঙ্গে সঙ্গে পড়িলে ভাল হয়। প্রবন্ধ খানার ইংরাজী অনুবাদ "কমিউনিস্ট" তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় সংখ্যায় বাহির হইয়াছে। "বামপন্থী বিচ্যুতির" বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই মূল পুস্তক এবং ইহার উপর "বলশেভিক"-এ লিখিত প্রবন্ধ দুইটি আমাদের গভীরভাবে পড়িতে হইবে।

সঙ্গে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় ও চতুর্থ কংগ্রেসে "বামপন্থী" বিচ্যুতি সম্পর্কে লেনিনের প্রদত্ত রিপোর্ট এবং প্রাভদায় প্রকাশিত লেনিনের "নিউ টাইমস এণ্ড ওল্ড মিষ্টেকস ইন নিউ গাইন" নামের প্রবন্ধটি পড়া দরকার। লরেন্স ও উইসার্টের লেনিনের সিলেকটেড ওয়ার্কসের ১০ম খণ্ডে তাহা আছে। শেষোক্ত প্রবন্ধটি দুইখণ্ড মস্কো সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ডেও রহিয়াছে।

৯। ষ্ট্যালিনের রচিত "মার্ক্সিজম এণ্ড দি ন্যাশন্যাল এণ্ড কলোনিয়াল কোশ্চান" এই পুস্তক হইতে চীনের উপর রিপোর্ট এবং 'ইউনিভার্সিটি অফ দি পিপলস্ অফ দি ইস্ট-এর নিকট প্রদত্ত বক্তৃতা বিশেষভাবে পড়া দরকার। তাহা ছাড়া ষ্ট্যালিনের লেখা 'চীনের সাম্প্রতিক ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য নামক কালেকটেড ওয়ার্কসে" প্রকাশিত প্রবন্ধও পড়া দরকার। এই প্রবন্ধটির বাংলা অনুবাদ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। 'কমিউনিস্ট' ২য় সংখ্যা (৩য় খণ্ডে) প্রকাশিত কমরেড চেন-পো-তা লিখিত "ষ্ট্যালিন এবং চীন বিপ্লব" নামীয় প্রবন্ধও সঙ্গে সঙ্গে পড়া উচিত। ইহার বাংলা অনুবাদ আছে।

১০। এমিল বার্ণস—মার্ক্সবাদ।

(খ) *আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব রচিত সাহিত্য—*

(১) কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশন্যালের প্রোগ্রাম।

(২) কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশন্যালের ষষ্ঠ কংগ্রেসের উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশ সম্পর্কে থিসিস।

(৩) কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশন্যালের সপ্তম কংগ্রেসে কমরেড ডিমিট্রভের প্রদত্ত রিপোর্ট। সম্মিলিত ফ্রন্টের কৌশল সংক্রান্ত বিষয় বুঝিতে ইহা খুবই সাহায্য করিবে।

(৪) কমরেড ঝদানভের **আন্তর্জার্তিক অবস্থা সম্পর্কে** কমিনফর্মের ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে প্রদত্ত ইতিহাস প্রসিদ্ধ রিপোর্ট।

(৫) কমিনফর্মের হাঙ্গেরী সম্মেলনে প্রদত্ত রিপোর্ট ও প্রস্তাব। বাংলায় অনুবাদ আছে।

(৬) টিটোবাদ সম্পর্কীয় প্রবন্ধাবলী। কমিনফর্ম জার্নালে ও নিউ টাইমসে প্রকাশিত। এ সম্পর্কে কমরেডদের নিজেদেরই লেখাগুলি বাছিয়া লইতে হইবে। পুস্তকাকারে বাংলা ভাষায় কিছু প্রকাশ করা হয় নাই।

(৭) পিকিং ট্রেড ইউনিয়ন কমফারেন্সের রিপোর্ট ও প্রস্তাব। পি.পি.এইচ'-এর প্রকাশিত ইংরাজী রিপোর্ট **"ওয়ার্কিং ক্লাস ইন দি ষ্ট্রাগল ফর ন্যাশান্যাল লিবারেশন"**। ইহার কতকাংশ বাংলায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সঙ্গে ২৭শে জানুয়ারীর কমিনফর্ম সম্পাদকীয় এবং চীনের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে লিখিত কমিনফর্ম জার্নালের সম্পাদকীয় ও ভালভাবে পুনঃপুনঃ পড়া দরকার।

(৮) উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশের মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে সোভিয়েত লেখকদের গুরুত্বপূর্ণ লেখাগুলি অবশ্যই পাঠচক্রের পাঠ্যমালার বা কোর্সের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। এ সম্পর্কে দশখানি বাংলা পুস্তকের একটি করিয়া সেট প্রোসেক্ট সাহিত্য কেন্দ্র হইতে কিনিয়া লইবেন। এই সেটের ভিতর আছে ঃ—

১। **ভি, মাসলেনিকভ**—চীনা জনগণের ঐতিহাসিক জয়, —উপনিবেশের জনতার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বের ভূমিকা।

২। **ভি, বালাবুশেভিচ**—ভারতের জনগণের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে নতুন পর্যায়।

৩। **এ, এম, ডায়াকভ**—ভারতের মুক্তি আন্দোলনের নতুন পর্যায়।

৪। **ই, এম, জুকভের**—লিখিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ক্রমবর্দ্ধমান সংকট সম্পর্কীয় রিপোর্ট।

৫। **এম, এম, ভাকব**—গান্ধীবাদের শ্রেণিরূপ।

(গ) *চীন-বিপ্লব সংক্রান্ত—*

মাও-সে-তুং—চীন বিপ্লবের নীতি ও কৌশল।—চীন বিপ্লব ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টি।—নয়া গণতন্ত্র।—গণরাষ্ট্রের একনায়কত্ব।—বর্তমান অবস্থা ও আমাদের কর্তব্য।

ইয়েন পি.সি.—চীন ভূমি বিপ্লবের কয়েকটি মূল সমস্যা।

আস্টাখায়েভ—চীনের অর্থনৈতিক সমস্যা।

উপরের এই পুস্তকগুলি ছাড়া অন্যান্য অনেক বই আছে যাহা আমাদের পড়া বিশেষ

দরকার। বিশেষ করিয়া "পিপল্‌স চায়না" হইতে চীন পার্টির নেতাদের লিখিত মূল্যবান রিপোর্টগুলি আলোচনা করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে আমরা কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ও রিপোর্ট বাছাই করিয়া একত্রে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিব। কিন্তু ইহার অপেক্ষা না করিয়া উপরিউক্ত পুস্তকগুলির যে কয়টি সম্ভব সংগ্রহ করিয়া এখনি পড়াশুনা এবং আলোচনা আরম্ভ করা যাইতে পারে।

(ঘ) *অর্থনীতি*—

লিয়নটিভের, **"পলিটিক্যাল ইকনমি" 'অর্থনীতির গোড়ার কথা'** এই বাংলা পুস্তকখানা পড়া দরকার।

(ঙ) *সংগঠন সম্পর্কে*—

পি.পি.এইচ. প্রকাশিত **স্টালিন অন পার্টি অর্গানাইজেশন**।

—**কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন**—(ষ্ট্যালিন, কাগোনোভিচ, ডিমিট্রভ, মাও সে-তুং প্রভৃতির লেখার সমষ্টি)

—**কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশন্যালের অর্গানাইজেশনস্ থিসিস**। (ইংরাজী)

—অষ্টাদশ পার্টি কংগ্রেসে কমরেড ঝদানভ প্রদত্ত পার্টি নিয়মাবলীর সংশোধন সম্পর্কীয় রিপোর্ট। বাংলায় কোন অনুবাদ নাই, ইংরাজী অনুবাদ বর্তমানে পাওয়া কঠিন। এই রিপোর্টে পার্টির সাংগঠনিক নিয়মাবলী এবং বিশেষ করিয়া পার্টি সভ্যদের অধিকার ও তাঁহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কি প্রকার হওয়া উচিত সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ এবং আলোচনা আছে। পার্টির অভ্যন্তরীণ জীবনকে সত্যিকার বলশেভিক ধারায় নিয়ন্ত্রিত করিবার পক্ষে এই রিপোর্টের তাৎপর্য ঐতিহাসিক। কমরেডদের এই রিপোর্টখানা সংগ্রহ করিয়া তাহার পূর্ণ ব্যবহার করা একান্ত দরকার।

—ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গঠনতন্ত্র।

(চ) *বিবিধ*—

রজনী পাম দত্ত—আজিকার ভারত। এই প্রামাণ্য পুস্তক হিসাবে সকল কমরেডেরই পড়া উচিত। কারণ ইহাতে ভারতের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা সম্পর্কে অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ বিশ্লেষণ ও আলোচনা রহিয়াছে।

তাহা ছাড়া সোভিয়েত সমাজতন্ত্র সম্পর্কে প্রামাণ্য পুস্তকাদিও সকলেরই পড়া উচিত। এই বিষয়ে অসংখ্য পুস্তক আছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে ভাল জ্ঞান না থাকিলে কখনও মার্ক্সবাদী-লেলিনবাদী রাজনৈতিক চেতনা বাড়িতে পারে না। সোভিয়েত ইউনিয়ন হইল সমাজতন্ত্রের জীবন্ত উদাহরণ। তাই সোভিয়েত সম্পর্কে পড়াশোনা ও জ্ঞানসঞ্চয় প্রতিটি কমরেডের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ।

ইহা ছাড়া মহান ষ্ট্যালিনের জীবনী আমাদের সকলকেই পড়িতে হইবে। এই সম্পর্কে বাংলায় ইয়ারোস্লাভিস্কির রচিত 'জোসেফ স্টালিন' কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত হয়।

আমাদের পার্টির নিজস্ব (কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক) দলিলপত্রের কথা এখানে আর উল্লেখ

করা হইল না। কারণ এইগুলি পড়া এবং আলোচনা আমাদের দৈনন্দিন কাজের মধ্যেই পড়ে।

অনেকগুলি বইয়ের নাম দেওয়া হইল। সবগুলি অল্প সময়ের পাঠচক্রের মারফৎ পড়া স্বভাবতই সম্ভব নয়। তাই আমাদের মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের মূল গ্রন্থাবলীর সঙ্গে সঙ্গেই সমসাময়িক আন্তর্জাতিক আন্দোলনের সংবাদপত্র কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট, প্রবন্ধ ইত্যাদি পড়িতে হইবে। চীনের শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেবার কথা আগেই বলা হইয়াছে। তাই এই পাঠচক্রের পাঠ্যমালা এমনভাবে নির্ধারণ করা দরকার যাহাতে এই তিন বিষয়ের কোন একটি যেন বাদ না পড়িয়া যায়। কিন্তু ষ্ট্যালিনের **সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) ইতিহাস, লেনিনবাদের সমস্যা** এবং **লেনিনবাদের ভিত্তি** এই তিনটি বই বিশেষভাবে পড়িতে হইবে। বর্তমান মতবাদগত সংগ্রামে এই ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলি হইবে আমাদের প্রধান হাতিয়ার।

১ ডিসেম্বর ১৯৫০

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার দাবির উপর ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলুন

মাদ্রাজ হাইকোর্টের সাম্প্রতিক এক রায়ের ফলে সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নামে মাত্র হলেও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে। অবশ্য কার্যত পার্টি সেখানে বে-আইনি; কংগ্রেসী দমননীতি এতটুকু হ্রাস পায়নি।

কিন্তু মাদ্রাজের হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আন্দোলনকে সুযোগ দিচ্ছে। কারণ এই সিদ্ধান্ত কংগ্রেসী শাসক শ্রেণির স্বরূপ তার নিজের আদালতের রায়ের মধ্য দিয়েই প্রকাশ করে দিচ্ছে। মাদ্রাজের হাইকোর্টের রায় পশ্চিমবাংলার পক্ষে বাধ্যতামূলক না হলেও, এর যৌক্তিকতা এবং আন্দোলনের দিক থেকে তার মূল্য এখানে বেশি ছাড়া কম নয়।

দ্বিতীয়ত, সাধারণ নির্বাচন যদিও আবার পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবুও সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে এখন আমাদের বক্তব্যের মধ্যে প্রধান কথা হবে কমিউনিস্ট পার্টিকে এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও দলকে আইনী করার দাবি, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি এবং নাগরিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আমরা বাস্তুহারাদের ভোটাধিকার দাবি করব। পণ্ডিত নেহরু বলেছেন—অবশ্য তাঁবেদারের কথার কোন মূল্য নেই—যে, সাধারণ নির্বাচন "স্বাধীন এবং ন্যায়সঙ্গত" হবে এবং তাতে সকলকেই সমান সুযোগ দেওয়া হবে। এই কথা কাজে পরিণত করার জন্য আমাদের দেশের সর্বত্র ঐক্যবদ্ধভাবে আওয়াজ তুলতে হবে। এই দাবিগুলিকে কার্যত জনসাধারণের দাবিতে পরিণত করতে হবে। তারজন্য চাই ব্যাপক প্রচার-আন্দোলন এবং গণ-সংযোগ। প্রতিটি স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রপ্রিয় পার্টি, দল, প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির নিকট এই দাবিগুলি নিয়ে তার সমর্থন লাভের জন্য অবিরাম চেষ্টা করতে হবে। বামপন্থী দলগুলির সমর্থন লাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে হবে। এখানে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে। একথা তাদের বোঝাতে হবে যে, কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি রাখার পিছনে কংগ্রেসী শাসকশ্রেণীর আসল লক্ষ্য হল শ্রমিক শ্রেণিকে তার অগ্রনী ভূমিকা গ্রহণ করতে দিতে অস্বীকার করা এবং এইভাবে সমগ্র গণতান্ত্রিক আন্দোলনকেই দুর্বল ও পঙ্গু করা। এটা হল ফ্যাসিজিমেরই চিরাচরিত কায়দা। তাই কমিউনিস্ট পার্টির আইনিভাবে কাজ করার অধিকার লাভের জন্য সংগ্রাম আসলে সমগ্র গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষেই একান্তভাবে প্রয়োজন। এখানে আমাদের বর্তমান রণনীতির কথা উল্লেখ

করা দরকার হবে। অর্থাৎ আমরা চাই মুষ্টিমেয় টাটা-বিড়লা এবং রাজা-জমিদারের গোষ্ঠী ছাড়া দেশের সমস্ত শ্রেণি, দল, প্রতিষ্ঠান, গ্রুপ এবং ব্যক্তিকে বিরাট গণফ্রন্টে ঐক্যবদ্ধ করতে। পশ্চিমবাংলার একতার জন্য এই আহ্বানে জনতার নিকট থেকে সাড়া আসবেই। কমিউনিস্ট পার্টিকে ঔপনিবেশিক এবং টাটা বিড়লা ও রাজা-জমিদারদের শোষণে নিপীড়িত সকল শ্রেণির মুখপাত্র এবং বাহক হিসাবেই উপস্থিত করতে হবে। এভাবে উপস্থিত না করতে পারলে পার্টি আইনিকরণের দাবি কখনও শক্তিশালী হতে পারে না।

পার্টিকে বে-আইনি করার পিছনে কলকাতার বিদেশী পুঁজিপতি মালিক সংঘ (বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স), মার্কিন কন্‌সাল ও বিড়লা পরিবারের প্রত্যক্ষ হাত ছিল। এদের কথাতেই পার্টিকে তাড়াতাড়ি বে-আইনি করা হয়। বিধান রায় এবং নলিনী সরকার এদেরই প্রধান বাঙ্গালী অনুচর। বর্তমানে এরাই পার্টিকে আইনি করার পক্ষে প্রধান বাধা। বিধান মন্ত্রীসভা হলো এই সকল মনিবদের হুকুমের চাকর। পশ্চিমবাংলার সরকারি মহলে এই নিকৃষ্টতম বিদেশী এবং দেশী শোষক গোষ্টির প্রাধান্য ও প্রভুত্ব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নিজেদের দলে ভাঙ্গনের পর একেবারে কোণঠাসা হয়ে বিধান রায় প্রফুল্ল সেনের দল বিড়লা এবং বড় বড় পুঁজিপতিদের দুয়ারে সাধারণ নির্বাচনে খরচপত্রের টাকার জন্য ধর্ণা দিতে শুরু করেছে। সাধারণ বাঙ্গালী ব্যবসায়ী মহলের উপরও তাদের আর ভরসা নেই। সুতরাং এই সকল বড় বড় বুর্জোয়া এবং রাজা-জমিদারের দল যে, কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি রাখার জন্য আরও বেশি চাপ দেবার সুযোগ পাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া এখানে ঈঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ ব্যবস্থার জন্য রীতিমত প্রস্তুতি চলছে, এই কারণেই ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধবাজরা একটু বিশেষভাবে তৎপর হবে কি করে পশ্চিমবাংলার কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি রাখা যায়। কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি রাখাকে এই যুদ্ধ চক্রান্ত হতে আলাদা করে দেখা যায় না। এটা পশ্চিমবাংলার অতি বাস্তব সত্য হিসাবেই বিদ্যমান। জনসাধারণের সামনে চক্রান্তের এই দিকটা অতি স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে।

ইতিমধ্যেই নাকি ধনিক শ্রেণির রক্ষিতা কাগজগুলি ঠিক করেছে যে, তারা কমিউনিস্ট পার্টি আইনিকরণের দাবি সমর্থন করবে না।

সুতরাং পার্টিকে আইনিকরণের আন্দোলনকে এক প্রচণ্ড বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু সঠিক কৌশলে এবং ব্যাপকভাবে এই আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলে "সুখী পরিবারের" সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে দেওয়া মোটেই কঠিন নয়। এরজন্য প্রয়োজন বিভিন্ন শ্রেণি ও সমাজের বিভিন্ন অংশের নিজ নিজ আন্দোলনের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির আইনিকরণের দাবিকে জীবন্তভাবে সংযুক্ত করা। যেমন বাস্তুহারাদের আন্দোলনের সঙ্গে পার্টিকে আইনি করার দাবিকে যুক্ত করা যায়। কোন বিশেষ আন্দোলনের প্রোগ্রামে এই দাবি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত না হলেও, আমাদের কমরেডরা অবশ্যই উপযুক্ত শ্লোগান ও কৌশল অবলম্বন করে তাকে প্রচার করতে এবং জনপ্রিয় করে তুলতে পারেন।

তাছাড়া পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্যও গণ-সমাবেশ, সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা, পোষ্টারিং ইত্যাদি ব্যবস্থা পুরো মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে। অবস্থা অনুযায়ী আন্দোলনের সকল কায়দাই প্রয়োগ করে এই দাবিকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিবৃতি এবং গণ দরখাস্তের এখানে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। স্থানীয় এম.এল.এ. এবং

কংগ্রেস সদস্যদের নিকট এই দাবি নিয়ে উপস্থিত হতে হবে।

সম্প্রতি কয়েকটি উপনির্বাচন হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এই উপলক্ষ্যেও কমিউনিস্ট পার্টিকে তার আইনিভাবে কাজ করার অধিকার ফিরিয়ে দেবার জন্য আওয়াজ তুলতে হবে। কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি রেখে কোন নির্বাচনই বিন্দুমাত্র গণতন্ত্র সম্মত হতে পারে না বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায়, যেখানে কমিউনিস্ট পার্টি একটি প্রধান রাজনৈতিক দল। এখানে মনে রাখা দরকার যে, এমনকি ১৯৪৬ সালের অতি সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাতেও গোটা বংলায় কমিউনিস্ট পার্টি একমাত্র কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের পরই সর্বাধিক ভোট পায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার ভোট। আজ কংগ্রেস ১৯৪৬ সালের যুগের মর্যাদা ও গণসমর্থন হারিয়েছে, মুসলিম লীগের অস্তিত্ব এখানে নাই।

মোট কথা, দেশের প্রতিটি সমস্যার উপর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিকে আইনি করার দাবিকে আজ যুক্ত করতে হবে। একাজ আমরা মোটেই করিনি।

একই সঙ্গে ও একইভাবে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনকে ব্যাপক ও শক্তিশালী করতে হবে। জানা গেল, নেহরু সরকার নিবর্তনমূলক আইন পাকা করবার ব্যবস্থা করেছেন। তাতে এই আইনকে একটা স্থায়ী আইনে পরিণত করা হবে।

একটানা তিন বৎসর পর্যন্ত বিনা বিচারে আটক রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে। এর প্রতিবাদে সর্বত্র আওয়াজ তুলতে হবে। নিবর্তনমূলক আইনের মেয়াদ বাড়ানো চলবে না, এই দাবির পিছনে ব্যাপকভাবে গণমত সংগঠিত করতে আর একদিনও দেরি করা চলে না।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন, নওজোয়ান সভা, কৃষক সভা, পিপলস্ রিলিফ কমিটি প্রভৃতি অন্যান্য বে-আইনি গণ প্রতিষ্ঠানের উপর থেকেও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি অবশ্যই করতে হবে। এই সকল আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট কমরেডরা সাধারণভাবে ছাড়াও নিজ নিজ আন্দোলনের ক্ষেত্রে আবার গণ-সংযোগ স্থাপন করে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিকে জোরালো করে তুলুন। যেমন ছাত্র ফেডারেশনকে আইনি করার জন্য শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে বিশেষভাবে আন্দোলন করা দরকার।

স্থানীয় ইউনিট এবং কমরেডদের ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপরই এই আন্দোলনেব সাফল্য নির্ভর করছে। এখনি বড় বড় গণ-সমাবেশ সকল জায়গায় হয়ত সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে আন্দোলন করার সুযোগ সর্বত্রই রয়েছে।

কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য গণ প্রতিষ্ঠানকে আইনি করা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি এবং নাগরিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলন আজকের দিনে আমাদের একটি প্রধান কর্তব্য।

৫ ডিসেম্বর ১৯৫০

বিপ্লবী অভিনন্দনসহ
পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

দ্বিতীয় অধ্যায়

কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে মতপার্থক্য দূর করার জন্য উদ্যোগ

কেন্দ্রীয় উদ্যোগ

পার্টির অভ্যন্তরে মতপার্থক্যের দুটি ঝোঁক বিদ্যমান ছিল। একটি হল 'থ্রি পি লাইন'-এর দলিল, অপরটি হল অন্ধ্র কমরেড বা নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির লাইন। শেষ পর্যন্ত ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল একটি সভা, যেখান থেকে পুরোনো কেন্দ্রীয় কমিটি ভেঙে দিয়ে ১৩ জনকে নিয়ে একটা যুক্ত কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হল। এতে পশ্চিমবঙ্গের ৩ জন ছিলেন—মুজফ্ফর আহ্মদ, রণেন সেন ও মণি সিংহ (?)। সোমনাথ লাহিড়ির না থাকার কারণ হল তিনি আগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে থাকাকালীন সেখান থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। জ্যোতি বসু ও রণেন সেন পুরোনো কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। উভয়েই নতুন কমিটিতে থাকার ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। জ্যোতি বসুর ব্যাখ্যাতে সন্তুষ্ট হয়ে, তাঁকে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটিতে রাখা হয়নি এবং রণেন সেনকে অনুরোধ করে রাখা হয়েছিল।

মতপার্থক্যের বহু জায়গায় মীমাংসিত করে নেওয়া হল, আবার অনেক জায়গায় অমীমাংসিত থেকে গেল। এগুলি হল : (১) ভারতের স্বাধীনতার মূল্যায়ন; (২) ভারতে বিপ্লবের স্তর; (৩) ভারতে বিপ্লবের পথ—রাশিয়া অথবা চীনের পথ। এর মধ্যে প্রথম দু'টি হল রণনীতি ও কর্মসূচি সংক্রান্ত এবং তৃতীয়টি হল রণকৌশল সংক্রান্ত।

মতপার্থক্য নিরসনের এই সব প্রক্রিয়া যখন চলছে, পার্টির অভ্যন্তরে যখন বামপন্থী হঠকারী লাইন পরিত্যাগের আলাপ আলোচনা চলছে সেসময় পশ্চিমবঙ্গ পার্টি ১৯৫১ সালে ৫ জানুয়ারি আইনি চরিত্র ধারণ করে। পার্টির নতুন যুক্ত কমিটি সব বিষয়ে মতপার্থক্য দূর করার জন্য একটি কমিশন তৈরি করেছিল। চারজনকে নিয়ে হয়েছিল এই কমিশন। এঁরা হলেন অন্ধ্র লাইনের দু'জন—রাজেশ্বর রাও ও বাসবপুন্নিয়া এবং প্রাক্-দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কমিটির দু'জন—অজয় ঘোষ ও ডাঙ্গে। কমিশনের সদস্যরা মনে করেছিলেন যে কেবলমাত্র কমিনফর্মের উদ্যোগেই এই মতপার্থক্য দূর হতে পারে। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে সোভিয়েত কমিউনিস্ট নেতৃবর্গের সঙ্গে, বিশেষ করে স্ট্যালিনের সঙ্গে, আলোচনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্যরা মস্কো গেলেন। স্ট্যালিনের চিন্তাধারার মধ্যে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণির চরিত্র মূল্যায়নে

একসময়ে সংকীর্ণতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেও, সেদিন কিন্তু তিনি ভারতের প্রতিনিধিদলকে সঠিক পরামর্শ দিয়েছিলেন। পার্টির সংকীর্ণতাবাদী হঠকারী লাইনের বিরুদ্ধে যারপরনাই সমালোচনা করেছিলেন। সমালোচনা করেছিলেন সশস্ত্র আন্দোলনের বিষয়টিকে। ষ্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিষয়টি অজয় ঘোষ কয়েকজনকে জানিয়েছিলেন, যার মধ্যে রণেন সেনও ছিলেন।[১]

ভারতের পার্টি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সোভিয়েত পার্টি প্রতিনিধিদলের আলোচনাকালে ষ্ট্যালিন ছাড়াও ছিলেন মলোটভ, সুসলভ ও ম্যালেনকভ্। এই সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে দু'টি দলিল তৈরি হয়েছিল। একটি হল খসড়া কর্মসূচি এবং অন্যটি হল রণকৌশল। আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে উভয় দলিলই ভারতের প্রতিনিধি দলের সদস্যরাই তৈরি করেছিলেন। সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ তা অনুমোদনও করেন। কর্মসূচিটি প্রথমে 'লাষ্টিং পীস'-এ ছাপা হয় এবং তা সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা 'প্রাভদা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। খসড়া কর্মসূচিটি ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে সি পি আই-এর পলিটব্যুরো সভায় গৃহীত হয়েছিল।[২] অন্যটি 'রণকৌশল' (Tactical Line) শিরোনামে একটি খসড়া তৈরি হয়েছিল।[৩]

খসড়া কর্মসূচীর পর পি.ও.সি'র কার্যকলাপ

১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে খসড়া কর্মসূচি এবং রণকৌশলগত লাইন এর মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের পার্টি আবার ঘুরে দাঁড়াতে আরম্ভ করল। 'রণকৌশল'টিকে কলকাতা সম্মেলনের পর পলিসি স্টেটমেন্ট বা পার্টির নীতি সংক্রান্ত বিবৃতি বা পার্টির কর্মনীতি হিসাবে আইনি রূপ দেওয়া হয়েছিল।[৪]

পি.ও.সি. এব্যাপারে এই দুই দলিলের ওপর ব্যাপকভাবে আলোচনা করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। প্রথমত, পশ্চিমবঙ্গের পি.ও.সি. ইতিপূর্বেই পার্টি সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য এবং আসন্ন নির্বাচনের জন্য প্রকাশ্যভাবে প্রাদেশিক কেন্দ্র গড়ে তোলার এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এর জন্য বিভিন্ন জেলা পার্টি ও ইউনিটগুলিকে নিয়ে ১৯৫১ সালের ৮-৯ মে তারিখের এক অধিবেশন থেকে একটি প্রকাশ্য প্রাদেশিক কেন্দ্র তৈরি হয়েছিল। এর সদস্যরা ছিলেন ঃ বঙ্কিম মুখার্জি, জ্যোতি বসু, মুজফ্ফর আহ্মদ, মণিকুন্তলা সেন, জলিমোহন কল, প্রমোদ দাশগুপ্ত, প্রমথ ভৌমিক ও নন্দলাল বসু।[৫]

দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গ পার্টি যে ঘুরে দাঁড়াতে আরম্ভ করেছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল কয়েক জায়গায় জেলা বোর্ড নির্বাচনে পার্টির জয়লাভে। বলা যেতে পারে যে, নতুন কর্মসূচির একটা প্রভাব জনগণের ওপর পড়েছিল। ফলে বামপন্থীরা এইসব জায়গায় বিপুল সাফল্য পেয়েছিল। যেমন ঃ বর্ধমান, চন্দননগর প্রভৃতি জায়গায় জেলা বোর্ড নির্বাচন এবং এই সময়ের আগে হাওড়ার মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন। মানুষ বুঝতে পারছিল যে কংগ্রেসকে পরাজিত করতে পারে একমাত্র কমিউনিস্টরাই। তাই তাঁরা প্রতিটি নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীর ওপর আস্থা স্থাপন করেছিল। যেমন ঃ ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে হাওড়ার পৌরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীরা ১৬-১৪ ভোটে হেরেছিলেন। এঁরা হলেন বঙ্কিম কর এবং রবীন্দ্রনাথ সিংহ। এঁদেরকে পরাজিত করেছিলেন ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ ব্লকের প্রার্থী কার্তিক চন্দ্র দত্ত ও শংকরলাল মুখোপাধ্যায়।[৬] ঐ একই

সময়ে চন্দননগর জেলা পরিষদ নির্বাচনে ২৫টি আসনের সবকটিতেই সংযুক্ত প্রগতিশীল ফ্রন্টের প্রার্থীরা জয়লাভ করেছিলেন। একথা প্রথম অধ্যায়েই উল্লেখ করা হয়েছিল।

এইসব নির্বাচনের আগে থেকেই কংগ্রেসের ওপর মানুষের মোহমুক্তি ঘটে চলছিল। বিভিন্ন রাজ্যে দেখা দিচ্ছিল কংগ্রেসের ভাঙন। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠিত নেতারা কংগ্রেস থকে বেরিয়ে এসেছিলেন। এঁরাও কংগ্রেস বিরোধিতায় নামলেন। পশ্চিমবঙ্গেও কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙন এসেছিল। যাঁরা বেরিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা হলেন অমরকৃষ্ণ ঘোষ, বিমল কুমার ঘোষ, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রতাপচন্দ্র গুহরায়, ফকিরচন্দ্র রায়, অরুণ ব্যানার্জী প্রমুখ।[৭]

তৃতীয়ত, প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি পার্টির সমস্ত ইউনিটকে অবগত করালো যে অবিলম্বে জেলা ও প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এই সার্কুলার মারফৎ পি.ও.সি. বিভিন্ন সম্মেলন সম্পর্কে কতকগুলি নির্দেশ দিয়েছিল। তবে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ছিল "জেলা সম্মেলনের পূর্ব পি.ও.সি'র প্রতিনিধি সমস্ত জেলা কমিটিগুলির নিকট উপস্থিত হইয়া 'খসড়া প্রোগ্রাম' ও 'খসড়া কর্মনীতি' সম্পর্কে প্রশ্নগুলি আলোচনা করিবেন। সম্ভব হইলে কোন কোন স্থানে তাঁহারা ডি.ও.সি'র অন্তর্ভুক্ত স্থানীয় কমিটিতেও আলোচনার জন্য উপস্থিত হইতে চেষ্টা করিবেন। জেলা সম্মেলনের সময়েও পি.ও.সি'র প্রতিনিধি জেলা সম্মেলনে উপস্থিত থাকিতে চেষ্টা করিবেন।" আবার ঐ সার্কুলারেই এই আশাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে এই সম্মেলনগুলি "পার্টিতে পরিপূর্ণ একতা প্রতিষ্ঠার পথে একটি বড় রকমের কাজ করিবে। অবশ্য এই একতা নির্ভর করিবে খসড়া কর্মসূচি ও খসড়া কর্মনীতিতে যে কর্মধারা নেওয়া হইতেছে সেই সম্বন্ধে আমরা কত গভীরভাবে আলোচনা করিয়াছি এবং কত গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছি তাহার উপরে।"[৮]

চতুর্থত, দলিল দু'টি আলোচনার জন্য প্রাদেশিক পার্টি সমস্ত ইউনিটের সভ্যদের নিকট এক আবেদন জানিয়েছিল। এই আবেদন পি.ও.সি. কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রাদেশিক পার্টি আলোচনা'য়। এতে আরও কয়েকটি আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন ঃ শান্তি আন্দোলনের সমস্যা ও পার্টি সম্পর্কে মুর্শিদাবাদ ডি.ও.সি, বিশ্বশান্তি ও নেহরুর ভূমিকা সম্পর্কে প্রাদেশিক মহিলা সেল, যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কে রেড ষ্টার ইউনিটের শরৎ এবং শান্তি আন্দোলন ও জওহরলাল সম্পর্কে রঞ্জিত (হয়ত কারও টেক্ নাম) এই আলোচনাগুলি ছিল।[৯]

সংগঠনী কমিটির নতুন সম্পাদক

রণেন সেন গ্রেপ্তার হওয়ার পর, সংগঠনী কমিটির নতুন সম্পাদক হয়েছিলেন মুজফ্ফর আহ্মদ।

মুজফ্ফর আহ্মদ পার্টির বেআইনি হয়ে যাওয়ার পরেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালের ২৬শে মার্চ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এই সময় বহু নেতা ও কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। সংখ্যায় প্রায় ৬০০ জন। মুজফ্ফর আহ্মদ প্রথমে দমদম জেলে, পরে প্রেসিডেন্সী জেলে ছিলেন। ১৯৪৮ সালের ৬ই অক্টোবর তিনি ছাড়া পান। আবার ৪ দিন পর গ্রেপ্তার হন। জেলে বন্দী অবস্থায় তিনি নিয়মিতভাবে পার্টি ক্লাসের উদ্যোগ নিতেন। সেসময় রাজনৈতিক বন্দীরা বিভিন্ন দাবি নিয়ে অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। দাবিগুলি ছিল ঃ রাজনৈতিক বন্দীদের সাধারণ কয়েদীদের মতন রাখা চলবে না, বিভিন্ন জেলে (দমদম, আলিপুর, প্রেসিডেন্সী, হুগলী,

মেদিনীপুর, ডায়মণ্ডহারবার) রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর অকথ্য নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, পার্টির বেআইনি কালে যাদেরকে বন্দী করা হয়েছিল, তাঁরা সকলেই জেলে ছিলেন বিনা বিচারে। কলকাতা হাইকোর্টের অর্ডারে ১৯৫১ সালের জানুয়ারি মাসে পশ্চিমবাংলার পার্টি আইনি হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায় এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার ব্যাপারে গড়িমসি করতে শুরু করে দিলেন। বলা হতে থাকল যে সুপ্রিম কোর্ট সিদ্ধান্ত না করলে, তাকে কার্যকরী করা যাবে না। তবে শেষপর্যন্ত সরকারকে হাইকোর্টের রায় মেনে নিতে হল। তবে নির্বাচনের পূর্বে অন্যান্য অঞ্চলের কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করা হবে না বলে নেহরুজী মত প্রকাশ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নীতির অপূর্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন।[১০] পরে, সুপ্রীম কোর্ট সর্বভারতীয় ভাবে পার্টির আইনি চরিত্রদান করেছিল।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ বাদে সকলেই ছাড়া পান। তাঁকে দমদম জেল থেকে দিল্লী সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। সরকার ১৯৫১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের বিরুদ্ধে লিখিতভাবে যেসব অভিযোগ করেছিল, সেগুলি হল : (ক) কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় পদে সাংগঠনিকভাবে দায়িত্বপূর্ণ কাজ করা; (খ) পি. সি. যোশীর কাছ থেকে আসন্ন বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ পাওয়া; (গ) সি পি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হওয়া এবং দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য হওয়া। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ এই সব অভিযোগকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন।[১১] তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন ১৯৫১ সালের ১লা মে তারিখে যারপরই তিনি সংগঠনী কমিটির সম্পাদক হয়েছিলেন।

পার্টি আইনি হওয়ার পরে স্বল্প সময়ের প্রস্তুতিতে এক জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল কলকাতার মনুমেন্ট ময়দানে (বর্তমানে শহীদ মিনার)। প্রায় দশ হাজার মানুষ জমায়েত হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিকে স্বাগত জানিয়েছিল। বিভিন্ন দল ও গণসংগঠনের পক্ষ থেকে পার্টিকে অভিনন্দন জানানো হল। এই সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন জ্যোতি বসু এবং রক্ত পতাকা উত্তোলন করেছিলেন রতনলাল ব্রাহ্মণ। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ডেমোক্রেটিক ভ্যানগার্ডের জীবন চ্যাটার্জী, ফরওয়ার্ড ব্লকের সত্যপ্রিয় ব্যানার্জী, সিভিল লিবার্টিজ অ্যাসোসিয়েশনের প্রমোদ সেনগুপ্ত।

নবপর্যায়ে 'স্বাধীনতা'

নবপর্যায়ে 'স্বাধীনতা' প্রকাশের পূর্বে কংগ্রেসের শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গে সংবাদপত্র এবং প্রেসের ওপর নির্বিচার আক্রমণ চলেছিল। বিগত ৩ বছরে শাসনকালে ৪০টিরও বেশি পত্রপত্রিকা সরকারের রোষানলে পড়েছিল। সরকারের কোন নীতির বিরুদ্ধে লেখনী ধরেছে এমন সকল পত্রিকা এবং বিভিন্ন গণসংগঠনের মুখপত্রের কণ্ঠরুদ্ধ করা হয়েছিল।[১২]

কমিউনিস্ট পার্টির আইনি মর্যাদা প্রাপ্তির পরই শুরু হয়ে গেল নবপর্যায়ে 'স্বাধীনতা' পত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা। জেলের বাইরে রয়েছেন এবং জেল থেকে সদ্য ছাড়া পেয়েছেন এমন কমরেডরাই আগ্রহ প্রকাশ করলেন। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত, অধীর চক্রবর্তী, জ্যোতি দাশগুপ্ত প্রমুখ। এই পত্রিকা প্রকাশ করার জন্য ১৯৯ নং পার্ক স্ট্রীটের ইস্ট অ্যাণ্ড প্রেস ঠিক করা হল। এই প্রেসটির মালিক ছিলেন কংগ্রেস নেতা জে. সি. গুপ্ত।

এখান থেকে ছাপা হত 'ইত্তেহাদ' নামে একটি কাগজ, যা দেশভাগের পর চলে যায় পূর্ব পাকিস্তানে।

নবপর্যায়ে 'স্বাধীনতা' প্রকাশের জন্য সম্পাদকমণ্ডলী তৈরি হল। কমিউনিস্ট সাংবাদিকতার অন্যতম পথিকৃৎ সোমনাথ লাহিড়ীর পরিবর্তে সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হলেন জ্যোতি বসু। অন্যান্য সদস্যরা হলেন গোপাল হালদার, অধীর চক্রবর্তী, নন্দ বসু, বিভূতি গুহ, জ্যোতি দাশগুপ্ত ও জ্যোতির্ময় নন্দী।[১৩] এখন কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকায় সম্পাদক যে ভূমিকা পালন করে থাকেন, সেযুগে এই ভূমিকা পালন করতেন সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি। 'স্বাধীনতা' পত্রিকা বেআইনি হওয়ার পূর্বে যেমন সম্পাদক হিসাবে ছিলেন বমণীমোহন সরকার, কিন্তু পত্রিকার অধিকাংশ সম্পাদকীয় লিখতেন সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি সোমনাথ লাহিড়ী।

নবপর্যায়ে 'স্বাধীনতা' প্রকাশের পূর্বে ২৬শে জানুয়ারি একটি বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছিল। এতে 'স্বাধীনতা' পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলীর তরফ থেকে জনসাধারণের কাছে সাহায্যের জন্য এক আবেদন করা হয়েছিল।[১৪]

নবপর্যায়ে 'স্বাধীনতা' বেরোতে আরম্ভ করল ১৯৫১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী থেকে। এই সংখ্যার শিরোনামে সম্পাদক হিসাবে নাম ছিল সন্তোষকুমার চ্যাটার্জী এবং সভাপতি হিসাবে জ্যোতি বসুর নাম। প্রথম সংখ্যায় লেখা হল ঃ নবপর্যায় ১ম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা)। প্রথম সংখ্যায় 'সরকার বিরোধী যুক্তফ্রন্টের ডাক' প্রসঙ্গে আইনসভাব কমিউনিস্ট সদস্য জ্যোতি বসু ও রতনলাল ব্রাহ্মণের একটি বিবৃতি ছাপা হয়েছিল। এটি ছিল বাজেট অধিবেশনের প্রাক্কালে দেওয়া যুক্তফ্রন্ট গঠনের একটি প্রস্তাব।[১৫]

নবপর্যায়ে 'স্বাধীনতা' পত্রিকার প্রকাশ উপলক্ষে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ১১ই মার্চ এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে দশ সহস্রাধিক নরনারীর অংশগ্রহণ ছিল। সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন ইউ টি ইউ সি'র সাধারণ সম্পাদক মৃণালকান্তি বসু। তিনি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন যে "জনসাধারণের মধ্যে 'স্বাধীনতা' জনপ্রিয় ছিল এইজন্য যে উহা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন দুঃখ, দুর্দশা, আশা-আকাঙ্ক্ষার সংবাদ পরিবেশন করিত। শোষণ, অত্যাচার আর অবিচারের বিরুদ্ধে 'স্বাধীনতা' সংগ্রামের নেতৃত্ব দিত।...সরকারি রোষে 'স্বাধীনতা' সর্বস্ব হারায়, কিন্তু হারায় নাই তার নির্ভীক আত্মা। সেই আত্মা আজ পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আজও তাহার পাথেয় সাধারণ শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তের সমর্থন ও সহানুভূতি।" অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়েছিলেন পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি জ্যোতি বসু।

নবপর্যায়ে 'স্বাধীনতা' প্রকাশের পথ মসৃণ ছিল না। সরকারের তরফ থেকে ক্রমাগত নির্যাতন, পত্রিকা প্রকাশের চরম অর্থসংকট এবং নিত্যনতুন লোকের সাহায্য নেওয়ার ফলে অনভিজ্ঞতার ত্রুটি-বিচ্যুতি সবটা মিলিয়েই ছিল সীমাবদ্ধতার গণ্ডী। এর মধ্যে অর্থ সংকট এমন একটা কারণ যার ওপরেই নির্ভর করছে পত্রিকার অস্তিত্ব। সেজন্য অর্থের জন্য 'স্বাধীনতা' তহবিল পূর্ণ করার আবেদন থাকত। এরকম দু'টি আবেদন এখানে আমরা উল্লেখ করছি। একটি হল ১৯৫১ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারিতে 'স্বাধীনতা'র সম্পাদকমণ্ডলীর বিজ্ঞপ্তি এবং অন্যটি হল ৩০শে মার্চের পার্টির প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটির আবেদন।[১৬] এছাড়াও ১০ই এপ্রিল 'স্বাধীনতা' তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ দিবস ধার্য হয়েছিল। সেদিন পশ্চিমবঙ্গের

কমিউনিস্টদের পাশাপাশি অনেক কংগ্রেস সদস্য এগিয়ে এসেছিলেন সাহায্য দেওয়ার জন্য। দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটির সদস্য সুশীল চক্রবর্তী 'স্বাধীনতা তহবিলে' সাহায্য দিয়ে লিখেছিলেন "স্বাধীনতা'র নীতিতে যথেষ্ট আস্থাশীল না হইলেও আমি বিশ্বাস করি, জনগণের স্বার্থে এবং কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের বিরুদ্ধে ইহার প্রয়োজন বর্তমানে অনস্বীকার্য। আমার সামান্য সাহায্য ইহার দীর্ঘজীবন লাভে কোনরূপ সহায়তা করিলে সুখী হইব।"[১৭] এরই পাশাপাশি আবার কংগ্রেসী গুণ্ডাদের তরফ থেকে 'স্বাধীনতা' পত্রিকা পুড়িয়ে ফেলারও ঘটনা ঘটেছিল। যেমন "১৩ই মে সকালে কলিকাতার হাজরা রোডের মোড়ে যখন 'স্বাধীনতা' পত্রিকা বিলি হইতেছিল তখন ১৫/১৬ জন কংগ্রেসী গুণ্ডা হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হয় এবং 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সমস্ত কপি (৫৫০ খানা) ছিনাইয়া লইয়া পুড়াইয়া ফেলে।"[১৮]

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চম রাজ্য সম্মেলনের পূর্বে এবং দেশব্যাপী আসন্ন নির্বাচনের পটভূমিতে 'স্বাধীনতা'র গুরুত্ব সমধিক হওয়া সত্ত্বেও সেটি আর্থিক সংকটে জেরবার হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থায় প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি 'স্বাধীনতা'র চরম সংকট সম্পর্কে ১৯৫১ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর একটি বক্তব্য 'স্বাধীনতা'ব পাতায় প্রকাশিত হয়েছিল।[১৯] এই অবস্থার মধ্যেও কমিউনিস্ট পার্টির বৈধতা প্রাপ্তির পর 'স্বাধীনতা' এক প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছিল। এব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ (ক) সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে; (খ) দেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐতিহ্য রক্ষায় সম্মিলিত গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের উদ্যোগ; (গ) অন্ন, বস্ত্র, জমি ও চাকুরির জন্য সংগ্রামের খবর পরিবেশনে এবং (ঘ) ন্যায় ও সত্যের পক্ষে এবং অন্যায়, মিথ্যা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে। 'স্বাধীনতা' পত্রিকার পুনঃপ্রকাশে পশ্চিবঙ্গের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছিলেন। যেমন ঃ হেমন্ত বসু, অমর বসু, নেপাল ভট্টাচার্য, অবিনাশ চন্দ্র দাস, প্রদ্যোত ঘোষ প্রমুখ। বক্সা জেলের বন্দীরা এবং গিরনী কামগড় ইউনিয়নের শ্রমিকেরাও 'স্বাধীনতা'র পুনঃপ্রকাশে অভিনন্দন জানিয়েছিল।

কেন্দ্রীয় সরকারের চরিত্র ও কার্যকলাপের প্রতি কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি

সি পি আই আইনি হওয়ার পর রাজনৈতিক প্রচার ভঙ্গিমায় একটা পরিবর্তন এসেছিল। সভা-মিছিলে অনর্থক উত্তেজনাকর শ্লোগান বা বক্তৃতা পরিহারের ওপর জোর দিয়েছিল। তাই বলে তাঁরা সরকারের জনস্বার্থবিরোধী নীতি ও কাজের নিন্দা ও সমালোচনা করা থেকে কখনই বিরত থাকেনি। এই মর্মে সব জেলাতেই পি.ও.সি'র তরফ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।[২০] পার্টি মনে করত তখনও পর্যন্ত ভারতের ওপর ঔপনিবেশিক দাসত্ব বিদ্যমান। কংগ্রেস নেতারা স্বাধীনতা দিবসের প্রতিটি সংকল্পের প্রতি যেহেতু চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সেই কারণে পি.ও.সি. সমস্ত ইউনিট ও সভ্যদের কাছে আবেদন জানিয়েছিল—২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ঐক্য ও শান্তি দিবস হিসাবে পালন করার জন্য।[২১]

সেসময় নিবর্তনমূলক আটক আইন চালু ছিল। এরই বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য পার্টি সমস্ত ইউনিটকে নির্দেশ দিয়েছিল।[২২] ভারতের পার্লামেন্টে 'বিনা বিচারে নিবর্তনমূলক আটক রাখার আইন'টি যাতে আরও এক বছর চালু রাখা যায়। উদ্দেশ্য ছিল যে আসন্ন নির্বাচনে যাতে কংগ্রেসকে এই আইনের বলে বিজয়ী হতে সাহায্য করে। এর বিরুদ্ধে

কমিউনিস্ট পার্টি নিম্নলিখিত দাবি তুলেছিল ঃ (ক) নিবর্তনমূলক আটক (সংশোধনী) বিল প্রত্যাহার, (খ) বিনা বিচারে আটক প্রথা রদ; (গ) কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা (অন্য রাজ্যে যেখানে পার্টি বেআইনি ছিল—সম্পাদক) প্রত্যাহার; (ঘ) পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা; (ঙ) কমিউনিস্ট পার্টিকে আইনি ধরনের কাজ এবং নির্বাচনে যোগদান করার ক্ষেত্রে কোনরকম বাধা না দেওয়া; (চ) ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে শান্তিসৈনিকদিগকে জনজমায়েতের অধিকার দান।[২৩]

এছাড়াও কমিউনিস্ট পার্টি দাবি তুলেছিল—তেলেঙ্গানা কৃষকদের ফাঁসি মুকুব করা হোক। এই একই দাবি তুলেছিল বি পি টি ইউ সি। এব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভা একটি আবেদন পত্র প্রচার করেছিল।[২৪] কমিউনিস্ট পার্টি মৌলিক অধিকারের ওপর সরকারি হামলা ব্যর্থ করার আহ্বান জানিয়েছিল। 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল "ধ্বংসের পথে কংগ্রেস"।[২৫] পশ্চিমবঙ্গে দেখা দিল দারুণ বস্ত্র সংকট। পার্টি শিল্পাঞ্চলের সমস্ত ইউনিটকে নির্দেশ দিয়েছিল যাতে তারা দাবি তোলে "কোম্পানী কাপড়ের দোকান খুলুক ও সস্তায় কাপড় দিক"।[২৬]

দেশের সংবিধান চালু হওয়ার প্রায় ১৬ মাস পর সাধারণ নির্বাচন আসন্ন এই কারণে ভারত সরকার সংবিধানে লিপিবদ্ধ মৌলিক অধিকার সংকোচনের জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে। এর জন্য ১১ই মে ভারতীয় পার্লামেন্টে শাসনতন্ত্রের ওপর সংশোধনী বিল আনা হয়। এর বিষয়বস্তুতে ছিল বাক্-স্বাধীনতা, বিভিন্ন জীবিকা, ব্যবসায়ের অধিকার খর্ব করা এবং কোন কোন প্রদেশের বিভিন্ন জমিদারি উচ্ছেদ বিল এবং জমিদারি সম্পর্কিত আইনগুলিকে রক্ষা করা। বহু রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে, এমনকি রক্ষণশীল প্রতিষ্ঠান ও সংবাদপত্রের তরফ থেকে এই ধরনের সংশোধন প্রস্তাবের প্রতিবাদ করা হয়েছিল। যেমন ঃ পশ্চিমবঙ্গ ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির সভাপতি অতুল চন্দ্র গুপ্ত, সুপ্রীম কোর্টের বাব অ্যাসোসিয়েশন, নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের কোন কোন শাখা, কলকাতা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন, দিল্লী ও কলকাতার বিশিষ্ট আইনজীবী, বিভিন্ন পত্রিকার মতামত, দিল্লীর বার্তাজীবী সংঘের প্রস্তাব, এ আই টি ইউ সি'র সহসভাপতি এস. এস. মিরাজকর ও ইউ টি ইউ সি'র সাধারণ সম্পাদক মৃণালকান্তি বসুর যুক্ত বিবৃতি।[২৭] সকলেই একমত যে এই সংশোধনী কার্যকরী হইলে বাক্ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা লুপ্ত হবে।

শেষ পর্যন্ত শাসনতন্ত্রে সংশোধনটি গৃহীত হওয়ার পর, অন্যান্য সংবাদপত্রের সঙ্গে ১২ই জুলাই 'স্বাধীনতা' পত্রিকাও তার প্রকাশ বন্ধ রেখেছিল।

মহিলা আন্দোলন

এই পর্বে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি বেআইনি ছিল। তবু আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের একটা আবহাওয়া অতীতে তারাই তৈরি করেছিল। তাই বিশিষ্ট মহিলাদের সভার আহ্বায়কদের মধ্যে ৮ই মার্চ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সভার আহ্বায়কদের মধ্যে যারা স্বাক্ষর দিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন, রাধারাণী দেবী, অঞ্জলী সরকার, শোভা হুই, সুনন্দা দেবী, বাণী রায়, চন্দ্রাদেবী, আশাপূর্ণা দেবী, সুষমা সেনগুপ্তা (প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, লেক গার্লস স্কুল), লতিকা গুপ্তা (প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, গার্লস একাডেমী), ইন্দিরা

দেবী, লীলা মজুমদার, সুধা কর, অন্নপূর্ণা গোস্বামী, সাবিত্রী রায়, মীরা রায় চৌধুরী, ভানু দেবী, দীপ্তি রায়, প্রণতি দে (প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, কমলা গার্লস স্কুল), মঞ্জুশ্রী দেবী, মনোরমা দেবী (গণতান্ত্রিক নারী সংঘ), সুরূপা ভট্টাচার্য, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, বেলা মিত্র (কমাণ্ডার ঝান্সী সেবিকা বাহিনী), আশা দেবী, সুধা রায়, লীলা রায় (মিসেস এ. এস. রায়), গীতা মল্লিক, উষা দাশগুপ্ত, জ্যোতির্ময় সরকার প্রমুখ। এই সভায় বাংলার প্রবীণা মহিলা নেত্রী মোহিনী দেবী বাংলার নারী-সমাজকে বিশ্বশান্তির লড়াইয়ে সামিল হওয়ার আবেদন জানান—"কল্যাণময়ী, শক্তিরূপিণী তোমরা আমাদের সেই শক্তিকে জাগ্রত করে আর এক মহাযুদ্ধের সর্বনাশা চক্রান্তকে রুখবার জন্য এগিয়ে এস"।[২৮]

১৯৫১ সালের ১১ই মে পশ্চিমবঙ্গ আত্মরক্ষা সমিতিকে কলকাতা হাইকোর্ট বৈধ ঘোষণা করে। সমিতির লীলা মজুমদার, মঞ্জুশ্রী দেবী, গীতা মল্লিক, অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা হুই, আর্যবালা দেবী, ইলা বসু, গীতা মুখোপাধ্যায়, অশ্রু দাস এক বিবৃতিতে মেয়েদের এক সমিতির মধ্যে সংগঠিত হবার জন্য আহ্বান জানান।[২৯]

পশ্চিমবাংলার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নিকট বিশ্বগণতান্ত্রিক নারী সংঘ ভারত ও পাকিস্তানে শিশু সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য মূল্যবান পরামর্শসহ এক চিঠি দিয়েছিল। এতে বলা হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারীদের বিধানেই ভারত ও পাকিস্তানে শিশুমেধ যজ্ঞ ঘটে চলেছে। শিশুদের শত্রুই হল যুদ্ধ, নিরক্ষরতা, পুষ্টিহীনতা ও কুশিক্ষা।[৩০]

এখানে আমরা বাস্তুহারা মানুষের ওপর সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির একটা দিকের কথা উল্লেখ করতে চাই। ছিন্নমূল মানুষেরা এপার বাংলায় এসে যেসব কলোনী স্থাপন করেছিল, সেগুলি তুলে দেওয়ার জন্য ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের বাজেট সেসনে নতুন আইন প্রণয়নে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্যোগী হয়েছিল। এরই বিরুদ্ধে বাস্তুহারা মানুষেরা যাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করতে পারে, তারই জন্য বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি তাদের আন্দোলনকে পশ্চিমবঙ্গে র গণতান্ত্রিক শিবিরের প্রত্যেকটি অংশের সঙ্গে মেলানোর চেষ্টা করেছিল, যাতে তারা সক্রিয় সহযোগিতা ও সমর্থন পায়। যাতে বাস্তুহারা আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক শিবিরের নির্ভরযোগ্য সাথী হিসাবে গড়ে ওঠে।[৩১] কমিউনিস্ট পার্টি আবেদন জানাল, 'সংকীর্ণ দলগত স্বার্থ বাস্তুহারাদের বৃহত্তর স্বার্থের অন্তরায়'।[৩২]

শ্রমিক আন্দোলন

কংগ্রেস সরকারের দমনপীড়ন শ্রমিকবিরোধী নীতি সর্বক্ষেত্রের মতো শ্রমিক আন্দোলনের ওপরেও জারি ছিল। যেমন উল্লেখ করা যেতে পারে বিড়লার হিন্দমোটর ওয়ার্কসের ধর্মঘটী শ্রমিকদের ওপর সশস্ত্র গাড়োয়ালী ও গুর্খা বাহিনীর নির্বিচার গুলি চালনা। এর প্রতিবাদে সারা হুগলী জেলায় হরতালের ডাক দিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি। এই সময় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে কিছু বাধা এবং কিছু আঘাত এসে পড়েছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জ্যোতি বসুর কথায় বলি, "…. সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির এই অধিবেশন (টিকা ঃ ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিতব্য—সম্পাদক) এমন এক সময় হইতে যাইতেছে যখন দেশের শ্রমিক আন্দোলনে বর্তমান বিভেদ এবং অনৈক্যের সুযোগ লইয়া সরকার ও মালিকগণ মজুরি কাটা, বেকারি,

গণ-অনশন এবং ভীষণ দমননীতির দ্বারা শ্রমিক শ্রেণির ওপর ক্রমবর্ধমান আঘাত হানিতেছে। ... আমরা সমগ্র শ্রমিক শ্রেণি, সংযুক্ত এবং সহযোগী সমস্ত ইউনিয়ন এবং ভ্রাতৃত্বমূলক সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলিকে সর্বপ্রকার প্রচারের মারফৎ ঐক্যের দাবি লইয়া উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইতে আহ্বান জানাইতেছি। শ্রমজীবী জনসাধারণের এই ঐক্যের দাবিতে শক্তিশালী হইয়া ওয়ার্কিং কমিটি বর্তমান অধিবেশনে সর্বপ্রকার প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরিয়া প্রয়োজনীয় ঐক্যের এই দাবিকে অবশ্যই গ্রহণ করিবেন। অতএব প্রস্তাবিত এই অধিবেশন আমাদের দেশের শ্রমিক আন্দোলনে এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণের সূচনা করিবে।"[৩৩] আসন্ন মে-দিবস উপলক্ষ্যে বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের ডাক ছিল ঐক্যই দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণির মূল শক্তি।[৩৪]

১৯৫১ সালের ৮ই জুন 'লাষ্টিং পীস' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল 'ট্রেড ইউনিয়নে কাজ করা কমিউনিস্টদের কর্তব্য' এই শিরোনামে একটি লেখা।[৩৫]

সরকারের শ্রমিকবিরোধী নীতির আরও কিছু নমুনা আমরা পাই। যেমন ঃ ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রী করা ছিল এক দুরূহ ব্যাপার। ইউনিয়নের বাৎসরিক রিটার্ন দেওয়ার ব্যাপারেও ইউনিয়নগুলিকে অযথা হয়রানি করা হত। চটকল ট্রাইব্যুনালে সরকার আগে থেকেই আলোচ্য বিষয় স্থির করে শ্রমিকদের সর্বনাশের ব্যবস্থা পাকা করে রাখত। কংগ্রেসী সরকারের শ্রমনীতির বেআইনি ও অসঙ্গত কার্যপদ্ধতির পরিচয় এইভাবে পাওয়া যেত ইত্যাদি।

মৈত্রী ও শান্তি আন্দোলন

বর্তমান খণ্ডটি যে সময়কালের, সেই পর্বে ভারতে এই আন্দোলন গড়ে তোলার ওপর জোর পড়তে শুরু করেছে। বিশ্বশান্তি কমিটির আহ্বানে এটম বোমা নিষিদ্ধ করার দাবিতে কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জায়গায় স্টকহোম থেকে প্রচারিত আবেদনে সই সংগ্রহের কাজ চলেছিল। এটম বোমার বিরুদ্ধে বিশ্বের ৫০ কোটি মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ হয়েছিল। 'ভারতে শান্তি আন্দোলন' সম্পর্কে 'ফর এ লাষ্টিং পীস ফর এ পিপলস ডেমোক্রেসী'র পাতায় মুদ্রিত হয়েছিল ঃ "ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের উস্কানিদাতা ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং তাহাদের সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জোয়া দালালদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মিলিত হওয়ার জন্য ভারতের জনগণকে শান্তিরক্ষীদের সম্মেলনের স্থায়ী কমিটি ডাক দিয়েছে। কমিটি সমস্ত স্থানীয় এবং প্রাদেশিক শান্তি কমিটির কাছে প্রকৃত হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য লড়াই করিতে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক, ছাত্র, মহিলা ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংগঠনের সহিত যুক্তভাবে শান্তির সমর্থকদের শোভাযাত্রা সংগঠিত, হিন্দু-মুসলিম গণ্ডগোল বন্ধ করার জন্য শান্তির সমর্থদের দল গঠন এবং যুদ্ধবাদ ও হাঙ্গামার সংগঠনকারীদের তীব্র প্রতিরোধ করার সুপারিশ করিয়াছেন।"[৩৬]

বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী জোলিও কুরী। এই কংগ্রেসের আহ্বানে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগদানের জন্য ভারতের ১৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন, যার মধ্যে ৩ জন ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের। এঁরা হলেন—ডঃ মেঘনাদ সাহা, ডঃ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ এবং আচার্য নন্দলাল বসু। ভারতে শান্তি আন্দোলনের পিছনে কমিউনিস্টরা রয়েছে এই ধরনের কথা সরকারের তরফ থেকে জনসাধারণকে অবগত করিয়ে সতর্ক করানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। সারা ভারত শান্তি সম্মেলনের পূর্বে ভারতের বিভিন্ন

স্থানে 'শান্তি কনভেনশন' অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরকমেরই এক কনভেনশন হয়েছিল দিল্লীতে। এব্যাপারে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এক গোপন সার্কুলার মারফৎ তাদের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছিল। সরকারের কাছে কনভেনশনটির উদ্যোক্তা ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। তারা মনে করত যে শান্তি আন্দোলনের কথা বলা আসলে রাজনীতির কথা ঘুরিয়ে বলা।[৩৭] কমিউনিস্ট পার্টি সরকারি এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল।[৩৮]

পশ্চিমবঙ্গে প্রাদেশিক শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫১ সালেব ৪-৮ই মে মহম্মদ আলী পার্কে। ২ হাজার প্রতিনিধি ও ৫ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে শুরু হয়েছিল এই সম্মেলন। সেই দিনেরই 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় 'শান্তির দুর্গ পশ্চিমবাংলা' শিরোনামে এক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল। চারদিনব্যাপী সম্মেলন শেষ হয়েছিল একটি স্থায়ী কমিটি গঠনের মধ্যে দিয়ে। ডঃ মেঘনাদ সাহা ছিলেন এই কমিটির সভাপতি এবং সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রমোদ সেনগুপ্ত। প্রাদেশিক শান্তি সম্মেলনে বাণী প্রেরণ করেছিলেন সোভিয়েত লেখক আলেকজাণ্ডার ফাদায়েভ এবং ইলিয়া এরেনবুর্গ। চীনা শান্তি কমিটিও অভিনন্দন জানিয়ে এক বাণী পাঠিয়েছিল। শান্তি সম্মেলন যাতে সর্বতোভাবে সফল হয় তারজন্য কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকেরা 'শান্তি সম্মেলন তহবিল'-এ অর্থ সাহায্য করার জন্য এক আবেদনে অনুরোধ করেছিলেন। এঁরা হলেন—ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন, হেমন্তকুমার বসু, অমর বসু, জে. সি. গুপ্ত, ত্রিপুরারী চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, জ্যোতি বসু, গোপাল হালদার, অজিত বিশ্বাস, দেবনাথ দাশ, ডাঃ জে, কে. ব্যানার্জী, ডাঃ কর্নেল জে. আর. সেনগুপ্ত, ডাঃ পবিত্র ও প্রমোদ সেনগুপ্ত।

বৃহৎ পাঁচ-শক্তির মধ্যে শান্তি চুক্তির জন্য বিশ্বশান্তি সংসদের এক আবেদনে স্বাক্ষর সংগ্রহের এক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র ফেডারেশন। এব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট লেখকেরাও এগিয়ে এসেছিলেন এবং বাংলার সমস্ত লেখককে এক আবেদনে স্বাক্ষর করার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। উদ্যোক্তা লেখকেরা হলেন—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ সান্যাল, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গজেন্দ্রনাথ মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ, কৃষ্ণদয়াল বসু, গোপাল হালদার ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।[৩৯]

১১-১৩ই মে, ১৯৫১ মুম্বাইয়ে দ্বিতীয় সারা ভারত শান্তি কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হয়েছিল। কংগ্রেস সরকারের তরফ থেকে শান্তি আন্দোলন কমিউনিস্টদের দ্বারা পরিচালিত এরকম অভিযোগ প্রায়ই তোলা হত। প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি ডাঃ মোহনলাল অটল এবং অন্যতম সদস্য ডঃ মুলকরাজ আনন্দ এর তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। অবিভক্ত পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সভাপতি ডঃ সফিউদ্দীন কিচলুও এর প্রতিবাদ করেছিলেন।

১৯৪১ সালের জুন মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর ফ্যাসিস্ট জার্মানীর আক্রমণের পটভূমিকায় বাংলার কমিউনিস্টদের উদ্যোগে গঠিত হয়েছিল সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি। মৈত্রী আন্দোলনের এই ধারাপথেই কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের উদ্যোগে ১৯৫১ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী চীন-ভারত মৈত্রী-সংঘ গঠিত হয়েছিল। এই সংঘের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন ত্রিপুরারী চক্রবর্তী। এই কমিটির মধ্যে ছিলেন সত্যেন বসু, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল, সুপ্রভা দেবী, ও. সি. গাঙ্গুলী, প্রবোধ বাগচী, সত্য বাগচী, সত্যেন মজুমদার, বিবেকানন্দ মুখার্জী, গীতা মল্লিক, মোহিত মৈত্র প্রমুখ।

কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চম রাজ্য সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫১ সালের ৫-৯ই অক্টোবর। এটা ছিল পঞ্চম রাজ্য সম্মেলন এবং এটি বৈধ অবস্থাতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতার মুসলিম ইনষ্টিটিউটে। প্রথমে স্থির ছিল যে ২৪-২৮শে সেপ্টেম্বর এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু 'অনিবার্য কারণবশত' সম্মেলনের তারিখ পেছিয়ে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে করা হল। ইতিমধ্যেই মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ জেল থেকে মুক্তিলাভ করেছেন ১৯৫১ সালের মে মাসে। পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা' নবপর্যায়ে প্রকাশ হতে আরম্ভ করেছে। সম্মেলন কালে পশ্চিমবঙ্গ পার্টির সভ্য সংখ্যা ছিল ৮-৯ হাজারের মধ্যে আর 'স্বাধীনতা'র বিক্রয়সংখ্যা ছিল ১৩-১৫ হাজার। মনে রাখা দরকার নবপর্যাযে 'স্বাধীনতা' পত্রিকা বেরোচ্ছে তখন মাত্র ৮ মাস।

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের পর থেকে ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক রিপোর্ট বাংলার পার্টি তৈরি করেছিল।[৪০] কীভাবে সংকীর্ণতা ও হঠকারিতার ঝোঁক পার্টির সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত হয়ে পার্টিকে ও গণফ্রন্টকে দুর্বল ক'রে তুলেছিল সে কথাগুলির উল্লেখ রয়েছে এই রিপোর্টে। উল্লেখ রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পার্টির পুনর্গঠন। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের লাইনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের প্রগতিবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলনও বেশ খানিকটা ধাক্কা খেয়েছিল। পার্টির ওপর 'লাস্টিং পীস'-এর প্রভাব, পি.ও.সি. গঠন, খসড়া কর্মসূচি ও রণকৌশল সংক্রান্ত পি.ও.সি'র বিবৃতির ওপর আলোচনার পরিণতিতে বিভিন্ন জেলায় পার্টি সম্মেলন ও রাজ্য সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়েছিল। এই রিপোর্ট রাজ্যের পঞ্চম সম্মেলনের রিপোর্ট ছিল কিনা, সে সম্পর্কে সম্পাদকদ্বয় নিশ্চিত নন। তবে এই রিপোর্ট পঞ্চম রাজ্য সম্মেলনে আলোচনার ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছিল একথা বলা যায়। এই রাজ্য সম্মেলনে বেশ কয়েকটি প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল, যেমন মহিলা ফ্রন্ট সম্পর্কে প্রস্তাব, ট্রেড ইউনিয়ন প্রস্তাব, কাশ্মীর সম্পর্কে প্রস্তাব, শান্তির উপর প্রস্তাব ইত্যাদি। এইসব প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে পার্টিকে নতুন কর্মসূচি নিয়ে এবং সমস্ত রকম ত্রুটি সংশোধন ক'রে এগিয়ে যাবার কথা পঞ্চম রাজ্য সম্মেলনের রিপোর্টে বলা হয়েছিল। এই সম্মেলন থেকে রাজ্য সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ।

সাবা ভারত পার্টি সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলনের শেষের দিন থেকে অর্থাৎ ৯ই অক্টোবর থেকে কলকাতায় সারা ভারত পার্টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন চলেছিল ১৫ই অক্টোবর পর্যন্ত। এই সম্মেলনে খসড়া হিসাবে দু'টি দলিল পেশ করা হয়েছিল। একটি হল খসড়া কর্মসূচি, অন্যটি হল পার্টির রণকৌশল নীতি বা কর্মনীতি। উভয় দলিলই নীচের ইউনিটগুলি থেকে আলোচনা সমাপ্ত করার পর সর্বোচ্চ স্তরে আনা হয়েছিল এবং তা পার্টি সম্মেলনে পেশ করা হয়েছিল চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য। সংশোধনসহ এই দুই দলিল সম্মেলন থেকে গৃহীত হয়েছিল। খসড়া কর্মসূচি আমরা ইতিমধ্যেই সহায়ক তথ্য হিসাবে বর্তমান অধ্যায়ে সংযোজিত করেছি। চূড়ান্ত কর্মসূচিটিও আমরা সংযোজিত করলাম এই বিবেচনাবোধে যে দু'য়ের মধ্যে পাঠকরা পার্থক্যের জায়গাগুলিকে ধরতে পারেবন।[৪১] অন্য দলিলটির সংশোধিত ও আইনানুগ নাম দেওয়া

হয়েছিল 'পলিসি স্টেটমেন্ট' বা 'পার্টির নীতিসংক্রান্ত বিবৃতি'। এসম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এ দু'টি দলিলের মূল কথা ছিল নিম্নরূপ ঃ

(১) ভারতের বিপ্লবের স্তর প্রসঙ্গে কর্মসূচিতে বলা হল ভারত এখন গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে রয়েছে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে নয়। এমনকি গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের কোন বিজড়ন এখানে ঘটেনি। নতুন কর্মসূচিতে বলা হল, "আমাদের বিকাশের বর্তমান স্তরে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা আমরা দাবি করিতেছি না।"

(২) বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশল প্রসঙ্গে রণদিভের সূত্রকে বাতিল করল এই কর্মসূচি। বলা হল, "আমাদের পার্টি মনে করে বর্তমান গণতন্ত্রবিরোধী ও জনবিরোধী সরকারের বদলে জনগণের গণতন্ত্রের নয়া সরকার গঠনের অবস্থা খুবই পরিপক্ক। এই জনতার গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হবে দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক, সামন্তবিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তির মিলনের ভিত্তিতে।"

(৩) এই কর্মসূচির সঙ্গে যে পলিসি স্টেটমেন্ট গ্রহণ করা হয়েছিল, তা 'চীনের পথ'কে বাতিল করে দিল। বলা হল, "রুশ দেশের পথ নয়, আবার চীনের পথ নয়, তবে এমন লেনিনবাদী পথ যা ভারতের পরিস্থিতিতে প্রযুক্ত হতে পারে।"

এই পলিসি স্টেটমেন্টে কী কী ছিল?

(১) চীনের পথ ও ভারতের পথের মধ্যে কোথায় সাদৃশ্য রয়েছে এবং কোথায় পার্থক্য রয়েছে তার উল্লেখ রয়েছে।

(২) চীনের পথ ও রাশিয়ার পথ উভয়কেই বাতিল করা হল।

(৩) গেরিলা যুদ্ধ ও ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের মধ্যে পার্থক্য টানা হল।

(৪) প্রতিটি ক্ষেত্রে সংসদীয় নির্বাচনকে ব্যবহারের কথা বলা হল।

এইভাবে পার্টি কর্মসূচি ও পার্টি বিবৃতির মধ্যে দিয়ে বামসংকীর্ণতাবাদী হঠকারী লাইন পরিত্যাগ করা হল। তবে ত্রুটিসমূহের অনেক কিছু দূরীভূত হলেও, কিছু ত্রুটি সংশোধন করা হল না। যেমন ভারতের স্বাধীনতার মূল্যায়ন এবং নেহরু সরকারের চরিত্র বিশ্লেষণ। বলা হলঃ (ক) চার-বছরের নেহরুরাজ জনসাধারণের আশা ভরসাকে সবদিক থেকে ভেঙেছে। (খ) সরকার নির্লজ্জের মতো আরও ঘোষণা করল যে এই প্রজাতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদেরই অঙ্গ বিশেষ। (গ) দেশটার ফৌজ কতখানি মুক্ত হল সেটাই যদি দেশের সার্বভৌমত্ব আর স্বাধীনতার মাপকাঠি হয়, তাহলে মানতেই হবে আমাদের দেশের স্বাধীনতার আসল ব্যাপারটাই এখনও সাম্রাজ্যবাদীদের হাতেই রয়েছে। (ঘ) ভারতবর্ষই বাকি রয়েছে এশিয়ার মধ্যে শেষ বৃহত্তম পরাধীন, আধা-ঔপনিবেশিক দেশ হিসাবে যার উপর সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা আজও লুঠ ও শোষণ চালাতে পারছে।

১৯৪৮ সালের ঝুটা বা আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতার সাথে ১৯৫১ সালের ভারতের স্বাধীনতা মূল্যায়নের তফাৎটা খুব সামান্যই।

প্রোগ্রাম ও পলিসি স্টেটমেন্টে শ্রেণি সমাবেশের যে কথা বলা হয়েছিল, তা হল নেহরু সরকারের অবসানের জন্য জনগণতন্ত্রের পথে যেতে হবে এবং সেখানে যে শ্রেণি সমাবেশ

ঘটাতে হবে তারা হল শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত ও অ-বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণি।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত এই সর্বভারতীয় সম্মেলন থেকে এক নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হল। অজয় ঘোষ নির্বাচিত হলেন পার্টির সাধারণ সম্পাদক। এই কমিটিতে বাংলার যাঁরা স্থান পেলেন, তাঁরা হলেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদদ, জ্যোতি বসু ও রণেন সেন। এইভাবে নতুন কমিটি তৈরি হওয়ার মধ্যে দিয়ে পার্টির জীবনে শুরু হল এক নতুন অধ্যায়। পার্টির বৈধতা প্রাপ্তি, পার্টির নতুন কর্মসূচি, নতুন কমিটি গঠন ইত্যাদি পার্টি সভ্য ও সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ এনে দিল। একথা মনে রাখা দরকার যে বেশ কয়েকটা বিষয়ের মূল্যায়নে ত্রুটি কিন্তু তখনও রয়ে গেছিল।

তবে আরও বেশি উৎসাহ ও আগ্রহ এনে দিয়েছিল সমস্ত ভারতবাসীর মনে সারা দেশজুড়ে সর্বপ্রথম সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের ঘটনায়। এবিষয়ে আমরা পরের খণ্ডে আলোচনা করব।

তথ্যসূত্র :

১. রণেন সেন—ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিবৃত্ত, অজয় ঘোষের সঙ্গে ষ্ট্যালিনেব সাক্ষাৎকাবের বিবরণ, পৃ. ১৩৯ (সহায়ক তথ্য - ১)
২. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির খসড়া কর্মসূচী, (সহায়ক তথ্য - ২)
৩. CPI Documents, vol VIII, Tactical Line, p 19-41 Ed by Mohit Sen
৪. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির 'পলিসি স্টেটমেন্ট' বা 'কর্মনীতি সম্পর্কে বিবৃতি' (সহায়ক তথ্য - ৩)
৫. পশ্চিমবঙ্গ পি.ও.সি. সার্কুলার ১৬ মে ১৯৫১, প্রকাশ্য প্রাদেশিক কেন্দ্র গঠন প্রসঙ্গে, (সহাযক তথ্য - ৪)
৬. যুগান্তর ১৬ জুলাই ১৯৫১, তথ্যপ্রাপ্তি অমলেন্দু সেনগুপ্ত—উত্তাল চল্লিশ, অসমাপ্ত বিপ্লব, পৃ. ৩৩৮
৭. যুগান্তর ৪ আগস্ট ১৯৫১, তথ্যপ্রাপ্তি—ঐ
৮. পশ্চিমবঙ্গ পি ও.সি. সার্কুলাব ৭ জুলাই ১৯৫১, 'জেলা ও প্রাদেশিক পার্টি সম্মেলন' (সহায়ক তথ্য - ৫)
৯. পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি, 'প্রাদেশিক পার্টি আলোচনা', ১৪ মে ১৯৫১ খসড়া প্রোগ্রাম সম্পর্কে (সহায়ক তথ্য - ৬)
১০. 'স্বাধীনতা', ১৪ মার্চ ১৯৫১, 'পশ্চিমবঙ্গ বাদে অন্য রাজ্যের কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ না কবার পিছনে নেহরুর যুক্তি'। (সহায়ক তথ্য - ৭)
১১. Dr Mortuza Khaled–A Study in Leadership, Muzaffar Ahmed and the Communist Movement in Bengal, p 100-101 (সহায়ক তথ্য - ৮)
১২. সমীর দাশগুপ্ত—গণ আন্দোলনে ছাপাখানা কমিউনিস্ট পার্টি ও সমদর্শী সংবাদপত্রের ক্রমপর্যায়, 'যাদের কণ্ঠরুদ্ধ হয়েছে'। পৃ. ১২৬ (সহায়ক তথ্য - ৯)
১৩. ঐ, পৃ. ১৪৭
১৪. 'স্বাধীনতা', ২৬ জানুয়ারি ১৯৫১ বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা, 'আমাদের আবেদন'। (সহায়ক তথ্য - ১০)
১৫. নব পর্যায়ে 'স্বাধীনতা', ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫১ 'সরকার বিরোধী যুক্তফ্রন্টের ডাক', কমিউনিস্ট সদস্য জ্যোতি বসু ও রতনলাল ব্রাহ্মণের বিবৃতি। (সহায়ক তথ্য - ১১)
১৬. 'স্বাধীনতা', ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১, 'স্বাধীনতা'র সম্পাদকমণ্ডলীর বিজ্ঞপ্তি—'প্রতিজ্ঞা চাই : স্বাধীনতার তহবিল পূরণ করিবই' এবং প্রাদেশিক সংগঠন কমিটির সার্কুলার, ৩০ মার্চ, ১৯৫১ 'দৈনিক'কে বাঁচাইতে ও উন্নত করিতে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করুন। (সহায়ক তথ্য - ১২)
১৭. ঐ, ২৮ এপ্রিল ১৯৫১
১৮. ঐ, ১৪ মে ১৯৫১
১৯. ঐ, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৫১, 'স্বাধীনতার চরম সংকট' (সহায়ক তথ্য - ১৩)

২০. প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি, ১১ জানুয়ারি ১৯৫১, পি.ও.সি. নোট নং ২৩, পার্টির নীতি ও কাজের মধ্যে যেন কোনরকম হঠকারিতা প্রকাশ না পায়। (সহায়ক তথ্য - ১৪)
২১. ঐ, ১৭ জানুয়ারি ১৯৫১ পি.ও.সি. জরুরি নোট ৩/৫১, ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস পালন করুন। (সহায়ক তথ্য - ১৫)
২২. পি.বি. সার্কুলার নং ১/৫১, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১, নিবর্তনমূলক আটক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন সম্পর্কে। (সহায়ক তথ্য - ১৬)
২৩. তথ্যসূত্র-১২, পৃ. ১৫৫
২৪. 'স্বাধীনতা', ২৪ মার্চ ১৯৫১, 'তেলেঙ্গানা বন্দীদের প্রাণদণ্ড রহিত কর'। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, বি পি টি ইউ সি এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভার বিবৃতি। (সহায়ক তথ্য - ১৭)
২৫. 'স্বাধীনতা', ১২ এপ্রিল ১৯৫১, সম্পাদকীয় 'ধ্বংসের পথে কংগ্রেস', (সহায়ক তথ্য - ১৮)
২৬. পশ্চিমবঙ্গ পি.ও.সি. জরুরি নোট ৭/৫১, 'বস্ত্র সংকট ও অন্যান্য দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলুন'। (সহায়ক তথ্য - ১৯)
২৭. 'স্বাধীনতা' ৩০ মে ১৯৫১, 'নির্বাচনের পূর্বে জনতার কণ্ঠরোধ করাই শাসনতন্ত্র সংশোধনের একমাত্র উদ্দেশ্য'—শ্রমিক নেতা মিরাজকর ও মৃণালকান্তি বসুর যুক্ত বিবৃতি। (সহায়ক তথ্য - ২০)
২৮. 'স্বাধীনতা' ৮ ও ৯ মার্চ ১৯৫১
২৯. ঐ, ১১ মে ১৯৫১, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ঘোষণা। (সহায়ক তথ্য - ২১)
৩০. 'স্বাধীনতা', ২৩ আগস্ট ১৯৫১, 'ভারত ও পাকিস্তানে শিশু সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে বিশ্বগণতান্ত্রিক নারী সংঘের পরামর্শ'। (সহায়ক তথ্য - ২২)
৩১. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটির তরফ থেকে 'বাস্তুহারা আন্দোলন সম্পর্কে' দু'টি সার্কুলার। (সহায়ক তথ্য - ২৩)
৩২. 'স্বাধীনতা', ১ এপ্রিল ১৯৫১
৩৩. ঐ, ৬-৪-৫১
৩৪. তথ্যসূত্র-১২, পৃ ২২০, বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়নের ডাক : 'যুদ্ধের বিরোধিতার আবেদন'। (সহায়ক তথ্য - ২৪)
৩৫. 'স্বাধীনতা', ৬ জুলাই ১৯৫১, 'ট্রেড ইউনিয়নে কাজ করা কমিউনিস্টদের কর্তব্য'। (সহায়ক তথ্য - ২৫)
৩৬. তথ্যসূত্র - ১২, পৃ. ১১২
৩৭. ঐ, পৃ. ১৩৯, Participation of Government Servants in Peace Conventions (সহায়ক তথ্য - ২৬)
৩৮. 'স্বাধীনতা', ১০ মার্চ ১৯৫১, 'সারা ভারত শান্তি সম্মেলন : সরকারী নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিবৃতি'। (সহায়ক তথ্য - ২৭)
৩৯. তথ্যসূত্র - ১২, পৃ. ২০৮, বিশ্বশান্তি সংসদের আবেদন। (সহায়ক তথ্য - ২৮)
৪০. পঞ্চম রাজ্য সম্মেলনের প্রাক্কালে দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর থেকে ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলার পার্টি সম্পর্কে রিপোর্টের খসড়া। সূত্র—বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য। দ্বিতীয় খণ্ড, প্রধান সম্পাদক অনিল বিশ্বাস, পৃ. ৩৮২-৪০২ (সহায়ক তথ্য - ২৯)
৪১. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী, সারা ভারত পার্টি সম্মেলন থেকে গৃহীত। অক্টোবর, ১৯৫১ (সহায়ক তথ্য - ৩০)

অজয় ঘোষের সঙ্গে ষ্ট্যালিনের সাক্ষাৎকার

রণেন সেন

অজয় বলেন যে মস্কোর যে বাড়িতে তাঁরা ছিলেন সেখানে একদিন হঠাৎ ষ্ট্যালিন ও মলোটভ তাঁদের সঙ্গে দেখা কবেন। ষ্ট্যালিন জিজ্ঞাসা করলেন যে জার্মান-সোভিয়েত লড়াইয়ের সময় ভারতেব পার্টিব ভূমিকা কী ছিল? আমাদের নেতারা সব ব্যক্ত করলেন। ষ্ট্যালিন প্রশ্ন করলেন, ষ্ট্যালিনগ্রাদ যুদ্ধেব পর কি কিছু পবিবর্তন করা হয়?

উত্তরে আমাদের নেতাবা বলেন যে তখন জাপান একেবারে ভারত সীমান্তে এসে পড়ায় কোন পরিবর্তন কবা হয়নি। এবং আরও বললেন যে লাল ফৌজ বার্লিন দখল করার পর ১৯৪৫ থেকে ভারতের পার্টিব লাইনে ধীরে ধীরে পরিবর্তন হতে লাগল। ১৯৪৫-৪৬-এর সংগ্রাম সম্বন্ধে তাঁকে অবহিত কবা হয। ষ্ট্যালিন চুপ করে শুনলেন।

দু-এক কথার পব ষ্ট্যালিন বলেন যে, আপনারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা পরিত্যাগ কবে ব্রিটিশের সঙ্গে একপ্রকার সহযোগিতা করেছেন। আমাদের নেতারা বলেন যে, ফ্যাসিস্ট-বিরোধী শক্তিকে আরও শক্তিশালী কবাব জন্যই আমরা ব্রিটিশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধা দিইনি। ষ্ট্যালিন বললেন, আপনারা জানেন বোধ হয় ব্রিটেন ও আমেরিকা আমাদের প্রায় কিছুই সাহায্য করেনি। আমাদের নিজেদের শক্তির জোরে আমরা জিতেছি। তারা দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলতে রাজি হয়নি। যখন লাল ফৌজ হিটলারী বাহিনীর পিছনে তাড়া করে অগ্রসর হতে লাগল তখন তারা, পাছে লাল ফৌজ সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে, সেই ভয়ে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলে। পার্টির অভ্যন্তরীণ অবস্থার বিবরণ শুনে বললেন যে পার্টি থেকে যাঁরা বহিষ্কৃত হয়েছেন তাঁরা ভাল কর্মী হলে পুনরায় তাঁদের কাজে লাগাতে হবে। দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের বিবরণ ষ্ট্যালিন শুনলেন। সঙ্গে সঙ্গে পার্টির অভ্যন্তরীণ মতবাদের বিরোধ কী নিয়ে তাঁকে বলা হলো। ষ্ট্যালিন বলেন (ক) রাশিয়ায় তৎকালীন পরিস্থিতিতে স্বভাবতই বিপ্লব এক পথ নেয় এবং সফল হয়। (খ) চীনের বিপ্লব ভিন্ন অবস্থায়, ভিন্ন পরিস্থিতিতে তার পথ নেয়। চীন খুব অনগ্রসব দেশ ছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত সেকেলে, বেশিরভাগ জায়গা ছিল দুর্গম, চীনের লাল ফৌজ ও গেরিলাবাহিনী বেশির ভাগ সময় মুখোমুখি লড়াই না করে দুর্গম গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, কৃষকদের সংগঠিত করে, তাছাড়া চুতে-র নেতৃত্বে কয়েক হাজার সুশিক্ষিত সেনা চীনা পার্টির সঙ্গে যোগ দেয়, তাই তারা গ্রাম থেকে ধীরে ধীরে অগ্রসব হয়ে শহরগুলি দখল করে সারা দেশে কুয়োমিনটাং ও তাদের সহায়ক আমেরিকাকে পবাস্ত করে। তাছাড়া চীনা পার্টি ও তার প্রধান সৈন্যদল একটু দূরে হলেও সোভিয়েত দেশের কাছাকাছি

ছিল এবং তাই অনেক সাহায্য সোভিয়েত থেকে পেয়েছে। (গ) ভারতে অবস্থা প্রায় বিপরীত, যথা, ভারতের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক ভাল, সৈন্যদল খুবই সুশিক্ষিত। ভারতের প্রতি শহর ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সৈন্য সমাবেশ আছে, তোমাদের হাতে কোন সৈন্য নেই, রণসম্ভার যোগাড় করাও অসম্ভব। কোন সৈন্যদল শিক্ষিত করাও তোমাদের পক্ষে সুবিধাজনক নয়, তাছাড়া তোমাদের পেছনে এমন কোন দেশ নেই যেখান থেকে তোমরা সাহায্য পেতে পার। তিনি বলেন চীনের কুয়োমিনটাং অপেক্ষা নেহরু সরকার ও কংগ্রেস পার্টি অনেক জনপ্রিয়। এইসব কারণে চীনের পথও তোমাদের পথ হতে পারে না। তোমাদের নিজেদের প্রোগ্রাম লিখতে হবে ভারতের পরিস্থিতির ভিত্তিতে। ষ্ট্যালিন ও সোভিয়েত পার্টির পরামর্শ অনুসারে এই আলোচনার পরেই আমাদের নেতারা প্রোগ্রামটি রচনা করেন এবং সেই প্রোগ্রামে যে সোভিয়েত পার্টির মত ছিল, তা পূর্বেই লেখা হয়েছে।

টিকা : (১) ১৯৭০ সালে সিপিআই এর চেয়ারম্যান এস. এ. ডাঙ্গে "When Communists Differ" গ্রন্থের পৃ. ৫৭-৫৮ তে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন।
(২) সিপিআই (এম) নেতা এম. বাসবপুন্নাইয়া 'গণশক্তি' পত্রিকার "ষ্ট্যালিন জন্ম শতবর্ষ" সংখ্যার জন্য "ষ্ট্যালিনকে যেমন দেখেছি" নামে একটি বিশেষ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। (—সম্পাদক)

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির খসড়া কর্মসূচী

(১) ১৯৪৭ সালের অগস্ট মাসে ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা যখন দিল্লীতে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে সরকার প্রতিষ্ঠা করিল এবং ঘৃণ্য ব্রিটিশ বড়লাট ও ছোটলাটেরা এই দেশ ছাড়িয়া গেল, তখন ভারতের লোককে বুঝানো হইল, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসন শেষ হইয়াছে, ভারত স্বাধীন হইয়াছে, মুক্ত হইয়াছে—এইবার আমাদের দেশের ভূমি ও শ্রম-সম্পদ, আমাদের কলকারখানা, আমাদের পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনবল নিয়া গভর্নমেন্ট ও জনসাধারণ আমাদের কোটি কোটি দেশবাসীর জন্য এক সুখী জীবনের ব্যবস্থা করিতে পারিবে। এইবার ক্রমশ আমরা আমাদের দারিদ্র্য ঘুচাইতে পারিব। প্রতিটি মানুষের জন্য ভাত, কাপড়, বাসস্থান ও নিম্নতম জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করিতে পারিব।

(২) এই চারি বৎসর নেহরু সরকারের শাসনে সবদিক দিয়াই জনতার আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে। অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া জনতা এই সিদ্ধান্তেই আসিয়াছে যে, জনসাধারণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ভিত্তিতে সরকারের যে-গদিতে জাতীয় কংগ্রেস বসিয়াছিল, সে গদি লাভ হইয়াছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুমতিতে। কারণ, এই গভর্নমেন্ট ইতিপূর্বেই ভারতে বিদেশী ব্রিটিশ পুঁজি কায়েম রাখার ও রক্ষা করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে। যে-সব পরগাছা জমিদার ও ভারতের দেশীয় রাজারা শত শত বছর ধরিয়া বিদেশী আক্রমণকারীদের সমর্থন করিয়াছে এবং তাহাদের সাথে একযোগে আমাদের দেশ ও জনসাধারণকে লুঠ করিয়াছে, এই গভর্নমেন্ট তাহাদের রক্ষার জন্যও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে। তাই জনসাধারণের জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে কোন শপথই এই গভর্নমেন্ট রক্ষা করিতে পারে নাই। প্রতিদিন জনতার জীবন বিষময় হইয়া উঠিয়াছে। আর জনতার পেট কাটিয়া জমিদার ও মুনাফা-শিকারীরা আরও ধনবান হইয়াছে।

(৩) আমাদের কলকারখানা, রেল, খনি, ডক, চা-বাগান প্রভৃতির ৫০ লাখ শ্রমিক প্রকৃত-মজুরি হ্রাস, জিনিসপত্রের দর বৃদ্ধি, ধনবাদী র‍্যাশনালাইজেশন* ও বেকারির পীড়ন ভোগ করিতেছে। মজুরি বৃদ্ধি ও উন্নত অবস্থার জন্য শ্রমিকের সংগ্রামকে পুলিশী সন্ত্রাস ও গুলির মুখে রক্তের বন্যায় ডুবাইয়া দেওয়া হইতেছে। গভর্নমেন্ট ও তাহার দালালরা শ্রমিকদের সংগ্রামী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলিকে ছত্রভঙ্গ, বিভক্ত ও দমন করিতেছে। জনতার নামে উৎপাদন বৃদ্ধির দাবি করিয়া গভর্নমেন্ট শ্রমিক শ্রেণির উপর আরও হীন শ্রমব্যবস্থা চাপাইয়া দিতেছে, আর মুনাফাখোরদের মুনাফা বাড়াইবারই সুযোগ করিয়া দিতেছে।

(৪) আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জনই কৃষক। সেই কৃষকদের কোটি কোটি লোক আগের মতই নিষ্পেষিত হইতেছে। যাহাদের জমি আছে এবং যাহারা এই জমি চাষ করিতে

পারে, তাহাদের শ্রমের ফল অতিরিক্ত খাজনা ও সুদের মারফতে জমিদার ও মহাজনরা লুটিয়া নিতেছে। ধনবাদী বাজারের কারসাজী ও সরকারি ট্যাক্সের ভিতর দিয়াও সেই লুট চলিয়াছে। কিন্তু বারো আনা কৃষকেরই আসলে নিজের কোন জমি নাই। যাঁহাদের কোন জমি নাই, এবং কোন কাজও যাঁহারা পান না, চিরন্তন নিঃস্ব অবস্থায় তাঁহারা কাল কাটান। যাঁহারা জমিদার ও সাহুকারের (মহাজন) খেতখামারে খেতমজুর বা গরীব প্রজা হিসাবে কাজ করেন, ভূমিদাস ও দাসের মতই তাঁহাদের কাজ করিতে হয়। পরিবারের জন্য জীবনধারণের উপযোগী মজুরি তাঁহারা কদাচিৎ পাইয়া থাকেন। তাহার ফলে খাদ্য ও শিল্পের কাঁচা মালের উৎপাদন নামিয়া যাইতেছে, এবং তাহা চরম খাদ্য সংকট, কোটি কোটি মানুষের অনাহার ও মৃত্যু ডাকিয়া আনিতেছে। জমিদার ও মুনাফাখোরদের এই সরকার একই সঙ্গে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের সম্বন্ধে গলাবাজি করে, আবার জনতার শোষকদেরই কোটি কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিবার চক্রান্তও করে, আসলে রাষ্ট্রের মারফতে কৃষকদের মেহনত হইতে পরোক্ষভাবে খাজনা আদায়ের সুযোগ জমিদারদের দেওয়ার জন্যই এই চক্রান্ত। শ্রমিকদের সংগ্রামের সাথেই জমির জন্য, খাজনা, সুদ ও ট্যাক্স কমানোর জন্য কৃষকদের সংগ্রামকেও রক্তের বন্যায় ডুবাইয়া দেওয়া হয়। গরীব কৃষক ও খেতমজুরেরা জমির জন্য, খাজনা ও সুদ কমাইবার জন্য এবং মজুরিবৃদ্ধি ও জীবনযাত্রা প্রণালী উন্নত করিবার জন্য দাবি করার সাহস করে বলিয়া গ্রামের পর গ্রাম, তালুক ও জিলা ফৌজ ও পুলিশের অধিকারে তুলিয়া দেওয়া হয়।

(৫) শহরের মধ্যবিত্তশ্রেণিদের অবস্থাও ভাল নয়। তাহাদের ভাগ্যেও ঘটিতেছে জীবনযাত্রার ব্যয়-বৃদ্ধি, বেতন-হ্রাস ও বেকারি। সরকারি চাকুরিতে ও বে-সরকারি অফিসে, ব্যাঙ্কে, ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে, স্কুল-কলেজে মধ্যবিত্ত উপার্জনকারীরা শ্রমিক শ্রেণি ও মেহনতকারী কৃষকদের মতই একই সমস্যার সম্মুখীন হইয়া থাকেন।

(৬) এমন কি শিল্পপতি, কারখানার মালিক ও ব্যবসায়ীরাও গভর্নমেন্টের নীতিতে ঘা খাইতেছে। এই নীতির পূর্ণ চালনা করে একচেটিয়া অর্থপতি, জমিদার ও দেশীয় রাজারা এবং পর্দার আড়ালে স্থিত তাহাদের বিদেশী ব্রিটিশ উপদেষ্টারা। পুঁজি, কাঁচা মাল, যানবাহন, আমদানি-রপ্তানি লাইসেন্স প্রভৃতি বরাদ্দ ব্যাপারে সরকারি দপ্তরের আমলারা এমনই ব্যবস্থা করিতেছে যাহার ফলে ছোট শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীরা আঘাত খাইতেছে এবং বিদেশী পুঁজির সিন্ডিকেট* ও ব্যাঙ্কের সাথে একযোগে বড় একচেটিয়া পুঁজিপতিরা লাভবান হইতেছে।

(৭) রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে তাহার নিজস্ব পরিচালনায় অথবা ব্যক্তিগত পুঁজির অংশীদার হিসাবে জলসেচ, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও কারখানা নির্মাণ ইত্যাদি যে সমস্ত "পুনর্গঠনমূলক" পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার মধ্যে কেবল যুদ্ধের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায় এমন পরিকল্পনাগুলি ছাড়া আর সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইতেছে। বিশেষজ্ঞ সরবরাহকারী ও অন্য সব সরবরাহের সহিত সংশ্লিষ্ট বিদেশী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট, ক্ষমতাপ্রাপ্ত পদস্থ আমলাদের নিকট ও ফটকা বাজারের বড় দালালদের নিকট এই পরিকল্পনাগুলি রাষ্ট্রের তহবিল লুণ্ঠনের একটি উপায় হইয়া দাঁড়াইতেছে। কালো বাজারীরা জনসাধারণকে লুট করিয়া যে-সব শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছে সে-সব শিল্পের জাতীয়করণের দাবি উঠিয়াছে। দেউলিয়া ও ভাঙাচোরা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারি দখলে আনাইয়া, ব্যর্থ হইবেই এমন পরিকল্পনায় সরকারকে অংশ গ্রহণ করাইয়া ঠগবাজীর দ্বারা সরকারি তহবিল আত্মসাৎ করাই আসলে এই দাবির উদ্দেশ্য।

এইরূপ সরকারি কারবার সব সময়ে অকৃতকার্য হয়। শেষে এই সমস্তকে বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইতেছে সরকারের অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিদের নিকট ও ব্যক্তিগত পুঁজির মালিকদের নিকট। ইহার ফল হইতেছে এই যে, ব্রিটিশ পুঁজির রথ-চক্রের সঙ্গে বাঁধা এই সরকারের দ্বারা দেশের শিল্পোন্নয়নের কাজ মোটেই অগ্রসর হইতেছে না। এই শিল্পোন্নয়ন ব্রিটিশ ও আমেরিকানদের মর্জির উপর নির্ভর করে, আর ভারতকে শিল্প-সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে গড়িয়া তোলায় নিশ্চিত-ভাবেই ইহাদের কোন স্বার্থ নাই।

(৮) আর যাও-বা শিল্প বর্তমানে আছে সেগুলিও ক্রমাগত সংকটাপন্ন অবস্থায় চলিতেছে। কারণ জনসাধারণের, বিশেষ করিয়া কৃষকদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের ফলে দেশের অভ্যন্তরে তাহাদের পর্যাপ্ত বাজার জুটিতেছে না। দেশের ভিতরে ও বাহিরে উভয়তই তাহারা বিদেশী ব্যবসায়ী কোম্পানী এবং ঔপনিবেশিক দুনিয়ার অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের সহিত প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতেছে এবং অচল অবস্থায় আসিয়া পড়িতেছে।

(৯) সবার উপরে, এই নড়বড়ে সরকার যখনই জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের সম্মুখীন হয় তখনই আপন অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টায় জনসাধারণের সমস্ত ব্যক্তিস্বাধীনতা দমন করে, রাজনৈতিক দল ও গ্রুপকে বে-আইনি করিয়া দেয়, ট্রেড ইউনিয়ন ও জনসাধারণের অন্যান্য সংগঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে, হাজার হাজার নারী ও পুরুষ-শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রকে কারারুদ্ধ করে এবং বন্দীশিবিরে পাঠায়। সমগ্র গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় কংগ্রেস নেতা ও জমিদারদের সহায়তায় পুলিশ এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী ও আমলারাই প্রধান শাসনকর্তা হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ পুলিশী রাষ্ট্রের ব্যয়ভার বহন করার জন্য জনসাধারণের ঘাড়ে যে বর্ধিত ট্যাক্সের বোঝা চাপান হয়, রাজস্বের (বাজেটের) অর্ধেকেরও বেশি অংশ যে জনসাধারণের খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য ব্যয় না হইয়া ব্যয় হয় ফৌজ, পুলিশ, কয়েদখানা ও আমলাতন্ত্রের পিছনে—ইহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই।

(১০) ভারতের জনসাধারণ এই সমস্ত অবস্থার অর্থ ক্রমশই বুঝিতে পারিতেছে এবং জমিদার ও রাজা-রাজড়াদের এই সরকারকে, রাঘববোয়াল পুঁজিপতি ও ফটকাবাজারীদের এই সরকারকে, ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এই সরকারকে পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তাও জনসাধারণ উপলব্ধি করিতেছে। মোহমুক্ত জনসাধারণ ধীরে ধীরে সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইতেছে। তিলে তিলে অনাহার ও মৃত্যুর এই অবস্থা আর সহ্য করার ক্ষমতা তাহাদের নাই। শহরে শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম ও গ্রামাঞ্চলে কৃষক সমাজের প্রতিরোধের মধ্য দিয়া তাহারা আগাইয়া আসিতেছে।

(১১) জনসাধারণের এই বর্ধমান ঐক্য, প্রধানত শ্রমিক শ্রেণির ঐক্য ও কৃষক সমাজের সহিত শ্রমিক শ্রেণির মৈত্রী, এবং জমিদার, রাজা-রাজড়া ও বৃহৎ ব্যবসায়ীদের এই সরকারের, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত সহযোগিতাকারী এই সরকারের অবসান ঘটাইতে উৎসুক এমন সমস্ত শ্রেণির মধ্যে ঐক্যকে ব্যাহত করার জন্য বর্তমান সরকার পুলিশী দমননীতি ছাড়া অন্য পন্থারও সুযোগ নিতেছে।

(১২) জনসাধারণের ব্যাপকতম অংশ আমাদের দেশকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আওতা হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন করিতে চায়—ইহা জানিয়াই সরকার ভারতকে প্রজাতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের সহিত তাহার বন্ধনকে প্রকৃতই ছিন্ন করিতে চায় না বলিয়া

সরকার নির্লজ্জভাবে এই প্রজাতন্ত্রকে সাম্রাজ্যেরই একটি অংশ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সদস্য হওয়াটা নেহাৎ একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার নয়, যদিও তাই বলিয়া ইহা বিঘোষিত হইয়াছে। ভারত সরকার ইংল্যান্ড ও আমেরিকার মধ্যেকার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোন কোন ক্ষেত্রে নিজের সুবিধাও করিয়া লইতেছে। কিন্তু মূলত ভারত সরকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বৈদেশিক নীতিকেই কার্যকরী করিতেছে। যুদ্ধবিরোধী ও শান্তিকামী জনসাধারণের চাপে পড়িয়া যদিও সে শান্তির পক্ষে ও আণবিক বোমার বিরুদ্ধে কথা বলিতেছে, তথাপি সে কোরিয়ায় মার্কিন ফৌজকে নামমাত্র হইলেও মেডিক্যাল সাহায্য পাঠাইতে দ্বিধা করে নাই। মালয়ের মুক্তি-সংগ্রামকে দমন করার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সে গোর্খা এবং শিখ সৈন্য সংগ্রহ করিতে দিয়াছে। ভিয়েৎনাম জনগণতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে যাওয়ার পথে ফরাসী বিমানগুলিকে সে ভারতের বিমান অবতরণ ঘাঁটি ব্যবহার করিতে দিয়াছে। ভারতীয় নৌবহর ব্রিটিশ নৌবহরেরই অংশ হিসাবে এবং ব্রিটিশ অধিনায়কত্বে কাজ করে। সরকারের দেশরক্ষা বিভাগের সামরিক কলকব্জার চাবিকাঠি ব্রিটিশ পরামর্শদাতাদেরই হাতে আছে এবং তাহারাই ইহা চালায়। কোন দেশের সশস্ত্র ফৌজের স্বাতন্ত্র্য যদি তাহার সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার চিহ্ন হয় তবে আমাদের স্বাধীনতার প্রধান অংশ এখনো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাতেই রহিয়া গিয়াছে।

(১৩) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা নতুন কংগ্রেস সরকারের পোশাকে তাহাদের শাসনকে আড়াল করার পূর্বে দেশকে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ ও হত্যাকাণ্ডে ডুবাইয়া দিয়াছিল এবং দেশকে ভারত ও পাকিস্তান এই দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত করিয়াছিল। এইভাবেই সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের অর্থনীতিকে কৃষির দিক দিয়া এবং পাকিস্তানের অর্থনীতিকে শিল্পের দিক দিয়া দুর্বল করিয়া দেয়। এইভাবেই তাহারা উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে ঠোকাঠুকি লাগাইয়া রাখে এবং উভয়কে পরস্পরের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধে লিপ্ত করিয়া তথাকথিত "নিরপেক্ষ তৃতীয় দল" সাম্রাজ্যবাদীদের উপর উভয়কেই নির্ভরশীল করিয়া তোলে।

দেশ-বিভাগের ফলে কংগ্রেস সরকার জনসাধারণের ন্যায্য দাবিগুলিকে হিন্দু-মুসলিম লড়াইয়ের উন্মত্ততায় ডুবাইয়া দিবার সুযোগ পাইয়াছে। ইহার ফলে, যে অর্থ জনসাধারণের অবস্থার উন্নতির জন্য ব্যয়িত হইতে পারিত, সরকার তাহা অস্ত্রশস্ত্রের পিছনে খরচ করার সুযোগ পাইয়াছে। ইহার ফলে তাহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট হইতে অস্ত্রশস্ত্র কেনার সুযোগ পাইয়াছে। এই সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের দেশকে যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি হইতে বঞ্চিত করিয়া ভারত ও পাকিস্তানের স্টার্লিং পাওনার পরিবর্তে তাহাদের নিকটে পুরাতন অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় করার বেশি আর কিছু চাহে নাই।

(১৪) ভারতের বিভিন্ন জাতির স্বাধীন বিকাশের দাবিকে ও আগেকার জগাখিচুড়ী ব্রিটিশ প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে সংযুক্ত ভারতের ভিতরে স্বায়ত্ত শাসনমূলক ও ভাষাগত ভিত্তিতে পুনর্গঠনের দাবিকে স্তব্ধ করিবার জন্য দেশভাগ ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বকে ব্যবহার করা হইয়াছে। দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার নামে একটি প্রদেশের ভাষা, যেমন হিন্দীকে সমস্ত জাতির ও রাজ্যের বাধ্যতামূলক রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। তাহার ফলে প্রত্যেক জাতির নিজ ভাষাকে ব্যাহত করা হইয়াছে। এক একটি জাতির বিরাট এলাকায় কোটি কোটি মানুষ অন্য জাতির প্রাধান্যমূলক সরকার ও আমলাতান্ত্রিকদের শাসনে বাস করিতে বাধ্য

হইতেছে। নিজেদের অর্থনীতি ও সংস্কৃতিসম্পন্ন বড় বড় আদিবাসী এলাকাকে অন্যান্য জাতির ভিন্ন গোষ্ঠীর জমিদার ও মহাজনী হাঙ্গরদের দয়ার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এইভাবে জনসাধারণের ভিতর বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি করা হইতেছে।

(১৫) অবশেষে, জনতার সরকার হিসাবে নিজেদের জাহির করার জন্য আইনসভায় বাকবিতণ্ডার পিছনে জনসাধারণের কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া একটি শাসনতন্ত্র খাড়া করিয়া ইহাকে গণতান্ত্রিক শাসমতন্ত্র আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই শাসনতন্ত্রের ধারা অনুযায়ী জনসাধারণকে নিজেদের ইচ্ছা মতো গভর্নমেন্ট গঠন করিতে এবং এই শাসনতন্ত্রে যে মৌলিক অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহা কাজে পরিণত করিতে বলা হইতেছে। এইভাবে জনতাকে বলা হইতেছে জনতা ইচ্ছা করিলে স্বাধীন ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের এই "গণতান্ত্রিক" শাসনতন্ত্রের মধ্য দিয়া বর্তমান স্বৈরাচারী শাসনের অবসান করিতে পারে এবং নিজেদের মুক্তি আনিতে পারে।

(১৬) ইহা সত্য যে বর্তমানে ভারতের শাসনতন্ত্রে পূর্ণবয়স্কের সার্বজনীন ভোটের অধিকার আছে ও জনতা তাহা ব্যবহার করিতে পারে এবং করিবে। কিন্তু এই শাসনতন্ত্রের ভিতর একমাত্র নির্বাচনের ভিতর দিয়াই দেশের জমিদার-পুঁজিপতির শাসন এবং জাতীয় জীবনের উপর সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের অবসান হইতে পারে বলার অর্থ জনতাকে ধোঁকা দেওয়া। সার্বজনীন ভোটাধিকার শ্রমিক শ্রেণি ও জনতার পরিণত অবস্থার মাপকাঠির কাজ করে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ইহা গণতন্ত্রের অঙ্গ। কিন্তু যতদিন জমি কৃষকের সম্পত্তি না হইয়া জমিদারের সম্পত্তি থাকিবে, যতদিন জমিদার ও পুঁজিপতি মাঠে ও কারখানায় জনতাকে দাস করিয়া রাখিবে, যতদিন সংবাদপত্র ও প্রচারযন্ত্রের উপর পুঁজির ক্ষমতা অব্যাহত থাকিয়া জনতাকে মিথ্যা প্রচারে ভুলাইবে, যতদিন অর্থশক্তি ধর্মগত ও জাতিগত দ্বন্দ্বকে ব্যবহার করিয়া জনতাকে বিভক্ত করিবে ও দুর্বল করিবে, যতদিন আমলাতন্ত্র ও পুলিশ রাজনৈতিক পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিবে, ব্যক্তি স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করিবে, এবং রাজনৈতিক মতবাদ ও সৎ কাজের জন্য আইন সভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পর্যন্ত বিনা বিচারে আটক রাখিবে, ততদিন ইহা শোষিত জনতার প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থ প্রকাশ করিতে পারে না।

(১৭) নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী জনতা বা তাহাদের নির্বাচিত সরকার স্বাধীনতা ও সুখী জীবনের পথ করিতে পারে—একথা বলাও জনতাকে ধোঁকা দেওয়া। শাসনতন্ত্র জনগণের এমন কোন অধিকার সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দেয় নাই যাহা কোনরূপে বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকরী হইতে পারে কিম্বা যাহা অলঙ্ঘ্য ও অপরিবর্তনীয় আমলাতন্ত্রের সংকট সময়ে ব্যবহার্য স্বেচ্ছাচারী নির্দেশ দ্বারা ব্যাহত না হয়। শ্রমিক শ্রেণি ও বেতনভুক কর্মচারীর ধর্মঘটের অধিকার, জীবনধারণের মত মজুরি, শ্রম ও বিশ্রামের অধিকারের কোন নিশ্চয়তা নাই। আইনে এই অধিকারকে কার্যকরী করার ব্যবস্থাও নাই। জমিদারের জমি গদিচ্যুত বা গদিয়ান দেশীয় রাজাদের সম্পত্তি ও আয় অলঙ্ঘনীয় করিয়া রাখা হইয়াছে। জমিহীন কৃষক যদি জমি কিনিয়া নিতে পারে অথবা জমির জন্য জমিদারকে ক্ষতিপূরণ দিতে পারে তবেই মনে হয় সে জমি পাইতে পারে। জমি কিনিতে বা ক্ষতিপূরণ দিতে হইলে পুঁজির প্রয়োজন। কোটি কোটি কৃষক দিন আনে দিন খায়, তাহাদের কোন পুঁজি নাই। সুতরাং গরীব কৃষককে জমি ছাড়াই থাকিতে হইবে এবং দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন করিতে হইবে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য ইহাই যে, বৃটেন ও আমেরিকার সাথে কয়েকটি চুক্তি দ্বারা গভর্নমেন্ট আমাদের দেশে বিদেশী মালিকদের

সম্পত্তিকে পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের এমন সব প্রতিশ্রুতি দিয়াছে যে তাহাদের মুনাফায় পর্যন্ত হাত দেওয়া যাইবে না আর তাহারা নিজেদের খুশীমত সে মুনাফা দেশের বাহিরে লইয়া যাইতে পারিবে। এবং ইহাও করা হইয়াছে এমন এক সময়ে—যখন গভর্নমেন্ট নাগরিকদের পুলিশের ডাণ্ডার আইন হইতে, আর মহাজন ও মুনাফাখোরদের লুণ্ঠনের হাত হইতে বাঁচাইবার অঙ্গীকার দেয় না।

সুতরাং, আমাদের অর্থনীতি, জমি ও পুঁজিকে টুঁটি টিপিয়া করায়ত্ত রাখার অধিকার সম্বন্ধে শাসনতন্ত্র জমিদার, সামন্ত রাজা ও সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, অথচ জনতার জীবন ও মুক্তি বিষয়ে একটি ব্যাপারেও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নাই, শুধু সদিচ্ছার ধোঁকাবাজি দেওয়া হইয়াছে মাত্র। এই শাসনতন্ত্র প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র নয়; আর ইহাকে সেই আখ্যা দেওয়াও যাইতে পারে না। ইহা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ, এবং প্রধানত ব্রিটিশ স্বার্থের চাকায় বাঁধা জমিদার-পুঁজিপতি রাষ্ট্রেরই শাসনতন্ত্র।

(১৮) ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, জনতাকে উপরে বর্ণিত দারিদ্র্য ও অরাজকতার দিকে ঠেলিয়া দিয়া জনতার জীবনে দুঃসহ অবস্থা আনিবার ফলে জনতা বর্তমান সরকারের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছে। এবং ইহার উপর তাহাদের অবিশ্বাস গভীর হইয়া উঠিতেছে। এই সরকার জনতার বিরুদ্ধে জমিদার, মহাজন ও জনতার অন্যান্য শোষকদের রক্ষা করিতেছে। তাই এই সরকারকে তাহারা তাহাদের শত্রু মনে করিতে শুরু করিয়াছে। উপরন্তু কয়েকটি প্রদেশে বর্তমান সরকারের অমানুষিক শাসনের বিরুদ্ধে জনতা প্রকাশ্যেই তাহাদের অসন্তোষ ও বিদ্রোহ প্রকাশ করিতেছে এবং এই সরকারের পরিবর্তে এমন একটি নতুন গণ-সরকার স্থাপনের পথ খুঁজিতেছে যে গণ-সরকার জনতার স্বার্থ ও আশা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিবে, জমিদার, পুঁজিপতি, মুনাফাখোর, মহাজন ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের পীড়ন হইতে জনতাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে।

(১৯) এইসব ঘটনার সম্মুখীন হইয়া ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি জনতার সাহায্যে অগ্রসর হওয়া এবং বাস্তব কর্তব্য ও কর্মসূচির কাঠামো উপস্থিত করা তাহার কর্তব্য বলিয়া মনে করে। এই কর্মসূচি কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থন করে এবং সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করিতেছে। বর্তমান সরকার ভারতের শ্রমিক শ্রেণিকে জোর করিয়া যে অচল অবস্থায় টানিয়া নামাইয়াছে তাহা হইতে যদি শ্রমিক শ্রেণিকে বাহির হইয়া আসিতে হয়, তাহারা যদি মুক্ত ও সুখী জীবন গঠন করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাদের এই কর্মসূচিকে কাজে পরিণত করিতে হইবে।

আমাদের বিকাশের বর্তমান স্তরে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা আমরা দাবি করিতেছি না। ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের পশ্চাৎপদ অবস্থা এবং শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী বুদ্ধিজীবীদের গণ-সংগঠনের দুর্বলতার দরুন আমাদের পার্টি বর্তমানে আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধনের সম্ভাবনা দেখিতেছে না। কিন্তু আমাদের পার্টি মনে করে যে, বর্তমান গণতন্ত্র-বিরোধী ও জন-বিরোধী সরকারের বদলে জনতার গণতন্ত্রের এক নয়া সরকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি খুবই সুপরিণত। এই জনতার গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হইবে দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির মিলনের ভিত্তিতে; ইহা এমন সরকার হইবে যাহা জনতার অধিকারের প্রকৃত প্রতিশ্রুতি দিতে সমর্থ হইবে, বিনামূল্যে কৃষকদের জমি দিবে, বিদেশী মালের প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে আমাদের জাতীয় শিল্পকে সংরক্ষণ করিবে, দেশের শিল্পোন্নয়নকে নিশ্চিত করিবে, শ্রমিক শ্রেণির

জীবনের উন্নত মানের ব্যবস্থা করিবে, বেকারি হইতে জনতাকে বাঁচাইবে, দেশকে প্রগতি, সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ও স্বাধীনতার প্রশস্ত পথে দাঁড় করাইয়া দিবে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মতে, জনতার নয়া গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে কোন্ কোন্ বাস্তব কর্তব্য কার্যকরী করিতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

কর্তব্যগুলি হইতেছে ঃ

রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে

(২০) জনতার সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ দেশের সমস্ত ক্ষমতা জনতার হাতে কেন্দ্রীভূত হইবে। রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা পরিপূর্ণভাবে জনতার প্রতিনিধিদের হাতে থাকিবে। এই প্রতিনিধিরা জনতার দ্বারা নির্বাচিত হইবে এবং ভোটদাতাদের বেশির ভাগ যেকোন সময় দাবি করিলে প্রতিনিধিদের ফিরাইয়া আনিতে পারিবে। প্রতিনিধিরা একটি মাত্র গণ-পরিষদ, একটি মাত্র আইনসভা গঠন করিবে।

(২১) রিপাবলিকের সভাপতির (রাষ্ট্রপতি) অধিকার সংকোচ; আইন সভা যে আইন পাস করে নাই, তাহা পাস করার কোন ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিব বা রাষ্ট্রপতির মনোনীত ব্যক্তির থাকিবে না। আইনসভাই রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করিবে।

(২২) ভারতের সকল পুরুষ ও স্ত্রী নাগরিকদের, যাহারাই ১৮ বৎসর বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের সকলের জন্যই আইনসভা ও বিভিন্ন স্থানীয় সরকারের নির্বাচনে সার্বজনীন, সমান ও প্রত্যক্ষ ভোটের অধিকার, গোপন ব্যালট ভোট, যে-কোন প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানেই প্রত্যেক ভোটদাতার নির্বাচিত হইবার অধিকার, সকল জন-প্রতিনিধিদের বেতনের ব্যবস্থা, সকল নির্বাচনে প্রাপ্ত মোট ভোটের সংখ্যানুপাতে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিত্ব লাভ।

(২৩) ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন স্থানীয় গভর্নমেন্ট, এগুলি জন কমিটি মারফত ব্যাপকভাবে কাজ করিবে। (লাট, ম্যাজিস্টেট, কমিশনার প্রভৃতি) উপর হইতে চাপান সমস্ত স্থানীয় ও প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের অবসান।

(২৪) যে-কোন স্থানে বসবাসের অলঙ্ঘনীয় অধিকার, ব্যক্তির দেহের অলঙ্ঘনীয় পবিত্রতা, মতামত, বক্তৃতা, সংবাদপত্র, সংঘ, ধর্মসংঘ ও সমিতি গঠনের অবাধ স্বাধীনতা, যে-কোন স্থানে গমনাগমন ও বৃত্তির স্বাধীনতা।

(২৫) ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ, উপজাতি (Race) ও জাতি (Nationality) নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান কাজের জন্য সমান বেতন।

(২৬) প্রত্যেকটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। জোর করিয়া নহে, পরন্তু এক সাধারণ রাষ্ট্র গঠনের জন্য ভারতের বিভিন্ন জাতির জনসাধারণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সম্মতির ভিত্তিতেই ভারতীয় রিপাবলিক তাহাদের ঐক্যবদ্ধ করিবে।

(২৭) বর্তমান কৃত্রিমভাবে গঠিত প্রদেশ বা রাষ্ট্রগুলির পুনর্গঠন; রাজন্য বর্গের রাজ্যগুলিকে ভাঙিয়া দিয়া ভাষার ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন।

এক বা একাধিক যে সকল উপজাতি-অঞ্চলের বিভিন্ন অধিবাসীদের গঠন নির্দিষ্ট, যাহাদের কতকগুলি নির্দিষ্ট সামাজিক বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, অথবা যাহারা সংখ্যালঘু জাতি বলিয়া

গণ্য হইতে পারে, সে সকল এলাকায় পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং আঞ্চলিক সরকার থাকিবে।

(২৮) শিল্প, কৃষি এবং ব্যবসায়ে আয় অনুসারে ক্রমবর্ধিত হারে আয়কর ধার্যের নীতি প্রবর্তন ("প্রগ্রেসিভ ট্যাক্স"); শ্রমিক, কৃষক এবং কারিগরদের উপর হইতে সর্বাধিক পরিমাণে করভার লাঘব।

(২৯) স্কুলে নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের অধিকার; প্রত্যেকটি সরকারি ও জনপ্রতিষ্ঠানে নিজ জাতীয় ভাষার ব্যবহার; সর্বভারতীয় রাষ্ট্রভাষারূপে হিন্দীর ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা চলিবে না।

(৩০) যেকোন রাজকর্মচারীকে জনগণের আদালতে অভিযুক্ত করার সার্বজনীন অধিকার।

(৩১) সর্ব প্রকার ধর্ম প্রতিষ্ঠান হইতে রাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন।

(৩২) চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্য বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা।

(৩৩) পুলিশ ব্যবস্থার বদলে গণবাহিনী (Militia)। ভাড়াটিয়া সৈন্যদল ও অন্যান্য দমনমূলক বাহিনীর বিলোপ সাধন এবং দেশরক্ষার জন্য জনগণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত জাতীয় সৈন্য বাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর প্রতিষ্ঠা।

(৩৪) জন-চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রবর্তন; দেশের মধ্যেকার কলেরা ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য মহামারির কেন্দ্রগুলিকে বিলুপ্ত করার উদ্দেশ্যে চিকিৎসাকেন্দ্র এবং হাসপাতাল মারফত সারা দেশ ছাইয়া ফেলা।

কৃষি এবং কৃষক সমস্যার ক্ষেত্রে

আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে কৃষি এবং কৃষক সমস্যার গুরুত্ব সর্ব প্রথম।

কৃষি ব্যবস্থার বেশিদূর উন্নতি আমরা করিতে পারি না এবং দেশকে খাদ্য এবং কাঁচা মাল সরবরাহ করিতে পারি না, কারণ, দারিদ্র্যপীড়িত কৃষক সম্প্রদায়ের জমি নাই; কৃষির উন্নতি করার মত অত্যন্ত প্রাথমিক ধরনের কৃষিযন্ত্রপাতি কেনারও সঙ্গতি তাহার নাই।

আমরা জাতীয় শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারি না এবং বেশ কিছু পরিমাণে দেশকে শিল্পোন্নত করিতে পারি না, তাহার কারণ দেশের জনসংখ্যার যাহারা শতকরা ৮০ জন সেইসব দারিদ্র্যপীড়িত কৃষকের এমন সঙ্গতি নাই যে ন্যূনতম পরিমাণ শিল্পজাত পণ্যও ক্রয় করিতে পারে।

আমরা রাষ্ট্রকে কিয়ৎ পরিমাণেও দৃঢ় করিতে পারি না, কারণ যে কৃষক জনতা অর্ধাশনের অবস্থায় দিন কাটায়, তাহারা সরকারের নিকট হইতে কোন সাহায্য পায় না এবং তাহারাও সরকারকে ঘৃণা করে এবং সমর্থন করিতে অস্বীকার করে।

আমরা শ্রমিক শ্রেণির অবস্থার ভালরকম উন্নতি করিতে পারি না, কারণ দারিদ্র্যের জ্বালায় লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষ গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আসে এবং 'মজুরের বাজার' ছাইয়া ফেলে, 'মজুরির দর' নিচে নামাইয়া দেয়, বেকার বাহিনী বৃদ্ধি করে এবং এইভাবে মেহনতী

জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি অসম্ভব করিয়া তোলে।

সংস্কৃতির পশ্চাৎপদ অবস্থা হইতে আমরা বাহির হইয়া আসিতে পারি না, কারণ জনসাধারণের মধ্যে যাহারা অধিকসংখ্যক সেই কৃষকেরা এমন এক অর্ধ-অনশনের অবস্থায় বাস করে যে, সন্তান-সন্ততির শিক্ষা দিবার কোন বাস্তব সঙ্গতি তাহাদের নাই।

এই সমস্ত অভিশাপ হইতে মুক্তি পাইতে হইলে, দেশকে সাংস্কৃতিক অন্ধকার হইতে টানিয়া বাহির করিতে হইলে প্রয়োজন কৃষকদের জন্য মনুষ্যোপযোগী অবস্থার সৃষ্টি করা, প্রয়োজন জমিদারের হাত হইতে জমি লইয়া কৃষকদের হাতে তুলিয়া দেওয়া। ইহা করিতে হইলে প্রয়োজন—

(৩৫) জমিদারের জমি বিনামূল্যে কৃষকদের দেওয়া এবং বিশেষ ভূমি আইন মারফত এই সংস্কারকে আইনসঙ্গত করা।

(৩৬) কৃষকেরা যাহাতে কৃষি-যন্ত্রপাতি এবং প্রয়োজনীয় বীজ প্রভৃতি কিনিতে পারে, তজ্জন্য দীর্ঘমেয়াদী ও সুলভ ঋণের ব্যবস্থা করা, কারিগরেরা যাহাতে কাঁচামাল ইত্যাদি কিনিয়া তাহাদের উৎপাদন এবং ব্যবসা চালাইতে পারে তজ্জন্য দীর্ঘমেয়াদী ও সুলভ ঋণের ব্যবস্থা করা।

(৩৭) পুরাতন সেচ ব্যবস্থাগুলির উন্নতি এবং নতুন সেচ ব্যবস্থা নির্মাণের কাজে কৃষকদের জন্য সরকারি সাহায্য সুনিশ্চিত করা।

(৩৮) মহাজনদের কাছে কৃষক ও ছোট কারিগরদের যে ঋণ আছে তাহা বাতিল করা।

(৩৯) ক্ষেতমজুরদের জন্য উপযুক্ত মজুরি ও জীবনযাত্রার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা।

শিল্প এবং শ্রমিক সমস্যার ক্ষেত্রে

কৃষকদের ক্রয় ক্ষমতার চূড়ান্ত অবনতির জন্যই যে জাতীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, শুধু তাহাই নহে, দেশের শিল্প বিদেশী মালের প্রতিযোগিতার ফলেও বিপন্ন। বাহিরের দেশগুলি মালের বাজার ছাইয়া ফেলার নীতি অনুসরণ করিয়া বাজার দখলের জন্য সস্তা মালে এখানকার বাজার প্লাবিত করিয়া দেয়। বিদেশী প্রতিযোগিতায় যে ক্ষতি হয় তাহার বিরুদ্ধে সরকারের তরফ হইতে কোন সাহায্য না পাইয়া আমাদের শিল্প উৎপাদকেরা ক্ষতিপূরণের জন্য শ্রমিক শ্রেণির উপর চাপ বৃদ্ধি করে, তাহাদের জীবনযাত্রার অবস্থার আরও অবনতি ঘটায়।

কিন্তু শ্রমিকের জীবনযাত্রার অবস্থার যদি অবনতিই ঘটিতে থাকে তবে শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে না। কারণ ক্ষুধার্ত নিঃস্ব একজন শ্রমিককে দিয়া আধুনিক শিল্পের সব দাবি মিটান যায় না। এই অবস্থাই জাতীয় শিল্পের নগণ্য বিকাশের আর একটি কারণ। এই নারকীয় গোলকধাঁধাঁ হইতে বাহির হইয়া আসিতে হইলে প্রয়োজন—বিদেশী মালের প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে জাতীয় শিল্পকে রক্ষা করা, দেশের সর্বত্র ব্যাপক শিল্পোন্নতি শুরু করা, শ্রমিক শ্রেণির অবস্থার উন্নতি করা। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে যে ইহা করিতে হইলে প্রয়োজন—

(৪০) উপযুক্ত আইন প্রণয়ন দ্বারা বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতা হইতে জাতীয় শিল্প সংরক্ষণ।

(৪১) জাতীয় শিল্পের বিকাশের ও দেশের শিল্পোন্নতির জন্য উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি; এই

উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের সম্পদ ও প্রচেষ্টার যথাসাধ্য ব্যবহার।

(৪২) শ্রমিকদের জীবনযাত্রা ও কাজের অবস্থার আমূল পরিবর্তন; তজ্জন্য বাঁচার মত মজুরি; প্রতি ব্যবসায় ও শিল্পে দিনে ৮ ঘণ্টা এবং সপ্তাহে ৪৪ ঘন্টা কাজ; ভূগর্ভস্থ খনির নিচে এবং অন্যান্য যে সকল শিল্পে কাজ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর সেখানে দিনে ৬ ঘণ্টা কাজের প্রবর্তন। কাজ করিতে করিতে যাঁহারাই অক্ষম হইয়া পড়িবেন তাঁহাদের সকলের জন্য এবং বেকারির জন্য রাষ্ট্রের ও পুঁজিপতিদের খরচে সামাজিক বীমার ব্যবস্থা; শ্রম নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা—এগুলি ট্রেড ইউনিয়নগুলির সহযোগে কাজ চালাইবে; শিল্প আদালতের প্রতিষ্ঠা; এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির স্বীকৃতি।

(৪৩) সর্বসাধারণের ব্যবহার্য জিনিসপত্রের মূল্য সম্পর্কে কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন।

(৪৪) বাস্তুহারাদের সমস্যা এবং প্রধানত অসংখ্য বাস্তুচ্যুত শ্রমিক, কৃষক, কারিগর, মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী ইত্যাদির সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান অবশ্যই করিতে হইবে। তাহার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক তাহাদের দ্রুত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিতে হইবে; এবং তাহাদের নিজস্ব জাতীয় পথে জীবনযাত্রা গড়িয়া তুলিবার জন্য, বিশেষ করিয়া জমি, কাজের হাতিয়ার ইত্যাদি, চাকুবি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ভারতের জন্য জাতীয় স্বাধীনতা

ব্রিটিশ—আমাদের দেশ ছাড়িয়া গিয়াছে এই মর্মে বহু বিজ্ঞাপিত বিবৃতি সত্ত্বেও ইহা আজও বাস্তব সত্য যে, ভারতের বহুসংখ্যক কল-কারখানা, খনি ও চা, কফি প্রভৃতি বাগানগুলি, জাহাজ ও ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের মালিক হইল ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা এবং তাহা হইতে তাহারা বছরে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করিতেছে। আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের উপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এই ক্ষমতা রহিয়াছে ঃ বৃহৎ পুঁজিপতিরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত সহযোগিতা করিতেছে, তাহাদের সহিত রহিয়াছে নানা সম্পর্ক ও অংশীদারি। এইভাবে পর্দার আড়াল হইতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এবং তাহাদের সহযোগীরা আমাদের শ্রম-শিল্পগুলির বিকাশে বাধা দিতেছে এবং এইভাবে আমাদের দারিদ্র্য অব্যাহত রাখিতেছে।

শ্রম-শিল্পে ব্যাপক বিকাশ না ঘটিলে আমাদের দেশ শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী হইতে পারে না। কিন্তু ব্রিটিশ পুঁজি যতক্ষণ ভারতে থাকিবে ততক্ষণ সে পরিমাণ শিল্পসমৃদ্ধি হইতে পারে না। কারণ, ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানগুলির মুনাফা দেশের বাহিরে লইয়া যাওয়া হয় এবং তাহাদের সহযোগী বৃহৎ জাতীয় পুঁজিপতিরা যতক্ষণ সাম্রাজ্যের সহিত আমাদের বাঁধিয়া রাখিতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুনাফাকে আমরা নিজেদের শ্রম-শিল্পগুলির সম্প্রসারণের কাজে ব্যবহার করিতে পারি না।

তাহারও উপর আবার অসংখ্য ব্রিটিশ পরামর্শদাতার কথা মনে রাখিতে হইবে। আমাদের নৌবহর, ফৌজ, পুলিশ ও অন্যান্য পিটুনী সংগঠনগুলি ঐসব পরামর্শদাতায় ভরা।

সত্যকারের স্বাধীন রাষ্ট্র হইতে হইলে সাম্রাজ্যের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হইবে; দেশের অর্থনীতিতে ব্রিটিশ পুঁজির আধিপত্যের অবসান করিতে হইবে এবং ব্রিটিশ পরামর্শদাতাদের সরাইতে হইবে।

তাই, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে যে, নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি প্রয়োজন ঃ

(৪৫) "জাতিসমূহের ব্রিটিশ কমনওয়েলথ" ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে ভারতের বাহির হইয়া আসা।

(৪৬) নিজেদের নামেই হউক কিংবা ভারতীয় কোম্পানীর সাইনবোর্ডেই হউক, ভারতে ব্রিটিশ মালিকানায় যেসব কল-কারখানা, ব্যাঙ্ক, চা, কফি ইত্যাদির বাগান, জাহাজী কারবার ও খনি আছে তাহা বাজেয়াপ্ত করিয়া জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা।

(৪৭) ব্রিটিশ পরামর্শদাতারা যেসব পদে আছে, সেখান হইতে তাহাদের অপসারিত করা।

ভারতের বৈদেশিক নীতির ভিত্তি

ভারতের চাই শান্তি এবং শান্তিপূর্ণ বিকাশ। সমস্ত রাষ্ট্রের সহিত শান্তি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্যই ভাবত আগ্রহশীল। বৃটেন যদি পূর্ণ সমানাধিকারের ভিত্তিতে ভারতের সহিত অর্থনৈতিক সহযোগিতা চালাইতে পারে বলিয়া প্রমাণিত হয় তবে বৃটেনও বাদ যাইবে না। শান্তি ও যুদ্ধের মধ্যে, শান্তিশিবিরের অংশীদার ও আক্রমণাত্মক যুদ্ধবাদীদের মধ্যে বর্তমান ভারত সরকার এই যে কপট খেলা ("spurious play") চালাইতেছে, তাহাতে ভারতের স্বার্থ নাই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার চারিপাশে সমস্ত আক্রমণলিপ্সু দেশগুলি সমাবেশ করিয়াছে। বর্তমানে শান্তির প্রধান শত্রু ও আক্রমণাত্মক যুদ্ধের প্রচারক হইল এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যুদ্ধের এই শিবির দাঁড়াইয়াছে শান্তি-শিবিরের মুখোমুখি। শান্তি-শিবিরে রহিয়াছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীনের জনগণের রিপাবলিক ও জনগণতন্ত্রের অন্যান্য দেশগুলি। আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে শান্তি-শিবিরাশ্রয়ীদের সঙ্গে হাত না মিলাইয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রধান আক্রমণকারী বলিয়া চিহ্নিত না করিয়া, ভারত সরকার এই দুই শিবিরের মধ্যে সন্দেহজনক খেলা খেলিতেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ঢলাঢলি করিতেছে, এবং এইভাবে শান্তিপ্রিয় দেশগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণকারীদের লড়াইয়ের পথ সুগম করিয়া দিতেছে। শান্তি ও যুদ্ধের মধ্যে খেলা নয়; ভারতের প্রয়োজন—শান্তিপ্রিয় দেশগুলির সহিত সংযুক্ত ফ্রন্ট এবং তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব।

ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান যে কাম্ড়াকাম্ড়িতে নিযুক্ত রহিয়াছে এবং বর্তমান ভারত সরকারের পক্ষ হইতে তাহার যে বিরোধিতা করা হইতেছে না, তাহাতে ভারতের স্বার্থ আরও কম।

দেশ-বিভাগের ফলে ভারতের অখণ্ড অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভারসাম্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে; পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যে বিরোধের জন্য প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্রগুলি জনতাকে বিভক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছে, ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সাহায্যের দৃঢ় মৈত্রীর দ্বারা সেই বিরোধের অবসান করা যাইবে। এইরূপ বন্ধুত্বপূর্ণ মৈত্রীর মধ্যে সিংহল রাষ্ট্রকেও অবশ্যই আনিতে হইবে।

সিংহলের অর্থনীতি হইল ভারতের অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল এবং তাহার পরিপূরক। যেসব ভারতবাসী (প্রধানত তামিলীয়) চা, কফি ইত্যাদি বাগানে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে শ্রমিক হিসাবে ভারত হইতে গিয়াছেন তাঁহারা সিংহলে জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ। সিংহলী ও

ভারতীয় জমিদার ও ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থপর লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য ভারতীয় ও সিংহলী শ্রমিকদের পরস্পরের বিরুদ্ধে উস্কাইয়া দেয়। এই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অসদ্ভাব সৃষ্টি করিবার জন্য এবং জনগণের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করিবার জন্য—সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাহাদের অনুচরেরা এই বৈরিতার সুযোগ নেয়। তাহার ফলে অসংখ্য মানুষ তাহাদের বাসভূমি হইতে উৎখাত হয়। কেবল দৃঢ় সখ্য ও বন্ধুত্বই সাম্রাজ্যবাদীদের ও এইসব দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্রগুলির চক্রান্ত ব্যর্থ করিতে পারে।

অতএব, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সুনিশ্চিত করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছে ঃ

(৪৮) সমস্ত শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রের সহিত সৎ ও সুসমঞ্জস্য শান্তি নীতি এবং আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে তাহাদের সঙ্গে সম্মিলিত ফ্রন্ট।

(৪৯) কোন রকমের ইতরবিশেষ না করিয়া পূর্ণ সমানাধিকারের ভিত্তিতে যে সব রাষ্ট্র অর্থনৈতিক সহযোগিতা করিতে সক্ষম, তাহাদের সহিত অর্থনৈতিক সহযোগিতার নীতি।

(৫০) পাকিস্তান ও সিংহলের সহিত মৈত্রী ও বন্ধুত্বের নীতি।

ভারতের জনগণ যে লক্ষ্যের জন্য লড়াই চালাইতেছেন, সে-সম্পর্কে তাঁহারা যাহাতে সুস্পষ্ট ছবি পাইতে পারেন, তাহারই জন্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের সামনে এই কর্মসূচি (প্রোগ্রাম) উপস্থিত করিতেছে।

কোটি কোটি মেহনতী মানুষ, শ্রমিক শ্রেণি, কৃষক সমাজ, মেহনতী বুদ্ধিজীবী সমাজ, মধ্যবিত্ত শ্রেণিগুলি এবং দেশের স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধ জীবনের বিকাশে আগ্রহশীল জাতীয় বুর্জোয়াদের উদ্দেশ্যে পার্টির ডাক—আমাদের দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য, সমস্ত মেহনতী মানুষের জীবনের উন্নতি-সাধনের জন্য, আমাদের জাতীয় শিল্পে বিরাট অগ্রসর পদক্ষেপ ঘটাইবার জন্য, এবং আমাদের দেশে সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সাধনের জন্য, একটি মাত্র গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে মিলিত হোন।

মার্ক্স-এঙ্গেলস্-লেনিন-ষ্ট্যালিনের শিক্ষায় চালিত এবং দেশের কোটি কোটি কৃষকের সহিত মৈত্রীবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণি ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতের জনগণ এই কর্মসূচিকে (প্রোগ্রাম) কার্যকরী করিবে। মার্ক্সবাদের নীতি ও দর্শন এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সমগ্র মানবজাতির প্রায় অর্ধেক সমাজতন্ত্র, মুক্তি ও প্রকৃত গণতন্ত্রে পৌঁছিয়াছে—সোভিয়েত ইউনিয়ন তাহাদের পুরোভাগে। মহান্ চীনের গণরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত এশিয়ার জনগণ এখন সাম্রাজ্যবাদ হইতে নিজেদের মুক্ত করিবার জন্য লড়াই চালাইতেছে। সাম্রাজ্যবাদীদের দস্যুতা ও শোষণে জর্জরিত হইতেছে, এশিয়ার এমন শেষ বৃহত্তম পরাধীন আধা-উপনিবেশ হইল ভারত। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্বাস করে যে ভারতও শীঘ্রই একটি বিজয়ী গণরাষ্ট্র হিসাবে দুনিয়ার মহান্ জাতিগুলির পাশে আসন গ্রহণ করিবে এবং শান্তি, সমৃদ্ধি ও সুখের পথে যাত্রা শুরু করিবে।

- র‍্যাশনালাইজেশন—মজুর ছাঁটাই, মজুরি হ্রাস, উন্নততর যন্ত্র নিয়োগ, কাজের চাপ বৃদ্ধি প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে ব্যয় সংকোচ করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।
- সিন্ডিকেট—ব্যবসায়ী সংঘ

(ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো কর্তৃক প্রচারিত, এপ্রিল ১৯৫১)



ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মনীতি

দ্বিতীয় মুদ্রণ
নভেম্বর ১৯৫৩

দুই আনা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির পক্ষে রমেন সেন কর্তৃক ৬৪এ, লোয়ার সার্কুলার রোড হইতে প্রকাশিত ও ওরিয়েন্টাল আর্ট প্রেস, ৭৭/১ সিমলা স্ট্রীট হইতে ননীগোপাল পোদ্দার কর্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো পার্টির কর্মনীতি সংক্রান্ত একটি খসড়া বিবৃতি প্রকাশ করে।

পার্টির বিভিন্ন সংস্থার সম্মেলন-সমূহে ঐ খসড়া-বিবৃতি আলোচিত হয় এবং কিছু কিছু সংশোধন সহ উহা অনুমোদিত হয়।

১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত সারা ভারত পার্টি সম্মেলন উক্ত খসড়া-বিবৃতি ও প্রস্তাবিত সংশোধনগুলি আলোচনা করে, উহার কয়েকটি অনুমোদন এবং চূড়ান্তভাবে পার্টির কর্মনীতি সংক্রান্ত বিবৃতি গ্রহণ করে।

বর্তমানে ইহা সারা ভারত পার্টি সম্মেলনে গৃহীত পার্টি-কর্মনীতির বিবৃতি হিসাবে প্রকাশ করা হইল।

নভেম্বর ১৯৫১ —পলিটব্যুরো

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মনীতি

আমাদের লক্ষ্য

গত চার বৎসরের অভিজ্ঞতা ভারতের জনসাধারণকে এই কথা শিখাইয়াছে যে বর্তমান সরকার এবং বর্তমান ব্যবস্থা তাহাদের জীবনের প্রধান সমস্যাগুলির সমাধান করিতে পারে না। বর্তমান সরকার এবং বর্তমান ব্যবস্থা জনসাধারণকে জমি ও রুটি, কাজ ও মজুরি, শান্তি ও স্বাধীনতা দিতে পারে না। বর্তমান যে সরকার প্রধানত সামন্ততান্ত্রিক জমিদার ও বৃহৎ একচেটিয়া ধনপতিদের স্বার্থ এবং ইহাদের সকলের পিছনে যে-শক্তি গোপন রহিয়াছে সেই ইংরেজ সাম্রাজ্যতন্ত্রের কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যস্ত, সেই সরকারকে পাল্টাইয়া দিবার প্রয়োজন জনসাধারণ ক্রমশই উপলব্ধি করিতেছে।

সুতরাং কমিউনিস্ট পার্টি যে কর্মসূচি গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে, পার্টি "মনে করে যে বর্তমানের গণতন্ত্র-বিরোধী, জনগণ-বিরোধী এই সরকারের বদল করিয়া এক নতুন জন-গণতন্ত্রের সরকার কায়েম করিবার অবস্থা বেশ পরিণত"।

সেই সরকার গঠন করিবে কে? পার্টির কর্মসূচিতে বলা হইয়াছে যে ইহা "দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক সামন্ততন্ত্র-বিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির সম্মেলনের (কোয়ালিশন) ভিত্তিতে" গঠিত হইবে।

"জনগণের অধিকারসমূহকে কার্যকরী নিশ্চয়তা দান, কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে জমি-বণ্টন, বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে আমাদের জাতীয় শিল্পগুলির সংরক্ষণ ও আমাদের দেশের শিল্পায়নের নিশ্চিত ব্যবস্থা, শ্রমিক শ্রেণির জন্য উন্নততর জীবন মান প্রতিষ্ঠা, বেকারির কবল হইতে জনগণকে নিষ্কৃতিদান এবং এইভাবে প্রগতি, সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ও স্বাধীনতার রাজপথে দেশকে পরিচালিত করিবার ক্ষমতা" সেই সরকারকে এবং যে সমস্ত শক্তি লইয়া তাহা গঠিত সেই সব শক্তিকে রাখিতেই হইবে। জনতার গণতান্ত্রিক

সরকারকে যেসব বাস্তব কাজ সম্পাদন করিতে হইবে, পার্টির কর্মসূচিতে এইভাবে তাহার রূপরেখা বিবৃত করা হইয়াছে।

আমাদের আশু প্রধান লক্ষ্য কি, তাহা এইভাবে নির্দিষ্ট হওয়ার পর প্রশ্ন ওঠে : কেমন করিয়া, কি কি পদ্ধতিতে, কোন্ কোন্ শক্তির সহায়তায় এই লক্ষ্য সাধিত হইবে?

আমাদের অতীতের বিভিন্ন কর্মনীতি

অনেকে আছেন যাঁহারা মনে করেন যে, নতুন সংবিধানের অবদান যে পার্লামেণ্ট তাহাকে কাজে লাগাইয়াই বর্তমান সরকারকে পাল্টাইয়া জনতার গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত করা যায়। কেবল এই সরকার এবং কায়েমী স্বার্থসমূহই নয়, দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্টরাও এইরূপ ধারণাকে উৎসাহ দেয় এবং পুষ্ট করে। তাহারা প্রচার করে যে পার্লামেন্টের কামরায় জোরদার বিরোধী দল থাকিলেই সরকার কাঁপিয়া উঠিবে এবং ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

কিন্তু যে নতুন সংবিধানকে জনসাধারণ তাহাদের অতীতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ফলস্বরূপ মনে করিত, তাহার কার্যকারিতা সম্বন্ধে বিশ্বাসের সূত্রপাত হইতে না হইতেই দেখা গেল, সেই সংবিধানেরই অন্তর্ভুক্ত মৌলিক অধিকার ও অঙ্গীকারের ছায়াটুকুকেও বরবাদ করিয়া দেওয়া হইল এবং এই গণতন্ত্র-বিরোধী সরকারকে নাড়া দিবার জন্য জনগণ যে দৈহিক অলঙ্ঘনীয়তার অধিকার, মুদ্রণ ও ভাষণের স্বাধীনতা এবং সভা-সমাবেশ করার স্বাধীনতা কাজে লাগাইতে চাহিয়াছিল তাহাও পুলিশী লাঠি ও আমলাতন্ত্রের হুকুমতের বলি হইয়াছে। এই সরকার এবং যেসব শ্রেণির লোক ইহার হাতে ক্ষমতা রাখিতে দিয়াছে, তাহারা যে কখনও এদেশে আমাদের শুধুমাত্র পার্লামেন্টারী কায়দায় বুনিয়াদী গণতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটাইতে দিবে, এ-কথা বলিতে আজ কমিউনিস্ট পার্টি কিংবা অন্যান্য গণতন্ত্রী ও বিপ্লবীরা দূরে থাক, একজন উদারনীতিকও লজ্জা পাইবেন। সুতরাং, যে রাস্তায় আমরা স্বাধীনতা ও শান্তি, ভূমি ও খাদ্যের সন্ধান পাইব, যে রাস্তার রূপরেখা পার্টির কর্মসূচিতে দেওয়া হইয়াছে, সেই রাস্তার সন্ধান করিতে হইবে অন্য কোথায়ও।

মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন এবং স্ট্যালিনের শিক্ষায় উদ্ভাসিত ইতিহাস আমাদের হাতে দিয়াছে সুবিপুল অভিজ্ঞতা। যে সমস্ত সংগ্রাম সমস্ত মানবজাতির প্রায় অর্ধাংশকে সমাজতন্ত্র, স্বাধীনতা ও প্রকৃত গণতন্ত্রে পৌঁছাইয়া দিয়াছে, সেই সংগ্রামের মধ্য হইতেই এই অভিজ্ঞতার উদ্ভব। এই অর্ধজগতের পুরোভাগে রহিয়াছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, এবং তাহার সহিত হাত মিলাইয়াছে মহান্ চীন ও অন্যান্য জন-গণতন্ত্রের দেশসমূহ।

এইভাবে আমাদের প্রধান সড়কের রূপরেখা ইতিপূর্বেই আমাদের জন্য নিরূপিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু তবুও প্রত্যেক দেশকেই তাহার নিজস্ব পথও খুঁজিয়া লইতে হয়। তাহা হইলে আমাদের পথ কি?

ভারতে কমিউনিস্টরা গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া প্রথমে কতকগুলি চক্র হিসাবে এবং পরে একটি দল হিসাবে জনগণের সহিত কাজ করিয়া আসিতেছে। এই ত্রিশ বৎসরে তাহারা শ্রমিক শ্রেণির এক শক্তিশালী আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহাদের সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছে এবং তাহাদের দাবি-দাওয়া জয়যুক্ত করিয়াছে। তাহারা কিষান আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছে এবং বিরাট বিরাট অঞ্চলে, যেমন তেলেঙ্গানায়, তাহাদের ভূমিহীনতার অবস্থা হইতে ভূমির

মালিকানার পথে, বেগার শ্রমের বিড়ম্বনা হইতে স্বাধীনতার পথে পরিচালনা করিয়াছে। জনগণের অধিকার কায়েম করার জন্য তাহারা লড়িয়াছে এবং এই লড়াইয়ে হাজারে হাজারে লোক মারা গিয়াছে, ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিয়াছে, কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, নির্যাতন সহ্য করিয়াছে ও সর্বস্বান্ত হইয়াছে। মেহনতী জনগণকে পরিচালনা করার সময় স্বভাবতই আমাদের ইতিহাসের বহু সন্ধিক্ষণে প্রশ্ন উঠিয়াছে—কোন্ পথ আমরা অনুসরণ করিব, দেশ এবং জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রকৃষ্টতম কর্মকৌশল কি হইবে?

গত ত্রিশ বৎসর আমরা যে পথে চলিয়াছি তাহার উল্লেখ না করিয়া আমরা এখন সাম্প্রতিক ঘটনার কথা বলিব। তাহা হইলেই এখন হইতে কোন্ পথে চলিলে আমাদের কর্মসূচি পূরণ করিতে পারিব তাহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিব।

ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনকে কোন্ পথে চলিতে হইবে, একথা লইয়া পার্টির ভিতর দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের পর মতভেদ ও বিতর্ক আরম্ভ হয়। কিছুকাল বলা হয় যে কারখানার শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট এবং তাহার পরই দেশব্যাপী অভ্যুত্থান হইবে আমাদের সংগ্রামের প্রধান অস্ত্র—যেমন ঘটিয়াছিল রুশ দেশে। পরে আবার চীন বিপ্লব যে শিক্ষা দেয় তাহার ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এই বক্তব্য উপস্থিত করা হয় যে চীনের মতই আমাদের দেশ অর্ধ-ঔপনিবেশিক বলিয়া চীনের কায়দাতেই আমাদের বিপ্লব আগাইয়া চলিবে—কৃষক শ্রেণির "পার্টিজান্" লড়াই হইবে আমাদের বিপ্লবের প্রধান হাতিয়ার।

যে কমরেডরা বিভিন্ন সময়ে উল্লিখিত দুই মতের মধ্যে একটি বা অপরটিকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে এবং বর্তমান সরকার জনগণ হইতে কতদূর বিচ্ছিন্ন সে সম্পর্কে ধারণা লইয়া এবং অন্যান্য বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার লইয়া মতভেদ ছিল। জনগণকে বিজয়ের পথে পরিচালনা করিতে হইলে পার্টিকে যে এই মতবৈষম্যের সমাধান ঘটাইতেই হইবে, তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

কয়েক মাস ধরিয়া সুদীর্ঘ আলোচনার পর আজ পার্টি দেশের স্বাধীনতা ও জনগণের সমৃদ্ধি বিধানের নির্ভুল পথ সম্বন্ধে এক নতুন উপলব্ধিতে উপনীত হইয়াছে। ইহাকে আমরা রুশিয়ার পথ বা চীনের পথ নাম দিই না, দিতে পারি না। মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন ও ষ্ট্যালিনের শিক্ষার সঙ্গে ইহাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকিতে হইবে এবং সামঞ্জস্য রহিয়াছেও। ইহাতে ইতিহাসের সকল সংগ্রামের এবং বিশেষ করিয়া রুশ ও চীন দেশের সংগ্রামের শিক্ষাকে কাজে লাগানো হইয়াছে। রুশ সংগ্রামের শিক্ষাকে কাজে লাগানোর কারণ এই যে, একটি পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যতন্ত্রী দেশে লেনিন ও ষ্ট্যালিন পরিচালিত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণি কর্তৃক সেখানে দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে। আর চীনের সংগ্রামের শিক্ষাকে কাজে লাগানোর কারণ এই যে, এক অর্ধ-ঔপনিবেশিক, পরাধীন দেশে সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে যে জন-গণতান্ত্রিক বিপ্লব ইতিহাসে প্রথম সংসাধিত হয় তাহাতে জাতীয় বুর্জোয়ারা পর্যন্ত অংশগ্রহণ করে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে প্রত্যেকটি দেশেরই বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেই সব বৈশিষ্ট্য মুক্তির পথকে প্রভাবিত না করিয়া পারে না।

তাহা হইলে, চীনের পথে আর আমাদের পথে প্রভেদ হইবে কোথায়?

চীন ও ভারত ঃ সাদৃশ্য ও প্রভেদ

আমাদের পরিপ্রেক্ষিত

প্রথমে দেখা যাক্ যে চীনের সহিত আমাদের সাদৃশ্য কোথায়। এই সাদৃশ্য আমাদের বিপ্লবের প্রকৃতিতে রহিয়াছে। চীনের মতই আমাদের দেশের জীবনে কৃষিকার্য ও কৃষক-সমস্যা হইল একেবারে প্রাথমিক গুরুত্বের ব্যাপার। মূলত আমাদের দেশ ঔপনিবেশিক; আমাদের দেশবাসীর সুবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই জীবিকার জন্য কৃষিকার্যের উপর নির্ভর করে। আমাদের শ্রমিকদেরও অধিকাংশের সঙ্গে কৃষক-সমাজের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রহিয়াছে। ভূমিসমস্যা লইয়া তাহারাও আগ্রহান্বিত।

আমাদের দেশে আজ প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থ হইল সামন্ততান্ত্রিক জমিদারদের জমি লইয়া বিনামূল্যে কৃষকের হাতে তুলিয়া দেওয়া। এই সামন্ততন্ত্র-বিরোধী কাজ যখন সম্পন্ন হইবে তখনই আমাদের দেশে প্রকৃত মুক্তি ঘটিবে, কারণ চীনের মতই আমাদের দেশেও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের প্রধান স্তম্ভ হইল সামন্ততান্ত্রিকেরা। সুতরাং, চীনাদের মতই আমাদের সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়িতে হইবে। আমাদের বিপ্লব সামন্ততন্ত্র-বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লব।

এই জন্যই কৃষক সমাজের সংগ্রামের সর্বাধিক গুরুত্ব রহিয়াছে। চীনে মুক্তি-সংগ্রাম প্রধানত কৃষক সমাজের "পার্টিজান্" লড়াইয়ের ভিত্তিতে পরিচালিত হইয়াছিল এবং তখন চাষীরা সামন্ততান্ত্রিক জমিদারের কাছ হইতে জমি কাড়িয়া লইয়াছিল ও সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মুক্তিসেনা সৃষ্টি করিয়াছিল—এই ঘটনার অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়াইয়া দাবি করা হয় যে ভারতেও ঐ একই পথ অনুসৃত হইবে, এবং কৃষক সমাজের "পার্টিজান্" লড়াইয়ের পথ প্রায় একক শক্তিতেই আমাদের মুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিবে।

কেন্দ্রীয় কমিটির অভিমত এই যে, এভাবে চীনের অভিজ্ঞতা হইতে ধার লওয়া এবং এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অর্থ হইল চীন বিপ্লবের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর দিতে অবহেলা করা এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিস্থিতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলির দিকেও নজর দিতে অবহেলা করা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় ঃ

আমরা ইহা লক্ষ্য না করিয়া পারি না যে, চীনের পার্টি যখন মুক্তি সংগ্রামে কৃষকশ্রেণিকে নেতৃত্ব দিতে শুরু করে তাহার পূর্বেই ১৯২৫ সালের বিপ্লবে দল ভাঙাভাঙি হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে পার্টি একটি সেনাবাহিনী পাইয়াছিল।

আমরা ইহাও লক্ষ্য না করিয়া পারি না যে, চীনে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত কোন ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না এবং সেজন্য শত্রু মুক্তিবাহিনীর উপর সুসংহত ও দ্রুত আক্রমণ চালাইতে পারে নাই। এ দিক হইতে দেখিলে ভারত ও চীনের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। চীনের সঙ্গে তুলনায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত, সুসংগঠিত ও বহু-বিস্তীর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা রহিয়াছে।

মুক্তি অভিযানের সময় চীনের যে শ্রমিক শ্রেণি ছিল, ভারতের শ্রমিক শ্রেণি তাহার তুলনায় বৃহৎ।

আবার ইহাও আমরা লক্ষ্য না করিয়া পারি না যে, মাঞ্চুরিয়াতে পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত চীনা লালফৌজ বার বার শত্রুদ্বারা বেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে ও নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবার আশংকা দেখা দিয়াছে। মাঞ্চুরিয়াতে শিল্প-কেন্দ্র হাতে থাকায় এবং মহান্ মিত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন পিছনে থাকায় চীনা মুক্তিসেনা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণের আশংকা-মুক্ত হইয়া নিজেকে পুনর্গঠিত করে এবং এক চূড়ান্ত অভিযান চালাইয়া বিজয় লাভ করে। এদিক হইতে দেখিলে ভারতের ভৌগোলিক পরিস্থিতি একেবারে আলাদা।

এসব কথা বলার অর্থ এই নয় যে, বিপ্লবের পর্যায় এবং বিপ্লবের প্রধান প্রধান কর্তব্য ভিন্ন চীনের সহিত আমাদের কোন মিল নাই। অপর পক্ষে চীনের মতই ভারতের আয়তন বিশাল। চীনের মতই ভারতের কৃষক-সংখ্যা বিপুল। সুতরাং, আমাদের বিপ্লবে চীন বিপ্লবের অনুরূপ বহু বৈশিষ্ট্য থাকিবে। কিন্তু চীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া একমাত্র কৃষক-সংগ্রামের মারফতেই ভারতে জয়লাভ সম্ভব হইবে না।

অধিকন্তু আমাদের মনে রাখিতেই হইবে যে চীনা পার্টি যে কেবল কৃষকদের "পার্টিজান্" সংগ্রাম লইয়াই ছিল, তাহা নীতির খাতিরে নয়, একান্তই প্রয়োজনের তাগিদে। দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চালাইতে গিয়া পার্টি ও তাহার কৃষক এলাকাগুলি ক্রমশ শহর ও তাহার শ্রমিক শ্রেণি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, পার্টি এবং মুক্তিবাহিনী শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য কারখানা, জাহাজ ও যানবাহনের কর্মরত শ্রমিক শ্রেণিকে ডাক দিতে পারে নাই। চীনাদের বেলায় এই ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া তাহাদের প্রয়োজনকে আমরা অমোঘ নীতি বানাইয়া তুলিব কেন, আমাদের মুক্তি সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণিকে কার্যকরীভাবে নেতৃত্বে ও কর্মের ক্ষেত্রে আনিব না কেন?

এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গি থাকিলে আমাদের দেশের বৃহৎ এক শ্রমিক শ্রেণির অস্তিত্বকে উপেক্ষা করা হয়, অথচ এই শ্রমিক শ্রেণিই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে চূড়ান্ত ভূমিকায় নামিতে পারে। ঐক্যবদ্ধ কর্মতৎপরতায় শ্রমিক শ্রেণি ও কৃষক সমাজের মহান্ মৈত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক ও কৃষক সংগ্রামগুলির সংহতি-সাধন এবং সংগ্রাম পরিচালনার উদ্দেশ্যে ইতিহাসের সমস্ত শিক্ষার প্রয়োগ—ইহাই হইল আমাদের পথ।

সুতরাং, এখন দেখা যাইবে যে শহরে সাধারণ ধর্মঘটের উপর নির্ভর করার পূর্বতন নীতি যেমন কৃষক সমাজের ভূমিকার গুরুত্ব ছোট করিয়া দেখিত, তেমনই আবার পরবর্তী যুগে "পার্টিজান্" সংগ্রামের নীতি শ্রমিক শ্রেণির ভূমিকার গুরুত্ব ছোট করিয়া দেখিল এবং কার্যত ইহার অর্থ হইল কৃষক সমাজকে তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ মিত্র ও নেতার সাহায্য হইতে বঞ্চিত করা। শ্রমিক শ্রেণি নেতা রহিল কেবল "তত্ত্বগত ভাবে", কেবল পার্টির মাধ্যমে, কেননা পার্টির সংজ্ঞা দেওয়া হয় শ্রমিক শ্রেণির পার্টির হিসাবে।

কাজের ক্ষেত্রে উভয় নীতিরই অর্থ হইল ঐক্যবদ্ধ জাতীয় মোর্চার (ইউনাইটেড ন্যাশনাল ফ্রন্ট) ভিত্তি হিসাবে শ্রমিক শ্রেণি ও কৃষক সমাজের মৈত্রী গড়িয়া তোলার দায়িত্বকে উপেক্ষা করা, উভয় নীতিরই অর্থ হইল সম্মিলিত জাতীয় মোর্চা গঠনের দায়িত্বকে উপেক্ষা করা এবং মুক্তি সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় মোর্চার শীর্ষস্থানে শ্রমিক শ্রেণিকে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্বকে উপেক্ষা করা।

একথা বুঝিতে হইবে যে এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভুল। শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্ব শুধুমাত্র পার্টির মধ্য দিয়া ও কৃষক সংগ্রামে পার্টির নেতৃত্ব মারফতে কার্যকরী হয় না; বাস্তবিক পক্ষে শ্রমিক

শ্রেণির নেতৃত্ব কার্যকরী হয় কাজের মধ্য দিয়া, শ্রমিক শ্রেণি কর্তৃক কৃষক সমাজের দাবি-দাওয়ার সুদৃঢ় সমর্থনের মধ্য দিয়া এবং শ্রমিক শ্রেণি কর্তৃক কৃষক সংগ্রামকে সক্রিয় ভাবে সাহায্য করার মধ্য দিয়া। কাজের ক্ষেত্রে এবং ঘটনার মধ্য দিয়া শ্রমিক শ্রেণি ও কৃষক সমাজের মৈত্রী কার্যকরী হইতে হইবে, শুধু তত্ত্বগত দিক দিয়া নয়। শ্রমিক শ্রেণি হইল কৃষকের সংগ্রামের বন্ধু, সংগ্রামী কৃষককে শ্রমিক শ্রেণি নিশ্চয়ই সাহায্য করিবে এবং উভয়েরই যে শত্রু তাহার পরাজয়কে নিশ্চিত করিবে।

ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষীর উপর নির্ভর করিয়া, কৃষক সমাজের সহিত মৈত্রীর দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, সমগ্র জনতার সহযোগিতায় শ্রমিক শ্রেণি শহরে ও গ্রামাঞ্চলে মুক্তির সংগ্রামে, জমি ও রুটির লড়াইয়ে, সকলের জন্য কাজ ও শান্তির সংগ্রামে নেতৃত্ব করে।

কেন্দ্রীয় কমিটি চায় যে কমরেডরা যেন ইতিহাসের এই মহতী শিক্ষাকে আত্মস্থ করেন। এ শিক্ষা নিছক রুশিয়ার পথ নয়, আবার নিছক চীনের পথও নয়, ইহা হইল ভারতের অবস্থায় প্রযুক্ত লেনিনবাদের পথ।

আমাদের পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে এই উপলব্ধি আসিলে আমাদের গণ-আন্দোলন, আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন ও কিষান সভা কিভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে, আমাদের পার্টিকে কোন্ নতুন পথে গড়িয়া তুলিতে হইবে সেই সম্পর্কে আমরা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করিব।

এই উপলব্ধি আসিলে কমরেডরা আরও দেখিতে পাইবেন যে সশস্ত্র সংগ্রাম হইবে কি না, ইহাই প্রধান প্রশ্ন নয়; অহিংসা বা হিংসাও প্রধান প্রশ্ন নয়। প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শ্রেণিগুলিই জনগণের বিরুদ্ধে জোর জবরদস্তি ও হিংসার আশ্রয় নেয়; আমরা হিংসায় বিশ্বাস করি কিংবা অহিংসায় বিশ্বাস করি, এ প্রশ্ন তাহারাই উপস্থাপিত করে। এইভাবে প্রশ্নের অবতারণা গান্ধীবাদী মতাদর্শেরই পরিচায়ক। কার্যত ইহা জনগণকে বিভ্রান্তই করিয়া থাকে। ইহা হইতে আমাদের অবশ্যই মুক্ত থাকিতে হইবে। বহুকাল পূর্বেই মার্ক্সবাদ এবং ইতিহাস পার্টির জন্য এবং দুনিয়ার সকল দেশের মানুষের জন্য এই প্রশ্নের চূড়ান্ত জবাব চিরতরে দিয়া রাখিয়াছে। মুক্তির পথে স্বকীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য জনগণ যাহা কিছু করে তাহাই পরম পবিত্র কর্তব্য। প্রগতি ও স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথে অবক্ষয় ও প্রতিক্রিয়ার যে স্তূপীকৃত জঞ্জাল পড়িয়া রহিয়াছে তাহা দূর করার জন্য জনসাধারণ যাহা কিছু করা স্থির করে তাহাই ইতিহাসের অনুমোদিত।

ইহা হইতেই আমরা বুঝিব যে আমাদের পূর্বতন ধারণাগুলি একদেশদর্শী ও ভ্রান্তিদুষ্ট এবং সেই কারণেই পরিত্যাজ্য।

ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর

কিন্তু এক ধরনের কাজকে ইতিহাস অনুমোদন করে না তাহা হইল ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ।

ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ প্রযুক্ত হয় কোন শ্রেণি বা কোন ব্যবস্থার ব্যক্তিগত সদস্যের বিরুদ্ধে, এবং কোন ব্যক্তি, গ্রুপ বা স্কোয়াড সেই সন্ত্রাসবাদ কার্যকরী করে। যে ব্যক্তিরা এইভাবে কাজ করেন তাঁহারা বীর ও নিঃস্বার্থ হইতে পারেন; জনসাধারণ তাঁহাদের গুণগান করিতে পারে কিংবা সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য অনুরোধ করিতে পারে; যাহাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতি প্রযুক্ত হয় তাহারা জনসাধারণের চোখে চরম ঘৃণার পাত্রও হইতে পারে। কিন্তু তবুও মার্ক্সবাদ এই পদ্ধতিকে অনুমোদন করে না। এই অনুমোদন না করার কারণ

কি? কারণ সুস্পষ্ট—ইহাতে জনগণের কোনও ভূমিকা নাই। সন্ত্রাসবাদ হইতে এই বিশ্বাসই উদ্ভূত হয় যে জনগণের পক্ষ হইতে কয়েকজন বীর সব কাজ সমাধা করিয়া দিবে। সন্ত্রাসবাদ হইতে এই ধারণা জন্মে যে অনেকগুলি সন্ত্রাসবাদী কার্য ঘটিলে তাহার একত্র অর্থ হইল বিভিন্ন শ্রেণির কিংবা শ্রেণি ব্যবস্থার বিলোপ। শেষ পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদ জনগণকে নিষ্ক্রিয়তা ও জড়তার দিকে লইয়া যায়, জনতার স্বকীয় উদ্যোগ ও বিপ্লবী পথে বিকাশ বন্ধ করিয়া দেয় এবং শেষ ফল হয় পরাজয়। সুতরাং, মার্ক্সবাদ ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সতর্ক হইতে বলে—মার্ক্সবাদে ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ নিষিদ্ধ।

আশু পরিস্থিতি ও কর্তব্য

এইবার একটি প্রশ্নের উত্তর বাকি থাকে এবং তাহা গুরুত্বপূর্ণ—পথের সন্ধান আমরা পাইয়াছি, পরিপ্রেক্ষিতও বুঝিয়াছি, কিন্তু এখন কি করণীয়? আশু কর্তব্যের যে প্রশ্ন তাহা নিশ্চয়ই পরিপ্রেক্ষিত দ্বারা প্রভাবিত হয় কিন্তু তাহা দ্বারা সম্পূর্ণ নির্ধারিত হয় না। বর্তমান পরিস্থিতির প্রকৃতি-নিরূপণের উপরেও উহা নির্ভর করে। সরকার কতদূর বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, জনসাধারণ কতদূর মোহমুক্ত হইয়াছে, সংগ্রামের জন্য তাহারা কতদূর পর্যন্ত প্রস্তুত—এইরূপ অনেকগুলি প্রশ্নের উপর এখনই আমরা কি কি করিব এবং কি কি আওয়াজ ("শ্লোগান") তুলিব তাহা নির্ভর করে।

কিছু লোক বলে যে সরকার একেবারে অপদস্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। জনসাধারণ বিদ্রোহ করার জন্য প্রস্তুত এবং কোন কোন জায়গায় তাহারা সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষেও নামিয়াছে, এবং সরকার বেপরোয়াভাবে পুলিশী গুলির জোরে শাসন চালাইয়া ইতিমধ্যেই দেশে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং পরিস্থিতি সম্বন্ধে এই বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের সব কাজ চালাইতে হইবে। এই প্রশ্ন লইয়া বিস্তারিত যুক্তিতর্কের প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে সরকারের সংকট আজ গভীর; কিন্তু সরকার এখনও পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই। পার্টির কর্মসূচিতে এ বিষয়ে বলা হইয়াছে, "জনগণ বর্তমান সরকারের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছে; এই সরকারের প্রতি গভীর সন্দেহ পোষণ করিতে এবং এই সরকারকে শত্রু বলিয়া মনে করিতে শুরু করিয়াছে—কেননা এই সরকার জনগণের বিরুদ্ধে জমিদার মহাজন ও অন্যান্য শোষকদের রক্ষা করিতেছে।" সুতরাং "অনশন ও তিলে তিলে মৃত্যুর এই অবস্থা অসহ্য হইয়া পড়ায় মোহমুক্ত জনগণ ধীরে ধীরে সংগ্রামের পথে পা বাড়াইতেছে।" কিন্তু যদি বলা হয় যে, দেশ সশস্ত্র অভ্যুত্থান বা বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ব স্তরে পৌঁছাইয়া গিয়াছে কিংবা যদি বলা হয় যে দেশে এখনই গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বলিতেছে, তাহা হইলে নিছক অত্যুক্তি করা হইবে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণে যদি আমরা এইরূপ ভুল করি, তাহা হইলে হঠকারিতার ("অ্যাডভেঞ্চারিজম্") পথে পরিচালিত হইব আর জনগণকে যে সমস্ত শ্লোগান দিব তাহার সহিত তাহাদের চেতনা, ধারণা ও প্রস্তুতির কোন সামঞ্জস্য থাকিবে না; সরকারের বিচ্ছিন্নতার সঙ্গেও তাহার সামঞ্জস্য থাকিবে না। ঐরূপ শ্লোগান দিলে আমরাই জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িব এবং জনগণকে সংস্কারবাদী ভেদপন্থীদের হাতে তুলিয়া দিব।

আবার যাহারা জনসাধারণের শক্তিসমূহের মধ্যে কেবল অনৈক্যই দেখিতে পায়, প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ ছাড়া যাহাদের চোখে আর কিছুই পড়ে না, নতুন করিয়া শক্তি সমাবেশের নামে যাহারা কেবল পিছু হঠার নীতিই প্রচার করে, সরকারি দমননীতিকে ডাকিয়া আনা হইবে এই অজুহাতে যাহারা সর্বপ্রকার সংগ্রামী কার্যক্রম এড়াইয়া চলিতে চায়, তাহারাও সমভাবে ভ্রান্ত। আমাদের কর্মকৌশল যদি পরিস্থিতি সম্পর্কে ঐরূপ ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে আমরা জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিব ও শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিব।

সুবিবেচনা সহকারে পরিস্থিতির প্রকৃতি-নিরূপণের ভিত্তিতেই জনসাধারণের সংগ্রামে আমাদের নেতৃত্ব দিতে হইবে। আমরা যেমন হঠকারিতার পথে পরিচালিত হইব না, তেমনি আবার আমরা ইহাও ভুলিয়া যাইব না যে সংকট বাড়িয়াই চলিয়াছে, সংকটের সমাধান হইতেছে না। সুতরাং আমরা যেন কিছুতেই ঢিমেতালে ঢঙে কাজ না করি এবং এমন ভাবে আচরণ না করি যাহা হইতে মনে হয় কোন গভীর সংকট জনজীবনকে মথিত করিতেছে না এবং কোন দারুণ সংগ্রামের নিশানা সম্মুখে দেখা যাইতেছে না। অভ্যুত্থান এবং গৃহযুদ্ধ নাই বলিয়া কেহ কেহ এমনভাবে চলিতে ও কাজ করিতে চান যাহাতে মনে হয় যে তাঁহারা যেন নানারকমের অধিকার ও স্বাধীনতাসহ এক গণতন্ত্রে বাস করিতেছেন এবং পার্টিকে ও গণ-সংগঠনসমূহের নেতৃত্বকে মত্ততাগ্রস্ত আইনের আক্রমণ হইতে রক্ষা করার জন্য যেন কিছু করার প্রয়োজন আর নাই। ঐরূপ মনোভাব থাকিলে আমাদের শক্তি চূর্ণ হইয়া যাইবে, আমরা কিছুই গড়িয়া তুলিতে পারিব না।

কিন্তু সংকট আরও গভীর হইতেছে বলিয়া এবং খাদ্যের জন্য সাধারণ এক মিছিলের (যেমন কোচবিহারে) ফলে পর্যন্ত গুলি চলে আর হাজারে হাজারে লোক রাস্তায় সামিল হয় দেখিয়া কেহ কেহ গণ-সংগঠন পরিচালনার দৈনন্দিন উত্তেজনাহীন কাজ একেবারে বাতিল করিয়া দিতে চান। ফ্যাসিজম্ অবশ্যম্ভাবী কিংবা এখনই গদি দখল করিয়াছে—এইরূপ ধরিয়া নিয়া তাঁহারা পার্লামেন্টের নির্বাচন কিংবা, নানাবিধ অধিকারের সংগ্রামকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন, অথচ এই লড়াইয়ে জনসাধারণের ব্যাপক অংশসমূহকে সমাবেশ করা যায় ও করা উচিত।

আমাদের বুঝিতে হইবে যে দেশের জনগণের মধ্যে দ্রুতগতিতে প্রগতিশীল মনোভাব সঞ্চারিত হইলেও এবং বহু স্থানে তাহারা সংগ্রামের সামিল হইলেও বর্তমান সরকার এবং তাহার নীতি ও পদ্ধতির বিরুদ্ধে অসন্তোষ যত বাড়িয়াছে জন-আন্দোলন সে অনুপাতে বাড়ে নাই। ইহার কারণ শুধু সরকারি দমননীতি বলিলে ভুল হইবে। জন-আন্দোলনের এই দুর্বলতার কারণ হইল সর্বোপরি আমাদের পার্টির দুর্বলতা এবং প্রগতিশীল শক্তিসমূহের শিবিরে অনৈক্য। সুতরাং, পার্টিকে এই অনৈক্য দূর করার জন্য চেষ্টা করিতেই হইবে। সকল প্রগতিশীল শক্তির ঐক্য যে আজ পরম প্রয়োজন তাহার উপরে পার্টিকে বিশেষ জোর দিতে হইবে, কাজের মধ্য দিয়া এই ঐক্য পার্টিকে গড়িয়া তুলিতেই হইবে এবং সংগ্রামী জনতার মধ্য হইতে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ কর্মী তাঁহাদের পার্টির মধ্যে টানিয়া আনিয়া প্রকৃত গণপার্টি হিসাবে দাঁড়াইতে হইবে।

পার্লামেন্টের নির্বাচনে এবং অন্যান্য নির্বাচনে আমরা নিশ্চয়ই লড়িব; যেখানেই নির্বাচন মারফত জনগণের ব্যাপক অংশকে সমাবেশ করা যায় এবং তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা যায়

এমন সব নির্বাচনেই আমরা লড়িব। জনতা যেখানে, আমরাও সেখানে থাকিব; জনতা আমাদের যেখানে চায় সেখানেই আমরা থাকিব।

শ্রমিক শ্রেণির ঐক্য ও পার্টির ভূমিকা

পার্টিকে শ্রমিক শ্রেণির ঐক্য গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং সমগ্র জনগণের প্রতি তাহার কর্তব্য বিষয়ে শ্রমিক শ্রেণিকে সজাগ করিতে হইবে। বর্তমানে শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনে যে বিভেদ রহিয়াছে, যে বিভেদ শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামের বিকাশকে ব্যাহত করিতেছে, তাহাকে যে কোনও উপায়ে এবং যথাসম্ভব স্বল্প সময়ে অতিক্রম করিতেই হইবে, এবং শ্রমিক শ্রেণির ঐক্যবদ্ধ গণ-সংগঠন গড়িয়া তুলিতেই হইবে।

রাজনীতির দিক হইতেও শ্রমিক শ্রেণিকে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে। একমাত্র ঐক্যবদ্ধ এবং রাজনীতি-সচেতন শ্রমিক শ্রেণিই জনসাধারণের নেতৃত্বের ভূমিকা পূরণ করিতে পারে।

ভূমি ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য সংগ্রামে ধনী কৃষক সমেত কৃষক সমাজের সমস্ত অংশকেই আমাদের জাগাইয়া তুলিতে হইবে; আর এই সংগ্রামের মারফতে কৃষক সমাজের বৃহত্তর অংশ যে ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষীরা, তাহাদের মধ্যে নিজেদের দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদের ঐক্যবদ্ধ কৃষক গণ-সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে।

একথা বুঝিতেই হইবে যে আমাদের দেশের আয়তনের বিপুলতার দরুন, কৃষিসংকট এবং শ্রমিক শ্রেণি ও কৃষক আন্দোলনের অসম-বিকাশের দরুন, কৃষকসাধারণের সংগঠন ও সচেতনতা এবং পার্টির প্রভাবের অসমান বিকাশের দরুন কৃষক আন্দোলন সর্বত্র সমান গতিতে আগাইয়া যাইবে না এবং সংকটের পরিপক্কতা, কৃষকসাধারণের ঐক্যবদ্ধতার মাত্রা ও তাহাদের মেজাজ, পার্টির শক্তি ও প্রভাব এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া সংগঠন ও সংগ্রামের ভিন্ন ভিন্ন ধরন অবলম্বন করিতে হইবে।

এই সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইলে প্রয়োজন জনগণের মধ্যে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে এবং ধৈর্য সহকারে দিনের পর দিন কাজ করিয়া যাওয়া, আমাদের বুনিয়াদী কর্মসূচি এবং জনগণের আশু ও দৈনন্দিন দাবি-দাওয়া লইয়া অবিশ্রাম আন্দোলন চালানো, সাধারণ এবং স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী ঐ সব দাবি-দাওয়াকে জনসাধারণের প্রত্যেকটি অংশের উপযোগী বাস্তব রূপদান করা, গণ-সংগ্রামে হাতে-কলমে নেতৃত্ব দেওয়া, বিভিন্ন ধরনের সংগ্রামকে সম্মিলিত করা এবং নিয়মিতভাবে বিভিন্ন গণ-সংগঠনের জাল গড়িয়া তোলা।

"সর্বোপরি প্রয়োজন ধৈর্যশীল সংগ্রামের মধ্য দিয়া কমিউনিস্ট পার্টিকে গড়িয়া তোলা— যে পার্টি মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্বে হইবে সুসজ্জিত, কর্মকৌশল ও কর্মনীতি সম্পর্কে হইবে সুদক্ষ, হইবে আত্মসমালোচনা ও কঠোর শৃঙ্খলায় নিষ্ঠাশীল এবং জনগণের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত।"

গণ-সংগঠনসমূহ এবং পার্টি এমনভাবে গড়িয়া উঠিবে যাহাতে তাহাদের নিজেদের বিরুদ্ধে এবং জনগণের আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকার যে অব্যাহত দমন-পীড়নের তাণ্ডব চালাইয়া থাকে তাহাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাহাদের অবশ্যই থাকে।

শান্তির জন্য সংগ্রাম

জনসাধারণের স্বার্থে আমাদের যে সমস্ত মৌলিক কর্তব্যের সম্মুখীন হইতে হয়, তাহার একটি হইল শান্তি-আন্দোলন গড়িয়া তোলা। সমস্ত গণসংগঠনে, সমস্ত ক্ষেত্রে শান্তির জন্য সংগ্রাম হইবে আমাদের কাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জনগণের সক্রিয় চেতনায় আমাদের এই কথা জাগাইয়া তুলিতে হইবে যে নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য শাসক শ্রেণিগুলি সর্বদাই চেষ্টা করিবে আমাদিগকে—অর্থাৎ জনগণকে—একটা যুদ্ধের মধ্যে ঠেলিয়া দিতে, যাহাতে শাসক শ্রেণিগুলির বিরুদ্ধে আমাদের যে যুদ্ধ তাহা হইতে আমরা নিরস্ত হই। তৃতীয় একটি বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার নিদারুণ বিপদ সম্পর্কে এবং জনগণ সংকল্পবদ্ধ হইলে যে সে বিপদ এড়ানো যায় এই সম্ভাব্যতা সম্পর্কে জনসাধারণকে আমাদের সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে। জনসাধারণকে আমাদের একথাও বুঝাইতে হইবে যে শান্তিরক্ষার জন্য যে কোন শ্রেণি বা দল কিংবা বর্তমান সরকারও কিছু করিলে আমরা তাহা সমর্থন করি, কিন্তু আমরা কিছুতেই ভুলিতে পারিনা যে সাম্রাজ্যবাদী, যুদ্ধবাজ, জমিদার ও মুনাফাখোরদের প্রভাবাধীন এই সরকার শান্তি সম্পর্কে সুসঙ্গত ও অকপট নীতি অনুসরণ না করিয়া তাহাদের রেষারেষি হইতে কিছু লাভের প্রত্যাশায় আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মধ্যে খেলা চালাইতেছে; শান্তিপ্রিয় দেশগুলি ও যুদ্ধবাজ দেশগুলির মধ্যেও সে এই খেলা খেলিতেছে। জনগণের সক্রিয়তার জোরে এই অসঙ্গতিকে অতিক্রম করিতে হইবে। পাকিস্তান, ভারত ও সিংহলের মধ্যে শান্তিচুক্তি, আণবিক বোমার উপর নিষেধাজ্ঞা, অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস এবং সামরিক খাতে ব্যয়সঙ্কোচের দাবি লইয়া আমাদের সংগ্রাম চালাইতে হইবে। সর্বোপরি, আমাদের সংগ্রাম চালাইতে হইবে বৃহৎ পঞ্চশক্তির মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদনের জন্য। জমি, খাদ্য, রুজি রোজগার—জনগণের নিজস্ব যে সব সমস্যা রহিয়াছে সকলের সমৃদ্ধি-সাধনের যে সমস্যা রহিয়াছে—তাহার সঙ্গে সামঞ্জস্য-বিধান করিযা শান্তি আন্দোলন জনগণের চক্ষে বাস্তব করিয়া তুলিতে হইবে।

ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে ঔপনিবেশিক যুদ্ধ চালাইতেছে, শান্তি আন্দোলনকে তাহার বিরুদ্ধে ব্যাপকতম প্রতিরোধ সংগঠিত করিতে হইবে এবং বর্তমান ভারত সরকার এই সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে সাহায্য দেয় তাহা নিবৃত্ত করিতে হইবে।

কমিউনিস্ট পার্টি যে কর্মসূচি জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছে, সেই কর্মসূচির সহিত দেশের সকল প্রগতিশীল শক্তি ও শ্রেণির স্বার্থেরই সঙ্গতি আছে; যাহারা ভারতকে স্বাধীন, সুখী ও শক্তিশালী দেখিতে চায় তাহাদেরই স্বার্থের সামঞ্জস্য আছে। তাই এই কর্মসূচিকে সফল করার জন্য আমরা সমগ্র জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিব এবং জনসাধারণের জীবনে যে সমস্ত সমস্যা রহিয়াছে তাহার সমাধানে কাজের ভিতর দিয়া ঐক্য গড়িয়া তুলিব। আমরা জনসাধারণের সকল অংশেরই সংগ্রামের বিকাশ সাধনে তৎপর হইব এবং স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও শান্তির সমগ্রিক আন্দোলনে বিভিন্ন সংগ্রামের ধারাকে মিলাইয়া দিবার চেষ্টা করিব।

এই সমস্ত কর্তব্য পালন করিতে গিয়া প্রত্যেকটি জেলা ও প্রদেশে এবং সামগ্রিক ভাবে সারা দেশে শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য শ্রেণি ও সমাজের বিভিন্ন অংশের যে সমস্ত সংগ্রাম চলে,

সেগুলিকে সম্মিলিত করার কৌশল আমাদিগকে আয়ত্ত করিতে হইবে। এই সমস্ত সংগ্রাম হইতে যে বীর যোদ্ধারা বাহির হইয়া আসিবেন, তাঁহারাই পরিণত হইবেন পার্টির স্রষ্টা ও সংগঠকে; তখনই আমাদের পার্টি পরিণত হইবে একদিকে প্রকৃত জনগণের পার্টিতে, আবার অন্যদিকে কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিপ্লবীদের সুসংহত পার্টিতে। আমাদের পরিপ্রেক্ষিত এবং আমাদের পথ আজ স্পষ্ট; আশু কর্তব্যের রূপরেখা আজ নিরূপিত; সামন্ত-তন্ত্রী ও সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীতদাসত্বের বিরুদ্ধে আমাদের মুক্তির সংগ্রাম নিশ্চয়ই সফল হইবে, বর্তমান গণতন্ত্র-বিরোধী সরকারের জায়গায় জনগণের গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত করিতে নিশ্চয়ই আমরা সক্ষম হইব।

টিকা : অনিল বিশ্বাস সম্পাদিত 'বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন' বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডের পৃ. ৩০৪-এ দলিলটির নাম 'কৌশলগত দিক' (Tactical Line)। এই দলিলের মুখবন্ধে উক্ত বইয়ের সম্পাদকমণ্ডলী বলেছেন, "এই দলিল সি পি আই পলিটব্যুরোতে উপস্থাপন করা হয়। সেখান থেকে পার্টি বিভিন্ন স্তরে আলোচনা চালিয়ে ১৯৫১ সালের মে মাসে একটি নীতি সংক্রান্ত বিবৃতি তৈরি হয়। ১৯৫১ সালের অক্টোবরে সর্বভারতীয় পার্টি সম্মেলনে ঐ বিবৃতিটি সামান্য সংশোধন করে গৃহীত হয়।"

'সি পি আই ডক্যুমেন্টস'-এর vol. VIII-এর সম্পাদক মোহিত সেন, পৃ. ১৯-এ একই দলিল প্রকাশ করেছেন "Tactical Line" এই শিরোনামে। এই দলিলের ফুটনোটে তিনি বলেছেন, "This document was drafted in consultation with the leaders of the CPSU and adopted by the CC in April, 1951 and circulated illegally. A legal version was adopted by the Calcutta Conference and published.... " অর্থাৎ মোহিত সেন-এর কথামত Tactical Line দলিলটি গৃহীত হয়েছিল ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসের কেন্দ্রীয় কমিটিতে। এটি সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার মধ্যে দিয়েই তৈরি হয়েছিল। Legal Version গৃহীত হয়েছিল কলকাতা সম্মেলনে Statement of Policy of the Communist Party of India নামে। এটির বাংলা হল সি পি আই-এর নীতি সংক্রান্ত বিবৃতি। (—সম্পাদক)

প্রকাশ্য প্রাদেশিক কেন্দ্র গঠন প্রসঙ্গে

প্রকাশ্য প্রাদেশিক কেন্দ্র গঠন সম্বন্ধে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি গত ১০ই এপ্রিল তারিখে একটি সার্কুলার প্রচার করিয়াছিল। পশ্চিমবাংলায় গণ আন্দোলন আবার ধীরে ধীরে মাথা তুলিতেছে। এই গণ আন্দোলনকে সংগঠন হিসাবে গড়িয়া তোলা একান্ত দরকার। তাহা ছাড়া কয়েক মাসের ভিতরে বয়স্ক ব্যক্তি মাত্রেরই ভোটে আমাদের দেশে প্রথম নির্বাচন হইবে। এই নির্বাচনের জন্যও আমাদের তৈয়ারি হইতে হইবে। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটির একটি বর্ধিত সভা পশ্চিমবাংলায় প্রকাশ্য প্রাদেশিক কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। এইরকম একটি কেন্দ্র স্থাপিত না হইলে ক্রমবর্ধমান আন্দোলন ও নির্বাচন কার্যের পরিচালনা করা সম্ভবপর নয়।

পি.ও.সি'র বর্ধিত সভার ইহাও একটা সিদ্ধান্ত ছিল যে, প্রকাশ্য প্রাদেশিক কেন্দ্রের সভ্যদের নাম পাকাপাকিভাবে ঘোষণা করার আগে সমস্ত বিষয়টি পার্টির বিভিন্ন জিলার ও পি.ও.সি. ইউনিটগুলির প্রতিনিধিদের সামনে পেশ করিতে হইবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে বর্তমান মে মাসের ৮ই ও ৯ই তারিখে বিভিন্ন জিলা পার্টি ও ইউনিটগুলির এক সভার অধিবেশন হইয়াছে। দীর্ঘ আলোচনার পরে প্রতিনিধিরা এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন :

(১) প্রকাশ্য পার্টি কেন্দ্র স্থাপন একান্ত প্রয়োজন।

(২) আপাতত দেড় মাসের জন্য নিজ দায়িত্বে পি.ও.সি. প্রকাশ্য পার্টিকেন্দ্রের সভ্যদের মনোনীত করিবেন।

(৩) ইতিমধ্যে পি.ও.সি. ১৫ জন সভ্যের একটি নামের তালিকা প্রকাশ করিবে। তালিকায় যাঁহাদের নাম থাকিবে তাঁহাদের কাজের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও দিতে হইবে। এই তালিকায় প্রস্তাবিত নামগুলি ছাড়াও পার্টির বিভিন্ন ইউনিট ইচ্ছা করিলে আরও নাম প্রস্তাব করিতে পারিবে।

(৪) তালিকা প্রচারিত হওয়ার পরে আবার একটি প্রতিনিধি সভা ডাকা হইবে এবং এই সভা স্থির করিবে কে কে প্রকাশ্য পার্টি কেন্দ্রের সভ্য হইবেন।

প্রতিনিধিদের সবার মত অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের পি.ও.সি. নিম্নলিখিত কমরেডদের প্রকাশ্য পার্টিকেন্দ্রের সভ্য মনোনয়ন করিতেছে :

১। বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় ২। জ্যোতি বসু ৩। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ৪। মণিকুন্তলা সেন ৫। জলি মোহন কল ৬। প্রমোদ দাশগুপ্ত ৭। প্রমথ ভৌমিক ৮। নন্দলাল বসু।

এই সব নাম ও আরও কয়েকটি নাম আগেই প্রচারিত হইয়াছিল। প্রতিনিধিদের সবার

সামনেও এই নামগুলি ছিল। অধিকাংশ প্রতিনিধির আপত্তি হওয়ায় কমরেড অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থাটি অস্থায়ী। প্রকাশ্য কেন্দ্রের সভ্যদের ঘন ঘন কলিকাতায় মিলিত হইতে হইবে। এইজন্য মফস্বল জিলার কাহাকেও মনোনীত করা হয় নাই। দুইটি প্রাদেশিক কেন্দ্রের ব্যবস্থা আমাদের পার্টি জীবনে সম্পূর্ণ নতুন। কাজের ভিতর দিয়াই আমাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইবে। আমাদের ভবসা আছে যে, এই প্রকাশ্য পার্টি কেন্দ্র স্থাপনের দ্বারা আমাদের আন্দোলন অনেক বেশি আগাইয়া যাইবে। আমরা একান্তভাবে প্রত্যেক পার্টিসভ্যের সহযোগিতা কামনা করিতেছি।

পরে আরও একটি সার্কুলার আমরা প্রচার করিব। সেই সার্কুলারে ৮ই ও ৯ই মে তারিখের সভার সিদ্ধান্তের দ্বিতীয় অংশ অনুসারে তালিকা ইত্যাদি দেওয়া হইবে।

অভিনন্দন সহ

১৬ মে ১৯৫১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

জেলা ও প্রাদেশিক পার্টি সম্মেলন

আপনারা সকলেই ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই পার্টি সম্মেলন সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় কমিটির সার্কুলার দেখিয়াছেন। এই সার্কুলারে বলা হইয়াছে যে, সারা ভারত পার্টি সম্মেলন খুব শীঘ্রই বসিতেছে। জেলা ও প্রাদেশিক পার্টি সম্মেলনগুলির ভিত্তি কি হইবে তাহাও এই সার্কুলারে দেওয়া হইয়াছে।

এই বিষয়ে আলোচনার জন্য কিছুদিন পূর্বে জেলা প্রতিনিধিদের এক বৈঠক হয়। এই বৈঠকে আগামী পার্টি সম্মেলনগুলি অনুষ্ঠানের করণীয় বিষয় সম্পর্কে জেলার রিপোর্ট লওয়া হয় এবং জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠানের পদ্ধতি বিষয়ে কতকগুলি সাধারণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

পার্টি সম্মেলন সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব এবং প্রতিনিধিদের বৈঠকে সংগৃহীত রিপোর্টের ভিত্তিতে পি.ও.সি. নিম্নোক্তরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ঃ

১। প্রাদেশিক সম্মেলন অগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ে হইবে।

২। জেলা সম্মেলনগুলির কাজ অগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই শেষ করিতে হইবে।

৩। প্রত্যেক জেলায় পার্টি-সভ্যদের তালিকাগুলি যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে। এবং সংশোধিত সভ্যতালিকা প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটির নিকট জেলা সম্মেলনের পূর্বে পাঠাইতে হইবে। এই কাজের জন্য ডি.ও.সি'কে একটি সাব-কমিটি নিয়োগ করিতে হইবে।

৪। যে-সমস্ত জেলার সভ্য সংখ্যা এত কম যে সমস্ত সভ্যদের নিয়াই জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠান করিতে কোন অসুবিধা হয় না, সেই সব জেলা ব্যতীত অন্য জেলাগুলিতে (যেখানে সভ্য সংখ্যা খুব বেশি) জেলা সম্মেলনের পূর্বে স্থানীয় সম্মেলন করিতে হইবে। ঐ সম্মেলনে সমস্ত সভ্যরা উপস্থিত থাকিয়া জেলা সম্মেলনের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন।

৫। জেলা সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় নিম্নোক্তরূপ হইবে ঃ

(ক) পার্টি খসড়া কর্মসূচি ও কর্মনীতি বিষয়ক বিবৃতি-র উপর আলোচনা—এই বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ।

(খ) জেলার আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ও কার্যবিবরণীর আলোচনা—সম্ভব হইলে বিগত তিন বৎসরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে হইবে এবং পার্টির ও গণসংগঠনগুলির বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।

(গ) বিভিন্ন গণসংগঠনে যথা—কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র প্রভৃতিকে পার্টির কাজ ও দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে।

(ঘ) জেলার জনতার জীবনের প্রধান রাজনৈতিক বিষয়গুলি যথা—খাদ্য ও বস্ত্র প্রভৃতি

সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হইবে।

(ঙ) আগামী নির্বাচনে পার্টির কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে।

(চ) জেলা কমিটি নির্বাচন ও প্রাদেশিক সম্মেলনের প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে হইবে।

৬। জেলা সম্মেলনের পূর্বে পি.ও.সি'র প্রতিনিধি সমস্ত জেলা কমিটিগুলির নিকট উপস্থিত হইয়া 'খসড়া প্রোগ্রাম' ও খসড়া কর্মনীতি সম্পর্কে প্রশ্নগুলির আলোচনা করিবেন। সম্ভব হইলে কোন কৌন স্থানে তাঁহারা ডি.ও.সি'র অন্তর্ভুক্ত স্থানীয় কমিটিতেও আলোচনার জন্য উপস্থিত হইতে চেষ্টা করিবেন। জেলা সম্মেলনেব সময়েও পি.ও.সি'র প্রতিনিধি জেলা সম্মেলনে উপস্থিত থাকিতে চেষ্টা করিবেন।

৭। জেলা সম্মেলনের তারিখ ও সম্মেলন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়গুলি এবং কি ভিত্তির উপর জেলা সম্মেলনের প্রতিনিধি নির্বাচন হইবে সেই সব বিষয়ে ডি.ও.সি'কে পি.ও.সি'র সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিতে হইবে।

যে সমস্ত জেলায় পি.ও.সি. প্রতিনিধি এখনো খসড়া প্রোগ্রাম সম্বন্ধে আলোচনার জন্য উপস্থিত হন নাই সেই সব জেলাগুলি অবিলম্বে এই বিষয়ে সময় প্রভৃতি স্থির করিবার জন্য এই সার্কুলার পাওয়ামাত্র পি.ও.সি'র সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

৮। প্রাদেশিক সম্মেলন—

(ক) এইরূপ স্থির করা হইয়াছে যে, প্রাদেশিক সম্মেলন প্রকাশ্যভাবে কলিকাতা শহরে অথবা শহরতলীতে অনুষ্ঠিত হইবে। সম্মেলনের প্রতিনিধি—আত্মগোপনকারী কমরেডরা, যদিও শারীরিকভাবে এই প্রধান সম্মেলনে উপস্থিত হইতে না পারেন, তাহা হইলেও যাহাতে তাঁহারা মতামত পাঠাইয়া সম্মেলনে অংশগ্রহণ করিতে পারেন সেইমত ব্যবস্থা করা হইবে।

(খ) প্রতি ২৫ জন পার্টিসভ্যের পক্ষ হইতে ১ জন প্রতিনিধিকে সম্মেলনে অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে। কোন জেলায় ২৫ জনের কম সভ্য থাকিলে সেই জেলাও ১ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(গ) প্রাদেশিক পার্টি সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় নিম্নোক্তরূপ হইবে ঃ

(১) গত প্রাদেশিক সম্মেলন হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত কালের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা। (২) বিভিন্ন গণসংগঠনে পার্টির কাজ সম্পর্কে খসড়া প্রস্তাবের উপর আলোচনা। (৩) জনতার জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে পার্টির কাজ সম্বন্ধে খসড়া প্রস্তাবের উপর আলোচনা। (৪) আগামী নির্বাচনে পার্টির কাজ সম্পর্কে আলোচনা। (৫) পার্টির খসড়া কর্মসূচি ও খসড়া কর্মনীতির উপর আলোচনা। (৬) ভূতপূর্ব প্রাদেশিক কমিটির সভ্যদের সম্পর্কে বিশেষ তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের উপর আলোচনা। (৭) পার্টির দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজের সম্বন্ধে রিপোর্ট ও সেই সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ। (৮) প্রাদেশিক কমিটি নির্বাচন ও সারা ভারত পার্টি সম্মেলনের প্রতিনিধি নির্বাচন।

আগামী জেলা, প্রাদেশিক ও সারা ভারত পার্টি সম্মেলনগুলি আশা করা যাইতেছে পার্টিতে পরিপূর্ণ একতা প্রতিষ্ঠার পথে একটি বড়রকমের কাজ করিবে। অবশ্য এই একতা নির্ভর করিবে খসড়া কর্মসূচি ও খসড়া কর্মনীতিতে যে কর্মধারা নেওয়া হইতেছে সেই সম্বন্ধে আমরা কত গভীরভাবে আলোচনা করিয়াছি এবং কত গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছি তাহার উপরে। এই উপলব্ধি কখনই গভীরতর হইতে পারে না যদি আমরা গণআন্দোলন ও

গণসংগঠন গড়িয়া তোলার জটিলতার সহিত উহাকে না মিলাইতে পারি। পার্টিতে পরিপূর্ণ একতা প্রতিষ্ঠার জন্য শেষ পর্যন্ত একটি পার্টি কংগ্রেসের অনুষ্ঠান করা অবশ্য প্রয়োজনীয় হইবে। কিন্তু আগামী সম্মেলনগুলিও খুব গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক ঘটনারূপে কাজ করিবে। কারণ এই সম্মেলনগুলি আমাদের গভীর পার্টিসংকট হইতে বাহির হইয়া আসিবার পথ দেখাইবে। জনতার সহিত আমাদের সংযোগ পুনঃস্থাপন করিবার রাস্তা দেখাইবে। আমাদের সম্মুখবর্তী পথ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে অনেক অনেক পরিমাণে একটা সাধারণ ধারণায় উপনীত হইতে পারিব এবং এই সম্মেলন হইতে আমরা সব পার্টি স্তরেই সমস্ত পার্টি সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত ও পার্টি সভ্যদের বিশ্বাসভাজন নেতৃত্ব সৃষ্টি করিতে পারিব। সংক্ষেপে বলা যায় এই সম্মেলনগুলির ফলে আমরা ভারতের জনতার স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও শান্তির সংগ্রামের নেতা হিসাবে আমাদের যে মহান দায়িত্ব আছে, সেই দায়িত্ব পালনের জন্য আমাদের প্রস্তুত করিতে পারিব। সেইজন্যই আমরা বিশ্বাস করি যে, সমস্ত কমরেডরাই এই সম্মেলনগুলি সফল করিবার জন্য তাহাদের শক্তি নিয়োজন করিবেন।

৭ জুলাই ১৯৫১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

সহায়ক তথ্য - ৬

প্রাদেশিক পার্টি আলোচনা

কেবলমাত্র পার্টি-সভ্যদের জন্য

নব পর্য্যায়, ১০ম সংখ্যা] ১৪ই মে, ১৯৫১ [দাম: পাঁচ আনা

"অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী শত্রুকে পরাজিত করতে হলে সর্বশক্তি প্রচেষ্টা করতে হবে। সেজন্ত অবশ্যই শত্রুপক্ষের প্রত্যেকটি এমন কি, সামান্যতম 'মনোমালিন্য', বিভিন্ন দেশের বুর্জোয়াদের মধ্যেকার এবং দেশগুলির ভিতরেও নানা গোষ্ঠী ও ধরণের বুর্জোয়াদের প্রত্যেকটি স্বার্থ সঙ্ঘাত সুচতুরভাবে ব্যবহার করতে হবে। তেমনি আবার গণ সমর্থন লাভের প্রত্যেকটি এমন কি সামান্যতম সুযোগেরও সদ্ব্যবহার করতে হবে—তা সে সমর্থন যতই সাময়িক, দোদুল্যমান, অস্থায়ী, অনির্ভরযোগ্য বা শর্ত সাপেক্ষই হোক না কেন। যাঁরা এটা বোঝেন না তাঁরা মার্কসবাদ বা সাধারণভাবে বৈজ্ঞানিক আধুনিক সমাজবাদের বিন্দুবিসর্গও বোঝেন না।" —লেনিন

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি
পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি

প্রাদেশিক পার্টি আলোচনা

"অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী শত্রুকে পরাজিত করতে হলে সর্বশক্তি প্রচেষ্টা করতে হবে। সেজন্য অবশ্যই শত্রুপক্ষের প্রত্যেকটি এমন কি, সামান্যতম 'মনোমালিন্য', বিভিন্ন দেশের বুর্জোয়াদের মধ্যেকার এবং দেশগুলির ভিতরেও নানা গোষ্ঠী ও ধরনের বুর্জোয়াদের প্রত্যেকটি স্বার্থ সংঘাত সুচতুরভাবে ব্যবহার করতে হবে। তেমনি আবার গণ সমর্থন লাভের প্রত্যেকটি এমন কি সামান্যতম সুযোগেরও সদ্ব্যবহার করতে হবে—তা সে সমর্থন যতই সাময়িক, দোদুল্যমান, অস্থায়ী, অনির্ভরযোগ্য বা শর্ত সাপেক্ষই হোক না কেন। যাঁরা এটা বোঝেন না তাঁরা মার্ক্সবাদ বা সাধারণভাবে বৈজ্ঞানিক আধুনিক সমাজবাদের বিন্দুবিসর্গও বোঝেন না।"—লেনিন

সম্পাদকীয়

পলিটব্যুরোর খসড়া প্রোগ্রামের উপর আলোচনা সম্পর্কে বিশেষ আবেদন

কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো কর্তৃক সম্প্রতি একটি খসড়া প্রোগ্রাম প্রকাশ করা হইয়াছে। এই প্রোগ্রামের বাংলা অনুবাদ স্বাধীনতা পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। ইহার বাংলা, হিন্দী ও উর্দু অনুবাদ শীঘ্রই পুস্তিকাকারে বাহির হইবে। ইংরাজীতে ইহা ইতিমধ্যেই অবশ্য পুস্তিকাকারে বাহির হইয়া গিয়াছে।

পলিটব্যুরোর এই খসড়া প্রোগ্রাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল এবং আগামী পার্টি সম্মেলন ও পার্টি কংগ্রেসের সামনে আলোচ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে ইহা স্বভাবতই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করিবে। এই দলিলের উপর তাই সমগ্র পার্টিতে ব্যাপক ও গভীর আলোচনা শুরু হওয়া একান্ত দরকার। **সমষ্টিগতভাবে বিভিন্ন ইউনিটে** ইহার উপর যাহাতে আলোচনা হয় তাহার জন্য আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাইতেছি। এই প্রোগ্রাম সম্পর্কে ইউনিটের সমষ্টিগত এবং বিভিন্ন কমরেড ব্যক্তিগত মতামত ও বক্তব্য প্রাদেশিক পার্টি আলোচনায় প্রকাশ করার জন্য আহ্বান করা যাইতেছে। ইউনিটের সমষ্টিগত মতামত ও বক্তব্যের উপরই বিশেষ জোর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। "পার্টি আলোচনা"য় সাধারণত কমরেডদের ব্যক্তিগত মতামতের চেয়ে **ইউনিটের সমষ্টিগত মতামতকেই** ছাপাবার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

রাজনৈতিক আলোচনার ব্যাপারে উদ্যোগশীল কমরেডদের অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাহারা পার্টি আলোচনায় যেন শুধুমাত্র নিজেদের ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করিবার জন্যই ব্যস্ত না হইয়া নিজ নিজ ইউনিটে আলাপ আলোচনা শুরু করিতেও উদ্যোগী হন। নিজ নিজ ইউনিটে এই ধরনের রাজনৈতিক আলোচনায় উদ্যোগ গ্রহণ করিবার প্রয়োজনীয়তা রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক উভয় দিক হইতে আজ অত্যন্ত জরুরি। পার্টি আলোচনার কোন লেখা পাঠাইবার পূর্বে তাহা লইয়া প্রত্যেকেই নিজের ইউনিটে আলোচনা করিতে যেন যথাসম্ভব সচেষ্ট হ'ন। সমষ্টিগত আলোচনা আমাদের মতবাদগত প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করিবে এবং পার্টি সংকট সমাধানের পথও প্রশস্ত করিবে। ব্যক্তিগতভাবেও প্রতিটি কমরেডরা ইহাতে বিশেষ উপকৃত হইবেন।

পার্টি আলোচনার জন্য সমস্ত লেখাই যেন বাংলাতে লিখিয়া পাঠানো হয়। ইংরাজীতে কেহ কোন লেখা পাঠাইলে বাংলা অনুবাদের জন্য তাহা সংশ্লিষ্ট কমরেড বা ইউনিটের নিকটই আবার ফেরৎ পাঠানো হইবে।

অভিনন্দন

১৬ মে ১৯৫১ সম্পাদক, প্রাদেশিক পার্টি-আলোচনা

শান্তি আন্দোলনের সমস্যা ও পার্টি

কোরিয়া যুদ্ধের শুরু হতে আমরা মার্কিন-সাম্রাজ্যবাদী পক্ষ সমর্থনকারীরূপে নেহরু সরকারের ভণ্ড নিরপেক্ষ নীতির মুখোশ খুলে দেবার প্রচার গ্রহণ করতে দেখলাম। সেই সময়কার (জুলাই—ডিসেম্বর—১৯৫০) 'ক্রশ রোডস্' ও মতামত পত্রিকাগুলো পড়লেই একথা বোঝা কঠিন হয় না। জানুয়ারি ১৯৫১ থেকে নেহরুকে শান্তিবাদী বলবার একটা খোলাখুলি চেষ্টা শুরু হল এবং মাস দুই ধরে তা চললোও। এই সময় নেহরুকে একরকম শান্তিবাদী বলেই ধরে নেওয়ার প্রচার চললো। তারপর ষ্টকহোম শান্তি আবেদনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করবার ও শান্তি আন্দোলনে সরকারি কর্মচারীদের যোগদান নিষেধ করবার পর থেকে নেহেরুর শান্তি নীতিকে "দ্বিধাগ্রস্ত' আখ্যা দেওয়া হতে লাগলো এবং রাজাগোপালাচারীর উপর আক্রমণটাই কেন্দ্রীভূত হতে শুরু হল। (১১-২-৫১ 'স্বাধীনতার' সম্পাদকীয়)—"যে ভারতের পররাষ্ট্র নীতি শান্তির পক্ষে দাঁড়াইবার ঘোষণা করিতেছেন সেই ভারতেরই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শান্তির দাবি এবং আন্দোলনকে বিদ্রূপ করে কেন?"—যেন অতীতের সংস্কারবাদী আমলের, নেহেরু-প্যাটেল অন্তর্দ্বন্দ্বের অস্তিত্বের ভূত এবার নেহেরু রাজাগোপাল অন্তর্দ্বন্দ্বের আকারে প্রচারিত হতে লাগলো। "নয়া চীনের বিপক্ষে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জঘন্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সহিত দাঁড়াইয়া নেহেরু সরকার দুনিয়ার সকল দেশের শান্তি ও স্বাধীনতার ভক্তের প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন। .... সেইজন্য নেহরুর কর্তব্য—রাজা গোপালাচারীর নিকট কৈফিয়ৎ দাবি করা।" (স্বাধীনতা সম্পাদকীয়—২৭-২-৫১)। লক্ষ্য করা দরকার যে নেহেরু সরকার শান্তি সম্মেলন দিল্লীতে হওয়ার অনুমতি না দেওয়ায়, খাদ্য নিয়ে মার্কিন তাবেদারী শুরু করায় নেহরুর শান্তি নীতির আসল রূপ প্রকাশিত হয়ে যাবার উপর—২৬/২/৫১ তারিখে "পথ রোধ কর" সম্পাদকীয় প্রবন্ধ (স্বাধীনতা) লিখবার পর দিন ২৭/২/৫১ তারিখে উপরোক্ত সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে।

প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটির ৩/২/৫১ তারিখের "অত্যন্ত জরুরি নোট"—"মার্কিন যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন গড়িয়া তুলুন"—এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। প্রথম কলম—প্রথম প্যারায়—"ভারত সরকারের এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে আমরা তাই অভিনন্দন জানাই ও সমর্থন করি—"এই প্যারায় পুরোপুরি সমস্তটাতেই ভারতসরকারের শান্তি প্রচেষ্টা নীতির প্রশংসা করা হয়েছে এবং শেষ লাইনে "**বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে**"—(বড় হরফ আমাদের) অভিনন্দন জানানো হয়েছে। অবশ্য প্রথম কলমে চতুর্থ প্যারার শেষ লাইনে বলা হয়েছে—"নেহেরুর সাম্প্রতিক পররাষ্ট্র নীতি ও শান্তি প্রচেষ্টার সহিত ইহার সঙ্গতি নাই।" ২য়

কলমে—"নেহরুর বর্তমান দ্বিধাগ্রস্ত ও অসঙ্গতিপূর্ণ শান্তি প্রচেষ্টার মূলে রহিয়াছে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের ও ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত সংকট।... শান্তি আন্দোলনকে ইহারও সুযোগ লইতে হইবে।" এই অন্তর্নিহিত সংকট সম্বন্ধে পি-ও-সি কোনো বিশ্লেষণের চেষ্টা না করে শুধু "সুযোগ নিতে হবে" এই কথা বলা মানে স্বতঃস্ফূর্ত্ততার পিছনে ছুটবার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

যে সমস্ত দাবি তুলবার কথা এই জরুরি নোটে বলা হয়েছে—তার মধ্যে ৭ নং দাবিতে রয়েছে—"শান্তির ব্যাপারে বৃটেন ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করিয়াছে।"—এই উক্তির তথ্যগত ভিত্তি কই? সামরিক বাজেট কমানর দাবির মত গুরুত্বপূর্ণ দাবি এই গোটা নোটটির মধ্যে স্থান পায় নি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গণ-আন্দোলন দমনে কমনওয়েলথে বৃটেনের সুযোগ্য সহচররূপে যে উক্তি ও কাজ নেহরু সরকার করেছেন বা করছেন তার প্রত্যেকটিকে আলাদাভাবে বিশ্লেষিত না করে বা এ সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ করবার দাবি বাস্তবভাবে না তুলে ৬ নং দাবিতে তাইওয়ান, ভিয়েৎনাম ও মালয় প্রভৃতি দেশ থেকে বিদেশী সৈন্য অপসারণের দাবি তুলবার জন্য বলা হয়েছে। অথচ ভারতের জনতার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গণ-আন্দোলনের উপর অপরিসীম সহানুভূতি রয়েছে এবং ভারত সরকারের দঃ পূঃ এশিয়া সম্পর্কিত নীতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে বাস্তব দাবি তুললে আরো ব্যাপক সাড়া পাওয়া সম্ভব।

এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে নেহরু সরকার সত্যিই শান্তিবাদী কিনা? ভারত সরকারের শান্তির সপক্ষে ও বিপক্ষে উক্তি ও কার্যকলাপ কি সাক্ষ্য দেয় তার বিচার করা যাক ঃ—

প্রথমে শান্তির সপক্ষে নেহরুর উক্তি তথা ভারত সরকারের কার্যকলাপ ঃ

১। জাতিসঙ্ঘে নয়াচীনের প্রতিনিধিত্বের দাবি অকুণ্ঠভাবে সমর্থন।

২। চীনকে আক্রমণকারী আখ্যা দানের মার্কিন প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দান।

৩। আন্তর্জাতিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের আলোচনার উদ্দেশ্যে ষ্ট্যালিনের নিকট তারবার্তা প্রেরণ।

৪। দ্বিতীয় দফায় ৩৮° অক্ষরেখা পার হওয়া জাতি সঙ্ঘ বাহিনীর উচিৎ হবে না বলে মন্তব্য করা।

৫। শান্তিরক্ষা সম্বন্ধে মাঝে মাঝে নেহরুর ইচ্ছা প্রকাশ করে উক্তি।

অপরদিকে লক্ষ্য করা যাক বৈদেশিক ও দেশীয় ক্ষেত্রে নেহরু সরকারের কথা ও কাজ—(শান্তি ও প্রগতির বিরুদ্ধে)

১। ভারত সরকারের স্ফীত সামরিক বাজেট।

২। নেহরু কর্তৃক জানুয়ারিতে কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদান ও উক্ত সম্মেলনকে "শান্তির পক্ষে" বলে ঘোষণা করা। সিড্নী সম্মেলন ও কলম্বো সম্মেলনে মার্কিন প্রতিনিধির মোড়লী মেনে নেওয়া।

৩। জাতিসঙ্ঘে উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী ঘোষণা করার পক্ষে ভোটদান এবং ম্যাক-আর্থারের সাহায্যের জন্য মেডিকেল ইউনিট পাঠানো।

৪। জাতিসঙ্ঘে মার্কিন কর্তৃক ফরমোজা আক্রমণ ও মাঞ্চুরিয়ায় বোমা বর্ষণের উপর নিন্দাসূচক সোভিয়েত প্রস্তাবের বিরোধিতা।

৫। উত্তর কোরিয়ার প্রতিনিধিকে জাতিসঙ্ঘে বক্তৃতা করবার বা মত প্রকাশ করবার অনুমতি না দেওয়ার মার্কিন প্রস্তাবকে সমর্থন। কোরিয়ায় বে-পরোয়া বোমা বর্ষণের নিন্দাসূচক

সোভিয়েত প্রস্তাবের বিরোধিতা—নেহরুর উক্তি—"সমরাস্ত্র ব্যবহার না করে তুমি যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারো না।"

৬। মালয়ে ব্রিটিশের অধিকার ও দমননীতির সমর্থন—গুর্খা ফৌজ দিয়ে সহায়তা।—"মালয়ে ব্রিটিশ অস্ত্র রপ্তানিতে ভারতীয় জাহাজ 'জলমতী'র সাহায্য"—ক্রশ রোডস্—২৩শে জুন '৫০)—নেহরুর উক্তি—"ব্রিটিশ মালয় ছেড়ে গেলে অসুবিধা হবে"—(মতামত—২২শ সংখ্যা)।

৭। তিব্বত সম্পর্কে চীনের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের পক্ষে উস্কানীসূচক মন্তব্য ও কার্যকলাপ। যুক্ত প্রদেশ সরকার কর্তৃক তিব্বত সীমান্তে "নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন"—(মতামত—২২শ সংখ্যা)

৮। ফরমোজার স্বাতন্ত্র্যের উপর ইঙ্গিত করে নেহরুব উক্তি।

৯। বর্মায় কমনওয়েলথী সাহায্যে অংশ গ্রহণ—অর্থ ও অস্ত্র সাহায্যদান। সম্প্রতি ২ লক্ষ সৈন্যের সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করার কথা।

১০। ইন্দো-চীনের গণ-সরকারকে স্বীকার না করা ও তথাকথিত নিরপেক্ষতার নামে বাও-দাই সরকারের প্রতিনিধির সঙ্গে দিল্লী-আলোচনা।

১১। ব্রিটিশ নৌ ও বিমান বহরের সঙ্গে ইংরাজ সেনাপতিদেব নেতৃত্বে একাধিকবারে ভারতীয় নৌ ও বিমান বহরের যৌথ মহড়া।

১২। নেপালে গণ-আন্দোলন দমনে রাণাশাহীর সঙ্গে চুক্তি ও ভারতীয় ফৌজ সাহায্য।

১৩। ইন্দোনেশিয়ার হাতা সরকারের প্রশংসা ও জনবিরোধী কার্যকলাপ সমর্থন—(নেহরুর সফর)

১৪। ব্যারাকপুর ও দমদম বিমানঘাটি হইতে মার্কিন যুদ্ধ বিমানকে তেল ভরবার অনুমতি দান।

১৫। কাশ্মীর সমস্যা জাতিসঙ্ঘে পাঠানো ও সাম্রাজ্যবাদী তোষণ নীতি—টাকার দাম কমানো—মার্কিনের কাছে খাদ্যের জন্য উমেদারী এবং শর্তাধীনে মার্কিন ঋণ পাবার জন্য আকুলতা।

১৬। খাদ্যের দামের বদলে থোরিয়াম দেবার একিসন প্রস্তাবের সম্পর্কে নীরব থাকা। ভারতে ইউরেনিয়াম ডেপজিটের সন্ধান দিতে পারলে সরকারি পুরস্কার ঘোষণা।

১৭। লন্ডনে ১৯৫০ সালে জুলাই মাসে ভারতীয় সমর কর্তাদের গোপন বৈঠক—(ক্রশ রোডস্—অগস্ট ৪, '৫০)।

১৮। ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিষ্ট স্পেনকে জাতিসঙ্ঘে আসন দানের মার্কিন প্রস্তাবের সময় ভারতীয় প্রতিনিধির নিরপেক্ষতা—(সি-আর—নভেম্বর ১৯, '৫০)।

১৯। ভারতীয় বড় ব্যবসাদারবৃন্দ কর্তৃক ওয়াল স্ট্রীটের মাতব্বরদের ম্যাঙ্গানিজ দেবার চুক্তি ও ক্যানাডাকে কাপড় (যুদ্ধের জন্য) বিক্রির চুক্তি। (সি-আর, নভেম্বর, ১৯৫০)।

২০। শান্তি সম্মেলনে বিদেশী প্রতিনিধিদের আসতে না দেওয়া (নভেম্বর '৪৯) এবং এবারেও ('৫১) না আসতে দেওয়ার ঘোষণা।

ভারতীয় প্রতিনিধিদের ছাড়পত্র না দেওয়া, পাবলো নেরুদার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ।

২১। ভারতে সোভিয়েত নিউজ এজেন্সীর উপর সেন্সর বসানো (সি-আর নভেম্বর ১৭

এস-পি-সি '৫০) এবং সোভিয়েত ফিল্মের উপর নিষেধাজ্ঞা—(সি-আর, ১৪ জুলাই '৫০)।

২২। ভারতের শান্তি আন্দোলনে বাধা সৃষ্টি করা, শান্তি আন্দোলন ও শান্তি সৈনিকদের উপর দমননীতি চালানো।

২৩। ষ্টকহোম ঘোষণা পত্রে সহি করার বিরুদ্ধে নেহরুর প্রকাশ্যে ঘোষণা এবং সরকারি কর্মচারীদের শান্তি আন্দোলনে যোগদানে নিষেধাজ্ঞা জারি।

২৪। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দমননীতি চালানো, গণ-আন্দোলন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা দমনে আটক আইনের ব্যাপক ক্ষমতা জারি।

২৫। দিল্লীতে সারা ভারত শান্তি অধিবেশনের অনুমতি না দেওয়া, শেফিল্ডের বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের অনুষ্ঠান হইতে না দেওয়ার পথে চলা।

২৬। "বৃটেনের অস্ত্র উৎপাদনে আমাদের ভাগীদার কর"—ইষ্টার্ন ইকনমিষ্টেব ১৬/২/৫১ তারিখের প্রবন্ধে টাটা-বিড়লা মুখপত্রের নির্লজ উক্তি। (স্বাধীনতা—২৩/২/৫১)

ভারত সরকারের কার্যকলাপের এবং কথার এই দুস্তর ব্যবধান এবং শান্তির সপক্ষে একমাত্র নয়াচীনের প্রতিনিধিকে জাতিসঙ্ঘে স্থান দানের জন্য সক্রিয় উদ্যোগ ছাড়া আর কোন জিনিষটা প্রশংসনীয়? বলা হয়ে থাকে কোরিয়া সমস্যা সমাধানের জন্য নেহরু উদ্যোগ দেখিয়েছেন, ষ্ট্যালিনকে টেলিগ্রাম করেছেন, কিন্তু তারপর উত্তর কোরিয়ার জন্য নেহরু সরকার কি করেছেন? ক্রশ রোডস্ ৬ নং ১৯৫০, থেকে একটি উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হবে না—

"জাতিসঙ্ঘে নেহরুর প্রতিনিধি বিবদমান দুই পক্ষকে ডেকে তাদের বক্তব্য শোনার প্রস্তাবের দাবির সপক্ষে ভোট দানে অস্বীকৃত হয়েছে—যে কাজ জাতিসঙ্ঘ সনদের ধারাকে লঙ্ঘন করেছে—এবং যা দ্বারা জে ভি ষ্ট্যালিনের শান্তি প্রস্তাবের মৌলিক বিষয়কেই নাকচ করা হয়েছে। পুনরায় বর্বর "পরিশোধন অভিযান" দ্বারা মার্কিন "মুক্তিদাতা" ধারাবাহিকভাবে কোরিয়ার নগরী ও গ্রামগুলিকে ধূলিসাৎ করেছে" তার দিকে দৃষ্টিপাত করতে নেহরু অস্বীকার করেছে। (ক্রশ রোডস্ ৬নং ১৯৫০)।

কোরিয়া সমস্যা সমাধানের শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টায় নেহরু নীতি এইভাবেই কার্যকরীভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বলা হচ্ছে যে নেহরুর বৈদেশিক নীতি ও স্বরাষ্ট্র নীতিতে বৈষম্য রয়েছে—দ্বিধা রয়েছে—এবং এই দ্বিধা সাম্রাজ্যবাদীদের চাপের ফল। এই কারণেই নেহরু যতটুকু শান্তির কথা মুখে বলছেন তার সঙ্গে অন্য পাঁচটা জন-বিরোধী মন্তব্য করলেও এ শান্তি কথাটুকু নিয়েই ফলাও করা হচ্ছে। যেমন বোম্বাইএ ৪ঠা মার্চ দুগ্ধ কেন্দ্রের দ্বারোদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে নেহরু যে বক্তৃতা দিয়েছেন—'স্বাধীনতায়' তার হেডিং দেওয়া হয়েছে—"যুদ্ধ প্রচারের বিরুদ্ধে নেহরুর সতর্ক বাণী"—(৫ই মার্চ)—অথচ ঐ তারিখের বক্তৃতায় সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে গালাগালি ও জনতাকে আরো কম খাবার ও ত্যাগ করবার উপদেশামৃত 'স্বাধীনতায়' অত্যন্ত গৌণভাবে স্থান পেয়েছে। এইভাবেই কি আমরা নেহরু নীতিকে শান্তির পেছনে টানতে পারব? নেহরুর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মন্তব্যগুলিকে জোড়াতালি দিয়ে শান্তির সপক্ষে উক্তি দেখালেই কি ভারতের শান্তি আন্দোলন জোরদার হবে? এই রকম চিন্তা করা আর নেহরুর লেজুড়ে পরিণত হওয়ায় তফাৎ কি? হয়তো প্যারিসের চিঠির নজীরের কথা উঠবে—'স্বাধীনতা'য় প্রকাশিত ২৭/২/৫১ তারিখের উক্ত চিঠিতে বলা হয়েছে—"একদিকে ভারতের জনতার শান্তির মনোভাব এবং অন্যদিকে ভারতের বড়

বুর্জোয়াদের আশু যুদ্ধ সম্পর্কে প্রস্তুতির অভাব এবং এশিয়ার বাজারের জন্য ভারত-জাপান প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পরিকল্পনার মূলে এমন আঘাত করিয়াছে যে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের সাথে মূল যোগ থাকা সত্ত্বেও ট্রুম্যানের আশু এটম যুদ্ধ হইতে ভারত সরকার তফাৎ রহিয়াছেন। এইসব কথা বলার অর্থ "সংস্কারবাদী" বা "নেহরুবাদী" হইয়া যাওয়া নয়। শান্তির পক্ষে নেহরু সরকারের এই দ্বিধা একটা বিরাট বাস্তব। উপরন্তু শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য আমাদের সংগ্রামে ইহা একটা অমূল্য পুঁজি। এই যে দ্বন্দ্ব আছে এবং ইহার মূল সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হইলে জনতার বিশ্বাস বাড়িবে, শান্তির জন্য সক্রিয় সংগ্রামের শক্তিতে বিশ্বাসের নতুন উৎস খুলিয়া যাইবে। ... ভারতে যখন এই অন্তর্বিরোধ তীব্রতম তখন কি করিয়া এই ঘটনাটি আমাদের ভারতবাসীর চোখ এড়াইয়া যায়?"

বোধ হয় এইটের উপর ভিত্তি করেই ৪/৩/৫১ তারিখের 'স্বাধীনতা'য় "নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার চাই" বলে লেখা হয়েছে—'ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধবাজরা ভারতকে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় জড়াইয়া ফেলিবার কোনো চেষ্টারই কসুর করিতেছে না। সেই চেষ্টারই সীমাবদ্ধ বিরোধিতা করিয়াও নেহরু সরকার যে শান্তিরক্ষার উদ্যোগ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অবশ্যই ট্রুম্যান এট্‌লীর সমরানল বাধাইবার পথে প্রধান (বড় হরফ আমাদের) বাধা সৃষ্টি করিয়াছে।... আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নেহরুর এই সীমাবদ্ধ শান্তি নীতি এবং দেশের মধ্যে মুনাফা লুণ্ঠন ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধবাজদের সুযোগ সুবিধা দান শান্তি আন্দোলনের উপর দমননীতি আর কতদিন পরস্পরের বিরোধিতা করিয়া চলিতে পারিবে? দেশের মধ্যে মুনাফা লুণ্ঠন ও দমন নীতি শেষ পর্যন্ত নেহরু সরকারকে প্রত্যক্ষ যুদ্ধের পথেই ঠেলিয়া দিবে যদি না দেশব্যাপী দুর্দমনীয় সম্মিলিত শান্তি অভিযান গড়িয়া উঠিয়া নেহরু সরকারের এই জন বিরোধী স্বরাষ্ট্র নীতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়।"

এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই বোধহয় ৭ই মার্চের 'স্বাধীনতা'য় "নেহরু বনাম নেহরু" এই সম্পাদকীয়টি লেখা হয়েছে এবং প্রশ্ন তোলা হয়েছে—"ব্যক্তিস্বাধীনতা দমন, কমিউনিস্ট বিরোধী কুৎসা প্রচার কি নেহরুর শান্তি প্রচেষ্টাকেই ব্যাহত করিতেছে না?" নেহরুর ভাষায় যাঁহারা ভারতে যুদ্ধ বাধাইবার কথা ভাবে তাহাদিগকেই সাহায্য করিতেছে না?" এবং ঐ প্রসঙ্গেই শেষে মন্তব্য করা হয়েছে—জনসাধারণের সম্মিলিত শান্তির শিবির ভারতে যত ব্যাপক হইয়া উঠিবে নেহরু সরকারের সাম্রাজ্যবাদী সংযোগ ততই বিচ্ছিন্ন হইবে, অভ্যন্তরীণ দমন নীতিও পরাস্ত হইবে।

এখন দেখা যাচ্ছে এই অন্তর্বিরোধের উপর প্রধান জোর দিয়েই আমাদের নেতৃবর্গ শান্তি আন্দোলনের কৌশল স্থির করছেন। অন্তর্বিরোধ রয়েছে সেটা অস্বীকার্য নয় এবং অন্তর্বিরোধের সুযোগ নিতে হবে এটা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু অন্তর্বিরোধের তাৎপর্য সঠিকভাবে অনুধাবন করা এবং কৌশলের সহিত তাকে কাজে লাগানো বাস্তব, অবস্থার উপর নির্ভরশীল। সেই দিকটায় যথেষ্ট সতর্ক দৃষ্টি না থাকলেই লেজুড় হয়ে যাবার সম্ভাবনা—যার লক্ষণ ফুটে উঠেছে।

প্যারিসের চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে—"ভারতের জনতার শান্তির মনোভাব"—ভারতের জনতার শান্তির মনোভাব ব্যাপক এটা সত্যি কথা কিন্তু ভারতের জনতার অধিকাংশেরই অন্তরের কামনা শান্তি হলে—"শান্তি আমাদের জন্য অপেক্ষা করে না—শান্তি

আমাদের জয় করে নিতে হবে"—এ মনোভাব প্রসূত নয়। আমরা যেন ভুলে না যাই গান্ধীবাদের অহিংস শ্রেণি সহযোগিতার শান্তির প্রভাব রয়েছে ভারতের জনতার একটা ব্যাপক অংশের মধ্যে এবং এই নেতিবাচক শান্তিবাদীরা শান্তি কামনা করেও সক্রিয়ভাবে শান্তি সংগ্রামের অংশীদার এখনও হয়নি। প্যারিসের চিঠিতে আরও উল্লিখিত—"ভারতের বড় বুর্জোয়াদের আশু যুদ্ধ সম্পর্কে প্রস্তুতির অভাব"—একথা কোন দিক দিয়ে সত্য? নিশ্চয়ই এটা নয় যে ভারতের বড় বুর্জোয়ারা যুদ্ধ সম্পর্কে প্রস্তুতিতে অনিচ্ছুক, বরং তাদের পশ্চাৎপদ অবস্থার দরুন সাম্রাজ্যবাদীরা এদের কাঁচা মালের জোগানদারের ভূমিকা গ্রহণ করতে বাধ্য করে রেখেছে, প্রয়োজন হলেই অস্ত্রশস্ত্র বানানো চলবে ভারতের মাটিতেই; আর তাছাড়া অস্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানি করে প্রচুর মুনাফা লুটবার মার্কিনী পরিকল্পনার দরুন ভারতের মাটিতে যুদ্ধ প্রস্তুতির এই দিকটার তোড়জোড় চোখে পড়ছে না কিন্তু বিমানঘাটী দেওয়া, যুদ্ধঘাটী সম্বন্ধে গোপন জল্পনা কল্পনা দঃপূঃ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে অস্ত্র-শস্ত্র, অর্থ, এমনকি মালয়ে ফৌজ দিয়ে সাহায্য করাও কি যুদ্ধ প্রস্তুতির অংশ নয়? স্ফীত সামরিক বাজেট কি যুদ্ধ প্রস্তুতির অংশ নয়? জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উপর আক্রমণ ও ট্যাক্স বৃদ্ধি কি সমর প্রস্তুতির অংশ নয়? ষ্ট্যালিন তাঁর সাম্প্রতিক বিবৃতিতে কি বলেছেন? "কোন দেশের সৈন্য বাহিনী বৃদ্ধি এবং সমাবেশের পিছনে ধাওয়া করিতে হইলে তাঁহাকে যুদ্ধ শিল্প উন্নয়নই করিতে হয়, বে-সামরিক শিল্পকে খর্ব করিতে হয়—বে-সামরিক গঠন কার্য বন্ধ করিতে হয়, ট্যাক্স বাড়ানো হয়, ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য বাড়াইতে হয়।" (স্বাধীনতা—১৮/২/৫১)। এটলী সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বৃহৎ পঞ্চ শক্তির বৈঠকের ও অস্ত্র শস্ত্রের হ্রাস, ও আণবিক অস্ত্র হ্রাস সম্পর্কিত জাতিসঙ্ঘে সোভিয়েত প্রস্তাবের বিরোধিতার উল্লেখ করেছেন। এটলীকে যুদ্ধবাদী বলে ঘোষণা করতে গিয়ে কমরেড ষ্ট্যালিন বলেছেন, "তিনি যদি সত্যি সত্যিই শান্তির সপক্ষে তবে তিনি শান্তির যোদ্ধাদের নির্যাতন করিতেছেন কেন? তিনি বৃটেনের শান্তি কংগ্রেসের উপর নিষেধাজ্ঞা করিয়াছিলেন কেন? বৃটেনের নিরাপত্তা কি কোন শান্তির রক্ষক বিপন্ন করিয়া তুলিতে পারে? (স্বাধীনতা ১৮/২/৫১)

কমরেড ষ্ট্যালিন যেভাবে উপরোক্ত কথায় এটলী সরকারের সমালোচনা করে বিশ্ববাসীর কাছে তার যুদ্ধবাদীর মুখোশ খুলে ধরেছেন ভারতের কমিউনিস্টেদর কি উচিৎ নয় এইভাবে নেহরু সরকারের শান্তি নীতির মুখোশ খুলে ধরা। উপরিলিখিত পটভূমিকায় এটলী সরকার ও নেহরু সরকারের ভূমিকায় মূলগত পার্থক্য কতটুকু? স্ব-বিরোধিতা কি ইঙ্গ-মার্কিন শিবিরের নিজেদের মধ্যে নেই? কিন্তু কমরেড ষ্ট্যালিন এটলী ট্রুম্যানের অন্তর্বিরোধ সম্পর্কে জোর দেননি কেন? অথচ আমাদের নেতৃবৃন্দ এই অন্তর্বিরোধকে মূল ধরে কৌশল ঠিক করতে যাচ্ছেন। অন্তর্বিরোধ রয়েছে, থাকবেও এবং এই অন্তর্বিরোধ বাড়বে শান্তি আন্দোলন যত উর্দ্ধস্তরে উঠবে এবং এতে করে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু উক্ত অন্তর্বিরোধকেই প্রবলতম ফ্যাক্টর মনে করা ঠিক নয়। এশিয়ার বাজারের জন্য ভারত জাপান প্রতিদ্বন্দ্বিতার চেয়ে অনেক বেশি নিষ্ঠুর সত্য এশিয়ার গণ-আন্দোলনকে দমানোর জন্য ভারত সরকারের সক্রিয় সাহায্য, কখনও মেডিকেল ইউনিট দিয়ে, কখনও গুর্খা ফৌজ দিয়ে, কখনও অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে। এবং দঃ পূঃ এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী কমনওয়েলথ গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে নেহরু সরকারের এই যে ভূমিকা এটা কি নেহরুর বৈদেশিক নীতির শান্তিপূর্ণতার লক্ষণ?

বৈদেশিক নীতি বলতে কি জাতিসঙ্ঘে চীনের পক্ষে ভোটদানই শুধু বোঝায়? ঐ একটিমাত্র ক্ষেত্র ছাড়া নেহরুর বৈদেশিক নীতিতে আর প্রগতিশীলতার লক্ষণ কোথায়? দেশবাসীকে অনশনের মুখে ঠেলে দিয়েও চীন, সোভিয়েত ও মুক্ত ব্রহ্মের খাদ্য প্রত্যাখান করা ও শর্তাধীনে আমেরিকার গম চাওয়া কি শান্তি ও প্রগতিশীলতার লক্ষণ? দেশীয় ক্ষেত্রে একটি মাত্র লক্ষণও নাই যাতে করে নেহরুকে শান্তিকামী বলা যায় এবং উপরোক্ত রূপ বৈদেশিক নীতির সঙ্গে দেশীয় নীতির সামঞ্জস্যপূর্ণ একতার আওয়াজের অর্থ কি? এবং এ আওয়াজ নেহরু সরকার সম্বন্ধে মোহ বিস্তারেই সহায়তা করছে নিশ্চয়ই। দেশীয় ও বৈদেশিক নীতির এই সীমারেখা টানা মোটেই বাস্তব জ্ঞানপ্রসূত নয়। এই প্রসঙ্গে ভারতের পররাষ্ট্র নীতি সম্বন্ধে ভি, রেবেজকভ প্রাভদায় যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং নিউ টাইমস ২২ নং ১৯৫০-তে যা প্রকাশিত হয়েছিল তা উল্লেখযোগ্য। ক্রস রোডস্‌-এ উক্ত প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল এবং তা থেকে এখানে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে।

"বৃটেন ওয়াশিংটনের আক্রমণাত্মক নীতির পিছনে চলেছে এবং ভারতও তার পিছু নিয়েছে। ভারতের মন্ত্রীরা ঘন ঘন প্রতিশ্রুতি দেন যে, তারা আক্রমণাত্মক চক্র থেকে বাইরে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু ভারতীয় সংবাদপত্রসকল এই মত পোষণ করে যে, ভারত পশ্চিমী চক্রের সঙ্গে সুনিশ্চিতভাবে যোগ দিয়েছে, বাস্তবিকপক্ষে যদিও গত জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দেশগুলোর বৈদেশিক মন্ত্রীদের সম্মেলনে সরকারিভাবে কিছু জানান নি....। এইভাবে ভারতের নীতি তৈরি করা হয়েছে যাতে দেশের অর্থনীতির দিক থেকে অত্যন্ত জরুরি কয়েকটি স্থান ওয়াল স্ট্রীটের খপ্পরে পড়ে, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় আক্রমণাত্মক চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করতে তাদের বাধছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে, কুয়োমিন্‌টাঙ-এর দুর্ভাগ্য থেকে তারা কিছু শিক্ষা নিয়েছে। ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভারতের জাতীয় কংগ্রেস পার্টি ও তার নেতারা সাবধানতা নিচ্ছে, তাদের মার্কিন অংশীদাররা যতটা পছন্দ করে তার থেকে বেশি, ...ভারত সাম্রাজ্যবাদের শিকলের দুর্বলতম গ্রন্থি। সেইজন্যই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্টতাকে আঁড়াল করতে হচ্ছে। ইঙ্গ -মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অধীনতার অর্থ নিশ্চিতভাবে দেশের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি।

ফলে কংগ্রেসের নেতারা পাচ্ছে জনতার কাছ থেকে ক্রমবর্দ্ধমান তীব্র বিরোধিতা এবং দেশকে নিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের পথে।" (ক্রশ রোডস-জুন ২৩, '৫১)

এই পটভূমিকায় বিচার করে দেখতে গেলে নেহরুর পররাষ্ট্র নীতিকে শান্তিবাদী বলা ভুল করা ছাড়া আর কি? শান্তি আন্দোলনে দক্ষিণপন্থী ভুল ও নেহরুর লেজুড়বৃত্তি করার যে লক্ষণ স্পষ্ট ফুটে উঠছে তার কারণ সম্বন্ধে এবার আলোচনা করা যাক।

কেন এই অস্বচ্ছ ও অস্পষ্ট ধারণা নেতৃত্বের মধ্যে দেখা যাচ্ছে?

জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও শান্তি আন্দোলনের পারস্পরিক সম্পর্ক, উভয়ের ভিত্তি, স্তর ও কৌশল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকা ও উভয়কে গুলিয়ে ফেলা।

এদেশের সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল আধাসামন্ততান্ত্রিক আধা বুর্জোয়া কাঠামোর সামাজিক অবস্থার পটভূমিকায় শান্তি আন্দোলনের স্তর ও আওয়াজ স্থির না করা এবং যান্ত্রিকভাবে পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনের গণরাষ্ট্রসমূহের শান্তি আন্দোলনের সঙ্গে একই স্তরে ও একই ধরনের আওয়াজ ঠিক করার চেষ্টা।

পূর্ব ইউরোপ ও চীন দেশের জনতা আজ দেশকে সাম্রাজ্যবাদ সামন্ততন্ত্র ও একচেটিয়াদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করে পুনর্গঠনের পথে পা বাড়িয়েছে, পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ এ বিষয়ে এগিয়েছে বেশি, চীন অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু এইসব দেশের মুক্ত জনসাধারণ আজ মর্মে মর্মে শান্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং জানেন যে শান্তিপূর্ণ পুনর্গঠনের সময় ও সুযোগ পেলে কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁরা সাফল্যজনকভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজে পা দিতে সক্ষম হবেন। কাজেই "সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র পাশাপাশি শান্তিতে থাকতে পারে" এই আওয়াজের তাৎপর্য অতি সহজেই এদের কাছে বোধগম্য।

কিন্তু ভারতের মজুর, চাষী, মধ্যবিত্তের কাছে উপরোক্ত আওয়াজের অর্থ কি সুস্পষ্ট? ভারতের মেহনতকারী মানুষের এই ধারণাটা কি অস্পষ্টাকারে মনে গুঞ্জন করে না যে, শান্তিপূর্ণভাবে আজ ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অস্তিত্ব সম্ভব হলে ভারতের খেটে খাওয়া লোকদের কি সুবিধা হবে? এই যে তত্ত্ব এটার তাৎপর্য ভারতের জনতার কাছে পরিষ্কার নয়। ভারতের জনতা আজকের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন চায়—(যদিও এখনও নিয়মতান্ত্রিক পথের মোহই বেশি) এবং সেই কারণেই তারা সোভিয়েত ও চীনের প্রতি সহানুভূতিশীল, কারণ ভারতের জনতার বেশির ভাগই বিশ্বাস করে না যে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা দুনিয়ায় শান্তি স্থাপন করতে চায় ও সোভিয়েত ও চীন তাতে বাধা দিচ্ছে। কাজেই আজকের দিনে ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে সহায়তামূলক আওয়াজ সমূহই জনসাধারণের মনে ব্যাপক উৎসাহ জাগাতে পারে। এদিকে লক্ষ্য না রেখে শুধুমাত্র "যুদ্ধ চাই না; শান্তি চাই—এটম্ বোমা বে-আইনি কর, জাপান ও জার্মানীর সঙ্গে শান্তি চুক্তি কর"—এই আওয়াজসমূহকে বেশির ভাগ সাধারণ লোকই আন্তর্জাতিক আওয়াজ হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত, এবং এই মনোভাবই ফুটে উঠে—খাওয়া পরার সঙ্গে যোগ নেই, ঐ দাবি তুলে কি হবে। অর্থাৎ খাওয়া পরার দাবির মানে আংশিক দাবি-দাওয়ার সংগ্রামের সঙ্গে শান্তির আওয়াজের যোগ সূত্র জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট নয়। সেটা স্পষ্ট করা দরকার।

শান্তি আন্দোলনের আওয়াজ ঠিক করতে ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে পারস্পর্য্য বিচার করতে হলে আরও কয়েকটি বাস্তব তথ্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়া দরকার যা একে একে উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ—

(ক) শান্তি আন্দোলন ও ভারতের শ্রমিক শ্রেণি—"শান্তির ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রামে" লাষ্টিং পীস্ পত্রিকার ২রা জুন, ১৯৫০ সংখ্যায় এই সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, "......শ্রমিক এবং সব দেশের ট্রেড ইউনিয়নের সভ্যদের উপর অনেকাংশে নির্ভর করছে আজকের দিনের মূল কর্তব্যের সমাধান, যে কর্তব্য হল—সাম্রাজ্যবাদীদের ব্যাহত করা এবং সারা বিশ্বে অবিচলিত শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।" শান্তির আওয়াজের উপর আমরা শ্রমিক শ্রেণিকে কতটা উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছি বা পারছি সেইদিকে লক্ষ্য করা যাক।

ভারতের শ্রমিক শ্রেণি আজ দ্বিধাবিভক্ত, আন্দোলনে সুসংগঠিত নয়। ট্রেড ইউনিয়নগুলি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন পেটিবুর্জোয়া পার্টি ও সংস্কারবাদী নেতৃত্বে এমন কি আই এন টি ইউ সি নেতৃত্বেও রয়েছে। লাল ঝাণ্ডার ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস অতীতের ভুল নীতি অবলম্বনের ফলে দুর্বল হয়ে পড়েছে। শ্রমিকদের মধ্যে বুর্জোয়া মতাদর্শগত প্রভাব (অর্থনীতিবাদ, গান্ধীবাদ, নেতাজীবাদ প্রভৃতি) রয়েছে। শান্তির অগ্রণী সৈনিক শ্রমিক শ্রেণি

এইরূপ অসংগঠিত ও বিভক্ত থাকতে শান্তি আন্দোলনের দ্বিধাগ্রস্ততা ও দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা কঠিন। উপরন্তু আর. এস. পি. জয়প্রকাশের এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লকের একাংশ এবং সদ্য কংগ্রেস ত্যাগী বিভিন্ন দল ও উপদলসমূহ (যেমন ডঃ ঘোষের কৃষক প্রজা) শান্তি আন্দোলনে বিশ্বাসী নয়—অথচ শ্রমিক মধ্যবিত্ত এবং চাষীদের উপর এদের সম্মিলিত প্রভাব যথেষ্ট। এই অবস্থায় যুদ্ধ প্রস্তুতির বা যুদ্ধে সাহায্য দানের কোন রকম চুক্তির বিরুদ্ধে শান্তির দাবিতে শ্রমিক শ্রেণির জমায়েত করা কঠিন এবং সেরকম প্রচেষ্টাও আমরা দেখছি না। ফ্রান্স ও ইটালীতে মার্কিন যুদ্ধাস্ত্র আমদানি ও আইসেনহাওয়ার বিরোধী বিক্ষোভে সেখানকার শ্রমিক শ্রেণির বীরত্বপূর্ণ আন্দোলন হয়েছিল সেখানকার জেনারেল কন্‌ফেডারেশন অব লেবারের নেতৃত্বে। ভারতের শ্রমিক নেতৃত্ব ও সংগঠন সেদিক থেকে যথেষ্ট দুর্বল।

(খ) দেশের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, বাস্তুহারা প্রভৃতি জ্বলন্ত সমস্যার সঙ্গে এবং এই সমস্ত দাবি আদায়ের আংশিক সংগ্রামের সঙ্গে শান্তি আন্দোলনের যোগসূত্র ও পারস্পরিক সম্পর্ক দেখানো হয় কি? "শান্তির প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্য কোন আওয়াজ দেওয়া চলবে না।" এই নীতি কার্যকরী করতে গিয়ে নজর রাখা হচ্ছে বিখ্যাত শিল্পী ও বুদ্ধিজীবিদের বেশির ভাগকে শুধু টেনে আনবার, কিন্তু যাঁরা যুদ্ধ রুখবার জন্য—শান্তির জন্য সক্রিয় লড়াইএ নামতে প্রস্তুত এমন ব্যাপক সাধারণ মানুষকে (বিভিন্ন দল ও মতের) টেনে আনবার উপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রচেষ্টা হচ্ছে না—মুখে স্বীকার করলেও। এবং এর ফলেই "যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই" আওয়াজে বিশেষ কোন সাড়া জাগাতে সক্ষম না হওয়ায় এখন "যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই—খেয়ে পরে বাঁচতে চাই" আওয়াজ ওঠানো হয়েছে। কিন্তু খেয়ে পরে বাঁচবার দাবির সঙ্গে শান্তির দাবির অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আরও ব্যাপকভাবে প্রচারের দরকার। এই যোগসূত্র সুস্পষ্টভাবে দেখানো না হওয়ার ফলে দেখা যাচ্ছে একটা করে সহি দেবার পর শান্তি সম্বন্ধে সাধারণ লোকের জানবার বা বুঝবার আগ্রহ বেশি থাকবে না এবং সেই কারণেই সহি সংগ্রহ এবং শান্তি সম্মেলনের মধ্যেই শান্তি আন্দোলন আবদ্ধ থাকছে এবং শান্তি কমিটিগুলো সম্মেলনের পরেই কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছে। অন্যান্য দলগুলির সাধারণ কর্মী এবং সমর্থকদের যাদের নেতারা শান্তি আন্দোলনের বিরোধিতা করছে বা বিরূপ মন্তব্য করছে—তাদেরকে নেতাদের স্বরূপ দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে না, ফলে তাদের মোহমুক্তি ঘটছে না এবং শান্তি আন্দোলনে তারা নামতে চাচ্ছেন না এবং এই কারণেই এই অবস্থায় আন্দোলনের বাইরেকার কাঠামো বদলাতে গিয়ে শান্তি আন্দোলন ব্যাপকতর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রধান লক্ষ্য থাকছে কি করে বিশিষ্ট নেতা, বুদ্ধিজীবী, ব্যক্তি ও শিল্পী প্রভৃতির সহি সংগ্রহ করবো এবং তাঁদের নিয়ে কমিটি তৈরি করবো, কিন্তু সাথে সাথে যাতে নীচের তলার ঐক্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে ও শান্তির ভিত্তি সাধারণ লোকের মধ্যে প্রসারিত হয় তার দিকে নজরটা কমে আসছে। আন্দোলনের ধার কমে আসছে ও লেজুড়বৃত্তি দেখা যাচ্ছে।

(গ) ভারতের মাটীর উপর এ পর্যন্ত কোন যুদ্ধ সংঘটিত না হওয়ায় যুদ্ধের ভয়াবহতার বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবে যুদ্ধ সম্বন্ধে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণ ভারতবাসীর কম। যুদ্ধের একটা দিক অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ দিক—মুদ্রাস্ফীতি, চোরাবাজার, জিনিষপত্রের অভাব ও দুর্মূল্যতা, খাদ্যাভাব ও মন্বন্তর—জনসাধারণ এ সবে ভুক্তভোগী। কিন্তু প্রত্যক্ষ দিক—ব্যাপক ধ্বংসলীলা, বোমাবর্ষণ, শত্রু সৈন্যের অত্যাচার এসব সম্বন্ধে ভারতীয় জনসাধারণের অভিজ্ঞতার অভাব।

এইসব ব্যাপারে প্রচার করবার মত যথেষ্ট খোরাকের অভাব থাকায় জনসাধারণের মনে নানা রকম হতাশাজনক প্রশ্ন আসে—"পড়ুক এটম বোমা, লোক কমবে', 'যুদ্ধ বাধলে চাকুরী মিলবে', 'যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বর্তমান শাসকরা উচ্ছেদ হয়ে যাবে', 'গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির গণফৌজের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীরা এঁটে উঠতে পারবে না', ...ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই মনোবৃত্তির সুযোগ নিতে শাসকশ্রেণি ইতস্তত করে না, বা করছে না এবং নেহরুর ঘোষিত শান্তির বক্তৃতা দিতে জনসাধারণের আরো বিভ্রান্ত হবার অবকাশ রয়েছে।

জনসাধারণের উপরিলিখিত মনোভাবগুলির ভুল দেখিয়ে দেওয়া বা ব্যাপক প্রচার নাই—অথচ নেহরুকে শান্তিবাদী আখ্যা দেওয়ার ফলে জনসাধারণের মনে নেহরু সম্বন্ধে যে মোহ কেটে আসছিল সেই মোহে পুনরায় দৃঢ় আসন কায়েম করবার সুযোগ পেয়ে যাবে। এ সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে ষ্টকহোম শান্তি আবেদন এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক দাবির উপর একটা আন্দোলন, এই ধারণা থাকা কিছু অস্বাভাবিক নয়। এবং এ দেশের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে উক্ত দাবির নিরিখ ঠিক করতে না পারলে এই ধারণা কাটবে না।

কাজেই শান্তি আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সম্পর্ক বিচার করতে হবে এবং এই আন্দোলনে কমিউনিস্টদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

"লাষ্টিং পীস্" পত্রিকার ৬ নং, ১৯৫০ সংখ্যায় শান্তির সংগ্রামে কমিউনিস্টদের ও শ্রমিক শ্রেণির কর্তব্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে "শান্তি আন্দোলনকে যারা দুর্বল করতে চায় কমিউনিস্ট পার্টিগুলি তাদের সাম্রাজ্যবাদের অনুচর হিসেবে নির্মমভাবে মুখোশ খুলে দেবে। ......আন্দোলনকে শ্রমিক শ্রেণির—যাদের চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করতে ডাক দেওয়া হয়েছিল তাদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ আক্রমণকারীদের এবং তাদের উদ্যোগের প্রতি পূর্ণ সমর্থন এবং শান্তির জন্য সংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক মুক্তি, জাতীয় স্বাধীনতা, মেহনতী জনসাধারণের রুটী, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক অধিকারের জন্য সংগ্রামের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সংযোগ।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।" (মতামত—২৮/৪/৫০)

লাষ্টিং পীস্ পত্রিকার ১৫ নং সংখ্যায় (১৯৫০) "আণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করার আবেদন পত্রে কোটি কোটি স্বাক্ষরের জন্য" আন্দোলনের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

"এই আন্দোলন, শান্তি আন্দোলনের অন্যান্য সমস্ত ধারার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত—যেমন নতুন যুদ্ধের জন্য আদর্শগত প্রস্তুতির স্বরূপ খুলে ধরা, মার্কিন সমরসম্ভার নামানো বা চালান করার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, মার্শাল প্ল্যানের কুক্ষিগত দেশগুলিতে দরিদ্র ও বেকারির বিরুদ্ধে মেহনতী জনগণের সংগ্রাম। সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক জনগণের সংগ্রাম শান্তির জন্য লড়াই-এর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।" (শান্তি সংগ্রামের নীতি ও কৌশল)

লাষ্টিং পীস্ পত্রিকার ১৮ নং, ১৯৫০ সংখ্যায় "যুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঔপনিবেশিক ও পদানত দেশগুলির জনসাধারণ" এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে—

"জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং বাড়িয়ে তোলাই হল দুনিয়া জোড়া শান্তি শিবিরের একই সাধারণ সংগ্রামে ঔপনিবেশিক ও পদানত দেশগুলির জনসাধারণের সবচেয়ে কার্যকরী দান।"—(ঐ)

লাষ্টিং পীস্ পত্রিকার "লেনিনবাদ ও বিশ্বমানবের শান্তির লড়াই" ১৬ নং, ১৯৫০ তারিখের সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে—

"সাম্রাজ্যবাদীদের চরিত্র হ'ল অত্যন্ত সংগোপনে যুদ্ধের প্রস্তুতি চালানো। জাতীয় স্বাধীনতার লড়াইকে এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গোলামীর বিরুদ্ধে লড়াইকে শান্তির লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত কর। যুদ্ধের প্রস্তুতি করতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা স্ফীতকায় যুদ্ধ বাজেটের বোঝাকে মেহনতী জনগণের কাঁধেই চাপিয়ে দেয়। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার লড়াইকে শান্তি লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত কর।"—(ঐ)

তাহলে এখন দাঁড়ালো কি? শান্তি আন্দোলনকে ব্যাপকতর ভিত্তিতে প্রসারিত করবার এই বাধা অপসারণে কমিউনিস্টদের কর্তব্য কি? একথা ঠিক যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও শান্তি আন্দোলনকে বর্তমানে গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে—ফলে উভয় আন্দোলনই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে—জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের আওয়াজ আড়াল পড়ে যাচ্ছে এবং শান্তি আন্দোলনে এসে যাচ্ছে লেজুড়বৃত্তি। শ্রমিক শ্রেণির ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন না থাকায় উভয় ক্ষেত্রেই হচ্ছে বিচ্যুতি।

'স্বা———', 'ক্র———স্', ও 'ম—' কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র বলেই জনসাধারণের কাছে পরিচিত। বর্তমানে ব্যাপক জাতীয় যুক্ত ফ্রন্ট গঠনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই কাগজগুলো চালু রয়েছে এটাই আমরা জানি। এদের কোনটাই শান্তি কমিটির মুখপত্র নয়। 'স্বা— তা'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে ৯ই ফেব্রুয়ারি তাং এ উল্লিখিত আছে—"আমাদের 'স্বাধীনতা' তাই শান্তির জন্য, প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য, জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য, আশু কৃষি সমস্যা সমাধানের জন্য, সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার, সামন্ততন্ত্র ও যুদ্ধ চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে সমস্ত দল, সমস্ত শ্রেণি, সমগ্র ভারতবাসীর ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ, গণতান্ত্রিক অভিযান গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করবে। আমাদের 'স্বা———' প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য লড়বে—বামপন্থী ঐক্যের ভিত্তিতে ব্যাপক জাতীয় ঐক্য গড়ার কাজে সচেষ্ট হবে, সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদারদের বিরোধী সমস্ত শক্তিগুলিকে সংহত করার যাবতীয় প্রচেষ্টাকে সাহায্য করবে।" কমিউনিস্টদের মুখপত্র 'স্বা———'র এই সম্পাদকীয়ের উদ্দেশ্য কি—যেভাবে নেহরু সম্পর্কে লেখা হচ্ছে—তাতে হাসিল হবে? শান্তি আন্দোলনে নেহরুর ভূমিকা ও কমিউনিস্টরা যেভাবে নেহরুকে দেখেন তা কখনও এক হতে পারে না। শান্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে নেহরুর কোন কোন উক্তি শান্তি কমিটি সমর্থন ও প্রচার করতে পারেন কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্রে শান্তির সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে নেহরুকে সমর্থন করা, পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র নীতির মধ্যে বিরোধ খুঁজতে যাওয়া সংস্কারবাদের পাঁকে ডুবে মরা ছাড়া আর কি হতে পারে? এমন কি নেহরুর বক্তৃতায় হেডিংগুলো পর্যন্ত এমনভাবে সাজান হচ্ছে যেন নেহরু সত্যি সত্যি শান্তিবাদী। ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শত্রু নেহরু সম্বন্ধে আজ কমিউনিস্টদের মুখপত্রে যদি এই রকম সম্পাদকীয় বের হয় এবং এইভাবে খবর ছাপান হয় তবে কেনই বা অন্য বামপন্থীরা আমাদের বিশ্বাস করবে—কেমন করেই বা সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী যুক্ত ফ্রন্টে কমিউনিস্টদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। শান্তি সম্পর্কে যান্ত্রিক চিন্তাধারা, জাতীয় যুক্ত ফ্রন্ট সম্বন্ধে যান্ত্রিক চিন্তাধারার ফলে আজ এই ধরনের জগাখিচুড়ীর আমদানি সম্ভব হচ্ছে এবং বামপন্থী সঙ্কীর্ণতাকে উপড়ে ফেলতে গিয়ে যে দক্ষিণপন্থী লেজুড়বৃত্তির আত্মপ্রকাশ ঘটছে সে চেতনা নেতৃত্বের নেই।

পার্টি যেমন জাতীয় যুক্ত ফ্রন্টকে গড়ে তুলবে এবং তার নেতৃত্ব দেবে—তেমনি জাতীয় যুক্ত ফ্রন্ট গড়ার তালে তালে শান্তি আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করবে ও উচ্চস্তরে পৌঁছবে—এইটেই হচ্ছে মূল কথা। এবং এই কারণেই শুধুমাত্র বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী ও বিশিষ্ট শিল্পী, বৈজ্ঞানিকদের সহায়তা নিলে চলবে না—তাদের সহায়তা নেবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণি ও তার সহযোগী কৃষক শ্রেণির দিকেই আসল লক্ষ্য রাখতে হবে।

যুদ্ধের জন্য চাই খাদ্য, কৃষক যদি যুদ্ধের জন্য খাদ্য না ছাড়ে, যুদ্ধের জন্য চাই অস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম—শ্রমিক যদি তা উৎপাদন না করে বা বহন না করে—যুদ্ধের জন্য চাই সৈন্য ছাত্র ও কৃষকরা যদি ভাড়াটিয়া সৈন্যবৃত্তি না করে—তাহলে যুদ্ধ হতে পারে না। এবং এই চেতনা জাগাতে হলে শুধুমাত্র বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের নয় দফা প্রস্তাব প্রচার করলেই চলবে না—জাতীয় ভিত্তিতে জনসাধারণের দৈনন্দিন সমস্যার সঙ্গে তাল রেখে আওয়াজও যোগ করতে হবে। কমিউনিস্টদের মুখপত্রগুলোয় আদর্শগত প্রচার করতে হবে। নেহরুর সম্বন্ধে মোহবিস্তার না করে—শান্তিকে কমিউনিস্টরা যে চোখে দেখে, যেভাবে শান্তি জয় করে নিতে চায়, সেই প্রচার করতে হবে। নেহরু সরকারের ভণ্ড শান্তি নীতির মুখোশ খুলে দিতে হবে।

পার্থক্য আছে যেমন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের আওয়াজে ও শান্তি সংগ্রামের আওয়াজে—তেমনি শান্তি কমিটির মুখপত্র ও কমিউনিস্টদের মুখপত্রের পার্থক্য থাকা উচিত। শান্তি কমিটির মুখপত্রে কমিউনিস্টদের বক্তব্যকে যেমন সম্পাদকীয় স্তম্ভে স্থান দেওয়া যায় না—তেমনি কমিউনিস্টদের মুখপত্রের সম্পাদকীয়তে শান্তি কমিটির বক্তব্যকে স্থান দেওয়া যায় না। তাহলে "ইন ডিফেন্স অফ পিস" আর "লাস্টিং পিস ফর পিপ্‌লস ডেমোক্রেসী" পত্রিকার মধ্যেও কোন পার্থক্য থাকে না।

ডি-ডি কোশাম্বী, মুলকরাজ আনন্দ প্রভৃতি সারা ভারত শান্তি কমিটির বোম্বাইস্থিত সদস্যবৃন্দ যে প্রস্তাবগুলো তুলেছেন। যেমন—

১। এশিয়ার প্রত্যেকটি দেশ হইতে সেই দেশের বহির্ভূত সৈন্য বাহিনী সরাইতে হইবে।

২। ভারতের সশস্ত্র ফৌজের কোনও অংশ বিদেশের মাটিতে অবস্থান করিবে না বা লড়াই করিবে না।

৩। কোনও বিদেশী শক্তিকে ভারতীয় সৈন্য বা ভারতের মাটিতে দাঁড়াইয়া অন্য কোনও সৈন্য সংগ্রহ করিতে দেওয়া হইবে না।

৪। ভারতের মাটিতে কোনও বিদেশী শক্তিকে স্থায়ী বা অস্থায়ী কোনওরূপ ঘাটি গাড়িতে দেওয়া হইবে না।

৫। কোনও বিদেশী শক্তিকে সামরিক মাল বা ফৌজ পরিবহনের জন্য ভারতের বিমান, রেল বা বন্দরের কোনরূপ সুবিধা দেওয়া হইবে না।

এইসঙ্গে যুক্ত করা দরকার বলে মনে হয়—

(১) ভারত সরকারের সামরিক বাজেট মোট আয়ের এক চতুর্থাংশ করতে হবে। কারণ প্রধানমন্ত্রী একাধিকবার ঘোষণা করেছেন যে ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ হবার সম্ভাবনা নাই। দেশের অন্যান্য খাতে যখন খরচ করবার মত অর্থাভাব তখন সৈন্যের জন্য মোট আয়ের অর্দ্ধেকের উপর খরচ করা ভারতবাসীর পক্ষে মঙ্গলজনক নয়।

(২) ভারত সরকারের সৈন্যবাহিনী থেকে বিদেশী কর্তাদের অপসারণ করা হউক। কারণ

এইসব সেনানায়করা একদিকে প্রচুর মাহিনা লয়—অপরদিকে বিদেশী সেনানায়ক দেশের শান্তির পক্ষে মঙ্গলজনক নয়—এই সমস্ত সেনানায়করা ভারতবাসীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের নিজেদের স্বার্থে ভারতকে যুদ্ধ চক্রান্তে জড়িয়ে ফেলতে পারে।

(৩) কমনওয়েলথ থেকে ভারত সরকার বেরিয়ে আসুন, কারণ কমনওয়েলথে থাকলে আমাদের দেশকে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র নীতি অনুসারে চলতে চাপ দেওয়া হবে এবং তাতে যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।

(৪) মালয় থেকে গুর্খা সৈন্য ও কোরিয়া থেকে মেডিকেল ইউনিট ফেরৎ আনতে হবে। কারণ এই দুই দেশে ভারতবাসীর নিজস্ব কোন স্বার্থ নেই এবং সাধারণ ভারতবাসী কোরিয়ায় মার্কিন আক্রমণের এবং মালয়ে ব্রিটিশ আক্রমণের বিরোধী।

(৫) ব্রহ্মে কমনওয়েলথী পরিকল্পনানুযায়ী ভারত সরকার যে অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য করছেন তা বন্ধ করতে হবে। ব্রহ্মবাসীরা নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করুন।

(৬) দেশে খাদ্যাভাব ও বেকারি বৃদ্ধি বেড়ে যাবার জন্য অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। কাজে কাজেই যেসব দেশ বিনা শর্তে আমাদের খাদ্য দিয়ে সাহায্য করতে চান ও সম্মানজনক চুক্তিতে আমাদের দেশের শিল্পোন্নয়নে সাহায্য করতে চান সেই সব সুবিধা ভারত সরকার গ্রহণ করুন।

(৭) কোরিয়া সমস্যা যেমন আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে তেমনি কাশ্মীর সমস্যাও ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি করেছে এবং জাতিসঙ্ঘে এই সমস্যার সমাধানের কোন শান্তিপূর্ণ সম্ভাবনা লক্ষ্য না করে ভারতবাসী গভীর উদ্বেগ বোধ করছেন—কাজেই অবিলম্বে ভারতে বৃহৎ পঞ্চশক্তির বৈঠক আহ্বান করে কোরিয়া সমস্যা ও কাশ্মীর সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার চেষ্টা ভারত সরকার গ্রহণ করুন।

৯ মার্চ ১৯৫১ মুর্শিদাবাদ ডি.ও.সি

বিশ্ব শান্তি ও নেহরুর ভূমিকা

[২৬শে ও ২৭শে জানুয়ারি, ১৯৫১, "প্রাদেশিক মহিলা" সেল কমঃ পাম দত্তের লেবার মান্থলী ও ক্রশ রোডস-এ প্রকাশিত প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে শান্তি ও নেহরুর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করে। কমঃ যমুনা, আত্রেয়ী (মাত্র একদিন উপস্থিত ছিলেন), বিভাদি, লতা ও অসীমা এই আলোচনাগুলিতে উপস্থিত ছিলেন। এই আলোচনার ভিত্তিতে একটি খসড়া উপস্থিত করা হয় জেলা প্রতিনিধিদের নিয়ে যে বৈঠক হয় ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি। সেখানে বিভিন্ন কমরেডদের মতামত ও আলোচনা শুনে আমরা যথেষ্ট লাভবান হই। বিশেষ করে নেহরু গভর্নমেন্টের চরিত্র সম্পর্কে আমাদের যে অস্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সেইটা স্পষ্ট হয় এবং তদনুযায়ী আমরা আমাদের সেলের মতামতটি পুনরায় লিখিত আকারে নিম্নে পাঠালাম। আমাদের প্রথম খসড়াটির লেখার মধ্যে যে সকল ভাসাভাসা ব্যাখ্যা (Loose Formulations) এবং অস্পষ্টতা ছিল তার সংশোধন করার চেষ্টা হয়েছে এখানে। তা বাদে লেখাটিকে ঢেলে সাজান হয়েছে তবু প্রথম লেখাটির থেকে কোন মূল ব্যাখ্যার পরিবর্তন করা গেল প্রয়োজন মনে করেনি।]

আজ শান্তি রক্ষায় নেহরুর ভূমিকা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার। গত ছয় মাসে ভারতের শ্রমিকের পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি যেখানে বিশ্বব্যাপী শান্তি আন্দোলনকে সফল করার

কাজে শোচনীয়ভাবে অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে, ঠিক সেই সময় নেহরু—যে নেহরুর সরকার সাম্রাজ্যবাদেরই ঔরসজাত—আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা করেছে। মার্কিন প্রভুদের প্ল্যান অনেকাংশে বানচাল করেছে, সমস্ত পৃথিবীর সামনে সোভিয়েত ও নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাথে একমাত্র ভারত ও বর্মা ভোট দিয়েছে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। এ সব কেন ও কি কারণে ঘটেছে তা আজ আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করে, ইতিহাসের গতি থেকে শিক্ষা গহণ করে আমাদেরপার্টির ভবিষ্যৎ নীতি নির্দ্ধারণ করতে হবে। আজ "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকা অবধি বলেছে—সারা পৃথিবীর সামনে দুইটি পথ উপস্থিত ঃ একটি হল আমেরিকার পথ অন্য পথটি হল ভারতের অনুসৃত পথ। আজ চৌ-এন-লাই ঘোষণা করছেন পান্নিকর মারফৎ যে কমনওয়েলথে নেহরুর উপস্থিতি চীনা গণরাষ্ট্র শান্তির সহায়ক হিসাবে দেখেন। আজ সোভিয়েত যখন কমনওয়েলথ প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন তখনও তারা "কোন কোন দেশের সদুদ্দেশ্যে"র (Good intentions) তারিফ করতে ভোলেনি যদিও তাঁরা বলেছেন যে জাহান্নামের পথেও সদুদ্দেশ্যের ছড়াছড়ি থাকে। রাজনৈতিক কমিটিতে বি এন রাও মারফৎ চীনা গণরাষ্ট্র ঘোষণা করেন ঃ—

"দ্বাদশ রাষ্ট্রের উত্থাপিত প্রস্তাবকে পিকিং সরকার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার একটি খাঁটি ভিত্তি বলিয়া মনে করেন......শান্তি প্রতিষ্ঠায় পিকিং সরকারের আগ্রহহেতু এবং জাতিসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত যে সকল দেশ সত্য সত্যই শান্তির জন্য আগ্রহশীল তাহাদের প্রতি পিকিং সরকারের শ্রদ্ধা হেতু কেন্দ্রীয় গণ-সরকার প্রস্তাবিত সম্মেলনের প্রথম বৈঠকে যুদ্ধ বিরতি সাধনে সম্মত হইয়াছেন।" আজ চীন, ভারতের শান্তি প্রচেষ্টাকে তার সমস্ত দুর্বলতা সত্ত্বেও এত বড় মানমর্যাদা দিয়েছে। কিন্তু আজও আমাদের পার্টি নেহরু সম্পর্কে দৃষ্টি ও মনোভাব পরিষ্কার করতে পারেনি।

প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে ঃ নেহরু সরকারের শ্রেণি চরিত্র কি এবং সে পৃথিবীর কোন শিবিরের অন্তর্ভুক্ত? নেহরু সরকারের চরিত্রে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। নেহরু সরকার হল বড় বুর্জোয়াদের সরকার যারা, সামন্ততন্ত্রের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নেহরু সরকার সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপস করেই আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। নেহরু সরকার সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের অন্তর্ভুক্ত। ভারতে নেহরু সরকার হল ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার দেশীয় রক্ষা কর্তা (native servitor of colonial regime in India)।

আজ পৃথিবী দুই শিবিরে বিভক্ত। তৃতীয় শিবির বলে কিছু নাই। সমাজতান্ত্রিক নেতারা যে তৃতীয় শিবিরের ভাওতা দেন তা হল আসলে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে প্রবেশ করার পিছনের দরজা মাত্র। এই দুই শিবিরের এক হল সাম্রাজ্যবাদী শিবির অথবা যুদ্ধবাজদের শিবির। অন্যটি হল জনগণের শিবির অথবা শান্তির শিবির যার নেতৃত্বে রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মহান চীন। তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে নেহরু সরকার যদি সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের অন্তর্ভুক্ত দেশ হয় তবে সে শান্তির সহায়ক এমন পথ কি কবে অবলম্বন করছে? কি করে সে মার্কিন যুদ্ধবাজদের পরিকল্পনার বিরুদ্ধতা করছে?

আমাদের সেল মনে করে এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে যদি আমরা আজ বিশ্বব্যাপী শান্তি সংগ্রামের বিরাট এবং যুগান্তকারী তাৎপর্য বুঝতে পারি। আমাদের প্রধান দুর্বলতা হল যে আমরা বর্তমান জগতে শান্তি রক্ষার লড়াইয়ের রণনীতিগত তাৎপর্য ও গুরুত্ব বুঝতে পারিনি

(strategic importance)। মার্ক্সিজম্ শেখায় যে বস্তু স্থিতিশীল নয় (not static)—তার গতি (movement) আছে। আজ পৃথিবীর যে দুইটি শিবিরের কথা বলা হয়েছে তার বেলায়ও ঐ একই কথা খাটে। যে সকল শক্তি ঐ দুই শিবিরের অন্তর্ভুক্ত তার মধ্যেও অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে, গতি আছে, তাই তার মধ্যেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ঘটনার চাপে বিভিন্ন শ্রেণি শক্তিগুলি নতুনভাবে সংগঠিত হয়ে থাকে (alignment of class forces), বন্ধু মিত্রদের মধ্যে ফাটল দেখা দেয়। যেমন গত মহাযুদ্ধের আগে ফ্যাসী বিরোধী আন্দোলন রণনীতিগত গুরুত্ব (strategic importance) গ্রহণ করেছিল, যার উপর ভিত্তি করে সমস্ত মানুষ দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল—সাম্রাজ্যবাদী শিবির অবধি দুই ভাগে ভাগ হয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল, আজ ঠিক তেমনি শান্তি ও যুদ্ধের প্রশ্ন সমস্ত পৃথিবীকে বিভক্ত করছে। এখনও এই process of struggle চলছে এবং এর মধ্যে দিয়ে আমাদের ঐতিহাসিক কর্তব্য—আমাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সফল করতে হবে। দুঃখের বিষয় অনেক কমরেডের মধ্যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম এবং শান্তি সংগ্রামকে দুইটি আলাদা সংগ্রাম হিসাবে দেখার ঝোক লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আমরা যদি বুঝতে পারি যে বিশ্বব্যাপী শান্তি সংগ্রাম আজ সমস্ত মনুষ্য জাতির ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করছে যদি আমরা বুঝি যে এই শান্তি সংগ্রামের সঙ্গে সমস্ত সংগ্রাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত, শান্তি সংগ্রামের সফলতার উপর অন্য সমস্ত প্রগতিশীল এবং মুক্তিকামী আন্দোলন নির্ভর করছে তাহলে আমরা শান্তি আন্দোলনের সাথে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ তা সহজেই বুঝতে পারব। আজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা সমস্ত পৃথিবীকে কবলভুক্ত ও শোষণ করার জন্য যুদ্ধ বাঁধাতে চায়। তাদের উপনিবেশগুলিকে নিজেদের তাঁবে রাখার জন্য তাই ইতিমধ্যেই তারা যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে মালয়, ভিয়েৎনামে, কোরিয়ায়। আজ এশিয়াবাসীর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে তাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সফলতা নির্ভর করছে কত কৃতকার্যভাবে শান্তির জন্য বিশ্বব্যাপী লড়াই সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনাকে পর্যুদস্ত করে—তার ঔপনিবেশিক রাজত্ব কায়েম করার আর দুনিয়াকে শৃঙ্খলিত করার স্বপ্ন চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়। আজ তাই শান্তিরক্ষার জন্য, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সফল করার জন্য সর্বব্যাপক বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন করার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী শান্তি আন্দোলনের মত এত বিরাট, সচেতন (conscious) আন্দোলন শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে পৃথিবীতে আগে কখনও হয় নাই। আজ যুদ্ধাতঙ্ক এবং শান্তির জন্য মানুষের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ক্রমান্বয়ে শান্তি আন্দোলনের সম্প্রসারমান ব্যাপক ভিত সৃষ্টি করছে যার ধাক্কা সাম্রাজ্যবাদী শিবিরেও লেগেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আজ নেহরুর শান্তি প্রচেষ্টার কারণ ও তাৎপর্য বুঝতে হবে ও বিচার করে দেখতে হবে। আজ মার্কিন পুঁজিপতিরা যে উন্মত্তভাবে যুদ্ধ লাগাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে তার ফলে সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়াতেও যে অন্তর্বিরোধ রয়েছে তার সংকট স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। আজ সাম্রাজ্যবাদী শিবির একটি সমষ্টিগত (homogenous) গোষ্ঠী হিসাবে চলতে পারছে না। কমন্‌ওয়েলথ প্রস্তাব তার একটি নিদর্শন। চীনকে জাতিসঙ্ঘে আসন দেওয়া থেকে শুরু করে, ৩৮তম অক্ষরেখা অতিক্রম করা, আনবিক বোমা ব্যবহার করার ব্যাপার নিয়ে এই মতানৈক্য ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্রের মত বড় সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে—ছোটখাট রাষ্ট্রদের ত কথাই নাই। নেহরু আজ সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে থেকেও দুনিয়ার

গতি সে খুব বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে দেখছে। আজ সে বুঝছে যে ইংল্যান্ড তার দূর প্রাচ্য উপনিবেশের সংকটে পড়ে নেহরু সরকারকে কিছুটা দূর পর্যন্ত লাগাম ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। কমনওয়েলথের রাশের মধ্যে থেকেও তাকে কিছুটা দূর পর্যন্ত গতি দিয়েছে। কিন্তু সে জানে যে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সর্বগ্রাসী শক্তির সামনে তার এটুকুও থাকবে না। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই সে বুঝেছে যে, যে আমেরিকা মার্শাল পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে বিরাট শিল্পে উন্নত পশ্চিম ইউরোপের শক্তিসম্পন্ন বুর্জোয়া গভর্নমেন্টগুলিকে ক্রীতদাসে পরিণত করেছে, সেই আমেরিকা অনেক দুর্বল, ঔপনিবেশিক বুর্জোয়াদের নেহরু সরকার যেটুকু সুবিধা পেয়েছে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে, তাও সে কেড়ে নেবে। প্রত্যেকটি ছোটখাট দাবির প্রতিদান হিসাবে ভারতকে আমেরিকান নীতি স্বীকার করানর চেষ্টা হয়েছে, সে অভিজ্ঞতাও তার আছে। তার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত খাদ্য নিয়ে। ট্রুম্যানের চার দফা পরিকল্পনা (Point 4 Program–Aid to Undeveloped Areas) থেকেও ভারত বঞ্চিত হয়েছে ঐ একই কারণে। কাশ্মীর সম্পর্কে, কোরিয়ার ৩৮তম অক্ষরেখা অতিক্রম করার ব্যাপারে—প্রত্যেকটি ঘটনার মধ্য দিয়ে নেহরু বুঝেছে যে মার্কিন যুদ্ধোন্মাদদের পথ অনুসরণ করলে যুদ্ধ এখুনি লেগে যাবে। তাই সে সাম্রাজ্যবাদের শিবিরে থেকেও আমেরিকার বিরুদ্ধতা করেছে যত সীমাবদ্ধভাবেই হউক।

অন্যদিকে ঔপনিবেশিক দুনিয়াতে এই সংকট আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে। ঔপনিবেশের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের যে অন্তর্বিরোধ তা আজ ফেটে পড়েছে সারা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়। আজ চীনের মুক্তি এবং ছোট্ট কোরিয়ায় সেরা মার্কিন বাহিনীর চরম দুর্দশা সমস্ত ঔপনিবেশিক দুনিয়ার শোষিত জনগণের মনে আসন্ন মুক্তির আশা সঞ্চার করেছে। এশিয়াতে জাগ্রত গণশক্তির জোয়ার লেগেছে। নেহরু বুঝেছে যে এই অবস্থায় যদি যুদ্ধ লাগে ত সমস্ত এশিয়ার গণশক্তি জেগে উঠে মার্কিন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কেন, এমন কি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থারও সমাধি রচনা করবে। গত যুদ্ধের পর যেভাবে পূর্ব ইউরোপে নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং চীনা গণরাষ্ট্রের বিজয় সম্ভব হয়েছিল, এবার যুদ্ধ লাগলে তার সরকার যে গণ-মুক্তি আন্দোলনের জোয়ারে ভেসে যাবে, এ বিষয় সে যথেষ্ট শ্রেণি সচেতন। এশিয়ার মধ্যে সে তার সরকারকে সব চেয়ে Stable Govt. বলে জানে। কিন্তু যুদ্ধ লাগলে সে যে এই সরকারকে টিকিয়ে রাখতে পারবে না, এ বিষয় সে খুব ভালভাবেই জানে। ২০/১/৫১ তারিখে তাই নেহরু দূর প্রাচ্য পরিস্থিতি বিশেষতঃ কোরিয়ার যুদ্ধ সীমাবদ্ধ রাখা সম্পর্কে এক প্রশ্নোত্তরে বলে ঃ ‘ইহা খুবই সুস্পষ্ট যে বিগত যুদ্ধের পর সমগ্র এশিয়ায় বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। এশিয়ার শক্তি সাম্যেরও তাহার ফলে পরিবর্তন হইয়াছে। ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশ স্বাধীন হইয়াছে এবং তাহার পর চীনের বিরাট পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। প্রথমেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে এশিয়াতে এবং বিশেষভাবে চীনেই এই পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অতীতের অবস্থার দ্বারা বিচার না করিয়া সকলেরই এই নূতন পরিস্থিতি উপলব্ধি করা দরকার ...অনেক জিনিষ আমরা পছন্দ করি না, একথা বলিয়া লাভ নাই। যাহা বাস্তব তাহা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে এবং আমাদের নীতিও তদনুযায়ী নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। নূতন পরিস্থিতির সহিত আমরা নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারি নাই বলিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দূর প্রাচ্যে অনেক গোলযোগ ঘটিয়াছে।” এই বাস্তববাদী দৃষ্টি

রাখার আবেদন কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষেও প্রযোজ্য।

তাই দেখা যায় এই দুই সংকটের চাপে পড়ে (এক সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার সংকট, অপরটি ঔপনিবেশিক দুনিয়ার সংকট) নেহরু নিজের স্বার্থে, তার অস্তিত্ব বজায় রাখার তাগিদে সে শান্তি রক্ষা করতে চেয়েছে। আজ তাই সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যে থেকেও নেহরু মার্কিন যুদ্ধ পরিকল্পনার বিরোধিতা করতে বাধ্য হচ্ছে। নেহরু বাধ্য হচ্ছে এমন stand নিতে যা কার্যত শান্তি শিবিরকেই সাহায্য করে (যথা চীন সংক্রান্ত নীতি)। যথা দেখা যায় যে নেহরু যে নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির কায়দা আবিষ্কার করেছিল সাম্রাজ্যবাদকে তুষ্ট করার জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক দেশের মানুষদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাবকে সন্তুষ্ট রাখতে—আজ সেই নিরপেক্ষতা ধাপে ধাপে লঙ্ঘন করে নেহরু খোলাখুলিভাবে চীনকে জাতিসঙ্ঘে গ্রহণের জন্য, তাকে কোরিয়ায় আক্রমণকারী ঘোষণা করা বা তার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ প্রথা প্রয়োগ করার শুধু বিরোধিতাই করেনি—সারা এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহ যাতে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আমেরিকান নীতি প্রতিরোধ করে তার জন্য বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেবার জন্য আগুয়ান হয়েছে। এই প্রথমবার জাতিসঙ্ঘে চীন প্রস্তাব বিবেচনার জন্য সময় প্রার্থনা করে অধিবেশন মুলতুবী রাখার প্রস্তাব আমেরিকার বিরোধিতা সত্ত্বেও গৃহীত হয়েছে। যে আরব রাষ্ট্রগুলি সামন্ততন্ত্রের সমস্ত স্বৈরাচারিতা ও মার্কিন ডলারের চাপের সমস্ত ঐতিহ্য বহন করে চলেছে তারা অবধি ভারতের নেতৃত্বে রাজনৈতিক কমিটিতে চীনকে আক্রমণকারী ঘোষণা করতে আপত্তি করেছিল। গত জুন মাসে এই সব রাষ্ট্রই বিনা বাক্যব্যয়েই নর্থ কোরিয়াকে আক্রমণকারী ঘোষণা ও কোরিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিন অভিযানকে সমর্থন করতে মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করেনি—এই অবস্থা থেকে তারা "লং মার্চ" করে সাময়িকভাবে হলেও কোথায় এসে দাঁড়িয়েছিল তা লক্ষ্য করার বিষয়। আজ যতই যুদ্ধ লাগা বাস্তব সত্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে ততই তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক তাৎপর্য (implications) সাম্রাজ্যবাদী শিবিরকেও বিভক্ত করছে। যুদ্ধবাজদের সংখ্যা ক্রমশই মুষ্টিমেয় কয়েকটি শক্তিতে পরিণত হচ্ছে। আজ তাই নেহরু আর এটলী, ট্রুম্যানের মধ্যে তফাৎ টানতে হবে। শান্তি কংগ্রেসে একজন চেক প্রতিনিধি আমাদের প্রতিনিধিদের যে কথা বলেছিলেন সেই কথা স্মরণ করা দরকার—"যুদ্ধে নেহরুর কোন লাভ নেই (Nehru has nothing to gain by war)। নেহরু যুদ্ধবাজ নয়। নেহরু শান্তি রক্ষা চায়"। সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে এই ফাটল ও পরিপ্রেক্ষিতে নেহরুর মার্কিন সমর পরিকল্পনার বিরোধিতা (Nehru's oppositional stand) সে যতই সীমাবদ্ধ হউক, তার গুরুত্ব আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। এই ফাটলকে আরও কি করে বাড়ান যায়, কি করে নেহরুকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ষড়যন্ত্র থেকে আরও দূরে ঠেলে দেওয়া যায়, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজগোষ্ঠীকে আরও কোণঠাসা করা যায়, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শান্তি শিবিরকে আরও শক্তিশালী করা যায়, নির্ভর করবে কিভাবে পার্টি শান্তি আন্দোলনে তার নেতৃস্থানীয় ভূমিকা গ্রহণ করবে। আজ মোট কথা হল যে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের সংকট এবং সেই সংকটে নেহরুর oppositional role শান্তি আন্দোলনকে আরও ব্যাপক; আরও শক্তিশালী করার সম্ভাবনা (possibility) এনে দিয়েছে।

কিন্তু এই সম্ভাবনা নিজের থেকে (automatically) সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের পরাজয় এনে দেবে না। কারণ একটা কথা মনে রাখা দরকার নেহরু এখনও ঐ সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যে থেকেই বিরোধিতা করছে। সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে থেকেই নেহরুর শান্তি নীতির সমস্ত

দুর্বলতা, সমস্ত অসামঞ্জস্যের উদ্ভব। যেমন একদিকে সে চীন সম্পর্কে মার্কিনী নীতির তীব্র বিরোধিতা করছে তেমনি সে আমেরিকাকেও এতদিন চটাতে চায়নি। দুই নৌকায় পা দিয়ে চলেছে বলেই নেহরু একদিকে ষ্ট্যালিন ট্রুম্যান শান্তি আলোচনার প্রস্তাব করেছে, অন্যদিকে উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করার বে-আইনি প্রস্তাব সমর্থন ও কোরিয়ায় মার্কিন হস্তক্ষেপ সমর্থন করেছে। একদিকে চীনকে জাতিসঙ্ঘে গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করেছে, অন্যত্র কমনওয়েলথে যোগ দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়ার মত সরাসরি মার্কিন ক্রীতদাসের সঙ্গে যাদের চাপের ফলে কমনওয়েলথ প্রস্তাব নেহরুর চেষ্টা সত্ত্বেও এমন গা বাঁচান ও দুমুখো ভাষার জঞ্জালে অস্পষ্ট করা হল যে তার কোনই কার্যকারীতা রইল না। যেমন একদিকে চীন সম্পর্কে সে বলিষ্ঠ নীতি অবলম্বন করেছিল, অন্যদিকে মার্কিন চাপে বি-এন-রাও দ্বাদশ রাষ্ট্র প্রস্তাবে আলোচনার আগেই যুদ্ধ বিরতি করতে হবে বলে সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করে, যাতে তা সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা গ্রহণযোগ্য হয়। রুশ কর্তৃক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে আক্রমণকারী আখ্যা দেওয়ার প্রস্তাবও নেহরু সরকার সমর্থন করে না।

তাই সাম্রাজ্যবাদী শিবির থেকে নেহরুর শান্তি নীতি সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সুদৃঢ় হবে তা আশা করা বৃথা। আজ সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের সংকট, তার অন্তর্বিরোধ, জনগণের শান্তি প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করার জন্য পার্টি কিভাবে ব্যবহার করবে, তার উপর নির্ভর করে আমরা যুদ্ধবাজদের আরও কোণঠাসা করতে পারব কি না, নেহরুকে তাদের আওতা থেকে আরও দূরে টেনে আনতে পারব কিনা, শান্তি শিবিরকে আরও শক্তিশালী এবং অজেয় করে তুলতে পারব কি না।

এটা করতে হলে পার্টিকে শান্তির জন্য সর্ববৃহৎ ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গড়ে তুলতে হবে। আজ চীন বিপ্লব এবং কোরিয়ায় সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ এবং সফল সংগ্রাম সমস্ত এশিয়াবাসীকে ভীষণভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। আমাদের সেলের মতে শান্তি আন্দোলনকে এশিয়াতে সর্বব্যাপক সমর্থন এনে দিয়েছে এই দুইটি ঘটনা, বিশেষ করে চীনের বিপ্লব যা হল বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির সব চাইতে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা (significant event)। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যেমন রুশ বিপ্লব সমস্ত ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিল, ঠিক তেমনিই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর চীন বিপ্লব ইতিহাসের অনুরূপ যুগান্তকারী পরিবর্তন এনে দিল।

আজ চীন বিপ্লবের প্রভাব সমস্ত ঔপনিবেশিক দুনিয়াকে চঞ্চল করে তুলেছে নিজেদের দাসত্ব শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলার জন্য। তাদের গভীর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব আরও শক্তি সঞ্চয় করেছে চীনের বিজয় অভিযানের মধ্য দিয়ে। এশিয়ার ঔপনিবেশিক দেশগুলির জঙ্গী জাতীয়তাবাদী মনোভাব (militant national sentiment) আজ চীনের জয়ের মধ্যে এতদিনকার শোষিত নিষ্পেষিত এশিয়াবাসীর শেতাঙ্গদের শোষণের বিরুদ্ধে জয় হিসাবে অভিনন্দিত করেছে। গত যুদ্ধের আগে সাধারণ লোকে যেমন এশিয়ান জাতি হিসাবে জাপানের সমর ও শিল্পশক্তিতে গর্ব অনুভব করত এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ ও আমেরিকানদের সাম্রাজ্যবাদী বলে বিরোধিতা করলেও জাপানীদের জন্য তাদের সহানুভূতি ছিল, সেই জাতীয়তাবাদী sentiment-ই আবার আজ প্রগতিশীল নয়া গণতান্ত্রিক চীনা রাষ্ট্রের কাছে বিপুল সমর্থন এনে দিয়েছে। গত যুদ্ধের সময় জাতীয় sentiment যেখানে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল (কেউ ছিল জাপানের সমর্থনে, কেউ ছিল ফ্যাসী বিরোধী শিবিরে) আজ আবার

সেইখানেই বিরাট ঐক্য সাধিত হয়েছে। আজ তাই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে এবং শান্তিরক্ষার জন্য ঔপনিবেশিক দুনিয়ার মানুষের জাগ্রত জঙ্গী জাতীয়তাবাদকে শান্তির একটি প্রধান ও শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে আমরা পাচ্ছি।

আজ "এশিয়া এশিয়াবাসীর জন্য" (Asia for Asians) এই sentiment-ই ওয়ারস শান্তি কংগ্রেসের একটি মূল দাবি—"বিদেশী হস্তক্ষেপ বন্ধ কর"—এই আওয়াজকে দুর্বার করে তুলবে। আজ এই sentiment-ই এমন বহু লোককে শান্তি শিবিরে টেনে আনবে যাদের সাধারণভাবে আমেরিকার ঐশ্বর্য, অর্থনীতি ও উন্নত শিল্প ব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট মোহ আছে। এমন কি বহু লোক যারা সোভিয়েত সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দিহান তারাও এই একই মনোভাব থেকে বিদেশী হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করবে। এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত C. V. Raman-এর কোরিয়া সম্পর্কে সাম্প্রতিক বক্তৃতা (১৯/১/৫১ এর ক্রশ রোডসএ প্রকাশিত)।

আজ চীনা গণরাষ্ট্র এশিয়া জাতির এই মনোভাবের তাৎপর্য বুঝেছে বলেই সে UNO-তে পিকিং সরকারের যা কিছু বক্তব্য, এবং পাশ্চাত্য জগতের কাছে চীনা সরকারের বক্তব্য বিশ্লেষণের ভার তারা সোভিয়েত মারফৎ উপস্থিত না করে ভারত ও তার রাষ্ট্রদূত পান্নিকর মারফৎ উপস্থিত করেছে। তার একটি কারণ হতে পারে সাম্রাজ্যবাদী আওতার একটি দেশকে শান্তির দিকে টেনে আনা। কিন্তু তার আরো একটি বিশেষ কারণ হল যে এশিয়ান জাতি দ্বারা উত্থাপিত হলে সে কথা ঔপনিবেশিক দুনিয়ার জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলিকে শান্তির পক্ষে সংগঠিত করায় অনেক দূর প্রভাবিত করতে সাহায্য করবে। চীন, মিশর ও ভারতকে যুদ্ধ বিরতি সপ্ত রাষ্ট্র সম্মেলনে এই কারণেই আহ্বান জানান।

আজ তাই সমস্ত এশিয়াবাসী 'সোভিয়েতের সাথে ঐক্য'—এই আওয়াজ তুলুক বা না তুলুক, তারা প্রত্যেকে চীনা গণরাষ্ট্রের সাথে ঘনিষ্ঠ ঐক্য ও মৈত্রী কামনা করে। এই কামনা এত গভীর যে আরব রাষ্ট্রগুলি অবধি (যারা প্রকৃত পক্ষে আমেরিকান ডলারের ক্রীতদাস) সেই মনোভাব সরাসরি উপেক্ষা করতে পারেনি দ্বাদশ রাষ্ট্র প্রস্তাব তার প্রমাণ। আমাদের দেশের শান্তি আন্দোলনের পক্ষে তাই "চীনা গণরাষ্ট্রের সাথে ভারতের ঘনিষ্ঠ ঐক্য ও মৈত্রী রক্ষা কর"—একটি মূল আওয়াজ। এইখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে এই শ্লোগান "সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ঐক্য ও মৈত্রীর" চাইতে অনেক ব্যাপক সাড়া জাগায়—অনেক বিরাট গণ ভিত সৃষ্টি করে শান্তি আন্দোলনের। সেই জন্য কমরেড পাম দত্ত বলেছেন ঃ

"If the strength of the Peace Movement can ensure that India stands firmly united with the **Chinese Peoples' Republic** in opposition to all **Western intervention** in Asia and in solidarity with the liberation struggle of **all Asiatic peoples**, then victory for peace in Asia can be won.

Such a stand on the part of India will profoundly change the balance of World relation and constitute a most powerful contribution to the victory of World peace. This is the historic task to which the Indian Peace Movement is called."

"যদি শান্তি আন্দোলনের শক্তি সুনিশ্চিত করতে পারে যে ভারত এশিয়ায় পশ্চিমী

হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে চীনা জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সুদৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ এবং সমস্ত এশিয়া জনগণের মুক্তি যুদ্ধের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে দাঁড়িয়েছে, তাহলে এশিয়ায় শান্তি জয়যুক্ত হবে।

ভারতের পক্ষে এইরূপ সিদ্ধান্ত বিরাটভাবে পৃথিবীর পারস্পরিক সম্পর্কের ভারসাম্যকে পরিবর্তিত করবে এবং প্রতিষ্ঠিত করবে বিশ্বশান্তির বিজয়ের পক্ষে একটি খুব শক্তিশালী দান। এই ঐতিহাসিক কর্তব্য সমাপনের আহ্বান ভারতের শান্তি আন্দোলনকে জানান হয়েছে।" (অনুবাদ)

এমন কি মধ্যবিত্ত বুর্জোয়ারা মাও সে-তুং-এর নয়া গণরাষ্ট্রে জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা সম্পর্কে জেনে যথেষ্ট উৎসাহী হয়েছে। এমন কি বিধান রায়ের মতন বড় বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিও "জাতীয় বুর্জোয়া" আখ্যার পিছনে আশ্রয় নিতে চেষ্টা করছে—মাও সে-তুংকে quote করছে।

তাছাড়া চীনের বিরাট বাজার বড় বুর্জোয়া এবং বিশেষ করে মধ্যবিত্ত বুর্জোয়াদের বিশেষ লোভের বিষয়। তাই শুনছি 'Eastern Economist'-ও নাকি নেহরুর চীন নীতিতে অসন্তুষ্ট নয় (এ বিষয়ে আমাদের সেল কোন তথ্য নিজেরা পায় নি—এটা শোনা কথা, কারণ আমরা ঐ সব পত্রিকা পড়ার সুযোগ পাই না)। এসব দিক থেকে বিচার করে বলা যায় যে চীনের সাথে মৈত্রী ও ঐক্য ভারতে সর্ববৃহৎ ঐক্য সাধন করতে পারে।

একদিকে চীনের সাথে ঐক্য ও মৈত্রী, অন্যদিকে এশিয়াতে পরদেশে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ (ভিয়েৎনাম, কোরিয়া, মালয়) প্রতিরোধ—এই দুইটি আন্দোলনই সমস্ত ঔপনিবেশিক দুনিয়ার জাতীয়তাবাদীদের সমর্থন পাবে। এই দুই আন্দোলন শান্তি আন্দোলনের সর্ববৃহৎ ও ব্যাপকতর ভিত্তি রচনা করতে সক্ষম—তাকে দুর্বার করে তুলতে সক্ষম। শান্তি সৈনিকদের এই কথাটি বিশেষ যত্নের সহিত চিন্তা করা দরকার।

প্রত্যেক দেশের জাতীয় আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাসকে সেই দেশের বিপ্লব সফল করার কাজে লাগাতে হবে। এই কথা মনে রেখে বুঝতে হবে আজ ভারতের সমস্ত মানুষ তার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব থেকে তার জাগ্রত জাতীয়তাবাদ বোধ থেকে চীনের ও এশিয়ার মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন করে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণা ও বিরোধিতা ঘোষণা করে "সাম্রাজ্যবাদ এশিয়া ছাড়ো"—এই আওয়াজের পিছনে আমাদের দেশের সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে। যেমন ফ্রান্সে জার্মান পুনরস্ত্রীকরণের বিরুদ্ধে সমস্ত ফরাসী জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা সহজ, যেমন বৃটেনে মার্কিন প্রভুত্ব বিস্তারের বিরুদ্ধে "স্বাধীন" ও "গণতন্ত্রপ্রিয়" ব্রিটিশ জনসাধারণকে সব চাইতে সহজে ঐক্যবদ্ধ করা যায়, সেইভাবে আজ এশিয়ার সমস্ত জাতির সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাবকে জাগ্রত করে তুলে শান্তি আন্দোলনকে অজেয় করে তুলতে হবে কারণ আজ এশিয়াতেই সাম্রাজ্যবাদ তার যুদ্ধপরিকল্পনার প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছে। আজ সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করা ও শান্তি রক্ষা করা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যারা শান্তি আন্দোলন না জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এই প্রশ্ন তোলেন তারা একটি কৃত্রিম, অবাস্তব প্রশ্ন তোলেন যার উত্তরে কমরেড পাম দত্ত দেখিয়েছেন : "The camp of democracy and peace is thus at the same time the anti-imperialist camp." (গণতন্ত্র ও শান্তির শিবির তাই একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শিবিরও বটে—অনুবাদ)

আজ এই সাম্রাজ্যবাদী শিবিরকে কি করে দুর্বল ও পরাস্ত করা যায় সেই পরিপ্রেক্ষিতেই

নেহরুর ভূমিকা বিশ্লেষণ করে আমাদের নীতি স্থির করা দরকার।

সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যে থেকেও নেহরু সরকার যে যুদ্ধ বিরোধিতা করেছে—এই ঘটনা একদিকে যুদ্ধবাজদের আরও কোণঠাসা করা এবং অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, যুদ্ধ বিরোধী ফ্রন্টকে আরও ব্যাপক ভিত্তিতে প্রসারিত কবার, সংগঠিত করার বিরাট সম্ভাবনা উপস্থিত করেছে। নেহরু সরকারকে খাস যুদ্ধবাজদের আওতা থেকে তাদের যুদ্ধ ষড়যন্ত্র থেকে আরো দূরে ঠেলে দেওয়ার সম্ভাবনাও উপস্থিত। সেই জন্যই কমঃ পাম দত্ত বলেছেন—"The indications of divergence of Premier Nehru and the Indian Govt. representatives in the United Nations from the reckless aggressive war policy of Mac-Arthur, Truman-Attlee bloc in Eastern Asia are a very important development of the present international situation."

"প্রধান মন্ত্রী নেহরু ও সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘে ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের ম্যাক-আর্থার, ট্রুম্যান-এট্‌লী ব্লকের পূর্ব এশিয়ায় হঠকারী আক্রমণাত্মক যুদ্ধ নীতি থেকে সরে আসার ইঙ্গিতগুলি বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি।" (অনুবাদ)

এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারা না পারা নির্ভর করছে আমাদের পার্টির উপর। আমাদের পার্টি সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে সর্ববৃহৎ শান্তি ফ্রন্ট গড়ে তুলতে পারবে কি না এবং এই ফ্রন্টে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে কি না, সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলকে ভেঙ্গে চুরমার করার মতন ক্ষমতাশালী গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে গড়ে তুলতে পারবে কি না নির্ভর করবে কমিউনিস্ট পার্টি শান্তি সম্পর্কে কি রণকৌশল অবলম্বন করে।

আমাদের সেল মনে করে শান্তিরক্ষার মূল দুইটি হাতিয়ার হল ঃ

—চীনা গণরাষ্ট্রের সাথে ঘনিষ্ঠ ঐক্য ও মৈত্রী স্থাপনা।

—আমেরিকান নীতিকে ক্রমান্বয়ে কোণঠাসা করা।

এই দুইটি ব্যাপারেই নেহরুর সাম্প্রতিক পররাষ্ট্র নীতি তার সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শান্তির সহায়ক হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। যদি আমরা বুঝি যে যা কিছু এই উপরোক্ত দুইটি উদ্দেশ্য সাধন করে তাকেই শান্তি সহায়ক হিসাবে আমরা গ্রহণ করব তাহলে নেহরুর জাতিসঙ্ঘের সাম্প্রতিক নীতি অভিনন্দন করা উচিত। তার মানে এই নয় যে সেই নীতির সীমাবদ্ধতা এবং দুর্বলতা নাই। সেই নীতিকে অভিনন্দন করে তাকে কি করে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সুদৃঢ় করা যায় তার জন্য আমাদের চিন্তা করতে হবে। আজ এই ভিত্তিতে বিরাট ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গড়ার সময় আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার। শুধু যুদ্ধাতঙ্কই নয়, আমাদের সেল মনে করে যে, ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সমস্ত জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্য এবং সেই সংগ্রামে নেহরু যে অতীতে আন্তর্জাতিকতাবাদ, ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা ও সাম্যবাদের বাণী ভারতবাসীর মনে সাড়া জাগিয়েছিলো—তার প্রভাব নেহরু নীতির উপর চাপ হিসাবে উপস্থিত হয়েছে। আজ যখন মার্কিন চর প্রফেসর কাজিন্‌স্ আমেরিকার সাথে ভারতের বন্ধুত্বের নাম করে ভারত সফরে আসেন, তখন সাধারণ সভায় (আমাদের দ্বারা আহূত নয়) তাকে সাধারণ লোক প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তোলে। নেহরু নর্থ কোরিয়াকে আক্রমণকারী বলে স্বীকার করেছে বলার সঙ্গে সঙ্গে তাই উত্তর আসে ঃ "আমরা গণতান্ত্রিক দেশের গণতান্ত্রিক নাগরিক। আমরা এ বিষয় নেহরুর কথা মানতে রাজী নই।" জনসাধারণের

এই সুস্থ চেতনা শান্তিরক্ষার লড়াইয়ে সফলতা এনে দেবার গ্যারান্টি। তাকে কি ভাবে আমরা শান্তির পক্ষে, চীনের সাথে মৈত্রী ও ঐক্যের পক্ষে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে কোণঠাসা করার জন্য দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাব তারই উপর নির্ভর করবে নেহরুর যুদ্ধ বিরোধিতার প্রথম পদক্ষেপকে কতটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে কতটা বলিষ্ঠ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আমরা করতে পারব। তাই জনসাধারণের চেতনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে আমাদের আন্দোলন স্থির করতে হবে। এই প্রসঙ্গে আমাদের সেলে "ম—"র লেখার আলোচনা হয়। আমাদের সেল মনে করে যে "ম—"র লেখাগুলি অত্যন্ত অবাস্তব ও দুর্বল হচ্ছে। আমরা ঘটনার সঙ্গে তাল রেখে, সামঞ্জস্য রেখে লিখতে পারছি না। অবাস্তব শ্লোগান তুলছি। লোকের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে বাস্তব ঘটনা উপস্থিত করে লেখাকে বলিষ্ঠ ও লোকের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে পারছি না। আমাদের সেলে "ম—"র "কমনওয়েলথের" উপর লিখিত প্রবন্ধের উপর আলোচনা হয়। কমনওয়েলথে আমেরিকার বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব কেন পাশ হয়নি—এই ধরনের সমালোচনা অবাস্তব এবং লোকের মনে রেখাপাত করে না। কমনওয়েলথ সম্মেলনে মার্কিন প্রভুদের প্রধান উদ্দেশ্য তার যুদ্ধনীতির সমর্থন—বানচাল হয়, সাময়িকভাবে। আমেরিকার এই সাময়িক পরাজয় আমাদের তুলে ধরতে হবে এবং এটা অনেকাংশে নেহরুর চেষ্টায় হয়েছে সেটা স্বীকার ও অভিনন্দিত করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে প্যারিসের কমরেডরা ("স্বাধীনতা" ৯ নং প্রকাশিত) যে সমালোচনা করেছেন তা খুবই সময়োচিত হয়েছে। শুধু শ্লোগান ঠিক হলেই কাজ হয় না। জনসাধারণের চেতনা, তার কোথায় মোহ আছে, তার ঝোক কোন দিকে, আন্দোলনের স্তর কোনখানে—স্থান, কাল, পাত্র বিচার করে তবেই আন্দোলনের কায়দা ও কৌশল ঠিক করতে হয়। সেই দিক দিয়ে তাঁরা খুব সঠিকভাবে দেখিয়েছেন যে যেখানে কমনওয়েলথ সম্মেলন বয়কট করার জন্য কোন আন্দোলন হয়নি সেখানে নেহরুর যাত্রার প্রাক্কালে "নেহরু কমনওয়েলথ ছাড়" শ্লোগান মূলত ঠিক হলেও কার্যকরী হয় না। সেখানে নেহরুকে ভারতের জনসাধারণের তরফ থেকে শান্তির প্রস্তাব—চীনের সাথে মৈত্রী, বন্ধুত্ব, ঐক্য, পররাজ্য আক্রমণ বন্ধ করা, আণবিক বোমা ও পুনরস্ত্রসজ্জার বিরোধিতা ইত্যাদি mandate দিয়ে দাবি করা উচিত ছিল ভারতের জনতার এই আশা ও দাবি কমনওয়েলথে উপস্থিত করতে হবে নেহরুকে।

এই ধরনের positive আন্দোলন ও প্রচার আজ জনতার নেহরু সম্পর্কে মোহমুক্তি আনতে বিরাট সাহায্য করবে—তাকে শান্তির পথ সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে—শ্রমিক শ্রেণির রাজনীতির নেতৃত্বে তাকে সংগঠিত করতে সাহায্য করবে। আজ একথা ঠিক যে যতদিন নেহরু সরকার সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে থাকবে ততদিন তার শান্তি নীতি সুদৃঢ় ও সার্থক হতে পারে না। তবু আজ নেহরু সরকারের কাছে এই ধরনের mandate দেওয়া মানে তার উপর চাপ দেওয়া, তার চরিত্রের মুখোশ লোকের চোখের সামনে তুলে ধরা। ওয়ারস কংগ্রেস UNO যে আমেরিকার ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে জেনেও Address to United Nations (জাতিসঙ্ঘের প্রতি আবেদন) কেন করেছে? ঐ একই কারণে। এই ধরনের বাস্তব প্রচার আন্দোলন করতে পারলে, লোকের চেতনার সঙ্গে তাকে খাপ খাইয়ে সর্ব ব্যাপক ভিত্তিতে তা সংগঠিত করতে পারলে, তবেই আমরা জনসাধারণকে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের হাত থেকে মুক্ত করে শান্তির প্রকৃত পথে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব—নেহরুর

শান্তি নীতির অসম্পূর্ণতা এবং শান্তি নীতিকে সফল করার জন্য যে নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন তা লোকের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে। এইভাবেই কমঃ আর-পি-ডি যে কথা বলেছেন তা করতে সমর্থ হব ঃ "Supporters of Peace in India, while welcoming every step towards disentanglement of India from the Anglo-American war-bloc, will press forward with unsparing vigour for the further steps which are necessary in order that India shall fulfil a firm and consistent Peace policy."

"ভারতে শান্তির সমর্থকেরা ইঙ্গ-মার্কিন ব্লক থেকে ভারতের বন্ধনমুক্তির পথের প্রতিটি পদক্ষেপকে যেমন অভিনন্দন করবেন, তেমনি অসীম উদ্যমের সঙ্গে চাপ দিয়ে যাবেন অধিকতর অগ্রগতির জন্যে যা ভারতের সুদৃঢ় ও সঙ্গতিপূর্ণ শান্তি নীতি গঠনের জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয়।" (অনুবাদ)

কোন কোন কমরেড বলে থাকেন—নেহরু ভাল কাজ করলে আমরা তা সমর্থন করব। তার প্রতিক্রিয়াশীল কাজের আমরা বিরুদ্ধতা করব। এটা নেহাৎই অরাজনৈতিক উক্তি। এর জন্য কোন নীতির প্রয়োজন নাই। কমিউনিস্টরা ইতিহাসের গতি নির্দ্ধারণ করে বিভিন্ন শ্রেণিগুলির শক্তি বিচার করে, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে তার positive নীতি স্থির করে নেতৃত্ব দেয়। সেইজন্যই শান্তি আন্দোলনের ভূমিকা, তার নীতি ও কৌশল কমিউনিস্ট পার্টিকে স্থির করে এগুতে হবে। তা নয় ত আমরা ঘটনার লেজুড় হয়ে চলব।

আজ নেহরুর শ্রেণি চরিত্র মনে রেখে তার শান্তি নীতির সমস্ত দুর্বলতা মনে রাখতে হবে। নেহরুর নীতির দুর্বলতা দেখা যায় যে সে আজও কমনওয়েলথে অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কেও নেহরু আজও ধরিমাছ না ছুঁই পানির নীতি গ্রহণ করেছে। ২০/১ তারিখে প্রকাশিত বাও দাইকে স্বীকার করা সম্পর্কে একটি প্রশ্নোত্তরে নেহরু বলে; "ভারত ইন্দোচীনের কোন পক্ষকেই স্বীকার করে নাই এবং স্বীকার করার ইচ্ছাও নাই।" ২৭শে জুনের বে-আইনি প্রস্তাব (কোরিয়ায় মার্কিন আক্রমণ সমর্থন করে) আজও নেহরু প্রত্যাহার করে নাই। ম্যাক বাহিনীর সাথে আজও ভারতীয় এ্যাম্বুলেন্স কাজ করছে। যদিও নেহরু চীন সম্পর্কে আমেরিকার বিরোধিতা করেছে আজও সে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে চটাতে চায় না। "সকল দেশের সাথে মৈত্রীর" আড়ালে সে মার্কিন পররাজ্য আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে আনীত সোভিয়েত প্রস্তাব বিরোধিতা করে। এমন কি দ্বাদশ রাষ্ট্র প্রস্তাবকে আমেরিকার কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য শেষ মুহূর্তে আলোচনার আগেই কোরিয়ার যুদ্ধ বিরতির শর্ত গ্রহণ করে।

নেহরুর শান্তি নীতির এই দুর্বলতা তার শ্রেণির ও সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের চরিত্র থেকে উদ্ভুত। এই দুর্বলতাগুলি সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করতে হবে। কিন্তু এ কাজে এগুবার সময় মনে রাখা দরকার যে আমাদের দেশের সমস্ত মানুষের মন থেকে কংগ্রেস সম্পর্কে এবং বিশেষভাবে নেহরু সম্পর্কে মোহ সম্পূর্ণ কাটেনি। অনেকে কংগ্রেস খারাপ, কিন্তু নেহরু ভাল—এরকম মনোভাবও পোষণ করেন। আমাদের দেশের মধ্যে একটি বিরাট অংশ যারা নেহরুর নীতি সমর্থন করেন তাঁরা ঐ পথের দুর্বলতা সম্পর্কে মোটেই সচেতন নন। গান্ধীবাদের প্রভাব থেকে নেহরুর প্রতি অন্ধ এবং প্রগাঢ় বিশ্বাস থেকে এবং শান্তির জন্য

এশিয়ান জাতি হিসাবে তাদের গভীর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী মনোভাব থেকে তারা নেহরু নীতিকে সমর্থন করে থাকে। তাই কি পন্থা অবলম্বন করলে পর আমরা লোককে নেহরু ও কংগ্রেসের শান্তি প্রচেষ্টার দুর্বল দিকগুলি সম্পর্কে হুশিয়ার করব, তাদের সম্পর্কে মোহ কাটিয়ে তুলব—তা গভীরভাবে চিন্তা করে স্থির করা দরকার। শুধু negative criticism-ই (বিরুদ্ধ সমালোচনা) যথেষ্ট নয়। আজ positive approach ও program (সক্রিয় কর্মপন্থা) নিয়ে উপস্থিত হয়ে লোকের চেতনা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, নেহরুকে চাপ দিতে হবে, তার মুখোশ খুলে দিতে হবে—ভারতের অগণিত মানুষকে শান্তিরক্ষার প্রকৃত উপায়ের পিছনে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। আজ যখন তারা বুঝবে যে দুই নৌকায় পা দিয়ে যুদ্ধ রোখা যায় না তখনই নিরপেক্ষতার ভাওতা (সমাজতন্ত্রী নেতাদের দালালীর মুখোশ সঙ্গে সঙ্গে খুলে যাবে) কমনওয়েলথ ত্যাগ করার প্রয়োজনীয়তা, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে তুষ্ট করার ব্যাপারে ব্যর্থতা তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তার সামনে নেহরুর দোদুল্যমান, দুর্বল শান্তি নীতি পরাজিত হবেই। সার্থক শান্তি নীতির জন্য যে দাবি অপরিহার্য তারা সেগুলিকে সফল আন্দোলনে পরিণত করবে।

- ভারত কমনওয়েলথ ছাড়।
- সাম্রাজ্যবাদ এশিয়া ছাড়—পরদেশে হস্পক্ষেপ অবিলম্বে বন্ধ কর।
- মালয় ভিয়েৎনাম ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বন্ধ কর।
- কোরিয়ায় মার্কিন হস্তক্ষেপ বন্ধ কর। ২৭শে জুনের বে-আইনি প্রস্তাব প্রত্যাহার কর।
- ভারতের সশস্ত্র ফৌজের কোনও অংশ বিদেশের মাটিতে অবস্থান করবে না বা লড়াই করবে না।
- ভারতের মাটিতে কোনও বিদেশী শক্তিকে স্থায়ী বা অস্থায়ী কোনও রূপ ঘাটি গাড়তে দেওয়া হবে না, বা সৈন্য সংগ্রহ করতে দেওয়া হবে না।
- কোনও বিদেশী শক্তিকে সামরিক মাল বা ফৌজ প্রেরণের জন্য ভারতের বিমান, রেল বা বন্দর ব্যবহার করতে দেওয়া চলবে না।
- এটম বোমা ও পুনরস্ত্রসজ্জা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধ করতে হবে।

এই সকল আওয়াজের পিছনে দেশের অধিকাংশ লোকের সমর্থন এনে হাজির করতে পারলে তবেই আমরা সুদৃঢ় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ শান্তি আন্দোলন গড়ে তুলতে পারব—নেহরু নীতির সমস্ত ফাঁক বন্ধ করতে পারব।

নেহরু নীতির আরও একটা বিশেষ দুর্বলতার দিক সম্পর্কে পার্টিকে সচেতন হতে হবে। আমাদের আলোচনার প্রথম অংশে এশিয়ার জাতীয়তাবাদী মনোভাব লক্ষ্য রেখে আজ শান্তি আন্দোলন শক্তিশালী করে তোলার দিকে জোর দেওয়ার ফলে এ ধারণা যেন সৃষ্টি না হয় যে আমরা আন্তর্জাতিকাবাদ এবং সোভিয়েতের ভূমিকাকে ছোট করে দেখছি। তাহলে মারাত্মক ভুল হবে। চীনের সাথে মৈত্রী ও ঐক্য আমাদের দেশের শান্তিরক্ষার মূল শ্লোগান হলেও আজ আমাদের দেশের সমস্ত মানুষকে জার্মান পুনরস্ত্রীকরণের বিরুদ্ধে সচেতন করতে হবে কারণ সুদুর প্রাচ্য সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদীদের স্ববিরোধ পরিলক্ষিত হলেও আটলান্টিক চুক্তির অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলি জার্মানীকে পুনরস্ত্রসজ্জিত করার ব্যাপারে একজোট হয়েছে। ঐখান থেকেই যুদ্ধের গুরুতর বিপদের আশংকা রয়েছে এ বিষয় ভারতবাসীকে সচেতন করান আমাদের বিশেষ

কর্তব্য কারণ ঐখানে নেহরু নীরস বা দোদুল্যমান থাকবে। জার্মানীতে যুদ্ধ লাগলে নেহরু সরকারকে সেইভাবে জড়াবে না, যেভাবে সে জড়াবে চীনের সাথে লড়াই বাধে—এই logic দিয়ে নেহরু ভাবে। সেইজন্যই জার্মান পুনরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে নেহরু প্রতিবাদ তোলেনি। কিন্তু আমাদের শান্তি আন্দোলনে ভারতবাসীকে জার্মান পুনরস্ত্রীকরণের বিরুদ্ধে সচেতন করা কর্তব্য। তাই শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলার সময় একদিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের স্ববিরোধের এবং সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যে থেকে নেহরুর যুদ্ধ বিরোধিতার সমস্ত সুযোগ গ্রহণ করব, তেমনি দেশের মানুষের চেতনা অনুযায়ী, আন্দোলনের স্তর অনুযায়ী, দেশের ও দুনিয়ার অবস্থানুযায়ী শান্তির সুদৃঢ় ও সার্থক পথ প্রদর্শন করতে হবে। এইখানেই পার্টি তার নেতৃস্থানীয় ভূমিকা (leading role) কতখানি গ্রহণ করতে কৃতকার্য হবে তা পরীক্ষিত হয়ে যাবে।

নেহরুর শ্রেণি চরিত্র এবং শান্তি আন্দোলন পৃথিবীর সমস্ত শ্রেণি এমন কি সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের শক্তিগুলিকে পর্যন্ত কিভাবে প্রভাবান্বিত করছে, বিভক্ত করছে, এই কথা মনে রাখলে আমাদের পার্টি নেহরুর সাম্প্রতিক নীতিকে অভিনন্দন করতে গিয়ে সংস্কারবাদের ভয়ে ত্রস্ত হত না। আজ এ কথা কিন্তু সত্য যে আমাদের পার্টির মধ্যে বহু কমরেড নেহরুর এই শান্তি প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করতে পারছে না পাছে আবার আমরা সংস্কারবাদী হয়ে পড়ি। অনেকে আর পি-ডি ও আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা হেতু এই নীতিকে মৌখিক সমর্থন জানালেও তাদের প্রধান দুশ্চিন্তা হল কোথায় নেহরুকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলি। এ ভয়ের যে কারণ নেই—তা নয়। লেজুড়ে মনোবৃত্তির ঝোঁক এবং অভিজ্ঞতা কমঃ যোশীর নেতৃত্বের সময় আমাদের যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার হতে হলে নেহরুর নীতির সঠিক শ্রেণি বিশ্লেষণ এবং দুনিয়ার শ্রেণি শক্তির সমাবেশের গুরুত্ব উপলব্ধির উপরেই নির্ভর করে। তাই আমাদের সেল মনে করে নেহরুর সাম্প্রতিক নীতি শান্তি আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে তোলার যে সুযোগ উপস্থিত করেছে তা সচেতন ভাবে অভিনন্দিত করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই আমাদের কাজ। এই প্রসঙ্গে আমাদের সেল কমঃ আর-পি-ডির সাথে সম্পূর্ণ একমত যে সংস্কারবাদের ভয় থাকলেও আজকের দিনে পার্টির ঝোঁক (trend) হল বামপন্থী সঙ্কীর্ণতাবাদ। সেইটার দিক থেকে হুঁশিয়ারীই বেশি প্রয়োজন। বিশেষ করে শান্তি আন্দোলন সম্পর্কে এটা বিশেষ প্রযোজ্য।

আমাদের বহু কমরেড নেহরুর সাম্প্রতিক পররাষ্ট্র নীতি সন্দেহের চক্ষে দেখার একটি কারণ হ'ল তার অভ্যন্তরীণ নীতির চেহারা। যে নেহরু সরকার শ্রমিক, কৃষক, মেয়ে, পুরুষ নির্বিচারে গুলী করতে ক্রটী করেনি, যার রাজত্ব নির্বত্তনমূলক আইনের মতন স্বৈরাচারী আইন ছাড়া চলে না, যেখানে প্রত্যেক ধর্মঘট বা mass action কে দমন নীতির চাকা দিয়ে গুঁড়িয়ে ফেলার চেষ্টা চলে, তার সঙ্গে নেহরুর পররাষ্ট্র নীতির সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। নেহরু যে বড় বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধি, তার সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা—এ বিষয় যখন বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই তখন এ সরকারের সাথে শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে বিরোধিতা থাকবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নাই। সেই বিরোধিতা আর দমননীতি রোখার প্রধান হাতিয়ার হ'ল ঐক্য, শ্রমিক-কৃষক ঐক্য, সমস্ত জনগণের ঐক্য। যে পরিমাণে আমরা এই ঐক্য গড়ে তুলতে পারব সেই পরিমাণে আমরা এই দমননীতি সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করতে পারব, সেই পরিমাণে নেহরু সরকার জনগণের শক্তির সামনে দমননীতি চালাতে ইতস্তত করবে। আজ ঐ ঐক্য

গড়ার এক বিরাট সম্ভাবনা উপস্থিত হয়েছে শান্তি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। নেহরুর সাম্প্রতিক পররাষ্ট্র নীতি এই সম্ভাবনাকে আরও সুযোগ এনে দিয়েছে। তাকে প্রাথমিক ধাপ হিসাবে গ্রহণ করে আরও দৃঢ় ও আন্তরিক শান্তিপ্রচেষ্টার পথে এগুবার জন্য জনগণকে আরও ব্যাপকভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে, ও চাপ দিতে হবে নেহরু গভর্নমেন্টের উপর। সেই বিরাট গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের শক্তির উপর নেহরুর অভ্যন্তরীণ পলিসি পরিবর্তন করাও অনেকাংশে নির্ভর করছে। তাছাড়া আজ যদি সত্যি নেহরু চীন ও শান্তিকামী জনগণের শান্তি ক্যাম্পের সাথে হাত মেলাতে বাধ্য হয়, তার অভ্যন্তরীণ পলিসি, আন্তর্জাতিক alignments দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে বাধ্য। আজ খাদ্যের ব্যাপারেই একথা সুস্পষ্ট—এতদিন চীন ও রাশিয়া থেকে খাদ্য আমদানি ভারত সরকারের নিকট নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু আজ পণ্ডিত নেহরু প্রকাশ্যে ঘোষণা করছেন রেশন বরাদ্দের যে ছাঁটাই করা হয়েছে তা অবিলম্বে পূরণের জন্য ভারত সরকার রাশিয়া ও চীন এবং অন্যান্য দেশ থেকে খাদ্য আমদানির জন্য চেষ্টা করছেন। আজ আন্তর্জাতিক প্রগতিশীল মানুষের চাপে নেহরু নিজামকে তেলেঙ্গানার ফাঁসির হুকুম রদ করতে বলেছেন। তার মানে এই নয় যে নেহরু স্বতস্ফূর্তভাবে দমননীতি তুলে নেবে, তা মোটেই নয়। নিবর্তনমূলক আটক লাইনের স্বৈরাচারিতা, সুপ্রীম কোর্টের রায়, এখনও ধর পাকড়গুলি সবই চলছে। একে ঠেকাতে হবে ঐক্যের জোরে। সেই ঐক্য গড়াই আজকের দিনের প্রধান কাজ। ঐ ঐক্য গড়া, গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ার সাথে শান্তি আন্দোলনকে ব্যাপকতম ভিত্তিতে গড়ে তোলা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই শান্তি আন্দোলনে নেহরুর সাম্প্রতিক পররাষ্ট্র নীতি আমাদের সাহায্য করবে প্রথম ধাপ হিসাবে। সেই নীতির পরিপূর্ণতা নির্ভর করবে জনগণের উপর, কমিউনিস্ট পার্টির উপর। একদিকে নেহরুর সীমাবদ্ধ শান্তিপ্রচেষ্টাকে ব্যবহার করতে হবে প্রকৃত ও সফল শান্তি আন্দোলনকে গড়ে তোলার সহায়ক হিসাবে, আর অন্যদিকে তার চরিত্র সম্পর্কে কোন মোহ না রেখে তার প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। এই দৃষ্টি স্বচ্ছ রেখেই ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের প্রোগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। ভাই কমঃ পাম দত্ত বলেছেন ঃ "Consideration should be given to such questions as the full liberation of India from the imperialist camp, fiendship with the Chinese Peoples' Republic and the USSR, support of the liberation struggle of Asiatic and all colonial people, liberation of Indian economy from the domination of imperialist monopolies, democratic and civil rights and annulment of anti-democratic legislation and ordinances, land reform and demands corresponding to the needs of the peasants, taxation reform......labour rights of organisation, the right to strike and collective bargaining, wage increases..." etc. "এই সমস্ত প্রশ্নকে গুরুত্ব দিতে হবে, যেমন সাম্রাজ্যবাদী শিবির থেকে ভারতের পূর্ণ মুক্তি, চীনা জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী, এশিয়া ও সমস্ত ঔপনিবেশিক জনসাধারণের মুক্তি যুদ্ধের প্রতি সমর্থন, সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া থেকে ভারতের অর্থনৈতিক মুক্তি, গণতান্ত্রিক ও সামাজিক অধিকার ও অগণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থার, ও বিশেষ আইন নাকচ, ভূমি সংস্কার ও কৃষকের প্রয়োজনুযায়ী দাবি দাওয়া, ট্যাক্স সংস্কার, শ্রমিকদের সংগঠনের অধিকার, ধর্মঘটের অধিকার ও যৌথভাবে সুবিধা পাওয়ার ব্যবস্থা,

মজুরি বৃদ্ধি...ইত্যাদি।" (অনুবাদ) এই দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেই আমরা সংস্কারবাদ ও বামপন্থা, উভয় ঝোক থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে সঠিক পথে চলতে পারব।

আজ অনেক কমরেড মনে করেন যে নেহরুর সাম্প্রতিক নীতি অভিনন্দন করা মানে আমরা নেহরু সম্পর্কে মোহসৃষ্টি করছি। এটা মহা ভুল। নেহরুর স্বাভাবিক শ্রেণিগত আদর্শের দিক থেকে সে মার্কিন ও ইংলন্ডের অনেক সন্নিকটে। চীন সম্পর্কে বলতে গিয়ে সে প্রায়ই বলে থাকে যে চীনের অনেক কিছু আমরা পছন্দ নাও করতে পারি। কিন্তু আজ যুদ্ধ যত নিকটে আসছে, তখন নেহরুর মতন লোক যার গদি সাম্রাজ্যবাদেরই দান, যার সরকার সাম্রাজ্যবাদেরই প্রভাবাধীন, তারাও আতংকিত (nervous) হয়ে পড়চে। যুদ্ধাতংক আজ ঔপনিবেশিক বুর্জোয়া এবং সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ার স্ববিরোধিতাগুলিকে (contradictions) তীব্র করে তুলছে। আজ আমাদের কাজ হল এই স্ববিরোধিতাগুলিকে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা, নেহরুর শান্তি নীতিকে আরও দৃঢ় এবং আন্তরিক করে তোলা, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে কোণঠাসা করা।

আজ যদি এই কর্তব্য পালন আমরা না করতে পারি, নেহরু যতটুকু এগিয়েছে সেটুকুতেও সে টিকে থাকতে পারবে না—দেশের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে তাদের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হবে। ইতিমধ্যেই নেহরুর দোদুল্যমানতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে (মার্কিন খাদ্য প্রস্তাব গ্রহণ আমেরিকা আক্রমণকারী বলে যে সোভিয়েত প্রস্তাব উত্থাপন হয়, তার বিরুদ্ধতা করা ইত্যাদি) নেহরু নীতি UNO-তে হারার পর সে তার স্বগোত্রদের কাছ থেকে কোণঠাসা হয়েছে। আমেরিকা ও কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগুলি থেকে ত বটেই, তার এশিয়া গোষ্ঠীগুলিও শেষ মুহূর্তে মার্কিন ডলারও হুমকির চাপে হয় নিরপেক্ষ থেকেছে, নয় লেবাননের মতন মুখরক্ষার জন্য একটি প্রস্তাব তুলে মার্কিন পক্ষ সমর্থন করেছে। আজ সর্ববৃহৎ ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করার স্পর্দ্ধা ভারত করেছে। ভোটে সোভিয়েত ও নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিই একমাত্র ও বর্মা তার পক্ষ সমর্থন করেছে। আজ চারিদিকে রব উঠেছে ভারত "কমিউনিস্টদের দালাল"। এই অবস্থায় নেহরু সরকারের শ্রেণি চরিত্র মনে রেখে বোঝা দরকার যে তার দোদুল্যমানতা আসা স্বাভাবিক। ৩১শে জানুয়ারির UPAর রিপোর্ট হল ঃ "রাজনৈতিক কমিটির অধিবেশন মুলতুবী হইবার পর রাও ... যেন নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িয়াচেন...শ্রীযুক্ত রাও ও নেহরুজী এখন মার্কিন সংবাদপত্র ও বেতারীদের জোর সমালোচনার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাওকে তাহারা বলে "তোষণকারী", "পিকিং-এর দালাল" এবং "কমিউনিস্ট"......একজন রিপোর্টার জিজ্ঞাসা করেন, তিনি শান্তি প্রয়াস চালাইয়া যাইবেন কিনা। তিনি মাথা নাড়িয়া বলেন ঃ "এ বোঝা বড় ভারি, একজনের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। অপরে এখন ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করুক।" আজ যাতে নেহরু কোন মতে পিছিয়ে না যেতে পারে এবং যাতে তার পিছিয়ে যাওয়ার পথ আমরা বন্ধ করতে পারি তার জন্য দুই দিক দিয়ে আমাদের চেষ্টা করা উচিত—সে যতটুকু এগিয়েছে সেটার পিছনে বিপুল জনসমর্থন সৃষ্টি করে আর তার মধ্যে যে সব গলদ ও দুর্বলতা রয়েছে সেটা লোকের চোখের সামনে তুলে ধরে সেগুলি দূর করার জন্য প্রবল জনমত ও ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলে।

আজ নেহরুর সাম্প্রতিক শান্তি নীতির পিছনে সমস্ত লোকের সমর্থন লাভ করার আরও

একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় দিক আছে। আমাদের দেশের মধ্যে এমন একটি neo-fascist দল আস্তে আস্তে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে যার বিপজ্জনক প্রভাব সম্পর্কে আমাদের পার্টি এখনও যথেষ্ট সচেতন নয়। আজ হিন্দু মহাসভা, আর-এস-এস ও গোঁড়া প্রতিক্রিয়াশীল সন্ত্রাসবাদী যে সব দল সৃষ্টি হচ্ছে, তারা এখনও যথেষ্ট শক্তিশালী না হলেও লোকের মনে যে গভীর অসন্তোষ রয়েছে দেশ ভাগ ও অর্থনৈতিক সংকটের ফলে নিকৃষ্ট সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানর সুযোগ নিয়ে তারা নেহরুর যতটুকু প্রগতিশীল নীতি রয়েছে তাকে আক্রমণ শুরু করেছে। আজ কংগ্রেসের একাংশ যথা কৃপালনীর ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টও নেহরুর নীতির তীব্র সমালোচনা করছে এবং এইটাই বেশি বিপজ্জনক কারণ কংগ্রেস সম্পর্কে লোকের মোহ এখনও সম্পূর্ণ কাটেনি। তারা পার্লামেন্টে বলেন যে চীনই ভারতের প্রকৃত শত্রু (বিশেষভাবে তিব্বত প্রসঙ্গে) এবং ভারতের এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে ইঙ্গ-আমেরিকান সাহায্য থেকে সে বঞ্চিত হতে পারে। তা বাদে মাসানি- লোহিয়ায় মতন মার্কিন "সমাজতন্ত্রী" দালালরা নেহরুর এই নীতিকে "কাণ্ডজ্ঞানহীন" বলে সরাসরি গালাগাল করেছে এবং মাসানী প্রভৃতি খাদ্যের ব্যাপারে আমেরিকার কাছে লজ্জাস্করভাবে ভিক্ষা চাইতেও দ্বিধা বোধ করেনি। "আনন্দবাজার"ও নেহরুর নীতিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছে। "যুগান্তর" 'মার্কিন পররাষ্ট্র নীতি' নামক একটি 'কলম' খুলেছে। মার্কিন প্রচার বিভাগ অর্থ ব্যয় করতে মোটেই কার্পণ্য করছে না।

আজ মনে রাখতে হবে যে নেহরুর নীতি আপনা আপনি বা স্বতস্ফূর্তভাবে সফল শান্তি আন্দোলনে পরিণত হতে পারে না। যারা তা ভাবেন তারা মস্ত ভুল করেন। ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের এটা শুরু (starting point) হিসাবে বিরাট ঐক্যের সম্ভাবনা উপস্থিত করেছে। এর ভিতর দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের সংকট আরও তীব্র করা সম্ভব, যুদ্ধ-বাজদের আরও কোণঠাসা ও দুর্বল করা সম্ভব, একে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ভারতের শান্তি নীতির দুর্বলতা ও স্ববিরোধিতা দূর করা সম্ভব। আজ নেহরুর উদ্দেশ্য ও শান্তি নীতিকেই সামনে তুলে ধরে (পিছনে ঠেলে ফেলে নয়) শান্তি আন্দোলনকে এই শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। পার্টিকে তার নেতৃস্থানীয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। বলতে হবে যে চীনের প্রতি বন্ধুত্ব ও মৈত্রী যদি সত্যি বজায় রাখতে হয় ও চীনকে bomb করা বা অবরোধ করা ভারত বরদাস্ত করবে না। কোরিয়াবাসীর উপর নৃশংস আক্রমণ সমর্থন করার প্রস্তাব ভারতকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সমস্ত বিদেশী সৈন্য এশিয়ার মাটি থেকে এখুনি অপসারণ করতে হবে। ভারতীয় এ্যাম্বুলেন্স এশিয়ার ১০ লক্ষ নারী ও শিশু হত্যাকারী ম্যাকবাহিনীর আজ্ঞাবাহক হতে দেওয়া চলবে না— তাকে ফেরৎ আনতে হবে। "এশিয়া এশিয়াবাসীর"। এই ধরনের positive আন্দোলন দেশের মধ্যে যত জোরদার হবে, ততই আমরা নেহরুর দোদুল্যমান নীতির পরিবর্তন আনতে পারব, ততই consistent peace policy-র সুদৃঢ় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ শান্তি নীতির দিকে এগিয়ে যেতে পারব।

আজ যদি এমন অবস্থা উপস্থিত হয় যেখানে যুদ্ধ লেগে যাচ্ছে—এশিয়া রাষ্ট্ররা মার্কিন ডলারের চাপ উপেক্ষা করতে পারছে না অথচ নিজেদের অস্তিত্বের জন্য যুদ্ধতে নামতেও ইতস্তত করছে—এই দোটানার মধ্যে ভারত এশিয়ার একটি প্রধান অকমিউনিস্ট রাষ্ট্র যদি নিরপেক্ষতা ঘোষণা করে, অন্যান্য এশিয়ান রাষ্ট্রদেরও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের direct

participation-এর বাইরে রাখতে সক্ষম হয়, তাহলে ঐ ধরনের ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে নিরপেক্ষতাও আমাদের সমর্থন করতে হতে পারে। অবশ্য আজই সেই অবস্থার উদ্ভব হয় নাই। এখন নিরপেক্ষতার বিরোধিতা করতে হবে positively—অর্থাৎ ভারতের কোন সৈন্য পরদেশে ব্যবহৃত হবে না, তার বন্দর, তার বিমান ঘাঁটি অন্য দেশের সমর শক্তি প্রেরণের জন্য ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না, পরদেশের সৈন্য বা সামরিক ঘাঁটি ভারতের এক কণা মাটিতেও অবস্থান করতে দেওয়া হবে না ইত্যাদি। এই positive আন্দোলন যত দানা বাঁধতে থাকবে ততই "নিরপেক্ষতা" প্রতিরোধের বিপ্লবী রূপ আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে। উপরে বর্ণিত অবস্থায় যুদ্ধকালীন "নিরপেক্ষতা" বাঁচানর জন্যও বিরাট বিরাট রক্তক্ষয়ী সংগ্রামেরও প্রয়োজন হতে পারে। মোট কথা আমাদের প্রধান tactical line সব সময়েই হবে—সাম্রাজ্যবাদী শিবির বিভক্ত করা, দুর্বল করা, শান্তির শিবির শক্তিশালী করা। ওয়ারস কংগ্রেসের "Manifesto to the Peoples of the World" এর আহ্বান মনে রেখে এগুতে হবে :

"Peace does not wait on us, it must be won." "শান্তি আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে না, একে জয় করে নিতে হবে।" তাঁরা বলেছেন যে দ্বিতীয় শান্তি কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি আমাদের পার্লামেন্ট, আমাদের সরকারের কাছে পেশ করতে হবে। তারা একথাও বলেছেন, "Let the Government act in the same way (i.e. not withstanding differences of opinion can agree in order to ward off the scourge of war) and peace will be saved" "সরকারগুলি একইভাবে কাজ করুক (অর্থাৎ মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধের ক্লেদকে ধুয়ে ফেলতে সম্মত হতে পারে) শান্তি তাহলে রক্ষা পাবে।" তাই একথা থেকে স্পষ্ট যে আজ সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে থেকেও, বড় বুর্জোয়াদের গভর্নমেন্ট হয়েও তারা শান্তি রক্ষার কাজে তাদের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। এই কথা মনে রেখেই আজ নেহরুর ভূমিকা বিচার করতে হবে। শান্তি রক্ষার সংগ্রামে তাকে ব্যবহৃত করতে হবে।

আরও কয়েকটি ছোটখাট বিষয় সেলে আলোচনা হয়। সেগুলিতে মতের তফাৎ থাকে। লতা বলে যে নেহরু চীনের ব্যাপারে এতটা অগ্রসর হয়েছে তার অন্যতম কারণ বৃটেনের 'ষ্ট্যান্ড'-এর সুযোগ নিয়ে। অন্যান্য সভ্যরা এ 'ফরমুলেশন'এ মত দেন না। তাদের মতে বৃটেনের 'ষ্ট্যান্ড' নেহরুর মনে বল সঞ্চার করেছে হয়ত, কিন্তু তার নিজের স্বার্থ ও এশিয়াবাসীর মনোভাব—এই মূল কারণগুলোই তার নীতি নির্দ্ধারণ করেছে।

জ্যোতি বসুর বিবৃতি যে বড় শিল্পপতিরা নিজেদের স্বার্থে যুদ্ধ চায় না—এই 'ফরমুলেশন'-এর প্রতিবাদ কমরেড যমুনা করেন। তিনি বলেন যে 'ফ্যাক্টস'-এর 'বেসিস'-এ বিবৃতি দেওয়া চলে কিন্তু যেখানে 'ডিবেটেবল পয়েন্ট' সেগুলো আজকের দিনে 'পাবলিক ষ্টেটমেন্ট'-এ দেওয়া উচিত নয়। কমঃ আত্রেয়ী বলেন যে শিল্পপতিরা যুদ্ধ চায় তাদের মুনাফার জন্য কিন্তু নিজেদের দেশ যুদ্ধের বাইরে থাকুক এই ইচ্ছা প্রণোদিত হয়ে হয়ত নিরপেক্ষতা পছন্দ করে। শিল্পপতিদের নিরপেক্ষতা আর নেহরুর নিরপেক্ষতার মধ্যে একটা তফাৎ আছে। একজন মূলত যুদ্ধ চায় আর একজন চায় না। তাই শিল্পপতিরা যে মূলত যুদ্ধবাজ এই কথা স্পষ্ট তুলে ধরা দরকার (সম্প্রতি টাটা-বিড়লারা ভারতে সমরোপকরণ তৈরির কারখানা স্থাপন

করার জন্য সাম্রাজ্যবাদের কাছে তদ্বির করেছে)। সেইভাবে 'ফরমুলেশন' করা উচিত। কমঃ অসীমা ও বিভাদি এই মত সমর্থন করেন।

কমঃ যমুনা বলেন যে নেহরু অতীতে 'এন্টিফ্যাসিষ্ট' ছিলেন তাই সেই অতীত তাঁকে প্রভাম্বিত করছে। তাঁর সাম্প্রতিক নীতির এটা একটা কারণ। বিভাদিও এই মত সমর্থন করেন। অন্য সভ্যরা মনে করেন যে ভারতের জনগণের মনে যদিও 'এন্টি ফ্যাসিস্ট সেন্টিমেন্ট' নেহরুই জাগিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সেই 'এন্টি ফ্যাসিজমের' প্রতি সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে যথেষ্ট (স্পেনকে ইউ-এন-ও'তে গ্রহণের ব্যাপারে, গ্রীসের ব্যাপাবে, এমন কি কোরিয়ার বোম্বিং-এর ব্যাপারে—তার অভ্যন্তরীণ নীতি যদি ছেড়েও দিই)। তাই তারা মনে করে যে নেহরুর 'এন্টি ফ্যাসিজম' অনেকখানি তার শ্রেণি চরিত্র ও স্বার্থ দ্বারা প্রণোদিত। তবে ভারতের জনগণের সুস্থ 'এন্টি ফ্যাসিষ্ট' চেতনা নিঃসন্দেহে আজ ভাবতের নীতিকে প্রভাবাম্বিত করছে। সেই চেতনা দানে নেহরুর অবদান অস্বীকার করা যায় না।

প্রাদেশিক মহিলা সেল

যুদ্ধ ও শান্তি

পর পর কয়েকটি প্রবন্ধ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার ফলে আমাদের মনে নানা রকমেব প্রশ্ন উঠছে। প্রশ্নটি কি রকমের? সে হচ্ছে এই যে আমাদের নূতন করে ভাবতে হবে যে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি কি চোখে দেখব। যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছে তার শুরুটা একরকমের, একই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। এক বছর আগে আন্তর্জাতিক অবস্থা যা ছিল এখন আজ আর সেই আন্তর্জাতিক অবস্থা নেই। এক বছর আগে যুদ্ধের পরিস্থিতি যা ছিল আজ আর সে পরিস্থিতি বিদ্যমান নেই। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির ভিত্তিতেই সমস্ত প্রবন্ধগুলি বিচার করতে হবে। তা যদি আমরা না করি, তা হলে দুনিয়ার প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। মনে আমাদের প্রশ্ন জাগছে যে এক বছর আগে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যা বলেছেন আজকে তারাই আবার নতুন অর্থে কথা বলছেন। এর মানেটা কী? এক বছরের মধ্যে কি এমন পরিবর্তন হল? সেইটাই আমাদের ভাল করে বুঝতে হবে। পরিবর্তনটা যদি আমরা ঠিক ধরতে পারি তাহলে আমরা হয়ত প্রবন্ধগুলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝতে পারব। এখন দেখা যাক মোটামুটিভাবে এক বছরের মধ্যে কি পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথমেই চোখে পড়ে যে এক বছর আগে যে তৃতীয় যুদ্ধের সম্ভাবনা ছিল সে সম্ভাবনা আর শুধু সম্ভাবনার পর্যায়েই নেই আজ প্রায় দরজার গোড়ায় এসে উপস্থিত হয়েছে। তা থেকে এখানে আমরা এই মানে করব না যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য। কোরিয়াতে লড়াই চলছে, হয়ত ফরমোজাতেও প্রত্যক্ষ যুদ্ধ বেধে উঠতে পারে। কেননা, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ তাই চায়। তার চাওয়া আজ জয়যুক্ত হবে কিনা তা নির্ভর করে দুনিয়ার শান্তিকামী মানুষের শক্তির ওপর। কমরেড থোরে বলেছেন "Peace hangs on a thread" (শান্তি সূতার ওপর ঝুলছে) পরিবর্তনটা এইখানেই। এর ভিত্তিতে সমস্ত জিনিষকে বিচার করতে হবে। প্রশ্ন উঠতে পারে, এক বছর আগে কি যুদ্ধের

সম্ভাবনা ছিল না? হাঁ, তা ছিল কিন্তু সে সম্ভাবনা এত নিকটবর্তী হয়নি। যুদ্ধের সম্ভাবনা যখন দূরে থাকে তখন যে অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং যে শ্রেণি বিন্যাস থাকে আর যুদ্ধের অবস্থা যখন নিকটবর্তী হয় তখন সে অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং সে শ্রেণি বিন্যাসও থাকে না, তারও পরিবর্তন হয়। আবার যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন আবার আর এক অবস্থার সৃষ্টি হয়। সুতরাং এই পরিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে আমাদেরও ভিন্ন ভিন্ন রণনীতি ও রণকৌশল নির্দ্ধারণ করতে হয়। অনেকে হয়ত এই পরিবর্তনকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনতে চান না। তাঁদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন শেষ হয় তখন আমরা অনেকেই জানতাম যে আবার হয়ত তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধতে পারে, কেননা সাম্রাজ্যবাদ বেঁচে রইল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেই কমরেড হ্যারি পলিট ও আর-পি-ডি প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, আবার কি বিশ্বযুদ্ধ হবে? সাথে সাথে তাঁরা এই উত্তর দিয়েছিলেন যে "তা হবে, কি হবে না তা নির্ভর করবে শান্তিকামী মানুষের শক্তির ওপর।" সুতরাং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেই প্রশ্ন উঠেছে তৃতীয় মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে। অনেকে হয়ত বলতে পারেন ওরকম চুলচেরা বিচারের দরকার কি? পুঁজিবাদ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ যুদ্ধ হবে। সুতরাং পুঁজিবাদীদের সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি ধারণা এই রকম। যাই হোক এবার আমাদের বিচার করা দরকার যে যুদ্ধের সম্ভাবনা যখন দূরে ছিল তখনকার অবস্থার সঙ্গে এখনকার অবস্থার পার্থক্য টানবো কেন? তখনই কি আমরা যুদ্ধ বন্ধ করার দিক লক্ষ্য রেখে আমাদের রণনীতি ও রণকৌশল নির্দ্ধারণ করিনি? তখনও কি ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আমাদের প্রধান শত্রু ছিল না? এবং এখনও তাই আছে। তবে পরিবর্তনের কথাটা আসে কেন? হাঁ, কমরেড, তাই ছিল। আরও বলা চলে তখনও দুই শিবিরের কথা ছিল। এখনও সেই দুই শিবিরের কথাই আছে। তবে পরিবর্তনটা কোথায়? পরিবর্তনটা হচ্ছে শক্তি বিন্যাসের। যুদ্ধ যখন দূরের কথা ছিল তখন যুদ্ধ সম্বন্ধে ছিল এক মনোভাব, ও যুদ্ধ যখন প্রায় বাধতে চলেছে (বিশেষ করে তা যদি আবার নিজের ঘাড়ের উপর এসে পড়ে) তখন আর এক মনোভাব। এ পরিবর্তিত মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদের নীতি নির্দ্ধারণ করতে হবে। এখন দেখা যাক্ যুদ্ধ নিকটবর্তী হওয়ায় ভারতের ক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন হয়েছে। প্রথমতঃ ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নীতি সাধারণ মানুষের কাছে অনেকখানি নগ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। তারাই যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধাতে চায় একথা আজ অনেকের কাছে পরিষ্কার, বিশেষ করে কোরিয়ার ব্যাপারে তা ভাল করে প্রমাণিত হয়েছে। যার ফলে সাধারণ মানুষ আজ ম্যাকআর্থারের পরাজয়ের ফলে খুশী। দ্বিতীয়ত যুদ্ধের সম্ভাবনা নিকটবর্তী হয়ে ওঠার ফলে বড় বুর্জোয়ার যে অংশ (ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত অল্প), এতদিন পর্যন্ত মোটামুটি ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে হাত মিলিয়ে, তাদের নীতি সমর্থন করে যাচ্ছিলো, সেই অংশ আজ ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ নীতির বিরোধিতা করতে শুরু হয়েছে; এবং যে বিরোধিতা করাটাই স্বাভাবিক, কেননা তারা জানে যে এ যুদ্ধে তাদের লাভের কোনও আশা নেই বরং লোকসানই হবে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি বাধে তাহলে ভারতবর্ষ যে অন্যতম সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অথচ তার দেশের রক্ষা ব্যবস্থার অবস্থাটা কি তা তারা ভালভাবেই জানে। কয়েকটি জোড়াতালি দেওয়া উড়োজাহাজ, আর তালপাতার সেপাই নিয়ে যে চীনের লালফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়

না, সেটা তারা ভালভাবেই বোঝে। কোরিয়ার ব্যাপারের পরও রাস্তায় পা বাড়ানো মোটেই সুবিধাজনক নয় বলেই তারা মনে করে। তারা এত বেশি ভাল করেই জানে যে যুদ্ধ বাধলে আমেরিকার কাছে থেকে বিশেষ কিছুই সাহায্য পাওয়া যাবে না ইন্দোচীনের ক্ষেত্রে সে প্রমাণ ভাল করেই হয়ে গেছে। এখনই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে পরে ভারতবর্ষকে তারা কতখানি সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে তা বুঝতে আর বেশি মাথা ঘামানোর প্রয়োজন হবে না। এর মধ্যেই আমেরিকার অর্দ্ধেক স্থল সৈন্যকে কোরিয়াতে নিযুক্ত করতে হয়েছে। এইসব ব্যাপার থেকেই তারা যুদ্ধের বিরোধিতা করছে। মনে সংশয় আসাটাও অস্বাভাবিক নয় যে এশিয়ার ব্যাপারে আমেরিকা জিতবেই তারই বা নিশ্চয়তা কি? তাই তারা মনে করে যে তৃতীয় মহাযুদ্ধ তাদের শ্রেণি স্বার্থের প্রতিকূল। কতদিন তারা এ রকম মনে করবে তা কেউ বলতে পারে না। প্রশ্ন উঠতে পারে যে বড় বুর্জোয়াদের এরকম ভাগ করা উচিত, না সম্ভব? এ সম্বন্ধে কমরেড তোগালিয়াত্তি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে যা বলেছেন তা থেকে কিছু উদ্ধৃত করলাম—"British Imperialists and in particular the most reactionary section of the British Bourgeoisie (here also the question must be put in a differential fashion) considers it to be its "historical task" to deal a mortal blow to the country of socialism or at best to weaken the Soviet Union for a long period of time by a series of wars in Europe and in the Far East." (P. 173 Peace Front to People's war.)

The dominant circles of the British Bourgeoisie support the German armaments in order to weaken hegemony of France on the European continent, to turn the spearhead of German armaments from the west to the east and to direct the German aggressiveness against the Soviet Union." (do, P. 231)

"ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং বিশেষ করে ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল অংশ (এখানেও প্রশ্নটাকে অন্যভাবে তুলতে হবে) সমাজতন্ত্রের দেশের উপরে প্রচণ্ড এক আঘাত হানাকে অথবা ন্যূনপক্ষে ইউরোপ ও সুদূর প্রাচ্যে ধারাবাহিকভাবে যুদ্ধ চালিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত দুর্বল করে রাখাকে তাদের 'ঐতিহাসিক কর্তব্য' বলে মনে করে।" (পৃঃ ১৭৩, পিস্ ফ্রন্ট টু পিপলস্ ওয়ার)

"ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের প্রতিপত্তিশালী গোষ্ঠী ইউরোপ ভূখণ্ডে ফরাসী প্রভুত্বকে খর্ব করার জন্যে জার্মান অস্ত্রসজ্জাকে সমর্থন করছে, যাতে করে জার্মান অস্ত্রসজ্জার বর্শফলক পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ধাবিত হয় এবং জার্মান আক্রমণাত্মক নীতি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়।" (ঐ—পৃঃ ২৩১)

আশা করি উপরোক্ত উদ্ধৃতি আমাদের ধারণা পরিষ্কার করার কাজে অনেকখানি সাহায্য করবে। তৃতীয়ত গত ১৯৪৭ সালে মাউন্টব্যাটেন চুক্তির পরে চীনের রিপাবলিকের জন্ম ও ভারতে তার প্রভাব।

এই পরিবর্তনের ভিত্তিতেই দেখতে হবে যে আমরা কি ভাবে আমাদের প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সমস্ত শক্তি লাগাতে পারি।

বড় বুর্জোয়াদের একাংশ এতদিন মোটামুটি ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদারী করছিল আজ তারা তা করতে চাইছে না এ সিদ্ধান্তে আমরা কি করে এলাম? ইউ-এন-ওতে ভারত সরকার বিভিন্ন ইসুতে যে নীতি অনুসরণ করছে তা থেকেই বেশ ভাল বোঝা যায়। এমন নীতিই ভারত সরকার সেখানে গ্রহণ করছে যা ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের প্রতিকূল এবং যে নীতি গ্রহণ করার ফলে দুনিয়ার শান্তির শিবিরকে অনেক পরিমাণে শক্তিশালী করেছে। কেন ভারত সরকার এরকম নীতি গ্রহণ করল? ইঙ্গ-মার্কিন চাপে? এইসব নীতি গ্রহণ করার ফলে গণশক্তির চাপও যে আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটাই সব নয়। কেননা, পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে বর্তমানে গণশক্তির চাপে এতখানি এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট যখন কোরিয়ায় এটম বোমা ফেলার কথা ঘোষণা করলেন তখন পণ্ডিত নেহরু জানালেন যে এটম বোমা নিক্ষেপ করার প্রস্তাব ভারতবর্ষ কখনই এবং কোন অবস্থাতেই সমর্থন করবে না। আর ওদিকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তার বিরোধিতা করতে পারলেন না। অথচ গণ-আন্দোলনের অনুপাত যদি বোঝা যায় তাহলে আমরা দেখবো বৃটেনে তার স্তর ভারতের চেয়ে নিশ্চয় নীচে ছিল না। ১০০ জনের বেশি পার্লামেন্টের সদস্য এ ব্যাপারে বিরোধিতা করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে জনসাধারণের চাপটা সব নয়। তবে, আর কি এই নীতি পরিবর্তনের জন্য দায়ি? সেটা হচ্ছে বড় বুর্জোয়াদের এক অংশের এই যুদ্ধের বিরোধিতা। তার সাথে নিশ্চয়ই মধ্য বুর্জোয়াদের চাপ আছে। কেহ হয়ত একথা বলতে পারেন যে, ধনীক শ্রেণির এক অংশের বিরোধিতার ফল এটা নাও হতে পারে। হয়ত সমস্ত বড় বুর্জোয়াদের দোদুল্যমানতার ফলেই এই নীতি ভারত সরকার গ্রহণ করেছে। কিন্তু বাস্তবে ব্যাপার তা নয়। কেননা আমরা দেখেছি যে বড় বুর্জোয়াদের এক শক্তিশালী অংশের মুখপত্র "ইষ্টার্ন ইকনমিষ্ট" ভারত সরকারের নীতির মোটামুটিভাবে বিরোধিতা করে যাচ্ছে। সুতরাং একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে বড় বুর্জোয়াদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। এক শক্তিশালী এবং অতি প্রতিক্রিয়াশীল যারা ইঙ্গ-মার্কিন অর্থনীতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তারা যুদ্ধের পক্ষে এবং অন্য অংশ বিপক্ষে। এই দুই অংশের দ্বন্দ্বের ফলে ভারত সরকারের পররাষ্ট্র নীতি দ্বিধাগ্রস্ত। একথা আজ কেহ অস্বীকার করতে পারবে না যে এই নীতিও ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভাল চোখে দেখছে না। অথচ ভাল চোখে না দেখলে উপায় নেই, কেননা, তাদের খুশিমত দুনিয়াটা চলবে না। যাই হোক এটা দেখা যাচ্ছে যে যুদ্ধের সম্ভাবনা আজ নিকটবর্তী হওয়ার ফলে বড় বুর্জোয়াদের এক অংশ যুদ্ধের বিরোধিতা করছে এবং তাকে আজ সাময়িকভাবে যুদ্ধ বিরোধী শিবিরে পাওয়ার সম্ভাবনা এসেছে, যে সম্ভাবনা কিছুদিন আগেও ছিল না। তবে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে তাকে সাময়িকভাবে যুদ্ধ বিরোধী শিবিরে পাওয়া গেলেও এই শিবিরের অন্যান্য অংশীদারের (যেমন সোভিয়েত, চীন ইত্যাদি) কায়দায় যে যুদ্ধকে রোধ করার চেষ্টা করবে না। আমরা যেন ভুলে না যাই যে সে যুদ্ধ বিরোধী শিবিরে, সাম্যবাদী শিবিরে নয়। এই শিবিরে থেকে সে চেষ্টা করবে যাতে করে গণতান্ত্রিক শক্তি দুর্বল হয়। আজ দুই শিবির, যুদ্ধবাদীদের শিবির ও যুদ্ধ-বিরোধীদের শিবির। যুদ্ধ-বিরোধী বলে তাদেরই ধরা হবে যারা যুদ্ধ করতে চায় না এবং এইটিই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শিবির এবং এর মূল আওয়াজ শান্তি, সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা নয়। এর থেকে বোঝা যায় যে যুদ্ধের বিপদ নিকটবর্তী হওয়ার ফলে শান্তির শিবিরকে আরও ব্যাপক করার সম্ভাবনা এসেছে।

বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এই সুযোগকে কার্যকরী করার চেষ্টা করবে। কিছুদিন আগে আন্তর্জাতিক নেতারা বলেছিলেন যে ঔপনিবেশিক দেশে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামই শান্তির লড়াইকে শক্তিশালী করবে আর আজ আমরা কেউ কেউ বলছি যে শান্তির সংগ্রামই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে শক্তিশালী করবে। তবে কি আগের কথা ভুল? নিশ্চয় নয়। কিছুদিন আগে শান্তি সংগ্রামে বড় বুর্জোয়াদের এক অংশকে পাওয়ার প্রশ্ন ছিল না! তখন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের যারা যোদ্ধা তারাই মোটামুটি শান্তি সংগ্রামের যোদ্ধা ছিল, তাই তখন ঐ আওয়াজ। আজ অবস্থা বদলাবার দিকে, তাই আজ অন্য আওয়াজ। শান্তির সংগ্রাম কি জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম? পরোক্ষে তাই। আমরা যদি বিশ্বাস করি যে শান্তি চাই এবং শান্তির মধ্যে দিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে দুর্বল করা যাবে, তাহলে নিশ্চয় আমরা একথা স্বীকার করবো যে সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে তাদের শক্তি হীনতার সাথে সাথে পদানত জাতীয় পরাধীনতার শৃঙ্খলও আলগা হতে থাকবে। আর-পি-ডি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের এই নতুন পথেরই ইঙ্গিত করেছেন। বুর্জোয়াদের এক অংশের নূতন পথ হচ্ছে যুদ্ধ চাইনা বলে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা আর আমাদের পথ হচ্ছে তাদের যে অংশ যুদ্ধ চায় না তাদের নিয়ে ব্যাপক শান্তির সংগ্রাম গড়ে তোলা। অনেকে হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে আজকের দিনের ভারতবর্ষে এক অংশের বুর্জোয়াদের পক্ষেও নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করা কি সম্ভব? যার ফলে পরোক্ষ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম জোরদার হবে? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যদি বৃটেনের প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়ারা নিজেদের স্বার্থের জন্য ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে ফ্যাসী-বিরোধী শিবিরে আসতে পারে তাহলে নিজেদের শ্রেণি স্বার্থের জন্য কেন ভারতের ধনিক শ্রেণির এক অংশ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে পারবে না? আমরা কি একথা বলতে পারি যে প্রতিক্রিয়াশীল ধনিক শ্রেণি নিজেদের স্বার্থের জন্য সাময়িকভাবেও কোন দিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শিবিরে আসতে পারে না? আমার মনে হয় তা বলা যায় না। বিশেষ অবস্থায় এবং বিশেষ কারণে তাও সম্ভব। কেননা অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের মনোভাবও বদলায় যার ফলে সাময়িকভাবে তাদের ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টে নিয়ে আসা সম্ভব। এ বিষয়ে কমরেড মাও-এর উক্তি হল : "Revolutionary character on the one hand, compromising character on the other. Such is the dual character of the Chinese Bourgeoisie. This dual character was also seen in the European and American Bourgeoisie according to history. To write with the workers and peasants to oppose the enemy when the enemy is endangering them and to write with the enemy to oppose the worker and the peasants, when the latter are awakening is a general rule for the bourgeoisie of various Countries. Only the Chinese bourgeoises shows this characteristics vividly... (China's new Democracy P. 11)"

"একদিকে বিপ্লবী চরিত্র, অন্যদিকে আপসকামী চরিত্র—চীনা বুর্জোয়ার এই হল দ্বৈত চরিত্র। ইতিহাস মতে এই দ্বৈত চরিত্র ইউরোপীয় ও আমেরিকান বুর্জোয়াদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়েছে। শত্রু যখন তাদের বিপদাপন্ন করে তুলছে তখন শত্রুকে প্রতিরোধ করার জন্য শ্রমিক ও কৃষকের সঙ্গে সারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান এবং শ্রমিক ও কৃষক যখন জেগে উঠছে

তখন শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের বাধা দান—এ হচ্ছে বিভিন্ন দেশের বুর্জোয়াদের একটি সাধারণ ধারা। চীনা বুর্জোয়ারাই কেবল এই বৈশিষ্ট্য সম্যকভাবে দেখিয়েছে। (চীনের নয়া গণতন্ত্র— পৃঃ ১১)

এমন কি বুর্জোয়া সরকারকে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টে আনা যায় তা তোগলিয়াত্তির নীচের বক্তব্য থেকে বোঝা যাবে—We can draw into the Ranks of this front even though bourgeois Governments, which at present moment are interested in the preservation of peace. (P. 227 Peace Front to People's War PPH) "The entry into the League of Nation are followed by further still bolder step in the unfolding of the peace policy of the Soviet Union in proportion at the threat of war increased and the contradictions sharpened between the countries that are instigators of war and the countries that at the moemt are interested in the preservation of peace. This contradiction can be made use of to a greater extent than all previous ones because it determined the temporary coincidence of the permanent aims of the peace policy of the Soviet Union and the temporary aims of the policy of certain capitalist counteies, (P. 190-191 Peace Front to Peoples' War) সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে বিশেষ অবস্থায় এবং পর্যায়ে বুর্জোয়াশ্রেণির এক অংশের পক্ষে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জনসাধারণের সাথে এক শিবিরে থাকা অস্বাভাবিক নয়। তা যদি না সম্ভব হত তা হলে চীন জাপানী আক্রমণের সময় "ইউনাইটেড ফ্রন্ট", রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি এবং ফ্যাসি বিরোধী যুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির অংশ গ্রহণ সম্ভব হত না। এটা হয়তো আমাদের মনে হতে পারে আজ ভারত সরকার যেমন দুদিক বজায় রেখে যাবার চেষ্টা করছে, ভবিষ্যতেও এই রকম করে যাবে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে দুদিক বজায় রাখার চেষ্টা করলেই করা যায় না। কেননা ঘটনার গতি ভারত সরকারের ইচ্ছামত চলবে না। যখন একটা শিবির বেছে নেবার প্রশ্ন আসবে, সে তখন সেই শিবির বেছে নেবে, যে তখনকার মত তার স্বার্থ রক্ষা করবে। নীচে কমরেড মাওয়ের আর একটা উদ্ধৃতি দিলাম—

In the international environment of the fourth and fifth decade of the 20th century, the heroes (means bourgeoisie) of the Colonies and semi-colonies have to stand either on the imperialist front and play a role in the world counter-revolution or in the anti-imperialist front and play a role in the world revolution. There is no third Road—(China's New Demo, P. 17) "বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ ও পঞ্চম দশকের আন্তর্জাতিক পরিবেশে উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশের "বীরদের" হয় সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে দাঁড়িয়ে বিশ্ব প্রতিবিপ্লবে অংশ গ্রহণ করতে হবে অথবা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শিবিরে দাঁড়িয়ে বিশ্ববিপ্লবে ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। তৃতীয় পথ নেই।" (চীনের নয়া গণতন্ত্র পৃঃ ১৭)

এর পর প্রশ্ন আসে যে যুদ্ধের ব্যাপারে ভারত যদি নিরপেক্ষ নীতি নেয়, তাহলে কি সে শান্তির শিবিরে আছে বলা যাবে? তাই যদি যায় তাহলে স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ

সরকারের নিরপেক্ষতা কোন পক্ষকে সাহায্য করেছিল? উত্তর হচ্ছে যে, এক এক সময়ে নিরপেক্ষতা এক এক শক্তিকে সাহায্য করে। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময়, নিরপেক্ষতা ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করেছিল, কেননা তখন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জিতেছিল, আর আজ ভারত সরকারের নিরপেক্ষতা শান্তির শক্তিকে জোরদার করবে, কেননা শান্তির শক্তি আজ জিতছে। নিরপেক্ষতার মানে সব সময় এক নয়। মোট কথা হচ্ছে যে, যুদ্ধ নিকটবর্তী হওয়ার জন্য অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ব্যাপক ভিত্তিতে শান্তির শিবির গড়ে তোলার বিরাট সম্ভবনা উপস্থিত হয়েছে। যে শান্তির লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে আজ জাতীয় শৃঙ্খল ছিন্ন হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। এই সুযোগ হয়তো অতি অল্পকাল স্থায়ী হতে পারে, কিন্তু তবু তাকে এতটুকু ছোট করে দেখা চলবে না। এ সম্বন্ধে লেনিনের সতর্ক বাণী আমাদের মনে রাখতে হবে।

"It is possible to conquer the most powerful enemy only by exerting our efforts to the utmost and by more necessarily, thoroughly, carefully, attentively and skilfully taking advantage of every fissure however small, in the ranks of our enemies, of antagonism of interests among various groups or types of Bourgeoisie in various countries, by taking advantage of every possibility however small, of gaining an ally among the masses even though this ally be temporary, vacilating, unstable, ulreliable and conditional. Those who do not understand this do not understand even a grain of Marxism and Scientific modern Socialism in general (Left-wing Communism) (2) "As you see Lenin" directly says that it is obligatory to utilize all the contradictions of interests not only between the Bourgeoisie of different countries. Lenin speaks here precisely of the attitude of the proletariat to the problem of international policy and war. The directive, he gives is obligatory for us above all in determining the foreign policy of the state and of the dictatorship of the proletariat. But it is at the same time obligatory for the proletariat, and for the Communist Party of the capitalist countries, in so far as these parties can and must work and a positive position in deciding problems of international policy, intervening actively in the course of events-and aiding tendencies that retard the unleashing of war and hindering every thing that constitutues a direct immediate menace to peace" (Peace Front to Peoples' War P.P. 175-176) এই হচ্ছে আমাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নূতন পর্যায়। এই দিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের রণনীতি ও রণকৌশল ঠিক করতে হবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের লক্ষ্য হবে শান্তি আন্দোলনে জনসাধারণের মধ্যে দিয়ে ভারত সরকারকে শান্তির পক্ষে যোগ দিতে বাধ্য করা। শাসক শ্রেণির মধ্যে যারা শান্তির নীতি বিরোধী, তাদের পৃথকভাবে আক্রমণ করা (যেমন ক্রস রোডস্ Dec, বলদেব সিংয়ের

বিরুদ্ধে লেখা) এবং সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপ, যা শান্তির শত্রুকে সাহায্য করে, তার বিরোধিতা করা হবে আমাদের অন্যতম কৌশল।

সঙ্গে সঙ্গে পার্টি গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মারফত আওয়াজ তুলবে "কমনওয়েলথ ছাড়ো" "যুদ্ধকামী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ কর" "শান্তিকামী রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা করো"।

নেহরু সরকারের অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের জীবনের দাবির সংগ্রাম, কৃষকদের ভূমির সংস্কারের সংগ্রাম। ব্যক্তি স্বাধীনতার সংগ্রামের গতি রাখতে হবে অব্যাহত।

এই সমস্ত আন্দোলন সংগঠিত করার উপরই নির্ভর করছে কমিউনিস্ট পার্টি কি পরিমাণে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

শরৎ
রেড ষ্টার ইউনিট

শান্তি আন্দোলন ও জওহরলাল

CPI Welcomes Nehru's Stand on Peace

January, 28th '51

The Central Headquaters has released the following statement issued by the Central Committee of the CPI to the press.

"The Communist Party of India welcomes the forthright refusal of Prime Minister Nehru and his representatives in the United Nations to associate India with the American plan to unleash a third world war on Asian soil by branding Peoples' China as an aggressor. The stand taken by India on this and related questions constitutes an important contribution to the cause of Peace."

"The gravity of the war danger to-day demands to increasing unity and strength of Peace-loving humanity. India, astride the war-routes of imperialism can decisively shift the balance in favour of Peace."

"The Communist Party pledges its support to the efforts of the defenders of peace in India. It appeals to all its friends and sympathisers to rally in support of the movement for peace. Only such a mobilisation can defeat the plans of the imperialists and their agents to drag India into war. Only such a mobilisation can compel the Indian Government to pursue a consistent policy of Peace." (From C. R. 2nd Feb, '51)

শান্তি আন্দোলনের প্রচার কার্যে পার্টি প্রেসে ও পার্টি নেতাদের বক্তৃতায় জওহরলালের বর্তমান বক্তব্য ও ভারত সরকারের কয়েকটি কাজকে (চীনকে আক্রমণকারী আখ্যা দিবার

বিরোধিতা, কোরিয়ায় শান্তিপূর্ণভাবে শান্তি প্রচেষ্টার কাজ ইত্যাদি) যেভাবে অভিনন্দন জানান হচ্ছে এবং অকুণ্ঠ চিত্তে সমর্থন (স্বা——) জানান হচ্ছে তার সঙ্গে আমি একমত নই। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় কমিটির ২৮শে জানুয়ারির বিবৃতি (সি-আর) একেবারেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। এই বিবৃতি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য বলে গ্রহণ করতে ইচ্ছা হয় না।

এ পর্যন্ত যতদূর ভেবেছি সেইভাবে কতকগুলি পয়েন্ট আমি এখানে দিচ্ছি। এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবং এর ওপর জেলার পার্টি সভ্যদের চিন্তা ও মতামত, এবং উচ্চতর কমিটির বক্তব্য তাড়াতাড়ি জানা প্রয়োজন।

১। জওহরলাল এই দেশের বড় বুর্জোয়াদেরই প্রতিনিধি। তার নিজের শ্রেণি থেকে সে বিচ্ছিন্ন নয়। এই শ্রেণি (কম্প্রাডোর) গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মিত্র নয়, শত্রু, সাম্রাজ্যবাদের মিত্র ও রক্ষিত, সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ। ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন ও সংগঠনকে এরা ধ্বংস করতে চায়।

২। আমাদের বর্তমান রণনীতি এই জোটের বিরুদ্ধে অন্যান্য শ্রেণি, দল প্রভৃতিকে ঐক্যবদ্ধ করা; এদের সমস্ত রকম প্রভাব থেকে জনতাকে মুক্ত করা, এদের প্রত্যেকটি জন-বিরোধী কার্যকলাপকে লোকের চোখে ধরিয়ে দেওয়া।

৩। উপনিবেশের জনসাধারণ ব্যাপকভাবে মোহমুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে যতই বিপ্লবী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অগ্রসর হয়, এবং সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের পথ গ্রহণ করে, ততই এরা শ্বেত সন্ত্রাসবাদের নীতি গ্রহণ করে। তার পূর্বে এরা অন্যান্য কৌশলও নেয়। এরা শাসন ক্ষমতায় সামনা-সামনি থাকার সুযোগ নিয়ে (ক) দমননীতি চালায়, (খ) আন্দোলন ও সংগঠনে বিভেদ চালু করে (গ) আইনি মোহ সৃষ্টি করে বিপ্লবকে বিপথগামী করে। এই স্তরে অর্থাৎ শ্বেত সন্ত্রাসবাদ গ্রহণের পূর্বে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চাপে নিজেদের প্রভাব ও জন-বিরোধী নীতিকে কায়েমী রাখবার স্বার্থকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য এরা কোন কোন জনপ্রিয় ইসুতে কখনো কখনো সাময়িকভাবে বা আংশিকভাবে পদক্ষেপ করে, এটা আশ্চর্য নয়। কিন্তু এটা দীর্ঘস্থায়ী হয় না, বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে না। এদের শ্রেণি চরিত্র এদের জনতার সঙ্গে চলতে দেয় না।

৪। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিরোধসমূহ সাম্রাজ্যবাদী একচেটে কারবারীদের মধ্যে যেমন সজ্বর্ষ আনে, ঔপনিবেশিক ধনিকগোষ্ঠীও সেই বিরোধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য। এই কারণেই বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী ও উপনিবেশের প্রতিক্রিয়াশীল ধনিক শাসকরা সোভিয়েত, চীন ও সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধোম্মাদ মার্কিন ধনিকগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁরা সমস্ত রাজনৈতিক কাজেই সব সময় একমত হতে পারে না। যুদ্ধ চাইলেও যুদ্ধকে এরা ভয় করে। জনতার যুদ্ধ বিরোধী ও বিপ্লবমুখী মনোভাবকে এরা ভয় করে (ডি-এন প্রিট-এর মন্তব্য এটলী সম্পর্কে, যখন সে ট্রুম্যানের কাছে এটম বম্ব থামাতে ছোটে)। জওহরলালও সেই ভয় করে। ভারতের পশ্চাদপদ, অত্যন্ত দুর্বল আর্থিক অবস্থা, জনতার প্রচণ্ড বিক্ষোভ, যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব, সোভিয়েত ও বিশেষ করে মুক্ত চীনের প্রতি ভারতের জনতার প্রচণ্ড আকর্ষণ, ভারতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের দ্রুত প্রসার—এই সবই যুদ্ধের মধ্যে ভারতকে জড়িয়ে ফেলার পথে প্রচণ্ড বাধা। কিন্তু যুদ্ধ বিরোধী পথে সুনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হওয়ায় কায়েমী স্বার্থের বিপদ আছে, বিপ্লবী শক্তিগুলির শক্তি বৃদ্ধির

সুযোগ ঘটে। সেই ভয় জওহরলালের আছে। তাই সে শান্তি আন্দোলনকে সমর্থন করে না, ষ্টকহোম শান্তি আবেদনকে অগ্রাহ্য করে। দমননীতি চালু রাখে, সরাসরি চীন বিরোধী কথা না বললেও মার্কিনকে আক্রমণকারী আখ্যা দিতে চায় না; সমগ্র এশিয়ার মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রত্যেক ধাপে সাম্রাজ্যবাদ পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সাহায্য করে এসেছে।

৫। সাম্রাজ্যবাদীদের পরস্পর বিরোধ, পরস্পর যুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি না করলেও এর পুরো সুযোগ আমরা নিশ্চয়ই গ্রহণ করব এবং তাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি কাজের (যে কোনও সরকারের, যে কোনও দলের, যে কোনও লোকের) আমরা সদ্ব্যবহার করব।

৬। কিন্তু শত্রু শ্রেণির শেষ লক্ষ্য ও তার ফাঁদ সম্বন্ধে পূর্ণ সজাগ থাকা যেমন কমিউনিস্টদের কর্তব্য, তেমনি তাদের প্রভাব থেকে জনতাকে বার করে নিয়ে আসাও আমাদের প্রধান দায়িত্ব। যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন আমাদের মুক্তি আন্দোলনকে সাহায্য করে, সাম্রাজ্যবাদকে দুর্বল করে। যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন দেশের শ্রেণি সংগ্রামকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক বড় বুর্জোয়াদের পরস্পর সম্পর্ক এবং উপনিবেশের মুক্তি আন্দোলনের রণনীতি বিচার করলে এই কথা স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়। কমিউনিস্টদের কাছে শান্তি আন্দোলনের, যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনের আর কি অর্থ হতে পারে আমি জানি না।

৭। কাজেই জওহরলাল (ভারত সরকার) কি কারণে চীনকে ইউ-এন-ওতে রাখতে চায়, তাকে আক্রমণকারী আখ্যা দিতে চায় না ইত্যাদি—এর কারণ (বাস্তব ভিত্তি) আগে পরিষ্কার বুঝে নিতে হবে। তার (বা সরকারের) এই কাজগুলি আমেরিকার যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে আংশিকভাবে ও সাময়িকভাবেও বাধা দিয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এটা সম্পূর্ণ একটা ভাওতা না হলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক শক্তিকে সাহায্য করবার উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়নি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি তাকে এই পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করেছে। এই কারণগুলি না বুঝে সাদা চোখে সব বুঝতে গেলে জওহরলালের শ্রেণি স্বরূপ ধরা পড়ে না, রণনীতিগত দায়িত্ব অস্বীকার করে বুর্জোয়া সংস্কারবাদের পাঁকে পা দেওয়া হয় মাত্র। জওহরলালও এইটাই চায়।

এই বিশ্লেষণ বিনা দ্বিধায় লোকের চোখে ধরিয়ে দিতে হবে। তার যে কাজ যুদ্ধোন্মাদ মার্কিন ধনিকদের ষড়যন্ত্রকে বিন্দুমাত্রও বাধা দেয় তার সদ্ব্যবহার করতে হবে সত্য; তার জন্য সেই কাজের গুরুত্ব স্বীকার করতে আপত্তি নেই; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে দাঁড়াতে গেলে যে পদ্ধতি নেওয়া দরকার তার ব্যাপক প্রচার অবশ্যই প্রয়োজন। জওহরলাল বা ভারত সরকার কেন সেই কাজগুলি করে না, কেন এশিয়ার জনতার বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ ব্যবস্থার সহযোগিতা করে (মালয়, বর্মা, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন), কেন তাদের গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধবাদী আখ্যা দিয়ে তাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে না, কেন যুদ্ধ বিরোধী ভারতীয় জনতার যুদ্ধ বিরোধী প্রচারের কণ্ঠরোধ করতে চায়, কেন প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে সক্রিয় ব্যবস্থা করে—তার ব্যাখ্যা দরকার।

৮। এই বিশ্লেষণ ও মুখোশ খোলার প্রচার বাদ দিয়ে অকুণ্ঠচিত্তে জওহরলালের 'ষ্ট্যান্ড' সমর্থন করলে লোকের মোহমুক্তির পথে বাধা সৃষ্টির অপরাধে আমরা অপরাধী হব। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করার দায়িত্ব ঐভাবে পালন করা যায় না। কেন্দ্রীয়

কমিটির বিবৃতিতে এই ভুলই করা হয়েছে। রমেশ থাপ্পরের প্রবন্ধে যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে সতর্কবাণী করতে গিয়ে একই ভুল হয়েছে। আর-পি-ডি—প্রশ্নের উত্তরদানকালে (সি আর) জওহরলালের দ্বিধাজড়িত পদক্ষেপের উল্লেখ করে প্রকৃত শান্তি নীতির যে সব প্রয়োজনীয় ধাপ উল্লেখ করেছেন—সেইগুলির ব্যাখ্যা সঠিক হলে আমার মনে হয় এই ভুল থেকে আমরা উদ্ধার পেতাম।

৯। ওয়ারস বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে বিভিন্ন বক্তার মুখে জওহরলালের শান্তি চেষ্টার উল্লেখ, মাও সে-তুং ও ভিসিনস্কির রিপাবলিকান ডে'তে উপস্থিতি, সবার আগে কমরেড ষ্ট্যালিনের কাছে জওহরলালের চিঠি ও কমরেড ষ্ট্যালিনের জবাব—এই সবই গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ও চীন রাষ্ট্র শত্রু শিবিরে ফাটল ধরাবার ও তাকে বিভিন্নভাবে দুর্বল করার চেষ্টা করবে, আমরাও সেই সুযোগ নেব। কিন্তু ভারতীয় শাসককে কোণঠাসা করবার নীতি তা থেকে বাদ পড়ে না। ভারত সরকারের সঙ্গে চীন- সোভিয়েতের কোনও চুক্তি বা কোনও সাময়িক মিতালী আমাদের রণনীতি পরিবর্তিত করতে পারে না। আমাদের দেশের শ্রেণি সংগ্রাম, মুক্তি আন্দোলন জওহরলালকে মিত্র শিবিরে কল্পনা করতে পারে না, জওহরলাল চীনের পক্ষে সহস্র ওকালতি করলেও।

১০। জওহরলাল সম্বন্ধে অকুণ্ঠ সমর্থনের আওয়াজ তোলার ফল কি দাঁড়িয়েছে? (ক) ব্যাপক জনতা যেমন ধাঁধায় পড়ছে (বহুলোক প্রশ্ন তুলেছে) (খ) বিভিন্ন বামপন্থী দলের মধ্যে পার্টির প্রতি সন্দেহ এসে যাচ্ছে (এফ-বি, আর-এস-পি), বামপন্থী ঐক্যের সম্ভাবনা দূরে সরে যাবার ভয় দেখা যাচ্ছে; (গ) পার্টির মধ্যেও রাজনৈতিক ঐক্য পিছিয়ে যাচ্ছে, বিভেদের আশংকা বাড়ছে। সুস্থ তর্কের বদলে [আদর্শগত সংগ্রাম] নেতৃত্বের প্রতি অবজ্ঞা, স্থায়ী অবিশ্বাস দেখা যাচ্ছে।

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১ —রঞ্জিত

টীকা : এই সব আলোচনার মধ্যে দিয়ে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে জওহরলাল নেহরুর শান্তি নীতি এবং শ্রেণি চরিত্র সম্পর্কে পার্টির অভ্যন্তরে কোন সহমত ছিল না। এই সমস্ত বিভিন্ন মত প্রাদেশিক পার্টি আলোচনায় প্রকাশেব মধ্যে দিয়ে একটা সুস্থ অন্তঃপার্টি আলোচনা জারি ছিল। (—সম্পাদক)

সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করা হইবে না ঃ নেহরু কর্তৃক 'স্বাধীন ও নিরপেক্ষ' নির্বাচন নীতির অপূর্ব ব্যাখ্যা

যে সমস্ত রাজ্যে রাজনৈতিক দল বিশেষের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছে তাহা আগামী নির্বাচনের সময় উঠাইয়া লওয়া হইবে কি না এই বিষয়ে সংবাদপত্র প্রতিনিধি সম্মেলনে শ্রী নেহরুকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন যে সেইরূপ দল বলিতে একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিকেই বেআইনি করা হইয়াছে। আগামী নির্বাচনে যে যে প্রদেশে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি সেখানে পার্টি হিসাবে তাহাদের কোন সুযোগ দেওয়া হইবে না।.....

কমিউনিস্টদের সম্পর্কে তাঁহার নীতি বিশ্লেষণ করিতে গিয়া শ্রী নেহরু বলেন, কমিউনিজম সম্পর্কে কেবল কথা বলিলেই তাহার প্রতি কোন নীতি নির্দ্ধারিত হয় না। ভারতের মধ্যে বা বাহিরে কমিউনিজম ও কমিউনিস্টদের ন্যায় আর কোন সমস্যাই এত গোলযোগ পূর্ণ নহে।...... ভারতের মধ্যে কমিউনিস্ট বলিতে শ্রী নেহরু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী একটি সন্ত্রাসবাদী দল বলিয়া মনে করেন। কমিউনিস্টদের সম্পর্কে এই ধারণা লইয়া ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে সেই দলকে কাজ করিতে দেওয়া চলে না। এই জন্যই অনেক রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি করা হইয়াছে।...

'স্বাধীনতা', ১৪ মার্চ ১৯৫১

টিকা : জওহরলাল নেহরু যখন 'স্বাধীন ও নিরপেক্ষ' নির্বাচন নীতির এই ধরনের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, সেসময় পশ্চিমবঙ্গে হাইকোর্টের রায়ে জানুয়ারি মাসে রাজ্যের কমিউনিস্ট পার্টি ইতিমধ্যে আইনি চরিত্র লাভ করেছিল। তবে অন্য রাজ্যে তখনও কমিউনিস্ট পার্টির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল। (—সম্পাদক)

Charges against Muzaffar Ahmed and his reply

Ahmed was kept in confinement without charge; On 26 February, 1951 the Government lodged charges against him, which were as follows :

1. That he had been a leading CPI member in Bengal and had held important charges in this Organization.

2. In 1947, he presided over a Party meeting in which it was viewed that a mass communist revolution of peasants and workers was possible. He received instructions from Mr. P. C. Joshi to get ready for the impending civil war in India for seizing power.

3. That he was a member of the Bengal Provincial Committee of the CPI and was elected a member of the Central Committee at the All India Party Congress in February and March 1948. That he was a member of the presidium formed to guide the deliberations of the Party Congress. That he inaugurated the Congress on behalf of the Bengal Provincial Party and was elected as a member of the CPI Central Committee.

Muzaffar Ahmed challenged the charges and wrote to the Secretary of Home Department, W.B. :

...The ground no. 1 is vague and meaningless as a ground for detention. There is no reason why I should not be a leading CPI member in Bengal. On the day of my arrest on the 26th March, 1948, the Communist Party of India was perfectly a legal organization in Bengal. The Official Gazette declaring the party illegal in Bengal was not published before the 27th March,1948. As the ground nos. 1 and 2 of the original charge sheet dated the 14th March, 1950 are declared vague by the High Court this ground too is vague.

The ground no. 2 is also vague and false. It is mentioned here that I presided over a party meeting in 1947 in which it was viewed that a mass Communist revolution [of] peasants and workers was possible.

The dates and places of such meeting are not given, because these particulars are not known to the Government.

...As regards the second part of this ground it is a more conclusion that I received instructions from P. C. Joshi to get ready for the impending civil war [in] India for seizing power. Why of all persons Mr. P. C. Joshi sent me these instructions? The Government has failed to state on what date the instruction were sent to me and through what channel. The fact is that such instructions were never sent by Mr. P. C. Joshi. I challenge the Government to produce a document containing these instruction. When I, receiver of the instructions is being detained in jails for over three years how is that giver of the instructions Mr. P. C. Joshi has been freely moving all over India?

... .If all the relevant papers and orders concerning me are gone through it will be found that the Government of West Bengal has been actuated from the very beginning from a malafide intention. The policy of Government has always been to detain me in jails by any means.

প্রাপ্তি স্বীকার : Dr Khaled Mortuza's book, I B File No 168/22

টিকা : [ ] এই চিহ্নের মধ্যে শব্দটি সম্পাদকের দেওয়া। (—সম্পাদক)

কংগ্রেসের অর্ডিনান্সের ফলে যে সমস্ত পত্রিকার কণ্ঠরোধ করা হয়েছে

(১) *পত্রিকার নাম*

১। স্বাধীনতা (দৈনিক), ২। সংবাদ (দৈনিক), ৩। সংবাদ (সাপ্তাহিক), ৪। নতুন সংবাদ (দৈনিক), ৫। খবর (দৈনিক), ৬। সাধারণ (সাপ্তাহিক), ৭। সওয়াল (সাপ্তাহিক), ৮। বার্তা (দৈনিক), ৯। নববার্তা (দৈনিক), ১০। সমাচার (সাপ্তাহিক), ১১। সপ্তাহ (অর্ধ সাপ্তাহিক), ১২। দর্পণ (দৈনিক), ১৩। দৈনন্দিন (দৈনিক), ১৪। নয়া দুনিয়া (সাপ্তাহিক), ১৫। রোশনী (সাপ্তাহিক), ১৬। ছায়াপথ (সাপ্তাহিক)। [নয়া দুনিয়া, রোশনী, ছায়াপথ পূর্ববঙ্গের তিনখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা কলিকাতা থেকে বের হত। কলিকাতা কংগ্রেসী শাসকগোষ্ঠী তাদের 'ইন্ডিয়ান প্রেস ইমার্জেন্সি অ্যাক্ট'-এর সাহায্যে এর প্রকাশ বন্ধ করে দেন।] ১৭। মঞ্জিল (সাপ্তাহিক), ১৮। শিবির (সাপ্তাহিক), ১৯। ছাত্র অভিযান (ছাত্র-পাক্ষিক), ২০। ডাক (ছাত্র-পাক্ষিক), ২১। ঘরে-বাইরে (মহিলা মাসিক), ২২। জয়া (মহিলা মাসিক পত্রিকা), ২৩। ট্রাম মজদুর, ২৪। রেল মজদুর, ২৫। রেলওয়ে মজদুর, ২৬। মধ্যবিত্ত (কর্মচারী-সাপ্তাহিক), ২৯। লোকনাট্য (শিল্পী-পাক্ষিক), ৩০। নই দুনিয়া (হিন্দী), ৩১। নই রোশনী (হিন্দী), ৩২। চলচ্চিত্র কর্মচারী (সাপ্তাহিক), ৩৩। নই কদম (উর্দু), ৩৪। গণবার্তা (আর. এস. পি.-সাপ্তাহিক), ৩৫। গণবিপ্লব (ভ্যানগার্ড), ৩৬। পঞ্চায়েত (আর. এস. পি. আই—সাপ্তাহিক), ৩৭। গণবামী (সাপ্তাহিক), ৩৮। গণ-অভিযান, ৩৯। প্রতিরোধ, ৪০। পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা (দৈনিক)।

(২) *২৬শে আগস্ট তারিখের 'মতামত'-এর সম্পাদকীয় 'অর্ডিনান্স করে কণ্ঠরোধ করা চলবে না'*— (তার কিছু অংশ)

বাংলার জনগণের কণ্ঠরোধ করার জন্য লাটসাহেব কাটজু আর একটি ফ্যাসিস্ট অস্ত্র তৈরি করেছেন, নিরাপত্তা সংশোধনী অর্ডিনান্স নামে একটি নয়া অর্ডিনান্স জারি করেছেন।

এই অর্ডিনান্সের জোরে বিধান মন্ত্রিসভা যখনই কোন সংবাদকে 'রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক' মনে করবেন তখনই তার উপর 'আগে সেন্সার করা'র হুকুম জারি করতে পারবেন, তার প্রকাশন বন্ধ করতে পারবেন, এমনকি যে প্রেসে তা ছাপা হবে সে প্রেসের উপর পর্যন্ত সংবাদ না ছাপার হুকুম চালাতে পারবেন।......।

বাংলার প্রত্যেকটি সাচ্চা মানুষের কাছে এ নয়া অর্ডিনান্স এসেছে এক নয়া চ্যালেঞ্জ হিসাবে। সত্যকে প্রকাশ করার অধিকারই সংবাদপত্রের অধিকার এবং আমাদের প্রত্যেকের

জন্মগত অধিকার। সে অধিকার ফতোয়া জারি করে কেড়ে নেয় সাধ্য কার?..... কারখানা, গ্রাম ও বাস্তুহারা শিবিরে যে অসংখ্য মানুষ ক্ষেপে উঠছে কংগ্রেসী 'রাম রাজ্যের মহিমা' প্রকাশ করার জন্যে, কাটজুর অর্ডিনান্স তাঁদের কন্ঠরোধ করবে কিভাবে? মেদিনীপুরের গ্রাম গঠরায় যে কৃষকরা ঘর ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে জঙ্গলে, মুর্শিদাবাদের যে ক্ষুধার্ত মানুষ ঘর ছেড়ে বের হয়েছে রাজপথে, কাকদ্বীপের যে কৃষকরা প্রত্যহ হাজিরা দিচ্ছে পুলিশ ক্যাম্পে তাদের কন্ঠস্বরকে কংগ্রেসী শাসকশ্রেণি কেন এতো ভয় করেন?..... গরীবদের যে সামান্য কয়েকখানা পত্রিকা ..... জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করার আওয়াজ তুলছে, খাদ্য ও মজুরি বৃদ্ধির দাবি তুলছে—তাদের মুখ বন্ধ করার জন্য এত তোড়জোর কেন?

তার জবাব দিয়েছেন 'নিউ টাইমস্' তাঁদের ছোট্ট একটি মন্তব্যে। ভারতের ফ্যাসিস্ট আইনের সমালোচনা করে তাঁরা লিখেছেন ঃ

'প্রগতিশীল সংগঠনের বিরুদ্ধে ভারতে যে সন্ত্রাসনীতি চলছে, যে পুলিশী শাসন চলছে, তা থেকে বোঝা যায় ভারতের শাসকশ্রেণি তাঁদের অবস্থা খুব পাকাপোক্ত বলে মনে করেন না। এ সকল ব্যবস্থার ফলে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা আরো জটিল হয়ে উঠবে।'

সংবাদপত্রের অধিকার কেড়ে নিয়ে, মুক্তিকামী মানুষকে তার হক কথা বলার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদাররা দেশবাসীকে নিক্ষেপ করতে চাইছে—দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধে।

সংবাদপত্রের অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রাম করে, হক কথা বলার অধিকারের জন্যে সকল দল, সকল মত, সকল শ্রেণির সাচ্চা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে আসুন আমরা ব্যর্থ করি তাদের ষড়যন্ত্রকে। ব্যাপকতম ঐক্য ও সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আসুন আমরা কংগ্রেসী শাসকশ্রেণিকে বাধ্য করি এ নয়া অর্ডিনান্স প্রত্যাহার করতে, অপরাজেয় করে তুলি মুক্তি সংগ্রামকে।

মতামত, ২৬ আগস্ট ১৯৫০

প্রাপ্তি স্বীকার : সমীর দাশগুপ্ত— গণআন্দোলনে ছাপাখানা কমিউনিস্ট পার্টি ও সমদর্শী সংবাদপত্রের ক্রমপর্যায়। দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১২৬।

স্বাধীনতা— ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫১

বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা

আমাদের আবেদন

প্রায় তিন বছর আগে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার হুকুমে 'স্বাধীনতা'র কণ্ঠরুদ্ধ হয়েছিল। এই তিন বছর 'স্বাধীনতা'র ডাক ব্যাপক জনসাধারণের কাছে পৌঁছায়নি। আজ আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'স্বাধীনতা' আবার আপনাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছে।

'স্বাধীনতা' পত্রিকা জনতার নিজস্ব পত্রিকা। মেহনতী মানুষের কাছে নতুন করে এর পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নাই। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে, একচেটিয়া ধনিকগোষ্ঠীর নির্লজ্জ মুনাফাখোরীর বিরুদ্ধে, সামন্ততন্ত্র ও জমিদারদের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-কেরানী-কর্মচারী—গোটা মেহনতী মানুষের মরণপণ লড়াই-এ 'স্বাধীনতা' ছিল বিশ্বস্ত সাথী, পথ দেখাতে, নেতৃত্ব দিতে ভুলত্রুটি তার কোনদিন হয়নি এমন নয়, কিন্তু জনসাধারণের আন্দোলন ও তার সংগ্রামের পাশে এসে দাঁড়াতে 'স্বাধীনতা' কোনদিন ভুল করে নি।

তাই 'স্বাধীনতা'কে প্রয়োজনে, 'স্বাধীনতা'র আহ্বানে জনসাধারণও বার বার তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, আপদে বিপদে তাকে মায়ের মতো যত্নে রক্ষা করেছে।

'স্বাধীনতা'র এই বিপুল জনপ্রিয়তা, তার এই দুর্বার শক্তি কংগ্রেসী শাসকশ্রেণিকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। তাই বার বার নানাভাবে তারা চালিয়েছে এর উপর আক্রমণ। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৮ সালের ২৬শে মার্চ তারা এর মুখ বন্ধ করে দেয়।

তারপর প্রায় তিন বছর পার হতে চলেছে। এই তিন বছরে দেশের সমস্ত মানুষকে শুধু অনাহার মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়নি, শুধু অত্যাচার আর দমননীতির রথের চাকায় তার শিরদাঁড়াটিকে ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টাই হয়নি, প্রতিবাদের ভাষাটিকে পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়ার নিদারুণ চেষ্টা চলেছে।

শাসকশ্রেণির পেটোয়া কাগজগুলো জনসাধারণের আন্দোলনকে বিপথগামী করার কুৎসিত ষড়যন্ত্র করেছে। এই অবস্থার মধ্যেও দু'একখানি কাগজ জনতার ভাষাকে খানিকটা রূপ দেবার সীমাবদ্ধ প্রচেষ্টা করেছে। কিন্তু সরকারি আক্রমণে তাদের সেই সীমাবদ্ধ চেষ্টাও মধ্য পথে বন্ধ হয়ে গেছে।

এই তিন বছর প্রতিটি আন্দোলনের সময়, লড়াইয়ের প্রতিটি মুহূর্তে জনসাধারণের মনে পড়েছে 'স্বাধীনতা'র কথা, মনে পড়েছে তাদের এই বিশ্বস্ত সাথী ও সুহৃদকে।

আমাদের ভাণ্ডার আজ কপর্দ্দকশূন্য। শাসকশ্রেণির উদ্যত খড়্গ আজও আমাদের মাথার উপর ঝুলছে। একটি দৈনিক কাগজ সংগঠনের জন্য সর্বনিম্ন সময়ের যে প্রয়োজন, তা সত্ত্বেও উপরোক্ত প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা হাজার অসুবিধাকে অগ্রাহ্য করে 'স্বাধীনতা'কে আবার নিয়মিতভাবে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মেহনতী জনতার দৃঢ় সমর্থন ও সহযোগিতার ভিত্তিতেই 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সৃষ্টি। অতীতে 'স্বাধীনতা'র আহ্বানে আপনারা বার বার অকুণ্ঠিত চিত্তে সাড়া দিয়েছেন। আপনাদের অর্থ সঞ্চয় থেকে যথাশক্তি দান করে কয়েকবার 'স্বাধীনতা'র তহবিলে আপনারাই প্রায় ৫ লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছিলেন।

আজও 'স্বাধীনতা' আপনাদের অবলম্বন করে এই প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও গড়ে উঠবে। বাঁচবে, বাড়বে—এ দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের আছে।

'স্বাধীনতা' প্রকাশ করা ও তাকে বাঁচাবার জন্য কমপক্ষে এখনই ৩০ হাজার টাকা প্রযোজন। 'স্বাধীনতা'র নিজস্ব প্রেস আজ নেই। ছাপার খরচ, কাগজের দর আজ অসম্ভব চড়েছে।

তাই 'স্বাধীনতা'কে সাহায্য করুন—এই আবেদন আমরা উপস্থিত করছি, 'স্বাধীনতা'র সমস্ত গ্রাহক, পাঠক, দরদী, বিজ্ঞাপনদাতা প্রত্যেকের কাছে আবেদন করছি শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকামী বাংলার প্রত্যেকটি মানুষের নিকট।

আমরা আবেদন করছি কারখানার শ্রমিক ভায়েদের কাছে। আপনার ছাঁটাই বন্ধ ও মজুরি বৃদ্ধি আন্দোলনের অতীতের মত আজও 'স্বাধীনতা' আপনাদের বিশ্বস্ত সাথী হবে শ্রমিক ঐক্য গড়ে তোলার জন্য, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে। যে কাগজ নির্ভীক লড়াই চালাবে শ্রমিক শ্রেণির সেই কাগজকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আপনার।

গ্রামের কৃষক ভাইদের কাছে আমাদের আবেদন তেভাগার লড়াইকে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছে যে পত্রিকা ... তার সাহায্যে উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে আসুন।...

.... আমরা আবেদন করছি কারখানা ও অফিসের কেরানী কর্মচারীদের নিকট ...।

ছাত্রছাত্রী বন্ধুদের কাছে আমাদের আবেদন শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আজ যে বীভৎস অভিযান চলেছে তার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ আওয়াজ তুলবে 'স্বাধীনতা'। অতীতের মত আজও আপনাদের প্রতিটি আন্দোলন ও সংগ্রামের সহযোদ্ধা হবে 'স্বাধীনতা'। তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে আপনারা সমস্ত শক্তি নিয়ে অগ্রসর হয়ে আসুন।

৫০ লক্ষ উদ্বাস্তু ভাইবোনদের কাছে আমাদের আবেদন ঃ আবার ঘর বাঁধার জন্য, বাসস্থান, জমি ও রুজির জন্য আপনারা যে মিলিত প্রচেষ্টা শুরু করেছেন, তাতে শক্তি ও প্রেরণা জোগাবে 'স্বাধীনতা'।

তাকে সমর্থন ও সাহায্য করতে অকুণ্ঠ দরদ নিয়ে এগিয়ে মা ও বোনদের কাছে আমাদের আবেদন ঃ আসুন, আপনাদের স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার লড়াইতে প্রথম থেকে যে আপনাদের সাথে ছিল, আপনাদের সেই প্রিয় 'স্বাধীনতা' পত্রিকা আজ আপনাদের সাহায্যপ্রার্থী। আপনারা এই আহ্বানে মায়ের মমতা এবং বোনের স্নেহ দিয়ে সাড়া দিন।

আমরা আবেদন করি ঃ বাংলার প্রতিটি বামপন্থী দল ও তাদের কর্মীদের নিকট ঃ বামপন্থী আন্দোলনের হাতিয়ার এই 'স্বাধীনতা'কে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আপনাদেরও। সাম্রাজ্যবাদ, বড় বড় ধনিকশ্রেণির সামন্ততন্ত্র ও জমিদারির বিরুদ্ধে সমস্ত শ্রেণি, দল ও মতের ঐক্যবদ্ধ

অভিযান গড়ার হাতিয়ার হবে যে কাগজ সে কাগজকে সাহায্য ও সমর্থন করতে উদার হৃদয়ে আপনারা এগিয়ে আসুন।

শান্তিকামী, গণতন্ত্রপ্রিয়, ব্যক্তি স্বাধীনতাকামী, দলমত নির্বিশেষে বাংলার প্রতিটি মানুষের কাছে আমাদের এই আবেদন ঃ শুধু অর্থ নয়, আমরা চাই আপনাদের সর্বপ্রকার সহযোগিতা, আপনারাই আমাদের রসদ যোগাবেন, আপনারাই আমাদের সংবাদ যোগাবেন। 'স্বাধীনতা' পত্রিকাকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার দায়িত্বও আপনারাই নেবেন।....

... এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই আমরা এ প্রথম বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা প্রকাশ করলাম। ... আপনাদের সকলের দ্রুত সাহায্য ও সমর্থনের উপরই নির্ভর করছে 'স্বাধীনতা'র নতুন প্রকাশ আয়োজনের সাফল্য ও ভবিষৎ ও সমৃদ্ধি।

বিপ্লবী ভ্রাতৃত্বমূলক অভিনন্দন সহ।
'স্বাধীনতা' পরিচালকমণ্ডলী

সরকার বিরোধী যুক্তফ্রন্টের ডাক

জ্যোতি বসু ও রতনলাল ব্রাহ্মণের বিবৃতি

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের কমিউনিস্ট সদস্যদ্বয় জ্যোতি বসু ও রতনলাল ব্রাহ্মণ পশ্চিমবঙ্গের আইনসভার বর্তমান বাজেট অধিবেশনের প্রাক্কালে সবকার বিরোধী সকল সদস্যের এক যুক্তফ্রন্টের প্রস্তাব প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বিবৃতি দেন।

"পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন এমন একটি সন্ধিক্ষণে শুরু হইয়াছে যখন দেশের উপর ঘনাইয়া আসিয়াছে দুর্ভিক্ষের ছায়া এবং পরিষদের অভ্যন্তরে অভূতপূর্ব এক শক্তিশালী বিরোধী পক্ষের আবির্ভাব হইয়াছে। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষসহ তাহার সাতজন সহকর্মী বিরোধী পক্ষের নতুন সাথী।"

"বাজেট ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ বিল পরিষদে উত্থাপিত হইবে। ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর, সাধারণভাবে জনগণের জীবন ও বিশেষ করিয়া বাস্তুহারাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে।"

"সরকার তাহার বিরোধীপক্ষকে দুর্বল করিবার জন্য আমাদের বিনা বিচারে আটক রাখিয়াছিলেন। কিন্তু পুনরায় আমরা পরিষদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছি।"

"আমরা আমাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করিয়া জনসাধারণের সেবা করিব এবং সরকারের প্রত্যেকটি প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব ও নীতির বিরুদ্ধে যথাসম্ভব সংগ্রাম করিব।"

"বিরোধীপক্ষের নতুন সদস্যদের আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি সর্বসম্মত কর্মসূচির ভিত্তিতে সহযোগিতার জন্য আবেদন জানাইতেছি। আমাদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু আসুন আমরা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া এই সরকারের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিরোধিতা উপস্থাপিত করি।"

"পশ্চিমবাংলার কংগ্রেসী কুশাসনের কবলে পড়িয়া জনসাধারণ আমাদের নিকট ইহাই দাবি করিতেছে, এবং আমরা তাহাদের বিমুখ করিতে পারি না।"

"বড় বড় জমিদার ও চোরাকারবারীদের এই সরকার বহুপূর্বেই জনসাধারণের আস্থা হারাইয়াছে।"

"সুতরাং আসুন আমরা পরিষদের অভ্যন্তরে ও বাহিরে এমনভাবে কাজ করি যাহাতে এই সরকার পদত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।"

"পরিষদের বাহিরের জনসাধারণ, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, কৃষক এবং ছোট পুঁজিপতিদের নিকট আমাদের আবেদন এই পবিত্র কর্তব্য সম্পাদন করিতে আপনারা প্রত্যেকে আমাদের শক্তি যোগান।"

'স্বাধীনতা', ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১

স্বাধীনতার তহবিল পূরণ করিবই

১) *'স্বাধীনতা'র সম্পাদকমণ্ডলীর বিজ্ঞপ্তি*

'স্বাধীনতা'র চলার পথে বাধা অনেক, কিন্তু সে বাধা 'স্বাধীনতা' অতিক্রম করিবেই। কারণ 'স্বাধীনতা' জনগণের কাগজ, জনগণ হইতেই তাহার নীতি উদ্বুদ্ধ হইয়া জনগণকেই সে অনুপ্রাণিত করে। 'স্বাধীনতা'র অগ্রগতি রুদ্ধ করিবার কামনা যাহারা করে তাহাদের কামনা তাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। দেশের অবস্থা দাবি করিতেছে 'স্বাধীনতা'র আরো দ্রুত উন্নতি। আরো দ্রুত অগ্রগতি। তাহারই জন্য চাই ৩০ হাজার টাকার তহবিল। এই তহবিল পূরণ করিবার চেষ্টায় আপনি কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন? 'স্বাধীনতা'র প্রত্যেকটি পাঠক, প্রত্যেকটি দরদীর নিকট আমাদের জিজ্ঞাসা, আপনি কি আপনার পাড়ায়, অফিসে, আপনার কল-কারখানায় 'স্বাধীনতা তহবিল' পূরণের অভিযান শুরু করিয়াছেন? কে কত টাকা তুলিবেন প্রতিজ্ঞা লইয়াছেন কি? যাহাদের নিকট সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে, তাহার লিস্ট করিয়া তাহাদের নিকট যাইতেছেন কি? নতুন মাস শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গেই টাকা তুলিবার প্ল্যান করিয়াছেন কি? অপেক্ষা করিবার সময় নাই। এই মুহূর্ত হইতেই স্বাধীনতার তহবিল পূরণ করিবই, স্বাধীনতার অগ্রগতি আরো আরো দ্রুত করিব।

স্বাধীনতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১

২) *রাজ্য কমিউনিস্ট পার্টির আবেদন*

প্রায় দুই মাস হইল আমাদের 'দৈনিক' বাহির হইয়াছে। যদিও 'দৈনিক' বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে পার্টি কমরেডদের মধ্যে একটি স্বাভাবিক উৎসাহ দেখা দিয়াছে, তবু যে পরিমাণ সামগ্রিক চেষ্টা এই 'দৈনিক'-এর উন্নতি ও পরিচালনার জন্য হওয়া দরকার তাহা এখনও হয় নাই। এ সম্বন্ধে সমগ্র পার্টিকে সচেতন হইতে হইবে। পার্টির অন্যতম প্রধান কাজ হিসাবে এই 'দৈনিক' কে সর্বতোভাবে পরিপুষ্ট করিতে হইবে।

'দৈনিক'-এর বর্তমান পরিচালনা পদ্ধতি সম্বন্ধে যাহাতে কোন ভুল ধারণা না হয়, তাহার জন্য একথা পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার যে, 'দৈনিক'টি পি.ও.সি'র দায়িত্বে বাহির হইতেছে এবং পি.ও.সি. অনুমোদিত সম্পাদকমণ্ডলীর উপরই ইহার পরিচালনার ভার অর্পিত। তবে, বর্তমান অবস্থায় একটি 'দৈনিক' পরিচালনা করিতে গেলে প্রত্যেকটি ব্যাপারে পি.ও.সি'র সহিত সম্পাদকমণ্ডলীর আলোচনা সম্ভব নয়, এবং তাই স্বভাবতই দৈনন্দিন পরিচালনার

ব্যাপারে সম্পাদকমণ্ডলীকে প্রধানত, নিজেদের দায়িত্বেই কাজ করিতে হয়। সুতরাং লেখার দিক দিয়াও সর্বদাই যে পি.ও.সি'র সুচিন্তিত মত কাগজে প্রতিফলিত হয় তাহা ধরিয়া লওয়া উচিত নয়। পার্টির পলিসি সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত এইরকম কিছু কিছু গরমিল হইতে বাধ্য। এইদিক দিয়া প্রত্যেক লেখা ও পরিচালনার প্রত্যেকটি বিষয়ে সমালোচনা করিবার পূর্ণ অধিকার ও দায়িত্ব সমস্ত কমরেডেরই রহিয়াছে। সম্পাদকমণ্ডলীও উদ্যোগী হইয়া সাধারণ কমরেডদের সমালোচনা ও পরামর্শ জানিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

সাধারণভাবে 'কমিনফর্মের' সম্পাদকীয়, সি.পি.জি.বি'র দলিল এবং আর.পি.ডি'র নোটই হইতেছে দৈনিকের সম্পাদকীয় নীতির ভিত্তি। পার্টির সুনির্দিষ্ট লাইন না থাকায় উপরিউক্ত দলিলগুলিরও বিভিন্ন ব্যাখ্যা হওয়া স্বাভাবিক। দৈনিকের মধ্যে তাহার প্রতিফলন কিছু না কিছু হইতে বাধ্য। এই বাস্তব অবস্থা স্বীকার করিয়াই দৈনিক চালান হইতেছে কিন্তু এই বাস্তব অবস্থার মধ্যেই দৈনিকের প্রধান লক্ষ্য হইবে সর্বতোভাবে পার্টির মূল দায়িত্ব অর্থাৎ শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের দায়িত্ব পালন করা। এইদিক দিয়া দৈনিকটি পার্টির বর্তমান অবস্থায় পার্টির সহিত জনসাধারণের যোগসূত্র গড়িয়া তোলার এবং তাহার ভিত্তিতে পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করার মূল্যবান হাতিয়ার। সুতরাং সর্বতোভাবে 'দৈনিক'কে উন্নত করা আজ প্রত্যেকটি পার্টি কমরেডের দায়িত্ব।

এখন যেভাবে কাগজটি চলিতেছে, তাহা প্রায় না চলার মতই। কমরেডদের অসীম আগ্রহ ও অক্লান্ত চেষ্টা না থাকিলে হয়ত ইতিমধ্যেই কাগজ বন্ধ হইয়া যাইত। অত্যন্ত সামান্য টাকা সম্বল করিয়া কাগজ বাহির হইয়াছে এবং প্রতিমাসে অসম্ভব দেনার বোঝা ঘাড়ে চাপিতেছে।...

অথচ বাস্তব অবস্থার দিক দিয়া আমাদের দৈনিকের এই দুর্বলতা থাকার কথা নয়। আমাদের দৈনিক শুধু আমাদের কমরেডদের কাছেই নয়, সাধারণ জনতার কাছেও অত্যন্ত প্রিয়। ... আজ ইহার চাহিদা ১৫,০০০; অথচ প্রেসের অক্ষমতার জন্য মাত্র ৮,০০০ বেশি ছাপান সম্ভব হইতেছে না।...

সুতরাং 'দৈনিক'-এর বর্তমান শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন আমাদের করিতেই হইবে। ইহার জন্য প্রত্যেকটি পার্টি ইউনিটকে সচেষ্ট হইতে হইবে।

প্রথম দরকার অর্থের। 'দৈনিকের জন্য ৩০ হাজার টাকার আহ্বান জানান হইয়াছে। প্রত্যেক ইউনিটকে এই টাকা তুলিবার কোটা লইতে হইবে। আমাদের প্রতিজ্ঞা হইবে দুই মাসের মধ্যেই 'দৈনিক'কে আর্থিক দিক দিয়া নিশ্চিন্ত করিব।

'দৈনিক'কে উন্নত করিবার জন্য প্রত্যেক ইউনিটকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য দিতে হইবে। শুধু পরামর্শ ও সমালোচনার দ্বারা নয়, রিপোর্ট পাঠাইয়া, চিঠিপত্র সংগ্রহ করিয়া, জরুরি ঘটনার সংবাদ দিয়া এবং আরো যেভাবে দরকার দৈনিকের খোরাক যোগাইয়া ইহাকে উন্নত করিতে হইবে। ইহার জন্য প্রত্যেক জায়গায় রিপোর্টার ঠিক করিতে হইবে; দৈনিকের সঙ্গে নিয়মিত পত্র আদান প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

'দৈনিক' প্রচারের জন্য প্রত্যেক জায়গায় উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে এই কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার যে, দৈনিক সংক্রান্ত কাজকর্মের সমস্ত ব্যাপার সরাসরি 'দৈনিক' অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে। কোন্ ইউনিট কত টাকা তোলার দায়িত্ব লইলেন, কাহাকে রিপোর্টার ঠিক করিলেন, প্রচার ব্যবস্থা কি

করিলেন প্রভৃতির খবর সরাসরি 'দৈনিক' অফিসে জানাইতে হইবে। টাকা তোলার রসিদ, কুপন প্রভৃতি লওয়া ও জমা দেওয়া, টাকা জমা দেওয়া, সমালোচনা পাঠান প্রভৃতি সব বিষয় 'দৈনিক'-এর অফিসের সহিত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পি.ও.সি. আশা করে উপরিউক্ত কাজগুলি করিবার জন্য প্রত্যেক ইউনিট এখনই আলোচনা করিবেন এবং সুনির্দিষ্ট প্ল্যান করিয়া অগ্রসর হইবেন। দৈনিককে বাঁচাইতে ও উন্নত করিতে আমাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। কেননা, ইহা শুধু পার্টির প্রতি দায়িত্ব পালনের প্রশ্নই নয়, জনতার প্রতি দায়িত্ব পালনের প্রশ্নও আজ ইহার সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

বিপ্লবী অভিনন্দন সহ

৩০ মার্চ ১৯৫১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র

'স্বাধীনতা'র চরম সংকট

'স্বাধীনতা'র আর্থিক সংকটের কথা বারে বারে স্বাধীনতার পাঠক, অনুগ্রাহক, কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ও দরদীদের জানানো হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু সাড়া আমরা পাই নাই। এমন কি স্বাধীনভাবে এজেন্টদের নিকটে যে কয়েক হাজার টাকা পাওনা আছে, সেই টাকাটাও উদ্যোগী হইয়া আমাদের কমরেডরা উসুল করিয়া পাঠান নাই। নির্বাচনের খরচ, পার্টি তহবিল ও স্বাধীনতার জন্য আমরা চার লক্ষ টাকার আবেদন করিয়াছি। আমাদের এই তহবিল যে ভরিয়া উঠিবে এই বিশ্বাস আমাদের আছে। কিন্তু টাকা তেমন জোরের সহিত এখনো আসা শুরু হয় নাই। "স্বাধীনতা" যে ঘাটতিতে চলে এ কথা আমরা সকলকে জানাইয়াছি এবং ঘাটতিতেই স্বাধীনতার মতো কাগজ চলিবে। বর্তমান সময়ে স্বাধীনতা চরম অর্থ-সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। শত চেষ্টা করিয়াও আমরা এই সংকট কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমরা খুবই বিপদে পড়িয়াছি। যে-কোন দিন স্বাধীনতা বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। আমাদের কমরেডরা আমাদের উৎসাহিত করিয়া পত্র লিখিতেছেন যে, স্বাধীনতাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। কিন্তু টাকা ছাড়া যে স্বাধীনতা বাঁচিতে পারে না এ কথা কেহ বুঝিতেছেন না।

নির্বাচন আসিয়া পড়িয়াছে। এই সময়ে স্বাধীনতা বন্ধ হইলে আমাদের দারুণ ক্ষতি হইবে জানি, তবুও আমরা নিরুপায়। এখনই আমাদের তহবিলে ১৮/২০ হাজার টাকা না আসিলে আমরা কিছুতেই কাগজ চালাইতে পারিব না। স্বাধীনতা পরের প্রেসে ছাপা হইতেছে। এই পরের প্রেসে [ছাপাও] আমাদের দুর্ভাগ্যের একটি কারণ।

যদি টাকা আসিয়া যায়, তবে 'স্বাধীনতা' চালু থাকিবে, টাকা না আসিলে তাহা আপাতত বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু এই বন্ধ হওয়া শেষ বন্ধ হওয়া নয়। আমাদের চার লাখ টাকার তহবিলে যথেষ্ট টাকা আসিলে আমরা আবারও কাগজ বাহির করিব।

'স্বাধীনতা', ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৫১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির

পার্টির নীতি ও কাজের মধ্যে যেন কোনরকম হঠকারিতা প্রকাশ না পায়

পি.ও.সি. নোট নং ২৩

সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্ট সংশোধিত ফৌজদারী আইনের (১৯০৮) ১৬ ধারাকে বেআইনি বলে ঘোষণা করায় পশ্চিমবঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টি এখন আর বেআইনি নয়। সুতরাং এখন পার্টির নামে মিছিল, সমাবেশ ইত্যাদি সর্বত্র করতে হবে, শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্য জনতাকে হাজারে হাজারে এই সমস্ত সমাবেশে আনতে হবে, নতুনভাবে পার্টির প্রচারকে ব্যাপক করে তুলতে হবে। সেজন্য প্রকাশ্য পার্টি অফিস খোলার ব্যবস্থা করতে হবে, পার্টিব পতাকা তুলতে হবে।

এই সমস্ত মিছিল ও সমাবেশ করার সময় মনে রাখতে হবে যে, পার্টি আইনি হলেও পার্টির গোপন কাজের প্রয়োজনীয়তা মোটেই শেষ হয়ে যায়নি, সমস্ত গোপন কর্মীকে গোপন কেন্দ্র থেকে এখনি বের করে আনা চলবে না।

আরো লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সভা-মিছিলে অনর্থক উত্তেজনাকর শ্লোগান বা বক্তৃতা দেওয়া না হয়। "নেহরু সরকার কুত্তা হ্যায়", "কংগ্রেস গভর্নমেন্ট খুনী গভর্নমেণ্ট" ইত্যাদি শ্লোগানের পরিবর্তে এমন শ্লোগান দিতে হবে যাতে কংগ্রেস গভর্নমেন্টের জনস্বার্থ-বিরোধী নীতি ও কাজের যথার্থ নিন্দা ও সমালোচনা প্রকাশ পায় এবং যার ফলে জনতা গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে যায় ও পার্টির দিকে এগিয়ে আসে। এইসব শ্লোগানের মধ্যে থাকবে—ব্রিটিশ কমনওয়েলথ বা সাম্রাজ্য ছাড়ার দাবি, অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বন্দী মুক্তির দাবি, যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির শিবিরে যোগদানের দাবি, জনগণের জন্য খাদ্যের দাবি ইত্যাদি। আমাদের নীতি ও কাজের মধ্যে যেন কোন রকম হঠকারিতা প্রকাশ না পায়।

বিপ্লবী অভিবাদন

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

১১ জানুয়ারি ১৯৫১

টিকা : পি.ও.সি. নোটের কোন শিরোনাম না থাকায়, বর্তমান শিরোনামটি এই গ্রন্থ সিরিজের সম্পাদকদ্বয় দিয়েছেন— সম্পাদক।

২৬শে জানুয়ারি 'স্বাধীনতা দিবস' পালন করুন!

পি.ও.সি. জরুরী নোট ৩/৫১

২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস।

কংগ্রেস নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার পর হইতে এই দিবসের সংগ্রামী ঐতিহ্য জন-সাধারণের মন হইতে মুছিয়া দিবার জন্য কংগ্রেস নেতারা চেষ্টা করে। ২৬শে জানুয়ারির বদলে কলংকময় ১৫ই অগস্টকেই তাহারা স্বাধীনতা দিবস বলিয়া ঘোষণা করে।

ভারতের অগণিত মানুষের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ও বলিদান এই দিবসের সহিত বিজড়িত। ভারত স্বাধীন হয় নাই। ভারতের উপর ঔপনিবেশিক দাসত্ব আজও কায়েম রহিয়াছে। কংগ্রেস নেতারা স্বাধীনতা দিবসের প্রতিটি সংকল্পের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে।

স্বাধীনতা দিবসকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐক্য ও শান্তি দিবস হিসাবে উদ্‌যাপিত করিতে হইবে। জনসাধারণের নিকট মুক্তি-সংগ্রামের আহ্বান পৌঁছাইয়া দিয়া সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সমস্ত শ্রেণি, দল, প্রতিষ্ঠান, গ্রুপ ও ব্যক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হইয়া বিরাট জাতীয় ফ্রন্ট গঠন করিবার জন্য আহ্বান জানাইতে হইবে। এই সমস্ত দল-প্রতিষ্ঠান-গ্রুপের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবেই এই দিবস পালন করিবার জন্য সর্বত্র চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন।

সর্বত্র সকল গণতান্ত্রিক শক্তি সমূহের সহযোগিতায় মিলিতভাবে সভা ও শোভাযাত্রা করুন।

অভিনন্দনসহ

১৭ জানুয়ারি ১৯৫১ — পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

টিকা : ১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যরাত্রে লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশন থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়েছিল। এরই কিছুদিন পরে ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি তারিখটি স্বাধীনতা দিবস রূপে উদযাপিত হয়। এই দিন প্রতিটি জনসভায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। একবছর পর ১৯৩১ সালের ২৬ জানুয়ারি সুভাষচন্দ্র বসু, যিনি তখন মেয়র ছিলেন, কলকাতা কর্পোরেশন থেকে বিরাট মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এর পর থেকেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ২৬ জানুয়ারি দিনটি স্বাধীনতা দিবস হিসাবে উদ্‌যাপিত হয়েছিল। তাই ২৬ জানুয়ারির বদলে ১৫ অগষ্টকে কংগ্রেসের তরফ থেকে স্বাধীনতা দিবস বলে ঘোষণা করাকে কমিউনিস্ট পার্টি মনে করেছিল এ হল কংগ্রেস নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা। (—সম্পাদক)

নিবর্তনমূলক আটক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন সম্পর্কে

পি.বি. সার্কুলার নং ১/৫১

প্রিয় কমরেডগণ,

নিবর্তনমূলক আটক আইন (সংশোধন) বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনের উপর আমরা প্রেসে যে বিবৃতি-প্রকাশের জন্য দিতেছি তাহার নকল এই সাথে পাঠাইতেছি। ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য ব্যাপক ভিত্তিতে গণ-আন্দোলনের জন্য ইহাকে ভিত্তি করিতে আমরা আপনাদের অনুরোধ করি। যেমন, বিবৃতিই পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে, আমরা সংকীর্ণভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতা চাহিতেছি না, কংগ্রেস এবং তাহার সরকারকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য বামপন্থী এবং গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সাথে হাত মিলাইতে ব্যক্তি স্বাধীনতা চাই। বামপন্থী দলসমূহ, অন্য সকল রাজনৈতিক পার্টির কর্মী সাধারণ এবং অদলীয় গণতান্ত্রিক মানুষ ও ব্যক্তি স্বাধীনতার পূজারিদের সমাবেশ করিতে ইহাই স্বাভাবিকভাবে আমাদিগকে সক্ষম করিবে। লক্ষণ এখনই দেখা যাইতেছে যে, প্রতিষ্ঠাবান আইনজীবী এবং সাংবাদিকরা সাধারণভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতা দমনের বিরুদ্ধে এবং বিশেষ করিয়া এই আইনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেছেন। স্বয়ং রাজাজীকেই কলিকাতার ৩০ জন বিশিষ্ট আইনজীবীর বিবৃতি উল্লেখ করিতে হইয়াছিল। সন্দেহ নাই যে যদি ঠিকভাবে আহ্বান করা যায়, তাহা হইলে ঐরকম প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণকে দিয়া বিবৃতি প্রকাশ, জনসভায় সভাপতিত্ব করান ও বক্তৃতা দেওয়ান এবং অন্যভাবে এই বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করান যায়। অনুরূপভাবে, সমস্ত বামপন্থীদলসমূহ, গ্রুপগুলি এবং সংগঠনগুলিকে এই আন্দোলনে সমাবেশ করা যায়। ইহা এমনই সু-সংগঠিত আন্দোলন যাহাকে গভর্নমেন্ট সর্বাপেক্ষা বেশি ভয় করে যে জন্য রাজাজী স্বয়ং জন-অভিমতের অ-কমিউনিস্ট নেতাদের নিকট আবেদনে কমিউনিস্টগণ কর্তৃক সংগঠিত সভায় সভাপতিত্ব না করিতে বা বক্তৃতা না দিতে বলিয়াছিলেন।

যেহেতু বিভিন্ন প্রদেশের অবস্থা পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র সেইহেতু কীভাবে এই আন্দোলন চলিবে তাহার কোন নির্দিষ্ট নির্দেশ আমরা দিতেছি না। আমরা আশা করি যে, পি.সি. এবং ডি.সি'রা নিজেদের বাস্তব পরিকল্পনা করিবেন। আমরা অবশ্য আপনাদের বিবেচনা করিতে প্রস্তাব করিব—

১। যথাসম্ভব বেশি সংগঠনের যুক্ত-আহ্বানে আটক-বিল-বিরোধী দিবস পালন। (সর্বভারতীয় দিবস নির্ধারণের প্রস্তাব লইয়া আমরা এ-আই-টি-ইউ-সি এবং এ-আই-এস-এফ'এর সহিত সংযোগ স্থাপন করিতেছি। প্রাদেশিক সংগঠনগুলির সহিত আলোচনা করিয়া

আপনারাও তাহা করিতে পারেন।)

২। নিবর্তনমূলক আটক বিলের বিরুদ্ধে যুক্ত অভিযানে হাত মিলাইতে পার্টির পক্ষ হইতে আনুমানিকভাবে, গণসংগঠনগুলির মারফৎ এবং ব্যক্তিগতভাবেও সমস্ত বামপন্থীদল ও নেতৃবৃন্দের নিকট যান। বিবৃতি প্রকাশ করিতে, জনসভায় আসিতে এবং বক্তৃতা দিতে, মিছিলে অংশগ্রহণ করিতে তাঁহাদের নিকট প্রস্তাব করিতে হইবে।

৩। দিবস পালনের পরবর্তী কাজকে সফল করিতে এই বিলের প্রত্যাহার প্রভৃতির জন্য আটক-বিল-বিরোধী অথবা ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটিসমূহ গঠন।

৪। সীমাহীন প্রতিবাদ চিহ্নিত করিতে গণ-স্বাক্ষর সংগ্রহ, এ বিষয়ে সম্ভাব্য ব্যাপক প্রচার সংগঠিত করিতে হইবে।

৫। পার্লামেন্টের সকল সদস্যকে ব্যক্তিগতভাবে অথবা চিঠি লিখিয়া এই বিলের বিরুদ্ধতা করিতে আহ্বান করুন। অনুরূপভাবে, জন-নিরাপত্তা আইন প্রত্যাহার, আটক বন্দীদের মুক্তি প্রভৃতি দাবি করিয়া রাজ্য আইন পরিষদের সমস্ত সদস্যের নিকট উপস্থিত হউন। (যেহেতু সমস্ত আইন সভায় এখন বাজেট অধিবেশন হইতেছে, এই বিষয়টি উত্থাপনের জন্য ইহাই ছাঁটাই প্রস্তাব উপস্থিত অথবা সমর্থন করার রূপ লইতে পারে)।

৬। পার্লামেণ্ট এবং রাজ্য-পরিষদের যে-সকল সভ্য এই বিল প্রত্যাহার এবং সাধারণের অন্যান্য গণতান্ত্রিক দাবির বিরুদ্ধতা করে তাহাদের মুখোশ খুলিয়া দিবার জন্য সমস্ত গণতান্ত্রিক সংবাদপত্রসমূহকে (দৈনিক ও সাপ্তাহিক) 'ফিচার' (feature) শুরু করিতে সম্মত করান। এই বিলের ধারাসমূহকে সরাসরি নিন্দা করিয়া সম্পাদকীয় ও প্রবন্ধ লিখিতে এই পত্রিকাগুলিকে বলিতে হইবে। যদি পার্টি তাহার সহস্র সহস্র সহানুভূতিশীলগণসহ এই আন্দোলনে সমাবিষ্ট না হয় তাহা হইলে এম-পি এবং রাজ্য-পরিষদের সভ্যদের উপর চাপ দিবার এই এবং অন্যসকল ব্যবস্তা স্বভাবতই ফলপ্রসূ হইবে না। আমরা প্রত্যেক পার্টিসভ্য এবং সমর্থককে উপলব্ধি করিতে অনুরোধ করিব যে, উচ্চস্তরের সংগ্রামের প্রশ্নে শেষ সিদ্ধান্ত যাহাই হউক না কেন, গণতান্ত্রিক জন-অভিমতের এই ব্যাপক গণ-সমাবেশ অবশ্য-প্রয়োজনীয় এবং সংগ্রামের আশু স্তর, যাহা ছাড়া কোন উচ্চস্তরের সংগ্রাম, যাহাই আমরা গ্রহণ করি, নিষ্ফল হইবে। কারণ, জনতা যে-সকল বিষয়ে এখনই একতাবদ্ধ তাহার জন্য তাহাদের সমাবেশ করিতে কেবলমাত্র যদি পার্টি উদ্যোগ নেয়, তাহা হইলে কংগ্রেস এবং তাহাব গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অসন্তোষকে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র এবং বড় বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অভ্যুত্থানে উন্নত করা যায়।

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১

'তেলেঙ্গানা বন্দীদের প্রাণদণ্ড রহিত কর'

(১) *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিবৃতি*

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন।

সুপ্রীম কোর্টে তেলেঙ্গানার বারজন বীর কৃষকের আবেদন নাকচ করিয়া তাদের প্রতি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা বহাল রাখায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছে। ভারতের যেসব দেশপ্রেমিক ও মানবতাবোধসম্পন্ন মানুষ এই মামলার বিষয় জানিতেন, তাহাদের প্রত্যেকেই চাহিয়াছিলেন যে এই মামলাটির বিচার করা হউক প্রকৃত সামাজিক ন্যায় ধর্মের ভিত্তিতে। অথচ আইনের তুচ্ছ অজুহাতে ভারত সরকার যে এই দণ্ডাদেশ বহাল রাখিলেন তাহার অপেক্ষা বেশি উদাসীনতা আর কিছুই হইতে পারে না।

এমনকি আইনসঙ্গত বিবেচনার দিক হইতেও দেখা যায় নিম্ন আদালতে মামলা চলাকালীন অপরাধীগণকে আইনের সুযোগ সুবিধাও দেওয়া হয় নাই বলিয়া সুপ্রীম কোর্ট যে মৃদু ভর্ৎসনা করিয়াছেন, তাহা খুবই গুরুতর এবং ইহা মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করিবারই সমর্থন বিশেষ। সামাজিক ন্যায় বিচার ও স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট আমাদের পার্টি আবেদন জানাইতেছে যে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রত্যাহারের সংখ্যাতীত দাবি তাহারা ভারত রিপাবলিকের রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করুন। এই বারজন বীরের মহান আত্মত্যাগ ও সাহস দেশের হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে প্রেরণা দিবে। এই বীর বন্দীদের নিকট পার্টি শপথ করিতেছে যে, যে আদর্শের জন্য তাঁহারা সর্বস্ব ত্যাগ করিতেছেন, সেই মহান আদর্শ জয়লাভ না করা পর্যন্ত পার্টির বিরাম নাই।

স্বাধীনতা, ২৪ মার্চ ১৯৫১

(২) *বি.পি.টি.ইউ.সি'র দাবি'*

গত ২২শে মার্চ বি.পি.টি.ইউ.সি. জেনারেল কাউন্সিলের বর্দ্ধিত সভায় নিম্ন মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে : তেলেঙ্গানার বার জন বীর কৃষকের মৃত্যুদণ্ডে সভা গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে এবং তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছে। সুপ্রীম কোর্টে উহাদের বিচারে নিয়ম লংঘনের কথা স্বীকার করিয়াছেন। অথচ বিচারের আপিল গ্রহণে অক্ষমতা জানাইয়াছেন। ইহাতে ভারতের শাসনতন্ত্রের তথাকথিত গণতান্ত্রিক প্রকৃতিই প্রমাণিত হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদ ও উহার তল্পীদার নিজাম, দেশমুখ, রাজাকারদের বিরুদ্ধে জমি ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামী এই বীর কৃষকদের

ফাঁসিতে হত্যা করিলে জাতীয় অপমান হইবে। সভা বি.পি.টি.ইউ.সি'র অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ইউনিয়নকে বাংলার অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংগঠন ও পার্টিকে এবং স্বাধীনতাকামী জগণকে ইহাদের ফাঁসি হইতে রক্ষার দাবিতে রাজ্য-জোড়া আন্দোলন গড়িতে অনুরোধ করেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি যাহাতে নিজামকে এই বীর বন্দীদের প্রাণদণ্ড রদ করিতে এবং অবিলম্বে মুক্তি দিতে পরামর্শ দেন সেজন্য অনুরোধ জানানো হইতেছে।

স্বাধীনতা, ২৬ মার্চ ১৯৫১

(৩) *পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভার আবেদন*

"নিখিল ভারত কৃষক দিবস" পালন করুন!
দমন নীতির প্রতিবাদ করুন!!

১৯৪৩ সালের ২৯শে মার্চ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী জহ্লাদ শাসকরা কাসাগারোড তালুকস্থ কায়ুরের ৪ জন বীর কৃষক সন্তান—আপ্পু, কুন্হাম্বু নায়ার, চিরুকন্দন এবং আবুবাকেরকে ফাঁসি দিয়া হত্যা করে। নিখিল ভারত কৃষক সভা এই শহিদের স্মরণে প্রতি বৎসর ২৯শে মার্চ নিখিল ভারত কৃষক দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত করে।

কংগ্রেসী সরকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বর্বর দমননীতি অনুসরণ করে চলেছে,—আরও কঠোর দমননীতি চলছে এই কংগ্রেসী আমলে। তাই, ২৯শে মার্চ দমননীতি-বিরোধী-দিবস হিসাবে পালনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ কৃষক সভা সমস্ত কৃষক ও জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাচ্ছে।

এই সাড়ে তিন বৎসরের কংগ্রেসী শাসনে পুলিশের গুলি-লাঠিতে বহু মজুর-কৃষক-মধ্যবিত্ত-মহিলা-শিশুকে হত্যা করা হয়েছে; বিনা বিচারে আটক, বেপরোয়া গ্রেপ্তার করে জেল ভর্তি করা হয়েছে। গ্রামে গ্রামে এখনও পুলিশ ক্যাম্প রয়েছে, সভা-সমিতি করার অধিকার হরণ করে—ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করে চলেছে এই সরকার। এখনও গ্রামে কৃষক ও সাধারণ লোককে গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে,—সেদিন উত্তরপাড়ায় পুলিশের গুলিতে মরেছেন একজন মজুর ও একজন সাধারণ নাগরিক। গত ২২শে ফেব্রুয়ারি মাদুরার জনপ্রিয় নেতা বীর মজুর সন্তান বালুস্বামীকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে হত্যা করা হল।.... তেলেঙ্গানার বারজন বীর কৃষক সন্তানকে যে-কোন মুহূর্তে ফাঁসি দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

এই বর্বর দমননীতি বন্ধ করতে হবে, তেলেঙ্গানার বীর কৃষক সন্তানদের ফাঁসি রদ করতে হবে—এই দাবি তুলে সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী দৃঢ় আওয়াজে ব্যাপক জনতাকে সমাবেশ করতে হবে এই দিবসে—তবেই কায়ুর শহিদদের প্রকৃত সম্মান দেওয়া হবে। তাই সমস্ত গণতান্ত্রিক দল ও গণসংগঠনগুলির সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিম্নলিখিতভাবে এই দিবসটি পালনের জন্য সমস্ত কৃষক সভার কর্মী ও কৃষক সমিতিকে আহ্বান জানাচ্ছি :

১। প্রত্যেক এলাকায় সভা, শোভাযাত্রা, পোষ্টার, ইস্তাহার মারফৎ ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা।

২। সভা, বৈঠকে নিম্ন বিষয়ে প্রস্তাব পাস করতে হবে :

(ক) কাইয়ুর শহীদ স্মরণে, (খ) বালুস্বামী স্মরণে ও উত্তরপাড়ায় শ্রমিক নেতা ও অপর একজন নাগরিকের হত্যার প্রতিবাদে, (গ) দমননীতির বিরুদ্ধে, ব্যক্তি স্বাধীনতা কায়েম করার জন্য, (ঘ) তেলেঙ্গানার বন্দীদের ফাঁসি রদের দাবি।

৩। ঐ দিবসে সভা ও বৈঠকে তেলেঙ্গানার বন্দীদের ফাঁসি রদের দাবির আন্দোলনকে আরও সংগঠিতরূপে পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা করা ও ঐ জন্য সর্বসাধারণের নির্বাচিত কমিটি গঠন করা।

৪। গণ-সহি সংগ্রহ ও অর্থ আদায়।

কাইয়ুর শহিদ জিন্দাবাদ
তেলেঙ্গানার কৃষক সন্তানদের ফাঁসি দেওয়া চলবে না
ব্যক্তি স্বাধীনতা কায়েম কর
অত্যাচারী পুলিশের শাস্তি চাই

২০ মার্চ ১৯৫১

টিকা : (১) হায়দরাবাদের এই ১২ জন বীর কৃষক নেতা নিজামের সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে জমির সংগ্রামে নেমেছিলেন। নিজামের বে-সরকারি সশস্ত্র রাজাকার বাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁরা সংগ্রাম করেছিলেন নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে।

(২) হায়দরাবাদ হাইকোর্টে এঁদের বিচার হয়েছিল এবং ফাঁসির হুকুম ধার্য হয়েছিল।

(৩) বিশ্ববিখ্যাত আইনজীবী ডি. এন. প্রিট্ মিলিটারী শাসন কর্তৃত্বের অধীনে এই বিচার সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে এইরূপ সাক্ষ্যসাবুদে একটা মাছিকেও ফাঁসি দেওয়া যায় না।

(৪) ১৯৫০ সালে কলকাতা রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর সভাপতি অধ্যাপক রামশর্মা বলেছিলেন হায়দরাবাদের তদানীন্তন হাইকোর্ট শাসনতান্ত্রিক বিচারে ছিল অবৈধ।

(৫) ভারতের সুপ্রীম কোর্ট এই ১২ জন কৃষক নেতার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা রহিতের আবেদন অগ্রাহ্য করেছিল। তবে তাদের রায়ে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল যে বন্দীরা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পায়নি।

(৬) শেষ পর্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রপতি এই ১২ জনের ফাঁসির হুকুম রদ করে দিয়েছিলেন। (—সম্পাদক)

কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ প্রভৃতির আটক কাল বৃদ্ধি : বক্সা বন্দী শিবিরে আরও বন্দী প্রেরণের তোড়জোড়

জানা গেল, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, সতীশ পাকড়াশী, আবদুর রেজ্জাক খাঁ, কমল সরকার প্রভৃতি ৫৩ জন বন্দীর আটককাল এক বৎসর বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

জানা গেল বক্সা ক্যাম্প তুলিয়া দেবার বদলে কর্তৃপক্ষ আরও বন্দী প্রেরণ করার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই ডেটিনুয়ের ব্যারাকগুলি বসবাসের জন্য উপযুক্ত করার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে। কয়েদী ব্যারাকে আরও কয়েদী আনা হইয়াছে।

বক্সায় বর্তমানে ছাব্বিশজন বন্দী আছেন।

'পুলিশ কমিশনারের হুকুমনামা ব্যক্তি স্বাধীনতার মূলে আঘাত করিয়াছে ঃ লাউড-স্পীকার প্রভৃতি ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে নেতৃবৃন্দের যুক্ত বিবৃতি'

কলিকাতা, ১১ই এপ্রিল—প্রমোদ সেনগুপ্ত (পশ্চিমবঙ্গ ব্যক্তিস্বাধীনতা কমিটি), রঙ্গীন সেন (এস. ইউ. সি), প্রমোদ দাশগুপ্ত (কমিউনিস্ট পার্টি), নির্মল মুখার্জি (বলশেভিক পার্টি), নমিতা সেন (ডবলিউ. সি. এ), নির্মল ঘোষ (আই. পি. টি. এ), অজিত ঘোষ (বি. পি. টি. ইউ. সি), তাপস সেন (প্রোগ্রেসিভ কালচার অ্যাসোসিয়েশন), মণীন্দ্র বসু (ডেমোক্রাটিক ভ্যানগার্ড), সুকোমল দাশগুপ্ত (এস. ইউ. সি. ছাত্র শাখা) ও বিকাশ বসু (ডেমোক্রাটিক ভ্যান গার্ড ছাত্র শাখা) লাউডস্পীকার, মাইক, চোং প্রভৃতি ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন।

... আজ খাদ্য-বস্ত্রের অভাবে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন দুর্বিসহ হইয়া উঠিয়াছে, লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা পুনর্বসতির কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। বেকার সমস্যা, চোরাকারবারী, দুর্মূল্যতা বাড়িয়াই চলিয়েছে, সরকার কোন সমস্যারই সমাধান করিতেছেন না। এই সব কারণে জনসাধারণের অসন্তোষ ক্রমশ বাড়িয়াই চলিয়াছে। পুলিশ কমিশনারের এই নিষেধাজ্ঞা যে জনসাধারণের এই ন্যায়সঙ্গত অসন্তোষের কণ্ঠরোধ করিবার জন্যই জারি করা হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই স্বৈরাচারী নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে সম্মিলিত আন্দোলন আরম্ভ করিতে হইবে এবং আমাদের মৌলিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ...।

'কংগ্রেস ফ্যাসিস্ট নীতির দিকে ধাবিত হইতেছে ঃ আমেদাবাদের ৬ জন কংগ্রেস কর্মীর উক্তি'

১০ই এপ্রিল, কোন কংগ্রেস কর্মী কর্তৃক কংগ্রেস সরকার এবং কংগ্রেসের সমালোচনা

করিলে তাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা লওয়া হইবে বলিয়া যে প্রস্তাব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গ্রহণ করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ করিয়া আমেদাবাদের ৬ জন কংগ্রেস কর্মী কংগ্রেস সভাপতির নিকট একটি পত্র লিখিয়াছেন।

প্রকাশ, এই চিঠিতে বলা হইয়াছে যে, কংগ্রেস ফ্যাসিস্ট নীতির দিকে ধাবিত হইতেছে এবং যে জনসাধারণের দুঃখ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাদের নিকট হইতে কংগ্রেস সরিয়া যাইতেছে। কংগ্রেস কর্তৃক সমালোচনা সহ্য না করার এই নীতি কংগ্রেস সংগঠনকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে।

স্বাধীনতা, ১২ এপ্রিল ১৯৫১

'ধ্বংসের পথে কংগ্রেস'
(কিছু কিছু অংশ উল্লেখ করা হল)

ভারতের বৃহত্তম সংগঠন ছিল কংগ্রেস। সে কংগ্রেস আজ বালির বাঁধের মতো ঝর ঝর করিয়া ভাঙ্গিয়া গুড়া হইয়া যাইতেছে। আসন্ন নির্বাচনের মুখে নেতৃবৃন্দ তাই কোন প্রকারে জোড়াতালি দিয়া ঘর সামলাইতে অতি বেশি সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটির সাম্প্রতিক দিল্লি অধিবেশন সে সচেষ্টতার একটি ব্যর্থ প্রকাশ মাত্র।

হাওড়া, আরামবাগ, দমদম, মালদহ প্রভৃতি নির্বাচনগুলি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, কংগ্রেস আজ জনসাধারণ হইতে কত দূরে সরিয়া গিয়াছে। কংগ্রেস পদতল হইতে যে প্রচণ্ডবেগে মাটি ধ্বসিয়া যাইতেছে, আগামী নির্বাচনের কথা মনে করিয়া কংগ্রেস নেতৃত্বও এ সত্য আর উপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না। কংগ্রেস আজ আতংকিত, ওয়ার্কিং কমিটি দিল্লি অধিবেশনের প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তে সে আতংক নিষ্ঠুরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কংগ্রেসের মধ্যে উপদল গঠন বেআইনি ঘোষণা করিয়া কংগ্রেস গভর্ণমেন্টের প্রকাশ্য সমালোচনা করা নিষিদ্ধ করিয়া ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেসের ভাঙ্গা ঘর জোড়া দেবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কিসের উপর দাঁড়াইয়া, কাহাদের লইয়া এই জোড়াতালি চলিবে? সে বালির বাঁধ ধ্বসিতে শুরু করিয়াছে। সাধ্য নাই শত ডিক্টেটরী শৃঙ্খলার হুমকিতে তাহা রোধ করে।

যাহারা ইতিমধ্যে কংগ্রেস পরিত্যাগ করিয়া বিরোধী দল গঠন করিয়াছেন, তাহাদের আবার কংগ্রেসে ভিড়াইবার সব চেষ্টাই প্রায় ব্যর্থ হইয়াছে।.......কংগ্রেসের অনাচার, দুর্নীতি হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এই ধরনের কংগ্রেস পরিত্যাগের উদাহরণ যেকোন প্রদেশ, যেকোন জেলা হইতেই শত শত মিলিবে।

আর যাহারা জনসাধারণ হইতে বিচ্যুত, সাম্প্রতিক নির্বাচনে পরাজিত, ভাঙনের পর ভাঙনে সঙ্কুচিত এই কংগ্রেসে এখনো টিকিয়া আছেন, তাঁহাদেরও অধিকাংশ কংগ্রেসী অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছেন।......তাই ওয়ার্কিং কমিটি মরিয়া হইয়াই শৃঙ্খলারক্ষার নামে কংগ্রেসের মধ্যে কংগ্রেসী শাসনের সমালোচনাও নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও কি কংগ্রেসের এই ভাঙন রুদ্ধ হইবে?

কংগ্রেসের আজ এই দুরবস্থা কেন? কংগ্রেসী পত্রিকা 'যুগান্তর'-এর সম্পাদকীয় হইতেই তাহার কিছু জবাব মিলিবে : "বিগত সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস যে ইস্তাহার প্রচার

করিয়াছিলেন, দেশের শাসনভার গ্রহণ করার পরে তাহার অধিকাংশই কার্যকরী হয় নাই। কার্যকরী হওয়া দূরে থাকুক, সেদিকে চেষ্টাও বিশেষ কিছু অগ্রসর হয় নাই।.....কংগ্রেস যদি তাহাদের নির্বাচনী ইস্তাহার অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য কিছুদূর অগ্রসর হইবার আগ্রহ বা আন্তরিকতা প্রদর্শন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে হয়তো এইরূপ অবস্থা ঘটিত না।"

কংগ্রেসী সরকার যে দেশবাসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহাদের নিজস্ব নির্বাচন ইস্তাহারকে কিভাবে পদদলিত করিয়াছেন, গত সাড়ে তিন বৎসরের তিক্ত অভিজ্ঞতায় জনসাধারণ তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছেন। মাউন্টব্যাটেনী স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়া কংগ্রেসী নেতৃত্ব দেশের জাতীয় স্বার্থ সাম্রাজ্যবাদের হাতে বিকাইয়া দেয়। ...সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষা করা এবং নির্বাচনী ইস্তাহার কার্যকরী করা একসঙ্গে চলিতে পারে না। কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষা করার পথ বাছিয়া লয়। নির্বাচনী ইস্তাহার স্বভাবতই অগ্রাহ্য হয়।

ফলে কংগ্রেসী শাসন সাম্রাজ্যবাদ, টাটা-বিড়লা ও জমিদারদের স্বার্থ ব্যতীত দেশের আর কোন শ্রেণির স্বার্থরক্ষা করে নাই। অন্ন, বস্ত্র, জমি, চাকুরি, বাসস্থান, শিল্প প্রসারের কোন সমস্যারই সমাধান কংগ্রেসী শাসনে মিলে নাই। তাই আজ ভারতের জনসাধারণ যত বেশি বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মাউন্টব্যাটেনী "স্বাধীনতা"র শৃঙ্খল মোচন করিতে, কংগ্রেসের নিজ ঘরেও অন্তর্দ্বন্দ্ব ততই তীব্র রূপ ধারণ করিতেছে।..... বিরোধী দলগুলির উপর দমননীতি চালাইয়া শত শত বিরোধী পক্ষকে কারারুদ্ধ রাখিয়া, —সভা-সমিতি, মাইক ব্যবহার প্রভৃতি নিষিদ্ধ করিয়া আগামী নির্বাচন জিতিবার ষড়যন্ত্র চালাইতে হইতেছে। আর শৃঙ্খলার নামে নিজ দলে স্বৈরাচারী নেতৃত্ব কায়েম করিতে হইতেছে।

কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির নিষেধাজ্ঞা আর শৃঙ্খলার হুমকি—কিছুই সাম্রাজ্যবাদ তোষণকারী কংগ্রেসের অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয় রোধ করিতে পারিবে না। কংগ্রেসের একমাত্র ভরসা আজ দমননীতি, তাহারই সাহায্যে আগামী নির্বাচনে বিরোধী দলগুলিকে সে পরাজিত করিবার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু সংকুচিত, অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত দ্বিধাবিভক্ত কংগ্রেস ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জনতার প্রবল শক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া কতদিন দমননীতি চালাইতে সক্ষম হইবে? ...কংগ্রেসের দুর্নীতি, সাম্রাজ্যবাদ-তোষণ, বিশ্বাসঘাতকতা, অনাচার যাঁহারা ব্যর্থ করিতে চান, তাঁহাদের সকলের ব্যাপক সম্মিলিত অভিযান আজ দেশের স্বার্থ দাবি করে।

১২ এপ্রিল, ১৯৫১ — স্বাধীনতার 'সম্পাদকীয়'

টিকা : 'স্বাধীনতা' পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে না পারার জন্য, তথ্যসূত্র ১২তে সমীর দাশগুপ্তের বইয়ের পৃ. ১৯৭-৯৮ থেকে এই সম্পাদকীয়টি নেওয়া হয়েছে। এতে কিছু কিছু অংশ অনুল্লেখ রয়েছে।—সম্পাদক

কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বান

বস্ত্র সংকট ও অন্যান্য দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলুন

জরুরী নোট ৭/৫১

বর্তমানে যে দারুণ বস্ত্র সংকট চলেছে তার অন্যতম প্রধান শিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে মজুর শ্রেণি। একে তো বাজারে কাপড়ের দাম অসম্ভব রকম বেশি তার ওপর লাইনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়েও ব্যর্থ মনোরথ হতে হচ্ছে প্রত্যেককেই। শ্রমিকের একে অর্থ নেই তার ওপর নেই সময়। সুতরাং মিল-কারখানা থেকে কাজ করে এসে তাদের পক্ষে কাপড়ের দোকানে লাইনে দাঁড়িয়ে কাপড় কেনা প্রায় অসম্ভব। অনেক ইউনিয়ন এরই মধ্যে "কোম্পানী কাপড়ের দোকান খুলুক ও সস্তায় কাপড় দিক"—এই ধ্বনি তুলেছে ও শ্রমিক সাধারণের সাড়া পাচ্ছে। বর্তমানে প্রত্যেক ইউনিয়ন থেকে খাদ্য ও বস্ত্রের উপর সভা-সমিতি করা প্রয়োজন। সভা-শোভাযাত্রায় নিম্নলিখিত দাবি তোলা দরকার। তার ভিত্তিতে ডেপুটেশন ইত্যাদি ও ব্যাপক আন্দোলন, গণ-সমাবেশ প্রভৃতি করা দরকার।

● সপ্তাহে পুরা ৪ সের রেশন দিতে হবে শ্রমিক ও তার পরিবারের জন্য অতিরিক্ত দিতে হবে কায়িক পরিশ্রমের জন্য।

● যতদিন ঐ পুরা রেশন না দেওয়া হচ্ছে ততদিন সেই পরিমাণ অন্য খাদ্য কিনতে যে অর্থের প্রয়োজন অতিরিক্ত মাগ্গী ভাতা হিসাবে তা দিতে হবে।

● পূর্বের ন্যায় শ্রমিক ও তার পরিবারকে সস্তায় রেশন দিতে হবে। অন্যথায় তাকে আরও অতিরিক্ত মাগ্গী ভাতা দিতে হবে।

● কোম্পানীকে কাপড়ের দোকান খুলতে হবে এবং প্রত্যেক মজুর ও তার পরিবারের আশু প্রয়োজন মত সস্তায় কাপড়ের ব্যবস্থা করতে হবে। সেইজন্য মালিককে সরকারের কাছ থেকে বিশেষ পারমিট নিতে হবে।

অবিলম্বে সর্বত্র এই দাবিগুলি তুলুন ও আন্দোলন গড়ে তুলুন।

২২ মার্চ ১৯৫১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

টিকা : শিরোনামটি সম্পাদকদ্বয়ের (—সম্পাদক)

নির্বাচনের পূর্বে জনতার কণ্ঠরোধ করাই শাসনতন্ত্র সংশোধনের একমাত্র উদ্দেশ্য: শ্রমিক নেতা মিরাজকর ও মৃণালকান্তি বসুর যুক্ত বিবৃতি

২৯শে মে কলিকাতা, প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র সংশোধন সম্পর্কে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহ-সভাপতি এস এম মিরাজকর এবং ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রী মৃণালকান্তি বসু এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন যে জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদকে প্রকাশ্যে অগ্রাহ্য করিয়া ভারত সরকার এমনিতেই প্রতিক্রিয়াশীল শাসনতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন করিতে চলিয়াছে। ইহার ফলে সীমাহীন ক্ষতি হইবে।

...তাঁহারা আরও বলেন যে কংগ্রেসী শাসন আজ এমনই দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছে যে তাহারা শতকরা মাত্র ১৩ জনের দ্বারা নির্বাচিত পরিষদ কর্তৃক রচিত শাসনতন্ত্রের অতি সংকুচিত অধিকারটুকু আসন্ন নির্বাচনের পূর্বেও সহ্য করিতে রাজি নহে।

জমিদারি বিলোপ আইন কার্যকরী করিয়া কৃষকদের সুবিধা করার জন্য শাসনতন্ত্র সংশোধন করা হইতেছে—এই ধাপ্পায় কেহই বিভ্রান্ত হইবেন না। ...সরকার যদি সত্যই জমিদারি প্রথায় উচ্ছেদ চাহিতেন তাহা হইলে বিহার, আসাম ও দক্ষিণ ভারতের স্থায়ী কৃষি সংকট এইরূপ ভয়াবহ রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিত না, ... 'বেশি খাদ্য ফলাও' এত প্রচার সত্ত্বেও খাদ্য উৎপাদন দিন দিন কমিয়া যাইত না।...

...সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে জনগণের আরও বেশি কণ্ঠরোধের মরিয়া প্রচেষ্টাই শাসনতন্ত্র সংশোধনের আসল কারণ। প্রাদেশিক নিরাপত্তা আইন, জরুরি প্রেস ক্ষমতা আইনের ৪ নং ধারা প্রভৃতি ঘৃণ্য আইনগুলির......যদি আজ প্রতিরোধ করা না যায় তাহা হইলে এট্‌লী ট্রুম্যান কোম্পানীর মত যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে সমস্ত সমালোচনা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। শ্রমিক ধর্মঘটে প্ররোচনা, জন নিরাপত্তা বিপদ প্রভৃতির অজুহাতে যে কোন শ্রমিক নেতাকে আটক করা হইবে। ...শত শত বার গুলিবর্ষণ ও বিনা বিচারে হাজার হাজার লোককে আটকের ফলে আজ ইহার অর্থ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

...বর্তমান শাসনতন্ত্রে কেবলমাত্র জমিদার ও পুঁজিপতিদের স্বার্থই রক্ষিত হইয়াছে। শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সদিচ্ছাই প্রকাশ করা হইয়াছে—তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য কোন ব্যবস্থাই ইহাতে নাই। প্রস্তাবিত সংশোধনের ফলে এই অবস্থা আরও খারাপ হইবে। নেহরু নীতির সমর্থক সংবাদপত্রের সম্পাদকরা যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন শ্রীনেহরু তাহাও প্রত্যাখ্যান করেন। ...ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে দেশ ছাইয়া যাইতেছে। ক্রমবর্ধমান

মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি এবং মজুরি ও মাগ্গীভাতা কমানোর ফলে শ্রমিক ও কৃষক জনতা ক্রমশই চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। কোচবিহারের মত গুলিবর্ষণই জনতার নিকট সরকারের একমাত্র জবাব। ...প্রস্তাবিত সংশোধন দ্বারা সরকার জনগণের বিরুদ্ধে নিজের স্বার্থকে সুরক্ষিত করিতে চায়।

পরিশেষে জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইয়া বলা হয় যে গণতন্ত্রকামী জনতার প্রত্যেকটি অংশ এই সংশোধনের নিন্দা করিয়াছে। আজ সকলের কর্তব্য হইতেছে ...ইহার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সৃষ্টি করা।

প্রস্তাবিত সংশোধন প্রত্যাহারের দাবিতে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক, ছাত্র, যুব ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের নিকট আমরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য আবেদন জানাইতেছি। সংশোধনের প্রস্তাব প্রত্যাহার ও জনগণকে পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা দিবার দাবিতে প্রতিবাদ সভা, শোভাযাত্রা প্রভৃতি সংগঠিত করুন। জনগণ যাহাতে তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য সংগ্রাম চালাইতে এবং আসন্ন নির্বাচনের সুযোগ পাইতে পারে তাহার জন্য সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের উপর বাধা নিষেধ প্রত্যাহার এবং ট্রেড ইউনিয়ন কৃষক ও অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মীদের উপর হইতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা উঠাইয়া লওয়ার দাবি করুন।

'স্বাধীনতা', ৩০ মে ১৯৫১

প্রাপ্তি স্বীকার : তথ্যসূত্র-১২, পৃ. ২৫৪

টিকা : ভারতের শাসনতন্ত্রের ওপর যে সংশোধন বিল আনা হয়েছিল, তার বিষয়বস্তু হল :—বাক্‌স্বাধীনতা, বিভিন্ন জীবিকা এবং ব্যবসায়ের অধিকার খর্ব করা এবং কোনও প্রদেশের বিভিন্ন জমিদারি বিচ্ছেদ বিল এবং জমিদার সম্পর্কিত আইনগুলিকে রক্ষা করা। (—সম্পাদক)

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ঘোষণা

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির শ্রীমতী লীলা মজুমদার, মঞ্জুশ্রী দেবী, গীতা মল্লিক, অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা হুই, আর্যবালা দেবী, ইলা বসু, গীতা মুখোপাধ্যায়, অশ্রু দাস নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন—

প্রায় দু'বছর বেআইনি থাকবার পর পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি আজ হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী আইনি ঘোষিত হয়েছে। দীর্ঘ দু'বছর পর আজ আমরা আমাদের কথা সাধারণ মেয়েদের কাছে বলবার সুযোগ পেয়েছি।

১৯৪২ সালে যুদ্ধের এক ঘোর দুর্দিনে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি জন্ম নেয়। মেয়েদের সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার জন্য নারীর "আত্মরক্ষা", "আত্মনির্ভরশীলতা", "আত্মপ্রতিষ্ঠা"—এই ছিল মূল লক্ষ্য।

১৯৪৩-৪৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময় সারা বাংলার গ্রামে ও শহরে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে গড়ে উঠেছে, খিচুরীর ক্যান্টিন, দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র, রিলিফ সেন্টার, দুস্থ মেয়েদের ওয়ার্কসপ, কলিকাতা চালের কিউতে শত শত দুস্থ মেয়েকে নিয়মিত ভাবে চাল সরবরাহের দায়িত্ব বহন করেছেন সমিতির কর্মীরা।...

'৪৭ সালে নোয়াখালি ও কলিকাতার ভয়াবহ দাঙ্গার দিনে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি দাঙ্গায় লাঞ্ছিত সর্বহারা মেয়েদের পাশে এসে দাঁড়াতে পশ্চাদপদ হয়নি। নোয়াখালিতে, রিলিফের কাজে কলিকাতায় শান্তি সেনার আন্দোলনে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কর্মীরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন।...

আমাদের দেশে শতকরা ৯৯টি মেয়েই অসংগঠিত, তাই যেকোন উদ্দেশ্য রক্ষার জন্য মেয়েদের সংগঠিত করা, মেয়েদের মধ্যে ব্যাপক চেতনার সঞ্চার করা হচ্ছে প্রধান কাজ। সেজন্য মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি সমস্ত মেয়েদের এক সমিতির মধ্যে সংগঠিত হবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে।...

এই সমিতি সম্পর্কে অনেকেরই ভ্রান্ত ধারণা আছে যে সমিতি কোন পার্টি বা রাজনৈতিক দলের করতলগত প্রতিষ্ঠান। আমরা দৃঢ়কণ্ঠে এর প্রতিবাদ করি। ...কোন রাজনৈতিক দলের মতামত কারো উপর চাপিয়ে দেওয়া হবেনা। এটা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির গৃহিত কনস্টিটিউশনের মূলকথা।

'স্বাধীনতা', ১১ মে ১৯৫১

প্রাপ্তিস্বীকার : তথ্যসূত্র-১২ পৃ. ২৩২

ভারত ও পাকিস্তানে শিশু সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে বিশ্ব গণতান্ত্রিক নারী সংঘের পরামর্শ

[পশ্চিমবাংলার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নিকট লিখিত এক পত্রে বিশ্বগণতান্ত্রিক নারী সংঘ এক চিঠিতে ভারত ও পাকিস্তানে শিশু সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আন্দোলন গড়িবার জন্য যেসব মূল্যবান পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে তাহার সারমর্ম নীচে দেওয়া হইল।]

এশিয়ার নারী সম্মেলনের শিশু-সংরক্ষণ সম্পর্কিত প্রস্তাবে প্রত্যেক দেশের বিশেষ করে ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশের নারী সমাজকে শিশুর জীবন বিপন্ন করে তেমন সকল সংকট যেমন যুদ্ধ, গরিবি, নিরক্ষরতা, পুষ্টির অভাব, কুশিক্ষা প্রভৃতির বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে বার্লিনে বিশ্ব গণতান্ত্রিক নারী সংঘের পরিষদের এক সভায় ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে শিশু সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ডাক দেওয়া হয়েছে ...।

ভারত ও পাকিস্তান—এই দুটি দেশেই শিশু সংরক্ষণের সমস্যা খুব গুরুতর ...।

শিশু সংরক্ষণ সমস্যার সুসমাধান সারাদুনিয়ার সাধারণ মানুষের দাবি। শিশু সংরক্ষণের সঙ্গে কোনরকমে জড়িত আছেন তেমন প্রত্যেক ব্যক্তি ও সংগঠনকেই এ সম্পর্কে অবহিত করা দরকার। স্থানীয়ভাবে শিশু দাবির ওপর কাজকর্ম বাড়িয়ে তোলা উচিত এবং এরই ভিত্তিতে জনগণের সকল অংশকে ঐক্যবদ্ধ করে দৈনন্দিন দাবি দাওয়ার সুসংহত অভিব্যক্তি দেওয়াও সম্ভবপর। শিশুকে রক্ষা করার দাবি সমস্ত শুভবুদ্ধি মানুষের প্রিয়তম দাবি। কাজেই এ সমস্ত আন্দোলন সফল হবেই এবং তাতে শিশু সংরক্ষণের দাবিতে স্থানীয় ও জাতীয় কমিটি গঠনের পথও খুলে যাবেই। নীচের তলার আন্দোলনের মারফতে গড়ে ওঠা এ ধরনের ঐক্য এক সুসংগঠিত রূপ পরিগ্রহ করে শিশুর জীবনে বিপত্তি ঘটায় তেমন সকল আপদ বিপদ থেকে তাদের রক্ষা করবার জন্য এক প্রচণ্ড শক্তি জাগ্রত করবে।

অন্যান্য আন্দোলনের মতই শিশু সংরক্ষণের আন্দোলনও বিভিন্ন কাজকর্ম ও দাবিদাওয়ার মাধ্যমে ধাপে ধাপে বিকাশলাভ করবে। ভারত ও পাকিস্তানে এই মহান উদ্দেশ্য সাধনের দাবিদাওয়া এধরনের হবে বলে মনে হয় :

১। যুদ্ধ সংকট থেকে শিশুকে বাঁচানো;

২। শিশু শ্রমিকদের সংরক্ষণ এবং তাদের জীবন ধারণের উপযোগী মজুরির জন্য দাবি করা;

৩। শিশু শ্রমিকদের কাজের সময় নির্দিষ্ট করা এবং সান্ধ্য স্কুলের মাধ্যমে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা দাবি;

৪। শিশু শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের দাবি;

৫। শিশুদের স্কুলে ক্যান্টিন খোলা এবং তাতে রাষ্ট্রের সাহায্য আদায় করা;

৬। বাস্তুহারা শিশুদের পুনর্বাসন;

৭। ভবঘুরে শিশুদের কাজকর্মে নিয়োগের ব্যবস্থা;

৮। আইন করে মায়েদের শিশু নিরাপত্তার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি;

৯। খাদ্য সরবরাহে শিশুর খাদ্য সম্পর্কে প্রাধান্য দেওয়া;

১০। সন্তান জন্মের সময় এবং স্তন্যপায়ী শিশুর জন্য শ্রমজীবী জননীকে উপযুক্ত ছুটি দেওয়ার ব্যবস্থা।

এসব দাবি এবং স্থানীয় ও জাতীয় স্বার্থ জড়িত অন্যান্য দাবি সকল নরনারীর মনোযোগ আকর্ষণ করবে—তাঁদের সচেতন সংগঠনগুলোর প্রচেষ্টা ভারত ও পাকিস্তানের হাজার হাজার শিশুর জীবননাশক সকল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

ব্যাপক প্রচার ও কার্যকলাপের ভিত্তিতে শিশু সমস্যার সঙ্গে জড়িত সকল ব্যক্তি ও সংগঠনকে নিয়ে জাতীয় অথবা আঞ্চলিক (যা সম্ভব) উদ্যোক্তা কমিটি গড়তে হবে। এই কমিটির উদ্যোগে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠান করে—ভবিষ্যত কাজকর্মের একটা বিরাট মঞ্চ গড়ে উঠবে।

সাম্রাজ্যবাদ শোষিত সামাজিক কাঠামোর ঘৃণ্যরূপ খুলে ধরাটাই এই দাবি আদায়ের সংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার। এই সামাজিক কাঠামো শোষণ বজায় রাখবার জন্যই নির্মম।

শিশু সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হতে যাচ্ছে, তা যুদ্ধের গ্রাস থেকে শিশু সম্পদ বাঁচানোর দাবিতে এক শক্তিশালী জনমতের অভিব্যক্তি করবে।

প্রাপ্তি স্বীকার : তথ্যসূত্র - ১২, পৃ. ৩২৬।

বাস্তুহারাদের দাবি প্রসঙ্গে

পশ্চিমবঙ্গ সকল ফ্রন্টের পার্টি ইউনিট ও সভ্যদিগের নিকট

১) *প্রাদেশিক বাস্তুহারা ফ্রন্টের জরুরি আবেদন*

কমরেড্‌স,

আপনারা প্রাদেশিক বাস্তুহারা কেন্দ্রের ৫ নং সার্কুলারে দেখিয়াছেন যে, সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের পক্ষ হইতে একটি আবেদন পত্র গণ-স্বাক্ষরের জন্য প্রচারিত হইতেছে। আবেদন পত্রে সরকার কর্তৃক বাস্তুহারাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কলোনীগুলিকে স্বীকার করিয়া সর্বপ্রকার সাহায্যদান, সকল বাস্তুহারার বাস্তুর দাবি, ক্যাম্পগুলি তুলিয়া দিবার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ এবং ভোটাধিকার স্বীকারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ ও ভারত সরকারের নিকট আবেদন জানানো হইয়াছে। এই দাবির সমর্থনে সই সংগ্রহের ভিতর দিয়া বাস্তুহারাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে আন্দোলন ও সংগঠন গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাস্তুহারাদের কলোনী হইতে উচ্ছেদ করিবার জন্য আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের বাজেট সেসনে নতুন আইন প্রণয়ন করিতে যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও জমিদারদের চক্রান্ত ব্যর্থ করিতে হইলে এই আন্দোলনে সকল বাস্তুহারাকে যেমন সংগঠিত করিতে ও টানিতে হইবে সেই সাথে পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত এই আন্দোলন সাফল্যলাভ করিতে পারে না।

সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ আগামী ৩/২/৫১ তারিখে কমার্শিয়াল মিউজিয়ামের হলে বৈকাল ৩টায় সকল গণতান্ত্রিক জনপ্রতিষ্ঠানগুলির সমর্থন ও সহযোগিতা পাইবার জন্য তাহাদের প্রতিনিধিদের একটি সভা ডাকিয়াছে। এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য আপনাদের প্রভাবিত সকল গণপ্রতিষ্ঠান হইতে প্রতিনিধি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। কেন্দ্রীয় পরিষদের অফিস হইতে নিমন্ত্রণ পত্র লইয়া যাইবেন।

আগামী ৪/২/৫১ তারিখে সকাল ৮টায় ময়দানে (মনুমেন্টের নীচে) কেন্দ্রীয় (বাস্তুহারা) ভলান্টিয়ার সমাবেশের আহ্বান জানানো হইয়াছে। আপনাদের প্রভাবিত সকল প্রতিষ্ঠান ও যুব সংগঠন হইতে এই সমাবেশে যোগদান করিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদল পাঠাইবেন। এই সমাবেশের দিন এই সকল স্বেচ্ছাসেবকদিগকে বাস্তুহারাদিগের আন্দোলনের সাহায্যার্থে অর্থসংগ্রহের কাজে বাহির হইতে হইবে এবং তাহাদিগকে পশ্চিমবঙ্গের ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনের সময় আগামী ৯ই অথবা ১০ই ফেব্রুয়ারি ময়দানে বিরাট বাস্তুহারা সমাবেশের

প্রস্তুতির কাজে সাহায্য করিতে হইবে। আগামী বাজেট সেসনে বাস্তুহারাদের দাবিগুলিকে গ্রহণ করানই হইবে এই জনসমাবেশের উদ্দেশ্য। এই দাবিগুলির সমর্থনে ময়দানে কমপক্ষে লক্ষাধিক বাস্তুহারা ও অন্যান্য জনগণের সমাবেশও সংগঠিত করিতে হইবে। যাহাতে প্রত্যেকটি বাস্তুহারা ক্যাম্প, কলোনী ও বাস্তুহারা অধ্যুষিত অঞ্চল হইতে সকলে দলে দলে শোভাযাত্রা করিয়া সমাবেশে যোগদান করে, তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে এবং এই সকল শোভাযাত্রায় স্থানীয় গণতান্ত্রিক শক্তির অন্যান্য অংশগুলি যাহাতে যোগদান করে তাহার জন্য যত্নবান হইতে হইবে।

বাংলার গণ আন্দোলনে নতুন জোয়ারের সূচনা করিতে অগ্রসর হইতে হইবে। এখন হইতে সমাবেশের প্রচারকার্যে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিতে হইবে। এই আন্দোলনের প্রত্যেকটি স্তরেই আমরা পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক শিবিরের প্রত্যেকটি অংশেরই সক্রিয় সহযোগিতা ও সমর্থন আশা করি। ইহার দ্বারা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক শিবিরের প্রতি বাস্তুহারাদের যেমন আস্থা স্থাপন করিতে সাহায্য করিবে তেমনি বাস্তুহারা আন্দোলনকেও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক শিবিরের নির্ভরযোগ্য সাথী হিসাবে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিবে।

বিপ্লবী অভিনন্দনসহ
প্রাদেশিক বাস্তুহারা কেন্দ্র
পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

২৫ জানুয়ারি ১৯৫১

বিঃদ্রঃ ময়দানে বাস্তুহারা সমাবেশের সঠিক তারিখ প্রকাশিত হইবে। সেদিকে লক্ষ্য রাখিবেন।

২) *১৮ই ফেব্রুয়ারী বাস্তুহারা সমাবেশ সম্পর্কে*

বাস্তুহারাদের কলোনী থেকে উচ্ছেদ করার জন্য বর্তমান এ্যাসেম্বলীতে গভর্ণমেণ্ট এক আইন পাশ করাবার চেষ্টা করছে। এই আইনের ফলে লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা আবার ভিটেছাড়া হবে। এই আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও সমাবেশ এবং সমাবেশ থেকে একটা ডেপুটেশন এ্যাসেম্বলীতে নেবার জন্য ১৮ই ফেব্রুয়ারি ময়দানে বাস্তুহারা সমাবেশ হবে। এই সমাবেশকে সফল করার জন্য প্রত্যেক সভ্য ও ইউনিটকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

অভিনন্দনসহ
পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১

বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের ডাক : 'যুদ্ধের বিরোধিতার আবেদন'

দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণি ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্যে মে-দিবস উপলক্ষে বিশ্ব ট্রেড ইউ-নিয়ন ফেডারেশন... আবেদনে বলা হইয়াছে যে, ঐক্যই শ্রমিক শ্রেণির ও সমস্ত শ্রমিকের শক্তি।

আবেদনে বলা হইয়াছে, "ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা যুদ্ধের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবো, অনশন, দারিদ্র্য ও বেকারিকে নিশ্চিহ্ন করিব। সমস্ত দেশের মেহনতী জনতার বাঁচিবার ও কার্য করিবার অবস্থাকে উন্নত করিব এবং আমাদের সংযুক্ত চেষ্টার ফলে আমরা জনতাকে শোষণকারী ও যুদ্ধের প্ররোচনাদাতা সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের বিরোধিতা করিব।"

.... সমস্ত দেশের শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রতি আহ্বান জানানো হইয়াছে ঃ

- আপনাদের আর্থিক ও সামাজিক দাবির সংগ্রামে যুক্তফ্রন্টকে আরও ব্যাপক করুন।
- শ্রমিক আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদের বিভেদ সৃষ্টিকারী দালালদের মুখোশ খুলুন ও তাহাদের দূরে সরাইয়া দিন।
- বৃহৎ পঞ্চশক্তির মধ্যে শান্তি চুক্তির আবেদনে সই করুন।
- জার্মানী ও জাপানের পুনরস্ত্রীকরণের বিরুদ্ধে লড়ুন।
- বিশ্বশান্তির রক্ষার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলিয়া নিন ও সর্বস্ব দিয়া উহাকে রক্ষা করুন, আন্তর্জাতিক মজুর ঐক্যের পতাকাকে উর্ধ্বে তুলিয়া ধরুন।
- বিশ্বশান্তির জন্য ও উন্নততর জীবনযাত্রা কার্যের অবস্থার জন্য সমগ্র শ্রমিক শ্রেণির ঐক্য দীর্ঘজীবী হউক।
- সমস্ত দেশের শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন দীর্ঘজীবী হউক।

শান্তি আন্দোলন সম্পর্কিত অন্যান্য শিরোনাম ঃ

'শান্তি, স্বাধীনতা ও শ্রমিক স্বার্থের সজাগ প্রহরী বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন', 'শান্তি চুক্তির দাবিতে শ্রমিক, শিক্ষক, লেখকদের মধ্যে সহি সংগ্রহের অগ্রগতি', 'ব্যারাকপুর মহকুমায় শান্তি সম্মেলন ঃ শ্রমিক অঞ্চলে শান্তি সংগ্রামের প্রসার', 'শান্তি চুক্তির দাবিতে সাড়ে ১৮ হাজার সহি ঃ বিশিষ্ট ডাক্তারদের স্বাক্ষর', 'বাগমারী-উল্টোডাঙ্গা শান্তি সম্মেলন', 'শান্তির সপক্ষে বেঙ্গল কেমিক্যালের ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক ঃ স্থায়ী শান্তি কমিটি গঠিত', 'দলমত-নিরপেক্ষভাবে শান্তির জন্য দাঁড়াও ঃ মে-দিবসে বিশ্ব-গণতান্ত্রিক যুব সংঘের ডাক', 'শান্তিবাদী না হইয়াও ব্রিটেনের অস্ত্রসজ্জার বিরোধিতা' প্রভৃতি।

প্রাপ্তি স্বীকার ঃ তথ্যসূত্র - ১২, পৃ. ২২০-২১

ট্রেড ইউনিয়নে কাজ করা কমিউনিস্টদের কর্তব্য

ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিক শ্রেণির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গণসংগঠন। এগুলির কর্তব্য হইল শ্রমিক শ্রেণির ভিতরে একতা প্রতিষ্ঠা ও দৃঢ়ীভূত করা, শান্তির জন্য সংগ্রাম করা, শ্রমিকদের দৈনন্দিন স্বার্থের জন্য এবং সমগ্রভাবে শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থের জন্য সংগ্রাম করা।

যে সব দেশে শ্রমিক শ্রেণি ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত সে সব দেশে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা এবং শ্রমিকদের জরুরি স্বার্থ ও শান্তিরক্ষার জন্য তাহাদের সংগ্রামের উপায় ও সাধন এক-ধরনের; আর যে সব দেশে রাষ্ট্রক্ষমতা শ্রমিক জনগণের শোষণকারীদের হাতে, সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের হাতে সে সব দেশে উহা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

ধনবাদী দেশসমূহে যে সব ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিক শ্রেণির অনুরক্ত সন্তানদের দ্বারা পরিচালিত সেইসব ইউনিয়ন শ্রমিকদের আশু স্বার্থের সংগ্রামকে ক্রমশই অধিকতর পরিমাণে ছড়াইয়া দিতেছে ক্ষুধা, দারিদ্র, গণতান্ত্রিক অধিকার দমন প্রমুখ নীতির বিরুদ্ধে, আক্রমণাত্মক যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী প্রস্তুতি স্বরূপ যে বর্ধমান ফ্যাসিস্ট বিপদ তাহার বিরুদ্ধে, ট্রেড ইউনিয়ন-গুলি ক্রমশই অধিকতর পরিমাণে সংগ্রাম ছড়াইয়া দিতেছে ...।

বর্তমান অবস্থায় শান্তির সংগ্রামে ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভূমিকার গুরুত্ব ক্রমেই বাড়িতেছে। স্টকহোম আবেদনে সহি সংগ্রহের কাজে তাহারা সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়াছে। একটা শান্তিচুক্তির জন্য সমস্ত দেশেই এখন যে দেশব্যাপী আন্দোলন চলিয়াছে সে আন্দোলনে উহারা আরো বেশি কর্মতৎপরতা দেখাইতেছে।

ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলি ক্রমশই বেশি বেশি করিয়া উল্লেখযোগ্য জনসমাবেশ ও ধর্মঘট সংগঠিত করিতেছে শ্রমিকশ্রেণির দাবি ও স্বার্থরক্ষা করার উদ্দেশ্যে ...।

দক্ষিণপন্থী সোস্যালিস্ট ও অন্যান্য বিভেদকারীরা আমেরিকান হুকুমে বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনে ভাঙ্গন আনার চেষ্টা করে... আর যে সব ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা বিশ্ব ফেডারেশনের বিরোধী সে সব ইউনিয়নের সভ্যদের ভিতরও ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে অসন্তোষ, দারিদ্র, ক্ষুধা ও যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে, শ্রমিক ঐক্যে বিভেদ সৃষ্টিকারীদের নীতির বিরুদ্ধে।

শ্রমিক শ্রেণি ও শ্রমপরায়ণ জনগণ নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হইতে ক্রমেই বেশি করিয়া বুঝিতেছে যে একতাতেই তাহাদের শক্তি। শুধু সমবেত চেষ্টার দ্বারাই শ্রমিক জনগণ যুদ্ধের পথরোধ করিতে পারে, দূর করিতে পারে ক্ষুধা, দারিদ্র ও বেকারি, জনগণের জন্য আনিয়া

দিতে পারে উন্নত কাজের অবস্থা ও উন্নততর জীবন। কিন্তু কেবলমাত্র দৈনিক সংগ্রামেই এই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত ও দৃঢ়ীভূত হয়। সেই দৈনিক সংগ্রামের যাত্রাপথে শ্রেণিসংগ্রাম লব্ধ ভুল অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জনগণ কমিউনিস্ট পার্টিগুলির নীতি ও শ্লোগান সম্বন্ধে বিশ্বাস অর্জন করে এবং দক্ষিণপন্থী সোস্যালিস্ট পার্টিগুলি ও তাহাদের নেতাদের নীতির সাংঘাতিক পরিণাম সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়।

কমিউনিস্টরা যতক্ষণ জনগণের কাছে না যাইতেছে তাহাদের দৈনন্দিন সংগ্রামকে সুপটু ও নিঃস্বার্থভাবে সংগঠিত না করিতেছে ততক্ষণ শ্রমিকদিগকে পরিচালিত করার বা তাহাদের ঐক্যসাধন করার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। সমস্ত ধনবাদী দেশে কমিউনিস্টরা চেষ্টা করে যাহাতে বিশ্ব ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নগুলি সঠিকভাবে কাজ চালাইয়া যায়, অনবরত নিজেদের কাজের উন্নতি করিতে থাকে এবং সভ্য ও সমর্থক বাহিনীকে আরও শক্তিশালী ও প্রসারিত করিয়া চলে। দুর্ভাগ্যের কথা কতকগুলি দেশের ট্রেড ইউনিয়ন সমূহে আজও পর্যন্ত কমিউনিস্টদের সংখ্যা অল্প। আবার সেই অল্প সংখ্যকের ভিতরও অনেক কমিউনিস্টই সক্রিয় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী নন। কোন কোন কমিউনিস্ট পার্টিতে ট্রেড ইউনিয়ন কাজ সম্বন্ধে যে কুনো মনোবৃত্তি আজও লক্ষ্য করা যায় এবং ট্রেড ইউনিয়ন কাজের গুরুত্ব লঘু করিয়া দেখার যে ভাব কমিউনিস্টদের মধ্যে আজও দেখা যায় তাহা শেষ করা প্রয়োজন।

ট্রেড ইউনিয়নে কমিউনিস্টদের কাজ করা এবং শ্রমিক জনগণের দৈনন্দিন জীবন ও সংগ্রাম সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারে সক্রিয় ভাগ লওয়া, ইহা হইল কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য, শ্রমিক শ্রেণির ঐক্য শক্তিশালী করার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ঐক্য বিরোধীদের বিরুদ্ধে দৃঢ়তম সংগ্রাম চালাইবার প্রয়োজনের কথাও কমিউনিস্টরা সর্বদাই মনে রাখে। দক্ষিণপন্থী সোস্যালিস্ট নেতাদের জঘন্য ক্রিয়াকলাপ ধনবাদের প্রতি তাহাদের দাসসুলভ বশ্যতা অনবরত সুসঙ্গতভাবে ইহার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া চলা কমিউনিস্টদের একটি প্রধান কর্তব্য। .... কমিউনিস্টদের কাজ হইল; এইসব ইউনিয়নের সভ্যদের সঙ্গে স্থায়ী সংযোগ গড়িয়া তোলা। দক্ষিণপন্থী নেতাদের কৃতঘ্ন নীতি যাহাতে তাহারা ধরিতে পারে সেজন্য তাহাদের সাহায্য করা এবং ট্রেড ইউনিয়ন জনগণের স্বার্থকে সকল উপায়ে রক্ষা করা। শ্রমিকদের সংগ্রামে অনবরত ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের (Action) স্থূল প্রত্যক্ষ প্রস্তাব উত্থাপন করিতে করিতে ও দক্ষিণপন্থী নেতাদের স্বরূপ চিনাইতে চিনাইতে কমিউনিস্টদের এমন করিয়া তুলিতে হইবে যাহাতে জনগণের সম্মুখে বিভেদকারীরা তাহাদের কৃতঘ্ন কর্মতৎপরতায় জবাবদিহি করিতে বাধ্য হয়। যদি এই নেতাদের বিরুদ্ধে নীচ হইতে যথেষ্ট চাপ আনা যায় এবং কমিউনিস্টরা যদি নীচ হইতে ঐক্য গড়িয়া তুলিতে পারে—তবেই ইহা সম্ভব। ..... শ্রমিক জনগণ যেখানেই আছে সেখানে সব সময়েই কমিউনিস্টদের অবশ্যই কাজ করিতে হইবে ও কর্মতৎপর হইতে হইবে।

বিজয়ী সাম্যবাদ, বিজয়ী গণশক্তির আওতার ভিতর ট্রেড ইউনিয়নের মর্যাদা একেবারে ভিন্ন রকমের, সমস্ত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তাহাদের ভূমিকাও ভিন্ন রকমের।

কমরেড স্ট্যালিন শিখাইয়াছেন যে "ট্রেড ইউনিয়নগুলি পার্টি সংগঠন নয়। যে শ্রমিক শ্রেণি আমাদের দেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের সার্বজনীন সংগঠন বলিয়া ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে বর্ণনা করা যাইতে পারে। এগুলি কমিউনিজমের স্কুল। এগুলির ভিতর হইতে

শ্রেষ্ঠ লোকগুলিকে তাহারা উপরে উঠাইয়া দেয়—শাসনযন্ত্রের সকল শাখায় নেতৃত্বমূলক কাজ করার জন্য। শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে অগ্রসর ও অনগ্রসর উপাদানগুলির ভিতর এগুলি বন্ধনস্বরূপ। শ্রমিক জনগণের সহিত উহারা শ্রমিক অগ্রদলের যোগসাধন করে।" ...

... জনগণতন্ত্রগুলিতেও কমিউনিস্টদের ট্রেড ইউনিয়ন কাজ অনেক বেশি ঘণীভূত করিতে হইবে এবং এ বিষয়ে এখন যে সব ত্রুটি আছে তাহা দূর করিতে হইবে। কোন কোন কারখানার কমিউনিস্ট পার্টি, শাখা প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায়ই ট্রেড ইউনিয়ন ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠানের কাজ নিজের হাতে তুলিয়া লয়। ... এমনও দেখা যায়, কারখানার গুরুত্বপূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত ব্যাপার, মাত্র কয়েকজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতার হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাও অনেক ক্ষেত্রে সভ্য সাধারণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে। ট্রেড ইউনিয়ন গণতন্ত্র নীতির ইহা দারুণ ব্যতিক্রম, শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন হইতে পৃথক হইয়া পড়ে, কারখানার গুরুতর সমস্যা সমাধানের কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এমন বেশ কিছু কমিউনিস্ট আজও আছে যাহারা মনে করে যে পার্টির সভ্য হইলেই যথেষ্ট, ট্রেড ইউনিয়নে কাজ করার আর প্রয়োজন নাই। সর্বহারার একাধিপত্য ব্যবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নগুলিই হইল যোগাযোগকারী বেল্টিং স্বরূপ, ইহা তাহারা বোঝে না। তাহারা বোঝে না যে, কমিউনিস্টরা ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভিতর নিয়মিত ও সক্রিয় কাজ করিলে তবেই ব্যাপক জনসাধারণকে সোস্যালিস্ট গঠনমূলক তৎপরতায় টানিয়া আনা যায়।

কমিউনিস্ট পার্টিগুলির একটা জরুরি কর্তব্য হইল ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে কমিউনিস্ট-দের কাজ তীব্র করিয়া তোলা। এই কর্তব্য সম্পন্ন হইলে শ্রমিক শ্রেণির ঐক্যস্থাপন ও দৃঢ়ীভূত করার কাজ যথেষ্ট পরিমাণে সুগম হইবে, শান্তি, গণতন্ত্র ও সোস্যালিজমের শিবির আরো শক্তিশালী করিতেও যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

১৯৫১ সালের ৮ জুন 'লাষ্টিং পীস' পত্রিকায় প্রকাশিত এই গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদকীয়,
১৯৫১ সালের ৬ই জুলাই, 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

প্রাপ্তি স্বীকার : তথ্যসূত্র - ১২, পৃ. ২৬৪-৬৬

সরকারি কর্মচারীদের শান্তি সম্মেলনে যোগদান প্রসঙ্গে

ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের গোপন সার্কুলার

Participation of Government Servants in Peace Conventions

Government of India

By Order etc.
Sd/- B. K. Dey
for Under Secretary to
the Govt. of India

Paper Forwarded

Ministry of Home Affairs Letter No. 7/77/50-Poll,
dated the 22 Nov. 1950
Copy with enclosure to Accounts Branch
and the Reads Organisation.

Copy of the Secret Letter No. 7/77/50-Poll, dated the 22nd November, 1950, from the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi addressed to all States...

Subject : Participation of Government Servants in Peace Conventions.

It has been reported to the Government of India that a certain number of Government employees took an active part in the peace convention which was held recently in Delhi.

It is possible that they did this in ignorance of the fact that this convention was organised under the inspiration of the Communist Party of India. Since it is possible that similar convention will be held in future auspices, I am to suggest that the fact stated above may be brought to the notice of all Government Servants who should be advised to refrain from associating with this particular type of round-about political propaganda.

প্রাপ্তিস্বীকার : তথ্যসূত্র - ১২, পৃ. ১৩৯

সারা ভারত শান্তি সম্মেলন ঃ
সরকারী নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিবৃতি

কলিকাতা ৮ই মার্চ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এক বিবৃতিতে দিল্লীতে ভারতীয় জাতীয় শান্তি কংগ্রেসের অধিবেশনের উপর আরোপিত ভারত সরকারের নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে এক বিবৃতি প্রদান করেন। কেন্দ্রীয় কমিটি বলেন যে সমস্ত সৎ এবং শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষই বিচার করিতে সক্ষম যে ভারতীয় শান্তি কংগ্রেসের সফল সম্মেলন চীন, ভিয়েতনাম, মালয় এবং কোরিয়ার শান্তি এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকারী মানুষের শক্তি বৃদ্ধি করে, না লাঘব করে। ভারত সরকারের এই কাজের ফলে লাভবান হইবে শুধুমাত্র ইঙ্গ-মার্কিন আক্রমণকারীরা। কেন্দ্রীয় কমিটি এই বিষয়ে আলোচনা পার্লামেন্টে উত্থাপনের জন্য পার্লামেন্টের সদস্যদের অভিনন্দন জানান। কেন্দ্রীয় কমিটি সমস্ত স্বাধীনতা এবং শান্তিকামী মানুষ এবং সংগঠনকে তীব্র আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়া ভারত সরকারকে নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্ত তুলিয়া লইতে বাধ্য করিবার আহ্বান জানান।

'স্বাধীনতা', ১০ মার্চ ১৯৫১

সহায়ক তথ্য - ২৮

বিশ্বশান্তি সংসদের আবেদন

কি কি কারণে বিশ্বযুদ্ধের আশংকার উদ্ভব হইয়াছে সেই সম্পর্কে মতামত নির্বিশেষে সারা দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ যে আশা পোষণ করেন তাহা পূরণ করিবার জন্য ঃ

শান্তিকে শক্তিশালী ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তাকে সুরক্ষিত করার জন্য ঃ

আমরা দাবি করি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীনের জনগণের রিপাবলিক, গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স—এই পাঁচটি বৃহৎ শক্তি একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদন করুন।

কোনো বৃহৎ রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক এই শান্তিচুক্তি সম্পাদনের জন্য সাক্ষাৎকারের অস্বীকৃতিতে আমরা সেই সরকারের আক্রমণাত্মক অভিসন্ধির সাক্ষ্য বলিয়া গণ্য করিব। আমরা সকল শান্তিপ্রিয় জাতিকে আহ্বান জানাইতেছি, সকল দেশের জন্য উন্মুক্ত এই শান্তিচুক্তি সম্পাদনকে উহারা সমর্থন করুন।

আমরা আমাদের নিজেদের স্বাক্ষর এই আবেদনের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছি ও সকল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নর-নারীকে ও শান্তিকে শক্তিশালী করিতে চান ঐ সমস্ত সংগঠনকে আমরা এই আবেদনে স্বাক্ষর করিবার জন্য আবেদন জানাইতেছি। এই আবেদনে প্রথম স্বাক্ষরকারী হইলেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ফ্রিডরিক জোলিও কুরি প্রমুখ বিশ্বশান্তি কাউন্সিলে দুনিয়ার সমস্ত দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ। **এই আবেদনে সহি দিন ঃ অন্যের সহি সংগ্রহ করুন ঃ যুদ্ধ চক্রান্ত ব্যর্থ হইবে।**

'স্বাধীনতা', ২১শে এপ্রিল ১৯৫১

দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর থেকে ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলার পার্টি সম্পর্কে রিপোর্টের খসড়া

দ্বিতীয় কংগ্রেসের সময় পশ্চিমবাংলার অবস্থা

"ক্ষমতা হস্তান্তরের" প্রায় ছয় মাসের মধ্যেই, ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের অধিবেশন হয়।

দুইশত বছরের প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসন আমাদের দেশের অর্থনৈতিক জীবনে ধ্বংস ও বিপর্যয় এনে দিয়েছিল। সেই সময় দেশের জনসাধারণের সামনে চির খাদ্যসংকট (Chronic food-crisis) ক্রমবর্ধমান দারিদ্র, জীবনযাত্রার ব্যয়-বৃদ্ধি, উৎপাদনের হ্রাস, বেকারি, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অভাবের ন্যায় নানান সমস্যা দেখা দিয়েছিল।

১৯৪৭ সালের অগস্টে দেশবিভাগ এই সমস্যাগুলির প্রত্যেকটিকে আরও বাড়িয়েই তুলেছে এবং এর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে পূর্বপাকিস্তান থেকে লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা ভীড় করায় (Crowded) একটি নতুন এবং বিপর্যয়কারী সমস্যা সৃষ্টি করেছে। দেশ বিভাগের ফলে পশ্চিমবাংলার শিল্পগুলি কাঁচামালের উৎস থেকে ও ভাল ভাল খাদ্য উৎপাদনকারী এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তাছাড়া একটি কৃত্রিম বাধার সৃষ্টি করে দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে একেবারে ভেঙ্গে দিয়েছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল এবং নিজেদের স্বার্থ ও ভারতবর্ষের সামন্ত প্রথাকে কায়েম রাখার জন্য প্রতিশ্রুত যে সরকার ক্ষমতায় এল তারা স্বভাবতই এই সমস্ত মূল সমস্যাগুলির সমাধান করতে সক্ষম হতে পারে না। কংগ্রেস নেতৃত্ব ক্ষমতার গদীতে আসীন হওয়াতে দেশের জনসাধারণের মনে যে মোহের সৃষ্টি হয়েছিল তা দ্রুতগতিতে এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে ভেঙ্গে যেতে বাধ্য হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে ভারতের জনসাধারণের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের লড়াইয়ের নেতারূপে দেখা দেওয়ার মত যে অত্যন্ত অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল সেই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

এইরকমের পরিস্থিতিতে, পার্টির পক্ষে স্বভাবতই প্রধান দায়িত্ব ছিল দেশের লোকের মনে ক্রমশ যে মোহমুক্তি ঘটেছিল তাকে সাহায্য করা, দেশের অর্থনৈতিক জীবনে ক্রমশ অবনতির দরুন সৃষ্ট অবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত যে লড়াই করছিল—সেই লড়াইগুলিকে নেতৃত্ব দেওয়া এবং এই সমস্ত লড়াইয়ের মারফৎ দেশের জনসাধারণের কাছে বর্তমান সরকারের আসল প্রকৃতি সম্পর্কে উপলব্ধি করান, এই সরকারের সত্যিকারের রূপের মুখোশ

খুলে ধরা, একটি প্রকৃত গণ-পার্টি গড়ে তোলা এবং ক্রমশ গ্রামাঞ্চলে জমির লড়াই ও শহরের শ্রমিকদের বাঁচার মত মজুরির জন্য লড়াইয়ের নেতৃত্ব করা এবং এইভাবে বর্তমান প্রতিক্রিয়াশীল সরকারকে বদল করে তার জায়গায় একটি প্রকৃত জন-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করার মত উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা।

এই পথেই পার্টির চলা উচিত ছিল এবং হয়ত চলতেও পারত।

কিন্তু সকলের জানা আছে যে এই পথে আসলে চলেনি।

এই ধরনের অবস্থা কিভাবে সৃষ্টি হ'ল তার কারণগুলি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করার আগে আমাদের পার্টি এবং বিভিন্ন গণ-সংগঠনগুলির সেই সময়কার অবস্থা সম্পর্কে একটি মোটামুটি সংক্ষিপ্ত ধারণা করে নেওয়া যাক্।

পশ্চিমবঙ্গে পার্টি সভ্য সংখ্যা—৮০০০ হাজার থেকে ৯০০০ হাজারের মধ্যে
পার্টির আয় (প্রাদেশিক)—৫,০০০ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকা
ট্রেড ইউনিয়ন সভ্য সংখ্যা—(তথ্য পাওয়া যায়নি)
কিষানসভার সভ্য সংখ্যা—২ লক্ষের উপর
স্বাধীনতার বিক্রয় সংখ্যা—১৩ থেকে ১৫ হাজার

পার্টির দুর্বলতা

কেবলমাত্র এই সংখ্যাগুলি থেকে পার্টি সংগঠনের একটি সম্পূর্ণ ছবি পাওয়া যাবে না। একথা অস্বীকার করা যায় না যে পার্টি সংগঠনের মধ্যেই নানান ধরনের সাংগঠনিক দুর্বলতা ছিল—এটা আমাদের অতীতের সংস্কারবাদী রাজনৈতিক চিন্তার পরিণতি হিসাবেই দেখা দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, প্রয়োজন হলে, পার্টিকে যে বেআইনি অবস্থায় নিয়ে যেতে হতে পারে—তারজন্য এতটুকুও প্রস্তুতি ছিল না।

পার্টির বেআইনি হওয়া

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস হয়ে যাওয়ার পর তিন সপ্তাহ পার হয়ে যেতে না যেতেই এর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল—১৯৪৮ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে ভোর বেলায় সরকার যখন আঘাত হানল। একমাত্র কলকাতায় ৮০টি জায়গায় যুগপৎ হানা দিয়েছিল। বিভিন্ন জেলায় এই ধরনের হামলা হয়েছিল। অধিকাংশ জেলা নেতৃত্বই অতর্কিতে ধরা পড়েন এবং গ্রেপ্তার হন। কোন কোন জেলায় যেমন জলপাইগুড়ি, ২৪ পরগণা, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় গোটা নেতৃত্বই গ্রেপ্তার হয়ে পড়েন।

আসন্ন গ্রেপ্তার ও পার্টি বেআইনি হওয়ার সংবাদ—পুলিশের হামলা হওয়ার ১২ ঘন্টা পূর্বে কলিকাতায় প্রাদেশিক হেড কোয়ার্টারে পৌঁছান সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নেতৃত্বের এক অংশও গ্রেপ্তার হন।

পার্টি নেতাদের এবং পার্টি কর্মীদের এইভাবে রক্ষা করতে না পারার সাংঘাতিক গাফিলতির জন্য কে কতটা দায়ি তা বিচার করা এই রিপোর্টের উদ্দেশ্য নয়—এটা শুধু আসল ঘটনা সঠিকভাবে বিবৃত করা এবং পার্টির রাজনীতি ও সাংগঠনিক নীতিতে কোথায় বিচ্যুতি ছিল সেটাই খুঁজে বার করার চেষ্টামাত্র।

কিছুদিনের জন্য, পার্টির উপর এই আঘাত পার্টি যন্ত্রকে একেবারে বিশৃঙ্খল করেছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই একটা গোপন সংগঠনের কাঠামো খাড়া করা গিয়েছিল। ১লা মে'র মধ্যেই বেআইনি ইস্তাহার বেআইনি স্বাধীনতার একটা সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল এবং বি-পি-টি-ইউ-সি'র উদ্যোগে একটি জমায়েত হয় এবং এই জমায়েত-এ ভাল জনসমাবেশ হয়েছিল। ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে—যাঁরা প্রথম মার্চ মাসে গ্রেপ্তার হন—তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছাড়া পান। এর ফলে প্রাদেশিক কেন্দ্র এবং বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্রগুলি কাজ শুরু করতে পারে।

পার্টিকে হঠাৎ বেআইনি করা, কোনরকম প্ররোচনা ছাড়াই, সারা প্রদেশব্যাপী বহু সংখ্যক কমিউনিস্টকে গ্রেপ্তার করা এবং বিনা বিচারে আটক করায় সকল গণতান্ত্রিক নাগরিকের দরজা খুলে গেল এবং সাধারণ প্রতিবাদ ও সমালোচনা দেখা দিল। পার্টি বেআইনির ঠিক পরে পরেই, একমাত্র ট্রাম শ্রমিকদের কতকটা স্বতস্ফূর্ত কয়েক ঘন্টা ধর্মঘট ছাড়া কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদ আন্দোলন পার্টির নেতৃত্বে সংগঠিত না হওয়া সত্ত্বেও, সরকারের কার্যকলাপ, তাদের প্রতিক্রিয়াশীলতা প্রকাশ করেছিল এবং জনসাধারণের মোহমুক্তিকে ত্বরান্বিত করেছিল।

বেআইনি হওয়ার পরবর্তী সময়ের জনসাধারণের লড়াইগুলি

১৯৪৮ সালের মার্চ মাস থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে শ্রমিকদের অনেকগুলি ধর্মঘট হয়, সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট (এপ্রিল '৪৮), অমৃতবাজার পত্রিকা, পোর্ট ও অন্যান্য কয়েকটি ধর্মঘটের কথা উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করা যায়। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এই ধর্মঘটগুলি ছিল—দৈনন্দিন অর্থনৈতিক জীবনে ক্রমশ অবনতির দরুন সৃষ্ট অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করার একটা প্রচেষ্টামাত্র, আর কিছু নয়। পরে আমরা দেখতে পাব না, এই ধর্মঘটগুলিকেই ভিত্তি করে "গণ অভ্যুত্থানের পক্ষে এই উপযুক্ত সময়"—এই গোটা মতবাদটাই খাড়া করা হয়েছিল।

সংকীর্ণতা ও দুঃসাহসিকতার দিকে ঝোঁক

যাইহোক, ইতিমধ্যে পার্টির নেতৃত্ব ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো, সমস্ত আন্দোলনকে পুরোপুরি সংকীর্ণতা ও দুঃসাহসিকতার খাতে নিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে, ১৯৪৮ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৪৯-এর জানুয়ারির মধ্যে—পরপর কয়েকটি দলিলের মারফৎ পি বি রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক পটভূমিকা তৈরি করে নিয়েছিল।

ক) রাজনৈতিক প্রস্তুতি

দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবেই সংকীর্ণতার বীজ নিহিত ছিল—এইগুলি পরে "জনতার গণতন্ত্র", "কৃষি সমস্যা", "কৌশলগত লাইন"—নামে বিভিন্ন দলিলে পরিবর্ধিত করা হয়। রাজনৈতিক প্রভাবে এ কথা উল্লেখ ছিল—ভারতবর্ষের পক্ষে এখনই একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের করণীয় কাজ করা যাবে। জনতার গণতন্ত্রের উপর লেখা দলিলে আছে যে বর্তমান যুগে জনতার গণতন্ত্রের অর্থই হচ্ছে যে দুইটা বিপ্লবই একই সূত্রে গাঁথা। কৃষি সমস্যার উপর লিখিত দলিলে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, কৃষিতে ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক বিকাশ লাভ করার মত অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। এবং নেহেরু সরকারের কৃষি

সংস্কারগুলিকে জারের আমলে রাশিয়ার গুলিপিন সংস্কারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এটাও দেখানো হয় যে, আমাদের কৃষক আন্দোলন প্রধানত নিঃস্ব কৃষকদের উপর নির্ভর করেই করতে হবে। ইহা আরও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, এখন হইতে কৃষকদের মধ্যে আমাদের সংগ্রাম প্রধানত ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকের উপর ভিত্তি করিয়া গ্রামাঞ্চলে প্রতিক্রিয়ার অগ্রগামী অংশ ধনী কৃষকদের বিরুদ্ধে চালাইতে হইবে।

রণকৌশল দলিলটি একে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলো। ঐ দলিল আরও দেখাল যে, ভারতবর্ষে ভারতীয় বুর্জোয়ারাই হল প্রধান, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বা সামন্ততন্ত্র নয় এবং এ জন্যে আমাদের লড়াই সমস্ত ভারতীয় বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে—এদের উপরই আমাদের প্রধান আঘাত হানতে হবে।

'বিপ্লবে রণনীতি' ও অন্যান্য দলিলগুলি দেখাতে চাইল যে যেহেতু সময়টাই বিপ্লবী সেহেতু দরকার কেবল সাহসী নেতৃত্বের। "হতে পারে যে ধর্মঘটগুলি সংখ্যায় কম। কিন্তু তাতে কী এসে যায়। আমাদের বোঝা দরকার যে, সংকট যখন রয়েছে তখন আন্দোলন কমেনি।" (বিপ্লবের রণনীতি)। এই অভিমত প্রচার করা হল যে, পার্টির সংস্কারবাদীরাই আন্দোলনকে পিছনে টেনে রাখার জন্যে দায়ি। শ্রমিক শ্রেণির লড়াইয়ের এক নতুন ব্যাখ্যা পরিষ্কার হল। "বর্তমানে দাবি না মেনে যে সব ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হচ্ছে (যেমন করা হয়েছে ট্রামে, ভার্তিয়ায়) সেগুলি হার নয় (সূর্যের লেখা ট্রেড ইউনিয়ন প্রস্তাব, ১২.১১.৪৮)। সাহসী নেতৃত্ব ও জঙ্গী লড়াইয়ের উপর জোর দেওয়া হয়।" এমন কি ঐ প্রস্তাবে 'জোর করে কারখানা দখলের'ও সমর্থন করা হয় (ঐ প্রস্তাব)। শ্রমিকদের "শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ বয়কট বা অগ্রাহ্য করে বিনা দ্বিধায় সংগ্রামের পথ বেছে নিতে বলা হয়" (ঐ প্রস্তাব)। বলা হল যে, "সমস্ত দমননীতিমূলক কাজের বিরুদ্ধে শোভাযাত্রা ধর্মঘট থেকে আরম্ভ করে পুলিশের সঙ্গে সামনা সামনি লড়াই পর্যন্ত সব রকম সাহসী ও সংগ্রামী প্রতিরোধই দমননীতি বিরোধী আন্দোলনের প্রধান অঙ্গ। আর যদি শ্রমিকরা মারা যায়? তাদের পরিবারের জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে সাহায্য তুলতে হবে ও তাদের শহিদ বলে গৌরবান্বিত করতে হবে।" এই রকম জেনেশুনে সব জিনিসটা তৈরি হয়েছিল।

এই সব অতি সাহসী সংগ্রামে নেতৃত্ব করার জন্যে যুক্ত কমিটি গঠন করতে হবে। কিন্তু আগে যুক্ত কমিটি করে তারপরে সংগ্রাম করতে হবে তা নয়। "লড়াইয়ের একটি শর্ত হিসাবে এই যুক্ত কমিটিগুলিকে দেখাবার প্রয়োজন নেই। ... এই কমিটি গঠনের জন্য আমরা বসে থাকব না। আমাদের উচিত শ্রমিকদের দেখান যে, লাল ঝাণ্ডা কোন উপায়ে, সাহস ও দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে সংগ্রামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে"। যদি ঐ রকম যুক্ত কমিটি গঠন না করা যায় তবে আমাদের উচিত নিজেদের সবচেয়ে সাহসী ও সংগ্রামী লোকজনকে নিয়ে গ্রুপ গঠন করা যাদের আমরা নিজেরাই বড় করতে পারব।

এইভাবে সম্পূর্ণ নগ্ন সংকীর্ণতাবাদ শেখান হল।

খ) সাংগঠনিক প্রস্তুতি

অনেক পি.সি. সভ্য পি.বি'র এই আমলাতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরোধিতা করেন। পি.বি. বুঝলেন যে, তাঁদের অতি বিপ্লবী নীতি চালু করতে হলে, এই সব বিরোধিতা দূর করে

নিজেদের একান্ত অনুগত প্রাদেশিক কেন্দ্র স্থাপন করা দরকার। এমন এক অবস্থার সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল যাতে সাধারণ সভ্যের বিরোধিতাও দমন করা যায়। এর জন্য পি.সি. কতকগুলি সাংগঠনিক প্রস্তুতি চালান। পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির উপর প্রস্তাব আনা হয়। নিম্নলিখিত ধারায় আক্রমণ চালান হয় ঃ

(১) অন্তঃপার্টি গণতান্ত্রিক প্রথাগুলির উপর আক্রমণ চালান হয় এই বলে যে, সেগুলি সংস্কারবাদী ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রী কাজেই কমিউনিস্ট পার্টি বিশেষত অবৈধ পার্টির পক্ষে ঐগুলি অপ্রযোজ্য। এইভাবে সমস্ত অন্তঃপার্টি গণতন্ত্র জোর করে দমন করার পথ পরিষ্কার হল। এই কথাগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ শত্রুশ্রেণী ও তাহাদের দালালদের প্রতি এই মারাত্মক সন্তুষ্টি যে, সকল ঝোঁক দোদুল্যমান ও বিভেদপন্থীদের হয় প্রশ্রয় দেয় অথবা সমর্থন করে তাহাদেরই অধিকতর পরিমাণে শক্তিশালী করিয়াছে। এই দোদুল্যমান ও বিভেদপন্থীরাই অনেক সময় সরকারের দালালদের অচেতন যন্ত্ররূপে কাজ করিয়াছে। এবং তাহা গণতন্ত্রের ভুল ধারণা, আনুষ্ঠানিক প্রথা পালন, পার্টি সভ্যের অধিকার রক্ষা, আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইত্যাদির নামে পার্টিকে অচল করিয়া দিতে চাহিয়াছে। আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের ধারণা বুর্জোয়া পার্টিগুলি হইতে আমদানি করা হইয়াছে। এইসকল কারণের জন্য সে সংস্কারবাদী ও দোমনা হয়তো সে সংস্কারবাদ রাজনীতিগতভাবে পরাস্ত হইয়াছিল তাহাই সাংগঠনিক ক্ষেত্রে, প্রধান শৃঙ্খলার ব্যাপারে পার্টিকে অচল করিয়া দিবার সংগ্রাম শুরু করিতে সমর্থ হয় এবং সংস্কারবাদী দোদুল্যমান শ্রেণি সমন্বয়কারীদের রক্ষা করিবার দাবি তোলে।

এইভাবে দেখানো হল যে কোন পার্টি সভ্যকে একবার সংস্কারবাদী, দোমনা ও শ্রেণি শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, এই বলাই যথেষ্ট ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে পার্টিসভ্যের অধিকার হারাত—গণতন্ত্র, সাধারণ নিয়মকানুন কিছুই তার সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। ১৯৪৯ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে স্থাপিত পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি পি.বি'র শেখানো নীতি খুব ভাল করে কাজে লাগালেন।

মধ্যবিত্ত পার্টিসভ্যদের উপর আক্রমণ চালানো হল এই বলে যে মূলত তারা সংস্কারবাদী ও দোমনা। এর ফলে পার্টি কমিটিগুলিতে যে সব পুরানো বুদ্ধিজীবী কমরেড তাদের নিজস্ব চিন্তাধারা ছেড়ে দিয়ে উচ্চতর কমিটিগুলির আজ্ঞাবাহী হতে রাজি হননি তাদের সরিয়ে নতুন করে পার্টি কমিটি গঠনের পথ পরিষ্কার হল।

(২) শ্রমিক সভ্যদের বলা হল মধ্যবিত্ত সংস্কারবাদী কমরেডদের সম্পর্কে সচেতন থাকবে কারণ এইসব মধ্যবিত্ত সংস্কারবাদীরা তাদের বিপথে নিয়ে যাবে। এইভাবে পার্টির মধ্যে এক শ্রেণি সংগ্রাম শুরু করা হল। নিম্নোক্ত কথাগুলি লক্ষ্য করুন ঃ

পার্টি নেতৃত্বকে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে শ্রেণি সংগ্রামের মধ্য দিয়া এইসব শ্রমিক এবং কৃষক পার্টিতে আসিয়াছেন সন্ত্রাসবাদী এবং কংগ্রেস আন্দোলন হইতে আগত মধ্যবিত্ত কমরেডদের দ্বারা উঁচু হইতে নীচু পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করিয়া থাকাই তাহাদের নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ার কারণ। যারা বাধা দিত তাকে 'বিরোধী দলপাকান' এই আখ্যা দেওয়া হত। এই চেষ্টাই হয়েছে সমস্ত প্রাদেশিক কমিটির উপর পি.বি'র প্রস্তাবে।

(৩) মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি ঃ পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি পুনর্গঠন ও পরবর্তী বিভীষিকার রাজত্ব শুরু হল এই ভয় দেখিয়ে যে শত্রুর চরেরা পার্টির মধ্যে ঢুকে পড়েছে (অনন্ত সিং-এর

ঘটনা) এই কথাও বলা হল যে মারাত্মক অবহেলা ও সংস্কারবাদই পার্টির নিরাপত্তা বিপন্ন করার জন্য দায়ি।

পশ্চিমবঙ্গ কমিটির পুনর্গঠন ঃ

এইরকম সযত্ন পরিকল্পিত প্রস্তুতির পরে ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, যথেচ্ছভাবে পার্টি নিয়মাবলী লংঘন করে পি.বি. দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে নির্বাচিত পশ্চিমবঙ্গ পি.সি. ভেঙে দিয়ে নতুন পি.সি. মনোনয়ন করলেন (পার্টি নিয়ম অনুসারে, পার্টির চরম গোপন অবস্থাতেও একমাত্র কেন্দ্রীয় কমিটিই নীচের কমিটিগুলি নতুন করে গঠন করতে পারে—পি.বি. নয়)। এর পিছনে পি.বি'র উদ্দেশ্য ছিল এমন এক কমিটি গঠন করা যে কমিটি হবে পি.বি'র একান্ত অনুগত; এবং যে কমিটি পি.বি'র সংকীর্ণতাবাদী, অতিবিপ্লবী ও সুবিধাবাদী সাংগঠনিক নীতি ঠিকঠাক ভাবে কার্যকরী করবে। পি.বি. কিভাবে পি.সি'কে দিয়ে তা করাবে তা ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে বাংলা প্রাদেশিক কমিটির আত্মসমালোচনার রিপোর্টেই সবচেয়ে ভালভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

"একদিকে পি.সি. ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক ঝোঁকের একটি সুবিধাবাদী সমঝোতার ফল এবং যে কোন বিষয়ের উপর তাহাদের পক্ষে রাজনীতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়া অসম্ভব হয়। অপরদিকে, সমালোচনা আত্মসমালোচনার কোন স্থান থাকে না এবং পি.সি.এম'দের দিক হইতে পি.বি'র প্রতি দাসত্ব সুলভ মনোভাব তাহার স্থান দখল করে। পি.বি. এই অবস্থার সম্পূর্ণ সুযোগ নেয় এবং পি.সি'র রাজনৈতিক মতভেদের সমাধান করা ও তাহাকে ঐক্যবদ্ধ করার নামে তাহাদের দৈনন্দিন কাজে হস্তক্ষেপ করে। পি.বি. সাধারণ সভ্যদের বিরুদ্ধে পি.সি'র পক্ষ অবলম্বন করিয়া ও তাহাদের হাত করিয়া প্রাদেশিক কমিটিকে নিজেদের দোষ সম্বন্ধে অন্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়। মার্ক্সবাদী চিন্তাধারায় তাহাদের দুর্বলতা অপরপক্ষে নিজেদের মধ্যবিত্তসুলভ আত্মম্ভরীতা এবং চূড়ান্ত দাসসুলভ মনোভাব পি.সি.এম'দের পি.বি'র চক্রান্তের বাধ্য এবং সুযোগ্য শিকারে পরিণত করে। এইরূপে ইহার জন্মের দিন হইতেই নতুন পি.সি. পি.বি'কে তাহাদের ট্রটস্কীবাদী নীতি ও টিটোবাদী আমলাতান্ত্রিক পন্থা চালু করিবার জন্য একটি সুফলপ্রসু ক্ষেত্র সরবরাহ করে।"

পি.সি'র কি অবস্থা ছিল তা মোটামুটি ভালভাবেই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। কেবল এই বক্তব্যে যেন পি.সি'র নিজের দায়িত্বকে লঘুভাবে দেখার চেষ্টা হয়েছে—যেন তাঁরা দুষ্ট পি.বি'র হাতে নির্দোষ এবং অসহায় শিকার ছিলেন।

<u>১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মনোনীত পি.সি'র কার্যকলাপ</u> ঃ মনোনীত পি.সি'র কার্যকলাপ দুইভাগে ভাগ করা যায়—একটি হচ্ছে ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পর ক্ষমতায় বসবার পর থেকে লাষ্টিং পীসে ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারিতে সম্পাদকীয় বেরুনো পর্যন্ত ও অন্যটি হল ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর মাসে একে ভেঙ্গে দেওয়া পর্যন্ত।

এক বছরের মধ্যে মনোনীত পি.সি. ট্রেড ইউনিয়নে, কৃষক এলাকায়, ছাত্র বুদ্ধিজীবী ইত্যাদির মধ্যে পার্টিকে ভেঙ্গে দিয়েছে, জেলা কমিটিগুলি ভেঙ্গে দিয়ে নতুন কমিটি গঠন করেছে; কয়েক শো পার্টিসভ্যকে পার্টি থেকে তাড়িয়েছে, সাসপেণ্ড করেছে বা নিরুৎসাহিত করেছে; অসংখ্য পার্টি সমর্থকদের বিমুখ করেছে; কয়েক শো পার্টি কর্মী ও জঙ্গীদের জেলে

ঠেলে দিয়েছে; পার্টির লোকজনের মধ্যে চরম ব্যর্থ মনোভাব এনে দিয়েছে। তাই সারা সময়ে একটি মাত্র কৃতিত্ব পার্টি অর্জন করেছে, সেটা হল—দক্ষিণ কলিকাতা উপনির্বাচন—এক্ষেত্রেও এ কৃতিত্ব সম্ভব হয়েছিল কারণ পার্টির যে নীতি চলে আসছিল এই ব্যাপারে তার ব্যতিক্রম করা হয়। পি.বি. কর্তৃক প্রচারিত কৌশলগত লাইন (ট্যাকটিক্যাল লাইন) ও তাহাদের দ্বারা নির্ধারিত সাংগঠনিক নীতি, যে-নীতি বাংলা পি.সি. অত্যন্ত গোঁড়ামী সহকারে এবং নিষ্ঠার সহিত কার্যে পরিণত করিয়া ছিলেন, তাহার ফল হইল এই আশ্চর্যরকম ধ্বংস।

ক্ষমতা দখলের জন্য শিশুসুলভ প্রচেষ্টা

৯ই মার্চের ধর্মঘট হইতে শুরু করিয়া যে-কোন ক্ষুদ্র ঘটনাকেই পি.সি. ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে পরিণত করিবার চেষ্টা করেন। আশা করা হইয়াছিল ৯ই মার্চের ধর্মঘটের সময় হইতে এক সর্বভারতীয় বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সূত্রপাত হইবে। বাংলাদেশে সেই আশা লইয়াই প্রস্তুতি হইতেছিল। বাংলা পি.সি'র পি.বি. কর্তৃক ইহাই হইল প্রথম পরীক্ষা এবং তাহাদের প্রমাণ করিতে হইবে যে, তাহাদের উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছে তাহারা তার উপযুক্ত। যদিও রেলওয়ে সমূহে কোথাও ধর্মঘটের বিন্দুমাত্রও আবহাওয়া ছিল না তাহা হইলেও সমগ্র পার্টিকে ধর্মঘটের জন্য এক উন্মত্ত প্ররোচনার প্ররোচিত করা হইল। রেলওয়ে শ্রমিকদের যখন কিছুতেই উত্তেজিত করা সম্ভব হইল না তখন নির্ভর করা হইল স্পেশাল স্কোয়াডের উপর এবং আরো নির্ভর করা হইল অন্যান্য ফ্রন্ট যথা, মহিলা, ছাত্র ইত্যাদির সাহায্যের উপর। এবং অনিবার্য কারণেই ধর্মঘট ব্যর্থ হইল। সমস্ত ভারতবর্ষে হাজার হাজার রেলওয়ে কর্মচারী এবং বাংলাদেশে শত শত কর্মচারী তাহাদের চাকুরি হারাইল এবং কারাগারে বন্দীদের সংখ্যা স্ফীত করিয়া তুলিল। পার্টির ভিতর যে প্রতিবাদের ঝড় উঠিল তাহাকে সাস্পেনশন, বহিষ্কার প্রভৃতির দ্বারা প্রচণ্ডভাবে দমন করা হইল। এ বিষয়ে পুনরায় পি.সি. আত্মসমালোচনা হইতে উদ্ধৃতি দিতেছি ঃ

"পি.সি. সেক্রেটারী ১৫/৪/৪৯ তারিখে সমস্ত জেলা কমিটির নিকট এক সার্কুলারে বলেন, ৯ই মার্চ হইতে বিশ্বাসঘাতকেরা, শত্রুচরেরা এবং যোশীবাদীরা পার্টি নেতৃত্ব ও উচ্চতর কমিটির বিরুদ্ধে কুৎসা এবং মিথ্যাগুজব প্রচার করিতেছে; ইহারা পার্টির সংস্কারবাদী অতীতের এবং বহু সংখ্যক পার্টি ইউনিটের পেটি-বুর্জোয়া সংখ্যা বাহুল্যের সুযোগ গ্রহণ করিতেছে। শ্রেণির শত্রুরা এমন কি পার্টির ভিতরেও পার্টি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জঘন্য কুৎসা প্রচার করিতেছে।" এই সার্কুলারে আহ্বান জানান হয় 'কুৎসাকারীদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হইবে'। পার্টি র‍্যাঙ্কের বিরুদ্ধে এই সব উন্মত্ত গালিগালাজ বর্ষণ করার চেয়েও ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর পক্ষে আরো গুরুতর বিষয় হইতেছে ধর্মঘটের অব্যবহিত পরেই পি.সি. সার্কুলারে যে-নীতি প্রচার করা হয় তাহা। উহাতে বলা হয় যে ঐ ধর্মঘট আহ্বান করা খুবই ন্যায়সঙ্গত হইয়াছিল এবং ঐ ধর্মঘট আমাদের পক্ষে এক মহৎ বিজয় স্বরূপ। এখন হইতে কোন ধর্মঘট আহ্বান করিবার সময় যে বিষয়ে বিশেষ বিচার করিতে হইবে তাহা হইতেছে, অধিকাংশ শ্রমিক ধর্মঘট সমর্থন করে কিনা তাহা নহে বরং এই ধর্মঘট (আমাদের বিচারে) শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থে পরিচালিত হইতেছে কিনা তাহাই। বিচারের এই মান ব্যবহার করিয়া পার্টি নেতৃত্ব পুনঃপুনঃ ব্যর্থ সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান দিয়াছিলেন।

এই সময় হইতে শুরু করিয়া ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত পার্টি র‍্যাঙ্ককে

পুনঃপুনঃ পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ট্রাম গাড়ী ও বাস আক্রমণ করিতে, ব্যক্তিগত কংগ্রেস নেতাদিগকে ও পুলিশ অফিসারদিগকে আক্রমণ করিতে, জেল গেট, রেলস্টেশন ও থানার উপর অভিযান করিতে প্ররোচিত করা হইয়াছে।

জেলের অনশন ধর্মঘট এই সমস্ত সংঘর্ষ সৃষ্টি করিবার সুযোগ আনিয়া দিল এবং পার্টি নেতৃত্ব এই সুযোগ উত্তমরূপে ব্যবহার করিয়া সাধারণ ধর্মঘট ও শহরের রাস্তায় রাস্তায় সংঘর্ষের আহ্বান দিলেন।

ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্ট

শ্রমিক শ্রেণি বহুস্থানে স্বতস্ফূর্তভাবে ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া তাহাদের জীবনযাত্রার অবস্থা উন্নত করিবার জন্য সংগ্রাম শুরু করিয়াছিল। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ট্রাম শ্রমিকেরা, ১৯৪৯ সালের মে-জুন মাসে পটারী শ্রমিকেরা, এ্যালেনবেরী ও টেক্সম্যাকোর শ্রমিকেরা এবং অক্টোবর মাসে কর্পোরেশন শ্রমিকেরা বিভিন্ন দাবির উপর সংগ্রাম শুরু করে। কিন্তু প্রাদেশিক কমিটি প্রতি ক্ষেত্রেই প্রত্যেকটি আংশিক ও স্থানীয় সংগ্রামকে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে পরিণত করিতে চেষ্টা করে এবং এইরূপ ধর্মঘটগুলিকে ব্যর্থ করিয়া দেয়। প্রত্যেকটি ঘটনাতেই মালিকেরা এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া শত শত জঙ্গী শ্রমিককে ছাঁটাই করিয়া দেয়। গভর্নমেন্টও মালিকদের পক্ষ পূর্ণভাবে সমর্থন করে, কারণ গভর্নমেন্ট চেষ্টা করিতেছে যাহাতে সংঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন ধ্বংস করিতে পারে। এ্যালেনবেরী কারখানাতে কারখানা দখল করিবার অসম্ভব ধ্বনি (শ্লোগান) দেওয়া হইল এবং হাওড়া ও টালিগঞ্জ উত্তর কারখানাতে ইহা কার্যে পরিণত করা হইল। এতদ্ব্যতীত আরও বহু কারখানায় তালাবন্ধের (লক আউট) হুকুম জারি ছিল সেইসব স্থানে বলপূর্বক কারখানা দখলের চেষ্টা করা হইল এবং উহার ফলও হইল অত্যন্ত মারাত্মক।

ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের ক্ষেত্রে ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতিকে বাদ দিয়া পার্টি ইউনিট ও পার্টি জঙ্গীদের জঙ্গী কমিটিকে (অ্যাকশন কমিটি) দাঁড় করান হইল। ট্রেড ইউনিয়ন অফিসগুলিকে চালু করিয়া রাখা হইল না। দেড়শত টাকা নিম্নতম মূল বেতন ও মাগ্গী ভাতার অসম্ভব ও অকার্যকরী দাবি উথাপিত করা হইল। এইবাবে শ্রমিক শ্রেণি হইতে আমাদের বিচ্ছিন্নতার ধারাকে সুসম্পন্ন করা হইল।

১৯৪৮ সালের মধ্যভাগেই ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল। যে সমস্ত স্থলে, যথা—পোর্ট এবং ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে তখনও পর্যন্ত সংযুক্ত ইউনিয়ন ছিল; তাহাও ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা হইল।

কৃষক ফ্রন্টে সংকীর্ণতাবাদ ও হঠকারিতা

কৌশলগত নীতির দলিলে (ট্যাকটিক্যাল লাইন) আগেই কৃষক আন্দোলন পরিচালনার সম্বন্ধে রাজনৈতিক ধারা দেওয়া হইয়াছিল যে কৃষক ফ্রন্টে ক্ষেত মজুর ও গরীব কৃষকেরাই হইবে গ্রামাঞ্চলে আমাদের সমস্ত আন্দোলনের ভিত্তি। আরও বলা হইয়াছিল ধনী কৃষকদিগকে শত্রু ও মধ্য কৃষকদিগকে দোদুল্যমান মিত্র বলিয়া মনে করিতে হইবে।

বাস্তব ক্ষেত্রে বহুস্থানেই যথা—হাওড়া জেলার ডোমজুড় ও ইসলামপুরে সরাসরিভাবে মধ্য কৃষকদের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম পরিচালিত হইয়াছিল।

কৃষকেরা বহুস্থানেই স্থানীয় ও আংশিক দাবির ভিত্তিতে সংগ্রাম শুরু করিয়াছিল, ইহার প্রত্যেকটি সংগ্রামকেই হঠকারী ধ্বনি দিয়া এবং ভুল দিকে পরিচালিত করিয়া সঠিক পথ হইতে দূরে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইসব সংগ্রামগুলি জমিদার ও সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিবার পরিবর্তে ধনী কৃষকের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইয়াছিল। পি.সি. সেক্রেটারী নিজেই তেভাগার পরিবর্তে চৌভাগার উদ্ভট ধ্বনি তুলিলেন। মেদিনীপুর, হুগলী, বাঁকুড়া এবং ২৪ পরগণার বহু স্থানেই ক্ষেত মজুর ও কৃষকের সংগ্রাম শুরু হইয়াছিল। কিন্তু অবস্থা উপযুক্ত হইবার পূর্বেই সংঘর্ষ শুরু করিয়া অথবা অবাস্তব দাবি তুলিয়া এইসব সংগ্রামগুলির দফা নিকাশ করা হইল। ক্ষেতমজুরদের আন্দোলন শিল্পের মজুরদের মত একই লাইনে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা হইল, এবং শিল্পের মজুরদের মত একই মজুরি অর্থাৎ ৮০ টাকা মূল বেতন ও মাগ্গীভাতা দাবি করা হইল।

ঢাক পিটান হইল কাকদ্বীপ হইতেছে একটি শিশু তেলেঙ্গানা। কিন্তু কার্যত ঐ স্থানে আমাদের আন্দোলনের ভিত্তি ছিল একটি বা দুইটি গ্রাম। যদিও এই এলাকায় জমি ছিল বড় বড় জমিদারদের অধীনে এবং তাহারা অত্যন্ত নির্দয়ভাবে সামন্ততান্ত্রিক প্রথায় অত্যাচার চালাইত এবং যদিও ঐ স্থানে আমাদের সম্প্রসারিত করিবার অনুকূলঅবস্থা ছিল তথাপি ঐ সংগ্রামকে হঠকারী ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের দ্বারা ভুলপথে ঠেলিয়া দেওয়া হইল। অথচ চেষ্টা করিলে এই আন্দোলনের গতিকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিস্তৃত করিয়া বাড়াইতে পারা যাইত এবং এইরূপে এখানে একটি সত্যকারের সংগ্রামী অঞ্চলের ভিত্তিস্থাপন করা যাইত।

সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট

সাংস্কৃতিক ফ্রন্টেও সংকীর্ণতাবাদ সর্বনাশ করে। বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মূল ধারা হল প্রগতিবাদী এবং বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ পার্টির প্রতি সহানুভূতিশীল। কিন্তু নেতৃত্বের পক্ষ থেকে বুদ্ধিজীবীদের হেয় করা, তাঁদের কাপুরুষ ও দোমনা বৃত্তির বলে আখ্যা দেওয়া, বুদ্ধিজীবীদের কলম ছেড়ে ট্রেড ইউনিয়ন ও কিসানসভাতে কাজ করতে বলা, এইসবের ফলে বুদ্ধিজীবীরা শীঘ্রই চটে যেতে শুরু করেন। চূড়ান্ত হল 'মার্ক্সবাদী'তে প্রকাশ রায় ও রবীন্দ্রগুপ্তের প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধগুলিতে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এমন কি ভারতের ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিকৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হল। রবীন্দ্রগুপ্তের লেখা বুদ্ধিজীবী, পার্টিসভ্য ও দরদী এবং প্রগতিবাদী লেখকদের মধ্যে প্রবল প্রতিবাদ জাগিয়ে তুলল। কিন্তু এই প্রবন্ধগুলি মেনে নেবার হুকুম দেওয়া হল। 'পরিচয়'-এর সম্পাদকমণ্ডলীর আমূল পরিবর্তন করা হল কারণ তাঁরা এই নীতিতে হ্যাঁ দিয়ে যাননি। গণনাট্য সংঘকে বলা হল তাঁদের লিখিত সমস্ত কাগজপত্র সেন্সরের জন্য এ্যাজিট্-প্রপ টিমকে দিতে। এ্যাজিট-প্রপ টিম আবার সমস্ত কাগজপত্র হারিয়ে ফেললেন। এইরকম এক কাঠামো করে সবকিছু তার মধ্যে ফেলার চেষ্টার ফলে প্রগতিবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল।

ছাত্র আন্দোলন

এই ফ্রন্টে এই ব্যাখ্যা দেওয়া হল যে, যেহেতু ছাত্ররা বুর্জোয়া শ্রেণি থেকে আসবে সেহেতু তারা পার্টির যে-মূল কর্তব্য—অর্থাৎ বুর্জোয়াদের সঙ্গে লড়াই—সে লড়াইয়ে নির্ভরযোগ্য মিত্র

নয়। কয়েকটি গৌরবময় ছাত্রসংগ্রাম এই সময়ে হয়, যথা—বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রদের ধর্মঘট। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত রায় মন্ত্রিসভার পতন না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এই সব সাধারণ ধর্মঘট করে যাবার আওয়াজ তোলা হয়। ফলে এই সংগ্রাম বানচাল হয়।

সবচেয়ে সংকীর্ণতাবাদী পথ আসে ছাত্রদের কাছে যতীনের (ছাত্রফন্টের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য) কাছ থেকে। তিনি বলেন ছাত্র ফ্র্যাকসন ও ছাত্র ফেডারেশনকে তফাৎ করার দরকার নেই।

গণ আন্দোলন গড়ে তোলার বদলে ছাত্র পার্টি সভ্য ও জঙ্গীদের রাস্তায় লড়াই করতে নামান হত অথবা স্পেশাল স্কোয়াডে নেওয়া হত। প্রত্যেকটি ছাত্রসভা ও শোভাযাত্রাকে ব্যবহার করা হত পুলিশের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য।

এই নীতি কেবল আমাদের গণ সংগঠন, ছাত্র ফেডারেশনের অস্তিত্বই নয় ছাত্রফ্রন্টে পার্টির অস্তিত্বই মুছে দিয়েছিল।

জেলের সংগ্রাম

রণদিভে নেতৃত্ব এবং তাহাদের এজেন্টদের কর্মতালিকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল, জেল এবং জেল সংগ্রামের। কমরেডদের উৎসাহের ভাটা পড়িলে তাহা চাগাইয়া তোলা, ধিক্কার দিয়া তাহাদের রাস্তায় লড়াইয়ে নামানো, এবং নেতৃত্বের প্ল্যান কার্যকরী করার হাতিয়ার ছিল জেল সংগ্রামগুলি।

২৬শে মার্চ ১৯৪৮ সালের পর কমিউনিস্ট বন্দীরা কংগ্রেসী জেলে এই প্রথম নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে আটক পড়িলেন। তখনকার নিরাপত্তা আইন তুলনায় কিছুটা উদার ছিল। প্রথম দফা গ্রেপ্তার-গুলির পর শীঘ্রই মুক্তিদান শুরু হয় ১৯৪৮ সালের জুলাইয়ের মধ্যে প্রথম দফায় দৃত নিরাপত্তা বন্দীদের ভিতরে ৭৫% জনেরও বেশি বন্দী পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেল হইতে ছাড়া পাইয়া যান। কিন্তু অক্টোবর '৪৮-এর মধ্যে নিরাপত্তা আইন সংশোধিত করিয়া তাহার ধারাগুলিকে আরও কঠোর এবং আটককাল আরও বৃদ্ধি করা হয়। সারা পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক খানাতল্লাশ, গ্রেপ্তার শুরু হয়। ১৯৪৮-এর নভেম্বরের মধ্যে বন্দীদের সংখ্যা কয়েক শ'তে গিয়া পৌঁছায়। নিরাপত্তা বন্দীদের এবারের পূর্ণতম আটককাল হল ৯ মাস। স্বভাবতই জেলের ভিতরে জীবনধারণের ব্যবস্থা সম্পর্কে আরও গুরুত্ব দিয়া চিন্তা করার প্রয়োজন হয়। প্রথম সংগ্রামগুলি আরম্ভ হয় সত্যিকার অভিযোগগুলি দূর করার মধ্যে—যথা, সমস্ত রাজবন্দীদের একই প্রকার ক্লাসিফিকেশন (কিছু বন্দীকে চোর ডাকাতের মত গণ্য করিয়া আলাদা ক্লাসিফিকেশন দেওয়া হইয়াছিল)। যথোপযুক্ত পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি। আলিপুর এবং প্রেসিডেন্সী জেলে নিরাপত্তা বন্দীদের ক্লাসিফিকেশনের দাবিতে কতকগুলি অনশন ধর্মঘট চলে। এইগুলির অধিকাংশই সফল হয়। নগদ টাকার হিসাবে ভাতা এবং সকল নিরাপত্তা বন্দীদের একই প্রকার ক্লাসিফিকেশনের দাবিতে জানুয়ারি মাসে দমদম এবং প্রেসিডেন্সী জেলে একযোগে ধর্মঘট হয়।

৯ই মার্চের রেল ধর্মঘটের পূর্বাহ্নে, ফেব্রুয়ারি '৪৯ সাল হইতেই নিরাপত্তা বন্দীদের আগমন বিপুলভাবে বাড়িয়া উঠিতে থাকে। তাহাদের সংখ্যা হাজার পার হইয়া যায়। নিরাপত্তা বন্দী ছাড়াও কয়েকশত রাজনৈতিক বন্দীও বিচারাধীন বন্দী হিসাবে জেলে আসেন। ইহাদের

সকলের প্রতিই সাধারণ কয়েদীর মত ব্যবহার করা হইত। বিচারাধীনদের ক্লাসিফিকেশন, নিরাপত্তা বন্দীদের স্টেটাস্, উপযুক্ত ক্যাশ এবং খাদ্যভাতা ও নিরাপত্তা বন্দীদের খাদ্যভাতার দাবিতে সংগ্রাম অপরিহার্য হইয়া উঠিল। ২১শে এপ্রিল হইতে সুচিন্তিতভাবে পশ্চিমবাংলার প্রত্যেকটি জেলে একযোগে অনশন ধর্মঘট শুরু হয়। (এই অনশন হয় এমন কতকগুলি সাচ্চা এবং আশু দাবির উপর যাহার ন্যায্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ ছিল না) এই ধর্মঘটের সমর্থনে ২১শে এপ্রিল মেয়েরা যে মিছিল বাহির করেন, তাহার উপর গুলি চলে। ফলে কংগ্রেসীরাজের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত ঘৃণা ও বিদ্রোহ জাগিয়া ওঠে।

এই সময় হইতে জেল সংগ্রাম পরিচালনায় মতপার্থক্য দেখা দিতে থাকে। পার্টির হঠকারী বিভেদাত্মক সাংগঠনিক পদ্ধতির প্রতিক্রিয়া এই সময় হইতে জেলের মধ্যেও অনুভূত হইতে থাকে। অনশনধর্মঘটীরা যে-সব দাবি পেশ করিয়াছিলেন, তাহার প্রায় সবগুলিই সরকার যখন মানিয়া লইলেন তাহার পরেও কমরেডদের একাংশ মীমাংসার বিরোধিতা করিতে লাগিলেন এই বলিয়া যে গুলি চালানোর উপর তদন্তের রাজনৈতিক দাবিতে এখনো সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়া উচিত। অধিক সংখ্যক ভোটে এই প্রস্তাব বাতিল হয় এবং মীমাংসা হয়। মীমাংসার শর্তগুলিকে আমাদের বিরাট বিজয়-ই প্রকাশ পায়। কারণ ভাতা এবং বিচারাধীনদের উচ্চতর ক্লাসিফিকেশন—এই দুই দাবিই সরকার মানিয়া লন। কিন্তু এই জয়লাভের জন্য বন্দীদের অভিনন্দন জানানোর পরিবর্তে পি.বি. স্বয়ং এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে এবং জেল সংগ্রামের গতি পরিবর্তিত করিতে চেষ্টা করে। ১৯৪৯ সালের মে মাসে জেল কমরেডদের উদ্দেশ্যে পি.বি. যে চিঠি লেখেন তাহা এমন কি এই যুগের অন্যান্য দলিলের তুলনাতেও একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও অসাধারণ দলিল।

কোন কোন মুক্ত-বন্দীর দেওয়া পুরোপুরি মিথ্যা রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করিয়া এই চিঠিতে সুবিধাবাদী ঝোঁকের জন্য জেলের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কমরেডকে তীব্রভাবে সমালোচনা করা হয়। যেসব কমরেডরা রাজনৈতিক দাবিতে এপ্রিল ধর্মঘটকে চালাইয়া যাইবার কথা বলিয়াছিলেন এই চিঠিতে তাহাদের সাধুবাদ করিয়া এপ্রিল ধর্মঘটের মীমাংসার নিন্দা করা হয়। বলা হয়, সাত তাড়াতাড়ি মীমাংসা করিয়া জেল কমরেডরা জেলের বাইরে জনগণের গৌরবজনক সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। চিঠিতে এই নীতি প্রতিষ্ঠিত করা হয় যে, পার্টির অন্য যে-কোন ফ্রন্টের মত জেলগুলিও একটি ফ্রন্ট, এক হিসাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্ট—কারণ এখানে শত্রুর দুর্গের মধ্যে সংগ্রাম চলে। চিঠিতে ঘোষণা করা হয় জেলের অভ্যন্তর হইতে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে এবং জেলের সিপাহী ও কয়েদীদের সহযোগিতা সংগ্রহ করিয়া জেল-বিদ্রোহের অবস্থা সৃষ্টি করিতে হইবে। এই জেল বিদ্রোহই হইবে জেল সংগ্রামের চরম লক্ষ্য। জেলকে তুলনা করা হয় একটি বড় কারখানার সঙ্গে।

জেলের বিভিন্ন অংশ, অপরাধপ্রবণ কয়েদী এবং জেলে ওয়ার্ডারদের সমস্ত ইউনিটের সংগঠন ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা কমিউনিস্ট বন্দীদের কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট করা হয়।

প্রেসিডেন্সী জেলের কতিপয় কমরেডের প্রশ্নের জবাবে একটির পর একটি চিঠিতে বলা হয় জেলের ভিতর হইতে জেল গেটের সামনে জঙ্গী বিক্ষোভ সৃষ্টি করা খুবই সঠিক।

এই যুগে জেল সংগ্রামের ইতিহাসে এই চিঠিগুলি একটি নতুন পরিবর্তন সূচিত করে।

সমস্ত বিরোধিতা দমন করিয়া এই নতুন লাইনকে আনুষ্ঠানিকভাবে পার্টি লাইন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই পত্রগুলির প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে সারা বাংলার জেলে নানারূপে হঠকারী সংগ্রাম শুরু হয়। ৩০শে এপ্রিল '৪৯-এর চুক্তির কতকগুলি শর্ত চালু না করার প্রতিবাদে ৮ই জুন প্রেসিডেন্সী জেলের রাজবন্দীরা লক-আপ অস্বীকার করেন। সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষের বাহিনী জোর করিয়া লক-আপ করিতে আসিলে তাহাদের সহিত সংগ্রাম করার জন্য ইঁট হইতে শুরু করিয়া আসবাব ও বাসনপত্র প্রভৃতিকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়া সক্রিয় প্রস্তুতি চলিল। লড়াই শুরু হইল রাত্রে। আমাদের একজন বন্দী কমরেড মারা যান, কয়েকজন আহত হন। জোর করিয়া লক-আপ করা হয়।

পরদিন দমদম জেলেও একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটে—শুধু এখানে ক্ষতির পরিমাণ হয় বেশি—তিনজন মারা যান।

এর সঙ্গে সঙ্গে যে অনশন ধর্মঘট শুরু হইয়া যায় তাহাতে একজন কমরেড মারা যান আলুপুর জেলে। এই সময় হইতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলে—প্রেসিডেন্সী, আলিপুর, হুগলী, মেদিনীপুর, বহরমপুর, জলপাইগুড়ি জেলে অসংখ্য সংঘর্ষ হয়।

জেল ফ্রন্টের দায়িত্ব ছিল পি.সি. সম্পাদকের ব্যক্তিগত দায়িত্ব। অসংখ্য ক্ষেত্রে তিনি জেল কমরেডদের নিকট নোট পাঠাইয়াছেন। একটি নোটে তিনি কমরেডদের "জেল গেটে আক্রমণ" করার নির্দেশ দেন। অন্য নানা সময়ে তিনি জঙ্গী বিক্ষোভ এবং জঙ্গী ধরনের লড়াইয়ের উপর জোর দিবার নির্দেশ দেন। প্রেসিডেন্সী জেলের কিছু কমরেড এই প্রশ্ন তোলেন যে, জেলে দৈহিক সংঘর্ষে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া স্বভাবতই আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং অনশন ধর্মঘটই জেলে লড়াইয়ের প্রধান ধরন হওয়া উচিত। দমদমের কমরেডরা এক সময়ে পি.সি'র নিকট লেখেন যে, জেলের অবস্থা তখন এমন যে প্রধান প্রধান দাবিগুলির সমাধান হইয়া গিয়াছে; এখন কোন আশু-অভিযোগ নাই যাহাকে ভিত্তি করিয়া সংগ্রাম করা যায়। সুতরাং তাঁহারা সংগ্রাম শুরু করিতেছেন না। দুটি চিঠিকেই চূড়ান্তভাবে তীব্র সমালোচনা করা হয়। প্রেসিডেন্সী জেলের যে কমরেডরা দৈহিক সংঘর্ষ এড়াইবার প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন, তাহাদের কাপুরুষ ও দ্বিধাগ্রস্ত বলিয়া ধিকৃত করা হয়। দমদমের কমরেডদের বলা হয় সুবিধাবাদী, তাহার শ্রমিক ও কৃষক কমরেডদের সম্মান বিকাইয়া দিয়াছেন।

বক্সা জেলে বন্দীদের বদলীর হুকুমকে দৈহিক শক্তিতে প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধতা করেন দমদম জেলের একজন নেতৃস্থানীয় কমরেড। তিনি বলেন এ সিদ্ধান্ত অবাস্তব এবং এক ধরনের সত্যাগ্রহ মাত্র। জনগণের আন্দোলনে ছুরি মারিতেছেন বলিয়া তাঁহাকে ধিক্কার দেওয়া হয়। এবং তীব্রভাবে হুঁশিয়ারী দেওয়া হয়। জেলকমিটির অন্যান্য যে-সকল সদস্য প্রতিরোধের কায়দা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন, তাহাদের আরো তীব্রভাবে আক্রমণ করা হয়। বলা হয়, বাহিরের বিপ্লবী জনতা একজন বন্দীকেও বদলী হইতে দিবে না; তাহাদের ওপর বিশ্বাস রাখো।

এইভাবে পুনরায় বন্দীদের সংঘর্ষ ও সংঘর্ষের মধ্যে টানিয়া নামান হয়। ১৫ই ডিসেম্বর '৪৯ সালে একটি দীর্ঘ সংগ্রাম শুরু হয়। দীর্ঘ অনশন ধর্মঘট এবং সেই অনশন ধর্মঘটের পূর্বে যে সংঘর্ষ হয় তাহার ফলে কয়েকজন সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হইয়া যান; আরও অনেকের স্বাস্থ্য গুরুতররূপে অসুস্থ হয় এবং একজন জেলের মধ্যে মারা যান। এই সংগ্রাম উপলক্ষ

করিয়া জেলের বাহিরে আর একদফা হঠকারী সংগ্রাম শুরু হয়। এ সংগ্রাম শেষ হয় বন্দীদের পরাজয়ে। যে সকল সুবিধা তাহারা দীর্ঘকাল যাবৎ ভোগ করিতেছিলেন, তাহার অনেকখানি কাটিয়া লওয়া হইতে থাকে—শুরু হয় ব্যাপকভাবে বক্সা প্রেরণ। ইতিমধ্যে লাষ্টিং পীস সম্পাদকীয় আসিয়া গিয়াছে। কিন্তু পি.সি. সম্পাদকের নিকট না পৌঁছানতে উনি ৫০ দিন অনশন ধর্মঘটের পর 'জয়লাভের' জন্য বন্দীদের এক অভিনন্দন পত্র প্রেরণ করেন। তিনি নির্দেশ দেন—সর্বপ্রকারে বক্সা প্রেরণের প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত হও। অন্তত একটি জেলে কমরেডরা সম্মিলিতভাবে এই সকল নির্দেশ অমান্য করার সিদ্ধান্ত লইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পূর্বেই পি.সি'র চৈতন্যদয় হয় এবং সার্কুলারটি তাঁহারা প্রত্যাহার করেন।

এই সকল হঠকারী সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় জেল ফ্রন্টের যে থিওরী পি.বি. তৈয়ারি করে এবং প্রবল উৎসাহ সহ পি.সি. কার্যকরী করে, সে থিওরী কিরূপ উন্মাদ। এই অভিজ্ঞতা বাহির হইয়া আসে, যে—

(ক) জেলের মধ্যে কর্তৃপক্ষের সহিত দৈহিক সংঘর্ষ উস্কাইয়া তোলা আত্মহত্যার সমতুল্য।

(খ) বাঁচিয়া থাকার অবস্থা কখন এমন যে প্রতিবাদ করা প্রয়োজন, যখন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে রাজবন্দীদের মর্যাদা বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে এবং যখন ইহার প্রতিবিধানের সর্বপ্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াও কিছু হয় নাই, তখন জেলের মধ্যে সংগ্রামের শেষ হাতিয়ার হইতেছে অনশন ধর্মঘট। যদি তাহা সুনির্দিষ্ট সম্ভবপর দাবির ভিত্তিতে চালান হয় এবং বাহিরে ব্যাপক ভিত্তির গণতান্ত্রিক আন্দোলন দ্বারা সমর্থিত হয় ফলে তাহা হইতে ফললাভ সম্ভব।

(গ) জেল কয়েদীদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠিত করা অথবা তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য তাহাদিগকে সংগঠিত সংগ্রামে টানিয়া আনা যে সম্ভব একথা ভাবা বাতুলতা। যেহেতু ইহারা কেহই স্থায়ী নহেন, ভাসমান, যেহেতু তাঁহারা প্রধানত 'লুম্পেন' শ্রেণির লোক, তাই ইহাদের মধ্যে স্থায়ী সংগঠন গড়িয়া তোলা অসম্ভব। ইহাদের মধ্যে যাহারা পেশাদার চোর ডাকাত নহে, ক্রিমিনাল ধরনের নহে এরূপ ছোট-খাটো অপরাধ অথবা হঠাৎ ক্রোধবশে কোন দুষ্কৃতি করিয়া ফেলার ফলে জেলে যাহারা কোন প্রকারে আসিয়া গিয়াছে, ব্যক্তিগতভাবে এরূপ কয়েদীদের সহিত যোগাযোগ করা এবং তাহাদের রাজনৈতিক করিয়া তোলার চেষ্টা অবশ্য করিতে হইবে।

(ঘ) পুলিশের মতই জেল ওয়ার্ডাররাও যদি সত্যই কখনো আন্দোলনে নামিয়া আসে, তবে তাহা শুধু তখনই হইতে পারে, যখন বিপ্লবী সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে যখন জনগণের অন্যান্য অংশগুলি ইতিমধ্যেই সশস্ত্র ক্ষমতা দখলের পূর্বাহ্নে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

(ঙ) দণ্ডের কাল অথবা আটকবন্দী থাকার সময়গুলিতে কমিউনিস্ট বন্দীরা ব্যবহার করিবেন প্রধানত নিজেদের মতবাদগত জ্ঞানকে বিকশিত করা, সাধারণ জ্ঞান, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ ও অন্যান্য বিজ্ঞানের জ্ঞান উন্নত করার জন্য। অফিসার ও কর্তৃপক্ষের সহিত ব্যবহার হইবে মর্যাদাপূর্ণ। তাহা অতি অন্তরঙ্গ অথবা অপমানকর ও উস্কানী দিবার মত ব্যবহার হইবে না।

(চ) সমবেত আলোচনা, সংগঠিত স্টাডি সার্কেল, সমবেত খেলাধূলা ইত্যাদি মারফৎ

রাজবন্দীদের দেহ ও মনের জোর উঁচু রাখার সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে। আস্থাহীনতা ও হতাশার ঝোঁকের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হইবে কমিউনিস্ট বন্দীদের বিশেষ করিয়া সতর্ক হইতে হইবে, যাহাতে পার্টির সম্মান ও মর্যাদা কোনরূপে ক্ষুণ্ণ না হয়।

পঃ বঃ পি.সি'র সাংগঠনিক প্রস্তুতি

পি.সি. যে অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী কর্তৃত্ব সুলভ পদ্ধতি লইয়া ছিল তাহার বিবরণ না দিলে এই সময়ের মধ্যে পি.সি'র কার্যের বিবরণ অসম্পূর্ণ হইবে। এই পদ্ধতির মধ্যে ছিল—

(ক) কংগ্রেসের অন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের দমন। মাঝে মাঝে বলা হইয়া থাকে র‍্যাঙ্কের মধ্যে হইতে কোন প্রতিবাদ ওঠে নাই এবং নেতৃত্ব র‍্যাঙ্কের পূর্ণ সমর্থন সহ তাহার নীতি কার্যকরী করে। ইহা সত্য নহে। অবশ্যই কোন সন্দেহ নাই যে কতিপয় কমরেড হঠকারিতায়, সংকীর্ণতাবাদে, ঔদ্ধত্য ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবহারে নেতাদেরও ছাড়াইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর নীচের ধাপে যাহারা ছিল তাহাদের কথা ধরিলে অবশ্যই বলা যায়, র‍্যাঙ্কের মধ্যে হইতে প্রভূত পরিমাণ প্রতিবাদ ওঠে। পি.সি. নিজেই ইহার সবচেয়ে ভাল সাক্ষী। তাহাদের রিপোর্টের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি লক্ষ্যণীয়।

"(পি.বি'র) এই বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করিয়া পি.সি. তাহার আলোচনায় (কমঃ নিতাইয়ের খসড়া) যাহারা ৯ই মার্চের সিদ্ধান্তের সম্পর্কে বিন্দুমাত্র প্রশ্নও সন্দেহ করিয়াছে, সেই সমস্ত কমরেডকে 'কাপুরুষ', 'বিশ্বাসঘাতক' বলিয়া গালাগালি দেয়। ছদ্মবেশের আড়ালে এই সকল হুমকি সত্ত্বেও বহু কমরেড পি.সি'র পর্যালোচনা গ্রহণ করিতে অথবা তাহাতে আস্থাশীল হইয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহারা ধর্মঘটের সিদ্ধান্তকেই ভুল এবং ৯ই মার্চের সংগ্রামকে পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবীবাদ বলিয়া সমালোচনা করেন কিন্তু র‍্যাঙ্কের কাছ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করার পরিবর্তে পি.সি. অন্ধ ঔদ্ধত্যের সহিত তাহাদের সমালোচনাকে দমন করা এবং হুমকি দিয়া তাহাদের স্তব্ধ করার চেষ্টা করে। পুরাতন পি.সি. আমলাতান্ত্রিকতা সত্ত্বেও পার্টির মধ্যে মাঝেমধ্যে প্রশ্নোত্তর (পার্টি আলোচনা সিরিজে প্রধানতঃ কিসান সমস্যা সম্পর্কে) প্রকাশ করিয়াছিলেন। নতুন পি.সি. কিন্তু উল্টো শৃঙ্খলাভঙ্গ জনিত শাস্তির ভয় দেখাইয়া র‍্যাঙ্ককে স্তব্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করে।"

পি.বি. এবং পি.সি'র ভীতি প্রদর্শনমূলক পদ্ধতি সত্ত্বেও পার্টি র‍্যাঙ্ক পার্টির নীতি রণনীতি ও রণকৌশল সম্পর্কে বারবারই প্রশ্ন তুলিয়াছে ও সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছে। ৯ই মার্চ রেল ধর্মঘট এবং পরবর্তী সংঘর্ষগুলির মধ্য দিয়া সশস্ত্র অভ্যুত্থানের যে থিওরী নেতৃত্ব খাড়া করিয়াছিল তাহা র‍্যাঙ্কের একাংশ কিছুতেই গলাধঃকরণ করিতে সক্ষম হয় না। মাও'র জনগণতন্ত্রের একনায়কত্ব এবং লিউ-শাও চি'র জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রকাশের পর র‍্যাঙ্কের একটি বৃহৎ অংশ এ দেশে জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করিতে শুরু করে। বহু শহরে হঠকারী কৌশলের ফলে যে-বিপুল ক্ষতি হইতেছিল, বহু ডি.সি. সে সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে পি.সি'র মনোযোগ আকর্ষণ করে।

উপরের উদ্ধৃতি হইতেই দেখা যাইবে কি ভাবে প্রতিবাদের এই সোরগোলকে দমন করিয়া পার্টির মধ্যে সন্ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

(খ) স্বৈরাচারী উপায়ে পার্টি মেম্বারদের বহিষ্কার করা ও সাস্‌পেণ্ড করার পদ্ধতি গ্রহণ।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন কৈফিয়ৎ চাওয়া হইত না, আপীল করার কোন অধিকার দেওয়া হইত না। কোন কোন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানান পর্যন্ত হইত না। বহিষ্কার অথবা সাস্‌পেন্‌শনের সংবাদটি শুধু চুপি চুপি আলোচনার মধ্য দিয়া ছড়াইয়া দেওয়া হইত। শুধুমাত্র নেতৃত্বের কোন পেটোয়ার রিপোর্টের উপরেই বিন্দুমাত্র প্রমাণের অপেক্ষা না রাখিয়া বহু কমরেডের বিরুদ্ধে মিথ্যা করিয়া স্পাই-এর অভিযোগ আনা হইত।

(গ) অন্যান্য পদ্ধতির মধ্যে উপদলীয় দলাদলি এবং গোপন সংবাদ সংগ্রহ করার পদ্ধতি গ্রহণ করা হইত। একদল কমরেডকে গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া নেতৃত্বের নিকট প্রেরণ করার গোপন নির্দেশ দেওয়া হইত। এইভাবে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের ভাব নষ্ট হইয়া যায় এবং গোপন চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের এক অস্বাভাবিক আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। এই সকল পদ্ধতি এবং অন্য নানা পদ্ধতি গ্রহণ করার ফলে অস্বাস্থ্যকর ঝোঁকগুলি বাড়িয়া উঠিতে থাকে, পার্টির ঐক্য ভঙ্গ ও পারস্পরিক সন্দেহ সৃষ্টি হয়; পার্টি জীবনকে ধ্বংস এবং ঐক্য গড়িয়া তোলার কাজকে ব্যাহত করিয়া এমন উপদলের সৃষ্টি হয় যাহা আজও পর্যন্ত একটি সমস্যা হইয়া আছে।

লাষ্টিং পীস সম্পাদকীয় যখন প্রকাশিত হয় তখন এই ছিল পার্টির অবস্থা। এই সম্পাদকীয় প্রকাশের পরবর্তী ঘটনার বিবরণ দিবার পূর্বে এই পরিস্থিতি উদ্ভব হওয়ার কারণগুলির বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ইহা সত্য যে পার্টিকে এই অবস্থায় আনিয়া ফেলার জন্য নেতৃত্ব দায়ি ছিল। ইহাও সত্য যে পার্টির মধ্যে প্রভূত পরিমাণ প্রতিবাদ উঠিয়াছিল যাহাকে তীব্রভাবে দমন করা হয়। কিন্তু ইহা কিরূপে সম্ভব হইল যে এই নীতি এবং পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ লাষ্টিং পীস সম্পাদকীয় আসার পূর্বেই আরো শক্তিশালী হইয়া উঠিল না? এত দীর্ঘদিন ধরিয়া র‍্যাঙ্কের উপর নেতৃত্ব তাহার রাজনীতি ও সাংগঠনিক পদ্ধতি চাপাইয়া দিতে সক্ষম হইতে পারিল কিরূপে? আমাদের মতে ইহার কারণগুলি নিম্নরূপ—

১) দীর্ঘদিন ধরিয়া পার্টির মধ্যে এই রেওয়াজ গড়িয়া উঠিয়াছিল যে, পার্টির লাইন স্থির করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় কমিটির এবং তাঁহারা কখনো র‍্যাঙ্কের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করেন নাই। পলিসিগত প্রশ্নগুলি ছিল একান্তভাবে সি.সি. সভ্যদেরই পবিত্র অধিকার। পার্টি হাইকমাণ্ড যে নীতি ঘোষণা করিতেন, বাকি সকলের কর্তব্য ছিল শুধু তাহা কাজে পরিণত করা। এই নিতান্ত অ-কমিউনিস্ট ধারণার জন্যই র‍্যাঙ্ক-এর রাজনৈতিক উদ্যোগ পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হইয়া পড়ে। সেইজন্যই যখন প্রতিবাদ উঠিয়াছে তখন সেগুলি পার্টি নীতির রণকৌশলগত ফলাফলের প্রসঙ্গে যতখানি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, মূলগত নীতির প্রসঙ্গে তত হয় নাই। অবশ্য এমনকি মূল সিদ্ধান্তগুলির কয়েকটি সম্পর্কেও (যথা, জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকা) প্রশ্ন উঠিয়াছিল, কিন্তু সে প্রশ্ন করিয়াছিলেন খুব অল্প সংখ্যক কমরেড।

২) পার্টি সভ্যদের ভিতর মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ সম্বন্ধে দুর্বলতা। অবশ্য ইহাও অতীতের জের। এমন কি দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের আগের যুগে মার্ক্সবাদ অধ্যয়নকে যে শুধু উৎসাহই দেওয়া হয় নাই, তাহা নয়, নিরুৎসাহিতও করা হইয়াছে। কোন কোন সময়ে নিষিদ্ধ পর্যন্ত করা হইয়াছে। "পিপল্‌স্ ওয়ার" পত্রিকা পড়াই ছিল সভ্যদের একমাত্র পাঠ্যবস্তু। স্বভাবতই এই অবস্থায় নেতাদের পক্ষে সাধারণ সভ্যদের বোকা বানানো সহজ হইয়াছিল। বিষয়বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উদ্ধৃতি দ্বারা পার্টিসভ্যকে ধাঁধা লাগাইয়া দেওয়া হইত এবং সম্পূর্ণ মূল রণনীতি ও রণকৌশল চালাইয়া দেওয়া হইত।

৩) পার্টির ভিতর নীতিগত সংগ্রাম না থাকাও একটি কারণ ছিল। পার্টির ভিতর মত বিনিময়ের ও রাজনীতিক বিতর্ক চালাইবার কোন বাহন কোন দিনই ছিল না। অন্ধ অনুসরণই ছিল পার্টির ধারা।

৪) সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা ছাড়া কোন কমিউনিস্ট পার্টিই বিকাশ লাভ করিতে পারে না এবং বলিষ্ঠ সংগঠনে পরিণত হইতে পারে না।

৫) আমাদের শ্রমিক কমরেডদের বিকাশের স্তর অপেক্ষাকৃত দুর্বল থাকায় পার্টিকে সুস্থভাবে সংশোধন করার বদলে, এক একজন শ্রমিক কমরেডকে নীতির বালাইহীন নেতারা নিজেদের তাঁবেদার হিসাবে ব্যবহার করিতেন।

৬) আর একটি কারণ হইতেছে পার্টির ভিতর পেটি-বুর্জোয়া সভ্যের আধিক্য। অবশ্য ঔপনিবেশিক দেশে পার্টির ভিতর শ্রমিকের সংখ্যা ধনবাদী দেশের তুলনায় অনেক কম হইবে। কিন্তু ইহাকে পূরণ করিতে হইবে কিছু মার্ক্সবাদ দিয়া, শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের সাথে জীবন্ত যোগসূত্র রাখিয়া। পার্টির ভিতর শ্রমিক সংখ্যা বাড়াইবার উপায় কৃত্রিমভাবে আসন রিজার্ভ রাখা নয় অথবা মধ্যবিত্ত শ্রেণির ঘরে জন্ম এমন পার্টি সভ্যদের জন্য একরূপ মান ও শ্রমিক পার্টি সভ্যদের জন্য অন্যরূপ মান রক্ষা করিয়া নয়। ইহার উপায় শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন গড়িয়া তোলা। এই আন্দোলনই শত শত শ্রমিক কর্মীকে সামনে আনিয়া দিবে। ইহাদেরই পার্টিতে গ্রহণ করিতে হইবে। এইসব কর্মীকে বিশেষ প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের নীতিতে ও সাধারণ জ্ঞানের মূল বিষয় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে।

৭) সরকারি সন্ত্রাস ও আক্রমণ জনতার ভিতর প্রবল বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। জনতার ভিতর তাহার প্রতিক্রিয়াও নানা রূপ গ্রহণ করে। জনতার এক অংশ ব্যর্থতায় ও হতাশায় মরিয়া হইয়া যে কোন উপায়ে এই মুহূর্তেই প্রত্যাঘাত হানিতে উদ্‌গ্রীব হয়। এই মনোভাব অল্প সংখ্যক লোকের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকিলেও পি.বি'র হঠকারী নীতি ভাষণের বাস্তব ভিত্তি যোগায়।

'লাষ্টিং পীস'-এর সম্পাদকীয়

জনতা হইতে পার্টির বিচ্ছিন্নতা অনেক দূর অগ্রসর হয়। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, মহিলা, সংস্কৃতিকর্মী প্রভৃতি গণ সংগঠন প্রায় একেবারে ধ্বসিয়া যায়। ৭টি গুরুত্বপূর্ণ গণ সংগঠন বেআইনি ঘোষিত হয় (৮ই জানুয়ারি, ১৯৫০)। পার্টি একেবারে চূড়ান্ত ধ্বংসের সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। এমন সময় আসে ২৭শে জানুয়ারির লাষ্টিং পীসের সম্পাদকীয়। এই সম্পাদকীয় সুকৌশলে পার্টিকে সংশোধন করিয়া দেয় এবং দেখাইয়া দেয় পার্টি সম্পূর্ণ ভুল রণকৌশল অনুসরণ করিতেছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও বাংলার প্রাদেশিক নেতৃত্ব প্রথমে সম্পাদকীয়টি সম্পূর্ণ চাপিয়া যাইবার চেষ্টা করে অথবা অস্বীকার করারই চেষ্টা করে। কিন্তু সাধারণ সভ্যদের কাছে ইহা আশা ও মুক্তির বাণী নিয়া আসে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সর্বত্র তলা হইতে আলোচনা শুরু হইয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে বিরোধিতা সত্ত্বেও এবং পি.সি'র নির্দেশ সত্ত্বেও আলোচনা চলিতে থাকে। এই অনুভূতি জাগিতে থাকে যে পার্টি নেতৃত্ব যে রণনীতি ও রণকৌশল অনুসরণ করিতেছিল তাহা সম্পূর্ণ ভুল। বারবার যে বিপর্যয় ঘটিয়াছে, যে সর্বনাশা অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার জন্য পার্টি সভ্যদের সংস্কারবাদ দায়ি নয়। ভুল রণনীতি ও রণকৌশলই দায়ি।

সেই সময়কার কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নেতৃত্বের ব্যবহারের ফলে পার্টির ভিতর আরও বিভ্রান্তি ও বিভেদ দেখা দেয়।

সম্পাদকীয়টি চাপিয়া যাওয়া বা ইহা সম্বন্ধে চোখ বুজিয়া থাকার প্রচেষ্টা যখন আর সফল হইল না তখন পি.বি. আত্মপক্ষ সমর্থনকারী একটা বিবৃতি তৈরি করিলেন। সম্পাদকীয়ের প্রতি মৌখিক সমর্থন জানানো হইল। কিন্তু ইহার তাৎপর্যকে বিকৃত করা হইল, মূল রণনীতিতেই যে ভুল করা হইয়াছে তাহা স্বীকার করা হইল না। অপরপক্ষে সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে সঠিকভাবে সংগ্রাম চালানো হইয়াছে বলিয়া নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করা হইল। বাংলার পি.সি. পি.বি'র বিবৃতিকে সমর্থন করিয়া ও অভিনন্দন জানাইয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। অবশ্য কিছু সমালোচনাও করা হইল। বলা হইল ঃ "কমিনফর্ম সম্পাদকীয়ের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে পি.বি'র বিবৃতিকে আমরা অভিনন্দন জানাই।" (পি.সি'র বিবৃতি—১৪.৪.৫০)

নেতৃত্বের ভুল ও অপরদিকে এইভাবে ঢাকিয়া যাইবার প্রচেষ্টায় পার্টি সভ্যদের ন্যায়সঙ্গত ক্রোধকে বিভেদসৃষ্টি ও যোশীবাদীদের কাজ বলিয়া হেয় করা হইল। "পি.বি'র প্রথম বিবৃতি যখন পার্টি-সভ্যদের ভিতর প্রবল সমালোচনার ঢেউ তুলিল, তখন পি.বি. ও পি.সি. ইহার ভিতর যোশীবাদীদের বিভেদের হাতই দেখিলেন।" (পঃ বঃ পি.সি'র আত্মসমালোচনা)

লাষ্টিং পীসের ২৭শে জানুয়ারির সম্পাদকীয়ের তাৎপর্য কার্যকরী করার জন্য পার্টির ভিতর নীতিগত সংগ্রাম চালাইতে ব্যর্থ হইয়া, নিজেদের ভুল ও অপরাধ স্বীকার না করিয়া, আত্মসমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করিতে অপারগ হইয়া, পার্টি সভ্যদের দ্বিধা, প্রশ্ন ও মতকে আমলাতান্ত্রিক কায়দায় চাপিয়া দিয়া এমন অবস্থার সৃষ্টি করা হইল যাহাতে পার্টির ভিতর সম্পূর্ণ সাংগঠনিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিল।

সি.সি'র জুন পত্র

১৯৫০ সালের মে মাসে সি.সি. নিজেকে পুনর্গঠিত করেন এবং অনেকগুলি দলিল প্রকাশ করেন। ইহার ভিতর জুন মাসে প্রকাশিত পার্টি সভ্যদের নিকট চিঠিখানি প্রধান।

পুনর্গঠিত সি.সি. স্বীকার করেন যে রণনীতি ও রণকৌশলের ব্যাপারে ভুল করা হইয়াছে এবং পুরোনো পি.বি. অতি মারাত্মক সাংগঠনিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন। সি.সি. স্বীকার করেন যে ট্রটস্কীবাদী পলিসি ও টিটোবাদী তুর্কী পন্থা অনুসরণ করা হইয়াছে।

কিন্তু সি.সি. নিজেই যে-রাজনীতি স্থির করেন ও যে সাংগঠনিক পথের নির্দেশ দেন, সেইগুলিই ছিল সম্পূর্ণ ভুল। তাহা অবস্থার উপযোগী চাহিদা মিটাইতে পারে নাই।

সি.সি'র নিজের রাজনীতিই ছিল সংকীর্ণতাবাদী, শহরের বদলে গ্রামাঞ্চলে হঠকারিতা ও সন্ত্রাসবাদ চালাইবার কথা ইহাতে ছিল। চীনের পথের সম্পূর্ণ বিকৃত বিবরণ ইহাতে দেওয়া হইয়াছিল। সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যাপক করিয়া তোলার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হইয়াছিল। সি.সি'র পত্রে তেলেঙ্গানার যোদ্ধাদের এই বিস্ময়কর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল যে, "দেশব্যাপী সশস্ত্র সংগ্রাম ছড়াইয়া দিবার শপথ সি.সি. গ্রহণ করিতেছে। মাত্র কয়েকটা দিন ও কয়েকটা মাসের ভিতরই আপনাদের বিচ্ছিন্নতার (অর্থাৎ আপনাদের একক সশস্ত্র প্রতিরোধ) অবসান হইবে। অবশিষ্ট অঞ্চলগুলিতে যেখানে আমাদের বিপ্লবী আন্দোলন

শক্তিশালী, সেখানেই আপনাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া আমরা লড়িব।" (তেলেঙ্গানার যোদ্ধাদের প্রতি অভিনন্দন, ১৭-৬-৫০)

সি.সি. পত্র মানিয়া নেবার ভিত্তিতে সমস্ত কমিটি গঠন করিতে হইবে—এই নির্দেশ, পার্টি কংগ্রেস আহ্বান করিবার জন্য সাধারণ সভ্যদের প্রায় সর্বসম্মত দাবি অস্বীকার করা, খোলাখুলিভাবে পার্টির আভ্যন্তরীণ আলোচনা চালাইতে অস্বীকার করা, যাহারা সি.সি. পত্রের সাথে একমত নন তাহাদের মতকে বিকৃত করা ও তাহাদের বিরুদ্ধে কুৎসাপূর্ণ আক্রমণ করা (তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের উপর সার্কুলার)—এইসব সাংগঠনিক পদ্ধতি পার্টিসভ্যদের সম্পূর্ণ হতাশ করিয়া দেয় এবং এই পত্র বাহির হইবার পর পার্টির অবস্থা দ্রুত অবনতির পথে যায়।

বাংলার পি.সি. আনুষ্ঠানিকভাবে মত না দিলেও পরিষ্কার ইঙ্গিত দিলেন যে তাহারা নতুন সি.সি'র রাজনীতিক ও সাংগঠনিক নীতি পুরোপুরিভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। পি.সি'র আত্মসমালোচনামূলক রিপোর্টেই তাহা দেখা যাইবে। কৃষকদের আংশিক সংগ্রামের পর্যালোচনা করিয়া ইহাতে বলা হইয়াছে, "সামন্তবাদকে প্রধান শত্রু হিসাবে দেখা হয় নাই এবং কৃষক ঐক্য গড়িয়া তোলা হয় নাই, ইহাই কৃষকদের আংশিক সংগ্রাম ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ নয়। সশস্ত্র সংগ্রাম সম্বন্ধে নেতৃত্বের ভুল দৃষ্টিভঙ্গিই ব্যর্থতার প্রধান কারণ।" ১৯৪৯ সালের যে পার্টি চিঠিতে (১ নং) দক্ষিণবঙ্গে মুক্ত এলাকা গঠনের শ্লোগান দেওয়া হইয়াছিল, তাহাকে এই রিপোর্টে এই জন্যই সমালোচনা করা হইয়াছে যে ইহাতে কাকদ্বীপ ও বাংলার অন্যান্য এলাকার ভিতর একটা 'অবাস্তব পার্থক্য' টানা হইয়াছে। রিপোর্টে প্রশ্ন করা হইয়াছে, "আসলে এই পার্থক্য কি যুক্তিসঙ্গত হইয়াছিল?" তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে, "আংশিক দাবির জন্য যেখানেই কৃষকরা সংগ্রাম চালাইয়াছে সেখানেই তাহাদের সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। গেরিলা কায়দায় শিক্ষিত সশস্ত্র জঙ্গীবাহিনী ছাড়া দাবি জিতিবার আশা কোথায়?"

পার্টি কংগ্রেস না ডাকিবার সি.সি. সিদ্ধান্তকে পি.সি. সমর্থন করে। "ইহাও আমাদের অভিমত যে, বর্তমান অবস্থায় যখন তৃতীয় পার্টি কংগ্রেস ডাকা সম্ভব নয়, তখন সি.সি. এবং সম্ভব হইলে সি.সি. প্লেনাম দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের থিসিসের প্রয়োজনীয় রদবদল করিবে।" (কমিনফর্ম সম্পাদকীয়ের উপর পি.বি'র বিবৃতি সম্বন্ধে বাংলা পি.সি'র নোট, ১৪.৪.৫০)। পি.সি. তাহার সার্কুলারে বিরুদ্ধ সমালোচনাকে এই বলিয়া চাপিয়া দিতে থাকে যে সমালোচকরা বিভেদ সৃষ্টিকারী ও যোশীবাদী।

লাষ্টিং পীসের সম্পাদকীয় বাহির হইবার ঠিক পরই পার্টির ভিতরকার আলোচনার ধারা খুবই সুস্থভাবে চলিতেছিল এবং রাজনীতিক প্রশ্নে ও নীতিগত ভিত্তির মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন হইতে পার্টির আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম ব্যক্তিগত কুৎসা রটনার স্তরে নামিয়া আসিল এবং পার্টির ঐক্যের কাঠামো ভাঙ্গিতে শুরু করিল। দল, উপদল দেখা দিল। পার্টির কাঠামো নিশ্চিহ্ন করা হইল। পি.সি'র অপসারণের দাবি ব্যাপক আকার নিল এবং প্রবল হইয়া উঠিল। বহু নেতৃস্থানীয় পার্টি কমরেড পার্টির আভ্যন্তরীণ সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহাদের ভিতর অনেকেই ছিলেন পুরাতন পি.সি'র নেতা। একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহাদের অনেক শ্লোগানই নির্ভুল ছিল, বিশেষ করিয়া সি.সি'র জুন পত্রের রাজনীতিক ও সাংগঠনিক নীতি সম্বন্ধে তাঁহাদের সমালোচনা। কিন্তু তাঁহারাও সি.সি'র 'জুন পত্রের' পাল্টা

কোন খসড়া তৈরি করিয়া, স্পষ্ট একটি রাজনীতিক লাইন উপস্থিত করিয়া, পার্টির আভ্যন্তরীণ সংগ্রামকে সঠিক পথে চালাইতে পারেন নাই। তাঁহারা জোর দিয়াছিলেন সাংগঠনিক পুনর্গঠনের উপর। স্বভাবতই রাজনীতিক ঐক্য গড়িবার প্রচেষ্টা ছাড়া ইহা ফলপ্রসূ হইতে পারে না বা সংকটের সমাধান করিতে পারে না।

আরও বিপদজনক অবস্থা দাঁড়াইল এই যে, অনেক কমরেডের গণ আন্দোলন হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার ঝোঁক দেখা দিল। তাহাদের যুক্তি ছিল, পার্টির নীতি ঠিক না হওয়া পর্যন্ত অথবা পার্টি নেতৃত্ব অপসারিত না করা বা পুনর্গঠিত না করা পর্যন্ত জনতার ভিতর কাজ করা সম্ভব নয়। এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে এই ঝোঁকের ফলে যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। ইতিমধ্যেই ভাঙ্গিয়া পড়া আমাদের ঘাঁটিগুলিকে আরও দুর্বল করিয়াছে।

পি.ও.সি গঠন

নতুন সি.সি. পি.সি. পুনর্গঠনের ব্যাপারে খুবই অবাস্তব ও আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করেন। পার্টি সভ্যদের কাছে বিষয়টি খোলাখুলি উপস্থিত করার চেষ্টা হয় নাই। র‍্যাঙ্কের পরামর্শ ও সহযোগিতা গ্রহণ করা হয় নাই। অথচ ইহা ছাড়া পুনর্গঠন সম্ভব ছিল না। প্রথমে সি.সি. এমনভাবে পি.সি. পুনর্গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন যাহার ফলে তখনকার অনেক পি.সি. সভ্যকেই পুনর্গঠিত পি.সি'তে নেবার কথা হয়। সাধারণ সভ্যদের ভিতর তীব্র বিরোধিতার ফলে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব নয় দেখিয়া, সি.সি. ৭টি নামের এক তালিকা উপস্থিত করেন ও মতামতের জন্য প্রচার করেন। বেশিরভাগ পার্টি সভ্য ও ইউনিট এই পদ্ধতি মানিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু অন্য কি পদ্ধতি গ্রহণ করা হইবে, সে সম্বন্ধে সাধারণ সভ্যদের ভিতর কোন ঐক্য ছিল না। ইহারই সুযোগ নেওয়া, যে সব মত পাঠানো হয় তাহাকে পি.বি. এমন কায়দায় হিসাব করিয়া দেখান যেন তাঁহাদের প্রস্তাবেই বেশি সমর্থন পাওয়া গিয়াছে। অথচ আসলে তাহা ছিল না। ঐ ভিত্তিতে পি.বি'র প্রস্তাবিত তালিকার সভ্যদের ও পুরাতন নির্বাচিত পি.সি'র সভ্যদের (মনোনীত পি.সি. সভ্যদের বাদ দিয়া) এক যুক্ত বৈঠক পি.বি. ডাকেন। তাহার ভিতর হইতে পি.ও.সি. গঠন করা হয়।

এইভাবে গঠিত নতুন পি.ও.সি. ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগে কাজ শুরু করেন।

সেপ্টেম্বর '৫০ ও মে '৫১-র মধ্যবর্তী পি.ও.সি.

পি.ও.সি'র কাজকে দুইটি পিরিয়ডে ভাগ করা যায়—'৫০-এর সেপ্টেম্বর হইতে '৫১ সালের এপ্রিল মাস এবং '৫১ মে মাস হইতে চলতি সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। '৫১ সালের এপ্রিল মাসের শেষ দিকে পার্টির খসড়া কর্মসূচির প্রকাশ এবং মে মাসে পি.ও.সি'র সেক্রেটারীসহ কয়েকজন পি.ও.সি. সদস্যের গ্রেপ্তারের ফলেই দুইটি পিরিয়ডের সীমা অংকন করা চলে।

পি.ও.সি. যে কায়দায় গঠন করা হয় তাহাতে স্বভাবতই উহা সাধারণ সভ্যদের মনে কোন উৎসাহ সৃষ্টি করিতে পারে না। পার্টির সম্মুখে যে গুরুতর অবস্থা বিদ্যমান ছিল তাহার মধ্যে কাজ চালাইয়া সাধারণ সভ্যদের বিশ্বাস অর্জন করা যাইবে কিনা তাহাও সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছিল পি.ও.সি. কমরেডদের একটি পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক-সাংগঠনিক নেতৃত্ব দিতে পারিবেন কিনা তাহার উপর।

আশু কর্তব্য ছিল পার্টির অভ্যন্তরীণ সংগ্রামকে নির্ভুল পথে পরিচালনার জন্য পার্টির মধ্যে সুস্থ রাজনৈতিক আলোচনা চালু করা। পি.ও.সি. কিন্তু ভুলভাবে শুরু করিলেন। তাঁহাদের প্রথম বিবৃতিতে বহু সুস্থ সাংগঠনিক নির্দেশ ছিল এবং পার্টির মধ্যে স্বাধীন, বন্ধনমুক্ত আলোচনার প্রতিশ্রুতি ছিল। বহুদিন ধরিয়া আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বের পর এই প্রতিশ্রুতি নিঃসন্দেহে ক্ষণস্থায়ী হইলেও কিছুটা উৎসাহের সৃষ্টি করিতে পারিল। কিন্তু পি.ও.সি. নভেম্বর মাসের শেষের দিকের পূর্বে কোন রাজনৈতিক বিবৃতি দিলেন না। নভেম্বর মাসের শেষের দিকেই জুন সি.সি. চিঠির উপর তাঁহাদের সমালোচনা প্রকাশ করিলেন।

ডিসেম্বর মাসে যুক্ত কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয় এবং ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্য, নির্বাচন, গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট প্রভৃতি প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের 'সাধারণ সভ্যদের জন্য চিঠি'খানা প্রকাশ করা হয়। পি.ও.সি. এই যুক্ত কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে সমর্থন জানাইলেন। এবারও তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের ট্রেড ইউনিয়ন, কিসান প্রভৃতি প্রস্তাব গ্রহণ না করিয়া অথবা, এমনকি কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবের উপর নিজেদের মতামত জ্ঞাপন না করিয়া পার্টির অভ্যন্তরীণ আলোচনায় কোন নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হইলেন।

এই সকল কাজে ব্যর্থ হওয়ায় পি.ও সি অবস্থার মধ্যে কোন বিশেষ পরিবর্তন এবং পার্টির আভ্যন্তরীণ সংকট দূর করার কাজে বেশি কিছু করিতে পারিলেন না।

এই সময় পি.ও.সি'র কয়েকটি সাফল্যও আছে। পার্টির আভ্যন্তরীণ আলোচনার জন্য 'ফোরাম' প্রকাশ পার্টির মধ্যে স্বাধীন ও বন্ধনমুক্ত আলোচনার আবহাওয়া তৈয়ার করা, কিয়ৎ পরিমাণে হইলেও গণতান্ত্রিকভাবে জেলা সাংগঠনিক কমিটিগুলির পুনর্গঠন করিয়া দৈনন্দিন কাজগুলি চালাইবার ব্যবস্থা প্রভৃতি কাজগুলি তৎকালীন অবস্থা বেশকিছু বদলে সাহায্য করে। নিঃসন্দেহ এই সময় পার্টি অপেক্ষাকৃত ভালর দিকে অগ্রসর হয়।

হাইকোর্টের রায়ের ফলে অনেক রাজবন্দী মুক্তি পাওয়ায় এবং পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞাও অবৈধ ঘোষিত হওয়ায় যে খোলাখুলি কাজ করার সুযোগ ঘটে তাহাও অবস্থা পরিবর্তনে সাহায্য করিল। বিভিন্ন ফ্রন্টে গণ কাজ শুরু, ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে দৈনন্দিন কাজ, কৃষক ও জনগণের অন্যান্য অংশের মধ্যেও কাজকর্ম এবং পার্টি দৈনিকের পুনঃপ্রকাশ প্রভৃতিই এই পিরিয়ডের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পার্টির অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে বদলে এইসব ঘটনা সাহায্য করিল।

'৫১ সালের মে হইতে সেপ্টেম্বর '৫১

'৫১ সালের এপ্রিলের শেষাশেষি পার্টির খসড়া কর্মসূচি প্রকাশিত হইল। খসড়া কর্মসূচির পরেই আবার '৫১ সালের মে মাসে 'কর্মপদ্ধতির উপর বিবৃতি' প্রকাশ আমাদের পার্টির ইতিহাসে মোড় ফেরার সন্ধিক্ষণ। বিভ্রান্তি ও অন্ধকারে পথ হাতড়াইবার যুগ শেষ করিয়া এই দলিলগুলি ভারতের জনসাধারণের বিপ্লবের পথকে আলোকিত করিয়া দিল।

পি.ও.সি'র এই পিরিয়ডের একমাত্র সাফল্য হইল এই যে, কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহারা এই খসড়ার উপর আলোচনা আরম্ভ করিতে সাহায্য ও নেতৃত্বদান করিলেন। বহুকাল পরে সমস্ত পার্টি মূল কর্মনীতির উপর রাজনৈতিক আলোচনাকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করিল এবং তাহারই ফলে পুরো বছর ধরিয়া যে কদর্য আবহাওয়া বিরাজ করিতেছিল তাহা অপসারণে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য হইল। কিন্তু এ ব্যাপারেও খুবই প্রয়োজনীয় হওয়া সত্ত্বেও 'ফোরাম' বাহির

করিয়া আলোচনার মঞ্চ সৃষ্টি করা গেল না। যদিও ইহার আংশিক কারণ টাকার অভাব, কিন্তু তবু ইহা একটি মারাত্মক ত্রুটি।

এই সময়ের আর একটু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইল বিভিন্ন জেলা বোর্ড নির্বাচনে পার্টির সাফল্য, যথা—বর্ধমান, চন্দননগর এবং কিছুকাল পূর্বের হাওড়া মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন যদিও পি.ও.সি. ইহার জন্য কোন কৃতিত্ব দাবি করিতে পারে না। কংগ্রেসের পরাজয় এবং বামপন্থী শক্তিগুলির জয়লাভ, বিশেষ করিয়া চন্দননগরে বিপুল জয়লাভ শুধুমাত্র বাংলায় নয়, সারা ভারতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। ইহা এতই তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার যে এমন কি মার্কিন সংবাদপত্রেও হাওড়া নির্বাচন সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশিত হয়। এই জয়লাভের ফলে জনগণের দৃষ্টি পুনরায় কমিউনিস্ট পার্টির উপর গিয়া পড়িয়াছে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একমাত্র সাচ্চা পাল্টা শক্তি হিসাবে পঃ বঙ্গের জনগণ আশা ও ভরসা লইয়া তাকাইতেছে। যদিও সংযুক্তি বামপন্থী ফ্রন্টই নির্বাচনে জয়লাভ করে, তবুও কমিউনিস্ট পার্টিই ছিল ইহার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী শক্তি এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে বাদ দিয়া জয়লাভ সম্ভব হইত না।

যদিও হাওড়া,বর্ধমান, চন্দননগর এবং উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতার নির্বাচনগুলির কোন বিশদ পর্যালোচনা এখানে সম্ভব নয়, তথাপি এই সকল নির্বাচন হইতে কতগুলি বিষয় বাহির হইয়া আসিতেছে যাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন ঃ

(১) ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে জনগণ কংগ্রেস সরকার সম্পর্কে বিশ্বাস হারাইয়াছে।

(২) কোন পার্টি কিন্তু স্বাধীনভাবে কংগ্রেসকে চ্যালেঞ্জ করিয়া সাফল্য আশা করিতে পারে না। বামপন্থী শক্তিগুলির যুক্তফ্রন্ট হইতেছে এমন একটি পাল্টা কেন্দ্র যাহার উপর জনগণ আরও বেশি বেশি করিয়া আস্থা লইয়া তাকাইতে শুরু করিয়াছে।

(৩) এই যুক্তফ্রন্টের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রবল শক্তি হইতেছে কমিউনিস্ট পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টিকে বাদ দিয়া কোন যুক্ত ফ্রন্ট জনগণের উৎসাহ উদ্বুদ্ধ করিতে পারে না।

(৪) সরকারের মুখোশ খোলা ও বিচ্ছিন্ন করার, জনগণের আত্মবিশ্বাসকে উদ্বুদ্ধ করা এবং জনগণের সহিত পার্টির সম্পর্ক পুনর্গঠিত করার পক্ষে বর্তমান সময়ে নির্বাচনগুলি আমাদের হাতে শক্তিশালী অস্ত্র। অবশ্য ইহার অর্থ শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বাধীন সংগ্রামগুলি যে সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিংবা সেগুলির প্রতি পার্টির মনোযোগ দিবার প্রয়োজন নাই তাহা নয়। উভয় আন্দোলনকেই একযোগে চালাইতে হইবে।

অকৃতকার্যতা

এমন কি এই সময়েও খসড়া প্রোগ্রামের এবং পার্টি কর্মনীতির সুবিধা থাকা সত্ত্বেও খাদ্যবস্ত্র প্রভৃতি জনগণের বিভিন্ন সমস্যার অথবা ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র, কিসান সভা, মহিলা ফ্রন্ট অথবা সংস্কৃতি ও শান্তি আন্দোলনে পি.ও.সি. কোন সুস্পষ্ট নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়। যদিও এই সমস্ত সমস্যা ও আন্দোলনের শ্লোগান একমাত্র পার্টি সম্মেলনকেই চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করিতে পারে, তথাপি এগুলি সম্পর্কে পরিচালনার কতকগুলি লাইন নির্দেশ করা উচিত ছিল। পি.ও.সি. যদিও ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং ন্যায্য ও স্বাধীন নির্বাচনের জন্য গণ আন্দোলন শুরু করার প্রচেষ্টা করে, এবং যদিও স্থানীয়ভাবে এই সকল দাবিতে প্রভূত পরিমাণ প্রচার ও আন্দোলন চলিতেছে তবু এই সকল দাবিতে একটি কেন্দ্রীভূত শক্তিশালী সারা প্রদেশব্যাপী গণ আন্দোলন গড়িয়া

তোলার জন্য উৎসাহ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয় না। এই সময় পি.ও.সি'র কতিপয় সভ্য গ্রেপ্তার হন এবং দুইজন অসুস্থতার জন্য কাজ করিতে পারেন না। ইহার ফলে এই সময় পি.ও.সি'র কাজ চালানোর যে বাধা ছিল তাহা অবশ্যই উল্লেখ করিতে হইবে।

পার্টি ও গণসংগঠনগুলির বর্তমান অবস্থা

গত দুই মাসের মধ্যে পশ্চিমবাংলার সমস্ত জেলাতেই জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যে সকল জেলা কমিটি গঠিত হইয়াছে তাহারা কাজ চালাইয়া যাইতেছে। পার্টির শক্তি বর্তমানে নিম্নরূপ ঃ

পার্টি সভ্যের মোট সংখ্যা — টি-ইউ সভ্য সংখ্যা—
কিসান সভার সভ্য সংখ্যা— পার্টি ফাণ্ড (প্রাদেশিক)—
স্বাধীনতা—

[উপরের বিষয়গুলি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়নি। —সম্পাদক]

পশ্চিমবঙ্গে আজ চরম খাদ্য সংকট। কংগ্রেস সরকার ভূমি সমস্যার কোন সমাধান করিতে না পারায় দেশে চিরন্তন খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে। ইহারই সাথে দুর্নীতিপরায়ণ জমিদার, ব্যবসায়ী প্রভৃতির মজুতদারী এবং কিছু অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির মত নৈসর্গিক দুর্ঘটনা যাহা ভারতের মত বিশাল দেশে ঘটিতে বাধ্য—এই সব মিলিয়া চরম দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারই প্রকাশ ২৪ পরগণা, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলায়। এই সব অঞ্চলে চালের দর ৮০ টাকা মণ উঠিয়াছে।

শিল্পের উন্নতি হইতেছে না। যুদ্ধ শিল্প ছাড়া সর্বত্র উৎপাদন কমিতেছে। শ্রমিকদের জীবনধারণের খরচা বাড়িয়া গিয়াছে। এদিকে ক্রমবর্ধমান সংকটে ক্রমেই বেকারের সংখ্যাও বাড়িয়া চলিয়াছে। সংকটের বোঝা শ্রমিকদের কাঁধে চাপাইবার জন্য মালিকরা ছাঁটাই ও রেশনালাইজেশনের পরিকল্পনা নিতেছে।

সংকট শিক্ষাকেও গ্রাস করিয়াছে। সরকারের মাথা মোটা পুলিশের খরচা, সশস্ত্র ফৌজ ও আমলাতন্ত্রের খরচার ফলে শিক্ষার জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। শিক্ষার মান নামিয়া যাওয়ার ফলে পরীক্ষায় ফেলের হার বাড়িতেছে। ছাত্রদের বেতন বাড়িতেছে, পাঠ্য-পুস্তকের দাম বাড়িতেছে, বাসস্থানের সমস্যা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনও এইভাবে সংকটাপন্ন। লেখকরাও রোজগারের পথ না পাইয়া সংবাদপত্র মালিকদের কাছে, সিনেমা মালিকদের কাছে নিজেদের বিক্রি করিতে বাধ্য হইতেছেন। ঐ সব মালিকরা জনতার জন্য বিষ প্রস্তুত করিতেছেন।

আমাদের ব্যাপক ত্রুটি সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টি জনতার কাছে শ্রদ্ধার আসন পাইয়াছে। যতই কংগ্রেস রাজত্ব সম্বন্ধে জনতার বিক্ষোভ বাড়িতেছে ততই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কমিউনিস্ট পার্টির দিকে তাকাইতেছে। কিন্তু আমাদের সংগঠন পিছনে পড়িয়া আছে। যে ঐতিহাসিক কর্তব্য আমাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সেই অনুযায়ী জনতাকে পরিচালিত করার সামর্থ্য গড়িয়া ওঠে নাই। এই ত্রুটি আমাদের কাটাইয়া উঠিতে হইবে। জনতার এই সংকটজনক মুহূর্তে পরিচালিত করার মত পার্টি আমাদের গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহাই পশ্চিমবঙ্গের জনতার ও পার্টির আজিকার চিত্র।

টিকা : (১) এই রিপোর্টটি অনিল বিশ্বাস সম্পাদিত বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন (২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮২) বই থেকে নেওয়া হয়েছে। সেখানে সম্পাদক মণ্ডলীর নোটে "এই রিপোর্টকে ১৯৫১ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত রাজ্য সম্মেলনের মূল রিপোর্ট হিসাবে ধরা যেতে পারে" বলে দাবি করা হয়েছে। সেই মোতাবেক রিপোর্টের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে "পঞ্চম রাজ্য সম্মেলন, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি"। রিপোর্টটির গুরুত্ব বিবেচনায়, আমরা এটিকে সহায়ক তথ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করলাম। কিন্তু এটি যে "পঞ্চম রাজ্য সম্মেলনের" মূল রিপোর্ট, সে ব্যাপারে সন্দেহ থাকায়, অনুমানের ভিত্তিতে সম্মেলনের রিপোর্ট হিসাবে দাবি করা থেকে নিজেদেরকে নিবৃত্ত রাখলাম।

(—সম্পাদক)

(২) এই প্রবন্ধে কয়েকজনের ছদ্মনাম রয়েছে, যেমন : সূর্য ছদ্মনামটি ব্যবহার করতেন ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, প্রকাশ রায় ছদ্মনামটি ব্যবহার করতেন প্রদ্যোত গুহ, রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামটি ব্যবহার করতেন ভবানী সেন, নিতাই ছদ্মনামটি ব্যবহার করতেন নৃপেন চক্রবর্তী।

সহায়ক তথ্য - ৩০



ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী

সারা ভারত পার্টি সম্মেলনে গৃহীত

অক্টোবর—১৯৫১

প্রথম সংস্করণ
মার্চ, ১৯৫২
দু' আনা

ভূমিকা

১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো পার্টির একটি কর্মসূচীর খসড়া প্রকাশ করে।

পার্টির বিভিন্ন ইউনিটের সম্মেলনগুলিতে এই খসড়াটির উপর আলোচনা হয় এবং কয়েকটি পরিবর্তন সমেত খসড়াটি গৃহীত হয়।

১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে পার্টির যে সারা-ভারত সম্মেলন হয় সেখানে খসড়াটি ও প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলি আলোচিত হয়, তাহার মধ্যে কয়েকটি পাস করা হয় এবং কর্মসূচীটি পাকাপাকিভাবে গৃহীত হয়।

এখন সারা-ভারত পার্টি সম্মেলনে গৃহীত ও পার্টির কর্মসূচী হিসাবে তা প্রকাশ করা হচ্ছে।

অক্টোবর, ১৯৫১ পলিটব্যুরো

প্রাপ্তিস্থান
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ
কলিকাতা—১২

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিম-বঙ্গ কমিটির পক্ষে মুজফ্ফর
আহমদ কর্তৃক ৬৪-এ, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা হইতে
প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস,
৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট হইতে মুদ্রিত।

সারাভারত পার্টি সম্মেলনে গৃহীত

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী

১। আগস্ট ১৯৪৭-এ যখন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকেরা দিল্লীতে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের সরকার কায়েম করল, এ-দেশ থেকে বিদায় নিল ঘৃণিত বড়লাট-ছোটলাটের দল, তখন ভারতীয় জনগণ ভাবল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটল বুঝি, ভারতবর্ষ বুঝি পেল মুক্তি আর স্বাধীনতা; আমাদের এত জমি আর মেহনতের এমন যোগান, আমাদের কলকারখানা, আমাদের এমন বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদ আর জনবল—এই সব থেকে এইবার বুঝি সরকারে-জনসাধারণে হাত মিলিয়ে কোটি কোটি দেশবাসীর জন্যে সুখের জীবন গড়ে তুলতে পারবে। এইবার থেকে আমরা কোমর বাঁধতে পারব আমাদের দারিদ্র্যকে ক্রমশ জয় করবার কাজে নিশ্চয়ই এমন ব্যবস্থা করতে পারব যাতে প্রত্যেকে পেটে খেতে পায়, পায় মাথা গোঁজবার জায়গা, পরনের কাপড় আর তাছাড়া অন্তত এতটুকু অন্যান্য জিনিস যা নইলে বেঁচে থাকাই সম্ভব নয়।

২। চার-বছরের নেহরু-রাজ জনসাধারণের আশা ভরসাকে সবদিক থেকে ভেঙেছে। জনসাধারণ ঠেকে বুঝেছে যে, তাদেরই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের দরুন জাতীয় কংগ্রেসের যে-সরকার গদি পেল সে-সরকার আসলে কসম করেছে পরগাছার মত ওই জমিদারদের জিইয়ে রাখবার আর রাজারাজড়াদের ঐশ্বর্যের পাহারাদারী করবার—অথচ এরাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে বিদেশীরা আমাদের দেশে হানা দিয়েছে তাদের সাহায্য করেছে আর তাদের সঙ্গে একজোট হয়ে জনসাধারণের উপর আর দেশের উপর লুটতরাজ চালিয়েছে। জনসাধারণ একথা ঠেকে শিখছে যে, ভারতীয় কংগ্রেসের এই সরকার ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের অনুমতি অনুসারেই গদি পেয়েছে; কেননা ভারতবর্ষে ইংরেজদের যে-পুঁজি খাটছে এই সরকার তা পাহারা দেবার আর জিইয়ে রাখবার কসম করেছে। জনগণের জীবনের কোন ক্ষেত্রেই সরকার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। দিনের পর দিন জনগণের অবস্থা ক্রমশই খারাপ হয়ে উঠেছে; আর এদিকে, জনগণকে বঞ্চিত করে জমিদার-মুনাফাখোরেরা উঠেছে ফেঁপে।

৩। আমাদের কলকারখানা, রেল, খনি, ডক, চা বাগান প্রভৃতি জায়গায় যে পঞ্চাশ লাখ শ্রমিক গতর খাটায় তারা 'আসল' মজুরি কমে যাবার দরুন, জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য হবার দরুন, পুঁজিবাদী র‍্যাশনালাইজেশন* আর বেকারির দরুন দারুণ দুর্ভোগে পড়েছে। মজুরি বাড়ানো বা অবস্থা উন্নত করবার দাবিতে তাদের সংগ্রামকে গুলি-বন্দুক আর পুলিশী আতংকের রক্তবন্যায় ভাসিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা। সরকার আর সরকারি দালালেরা তাদের জঙ্গী শ্রমিক সংঘগুলিকে ভেস্তে দিচ্ছে, ভেঙে দিচ্ছে, বন্ধ করে দিচ্ছে। জনগণের দোহাই দিয়ে সরকার হুকুম করছে উৎপাদন বাড়াতে হবে; আসলে কিন্তু এর আড়ালে শ্রমিকদের কাজের অবস্থাকে আরও সঙ্গীন করে তুলে মুনাফাখোরদের মুনাফা ফাঁপানোর কারসাজি।

৪। আমাদের দেশে শতকরা ৮০ জন হল কৃষক। এই কোটি কোটি কৃষকদের দশা আগেকার মতই অধম হয়ে রইল। যাদের জমি আছে এবং সে-জমি যারা চাষ দিতে পারে

তাদের মেহনতের ফলটুকু জমিদার-মহাজনের দল সাংঘাতিক খাজনা আর সুদের হার বাবদ লুটে নিচ্ছে। তাছাড়া, পুঁজিবাদী বাজারের কায়দাকানুন আর হরেক রকম সরকারি ট্যাক্স-এর অজুহাতে লুঠও আছে। অবশ্য, বারো আনা কৃষকের নিজস্ব জমি বলে প্রায় কিছু নেই। যাদের জমি নেই, কাজ নেই, তাদের দশা তো চিরভিখিরীর মতো। জমিদার-মহাজনের জমিতে ক্ষেত-মজুর কিংবা গরীব প্রজা হিসেবে যারাও বা কাজ পায় তাদের কপালে তো ক্রীতদাস-ভূমিদাসের মতো হাড়ভাঙা খাটুনি; অথচ মজুরি যা জোটে তাই দিয়ে কোনমতে টেনেটুনেও সংসার চলে না। ফলে, খাদ্য আর শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদন কমে যাচ্ছে। এরই দরুন দেশে চরম খাদ্যাভাব—কোটি কোটি মানুষের অনাহার ও মৃত্যু। জমিদার-মুনাফাখোরের এই সরকার জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করা নিয়ে মুখে যতই বড়াই করুক না কেন, আসলে কিন্তু জনসাধারণের এই নির্যাতকগুলিকে কি করে ক্ষতিপূরণ হিসেবে কোটি কোটি টাকা পাইয়ে দেওয়া যায় তারই মতলব আঁটছে ঃ এইভাবে জমিদারদের খাজনাটা কৃষকের শ্রম থেকে সরকারি ব্যবস্থার সাহায্যে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে উসুল করবার আয়োজন। জমির দাবিতে, কিংবা জমিদারি খাজনা সুদ আর সরকারি ট্যাক্স কমাবার দাবিতে, কৃষকদের যে সংগ্রাম সেই সংগ্রামকেও রক্তে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শ্রমিকদের সংগ্রাম ও সংগঠনগুলির পাশাপাশি কৃষক সমিতিগুলিকেও টুঁটি টিপে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। অনেক জায়গায় গাঁ-কে-গাঁ, তালুক-কে-তালুক, জেলা-কে-জেলা, পুলিশ আর পল্টনের শাসনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, কেননা ও-সব জায়গায় কৃষক আর ভূমিহীন ক্ষেত-মজুরেরা সাহস করে চেয়েছিল জমি, চেয়েছিল খাজনা আর সুদের হার কমাতে, মজুরি বাড়াতে, অবস্থার উন্নতি করতে।

৫। শহরে মধ্যবিত্তদের দশা এর চেয়ে কিছু ভাল নয়। জিনিসপত্তরের দর আগুনের মতো, বেতন কমছে, বেকারি বাড়ছে। সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে, ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স আর সওদাগরী অফিসে, স্কুলে, কলেজে, সর্বদাই মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবীদের সামনে একই জীবন সমস্যা—শ্রমিকেরই মতো, মেহনতী কৃষকদেরই মতো।

৬। এ-সরকারের নীতির দরুন এমন কি শিল্পপতি, কারখানার মালিক আর ব্যবসাদাররাও ঘা খাচ্ছে; কেননা এ-সরকার রয়েছে একচেটিয়া অর্থপতি, জমিদার, দেশী রাজরাজড়া আর এদের ইংরেজ পরামর্শদাতার কবলে—ইংরেজ পরামর্শদাতারা অন্তরীক্ষে বসে কলকাঠি নাড়ছে। সরকারি যন্ত্রের আমলারা এমন কায়দায় পুঁজি, কাঁচামাল, যানবাহনের সুযোগ-সুবিধে, আমদানি রপ্তানির ছাড়পত্র ইত্যাদির বিলিব্যবস্থা করছে যাতে ছোটখাটো শিল্পপতি আর ব্যবসাদাররা পথে বসে, আর লাভ লুটতে পারে শুধু বিদেশী ব্যাঙ্ক আর ব্যবসা সংঘের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বড় একচেটিয়া পুঁজিপতিরাই।

৭। 'পুনর্গঠনের' পরিকল্পনা, জলসেচ ব্যবস্থা, জলবিদ্যুত উৎপাদন কেন্দ্র কারখানা তৈরি ইত্যাদি—তা সে সোজাসুজি সরকারি উৎসাহেই হোক আর বেসরকারি পুঁজির সঙ্গে অংশীদারীতেই হোক—সবই বানচান হয়ে যাচ্ছে; কেবল যেগুলি সরাসরি লড়াইয়ের কাজে লাগে সেইগুলি ছাড়া। বিশেষজ্ঞ ও জিনিসপত্রের জোগানদার বিদেশী প্রতিষ্ঠান, ভারপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ আমলা আর স্টক এক্সচেঞ্জের বড় ফাটকাবাজের দল যাতে সরকারি তহবিল লুট করতে পারে এই পরিকল্পনাগুলো তারই উপায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। রব তোলা হয়েছে, চোরাকারবারীরা জনসাধারণকে লুট করে যেসব শিল্প ফেঁদেছে সেগুলোর জাতীয়করণ নিয়ে।

এই রবের সাহায্যে সরকারি তহবিল লুট করবার ব্যবস্থা ঃ সরকারি টাকায় কতকগুলো দেউলে আর লক্কড় প্রতিষ্ঠান কেনা আর কতকগুলো ভাঁওতাবাজী পরিকল্পনায় সরকারকে ভিড়িয়ে দেওয়া। শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনাগুলো লাটে ওঠেই আর তখন সরকারের অনুগ্রহভাজন আর বেসরকারি পুঁজিপতিদের কাছে এগুলো বেঁচে দেওয়া হয়। ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, ইংরেজ পুঁজিপতিদের লেজুড় এই সরকারটির হাতে দেশের শিল্প একটুও উন্নত হচ্ছে না। ইংরেজ-মার্কিনেরা এদেশকে শিল্পে উন্নত করায় উৎসাহী নয় অথচ দেশের শিল্প উন্নতিকে তাদেরই কৃপানির্ভর করে রাখা হয়েছে।

৮। যেটুকু শিল্পও বা দেশে আছে সেটুকুতেও একটানা সংকট লেগেই রয়েছে। কেননা জনসাধারণের—বিশেষ করে কৃষকদের—অভাব বেড়ে চলার ফলে দেশে তার যথেষ্ট বাজার মেলে না। এই সব শিল্পগুলি দেশের ভিতরে এবং বাইরে সর্বত্রই বিদেশী ব্যবসাদার আর উপনিবেশের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের সঙ্গে পাল্লা দিতে বাধ্য হচ্ছে আর তাই শেষ পর্যন্ত অথৈ জলে পড়ছে।

৯। এই সব ব্যাপারের উপর, জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের মুখোমুখি হয়ে এই নড়বড়ে সরকারটি গদি আঁকড়ে থাকবার আশায় জনসাধারণের সবরকম ব্যক্তিস্বাধীনতা দাবিয়ে দেয়, রাজনৈতিক সংগঠন আর দলগুলিকে বেআইনি বলে ঘোষণা করে, শ্রমিকসংঘ এবং জনসাধারণের অন্যান্য সংঘগুলির উপর নিষেধ জারি করে, হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষ শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রকে কয়েদখানা আর বন্দী শিবিরে আটক করে। স্থানীয় কংগ্রেসী নেতা এবং জমিদারের সাহায্য পেয়ে পুরো গ্রাম এলাকার চরম শাসক হয়ে দাঁড়ায় পুলিশ কর্মচারী আর আমলার দল। এরকম পুলিশীরাষ্ট্র টিকিয়ে রাখবার জন্যে জনসাধারণের উপর খাজনার বোঝা যে বেড়েই চলবে, সরকারি খরচের অর্ধেকেরও বেশি খাদ্য, বস্ত্র, বাড়ি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতার খাতে খরচ না হয়ে পুলিশ, পল্টন, কয়েদখানা আর আমলা যন্ত্রের খাতে খরচ হবে এতে অবাক হবার কিছু নেই।

১০। এসব ব্যাপারের আসল মানে যে কি সে সম্বন্ধে ক্রমশই ভারতীয় জনগণের চোখ ফুটছে, এই সরকারকে বদল করবার তাগিদ যে কতখানি সে বিষয়ে উপলব্ধি হচ্ছে।—জমিদার আর রাজরাজড়ার এই সরকার, ফাটকাবাজ আর টাকার কুমীরদের এই সরকার, ইংরেজ কমনওয়েলথ আর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের মর্জির উপর ঝুলে রয়েছে এই সরকার। মোহমুক্ত জনতা অনাহার আর মন্থর মৃত্যুর দশায় নাচার হয়ে ধীরে ধীরে সংগ্রামের পথে পা বাড়াচ্ছে, গড়ে উঠছে নগরে শ্রমিকের সংগ্রাম, গ্রামে কৃষকের প্রতিরোধ।

১১। দিনের পর দিন মজবুত হচ্ছে জনগণের একতা—বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে ঐক্য এবং কৃষকদের সঙ্গে তার মৈত্রী, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের লেজুড় জমিদার, রাজরাজড়া আর প্রতিক্রিয়াশীল বড় বুর্জোয়াদের এই সরকার খতম করায় যে সমস্ত শ্রেণিরই উৎসাহ আসলে তাদের সকলেরই একতা। এই একতা যাতে গড়ে উঠতে না পারে সেই আশায় পুলিশের জল্লাদ নীতি ছাড়াও সরকার অন্যান্য উপায়ের সাহায্য নিচ্ছে।

১২। দেশকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে পুরোপুরি মুক্ত করায় জনগণের আগ্রহ দেখে সরকার ঘোষণা করে দিল ভারতবর্ষ প্রজাতন্ত্র হয়েছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক তো সত্যিই ছিঁড়তে চায় না, তাই সরকার নির্লজ্জের মতো আরও ঘোষণা করল যে

এই প্রজাতন্ত্র সাম্রাজ্যেরই অঙ্গবিশেষ।

ইংরেজ সাম্রাজ্যের সভ্য হওয়াটা তো সত্যিই নেহাত শিষ্টাচার নয়। অথচ সরকারের ঘোষণাটা তাই-ই। ইংরেজ-মার্কিনদের মধ্যে যে রেষারেষি কোন কোন অবস্থায় নিজের স্বার্থে তা কাজে লাগাতে পারলেও এ-সরকার মোটের উপর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের বৈদেশিক নীতির তামিল করছে। জনগণ যুদ্ধ চায় না, শান্তি চায়। জনগণের চাপে পড়ে এ-সরকার মুখে এ্যাটম্ বোমার বিরুদ্ধে শান্তির বুলি আওড়ায়; অথচ কোরিয়ায় মার্কিন ফৌজদের সেবা করবার জন্যে নামমাত্র হলেও ডাক্তারী দল পাঠাতে কুণ্ঠা হয় না, মালয়ের মুক্তি সংগ্রাম দমন করবার জন্যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের সুযোগ দেওয়া হয় গোর্খা আর শিখ সৈন্য সংগ্রহ করতে, ভিয়েতনামের জনগণের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার পথে ফরাসী উড়োজাহাজগুলোকে এ-সরকার ভারতবর্ষের বিমান ঘাঁটি ছেড়ে দেয়। ভারতীয় নৌবহর ইংরেজ নৌবহরের অংশ হিসাবে ইংরেজ কর্তাদের হুকুম মেনে চলে। এ-সরকারের রক্ষা বিভাগের চাবিকাঠিটি ইংরেজ মাতব্বরদেরই হাতে, তারাই সে চাবি ঘোরায়। **দেশটার ফৌজ কতখানি মুক্ত হল তাই যদি দেশের সার্বভৌমত্ব আর স্বাধীনতার একটা মাপকাঠি হয় তাহলে মানতেই হবে আমাদের দেশের স্বাধীনতার আসল ব্যাপারটাই এখনও ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতেই রয়েছে।**

এইভাবে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের মনিব-মানা ছাড়াও ভারত সরকারের নীতির দরুন আমাদের জীবনে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রের ব্যাপারে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে প্রবেশপথও সুগম হচ্ছে; ফলে মার্কিন পুঁজির কাছে আজ আর একটা উপরি-গোলামীর ভয়।

১৩। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা নতুন কংগ্রেসী সরকারের কোরা চাদর দিয়ে নিজেদের শাসন ঢাকা দেবার আগে দেশটাকে হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষ আর খুনোখুনি দিয়ে চুপিয়ে নিল। তারপর দেশটাকে ভারতবর্ষ আর পাকিস্তান এই দুরাষ্ট্রে ভাগ করল। সাম্রাজ্যবাদীরা এইভাবে চাষবাসের দিক থেকে ভারতবর্ষের আর শিল্পের দিক থেকে পাকিস্তানের অর্থনীতিকে দুর্বল করে ফেলল। এবং এইভাবেই পরস্পরের মধ্যে খেওখেয়ি লাগিয়ে দিয়ে, যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়াই যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে, দুটো রাষ্ট্রকেই তথাকথিত 'নিঃস্বার্থ তৃতীয় দলের' উপর, অর্থাৎ কিনা সাম্রাজ্যবাদীদের উপর—নির্ভর করতে বাধ্য করল।

দেশ বিভাগের দরুন কংগ্রেস সরকার দেখল জনগণের ন্যায্য দাবিটুকু হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের উত্তেজনা দিয়ে ধামাচাপা দেবার সুযোগ। এই সুযোগে যে-টাকা দিয়ে জনগণের অবস্থার উন্নতি করা যায় সেই টাকা পল্টনী খাতে খরচা করবার মওকা পাওয়া গেল। সুযোগ পেল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে লড়াইয়ের হাতিয়ার সওদা করার। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরাও তো ঠিক এই-ই চায়, চায় যে জনগণকে যন্ত্রপাতি আর অন্যান্য দরকারি জিনিসের সরবরাহ থেকে বঞ্চিত করে ভারতবর্ষ আর পাকিস্তানের কাছে ওদের যে স্টার্লিং দেনা তা লক্কড় অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে শোধ করবে।

১৪। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিগুলির দাবি হল স্বাধীন বিকাশের দাবি, আগেকার আমলের জগাখিচুরী ব্রিটিশ প্রদেশ আর দেশী রাজ্যগুলি বদলে সংযুক্ত ভারতের ভিতর স্বায়ত্তশাসন আর ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের দাবি। দেশবিভাগ আর ধর্ম নিয়ে মারামারি কাটাকাটির সাহায্যে এই দাবিকেও দাবিয়ে দেওয়া হল। ঐক্যবদ্ধ দেশের দোহাই দিয়ে হিন্দী ভাষাকে—যে-ভাষা কিনা দেশের মাত্র একটা অংশর ভাষা—সমস্ত জাতি এবং রাজ্যের

উপর রাষ্ট্রভাষা বলে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হল যাতে তাদের মাতৃভাষা অধঃপাতে যায়। একটা জাতির বিরাট এলাকা আর লক্ষ লক্ষ মানুষকে জোর করে এমন শাসনাধীনে বাস করতে বাধ্য করা হল যার আমলাতন্ত্র ও সরকার প্রধানত ভিন্ন জাতিরই দখলে। বিরাট বিরাট আদিবাসী এলাকাগুলির নিজস্ব অর্থনীতি আর সংস্কৃতি থাকা সত্ত্বেও এগুলিকে কোন না কোন অন্য জাতির জমিদার আর টাকার কুমীরের কৃপা-নির্ভর করা হল; এবং এইভাবেই দেশকে একতাবদ্ধ করবার জন্যে জনগণের যে আকাঙ্ক্ষা আসলে তাই দিয়েই দেশের লোকের মধ্যে বিভেদ আর বিবাদের বীজ ছড়ান হল।

১৫। জনসাধারণের কোটি কোটি টাকা আইন সভার হট্টগোলে ফৌত করে দেবার পর শেষ পর্যন্ত এই সরকার জনগণের সরকার হিসেবে নিজেকে জাহির করবার জন্যে প্রসব করল একটি জিনিস, যার নাম দেওয়া হয়েছে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র। দেশের লোককে ডাক দিয়ে বলা হল, এই শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে নিজেদের সরকার নিজেরা গড়ে নাও এবং শাসনতন্ত্রে যেসব মৌলিক অধিকারের উল্লেখ আছে সেগুলোকে কাজে খাটাও। বলা হল, জনতার খুশি হলেই তো আজকের স্বৈরাচারী শাসন খতম করতে পারে, পারে স্বাধীন ভারতীয় প্রজাতন্ত্রর 'গণতান্ত্রিক' শাসনতন্ত্র অনুসারে নিজেদের মুক্তি পেতে।

১৬। এ-কথা যদিও ঠিক যে ভারতের এই শাসনতন্ত্র অনুসারে প্রাপ্তবয়স্ক সবাইকারই ভোটে অধিকার আছে। জনতা সে-অধিকার ব্যবহার করতে পারে এবং করবেও। তবু, শুধু ভোট দিয়ে এই জমিদার-পুঁজিবাদীর শাসন দেশ থেকে দূর করা সম্ভব, সাম্রাজ্যবাদীর কবল থেকে জাতীয় জীবনকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব—এমনতরো কথা বলাও দেশের লোককে ধাপ্পা মারাই। সবাইকার ভোটে অধিকার থেকে শ্রমিক শ্রেণির ও জনতার চেতনার পরিণতিটা মাপা যায় এবং রীতির দিক থেকে এ অধিকার গণতন্ত্রের অঙ্গই। কিন্তু জমি যতদিন কৃষকের না হয়ে জমিদারের সম্পত্তি হয়ে থাকে, যতদিন জনগণ জমিদার পুঁজিবাদের শক্তিতে ক্ষেতে আর কারখানায় বাঁধা পড়ে থাকে, যতদিন পর্যন্ত পুঁজিবাদের শক্তিতে খবরের কাগজ এবং প্রচারের অন্যান্য সমস্ত উপায়গুলি জনগণের কানে শুধু মিথ্যের বিষ ঢালে, টাকার হুমকি যতদিন পর্যন্ত ধর্ম ও জাতিভেদের সংঘর্ষ রেষারেষি দিয়ে জনগণকে বিভক্ত ও দুর্বল করে রাখে, যতদিন পর্যন্ত আমলা আর পুলিশের দল রাজনৈতিক সংগঠনগুলিকে বেআইনি করে রাখতে পারে, পারে ব্যক্তি স্বাধীনতার টুঁটি টিপে এমনকি আইন পরিষদের নির্বাচিত সভ্যদেরও তাদের মতবাদ ও সৎ চেষ্টার অপরাধে বিনা বিচারে কয়েদ করতে, ততদিন পর্যন্ত সকলের পক্ষে ভোট দেবার এই অধিকার দিয়ে শোষিত মেহনতকারী জনতার আসল আকাঙ্ক্ষা আর আসল স্বার্থ প্রকাশ করা অসম্ভব।

১৭। নতুন শাসনতন্ত্রের আওতায় জনগণ বা তাদের নির্বাচিত সরকার মুক্তি ও সুখের পথে পা বাড়াতে পারবে—জনতাকে এ-কথা শোনানোও আসলে ধাপ্পা মারাই। শাসনতন্ত্র জনতাকে এমন কোন অধিকার দেয়নি যা জোর করে কার্যকরী করা যায়, কিংবা অপসারণ বা সর্ববিধ আক্রমণের অতীত, আমলাতন্ত্র জরুরি অবস্থার নামে স্বেচ্ছাচারী নির্দেশ জারি করলে যে অধিকার সে নির্দেশের দ্বারা ক্ষুণ্ন হবে না। শ্রমিক ও চাকুরেদের পক্ষে ধর্মঘট করতে পারার অধিকার, বাঁচবার মতো বেতন পাবার অধিকার, কাজ ও বিশ্রাম পাবার অধিকার—এ-সবের তরফে কোন প্রতিশ্রুতি নেই, এগুলিকে জোর করে কায়েম করবার কোন কায়দাও নেই। ছোঁয়া

চলবে না জমিদারের জমি, গদিয়ান বা গদিচ্যুত রাজাদের সম্পত্তি আর আয়। মনে হয়, ভূমিহীন কৃষক যদি নগদ কিনতে পারে কিংবা জমিদারকে খেসারত জোগাতে পারে তাহলেই সে জমি পাবে। কিন্তু কিনতে গেলে বা খেসারত দিতে গেলে পুঁজি লাগে; কোটি কোটি গরীব চাষীর পক্ষে কোনমতে দুমুঠো খাবার জোটানোই ভার, পুঁজি তারা পাবে কোথায়? অতএব, গরীব চাষীদের পক্ষে জমি ছাড়াই বাঁচতে হবে, তাদের দারিদ্র্য সমানই হয়ে থাকবে। ইংরেজ-মার্কিনদের সঙ্গে হরেক রকম চুক্তিপত্র সই করে এ-সরকার আমাদের দেশে বিদেশীর সম্পত্তিকে পবিত্র ও অলঙ্ঘ্য করে রেখেছে, তাদের কাছে কসম করা হয়েছে যে তাদের মুনাফাটুকুও ছোঁয়া হবে না এবং তারা মর্জিমাফিক এই মুনাফা এদেশ থেকে বের করে নিয়ে যেতে পারবে। ব্যাপারটা এই সরকারের চরিত্রমাফিকই হয়েছে। অথচ এমন দিনে এইসব চুক্তিপত্র সই করা হচ্ছে যখন দেশবাসীকে পুলিশ শাসকদের মুগুর-আইন থেকে কিংবা মহাজন মুনাফাখোরের লুটতরাজ থেকে বাঁচাতে সরকার কোনরকম কথা দিতে নারাজ।

তাই, জমিদার, সামন্ত রাজা আর সাম্রাজ্যবাদীরা যাতে আমাদের অর্থনীতি, জমি আর পুঁজির টুঁটি টিপে রাখতে পারে এই শাসনতন্ত্রের মধ্যে সে সম্বন্ধে কসম থাকলেও জনতার জীবন ও স্বাধীনতার কোন অঙ্গকে রক্ষা করবার কোন প্রতিশ্রুতি নেই। বড় জোর কিছু কিছু ধর্মবুলি আর অলীক ইচ্ছে নিয়ে কপ্চানী আছে। এই শাসনতন্ত্র সত্যকার গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র নয়, একে মোটেই তা বলা চলবে না। আসলে, এটা হল জমিদার পুঁজিদাররাজের শাসনতন্ত্র, যে রাজ কিনা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের—বিশেষ করে ইংরেজদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত।

১৮। এই রকম সাংঘাতিক অবস্থার দরুন, জনতাকে এইভাবে দৈন্য আর অরাজকতার পাঁকে ডুবিয়ে রাখবার দরুন, জনতা স্বভাবতই বর্তমান সরকারের উপর বিশ্বাস হারিয়েছে, এ-সরকারকে দারুণ সন্দেহের চোখে দেখছে, শুরু করছে একে শত্রু বলে চিনতে। এই শত্রু জমিদার মহাজন থেকে শুরু করে জনতার সবরকম শোষককে রক্ষা করছে। তাছাড়া, নানান প্রদেশে জনগণ এই সরকারের অমানুষিক শাসনের বিরুদ্ধে সোজাসুজি আপত্তি জারি করেছে, ঘোষণা করেছে বিদ্রোহ, আর কোন পথে এগিয়ে এই সরকারকে বদল করে নয়া গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করা যায় তাই খুঁজছে। সেই নয়া গণতান্ত্রিক সরকার জনতার আকাঙ্ক্ষা আর স্বার্থ প্রকাশ করতে পারবে, পারবে জমিদার, পুঁজিদার, মুনাফাখোর, মহাজন আর বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর অত্যাচার থেকে জনতাকে বাঁচাতে।

১৯। এইসব ঘটনার মুখোমুখি হয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বুঝছে জনসাধারণের সামনে বাস্তব কর্তব্য ও কর্মসূচির কাঠামো পেশ করা দরকার। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি এই কর্মসূচির সমর্থন করে। এবং আজকের সরকার যে জাঁতাকলে জনগণকে পিষছে জনগণ যদি তার থেকে মুক্তি চায়, যদি চায় স্বাধীনতা ও সুখের জীবন তাহলে ভারতের জনগণের পক্ষে এই কর্মসূচি কাজে পরিণত করা দরকার।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রেখেও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের দেশের বর্তমান উন্নতির অবস্থায় এক্ষুণি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবার দাবি করছে না। অর্থনৈতিক উন্নতির দিক থেকে ভারতবর্ষের পিছিয়ে পড়া অবস্থা বলে এবং শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতকারী বুদ্ধিজীবীদের গণপ্রতিষ্ঠানগুলি এখনো দুর্বল বলে, আমাদের পার্টি মনে করে এ দেশে এক্ষুণি সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের পার্টি মনে করে বর্তমান

গণতন্ত্র-বিরোধী, জনগণ-বিরোধী সরকারের অবসান ঘটিয়ে জনগণের গণতন্ত্রের নতুন সরকার কায়েম করবার মতো অবস্থা ঘনিয়ে এসেছে। দেশের সমস্ত সামন্ততন্ত্র-বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির একতার উপর এই নতুন সরকার গড়ে উঠবে, জনগণের অধিকার ঠিকমত রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারবে, পারবে বিনামূল্যে কৃষককে জমি দিতে, বিদেশী মালের সঙ্গে প্রতিযোগিতা বন্ধ করে দেশী শিল্পগুলিকে রক্ষা করতে এবং এইভাবে দেশকে নিশ্চিতভাবে শিল্পে উন্নত করে তুলতে। যাতে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি হয়, জনতা বেকার সমস্যার হাত থেকে বাঁচে এবং এইভাবে দেশ যাতে প্রগতি, সাংস্কৃতিক উন্নতি ও স্বাধীনতার উদার পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারে এই নতুন সরকার তার দায়িত্ব নিতে সক্ষম হবে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মতে, জনতার গণতন্ত্রের নতুন সরকার কোন্ কোন্ বাস্তব কর্তব্য কার্যকরী করতে এগোবে?

সেগুলি হল ঃ

রাষ্ট্রগঠনের ক্ষেত্রে

২০। জনতার সার্বভৌমত্ব—তার মানে, দেশের সমস্ত ক্ষমতা জনতার হাতে তুলে দেওয়া। দেশ শাসনের সমস্ত শক্তি একান্তভাবেই থাকবে জনগণ যে প্রতিনিধিদের নির্বাচন করবে তাদের উপর। যারা ভোট দিয়ে এই প্রতিনিধি ঠিক করবে তাদের মধ্যে বেশির ভাগ যদি কখনো দাবি করে তাহলে প্রতিনিধির প্রতিনিধিত্ব নাকচ হয়ে যাবে। প্রতিনিধিরা মাত্র একটি গণপরিষদ এবং একটি আইনসভা গঠন করবে।

২১। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা-সংকোচ। আইনসভা যে-আইন পাস করেনি রাষ্ট্রপতি বা তার মনোনীত ব্যক্তিরা সে-আইন জারি করতে পারবে না। আইনসভা নির্বাচন করবে রাষ্ট্রপতিকে।

২২। ১৮ বছর বয়েস হলেই ভারতের যে-কোন স্ত্রী পুরুষ নাগরিক আইনসভার নির্বাচনে এবং বিভিন্ন স্থানীয় সরকারের নির্বাচনে সমান, প্রত্যক্ষ ও গোপন ব্যলটের সাহায্যে ভোট দেবার অধিকার পাবে। ভোটদাতাদের মধ্যে যে-কেউ যে-কোন প্রতিনিধিমূলক অনুষ্ঠানে নির্বাচিত হবার অধিকারী হবে। জনগণের প্রতিনিধিদের বেতন দেবার ব্যবস্থা থাকবে। প্রত্যেক নির্বাচনের সময় সমস্ত রাজনৈতিক দলই মোট ভোটের সংখ্যা অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব পাবে।

২৩। ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় সরকার গণকমিটির সহযোগিতায় কাজ করবে, তাদের হাতে থাকবে প্রভূত শক্তি। উপর মহল থেকে (যেমন, লাটসাহেব, ম্যাজিস্ট্রেট বা কমিশনারের সুপারিশে) চাপানো স্থানীয় ও প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ উচ্ছেদ করা হবে।

২৪। ব্যক্তির এবং বসবাসের অলঙ্ঘনীয় অধিকার। বিবেক, ধর্মবিশ্বাস ও পূজা অর্চনা, বক্তৃতা, লেখা, প্রকাশ করা, জমায়েত হওয়া, ধর্মঘট করা ও সমিতি গড়া, যাতায়াত, জীবিকা—এই সমস্ত ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতা থাকবে।

২৫। ধর্ম, জাত, স্ত্রী পুরুষ, জাতি, উপজাতি নির্বিশেষে সমস্ত নাগরিকেরই সমান অধিকার থাকবে। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সমান কাজের জন্যে সমান বেতন হবে।

যে সামাজিক অসাম্যের দরুন মেয়েরা দুর্ভোগ ভোগে তার উচ্ছেদ করা হবে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বিবাহ ও বিচ্ছেদ সম্বন্ধে আইন, জীবিকা ও চাকুরি ক্ষেত্রে প্রবেশ—এই সমস্ত

ব্যাপারেই যাতে তারা পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার পায় এবং কাজে লাগাতে পারে তার জন্যে উপযুক্ত রক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে।

আচার, ঐতিহ্য এবং ধর্মের নামে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভাবে এক জাতের পক্ষে আর এক জাতকে পীড়ন করা, তথাকথিত উচ্চজাতির পক্ষে নিম্ন জাতির উপর—বিশেষ করে অস্পৃশ্যদের উপর—নিষেধজারি উচ্ছেদ করা হবে এবং এ সবের জন্যে আইনের সাহায্যে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

ধর্মের দিক থেকে সংখ্যায় যারা কম তাদের রক্ষা করা হবে বৈষম্য ও বাছ বিচারের হাত থেকে।

২৬। প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার। এক সাধারণ রাষ্ট্র গড়বার জন্যে ভারতের বিভিন্ন জাতির জনসাধারণকে ভারতীয় প্রজাতন্ত্র ঐক্যবদ্ধ করে তুলবে—জোর করে নয়, তাদের স্বেচ্ছায় দেওয়া মত অনুসারে।

২৭। ভারতীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রগুলির বর্তমান সীমারেখা নতুনভাবে নির্ধারিত করা হবে এবং সাধারণ ভাষার ভিত্তিতে রাষ্ট্রগুলিকে পুনর্গঠন করা হবে। যে-সব জায়গায় এখনো সামন্ত রাজ্য রয়েছে সেগুলিকে আশপাশের উপযুক্ত জাতীয় রাজ্যের মধ্যে বিলীন করে দেওয়া হবে। বিদেশীর কবলে যে-সব জায়গা আছে তা দেশকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং একই সূত্র অনুসারে সেগুলির পুনর্গঠন করা হবে। আদিবাসী এলাকাগুলি, কিংবা যে এলাকাগুলির জনসংখ্যার গঠন সুনির্দিষ্ট এবং যাদের কতকগুলো সামাজিক বৈশিষ্ট্য আছে, কিংবা যেগুলিতে কোন একটি লঘু-সংখ্যক জাতি আছে, সেগুলিকে সম্পূর্ণ এলাকাগত স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হবে এবং সেখানে এলাকাগত সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে ও তাদের উন্নতির জন্যে সম্পূর্ণ সাহায্য করা হবে।

২৮। শিল্প, কৃষি এবং ব্যবসায়ের ওপর আয় অনুসারে ক্রমবর্ধমান আয়কর ধার্য করা হবে; শ্রমিক, কৃষক আর কারিগরদের উপর থেকে যতটা সম্ভব কর লাঘব করা হবে।

২৯। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জনগণ যাতে মাতৃভাষায় শিক্ষা পায় তার অধিকার স্থাপন করা হবে; প্রতিটি রাষ্ট্রের সরকারি ও জনপ্রতিষ্ঠানে যাতে জাতীয় ভাষা ব্যবহার করা হয় তার ব্যবস্থা করা হবে; এবং যেখানে যেখানে দরকার সেখানে সেখানে জাতীয় ভাষা ছাড়াও সংখ্যালঘুদের বা এলাকা বিশেষের ভাষা ব্যবহারে সুযোগ করা হবে। অখিল-ভারত রাষ্ট্রভাষা হিসেবে হিন্দীর ব্যবহার বাধ্যতামূলক হবে না। হিন্দীভাষা এলাকায় উর্দু ও দেবনাগরী হরফকে রক্ষা করা হবে এবং জনগণ এ'দুটির মধ্যে যে-কোন হরফ ব্যবহার করতে পারবে।

৩০। নিম্নোক্ত সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবার, উৎসাহ দেবার এবং উন্নত করবার ব্যবস্থাও করা হবে ঃ

—যার সাহায্যে আদিবাসী সমেত প্রতিটি জাতি নিজেদের মতো করে এবং পুরো দেশের গণতান্ত্রিক জনগণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আপন ভাষা ও সংস্কৃতিকে উন্নত করতে পারে;

—যার থেকে গণতান্ত্রিক জনতা নিজেদের বাঁচবার অবস্থাকে উন্নত করবার এবং নিজেদের জীবনকে ঐশ্বর্যশালী করবার খোরাক পায়;

—যার সাহায্যে ঐতিহ্যগত ভাবে জমিদার-পুঁজিবাদ শ্রেণি মেহনতকারী জনতার উপর জাতিভেদ, ধর্মবিদ্বেষ, কুসংস্কার, ভয়, দাসত্ব ও অন্ধ বিশ্বাসের যেসব ধারণা ঢুকিয়েছে,

সেগুলির হাত থেকে মেহনতকারী জনতা নিস্তার পেতে পারে;

—যার সাহায্যে অন্যান্য শান্তিপ্রিয় দেশের জনগণের সঙ্গে আমাদের দেশের জনগণের ভ্রাতৃভাব জাগে এবং যেগুলি জাতিগত ও দেশগত ঘৃণা দূর করে;

—যেগুলি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-প্রচার রদ করে এবং জনগণকে শান্তি ও মুক্তি পেতে সাহায্য করে।

৩১। জনগণের আদালতে যে-কোন কর্মচারীকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার সার্বজনীন অধিকার দেওয়া হবে।

৩২। কোনরকম ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাষ্ট্রর সম্পর্ক না রাখা। রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ করা হবে।

৩৩। ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে বিনা পয়সায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

৩৪। পুলিশের বদলে গণবাহিনী। ভাড়াটে আর অন্যান্য বাধ্যতামূলক সৈন্যদলের বিলোপ এবং ভারতবর্ষকে রক্ষা করবার জন্যে জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রে আবদ্ধ জাতীয় সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৩৫। দেশের মধ্যে থেকে কলেরা, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য মহামারীর ঘাঁটিগুলোকে উচ্ছেদ করবার জন্যে সারা দেশ জুড়ে চিকিৎসাকেন্দ্র আর হাসপাতালের বিস্তার করা হবে এবং এইভাবে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে।

কৃষি ও কৃষক-সমস্যার ক্ষেত্রে

আমাদের জাতীয় জীবনে কৃষি ও কৃষক সমস্যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।

আমাদের কৃষি ব্যবস্থার বেশি দূর উন্নতি আমরা করতে পারি না এবং দেশে খাদ্য ও কাঁচামাল সরবরাহ করতে পারি না, কারণ অভাবগ্রস্ত কৃষকের হাতে জমি নেই এবং সামান্য মামুলি যন্ত্রপাতি কিনে চাষবাসের উন্নতি করবার ক্ষমতাও তার নেই।

আমাদের জাতীয় শিল্প আমরা গড়ে তুলতে পারিনা। এবং দেশকে বেশি দূর শিল্পোন্নত করতে পারি না, কারণ দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ হল অভাবগ্রস্ত কৃষক এবং তাদের পক্ষে কলকারখানায় তৈরি জিনিস এতটুকুও কিনবার পয়সা নেই।

আমাদের রাষ্ট্রকে আমরা মোটেই দৃঢ় করতে পারি না, কারণ কৃষকেরা আধপেটা খেয়ে, সরকারের কাছ থেকে কোনও সাহায্য না পেয়ে তাকে ঘৃণা করে এবং তাকে সমর্থন করতে রাজি হয় না।

আমরা শ্রমিক শ্রেণির অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করতে পারি না, কারণ লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষ অভাবের তাড়নায় গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে "মজুরের বাজার" ছেয়ে ফেলে, "মজুরির হার" কমিয়ে দেয়, বেকার বাহিনী ফাঁপিয়ে তোলে এবং এইভাবে মেহনতী জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের পেছিয়ে-পড়া অবস্থা আমরা ঘুচোতে পারি না, কারণ আধপেটা-খাওয়া কৃষকই হল দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ এবং তাদের কোন সামর্থ্য নেই যে

ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে পারে।

এইসব অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে হলে এবং আমাদের দেশকে যদি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পেছিয়ে-পড়া অবস্থা কাটিয়ে উঠতে হয়, তাহলে চাই কৃষকদের জন্য মানুষের মতো বেঁচে থাকার অবস্থার সৃষ্টি করা, চাই জমিদারদের কাছ থেকে জমি নিয়ে কৃষকের হাতে তুলে দেওয়া।

তা করতে হলে দরকার—

৩৬। বিনা পয়সায় জমিদারদের জমি নিয়ে বিলিয়ে দিতে হবে ক্ষেত-মজুরশুদ্ধ সব কৃষকদের মধ্যে এবং এই বন্দোবস্ত আইনগত করে নিতে হবে একটি বিশেষ আইন জারি করে; এইভাবে বিনা খেসারতে জমিদারিপ্রথা লোপ করা হবে।

৩৭। কৃষকেরা যাতে কৃষির যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনমত বীজ ইত্যাদি কিনতে পারে তারজন্য দীর্ঘমেয়াদী এবং কম সুদে কর্জ পাবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ছোট কারিগররা যাতে কাঁচামাল ইত্যাদি কিনতে পারে এবং তাদের কারবার ও ব্যবসা চালাতে পারে তারজন্য দীর্ঘমেয়াদী ও কম সুদে কর্জ করবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

৩৮। পুরোনো সেচ ব্যবস্থাগুলির উন্নতি এবং নতুন সেচ ব্যবস্থা তৈরি করার জন্য সরকারের কাছ থেকে কৃষকদের সাহায্য দেওয়ার বন্দোবস্ত করে দিতে হবে।

৩৯। মহাজনের কাছে কৃষক ও ছোট কারিগরদের যা ঋণ আছে তা বাতিল করতে হবে।

৪০। ক্ষেত মজুরদের জ্য উপযুক্ত মজুরি ও বাঁচবার মত ব্যবস্থা করতে হবে।

শিল্প ও শ্রমিক সমস্যার ক্ষেত্রে

আমাদের জাতীয় শিল্পের দুর্দশার কারণ কৃষকদের জিনিসপত্র কেনবার ক্ষমতা অত্যন্ত কম ত বটেই, তার উপর এদেশে আমদানি করা বিদেশী মালের প্রতিযোগিতাও তাকে সামলাতে হয়। সরকার যেসব শিল্পপতিকে বিদেশী মালের সর্বনাশা প্রতিযোগিতা থেকে বাঁচাতে নারাজ তারা এই প্রতিযোগিতার ক্ষতিপূরণ করে নেওয়ার চেষ্টা করে শ্রমিকদের উপর বেশি করে চাপ দিয়ে, শ্রমিকদের অবস্থা আরো সঙ্গীন করে তোলে। কিন্তু শ্রমিকদের জীবনযাত্রার অবস্থা যদি খারাপ হতে থাকে তাহলে শিল্পের উন্নতি হতে পারে না, কারণ যে শ্রমিক পেটের জ্বালায় মরছে, হাতে একপয়সা রাখার অবস্থা যার নেই সে কখনও আধুনিক শিল্প গড়ে তোলার কাজে সাহায্য করতে পারে না। আমাদের শিল্প বিকাশ এত কম হবার এটাও একটি কারণ। এই গোলকধাঁধাঁ থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য চাই আমাদের জাতীয় শিল্পকে বিদেশী মালের প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করা, দেশের শিল্প যথাসম্ভব বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করা, শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা উন্নত করা। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে যে তা করতে হলে চাই—

৪১। যথাবিহিত আইন জারি করে বিদেশী মালের প্রতিযোগিতা থেকে জাতীয় শিল্পকে বাঁচাতে হবে।

৪২। জাতীয় শিল্পকে উন্নত করতে হবে এবং দেশের শিল্প বিস্তারের জন্য উপযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ পুরোমাত্রায় নিয়োগ করতে হবে।

৪৩। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি যাতে জনগণের স্বার্থে একটি পরিকল্পনা মাফিক হয়

তারজন্য দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন বিভাগগুলিকে ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং তাদের মধ্যে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য আনতে হবে।

৪৪। শ্রমিকদের বাঁচবার ও কাজ করবার অবস্থাকে আমূল উন্নত করতে হবে। তাই বাঁচবার মতো মজুরি ঠিক করতে হবে, সমস্ত শিল্প ও ব্যবসায়ে দিনে ৮ ঘণ্টা ও সপ্তাহে ৪৪ ঘণ্টা কাজের সময় বেঁধে দিতে হবে। মাটির নীচে খনিতে এবং অন্যান্য যে সব কাজে স্বাস্থ্য জখম হয় তাতে দিনে ৬ ঘণ্টা করে কাজের সময় বেঁধে দিতে হবে; কাজ করতে করতে কেউ অক্ষম হলে বা বেকারি হয়ে পড়লে যাতে সামাজিক বীমার সাহায্য পায় সরকার ও পুঁজিপতিদের খরচায় তার ব্যবস্থা করতে হবে; ট্রেড ইউনিয়নগুলির সহযোগিতায় চাকুরি-যোগাড় করে দেওয়ার দপ্তর খুলতে হবে; শিল্প-আদালত বসাতে হবে।

ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে স্বীকার করে নিতে হবে এবং শ্রমিকদের একত্রিত দর কষাকষির অধিকার ও ধর্মঘট করবার অধিকার দিতে হবে।

৪৫। জনসাধারণের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামের উপর পাকা কণ্ট্রোল চালু করতে হবে।

৪৬। বাস্তুহারাদের সমস্যা, বিশেষ করে লক্ষ লক্ষ ভিটে-ছাড়া শ্রমিক, কৃষক, কারিগর ও মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবীদের সমস্যার সমাধান করতে হবে। তারজন্য সরকারকে তাড়াতাড়ি তাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করতে হবে, বিশেষ করে তাদের জমি দিতে হবে, মেহনতের হাতিয়ার দিতে হবে, চাকুরি দিতে হবে এবং নিজেদের জাতীয় পদ্ধতি অনুসারে তাদের জীবন গড়ে তোলবার সুযোগ সুবিধা করে দিতে হবে।

ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা

ইংরেজ আমাদের দেশ ছেড়ে গিয়েছে, এই কথা নিয়ে যত ফলাও বিজ্ঞাপনই দেওয়া হোক না কেন, আসলে কিন্তু অনেক কলকারখানা, খনি, চা-বাগান, জাহাজ ও ব্যাঙ্ক-ব্যবসার মালিক এখনো ইংরেজই; এইসব থেকে তারা প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা কামায়। আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের উপর এই শক্তি থাকার দরুন এবং আমাদের দেশের যেসব বড় বড় পুঁজিপতিরা ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তাদের সঙ্গে যোগসূত্র ও অংশীদারী থাকার ফলে আড়ালে বসে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের সহযোগীরা এমন কলকাঠি নাড়ছে যে দেশের শিল্প উন্নত হয় না, দারিদ্র্য লেগেই থাকে।

ব্যাপকভাবে শিল্পের বিকাশ না হলে আমাদের দেশ শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী হতে পারে না। কিন্তু দেশে যতদিন বিদেশী পুঁজি খাটে যতদিন পর্যন্ত ওদের সহকারী রাঘববোয়াল দেশি পুঁজিপতিরা সাম্রাজ্যের সঙ্গে আমাদের বেঁধে রাখে ততদিন পর্যন্ত আমাদের ততখানি শিল্প-উন্নতি সম্ভবই নয়, কেননা ইংরেজ ব্যবসার মুনাফা দেশ থেকে বেরিয়ে যায়, দেশের শিল্প উন্নত করবার কাজে লাগে না।

তাছাড়াও মনে রাখতে হবে অসংখ্য ইংরেজ পরামর্শদাতাদের কথাও; আমাদের নৌবহর, ফৌজ, পুলিশ এবং অন্যান্য সব পিটুনী-সংগঠনই এইসব পরামর্শদাতায় ভরা।

সত্যিকারের স্বাধীন রাষ্ট্র হতে গেলে সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের গেরো খুলতে হবে,

দেশের অর্থনীতির উপর থেকে ইংরেজ পুঁজির আধিপত্য হঠাতে হবে, হঠাতে হবে ইংরেজ পরামর্শদাতাগুলিকে।

তাই, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলির প্রয়োজন আছে ঃ

৪৭। "জাতিসমূহের ব্রিটিশ কমনওয়েলথ" থেকে এবং ইংরেজ সাম্রাজ্য থেকে ভারতবর্ষের পক্ষে বেরিয়ে আসা।

৪৮। নিজেদের নামেই হোক আর দেশী কোম্পানীর সাইন বোর্ড দিয়েই হোক, ভারতবর্ষে ইংরেজের মালিকানায় যেসব কলকারখানা, ব্যাঙ্ক, চা-বাগান জাহাজী-কারবার আর খনি আছে সেগুলিকে বাজেয়াপ্ত করে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা।

৪৯। ইংরেজ পরামর্শদাতারা যেসব গদিতে বসে আছেন সেখান থেকে তাদের হটানো।

ভারতের বৈদেশিক নীতির ভিত্তি

ভারতবর্ষ শান্তি চায়, শান্তপূর্ণ বিকাশ চায়। সমস্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতায় ভারতবর্ষের আগ্রহশীলতা আছে। ব্রিটেন যদি সম্পূর্ণ সমান অধিকারের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা করতে চায় তাহলে তাকেও বাদ দেওয়া হবে না। বর্তমান ভারতীয় সরকার যেভাবে শান্তি ও যুদ্ধের মধ্যে, শান্তিশিবির ও হামলায় উন্মুখ যুদ্ধবাদীদের মধ্যে ধড়িবাজী চাল চালছে তাতে ভারতবর্ষের মঙ্গল হবে না।

আজকের দিনে শান্তির সবচেয়ে বড় শত্রু আর আক্রমণাত্মক যুদ্ধের সবচেয়ে বড় পাণ্ডা হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আজ সেই তার চারিপাশে টেনে এনেছে সব যুদ্ধবাজ দেশগুলিকে। যুদ্ধবাজদের এই শিবির আজ শান্তিশিবিরের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। শান্তিশিবিরে আছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীনের গণ প্রজাতন্ত্র এবং জনগণতন্ত্রের অন্যান্য দেশগুলি। আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে শান্তিকামীদের সঙ্গে হাত না মিলিয়ে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধবাজদের প্রধান পাণ্ডা বলে ঘোষণা না করে, ভারতীয় সরকার আজ এই দুই শিবিরের মধ্যে ধড়িবাজীর চাল চালছে আর মার্কিনদের সঙ্গে ঢলাঢলি করছে; এইভাবে শান্তিপ্রিয় দেশগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণকারীদের সংগ্রামকে সাহায্য করাই হয়। ভারতবর্ষের পক্ষে দরকার হল শান্তিপ্রিয় দেশগুলির সঙ্গে একজোট হওয়া, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা, শান্তি আর যুদ্ধের মধ্যে চাল চালবার চেষ্টা নয়।

ভারতবর্ষের স্বার্থের দিক থেকে আরও ক্ষতিকর হচ্ছে বর্তমানে ভারতীয় ইউনিয়ন আর পাকিস্তানের মধ্যে ঝগড়া বিরোধ—এবং আজকের ভারতীয় সরকার তা রদ করবার কোন চেষ্টা করছে না।

ভারত আর পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্ব ও পরস্পরকে সাহায্য করবার দৃঢ় বন্ধন প্রতিষ্ঠা করলে পর দেশ বিভাগ হবার ফলে ভারতের অখণ্ড অর্থনীতি যে টলমল করে উঠেছে আর ভারত পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধের সুযোগ নিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শাসনচক্রগুলো জনগণকে যেভাবে বিভক্ত করতে পারছে ইংরেজ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা যেরকম কাশ্মীরে নাক গলাচ্ছে সেইরকম নাক গলাবার যে সুযোগ পাচ্ছে, তা বন্ধ হবে। ভারতবর্ষের পক্ষে সিংহল ও নেপাল রাষ্ট্রের সঙ্গে দৃঢ় বন্ধুত্বের সম্পর্কও স্থাপন করা দরকার।

সিংহলের অর্থনীতি ভারতীয় অর্থনীতির উপর নির্ভর করে এবং তারই পরিপূরক। ভারতের চা বাগানের শ্রমিক এবং অন্যান্য শ্রমিকেরা সিংহলে গিয়েছে এবং সিংহলের জনসাধারণের মধ্যে এরা একটা বড় রকমের অংশ। সিংহল এবং ভারতবর্ষের জমিদার ব্যবসাদাররা সিংহলী ও ভারতবাসী শ্রমিকদের পরস্পরের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে। এইসব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মৈত্রী সূত্রের যে অভাব তার সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ও তার দালালরা এইসব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিবাদের বীজ ছড়ায়, জনগণের মধ্যে ঘৃণার বীজ ছড়ায় এবং এইভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে তাদের বাসভূমি থেকে উৎখাত করে। একমাত্র গভীর মৈত্রী ও বন্ধুত্ব স্থাপন করেই সাম্রাজ্যবাদীদের এবং এদেশগুলোর প্রতিক্রিয়াশীল শাসনচক্রের এই যে চাল তা ভেস্তানো সম্ভব।

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি তাই নিম্নোক্ত বিষয়ে দৃঢ় আশ্বাস দিচ্ছে ঃ

৫০। সমস্ত শান্তিপ্রিয় দেশের মিত্র হিসেবে সৎভাবে ও আগাগোড়া মিল রেখে শান্তির নীতি মেনে চলা এবং আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে একজোট হওয়া।

৫১। সম্পূর্ণ সাম্যের ভিত্তিতে এবং সবরকম ইতর বিশেষ বাদ দিয়ে যেসব রাষ্ট্র অর্থনৈতিক সহযোগিতা করতে পারে তাদের সবাইকার সঙ্গে এই সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করা।

৫২। পাকিস্তান, সিংহল ও নেপালের সঙ্গে মৈত্রী ও বন্ধুত্বের নীতি মেনে চলা।

৫৩। প্রবাসী ভারতবাসীদের বৈধ অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করবার যথাসাধ্য চেষ্টার নীতি মেনে চলা।

ভারতীয় জনগণ ঠিক কিসের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম চালাচ্ছে তারই স্পষ্ট ছবি যাতে তারা পায় এইজন্যে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি তাদের সামনে এই কর্মসূচি পেশ করল।

কোটি কোটি মেহনতী মানুষ, শ্রমিক শ্রেণি, কৃষক সমাজ, মেহনতী বুদ্ধিজীবী সমাজ, মধ্যবিত্ত এবং দেশের স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধিতে আগ্রহশীল জাতীয় বুর্জোয়া সবাইকে ডাক দিয়ে আমাদের পার্টি বলে ঃ দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবার জন্যে, সামন্তদের নিষ্পেষণ থেকে কৃষকদের মুক্তি দেবার জন্যে, মেহনতী জনগণের জীবনকে উন্নত করবার জন্যে, আমাদের কৃষিতে, আমাদের জাতীয় শিল্পে সামনের দিকে মস্ত এক ধাপ এগিয়ে যাবার জন্যে আর দেশে সাংস্কৃতিক উন্নতি আনবার জন্যে মাত্র একটি গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে একজোট হতে হবে।

মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্টালিনের শিক্ষায় চালিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং কোটি কোটি কৃষকের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে ভারতের জনগণ এই কর্মসূচিকে বাস্তবে পরিণত করবে। মার্ক্সবাদের নীতি ও দর্শন এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে দুনিয়ার প্রায় অর্ধেক মানুষকে সমাজতন্ত্র, মুক্তি ও আসল গণতন্ত্রে পৌঁছে দিয়েছে—তারই পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। মহান চীনের গণরাষ্ট্রের নেতৃত্বে এশিয়ার জনগণ আজ লড়াই করছে সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করবার জন্য। ভারতবর্ষই বাকী রয়েছে এশিয়ার মধ্যে শেষ বৃহত্তম, পরাধীন, আধা-ঔপনিবেশিক দেশ যার উপর সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা আজও লুঠ ও শোষণ চালাতে পারছে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্বাস করে যে ভারতবর্ষও অদূর ভবিষ্যতে বিজয়ী গণতন্ত্র হিসাবে দুনিয়ার বড় বড় জাতিগুলির পাশে আসনলাভ করবে এবং শান্তি, সমৃদ্ধি ও সুখের পথে এগিয়ে চলবে।

* র‍্যাশনালাইজেশন—মজুর ছাঁটাই, মজুরি হ্রাস, উন্নততর যন্ত্র নিয়োগ, কাজের চাপ বাড়ানো ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে ব্যয় সংকোচ ক'রে উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

টিকা : (১) এর পূর্বে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির খসড়া কর্মসূচী সহায়ক তথ্য-২-এ দিয়েছি। এখানে অর্থাৎ সহায়ক তথ্য-৩০-এ গৃহীত কর্মসূচীটি দেওয়া হল।

(২) যেহেতু সারা ভারত পার্টি সম্মেলনটি ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য সেই কারণে খসড়াতে অনেক জায়গায় পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা হয় এবং সবশেষে কর্মসূচীটি গৃহীত হয়।

(৩) গৃহীত কর্মসূচীতে যে সব জায়গায় মুদ্রণগত ত্রুটি ছিল, সেগুলিকে সংশোধিত আকারেই পেশ করা হল।

(৪) সংশোধন করতে গিয়ে আমরা যাতে ভুল না করি তার জন্য 'শুদ্ধিপত্র'টিও এখানে দেওয়া হল।

(—সম্পাদক)

শুদ্ধিপত্র

বর্তমান বইয়ের		মূল বইয়ের			
ধারা	লাইন	পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	৭	১	২০	শিখতে শুরু করেছে	শিখছে
২	১১	২	২-৩	প্রতিটি ক্ষেত্রেই সরকারী আশ্বাসবাণী বিফল হয়েছে	কোন ক্ষেত্রেই সরকার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি।
২	১২	২	৩-৪	জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে, এদিকে,... উঠছে ফেঁপে	অবস্থা ক্রমশই খারাপ হয়ে উঠেছে আর . উঠেছে ফেঁপে।
৪	৫	২	২১	জমি বলে কিছু নেই	জমি বলে প্রায় কিছু নেই।
৪	১০	৩	৪	দারুণ খাদ্যাভাব	চরম খাদ্যাভাব।
৪	১৪	৩	৯	চাহিদা	খাজনাটা।
৬	৭	৪	৪-৫	শুধু একচেটিয়া পুঁজিপতি আর তাদের সাক্ষাৎ বিদেশী ব্যাঙ্ক......	বিদেশী ব্যাঙ্ক আর ব্যবসাসঙ্ঘের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বড় একচেটিয়া পুঁজিপতিরাই।
৭	৪	৪	৯-১০-১১	ওস্তাদ যোগানদার...আমলা	বিশেষজ্ঞ ও জিনিসপত্রের যোগানদার বিদেশী প্রতিষ্ঠান, ভারপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ আমলা...
৭	৫	৪	১১	আর ফাটকাবাজের দল	আর স্টক এক্সচেঞ্জের বড় ফাটকবাজের দল।
৮	২	৪	২৪-২৫	অভাব বেড়েই চলেছে আর সেই দেশের মধ্যে যথেষ্ট বাজার নেই	অভাব বেড়ে চলার ফলে দেশে তার যথেষ্ট বাজার মেলে না।
১১	৩	৫	২৪	রাঘববোয়াল ব্যবসায়ীদের	বড় বুর্জোয়াদের
১১	৪	৬	১	এই একতাকে বানচাল করার আশায়	এই একতা যাতে গড়ে উঠতে না পারে সেই আশায়।
১১	৫	৬	২	নিতে শুরু করেছে	নিচ্ছে।

বর্তমান বইয়ের		মূল বইয়ের			
ধারা	লাইন	পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২	১৬	৬	২১	স্বায়ত্বশাসন	সার্বভৌমত্ব
১২	১৭	৬	২২	একটা আসল ব্যাপার	আসল ব্যাপারটাই
১৪	৪	৭	২৪	ধামাচাপা দেওয়া হল	দাবিয়ে দেওয়া হল।
১৪	৪	৭	২৪	দেশের মধ্যে একতা আনবার নামে	ঐক্যবদ্ধ দেশের দোহাই দিয়ে
১৪	৭	৮	৩-৪	আর একটা জাতির ব্যবস্থা করা হোল	এমন শাসনাধীনে বাস করতে বাধ্য করা হল যার আমলাতন্ত্র ও সরকার প্রধানত ভিন্ন জাতিরই দখলে।
১৭	৪	৯	১৩	যা নিয়ে জোর করা যায়	যা জোর করে কার্যকরী করা যায়।
১৭	৪	৯	১৩	কিম্বা যার সাহায্যে আমলা-তন্ত্র সংকটের কথা শুনিয়ে	কিম্বা অপসারণ বা সর্ববিধ আক্রমণের অতীত, আমলাতন্ত্র জরুরি অবস্থার নামে।
১৭	৫	৯	১৪	সে নির্দেশ দূর করা বা ভাঙা সম্ভব	যে অধিকার সে নির্দেশের দ্বারা ক্ষুণ্ন হবে না।
১৮	৩	১০	১৭-১৮	দেখতে শুরু করেছে	দেখছে
১৮	৪	১০	১৯	শোষককে রক্ষা করতে ব্যস্ত	শোষককে রক্ষা করছে।
১৮	৭	১০	২২	খুঁজতে চেষ্টা করছে	খুঁজছে।
১৯	১৫	১১	১৭	বিনা খেসারতে	বিনা মূল্যে।
৪৬	২২	১৯	১৯	জুলুম	আধিপত্য
৪৯	৭	২০	১৪	তারই পাশে এসে জুটেছে সমস্ত যুদ্ধবাজ দেশ	সেই তার চারিপাশে টেনে এনেছে সব যুদ্ধবাজ দেশগুলিকে।

পরিশিষ্ট অধ্যায়

অতিরিক্ত তথ্য

এই খণ্ডে মুদ্রণের কাজ যখন শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছিল, সেসময় সংশ্লিষ্ট পর্বের আরও চারটি দলিল আমাদের হাতে আসে। এগুলি হল ঃ (১) বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'ছাত্র-ফেডারেশনকে বে-আইনি করে সাধ্য কার'! এটি ১৯৫০ সালের ১২ জানুয়ারি প্রকাশিত হয়েছিল। (সহায়ক তথ্য-১) (২) 'ট্রেড ইউনিয়ন বিল' সম্পর্কে প্রোসেক্ট কর্তৃক প্রকাশিত এ আই টি ইউ সি'র বিবৃতি। ১৯৫০ সালের ২০-২১শে মার্চ দিল্লীতে ভারতীয় শ্রমিক সম্মেলনের নিকট এই বিবৃতি দাখিল করা হয়েছিল। আসলে এই বিলটি ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে বে-আইনি করার একটা খোলাখুলি প্রচেষ্টা। বিবৃতিতে বলা হয়েছিল এই বিলটি ছিল দাসত্বের সনদ। (সহায়ক তথ্য-২) (৩) কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি কর্তৃক 'সওয়াল-জবাব'-এর ৩০শে নভেম্বরে প্রকাশিত 'আগামীতে তে-ভাগার লড়াই'। এটি লিখেছিলেন 'বীরেন' ছদ্মনাম দিয়ে একজন লেখক। (সহায়ক তথ্য-৩) সর্বশেষ তথ্যটি হল ১৯৫১ সালের ন্যাশনাল বুক এজেন্সী কর্তৃক প্রকাশিত 'শান্তি আন্দোলনের নূতন পর্যায়' এই পুস্তিকা। এর অন্তর্ভুক্ত সব লেখাগুলি কমিনফর্মের এল পি পি ডি পত্রিকায় ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টি শান্তি আন্দোলনের গুরুত্ব বিবেচনায় এগুলির অনুবাদ ক'রে একই পুস্তিকার মধ্যে গ্রন্থিত করেছিল। (সহায়ক তথ্য-৪)

সাধারণত যেসব দলিল সহায়ক তথ্য হিসাবে এপর্যন্ত সংযোজিত হয়েছে, সেগুলির পটভূমি, বক্তব্য এবং অর্ন্তর্নিহিত গুরুত্ব যথাসম্ভব বিবৃত করা হয়েছে প্রতিটি অধ্যায়ের ভূমিকাতে। নতুন এই চারটি দলিল সম্পর্কে সেরকম কিছু বলা না থাকলেও এগুলির সংযোজন করা হল পরিশিষ্ট অধ্যায়ে কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট সময়কালের তথ্য হিসাবে, বলা চলে নথিভুক্ত করা হল। পরে পাওয়া তথ্যগুলিকে আগে ভেবেছিলাম একটা 'অতিরিক্ত খণ্ড' হিসাবে প্রকাশ করব। সবগুলি খণ্ড শেষ হওয়ার পর 'অতিরিক্ত খণ্ড' প্রকাশ করা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে, এইসব তথ্য এখন থেকে প্রতিটি খণ্ডের শেষে পরিশিষ্ট অধ্যায়ে সংযোজিত করব। (—সম্পাদক)

স্বাধীনতা শান্তি প্রগতি

ছাত্র-ফেডারেশনকে

বে-আইনী করে সাধ্য কার!

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র-ফেডারেশন

ছাত্রফেডারেশনকে বে-আইনি করে সাধ্য কার!

শিক্ষা, শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের সংগ্রাম দুর্বার করে তোল!

ছাত্র-ছাত্রী বন্ধুগণ!
গত ৬ই জানুয়ারি বিপ্লবী শ্রমিক কৃষক ও মহিলাদের ৫টি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং ছাত্রী সংঘ সহ বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রফেডারেশনকে বিধান সরকার বে-আইনি ঘোষণা করেছে। তাদের পুলিশ ছাত্রফেডারেশনের প্রাদেশিক ও সমস্ত জেলা অফিস তালাবন্ধ ক'রে, সারা বাংলায় নতুন করে অসংখ্য ছাত্রকর্মীকে গ্রেপ্তার করে, তারা তাদের ফতোয়া জারি করেছে।

কংগ্রেসী সরকারের ফ্যাসিস্ট হামলা

গত দু'বছর ধরেই কংগ্রেস সরকার ছাত্র-ফেড়ারেশনের উপর কার্যত বে-আইনি অবস্থা চাপিয়ে রেখেছে। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাস থেকে বিধান সরকার ছাত্রফেডারেশনের শত শত কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে, বারবার প্রাদেশিক ও জেলা অফিসসমূহ তালাবন্ধ করেছে। একের পর এক প্রাদেশিক সম্পাদককে গ্রেপ্তার করেছে, একের পর এক কার্যকরী সমিতির সদস্যদের জেলে পুরেছে, সমস্ত জেলা ইউনিটের সম্পাদক ও সভাপতিকে গ্রেপ্তার করেছে, ছাত্র-ফেডারেশনের মুখপত্র 'ছাত্র-অভিযান' এবং 'আগামী'র কণ্ঠরোধ করেছে, ছাত্র-ফেডারেশনের বুলেটিন ও পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত করেছে, প্রেসে হামলা করে বারবার ছাত্রফেডারেশনের প্রচারপত্র কেড়ে নিয়েছে, অসংখ্যবার অফিস তল্লাশী করে কাগজপত্র নিয়ে গেছে, তহবিল বাজেয়াপ্ত করেছে, নিখিল ভারত ছাত্র-সম্মেলন বন্ধ করবার চেষ্টা করেছে নিখিল ভারত ছাত্রফেডারেশনের সঙ্গে প্রাদেশিক ছাত্রফেডারেশনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করবার জন্য বারবার 'দি স্টুডেন্ট' পত্রিকা ও চিঠি আটক করেছে; ছাত্রফেডারেশনের ডাকা সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত সভাতে পর্যন্ত হামলা ক'রে লাঠি টিয়ার গ্যাস ও গ্রেপ্তার চালিয়েছে।

কংগ্রেসী দস্যুদলের সর্দার নেহরু থেকে শুরু করে বাংলাদেশের কংগ্রেসী মনসবদার বিধান পর্যন্ত সকলে বারবার বক্তৃতায় বি-পি-এস-এফকে আক্রমণ করেছে। ১৯৪৯-এর ফেব্রুয়ারিতে বি-পি-এস-এফ নেতা নৃপেন ব্যানার্জির রেল স্ট্রাইকের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বক্তৃতার উল্লেখ ক'রে নেহরু স্বয়ং বি-পি-এস-এফকে আক্রমণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়োজিত যত সালিশী কমিটি আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অসংখ্য প্রেস নোট বি-পি-এস-এফ'এর বিরুদ্ধে তারস্বরে চিৎকার করেছে। তবু এতদিন তারা বি-পি-এস-এফ'কে বে-আইনি ঘোষণা করতে সাহস করে নি।

এই মরিয়া আক্রমণ কেন?

কিন্তু এবারে জনসাধারণের থেকে চরম বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়ে একেবারে কোণঠাসা হয়ে *কংগ্রেসী সরকার বি পি এস এফ'এর উপর মরিয়া হয়ে আক্রমণ করেছে। সম্প্রতি*

বাংলাদেশের জেলে প্রায় ১০০০ রাজনৈতিক বন্দীর বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রাম কংগ্রেসী জেলে বিদ্রোহের অবস্থা সৃষ্টি করেছে। রাজবন্দীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার ক'রে তাদের চিরজীবনের মত পঙ্গু করে দিয়েও সরকার সেই প্রতিরোধ রুখতে পারছে না। রাজবন্দীদের সঙ্গে জেলের কয়েদি এবং সরকারি সিপাইরা পর্যন্ত যোগ দিয়েছেন। দমদম-প্রেসিডেন্সীতে স্থায়ী সিপাইরা রাজবন্দীদের আক্রমণ করতে সরাসরি অস্বীকার করেছেন। রাজবন্দীদের সমর্থনে বিপুল ছাত্র-বিক্ষোভের বন্যার আশংকার এবং দিনের পর দিন গুলি লাঠি তুচ্ছ করে ছাত্র-শ্রমিক-মহিলা জনতার প্রতিশোধকামী মিছিলের আতংকে বিহ্বল হয়ে এবার খুদে-হিটলার বিধান রায় ছাত্র-আন্দোলনের বিদ্যুৎ বাহিনী বাংলার ছাত্রফেডারেশনকে বে-আইনি ঘোষণা করেছে। বিধান রায় আশা করেছে এই মরণ-কামড়ে বি-পি-এস-এফ'কে খতম করবে।

বি-পি-এস-এফ জিন্দাবাদ!

কিন্তু তার সে আশায় অবশ্যই ছাই পড়বে। বি-পি-এস-এফ'কে খতম করা বিধান রায়ের সাধ্যের বাইরে। গত দু'বছর, বিশেষত, গত বছরে বি-পি-এস-এফ'এর যেমন শত শত কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছে তেমনি তার দু'গুণ নতুন কর্মী এসে শূন্যস্থান ছাপিয়ে দিয়েছে। সরকার সম্পাদক-সভাপতিদের গ্রেপ্তার করেছে—সাধারণ কর্মীদের থেকে নতুন নেতা বেরিয়ে এসে তাদের শূন্যস্থান পূর্ণ করেছে; অফিসে তালা দিয়েছে—সংগ্রামের ময়দানে পুলিশের চোখের সামনে নতুন যুদ্ধ শিবিরের মত সংগঠনের কেন্দ্র গড়ে উঠেছে; কাগজ বন্ধ করেছে—নতুন কাগজ এসে তার জায়গা দখল করেছে; তহবিল বাজেয়াপ্ত করেছে—ছাত্র ও সংগ্রামী জনতার অকৃপণ দানে নতুন করে তহবিল ভরে উঠেছে।

দমননীতির সঙ্গে সঙ্গে বি-পি-এস-এফ'এর প্রভাবকে খর্ব করার জন্য কংগ্রেসী নেতারা নতুন নতুন অস্ত্র প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছে কিন্তু তাও দেউলিয়া প্রমাণ হয়েছে।

কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী বিধান আর চুনোপুঁটি মন্ত্রীরা ছাত্রদের কাছে সংগ্রামের বদলে আত্মসমর্পণের পরামর্শ দিতে গেছে—কুকুরের মত বেত খেয়ে তাদের ফিরতে হয়েছে। বিধান রায়কে জান হাতে করে জলপাইগুড়ি আর শিলিগুড়ি থেকে পালাতে হয়েছে, মন্ত্রী বিমল সিংহকে বুড়ুল থেকে অপমানিত হয়ে ল্যাজ গুটোতে হয়েছে। কংগ্রেসের রক্ষিতা সংবাদপত্রগুলো তারস্বরে ছাত্রফেডারেশন বিরোধী চিৎকার করেছে। গেল ডিসেম্বর মাসে প্রফেসর ধর্মঘটের সময় অমৃতবাজার-আনন্দবাজারের বহ্ন্যুৎসব করে ছাত্র ও জনসাধারণ তার জবাব দিয়েছে।

কংগ্রেসী নেতা ও মন্ত্রীদের সরাসরি ছাত্র-সাধারণের কাছে যাওয়া অসম্ভব বুঝতে পেরে ছাত্র-আন্দোলনে বি-পি-এস-এফ'এর বিরুদ্ধে চর লাগিয়েছে, তারা বহুরূপী হয়ে কেউ এন-ইউ-এস, কেউ 'বামপন্থী' সেজে আসর জমানোর চেষ্টা করেছে কিন্তু ছাত্র সমাজের কাছে তাড়া খেয়ে পুতুলনাচের ভাঙা পুতুলের মত মঞ্চের তলায় তাদের আশ্রয় দিতে হয়েছে। সেন্টপলস কলেজে এন-ইউ-এস'এর সংগঠক মার খেয়ে ফিরেছে, ছাত্রফেডারেশনকে অ্যাডভেঞ্চারিস্ট বলবার ধৃষ্টতার জন্য আর-এস-পি ও ফরোয়ার্ড ব্লক মার্কা ছাত্র কংগ্রেসদের ১৮ই ও ১৯শে জানুয়ারিতে বিশ্বাসঘাতক বলে ছাত্র জনতা তাড়া করেছে।

এত গ্রেপ্তার, এত বাধা, এত অপপ্রচার সত্ত্বেও বাংলাদেশে মহানগরীর বুকে আর পল্লীপ্রান্তরে এমন কোন ছাত্র-আন্দোলন হয়নি, যা বি-পি-এস-এফ পরিচালনা করেনি, যাতে বি-পি-এস-এফ'এর কর্মীরা নেতৃস্থানীয় অংশগ্রহণ করেন নি।

অসংখ্য সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়ে ছাত্রফেডারেশনের এই অপরাজেয় শক্তি গড়ে উঠেছে, গড়ে উঠেছে তার প্রতি অপরিমেয় ভালবাসা।

বাংলাদেশের ছাত্র-আন্দোলনের বিরাট বৈপ্লবিক জোয়ারের মাথায় থেকে ছাত্রফেডারেশন বারবার সারা ভারতবর্ষের ছাত্র আন্দোলনের পথ প্রদর্শকের কাজ করেছে। তাই বোম্বাইয়ের ভি-জে-টি-আই টেকনিক্যাল স্কুলের ৩ মাস ব্যাপী ছাত্র ধর্মঘটের বিরাট মোড়ের মাথায় বোম্বাইয়ের ছাত্র-সাধারণ আওয়াজ তুলেছেন : "আমাদের পথ কলকাতার পথ।" সেই আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়েছে যুক্ত প্রদেশের ছাত্র ধর্মঘটে, সুদূর ত্রিবাঙ্কুরের ছাত্র সংগ্রামে।

বাংলার ছাত্রফেডারেশনের বিপ্লবী ঐতিহ্য সারা পৃথিবীর বিপ্লবী ছাত্র ও যুব সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। তাই বাংলাদেশের ছাত্র নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বারবার নেহরু আর বিধানের কাছে টেলিগ্রাম এসেছে বিশ্ব বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র মস্কো থেকে, এশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত চীনের প্রধান নগরী নানকিং থেকে, মুক্ত মধ্য ইউরোপের অন্যতম রাষ্ট্র চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী ও আন্তর্জাতিক বিশ্ব ছাত্র সংঘের সদর দপ্তর প্রাগ থেকে, পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণীর ঝটিকা-কেন্দ্র আর বিশ্ব যুবসংঘের সদর দপ্তর প্যারী থেকে।

সংগ্রামের পুরোভাগে

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রফেডারেশন এই বিরাট শক্তি অর্জন করেছে, কারণ ছাত্রফেডারেশন বরাবরের ছাত্র সাধারণের স্বার্থের জন্য সমস্ত অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে লড়েছে সকল সময়ে ছাত্র সাধারণের সঙ্গে থেকেছে।

যুদ্ধোত্তর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বৈপ্লবিক গণ অভ্যুত্থানের সময় থেকে নতুন করে ছাত্রফেডারেশনের এই গৌরবের ইতিহাস রচনা হয়েছে। নভেম্বরে ধর্মতলার মিছিলে যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পুলিশ গুলি চালিয়ে রামেশ্বরকে হত্যা করে সেদিন ছাত্রফেডারেশন ছাত্রসমাজের একচ্ছত্র নেতা ছিল না। কিন্তু গুলি চলার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রসাধারণের সঙ্গে লেগে থেকে ছাত্রফেডারেশনের কর্মীরা তাঁদের নেতৃত্বের ক্ষমতা দেখালেন। তিনদিনের মধ্যে বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের প্রধান নেতৃত্বের আসনে ছাত্রফেডারেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল। তারপর সাম্রাজ্যবাদী আমলে বাংলাদেশে রসিদ দিবস, ভিয়েতনাম দিবস, ২৯শে জুলাই—একের পর এক ছাত্র-বিক্ষোভ পরিচালনা করে ছাত্রফেডারেশন বারবার সারা ভারতের ছাত্র আন্দোলনে নতুন জোয়ার আনতে পথ দেখিয়েছিলেন।

ভারতবর্ষের ধনিকশ্রেণি বিপ্লবী জনতার পিঠে ছুরি মেরে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করে ক্ষমতা দখলের পর থেকে আজ পর্যন্ত ছাত্রফেডারেশনের ইতিহাস হচ্ছে একটানা নিরলস সংগ্রাম পরিচালনার ইতিহাস।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে পশ্চিমবাংলা সরকার বিপ্লবের সর্বাগ্রগামী শক্তি কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি ঘোষণা করে ভেবেছিল সংগ্রামী জনতাকে নেতৃত্বহীন করে সে নিরাপদে বার হয়ে যাবে আর গণতন্ত্রপ্রিয় ছাত্রসমাজ থেকে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠবে না।

ছাত্রফেডারেশন সম্পাদকসহ ছাত্রফেডারেশনের অসংখ্য কর্মীকে গ্রেপ্তার করে তারা ছাত্রফেডারেশনের উপরও প্রথম আঘাত হেনে তাকে কাবু করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে দুর্বল তো হয়ইনি বরং গণতন্ত্রপ্রিয় ছাত্রদের পক্ষ থেকে গণতান্ত্রিক অধিকারের লড়াইয়ে, কমিউনিস্ট পার্টির কণ্ঠরোধের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসে ছাত্রফেডারেশন। সমস্ত ৪৮ সাল ধরে ছাত্র-ফেডারেশনের নেতৃত্বে কলকাতা ও বাংলার ছাত্রসমাজ জনতার উপর সমস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর জাগিয়ে রাখেন। পোর্টে গুলি চালনার প্রতিবাদে কলকাতা শহরে ৩০,০০০ ছাত্রের শোভাযাত্রা হয়।

ব্যারিকেড সংগ্রামের সেনাপতি

তারপর এই প্রতিবাদ আন্দোলন ১৯৪৯-এর জানুয়ারি মাসের ১৮ই আর ১৯শে প্রচণ্ড শক্তিতে ফেটে পড়ে। বাস্তুহারাদের উপর লাঠি আর গুলির প্রতিবাদে ব্যারিকেড বেঁধে কলকাতার রাস্তায় প্রতিরোধের অমর ইতিহাস রচনা করেন কলকাতার ছাত্রেরা ঃ আওয়াজ তোলেন ছাত্রফেডারেশন জিন্দাবাদ।

জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত সারা বাংলাদেশে ৪,৪৮,৫০০ ছাত্র বন্দীমুক্তি, শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র ও বাস্তুহারা জনতার উপর সরকারী অত্যাচারের প্রতিবাদ, সর্বোপরি রায়-মন্ত্রীসভার অবসান ইত্যাদি রাজনৈতিক দাবিতে ধর্মঘট করেছেন। ওই একই সময়ে ৩ লক্ষ ছাত্র মাইনে কমানো ও অন্যান্য শিক্ষা-সংক্রান্ত দাবিতে সারা বাংলাদেশে ধর্মঘটে নেমেছেন।

ধনিক ডিক্টেটরীর বিরুদ্ধে

জুলাই মাসে ছাত্রফেডারেশনের নেতৃত্বে ধনিক ডিক্টেটরী শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্রদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এক রাজনৈতিক বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে। খুনী সর্দার নেহরু যখন কলকাতায় এল দক্ষিণ কলকাতা উপনির্বাচনের পর, তখন কলকাতায় ১২,০০০ ছাত্র ছাত্রফেডারেশনের নেতৃত্বে 'নেহরু ফিরে যাও' ধর্মঘটে যোগ দিয়ে, নেহরুকে জুতো দিয়ে অভ্যর্থনা করে বাংলাদেশের ছাত্র উচ্চ রাজনৈতিক চেতনার প্রমাণ দিলেন, সারা ভারতের ছাত্রদের কাছে ও জনসাধারণের কাছে ঘোষণা করলেন যে, ভারতবর্ষের ছাত্রসমাজ নেহরু সরকারের ধাপ্পাবাজীতে বিভ্রত নয়, নেহরু সরকারের সম্পর্কে তার সম্পূর্ণ মোহমুক্তি ঘটছে।

তারপর অগস্ট-সেপ্টেম্বর আর ডিসেম্বর মাসে ছাত্রফেডারেশনের নেতৃত্বে ছাত্রসংগ্রাম ব্যাপ্তিতে আগের সমস্ত ঐতিহ্যকে ছাড়িয়ে গেছে। গত সেপ্টেম্বরে এক ১০ই সেপ্টেম্বরেই কমার্স ছাত্রদের সমর্থনে সারা বাংলায় ১ লক্ষ ছাত্রের ধর্মঘট হয়েছে ছাত্রফেডারেশনের ডাকে! ১১ দিন ধরে ৩০/৪০ হাজার ছাত্র এক কলকাতায়ই ধর্মঘট করে থেকেছেন বিভিন্ন শিক্ষার দাবিতে। তারপর থেকে আজ সেই লড়াই-এর একদিনও বিরাম নেই। আজ অধ্যাপকদের সমর্থনে কলকাতায়, কাল শিক্ষয়িত্রী ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে ভাটপাড়ায়, পরশু বর্ধমান মেডিকেল স্কুলের ছাত্রজনপ্রিয় শিক্ষকের বদলির হুকুমের বিরুদ্ধে—এমনি আরও অসংখ্য দাবিতে অসংখ্য জায়গায় প্রতিদিন হাজার হাজার ছাত্রের একান্ত জরুরি দাবি নিয়ে সংগ্রাম বন্যার জলের মত

চলেছে। আর এই সংগ্রামের একচ্ছত্র সেনাপতি থেকেছে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র-ফেডারেশন।

তাই বিধান মন্ত্রীসভা আজ মরিয়া হয়ে ছাত্র-ফেডারেশনের উপর মরণ কামড় দিতে চেয়েছে, তাকে বে-আইনি ঘোষণা করেছে।

ছাত্রফেডারেশন ও ছাত্রীসংঘকে বিধান মন্ত্রীসভা বে-আইনি ঘোষণা করেছে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হুকুমে তাদের যুদ্ধের প্রয়োজনে। ১০ই জুন সম্রাটের জন্মদিবসে, ১৫ অগস্ট ভূয়া স্বাধীনতা দিবসে, শান্তি সম্মেলনের লক্ষ জনতার মঞ্চ থেকে ছাত্র-ফেডারেশনের কর্মীরা যুদ্ধপাগল সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বাসঘাতকদের জানিয়ে দিয়েছে তারা মার্কিন দস্যু আর তাদের টাটা-বিড়লা অংশীদারদের মুনাফার জন্য যুদ্ধে জান দেবে না, সোভিয়েত ও চীনের বিরুদ্ধে যারা নয়া যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করছে, কলম্বোতে কমনওয়েলথ আলোচনা চালাচ্ছে তাদের দেশছাড়া করবে। শান্তির সংগ্রামে মজদুর নওজোয়ানদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়াই করে তারা পশ্চিম-বাংলায় মার্কিন যুদ্ধঘাঁটিকে তারা বিপন্ন করে তুলেছে বলেই এই আক্রমণ এসেছে তাদের উপর।

কিন্তু ছাত্র-ফেডারেশনের উপর এই আক্রমণ বাংলাদেশের বিশেষত কলকাতার সংগ্রামী ছাত্রদের উপর আক্রমণের প্রথম অধ্যায়।

ছাত্রসমাজের বিরুদ্ধে জেহাদ—ছাত্র ছাঁটাই

১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসের ঘটনার সময় ধনিক সরকারের দালাল রাধাকৃষ্ণণের ইউনিভার্সিটি কমিশন কলকাতায় থেকে ছাত্র সংগ্রামের দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে দিনের আলোর মত বুঝতে পারে যে, কলকাতার বিপ্লবী ছাত্রসমাজকে তারা বাগে আনতে পারবে না। যদিও ধনিকশ্রেণির নেতা ও সংবাদপত্রগুলো প্রাণপণে চেঁচিয়ে ঘোষণা করত যে, কলকাতায় বিক্ষোভের পিছনে জনসাধারণের সমর্থন নেই, তবু তারা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল যে, কলকাতার ছাত্রদের কাছে হার মানতে হবে। তাই তারা সিদ্ধান্ত নিল যে কলকাতা থেকে ছাত্রসংখ্যা কমিয়ে দিতে হবে। তারা সুপারিশ করল কলকাতার এতবেশী কলেজ ও প্রতি কলেজের ছাত্রসংখ্যা ৩,০০০ থেকে ৭,০০০ পর্যন্ত ছাত্রসংখ্যা—এ দুইই কমাও। কলেজের সংখ্যা কমাও, প্রতি কলেজে ১,৫০০-এর বেশি ছাত্র ভর্তি করো না।

কলকাতার ছাত্র এবং শ্রমিক ও জনসাধারণের আন্দোলনের সামনে সম্পূর্ণ অপদস্থ এবং সন্ত্রস্ত বিধান সরকার কলকাতাকে ছাত্রবিহীন করবার এই সুপারিশকে লাফ দিয়ে চেপে ধরেছে। তাই যে সভায় বিধান রায়ের কংগ্রেসী সরকার প্রফেসরদের মাইনে বাড়ানোর টাকা নেই এই ঘোষণা করেছে, সেই সভাতেই দালাল অধ্যক্ষদের কাছে ঘোষণা করেছে যে, বর্তমান ছাত্রসংখ্যা কমিয়ে প্রত্যেক কলেজে ১,৫০০ ছাত্র করবার জন্য কলেজগুলোর যে আর্থিক ক্ষতি হবে কংগ্রেসী সরকার তা পূরণ করবে। এইভাবে তাদের দালালদের ঘুষ দিয়ে কংগ্রেসী সরকার কলকাতার ছাত্রসমাজকে বিক্ষিপ্ত ছিন্নভিন্ন করতে চায়—বাংলাদেশের সংগ্রামী ছাত্র আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্রে আঘাত করতে চায়, হাজার হাজার ছাত্রকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চায়। বিধান রায়ের শিক্ষাক্ষেত্রে সবার বড় দালাল চারু বিশ্বাস সব কলেজে এই সুপারিশ তিন বছরের মধ্যে কার্যকরী করার ব্যবস্থার জন্য এরই মধ্যে জোর তাগাদা শুরু করেছে। নেহরুও তার সাম্প্রতিক দিল্লীর প্রেস সম্মেলনে কলকাতার শিক্ষাব্যবস্থাকে

"পুনর্গঠনের" আওয়াজ তুলেছে। ধনিক সরকারের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সকল সরকার উঠে পড়ে লেগেছে কলকাতার ছাত্রদের উপর এই জঘন্য আক্রমণ শুরু করবার জন্য।

হিটলারী নীতি ধ্বংস হবেই

কিন্তু এই বর্বর নীতি শুধু হিটলার ও চিয়াং কাইশেকই গ্রহণ করেছিল। তারা প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয় তুলে দিয়েছিল, বিরাট সংখ্যায় দেশপ্রেমিক চেকোশ্লোভাক ও চীনা ছাত্রদের খুন করে তাদের স্বাধীনতা আন্দোলন বন্ধ করতে চেয়েছিল। তারা সারা ইউরোপে ও চীনের রাজধানীগুলোর ছাত্রসংখ্যাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রদীপ নিভিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু দেড় বছরের বেশি হিটলারের চক্রান্ত টেকেনি। এই ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়ক হিটলারকে মরতে হয়েছিল ইঁদুর-মারা বিষ খেয়ে আর তার সমস্ত সাঙ্গপাঙ্গসহ বিরাট বাহিনীর শোচনীয় ঘৃণ্য পরিণতি হয়েছিল! চিয়াং-এর শয়তানী রাজত্বকেও আজ চীনের বিপ্লবী জনতা ও নওজোয়ানেরা খতম করে দিয়ে শান্তি, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জয় ঘোষণা করেছে।

বিধান রায় মন্ত্রীসভা আবার সেই মৃত্যু চিহ্ন আঁকা পথ ধরে এগোচ্ছে। এতকালকার সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে বাংলাদেশের মানুষ যে শিক্ষার অধিকার লাভ করেছিল কংগ্রেসী মন্ত্রীরা যুদ্ধের খরচ জুটাবার জন্যে শিক্ষা বরাদ্দ কেটে তা কেড়ে নিয়ে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েকে অশিক্ষিত এবং হাবা বোবা গোলামে পরিণত করতে চায়। মাইনে বাড়িয়ে, পাসের হার কমিয়ে, আরও হাজার আর এক উপায়ে আক্রমণ চালিয়েও শান্তি নেই, আরও নতুন আক্রমণের ফন্দি তারা আঁটছে। ছাত্র-ফেডারেশনের উপর আক্রমণ তারই প্রথম ইঙ্গিত।

কিন্তু হিটলার পদচিহ্নিত পথ মৃত্যুর পথ—সে পথে বিধানশাহীরও মৃত্যু নিশ্চিত। হিটলারও যেমন শিক্ষার অধিকার কেড়ে নিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করে বেশিদিন বাঁচতে পারেনি, এরাও তেমনি পারবে না! ছাত্রজনতা জান দিয়ে রুখবে তাদের উপর আক্রমণ, রুখবে তার প্রিয় নেতা তার অগ্রগামী বাহিনী ছাত্র-ফেডারেশনের উপর আক্রমণ।

ছাত্র-ফেডারেশনের ঘোষণা

ছাত্র-ফেডারেশন এই বে-আইনি ঘোষণায় কিছুমাত্র ভীত নয়। ছাত্র-ফেডারেশন জানত যে এই বর্বর ধনিক ডিক্টেটরীর আমলে তার আইনসঙ্গত অস্তিত্ব বেশিদিন বজায় থাকবে না, কারণ সে ছাত্র সাধারণের শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে আপসবিহীন লড়াইয়ের নেতা।

ছাত্রফেডারেশন মুমূর্ষু কংগ্রেস সরকারকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, বে-আইনি আইনের যতই ফতোয়া তারা ঝাড়ুক ছাত্র সাধারণের মধ্যে যেমন বিধান রায়ের প্রবেশ নিষেধ তেমনি কংগ্রেসী আইনেরও প্রবেশ নিষেধ। স্কুলে কলেজে হস্টেলে আর ছাত্রজমায়েতে ছাত্র-ফেডারেশনের আইনই আইন। আর সব আইন বে-আইনি। ছাত্র-ফেডারেশনের আইন ঘোষণা করছে ঃ ছাত্রদের মধ্যে কংগ্রেস আর তার অনুচররাই বে-আইনি, ছাত্র-ফেডারেশন সেখানে সম্পূর্ণ আইনি যেখানে ছাত্র-ফেডারেশনের একচ্ছত্র নেতৃত্ব। ছাত্র-ফেডারেশন ছাত্র সাধারণের

মধ্যে টিকে থাকবে, বাড়বে, লড়াইয়ে অবিচলিত নেতৃত্ব দেবে, বর্বর খুনী কংগ্রেসী শাসনের ও শোষণের অবসানের জন্য মৃত্যুভয়হীন সংগ্রামে সারা ছাত্রসমাজকে সমবেত করবে এবং বিধান রায়ের বে-আইনি করার ফতোয়াকে রাইটার্স বিল্ডিং-এর ফাইলের তলাতেই কবর দেবে।

ছাত্র-ফেডারেশন সারা কলকাতা আর বাংলার ছাত্রসমাজের কাছে ডাক দিচ্ছে : আওয়াজ তুলুন ছাত্রফেডারেশন জিন্দাবাদ।

ছাত্র-ফেডারেশনকে শক্তিশালী করুন

ছাত্র-ফেডারেশনের শত শত নেতৃস্থানীয় কর্মী জীবন তুচ্ছ করে জেলের মধ্যে গুরুতরভাবে আহত হয়েও সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছেন। ছাত্র-ফেডারেশনের ১৪ বছরের কর্মী ধ্রুবকে গ্রেপ্তার করে লালবাজারে নিয়ে মেরে পা ভেঙে দিয়েছে, তবু বাঘের বাচ্চার মত রুখে দাঁড়িয়ে সে বিধানশাহীর বুক কাঁপিয়ে তুলেছে। জেলের বাইরে প্রতিদিন শত শত কর্মী প্রাত্যহিক আন্দোলন পরিচালনা করছেন।

এইরকম কর্মীদের গৌরবময় সংগঠন ছাত্রফেডারেশনেকে সরকারি আঘাতের মুখে আজ শক্তিশালী করে তুলুন সারা বাংলার সেই লক্ষ লক্ষ ছাত্ররা, যাঁরা গত দু'বছরে ছাত্র-ফেডারেশনের নেতৃত্বে অসংখ্য লড়াই লড়েছেন। প্রত্যেক ধর্মঘটী ছাত্র বে-আইনি ছাত্র-ফেডারেশনের সভ্য হন, ছাত্র-ফেডারেশনেকে আইনি করবার জন্য তীব্র তুমুল আন্দোলন গড়ে তুলুন। এতদিন যাঁরা ছাত্র-ফেডারেশনেকে সমর্থন করে সংগঠনে আসেননি আজ অগ্নি পরীক্ষার মুহূর্তে তাঁরা প্রত্যেকে ছাত্র-ফেডারেশনের সৈন্যবাহিনীতে নিজের স্থান খুঁজে নিন।

কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা আজ মধ্যবিত্ত ও গরীবের ছেলেমেয়ের জীবনে বেকারি, অশিক্ষা, অনাহার আর লাঠি গুলি ছাড়া কিছু দিতে পারবে না। ছাত্রফেডারেশন আজ এই ধনিক সরকারের উচ্ছেদের জন্য শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে বিপ্লবী জনতার সরকার গঠনের জন্য লড়াইয়ে ছাত্র সাধারণকে পরিচালনা করছে। যে কেউ কংগ্রেসের দেওয়া ভয়াবহ ভবিষ্যতের হাত থেকে বাঁচতে চান, হাঁটু ভেঙে পরাজয় স্বীকারের বদলে দুপায়ে দাঁড়িয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য লড়তে চান, তাঁকে আজ ছাত্রফেডারেশনের ভিতর আসতেই হবে।

আজকের অগ্নি পরীক্ষার মুখে প্রত্যেক ছাত্রকে ভবিষ্যতের পথ বেছে নিতে হবে। ছাত্র-ফেডারেশন বিশ্বাস করে এই আক্রমণের মুখে বাংলার লক্ষ লক্ষ ছাত্র দ্বিতীয় পথ বেছে নেবেন। মুষ্টিমেয় ধনিক দুলাল ছাত্র এবং তাদের প্রতিনিধি দালাল ছাত্র প্রতিষ্ঠানরা ছাড়া আর সমস্ত ছাত্র আজ নিশ্চয় নতুন উৎসাহে ছাত্রফেডারেশনের পতাকার তলায় সমবেত হবেন শিক্ষার অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে, রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে আর কংগ্রেসশাহীকে খতম করবার লড়াইয়ে, নিশ্চয় হাজারগুণে শক্তিশালী করে তুলবেন তার সংগঠনকে।

আপসপন্থী বিভেদকারীদের তফাৎ করুন

ছাত্র-ফেডারেশন ছাত্র সাধারণকে সতর্ক করে দিচ্ছে যে, সরকারের চরেরা এই আক্রমণের সুযোগ নিয়ে দক্ষিণপন্থী বামপন্থী বহুরূপ ধরে এন-ইউ-এস, 'ঐক্যবদ্ধ ছাত্র-

কংগ্রেস'—নানা ভেক ধরে ছাত্রদের মধ্যে নতুন করে আসর জমানোর চেষ্টা করবে। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকবে ১৮ই-১৯শে জানুয়ারির আর সেপ্টেম্বরের কমার্স সংগ্রামের দিনের মত ছাত্র আন্দোলনকে পিছন থেকে ছুরি মারা। তাদের কেউ কেউ এমনকি বামপন্থার নামে আর-এস-পি মার্কা ছাত্র-কংগ্রেসের মত "শান্তির" বুলি কপচাবে আর সংগঠনের কথা বলবে বিপ্লবী সংগ্রামের বদলে। আজ যখন সামান্য অধিকার অর্জন করতে পর্যন্ত গুলির সামনে যেতে হয়, যখন সামান্য মিছিল করতে হলে পর্যন্ত ধনিক সরকারের পুলিশের হিংস্র আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য প্রস্তুত না হয়ে দাঁড়ান যায় না, যখন আইনি প্রচার সংগঠনের সামান্য অধিকার পর্যন্ত ধনিক সরকার কেড়ে নিয়েছে তখন তাদের এই বস্তাপচা বুলি ছাত্রসমাজের কাছে শুধু ঘৃণারই উদ্রেক করবে। তাই ছাত্রফেডারেশনের আহ্বান ঘোলাজলে মাছ ধরতে আসবার এইসব শিকারীদের ছাত্র আন্দোলনের চৌহদ্দী থেকে চিরদিনের মত বিতাড়িত করুন।

ছাত্র-ফেডারেশনের ঘোষণা ঃ ছাত্রফেডারেশনের কর্মী ছাড়া অন্য কারও নেতৃত্বে অন্য কোনও সংগঠনের ছাত্রসমাজের মধ্যে কোনও স্থান নেই। ছাত্রসমাজের শিক্ষা, গণতান্ত্রিক অধিকার আর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের বিশ্বস্ত নেতা ছাত্রফেডারেশনকে বে-আইনি করবার কারও অধিকার নেই।

ছাত্র-ফেডারেশন জিন্দাবাদ!

বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলন জিন্দাবাদ!

বর্বর খুনী ধনিক ডিক্টেটরশাহী খতম কর!

টিকা : অন্যান্য ৬টি সংগঠনের সাথে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রফেডারেশনকে ১৯৫০ সালের ৬ই জানুয়ারি বে-আইনি ঘোষণা করা হয়েছিল। এই পুস্তিকা মাত্র ৫/৬ দিনের মধ্যে লিখে ও ছেপে ছাত্র সমাজের মধ্যে প্রচার করা হয়।

(—সম্পাদক)

সহায়ক তথ্য - ২

প্রোসেক্ট নোট
ট্রেড ইউনিযন ইউনিটগুলিব জন্য

প্রিয় কমরেড,
ট্রেড ইউনিয়ন বিল সম্পর্কে এ-আই-টি-ইউ-সি'র বিবৃতি এই সঙ্গে আমরা পাঠাইতেছি।

যে সব কমরেড ইংরাজী পড়িতে পারেন না অথবা বোঝেন না তাহাদের নিকট ইংরাজী জানা কমরেডদের এই দলিলটি অবশ্য অনুবাদ করিয়া দিতে হইবে এবং ব্যাখ্যা করিয়া দিতে হইবে।

প্রোসেক্ট।

সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস

ট্রেড ইউনিয়ন বিল সম্পর্কে এ, আই, টি, ইউ, সি'র বিবৃতি

(২০-২১ মার্চ ১৯৫০, নিউ দিল্লীতে ভারতীয় শ্রমিক সম্মেলনের
নিকট এই বিবৃতি দাখিল করা হইয়াছে)

ট্রেড ইউনিয়ন বিল—দাসত্বের সনদ

ভারতের পার্লামেন্টে ভারত সরকার যে ট্রেড ইউনিয়ন বিল উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা হইল সেই সব ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে বে-আইনি করিবার খোলাখুলি প্রচেষ্টা, যেই সব ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ব্যাপক ছাঁটাই, শ্রমের তীব্রতা বৃদ্ধি (র‍্যাশনাইজেশন) ও মজুদুরির হার হ্রাসের মারফত পুঁজিবাদীদের ক্রমবর্ধমান আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং শ্রমিকদের অধিকার ও স্বার্থরক্ষা করার কাজে শ্রমিকদের লড়াই সংগঠিত করিতেছে এবং তাহাকে পরিচালিত করিতেছে।

এই বিলের মারফত, বুর্জোয়া শ্রেণি এবং তাহাদের কংগ্রেসী সরকার শ্রমিকদের সংগঠন ও ধর্মঘটের মৌলিক অধিকার হইতে, তাহাদের পছন্দমত রাজনৈতিক মতবাদ পোষণ করিবার ও রাজনৈতিক সংগঠনে যোগ দিবার অধিকার হইতে শ্রমিকদিগকে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করিতেছে এবং এইভাবে দাসত্বের মধ্যে তাহাদের হাত পা বাঁধিয়া ফেলিতে চাহিতেছে।

এই বিল সরকারি চাকুরিয়াদের বিরুদ্ধে খোলাখুলিভাবে ও নির্লজ্জভাবে বিভেদমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে এবং তাহাদের বে-সরকারি চাকুরিয়াদের কোন সংগঠনে যোগদান নিষিদ্ধ করিয়াছে। এইভাবে সরকারি চাকুরিয়াদের অবশিষ্ট শ্রমিকদের নিকট হইতে আলাদা করিয়া শ্রমিকদের ভিতর বিভেদ আনার চেষ্টা হইতেছে এবং বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সাধারণ

সংগ্রামে অন্য শ্রমিকদের সাথে যোগদানে সরকারি চাকুরিয়াদের বাধা দিতেছে।

গভর্নমেন্ট এবং পুঁজিবাদীদের নীতির বিরুদ্ধে যে সব ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রাম করিতেছে, এই বিল সেই সব ইউনিয়নের সুযোগ এবং অধিকার অস্বীকার করিতেছে। এই বিল ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে এইরূপ সমস্ত নিয়ম কানুন তাহাদের গঠনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করিতে আদেশ করিতেছে যাহার ফলে যে সব শ্রমিক মালিকের বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে লড়ে, যে সব নেতার উপর সব শ্রমিকদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে—তাহারা ট্রেড ইউনিয়নের পরিচালনার ব্যাপার হইতে বাদ পড়িয়া যাইবে। ইউনিয়নের যে সমস্ত শ্রমিক ও নেতা স্বতস্ফূর্ত ধর্মঘটে যোগদান করিবে, তাহাদের বহিষ্কার করিবার জন্য এই বিল দাবি করিতেছে।

এই বিল আইনে পরিণত হওয়ার ফল এই হইবে, যে শত শত ট্রেড ইউনিয়ন যাহারা আজ মজদুরদের লড়াই সংগঠিত করিতেছে ও চালাইতেছে এবং যাহাদের উপর শ্রমিকদের বিশ্বাস আছে, সেই সব ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন নাকচ হইয়া যাইবে এবং এইভাবে তাহারা এক হয় বে-আইনি সংগঠনে পরিণত হইবে অথবা আইনসঙ্গতভাবে শ্রমিকদের পক্ষ হইতে কথা বলিবার কোন অধিকার তাহাদের থাকিবে না, এবং আইনের মারফত তাহাদের কোন রক্ষা ব্যবস্থা থাকিবে না। সরকার এবং পুঁজিবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পুতুল সংগঠন ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং তাহার অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নগুলিই যাহাতে অন্যান্য ইউনিয়নগুলিকে বাদ দিয়া আইনসঙ্গতভাবে থাকিতে পারে তাহার সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করিবার জন্যই ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশনের উপর এই সব বাধা-নিষেধ চাপান হইতেছে। এই সমস্ত "ইউনিয়নগুলিকে" শ্রমিকদের আইনসঙ্গত স্বীকৃতি প্রতিনিধির মর্যাদা দেওয়ার নির্লজ্জ প্রচেষ্টা এই বিলের মারফত করা হইতেছে এবং এই "ইউনিয়নগুলি" ও মালিকদের ভিতর যে সমস্ত বিশ্বাসঘাতক চুক্তি সম্পাদিত হইবে তাহা মানিতে সমস্ত শ্রমিককে বাধ্য করা হইতেছে।

শ্রমিকগণ আজ পর্যন্ত যে সামান্যতম ও অতিসীমাবদ্ধ অধিকার আদায় করিয়াছে, যেমন নিজের ইচ্ছা ও পছন্দমত ইউনিয়ন সংগঠিত করিবার অধিকার, এই বিল সেইটুকু অধিকার হতেও শ্রমিকদের বঞ্চিত .করিতেছে এবং তাহা তুলিয়া নিতেছে। এইভাবে যে সব ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গভর্নমেন্টের নীতির বিরুদ্ধে এবং যাহা শ্রেণি সংগ্রামের নীতির উপর সংগঠিত, এই বিলের মারফত কার্যত তাহাদের বে-আইনি করা হইতেছে।

শ্রমিকদের উপর সংকটের বোঝা চাপাইবার খোলাখুলি ও নির্লজ্জ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে শ্রমিক ও সরকারি কর্মচারীদের প্রত্যেক অংশের নিকট হইতে ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধের সম্মুখীন হইয়া এবং শোষণের জন্য যে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট তাহারা দেশ বিক্রয় করিয়াছে, তাহাদের (ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের) হুকুমের দ্বারা পরিচালিত হইয়া, কংগ্রেসী বুর্জোয়া শাসকরা ভারতবর্ষের শ্রমিকদের ক্রীতদাসে পরিণত করার জন্য এই বিল উপস্থিত করিয়াছে।

শ্রমিকদের সংগঠনের স্বাধীনতা এবং তাহাদের স্বার্থরক্ষা করার জন্য ধর্মঘটের স্বাধীনতা দিয়াছেন বলিয়া গভর্নমেন্টের সমস্ত দাবির মুখোশ এই বিল খুলিয়া ধরিয়াছে এবং তাহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে।

একদিকে যেমন শ্রম-সম্পর্ক বিলের মারফত, যে বিল এই একই সঙ্গে তাড়াতাড়ি পাশ করান হইতেছে, সরকার শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার ও পুঁজিবাদীদের ক্রমবর্ধমান আক্রমণের

বিরুদ্ধে শ্রমিকদের প্রতিরোধের অধিকার ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং ছয় মাসের জেল দিয়া শ্রমিকদের শাস্তি দিতে সরকার চাহিতেছে অন্যদিকে ট্রেড ইউনিয়ন বিলের মারপথ শ্রমিকদের ইচ্ছা ও পছন্দমত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠিত করিবার অধিকার সরকার তুলিয়া লইতে চাহিতেছে এবং তাহার বদলে গভর্নমেন্টের পুতুল সংগঠন আই-এন-টি-ইউ-সি ও তাহার অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়ন শ্রমিকদের উপর চাপাইবার চেষ্টা সরকার করিতেছে। সেই আই-এন-টি-ইউ-সি ইউনিয়নগুলি মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করিতে সর্বদাই প্রস্তুত এবং যাহারা বর্তমানে খোলাখুলি ধর্মঘট ভাঙ্গা দল হিসাবে এবং পুঁজিবাদীদের ও গভর্নমেন্টের দালাল হিসাবে কাজ করিতেছে।

যাহাতে পুঁজিবাদী ও তাহাদের গভর্নমেন্টের জনগণের উপর শোষণ নিশ্চিত হয়, যাহাতে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতে নিরাপদ শোষণ করিতে পারে এবং যাহাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, গণরাষ্ট্রের দেশগুলি, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুক্তি-আন্দোলন ও সমস্ত দেশের জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘাঁটি হিসাবে ভারতবর্ষকে গড়িয়া তোলা যায়, সেই উদ্দেশ্যে ভারতের শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনকে নাৎসী লেবার ফ্রন্টের মত অবস্থায় পরিণত করার জন্য, এইভাবে শ্রম-সম্পর্ক বিল এবং ট্রেড ইউনিয়ন বিল উপস্থিত করা হইতেছে।

এ-আই-টি-ইউ-সি বিশেষ তীব্রতার সহিত এই বিলের নিন্দা না করিয়া পারেন না। এই বিলের অবিলম্বে প্রত্যাহার এ-আই-টি-ইউ-সি দাবি করিতেছে এবং তাহাব বদলে দাবি করিতেছে শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার, সংগঠনের অধিকার, রাজনৈতিক মতবাদ পোষণ করিবার অধিকার, নিজেদের পছন্দমত যে কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করিবার অধিকার ইত্যাদির সম্পূর্ণ স্বীকৃতি।

২

এই বিলের উদ্দেশ্য এবং কারণগুলির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেই এই বিবৃতির সত্যতা বোঝা যাইবে ঃ

গোড়াতেই গভর্নমেন্ট ঘোষণা করিতেছেন, "শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার স্বার্থে, এই বিলের আওতা হইতে সৈন্যবাহিনী এবং পুলিশকে বাদ দেওয়া হইয়াছে।"

ইহা হইতে বোঝা যায় যে কংগ্রেসী বুর্জোয়া সরকার পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনীর অসন্তোষের সম্মুখীন হইতে বিশেষভাবে ভয় পান। যেই পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী পুঁজিবাদী শাসনে অন্যান্য শ্রমজীবী জনসাধারণের মতই শোষিত হইতেছে। তাহাদের মজুরি এত কম যে প্রায় অনশনে তাহাদের কাটাইতে হয়। তাহাদের চাকুরির অবস্থা কঠোর এবং কষ্টকর। তাহাদিগকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজেদের দেশের জনসাধারণকে দমন করিবার কাজে খুশিমত লাগান হইয়াছে। জীবনধারণের মজুরি পাইবার মত কোন অধিকার গভর্নমেন্ট তাহাদিগকে গ্যারান্টি করেন নাই অথচ অন্যান্য শ্রমিক যাহারা উন্নততর জীবনধারণের মান আদায় করিবার জন্য পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়িতেছে সেই শ্রমিকদের নিকট হইতে আলাদা করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে সব রকম বাধা নিষেধ তাহাদের উপর দেওয়া হইয়াছে। জীবনধারণের উপযুক্ত অবস্থা আদায় করিবার জন্য ইউনিয়ন সংগঠন করা হইতে এইভাবে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীকে নিষিদ্ধ করার কোন যৌক্তিকতা কংগ্রেসী সরকারের নাই।

গভর্নমেন্ট দাবি করিতেছে যে ইউনিয়নের নিয়মকানুনের মধ্যে এমন ব্যবস্থা থাকিতে

হইবে যাহাতে যাহারা কার্যকরী সমিতি কর্তৃক অসমর্থিত কোন ধর্মঘটে যোগদান করিলে তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

"কার্যকরী সমিতি অথবা অধিকাংশ সভ্যের সমর্থন ছাড়া যেই সব সভ্যগণ ধর্মঘটে যোগদান করিবে অথবা ট্রেড ইউনিয়নের নিয়মকানুন যাহারা অন্যভাবে লঙ্ঘন করিবে, তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার পদ্ধতি।" (৬ (১) ধারা)—গভর্নমেন্ট দাবি করিতেছেন যে নিয়মাবলীর মধ্যে এই বিষয়টির উল্লেখ করিতে হইবে।

গভর্নমেন্ট এবং মালিকের ক্রমবর্ধমান ও অতর্কিত আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য, সরকারি ও বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণ স্বতস্ফূর্তভাবে ধর্মঘট করে। এইরূপ ধর্মঘটের জন্য একমাত্র মালিকেরাই দায়ি। অত্যাচার, ব্যাপক গ্রেপ্তার, লাঠিচার্জ এবং গুলি অগ্রাহ্য করিয়া বুভুক্ষু শ্রমিকগণ সাহসের সহিত, সংকল্পের সহিত বারবার এইরূপ অতর্কিত আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছে এবং স্বতস্ফূর্ত ধর্মঘট বর্তমান দিনের সাধারণ ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একমাত্র শ্রমিকদের দ্রুত প্রতি-আক্রমণের ফলেই মালিক এবং গভর্নমেন্ট ছাঁটাই, কাজের বোঝা বাড়ান, মজুরি হ্রাস করা ইত্যাদি দ্বারা তাহাদের আক্রমণ অনেক সময় সহজে চালু করিতে বাধাগ্রস্ত হইয়াছে।

শ্রমিকদের এই সব কার্যকরী প্রতি-আক্রমণ যাহাতে ঘটিতে না পারে তাহার জন্য আগে হইতে ব্যবস্থা হিসাবে গভর্নমেন্ট এই সব ধর্মঘটকে বে-আইনি ঘোষণা করিয়াছে এবং চাকুরি যাওয়া ও মজুরির লোকসান ছাড়াও শ্রমিকগণকে ছয় মাসের জেল দেওয়ার ব্যবস্থাও হইতেছে।

কিন্তু গভর্নমেন্ট ইহাতেও খুশি হয় নাই। গভর্নমেন্ট ইউনিয়নগুলিকে শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর এবং তাহাদিগকে এমন গঠনতন্ত্র তৈয়ার করিতে বাধ্য করিতে চায় যাহার ফলে শ্রমিকগণ স্বতস্ফূর্ত ধর্মঘটে যোগদান করিতে পারিবে না। এই বিলে ইউনিয়নগুলিকে ধর্মঘট-ভাঙ্গা দালাল সংগঠনে পরিণত হইতে বাধ্য করা হইতেছে।

যে সব ইউনিয়ন শ্রমিক শ্রেণির প্রকৃত স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পুঁজিবাদী দাসত্বের এইরূপ জঘন্য ব্যবস্থা মানিতে অস্বীকার করিবে, তাহাদিগকে আদৌই রেজিষ্ট্রী করা হইবে না অথবা এইরূপ একটি নিয়ম কার্যকরী করিতে অস্বীকৃত হওয়ার জন্য তাহাদের বর্তমান রেজিষ্ট্রেশন নাকচ করা হইবে।

বিলের উদ্দেশ্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে আরও বলা হইয়াছে এবং বিল দাবি করিতেছে যে যেই ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রী করিতে চায় তাহার গঠনতন্ত্রে নিম্নলিখিত বিষয়টি থাকিতে হইবে, "ইউনিয়নের কর্মকর্তাগণ যাহারা এই আইনের বিধিব্যবস্থা অথবা ট্রেড ইউনিয়নের নিয়মকানুন লঙ্ঘন করিবে তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার পদ্ধতি।" (৬ (ত্র) ধারা)

প্রথমত, ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রে এইরূপ নিয়ম করিতে হইবে যে শ্রমিকগণ স্বতস্ফূর্ত ধর্মঘটে যোগদান করিবে না। শ্রমিকগণ যদি এই নিয়ম না মানে, তবে তাহাদের ইউনিয়ন হইতে বহিষ্কার করিতে হইবে। যদি কোন কর্মকর্তা স্বতস্ফূর্ত ধর্মঘটে যোগদান করে অথবা সমর্থন করে, তবে তাহাকে ইউনিয়ন হইতে বাহির করিয়া দিতে হইবে। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের নিকট এই হইল পুঁজিবাদী গভর্নমেন্টের আদেশ। ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন করার জন্য অথবা রেজিষ্ট্রেশন বজায় রাখিবার জন্য, এই শর্ত তাহারা দাবি করিতেছে।

তাহাদের জীবনধারণের মানের উপর পুঁজিবাদীদের আক্রমণ যদি শ্রমিকরা প্রতিরোধ করে, তবে তাহাদের বহিষ্কার কর। কাজের জায়গার ভিতরে অথবা বাহিরে ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের ফলে, ব্যাপক বেকারি, অথবা এইরূপ কিছুর ফলে, শ্রমিকগণ যদি নিয়মিত ইউনিয়নের চাঁদা দিতে না পারে, তবে তাহার রেজিস্ট্রেশনের অধিকার নষ্ট হইয়া যাইবে। এই হইল নতুন বিলের স্বরূপ।

কিন্তু এইখানেই শেষ নহে। ২০ লক্ষ সরকারি চাকুরিয়াদের কোন বে-সরকারি চাকুরিয়াদের প্রতিষ্ঠানে যোগদান নিষিদ্ধ করিয়া গভর্নমেন্ট শ্রমিকদের একতা নির্লজ্জভাবে ধ্বংস করিতে চায়। শ্রমিক শ্রেণির সাধারণ আন্দোলন হইতে সরকারি চাকুরিয়াদের দূরে রাখিবার উদ্দেশ্যে এবং এইভাবে তাহাদের অবস্থার উন্নতির সংগ্রাম পঙ্গু করিবার জন্য, বিল তাহাদের উপর কতকগুলি বাধা-নিষেধ চাপাইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে বিলের উদ্দেশ্য এবং কারণাবলীর সঙ্গে নিম্নলিখিতভাবে বলা হইয়াছে।—

"যদি কোন ট্রেড ইউনিয়ন সম্পূর্ণভাবে সরকারি চাকুরিয়াদের দ্বারা গঠিত না হয় অথবা এই ট্রেড ইউনিয়ন এমন একটি ফেডারেশনের সহিত যুক্ত থাকে যাহার মধ্যে সরকারি চাকুরিয়ারা ব্যতীত অন্য ট্রেড ইউনিয়নও যুক্ত আছে; তবে বিলের বিধান অনুযায়ী সরকারি চাকুরিয়াদের এরূপ ট্রেড ইউনিয়নের সংশ্লিষ্ট গভর্নমেন্ট কর্তৃক বাধ্যতামূলক স্বীকৃতির অধিকার থাকিবে না।" সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যায় যে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মত ভারতের শ্রমিক শ্রেণির কেন্দ্রীয় সংগঠন অথবা অন্যান্য সংগঠন যাহাতে সমস্ত শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন যুক্ত থাকে সেই রূপ সংগঠন হইতে লক্ষ লক্ষ সরকারি চাকুরিয়াদের দূরে রাখাই হইল বিলের উদ্দেশ্য।

হাসপাতাল এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের সংগঠনের উপর বিল এইরূপ একই প্রকার বাধা-নিষেধ চাপাইয়া দিয়াছে। বিভিন্ন রকম শ্রমিকদের উপর যেমন পরিদর্শন ব্যবহার কর্মচারী (সুপারভাইজারী স্টাফ) এবং ওয়াচ এন্ড ওয়ার্ড ডিপার্টমেন্টে নিযুক্ত কর্মচারীদের উপরও এই একই রকম বাধা-নিষেধ চাপান হইয়াছে। শ্রমিকদের এই সমস্ত অংশকে ভারতের শ্রমিক শ্রেণির মৌলিক অধিকার এবং দাবির সাধারণ সংগ্রাম হইতে খেয়াল খুশিমত দূরে সরাইয়া রাখা হইতেছে।

এইভাবে শ্রমিকদের সংগ্রাম দমন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামী ঐক্যের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাইবার জন্য এই বিলটি হইল একটি খোলাখুলি প্রচেষ্টা।

বিলের উদ্দেশ্য ও কারণাবলীর মধ্যে আরও বলা হইয়াছে ঃ—

"ইউনিয়ন সভ্যের চাঁদার হার, এবং চাঁদা বাকি পড়া ও অন্যান্য যে সব অবস্থায় কোন সভ্যের নাম সভ্যতালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইবে, এখন হইতে ট্রেড ইউনিয়নের নিয়মাবলীর মধ্যে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে।"

বর্তমানে এমন কি ইউনিয়নের স্বাভাবিক কাজও যেমন চাঁদা আদায় প্রভৃতি ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের প্রত্যক্ষ অবস্থার মধ্যে চালাইয়া যাইতে হয়, সেই সমস্ত শ্রমিকেরা মালিকের দালাল সংগঠন (অর্থাৎ কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত ইউনিয়ন) ব্যতীত অন্য কোন ইউনিয়নে যোগদান করিবে তাহাদের বিরুদ্ধে বিভেদমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অথবা তাহাদের চাকুরি হইতে বরখাস্ত করাও সাধারণ ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গভর্নমেন্ট এই সমস্ত অসুবিধার কথা ভালভাবেই জানে; যেই

অসুবিধা তাহাদের নিজেদের ফ্যাসিস্ট শাসনের ফলে সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও এখন তাহারা ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রে এইরূপ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা দাবি করিতেছে।

এই সমস্ত ব্যবহার মারফত সেই সমস্ত ইউনিয়ন প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদের আস্থাভাজন এবং তাহাদের প্রকৃত নেতা, যে সমস্ত ইউনিয়ন প্রতিনিধিমূলক নয় বলিয়া যাহাতে প্রমাণিত হয় এবং তাহার বদলে শাস্তির ভয় দেখাইয়া মালিকের সাহায্যে যে সমস্ত আই-এন-টি-ইউ-সি'র ইউনিয়ন জোর করিয়া চাঁদা আদায় করে তাহারা যাহাতে প্রতিনিধিমূলক সংগঠন বলিয়া ঘোষিত হয় এবং শ্রমিকদের পক্ষ লইয়া কথা বলার সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা তাহাদের থাকে তাহা দেখাই ইহার উদ্দেশ্য। ইহার সহজ অর্থ শ্রমিকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।

ইউনিয়নকে রেজিষ্ট্রী করার জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলি চাপাইয়া এই একই উদ্দেশ্যসাধন করার চেষ্টা হইতেছে।

৬ নং ধারা ঃ

(ছ) "সাধারণ সভ্যদের দেয় চাঁদার হার মাসিক দুই আনার কম হইবে না—কৃষি, গ্রামাঞ্চলে কুটীর শিল্প, কন্‌জারভেন্সি (ময়লা নিষ্কাষণ ব্যবস্থা) অথবা এরূপ পরিশ্রম সাধ্য অন্যান্য শিল্প যাহার সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট গভর্নমেন্ট সরকারি গেজেটে ঘোষণা করিবেন, সেইরূপ শিল্পে নিযুক্ত কর্মচারীদের বেলায় বাৎসরিক চাঁদার হার কম করা যাইতে পারে।

(জ) "যেসব পরিস্থিতিতে (ইহার মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চাঁদা বাকি পড়ার কথাও থাকিবে) কোন সভ্যের নাম সভ্যের তালিকা হইতে বাদ দিতে হইবে।"

কিন্তু পুঁজিবাদী গভর্নমেন্ট তাহাদের কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারের উপর এই সমস্ত বাধা নিষেধ চাপাইযাও সন্তুষ্ট হয় নাই। তাহারা আরও অগ্রসর হইয়াছে। বিলের উদ্দেশ্য ও কারণের মধ্যে বলা হইয়াছে ঃ

"সামরিক অথবা বে-সামরিক সমস্ত সরকারি চাকুরিয়ার রাজনৈতিক ফাণ্ডে চাঁদা দিতে পারিবে না কিন্তু যাহারা সরকারি চাকুরিয়া নন তাহাদের উপর এইরূপ কোন বাধা নিষেধ থাকিবে না।"

ইহার অর্থ খুবই স্পষ্ট। রেল শ্রমিক ও কর্মচারী, ডাক তার শ্রমিক, কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের গোলাবারুদের কারখানার ও ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার শ্রমিক ও কর্মচারী, পি-ডবলিউ-ডি, সেক্রেটারিয়েট এবং গভর্নমেন্টের এইরূপ অন্যান্য বিভাগের শ্রমিক ও কর্মচারী—সর্বসমেত মোট প্রায় ২০ লক্ষ কর্মচারী কেবল যে রাজনৈতিক কার্যকলাপে যোগদান করিতে পারিবে না শুধু তাহা নয়, তাহারা রাজনৈতিক ফাণ্ডেও কোন চাঁদা দিতে পারিবে না। এই লক্ষ লক্ষ কর্মচারী ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করিতে পারিবে না। পুঁজিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কোন আন্দোলনে তাহারা যোগদান করিতে পারিবে না। ইহার সোজাসুজি অর্থ হইতেছে লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে তাহাদের রাজনৈতিক মতবাদ পোষণ করিবার অধিকার হইতে খোলাখুলিভাবে এবং নির্লজ্জভাবে বঞ্চিত করা।

এই উদ্দেশ্যে কোন ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন পাইবার অথবা বজায় রাখিবার পূর্বশর্ত হিসাবে ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রে নিম্নলিখিত নিয়ম অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে বলিয়া গভর্নমেন্ট দাবি করিয়াছে। ৬ (ট) ধারায় দাবি করা হইয়াছে ঃ—

"সম্পূর্ণভাবে অথবা আংশিকভাবে যে ইউনিয়নে সরকারি চাকুরিয়া আছে, সেই

ইউনিয়নের সভ্যদের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কোনরূপ রাজনৈতিক কার্যকলাপে যোগদান নিষিদ্ধ করিতে হইবে এবং যে কোন সভ্য কোনরূপ রাজনৈতিক কার্যকলাপে যোগদান করিবে তাহার নাম সভ্য তালিকা হইতে বাদ দিতে হইবে।"

ইউনিয়নের পরিচালনার মধ্যে হস্তক্ষেপ

এই বিলে সরকার এমন অধিকার গ্রহণ করিয়াছে যাহাতে স্বতস্ফূর্ত ধর্মঘটের জন্য শ্রমিকদের শাস্তি দিতে এবং ইউনিয়ন হইতে বহিষ্কার করিতে ইউনিয়নগুলিকে বাধ্য করিতে পারে। অন্যথায় ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বিপন্ন হইবে; এই বিলে সরকার এমন অধিকার গ্রহণ করিয়াছে যাহার দ্বারা ২০ লাখ সরকারি চাকুরিয়াকে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে এবং উন্নততর জীবনযাত্রার জন্য সাধারণ সংগ্রামে ভারতের অন্যান্য শ্রমিকদের সহিত এক হইতে বাধা দিতে পারে; এবং ইহারও উপর ইউনিয়নগুলির দৈনন্দিন কার্যকলাপে তাহাদের খোলাখুলি এবং নির্লজ্জ নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত করিবার জন্য এবং ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকলাপে যে কোন সময়ে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার সুনিশ্চিত করিবার জন্য সরকার এই বিলে আরও ক্ষমতা চাহিয়াছে।

১৫ নং সেকশন ১ নং ধারায় বলা হইয়াছে।

"রেজিস্ট্রীভুক্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলি পরিদর্শন করার জন্য এবং এইরূপ যে সকল কাজ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে তাহার জন্য সংশ্লিষ্ট গভর্নমেন্ট যত সংখ্যক প্রয়োজন ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করিতে পারিবেন।"

ইহার অর্থ সুস্পষ্ট। জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে পঙ্গু করিবার জন্য এই বিল বুর্জোয়া সরকারকে যে ব্যাপক ক্ষমতা দিয়াছে সেই ক্ষমতা এই সমস্ত ছোট অফিসারদের দ্বারা এবং তাহাদের মারফত প্রয়োগ করা হইবে; শ্রমিক শ্রেণির ইউনিয়নগুলিকে এইসব অফিসারদের অধীনে এখন লইয়া যাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। শ্রমিক এবং শ্রমজীবী জনসাধারণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর ঘৃণ্য জন-নিরাপত্তা আইনের মারফত সাব-ইন্সপেক্টরদের অসীম ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। শ্রমিকদের এবং অন্যান্য মেহনতী জনগণের শ্রেণি সংগঠনের উপর এই একই প্রকার অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট ক্ষমতা ট্রেড ইউনিয়ন বিলের মারফত ইন্সপেক্টরদের দেওয়া হইয়াছে।

এই বিলের মারফত এই ইন্সপেক্টরদের ক্ষমতা সুচিন্তিতভাবে অনির্দিষ্ট রাখা হইয়াছে এবং ধনিক শ্রেণির এবং তাহার আইনের সব হুকুম কোন ট্রেড ইউনিয়ন অধীনের মত তামিল করিয়াছে কিনা তাহা এই ইন্সপেক্টরাই স্থির করিবেন। তিনি যদি সিদ্ধান্ত করেন যে কোন ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের হুকুম পালন করিতে অস্বীকার করিয়াছে এবং তার বদলে শ্রমিক শ্রেণির পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়াছে, তাহা হইলে তিনি সেই ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন নাকচ করিয়া দিতে পারেন অথবা রেজিস্ট্রী করিতে দিতে একেবারেই অস্বীকার করিতে পারেন।

কোন একটি ট্রেড ইউনিয়ন কি ভাবে চালাইতে হইবে অথবা না হইবে, তাহা স্থির করিবে এই গভর্নমেন্ট অফিসারটি, তাহা ঐ ইউনিয়নের সহিত সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সাধারণ স্থির করিবে না। শ্রমিকদের ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ করিবে শ্রমিকগণ নয়—তাহা নিয়ন্ত্রণ করিবেন এই অফিসার। তিনি হইলেন সর্বক্ষমতাসম্পন্ন ডিক্টেটর যাহার আদেশ শ্রমিকদের সংগঠনগুলিকে মানিতে বলা

হইতেছে। এই আদেশ মানিতে ব্যর্থ হইলে রেজিস্ট্রেশন নাকচ হইয়া যাইবে; প্রায় বে-আইনি অবস্থার মধ্যে কাজ করিতে ইউনিয়নগুলি বাধ্য হইবে।

ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের উপর বাধা-নিষেধ

ইউনিয়নের কাজ অসুবিধাজনক করার উদ্দেশ্যে, গভর্নমেন্ট এই বিলের মারফত ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের উপর আরও বাধানিষেধ চাপাইয়াছে, ২৪ (১) ধারায় বলা হইয়াছে ঃ—

"কোন একটি প্রতিষ্ঠান অথবা একজাতীয় কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের চাকুরিয়া না হইয়াও যাহারা উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন রেজিষ্ট্রীভুক্ত ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতির কর্মকর্তা হইবার অধিকারী হইতে পারেন তাহাদের সংখ্যা চার অথবা কার্যকরী সমিতির মোট সদস্য সংখ্যার এক চতুর্থাংশের বেশি হইতে পারিবে না—ইহার ভিতর যে সংখ্যাটি কম সেই সংখ্যাই গৃহীত হইবে।"

শ্রমিকদের যে নেতারা এতদিন পর্যন্ত তাহাদের সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছে তাহাদের আজ ইউনিয়নের নেতৃত্ব হইতে বাদ দিতে হইবে। এই ব্যবস্থার স্পষ্ট উদ্দেশ্য হইল তাহাদের সংগ্রামের কার্যকরী নেতৃত্ব হইতে শ্রমিকদের বঞ্চিত করা। কিন্তু এই ধারার প্রকৃত অর্থ আরও অনেক বিপজ্জনক। আসলে গভর্নমেন্ট যাহা করিতে চায় তাহা হইল এই—যে সমস্ত জঙ্গী শ্রমিক যোদ্ধা শ্রমিকদের সংগ্রাম পরিচালনা করিতে যাইয়া চাকুরি হইতে বরখাস্ত হইয়াছেন তাহাদেরও ইউনিয়ন হইতে বাহিরে রাখা। তাহাদের চাকুরি নাই বলিয়া তাহাদিগকে ইউনিয়ন হইতে এখন বাদ দেওয়া হইবে। এইভাবে ইউনিয়নের শ্রমিক কর্মকর্তাদের চাকুরি হইতে বরখাস্ত করিবার জন্য মালিকদিগকে খোলাখুলিভাবে আহ্বান করা হইতেছে। বিলের এই ধারা এইভাবে সরাসরি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে আক্রমণ করিতেছে। শ্রমিক যোদ্ধারা তাহাদের ইউনিয়নে যাহাতে নেতৃত্বের পদে না থাকিতে পারে এবং তাহার বদলে কর্মচারীদের মধ্য হইতে অনুন্নত ব্যক্তিদের নেতৃত্বের পদে রাখিবার জন্য খোলাখুলিভাবে চেষ্টা করা হইতেছে; ইহার উদ্দেশ্য হইল যাহাতে শ্রমিকদের প্রতিরোধ সহজে দমন করা যায়।

"অসাধু কার্যকলাপ"—ইউনিয়নগুলিকে আক্রমণ করিবার একটি হাতিয়ার

কিন্তু ইউনিয়নগুলির পক্ষে রেজেষ্ট্রীভুক্ত হইবার অথবা স্বীকৃতি লাভ করিবার পথে তাহাদের উপর এইরূপ সব বাধা-নিষেধ দ্বারা সর্বপ্রকারে অসুবিধা সৃষ্টি করিবার পরও গভর্নমেন্ট সন্তুষ্ট হন নাই। তাহারা ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন অথবা স্বীকৃতি বজায় রাখিবার ব্যাপারেও আরও অনেক বাধা-নিষেধ চাপাইয়াছে। "অসাধু কার্যকলাপ" সম্পর্কে ধারার মারফত ইহা করিবার চেষ্টা হইতেছে।

৪০ নং ধারা নিম্নলিখিতভাবে "অসাধু কার্যকলাপের" ব্যাখ্যা করিয়াছে ঃ—

"স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে নিম্নলিখিতগুলি অসাধু কার্যকলাপ বলিয়া বিবেচিত হইবে। যথা —

(ক) কোন ট্রেড ইউনিয়নের অধিকাংশ সভ্য যদি কোন অনিয়মিত ধর্মঘটে যোগদান করে।

(খ) কোন ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতি যদি কোন অনিয়মিত ধর্মঘটের ব্যাপারে পরামর্শ দেয়, সক্রিয় সমর্থন দেয় অথবা ধর্মঘটের জন্য উস্কানী দেয়।

(গ) ট্রেড ইউনিয়নের কোন কর্মকর্তা যদি এই আইন অনুযায়ী মিথ্যা বিবৃতি সমেত কোন হিসাবপত্রাদি (রিটার্ণ) দাখিল করে।"

কোন স্বতস্ফূর্ত ধর্মঘটে শ্রমিকদের যোগদানকে অথবা ইউনিযনের কার্যকরী সমিতি কর্তৃক এইরূপ কোন ধর্মঘটে সমর্থনকে "অসাধু কার্যকলাপ" গণ্য করিয়া এবং তদনুযায়ী তাহাকে অপরাধ হিসাবে ঘোষণা করিয়া, ইউনিয়নের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

কোন ইউনিয়ন এইরূপ "অসাধু কার্যকলাপের" জন্য দোষী এই অজুহাতে, রেজিষ্ট্রার অথবা মালিক ইউনিয়নের অনুমোদন প্রত্যাহার দাবি করিয়া লেবার কোর্টের নিকট দরখাস্ত করিতে পারে। ইউনিয়নের তথাকথিত স্বীকৃতি কিরূপ মিথ্যা এবং মূল্যবিহীন, তাহা এই ঘটনাই দেখাইয়া দিতেছে। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন যখনই শ্রমিকদের স্বতস্ফূর্ত ধর্মঘট সমর্থন করিবে, তখনই ইহার স্বীকৃতি কিভাবে প্রত্যাহার করা যাইতে পারে, তাহাও এই ঘটনা দেখাইয়া দেয়।

ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের নিকট যে হিসাবপত্র ইত্যাদি দাখিল করে তাহার মধ্যে কোন খুঁত বাহির করিয়াও রেজিষ্ট্রার অথবা মালিক ইউনিয়নের স্বীকৃতির প্রত্যাহার দাবি করিতে পারেন।

"অসাধু কার্যকলাপের" জন্য দোষী এই অভিযোগে যে ইউনিয়নের স্বীকৃতি এইভাবে প্রত্যাহার করা হইয়াছে, সেই ইউনিয়নের কর্মকর্তার তিন বৎসরের জন্য কোন ইউনিয়নের কর্মকর্তা হইবার অধিকার থাকিবে না।

রেজিষ্ট্রীভুক্ত হওয়া এবং স্বীকৃতি লাভ করা—

প্রথমত, কোন ইউনিয়নের সভ্যরা অথবা ইহার কর্মকর্তারা যদি স্বতস্ফূর্ত ধর্মঘটে যোগদান করে অথবা এইরূপ কোন ধর্মঘটে যোগদান করে যে ধর্মঘট ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতির নিয়মিত সভা দ্বারা সমর্থিত হয় নাই, তবে তাহাদের বহিষ্কারের ব্যবস্থা যদি কোন ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রে না থাকে, তবে সেই ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রীভুক্ত হইতে পারিবে না।

স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘটের বিরুদ্ধে যদি ইউনিয়ন স্পষ্টভাবে না দাঁড়ায়, যদি ইহা খোলাখুলি ধর্মঘট-ভাঙ্গা দালাল সংগঠনে পরিণত হইতে স্বীকার না করে তবে ইহা (ইউনিয়ন) রেজিষ্ট্রীভুক্ত হইতে দাবি করিতে পারিবে না।

দ্বিতীয়ত, কেবল রেজিষ্ট্রীভুক্ত ইউনিয়নের স্বীকৃতি লাভের অধিকার থাকিবে। কিন্তু এইভাবে স্বীকৃতি লাভ করিবার পর যদি সেই সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন যে কোন অবস্থায় যে কোন ধর্মঘট সংগ্রামে কোনরূপ সাহায্য দান না করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করে তবেই কেবল তাহার রেজিষ্ট্রেশন বজায় থাকিবে।

সংশ্লিষ্টভাবে, শ্রমিকদের সংগঠনের অধিকার, ধর্মঘটের অধিকার, অবস্থার গুরুত্ব অনুসারে মালিকদের আক্রমণের বিরুদ্ধে তাড়াতাড়ি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং মালিকদের আক্রমণ রুখিবার জন্য স্বতস্ফূর্ত ধর্মঘটে যোগদান করিবার অধিকার—যে সব ইউনিয়ন এই সব অধিকারের পক্ষে দাঁড়াইবে এবং তাহা রক্ষা করিবে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে দমন করাই হইল ট্রেড ইউনিয়ন বিলের আসল উদ্দেশ্য।

এই বিলে, যে ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদের প্রকৃত সংগ্রামী সংগঠন তাহাদিগকে প্রত্যেক ধর্মঘটের বিরুদ্ধতা করিবার জন্য, ধর্মঘটে যোগ দিবার নিমিত্ত ইউনিয়নের সভ্যদের শাস্তি দিবার জন্য সম্মত হইতে বলা হইতেছে। এই সমস্ত নির্লজ্জ হুকুম তামিল করিতে ব্যর্থ হওয়ার অর্থ এই দাঁড়াইবে যে ঐ সকল সংগ্রামী ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন নাকচ হইয়া যাইবে এবং তাহাদের প্রায় বে-আইনি অবস্থার মধ্যে কাজ চালাইতে হইবে এবং তাহাদের কোনরূপ আইনসঙ্গত রক্ষা ব্যবস্থা থাকিবে না।

সংগ্রামী ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রীভুক্ত হওয়া এবং স্বীকৃতি লাভ করা অসম্ভব করিয়া তুলিবার পর, গভর্নমেন্ট ৩৫ ধারা অনুসারে পুতুল ইউনিয়নগুলিকে কাজ করিবার জন্য কতকগুলি সুযোগ সুবিধা দিয়াছে এবং তাহাদের সভা ইত্যাদি ঘোষণা করিবার জন্য কতকগুলি সুবিধা দেওয়ার জন্য মালিকদিগকে বাধ্য করিয়াছে।

এই ভাবে, যে সমস্ত ইউনিয়ন তাহাদের সভ্যদের স্বতস্ফূর্ত ধর্মঘটে যোগদান করিবার জন্য শাস্তি দিতে সম্মত না হইবে অর্থাৎ যাহারা ধর্মঘট ভাঙ্গা সংগঠন হিসাবে কাজ করিতে সম্মত না হইবে একদিকে যেমন তাহাদের স্বীকৃতি অথবা রেজিষ্ট্রেশন প্রত্যাহার করা হইতেছে, অন্যদিকে যেসব পুতুল ট্রেড ইউনিয়ন খোলাখুলি ধর্মঘট ভাঙ্গার কাজ করার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে কাজ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ সুযোগ সুবিধা গভর্নমেন্ট দিতেছে।

সংক্ষেপে, ভারত গভর্নমেন্ট যে ট্রেড ইউনিয়ন বিল উপস্থিত করিয়াছে তাহা খোলাখুলি নিম্নলিখিত রূপ প্রচেষ্টা করিতেছে ঃ—

১। যে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন পুঁজিবাদীদের নিকট এবং বুর্জোয়া সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে অস্বীকার করিবে, এবং যাহারা জীবন ধারণের মত মজুরি, চাকুরির নিরাপত্তা এবং জীবন ধারণের অবস্থার উন্নতির জন্য সংগ্রামে শ্রমিকদিগকে সংগঠিত ও পরিচালিত করিবে, যাহারা ব্যাপক ছাঁটাই, মজুরির উপর ক্রমাগত আক্রমণ, কাজের বোঝা বাড়াবার চেষ্টা ও এইরূপ অন্যান্য ব্যবহার মারফত মালিক ও গভর্নমেন্টের প্রতিটি আক্রমণ প্রতিরোধ করিবে সেই সব ইউনিয়নকে দমন করা।

২। গভর্নমেন্টের আক্রমণের বিরুদ্ধে যে সব শ্রমিক ও নেতারা স্বতস্ফূর্ত ধর্মঘটে যোগদান করিবে তাহাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য ও ইউনিয়ন হইতে বহিষ্কার করার জন্য নিয়ম কানুন যে সব ইউনিয়ন তাহাদের গঠনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করিতে অস্বীকার করিবে, তাহাদের রেজিষ্ট্রেশন নাকচ করা।

৩। যে সব ইউনিয়ন শ্রমিকদের উপর গোয়েন্দাগিরি করিবে, ও শ্রমিকরা ধর্মঘট করিলে তাহাদের শাস্তি দিবে, এবং এইভাবে পুঁজিবাদীদের এবং গভর্নমেন্টের খোলাখুলি ধর্মঘট ভাঙ্গার দালাল হিসাবে কাজ করিবে, কেবল সেইসব ইউনিয়নকে রেজিষ্ট্রীভুক্ত হইতে এবং স্বীকৃতি লাভ করিতে দেওয়া।

৪। ইউনিয়নের কার্যকলাপের মধ্যে হস্তক্ষেপ করা যাহাতে মালিক এবং গভর্নমেন্টের নিকট ইউনিয়নগুলির সম্পূর্ণরূপে বশ্যতা স্বীকার নিশ্চিন্ত হয় এবং যাহাতে সমস্ত স্বতস্ফূর্ত ধর্মঘটের বিরোধী হিসাবে, ধর্মঘট ভাঙ্গা দালাল হিসাবে কাজ করতে ইউনিয়নগুলি বাধ্য হয়।

৫। কেবল আই-এন-টি-ইউ-সি ইউনিয়ন যাহারা খোলাখুলি ঘোষণা করিবে যে তাহাদের নীতি হইল প্রত্যেক ধর্মঘটের বিরুদ্ধতা করা এবং পুঁজিবাদীদের স্বার্থ রক্ষা করা। এই বিলে

কেবল সেই সকল ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রীভুক্ত হইবার অধিকার থাকিবে।

৬। শ্রমিকদের পক্ষ হইয়া আপস আলোচনা চালাইবার এবং আপস মীমাংসা করিবার অধিকারী হিসাবে, কেবল সরকার ও পুঁজিবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ইউনিয়নগুলিকে এই বিল স্বীকার করিতে ও রেজিষ্ট্রীভুক্ত করিতে চাহিতেছে। কার্যত ইহার অর্থ হইল আই-এন-টি-ইউ-সি ও তাহার অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নগুলি কর্তৃক শ্রমিকদের স্বার্থের প্রতি খোলাখুলি বিশ্বাসঘাতকতাকে আইনসম্মত করা।

৭। ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর কেন্দ্রীয় সংগঠন যেখানে বে-সরকারি কর্মচারীদের ইউনিয়নও যুক্ত আছে, সেই সংগঠনে সরকারি কর্মচারীদের ইউনিয়নের যোগদান নিষিদ্ধ করিয়া, এই বিল এইভাবে লক্ষ লক্ষ সরকারি কর্মচারীদের অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট হইতে আলাদা রাখিবার জন্য সুচিন্তিতভাবে চেষ্টা করিতেছে। শ্রমিকদের ঐক্য ভাঙ্গিবার এবং পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে তাহাদের সাধারণ ফ্রন্ট দুর্বল করিবার এই হইল পূর্বপরিকল্পিত প্রচেষ্টা।

৮। এই বিল সরকারি চাকুরিয়াদের উপর গুরুতর বাধানিষেধ চাপাইয়াছে। তাহাদের নিকট দাবি করা হইয়াছে যে তাহারা কোন রাজনৈতিক মতবাদ পোষণ করিবে না অথবা কোন রাজনৈতিক দলে যোগ দিবে না, এইভাবে তাহাদিগকে কেনা গোলামে পরিণত করিতে চেষ্টা করা হইতেছে, যাহারা পুঁজিবাদী গভর্নমেন্টের যে কোন নীতি সমর্থন করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিবে।

৯। হাসপাতালের কর্মচারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, ওয়াচ এবং ওয়ার্ড ডিপার্টমেন্টে নিযুক্ত কর্মচারী এবং পরিদর্শন ব্যবস্থার কর্মচারীদের [সুপারভাইজার স্টাফ] বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা এই বিল করিয়াছে এবং এইভাবে পুঁজিবাদী এবং তাহাদের সরকারের বিরুদ্ধে সমস্ত শ্রমিকের সাধারণ সম্মিলিত ফ্রন্ট দুর্বল করিতে চেষ্টা করা হইতেছে।

১০। এইরূপ গুরুতর বাধানিষেধে সীমাবদ্ধ সংগঠনের অধিকার হইতেও সৈন্যবাহিনী এবং পুলিশকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা হইয়াছে। অন্যান্য শ্রমজীবী জনসাধারণের সাথে সাথে এই পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীও ক্রমাবনত অর্থনৈতিক অবস্থা ও অনশনের মজুরির কঠিন চাপে কষ্টের মধ্যে দিন কাটাইতেছে।

এইভাবে ট্রেড ইউনিয়ন বিল শ্রমিকদিগকে তাহাদের ইউনিয়ন বিনা বাধায় সংগঠিত করিবার জন্য একটিও অধিকার দেয় নাই। তাহার বদলে, যে সামান্যতম অধিকার বর্তমানে আছে তাহাও এই বিল তুলিয়া লইতে চাহিতেছে। এবং এইভাবে অসীম বাধানিষেধের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণিকে বাঁধিয়া তাহাদিগকে কেনা গোলামে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছে।

এ-আই-টি-ইউ-সি ট্রেড ইউনিয়ন বিলকে একটি ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থা হিসাবে অভিহিত করিয়াছে। এই বিল একদিকে ইউনিয়নগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহিতেছে অন্যদিকে শ্রমিকদের সংগঠন ও ধর্মঘটের অধিকার তুলিয়া লইতেছে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উপর বুর্জোয়া একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এই বিল খোলাখুলিভাবে চেষ্টা করিতেছে। এ-আই-টি-ইউ-সি এই ব্যবস্থার তীব্রভাবে নিন্দা করিতেছে এবং অবিলম্বে ইহার সম্পূর্ণ প্রত্যাহার দাবি করিতেছে।

এ-আই-টি-ইউ-সি আরও দাবি করিতেছে যে ট্রেড ইউনিয়নের নিম্নলিখিত অধিকারগুলি সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা হউক এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলি যাহাতে বিনা বাধায় কাজ করিতে

পারে তাহা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা অবিলম্বে নেওয়া হউক ঃ—

১। সংগঠনের অধিকার, ধর্মঘটের অধিকার, রাজনৈতিক মতবাদ পোষণ করিবার অধিকার এবং নিজেদের ইচ্ছামত যে কোন রাজনৈতিক দলে যোগ দিবার অধিকার সম্পূর্ণভাবে এবং বাধাশূন্যভাবে স্বীকার করা।

২। বিনাবাধায় কাজের যায়গায় [চাকুরির স্থলে] ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ চালাইয়া যাইবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা।

৩। ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গ্যারান্টি।

৪। বম্বে শিল্প-সম্পর্ক আইন [ইন্ডাষ্ট্রীয়াল রিলেশন এ্যাক্ট] ভারতীয় শিল্প-বিরোধ আইন [ইন্ডিয়ান ট্রেড ডিসপিউট এ্যাক্ট] রদ করা এবং শ্রমিকদের সংগঠনের ও ধর্মঘটের অধিকার সীমাবদ্ধ করিতে চায় এইরূপ অন্য সকল ব্যবস্থা বাতিল করা।

৫। সমস্ত রকম জননিরাপত্তামূলক আইন এবং নিবর্তনমূলক আটক আইন [প্রিভেনটিভ ডিটেনশন এ্যাক্ট] যে সব আইনে হাজার হাজার ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক এবং ছাত্র নেতারা বিনাবিচারে জেলে আটক রহিয়াছেন সেই সব আইন রদ করা এবং সব শ্রমজীবী জনসাধারণের জন্য সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করা।

৬। মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনের যুক্তরাষ্ট্র, মধ্যভারত এবং ভূপালের ট্রেড ইউনিয়নের উপর যে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রত্যাহার করা।

৭। জননিরাপত্তামূলক আইনে বিনা বিচারে বন্দী শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত কর্মচারী এবং মহিলার সকল নেতাদের মুক্তি। বিভিন্ন অভিযোগে দণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি।

এই উপলক্ষে, এই বিল যাহা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অস্তিত্বকে আঘাত করিতেছে তাহার প্রত্যাহার মিলিতভাবে দাবি করিবার জন্য, সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের যে সব প্রতিনিধি এখানে জমায়েত হইয়াছেন তাহাদের নিকট আকুল আবেদন জানাইতেছে। পুঁজিবাদীদের ক্রমাগত শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগ্রাম দমন করিবার জন্য সরকার প্রত্যেক পদ্ধতি ব্যবহার করিতেছে। এই অবস্থার গুরুত্ব শ্রমিকদের সকল সংগঠনের সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে হইবে।

শ্রমিকদের সংগ্রাম দমন করা এবং পুঁজিবাদীদের আক্রমণ চালাইয়া যাহাতে সাহায্য করা বর্তমান শাসন ব্যবস্থা তাহার সর্বপ্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করে। হাজার হাজার শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, শ্রমিক সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নের ভিতরই থাকুক অথবা হিন্দ মজদুর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করুক—কারণ শ্রমিকগণ যখন ইতিমধ্যেই অত্যন্ত অমানুষিক অবস্থার মধ্যে কষ্টে দিন কাটাইতেছিল এবং প্রকৃতপক্ষে অনশন এবং মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছিল যেই সময়ে শ্রমিকদের পিঠের উপর সংকটের বোঝা চাপাইবার মালিকের চেষ্টার বিরুদ্ধে তাহারা (শ্রমিকরা) লড়িয়াছে। কংগ্রেসী রাজত্ব তাহাদের একটি অধিকারও দেয় নাই। এই শাসনব্যবস্থা তাহাদের জীবনধারণের মত মজুরি, চাকুরির নিরাপত্তা অথবা কাজ করার অধিকার সুনিশ্চিত করে নাই। অথচ একই সময়ে, শ্রমিকদের শেষ সীমা পর্যন্ত শোষণ করিবার জন্য পুঁজিবাদীদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করিয়াছে।

দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত শ্রমিকগণকে অশ্রুতপূর্ব ফ্যাসিস্ট দমনব্যবস্থার সম্মুখীন হইয়া সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইতেছে। কিন্তু গভর্নমেন্ট এখন দুইটি বিল লইয়া আগাইয়া

আসিয়াছেন—এই দুইটি বিল হইল ট্রেড ইউনিয়ন বিল এবং শ্রম-সম্পর্ক বিল—এইগুলি খোলাখুলি ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। যাহার উদ্দেশ্য হইল সংগঠন করিবার এবং ধর্মঘট করিবার সমস্ত স্বাধীনতা ধ্বংস করা এবং এইভাবে শ্রমিকদিগকে কেনা গোলামে পরিণত করা।

পুঁজিবাদী এবং তাহার সরকারের আক্রমণের বিরুদ্ধে যে সব ট্রেড ইউনিয়ন সাহসের সহিত শ্রমিকদের সংগঠিত করে ও পরিচালিত করে, গভর্নমেন্ট ট্রেড ইউনিয়ন বিল এবং শ্রম-সম্পর্ক বিলের মারফত তাহাদের শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে। এই সব ট্রেড ইউনিয়ন বে-আইনি হইয়া পড়িবার বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে। প্রত্যেক ধর্মঘটকে বে-আইনি করার চেষ্টা হইতেছে, অথচ শ্রমিকদের জীবনধারণের মানের উপর আক্রমণ করিবার জন্য পুঁজিবাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে।

এই অবস্থায় আমরা শ্রমিকদের সংগঠনের সমস্ত প্রতিনিধিদের নিকট এবং তাহাদের মারফত শ্রমিকদের নিকট আবেদন করিতেছি যে তাহারা যেন বিলের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে দাঁড়ান এবং ইহার অবিলম্বে বিনাশর্তে প্রত্যাহার দাবি করেন। এই বিলগুলির ভিত্তিই এমনভাবে তৈয়ারি করা যে শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থে এইগুলির কোন সংশোধন করিবার সুযোগ নাই। এই দুইটি বিলকেই সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করিতে হইবে। তাহার বদলে সমস্ত শ্রমিকের জন্য সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক এবং ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার স্বীকার করিতে হইবে এবং তাহাকে নিশ্চিত করিতে হইবে এবং সমস্ত দমনব্যবস্থা প্রত্যাহার করিতে হইবে, যেমন সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস দাবি করিয়াছে।

আমরা সমস্ত শ্রমিককে আশ্বাস দিতেছি যে এই বিলের অবিলম্বে প্রত্যাহারের জন্য, শ্রমিকদের পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য, এবং সমস্ত দমন ব্যবস্থা রদ করিবার জন্য যাহারা লড়াই করিতে প্রস্তুত তাহাদের সঙ্গে সম্মিলিত ফ্রন্ট গড়িয়া তুলিতে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সব সময়েই প্রস্তুত থাকিবে।

কংগ্রেসী পুঁজিবাদী সরকার কর্তৃক উপস্থাপিত এই বিলগুলির অবিলম্বে প্রত্যাহার দাবি করিবার জন্য আমরা আবার শ্রমিকদের সমস্ত প্রতিনিধিদের নিকট আবেদন জানাইতেছি।

আগামী তে-ভাগার লড়াই সম্বন্ধে পি.ও.সি'র বক্তব্য প্রসঙ্গে

(বীরেন)

"আগামী তে-ভাগার লড়াই" সম্বন্ধ পি-ও-সি একটি সার্কুলার দিয়েছেন। সার্কুলারটিতে অনেক কথাই কিছু কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। গত দু'বারের মত তে-ভাগার আন্দোলনের কথা, গ্রামের শ্রেণি বিচার, আন্দোলনের রূপ, সংগঠন, সবই সার্কুলারে আছে। কিন্তু কোন বিষয়েই পরিষ্কার কোন আলোচনা নেই। যতটুকুও বা বলা হয়েছে, তা কোন বাস্তব অবস্থার আলোচনা বা সমালোচনার ভিত্তিতে করা হয়নি। সার্কুলারটিতে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার কোন বিশ্লেষণ নেই। কোন জিলার কি অবস্থা তাও পর্যন্ত বলা হয়নি। সমস্ত আলোচনাটাই বাস্তব ভিত্তি থেকে আলাদা করে নিতান্ত মানসিক কল্পনার ভিত্তিতে করা হয়েছে। ফলে কতকগুলি ভুল বিশ্লেষণ ও মারাত্মক বিচ্যুতি দেখা দিয়েছে।

গ্রামের শ্রেণি বিচার

প্রথমে গ্রামের শ্রেণি বিচারের কথা ধার যাক। আন্দোলনের বর্তমান পর্যায়ে, তে-ভাগা আন্দোলনে শত্রু কে এবং মিত্র কে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার কোন কথাই সার্কুলারে নেই।

বাংলার গ্রামে জমিকে ভিত্তি করে নিম্নলিখিত স্তর দেখতে পাওয়া যাবে : জমিদার, জোতদার, ধনি কৃষক, মাঝারী কৃষক, গরীব কৃষক ও ভাগচাষী এবং ক্ষেত মজুর। এদের ভিতর জমিদাররা যে প্রধান শত্রু সে বিষয়ে কোন মতভেদই নেই। কিন্তু জোতদার সম্বন্ধে সার্কুলারে স্তরভেদ করে বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে বিভিন্ন পন্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

প্রথমত বড় জোতদার। বড় জোতদারদের সকলকেই পি-ও-সি শত্রুদের ভিতর ফেলতে রাজি নন। "অধিকাংশ ক্ষেত্রে বড় জোতদাররা তে-ভাগার দাবি পূরণ করতে অস্বীকার করবে"। (১ পৃঃ) অর্থাৎ পি-ও-সি মনে করেন সবক্ষেত্রেই বড় জোতদাররা দাবি অস্বীকার করবে না। কোন কোন ক্ষেত্রে বড় জোতদাররা দাবি মানতে অস্বীকার করবে না। অর্থাৎ কোন কোন বড় জোতদার কৃষকের শত্রু নয়। কথাটা আরও পরিষ্কার করে ২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "তে-ভাগা আন্দোলন প্রধানত চালাতে হবে অপেক্ষাকৃত বড় জোতদারদের বিরুদ্ধে"। সুতরাং সব বড় জোতদারের বিরুদ্ধে নয়।

পি-ও-সি বাংলাদেশের কোন্ জেলায় এমন অবস্থা দেখেছেন যে বড় জোতদারদের একটা অংশ তে-ভাগার দাবি অতীতে মেনেছে বা বর্তমানে মানবার সম্ভাবনা আছে? সামন্ত শোষণের বড় পাণ্ডাই হচ্ছে জমিদার ও জোতদারেরা। সেই বড় জোতদারের ভিতরও মিত্র খুঁজবার চেষ্টা

করা মারাত্মক দক্ষিণ সংস্কারবাদ। এত বড় সংস্কারবাদী বিচ্যুতি অতীতের সংস্কারবাদী আমলেও বাংলার কৃষক আন্দোলনে কোনদিন দেখা যায় নি।

তারপর ছোট জোতদারের কথা। ছোট জোতদার সম্বন্ধে পি-ও-সি'র ধারণা খুবই ঘোলাটে। "এমন অনেক ছোট ছোট জোতদার আছে যাদের শুধু জোতদারির আয়ে সংসার চলে না, চাকরি বা ছোটখাট ব্যবসা ইত্যাদি করে সংসার খরচের অধিকাংশ রোজগার করতে হয়"। (২ পৃঃ)

কিন্তু এই স্তরটিকে আর জোতদার বলা যায় না। যাদের "খরচের অধিকাংশ রোজগার" চাকুরি বা ছোটখাটো ব্যবসা থেকে, তারা অর্থনৈতিক স্তরে প্রধানত সেই চাকুরি বা ব্যবসার সাথেই সংশ্লিষ্ট। প্রধানত জোতদার নয়। সুতরাং প্রধানত তাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসাবেই ধরতে হবে। এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসাবেই তারা গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের ভিতরের স্তর। কৃষকের মিত্র।

কিন্তু একথা স্পষ্ট মনে রাখা দরকার সামন্ত শোষণের ভিত্তি হচ্ছে জমিদারি ও জোতদারি প্রথা সুতরাং শ্রেণি হিসাবে জমিদার ও জোতদার (বড়-ছোট সব) সামন্ত শোষণের উপরই দাঁড়িয়ে আছে। কাজেই জমিদার ও জোতদার শ্রেণিই কৃষক সাধারণের শত্রু, মিত্র নয়।

কিন্তু ছোট জোতদাররা গ্রামে প্রধান শোষক নয়। তারা এমন শক্তিমানও নয় যে প্রতিক্রিয়ার পাণ্ডা হতে পারে। গত তে-ভাগা আন্দোলনগুলিতে দেখা গেছে, আন্দোলনের যখন পূর্ণ জোয়ার, গ্রামের কৃষক সাধারণ ঐক্যবদ্ধ, তখন ছোট জোতদাররা কৃষক সাধারণের জোর দেখে শত্রুর দলে খোলাখুলি ভিড়তে সাহস করে না। অবশ্য তাদের সহানুভূতি পুরোপুরিই থাকে বড় জোতদারের দিকে। প্রবল আন্দোলনের চাপে কোন কোন ছোট জোতদার তে-ভাগার দাবিতে আপসও করে থাকে। সুতরাং সেদিকে লক্ষ্য রাখা খুবই প্রয়োজন।

আবার ইহাও দেখা গেছে, আন্দোলনের ভাটা শুরু হলে, প্রতিক্রিয়া শুরু হলে, এরা সোজাসুজি শত্রুর দলে ভিড়ে যায় এবং পুলিশী হামলায় সরাসরি সমর্থন করে।

ছোট জোতদারদের সামাজিক মেলামেশা বড় জোতদারদের দিকেই, আচার-ব্যবহারও তাদেরই মত। এরা নিজেরা চাষ করে না। সুতরাং শ্রেণিসম্বন্ধটা বড় জোতদারদেরই সাথে।

এরা আন্দোলনের দিক থেকে কৃষকদের মিত্র নয়। গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের ভিতরকার শ্রেণি নয়।

অবশ্য একথা ঠিক জনতা ক্ষমতা দখল করবার পর এই ছোট জোতদারদের সম্বন্ধে ভিন্নভাবে বিচার করবে। সে সময় ছোট জোতদাররা অসহায়। নিজেরা এমন প্রবল ছিল না যে প্রতিক্রিয়ার পাণ্ডা হতে পারে। আগের পুলিশ ফৌজ নেই যে তাদের উপর ভরসা করবে। তাই জনতার ক্ষমতার কাছে তারা মাথা নোয়াবে। চীনের ইতিহাস সেই শিক্ষাই দেয়। তাই সংগ্রামের মাঝে ও ক্ষমতা দখলের পর ছোট জোতদারদের সম্বন্ধে একই ধরণের বিচার করা চলবে না।

যারা "নাবালক বা বিধবা বলে নিজেরা চাষ করতে পারে না" তাদের আর ছোট জোতদার বলা যায় না। যারা নিজেরা চাষ করে তারা জোতদার নয়, তারা কৃষক। যারা নিজেরা চাষ করে, অথচ কিছু জমি ভাগ চাষেও দেয় এবং সামান্য কিছু দিনমজুরও খাটায়, তারা জোতদার নয়, তারা ধনি কৃষক।

বর্তমানে ধনি কৃষক সম্বন্ধে প্রবল বিতর্ক দেখা দিয়েছে। অথচ সার্কুলার এই বিষয়টিই এড়িয়ে গেছে।

আগেকার পি.বি. ধনি কৃষককে শত্রু বলে গণ্য করেছে। বর্তমান পি.বি'র মতে, "যে সব ধনি কৃষক সামন্ত শোষণ চালায় তাদের ফ্রন্টের শত্রু বলে গণ্য করতে হবে"। (সি. সি. লেটার)

আগেই বলেছি বাংলাদেশের প্রায় সব ধনি কৃষকই কিছু না কিছু জমি ভাগ চাষে দেয় বা দিন মজুর খাটায়। সুতরাং বেশিরভাগ ধনি কৃষকই সামন্ত শোষণের (যৎকিঞ্চিৎ হলেও) সাথে জড়িত। তা হলে, পি.বি'র মতে বাংলাদেশে প্রায় সব ধনি কৃষককেই "শত্রু বলে গণ্য করতে হবে"।

১৯৪৬-৪৭ সালের তে-ভাগা আন্দোলনে দেখা গেছে, বহু ধনি কৃষক আন্দোলনের জোয়ারের দিনে অংশগ্রহণ করেছে। কেহ কেহ সক্রিয় অংশগ্রহণেও কুণ্ঠা করে নি। জেলভোগ করেছে এমন ধনি কৃষকও দেখা যাবে। কিন্তু সেই সাথে ইহাও দেখা গেছে আন্দোলনের প্রথম দিকে তারা নামতে চায়নি। আন্দোলন অগ্রসর হবার সময় নানা সন্দেহ-দ্বিধার সৃষ্টি করেছে। এবং ভাটার দিনে, প্রতিক্রিয়ার দিনে বেশিরভাগ ধনি কৃষকই আন্দোলন থেকে সরে পড়েছে, কেউ কেউ জোতদারের দলেও ভিড়েছে।

সুতরাং ধনি কৃষককে আন্দোলনে টানতে হবে। তারা শত্রু নয়, মিত্র। কিন্তু সুদৃঢ় মিত্র নয়। তারা দোলায়মান। ধনি কৃষকরা বুর্জোয়া প্রভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন। কংগ্রেস (বা লীগ) নেতারা তাদের দলে টানবার চেষ্টা করে। এবং এরা বিভ্রান্তও হয়। তাই রাজনীতিক দিক থেকে এদের দোলায়মানতা, বিভ্রান্তি প্রভৃতির বিরুদ্ধে লড়তে হবে।

মাঝারী কৃষকরা যে সুদৃঢ় মিত্র, সে কথা অবশ্য বলাইবাহুল্য।

আর একটি বিতর্কমূলক প্রশ্ন হচ্ছে ক্ষেতমজুর সম্বন্ধে। আগেকার পি.বি. মনে করতেন গ্রামাঞ্চলে ধনবাদী শোষণ প্রধান অংশগ্রহণ করেছে, সুতরাং তাঁরা ক্ষেতমজুরদের ধনবাদে শোষিত গ্রাম্য শ্রমিক বলে মনে করতেন। এবং ক্ষেতমজুর ধর্মঘটকে কৃষক আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ার মনে করতেন।

পি.ও.সি. সার্কুলারে বলা হয়েছে "প্রধানত যে সব শোষক ভাগ চাষী বা আধিয়ারদের শোষণ করে, প্রধানত তারাই ক্ষেতমজুরদেরও শোষণ করে"। কথাটা খুবই ঠিক। কিন্তু এই সঠিক কথার অর্থ পি.ও.সি. আদৌ বুঝতে পারেন নি। ক্ষেতমজুরদের প্রধান শোষক কে সে সম্বন্ধে কোন বিশ্লেষণ তারা করেন নি। সুতরাং শোষক কে, শোষণের ধরণটা কি তা আলোচনা না করার ফলে ক্ষেতমজুরদের দাবিটাও তাঁরা তুলে ধরতে পারেন নি এবং সংগ্রামের চেহারাটাও ঠিক বুঝতে পারেন নি। তাঁরা বলেছেন, "তে-ভাগা লড়াইয়ের সাথে সাথে ক্ষেতমজুরের মজুরি বৃদ্ধির জন্যও সংগ্রাম করতে হবে"।

ক্ষেতমজুরের মজুরি বৃদ্ধির জন্য সংগ্রাম নিশ্চয়ই করতে হবে। কিন্তু ক্ষেতমজুরের দাবি কি শুধু মজুরি বৃদ্ধি? প্রশ্নটা আরও গোড়ায় বিচার করতে হবে।

আমাদের দেশের ক্ষেতমজুর ধনবাদী খামারের গ্রাম্য শ্রমিক নয়। কোন কোন জায়গায় ধনবাদী খামার আছে সত্য, যেমন চিনি কলের সংলগ্ন আখের ক্ষেতে। কিন্তু তার সংখ্যা খুবই নগণ্য। রাজশাহী, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলের সামান্য অংশে।

ক্ষেতমজুর সংখ্যা বাংলায় অজস্র বেড়েছে সত্য কিন্তু তারা বেশিরভাগই বছরের বেশিরভাগ সময়েই বেকার। মাঝারী কৃষক ও গরীব কৃষকের পর্যায় থেকে একেবারে মজুরে পরিণত হয়েছে, বহু ভাগ চাষীও ক্ষেতমজুরি করে থাকে।

কিন্তু এই নিঃস্ব ক্ষেতমজুরের দল ধনবাদী খামার বা কারখানায় মজুরির কোন ব্যবস্থা করতে না পেরে, জোতদারের গোলামী করতে বাধ্য হয়। জোতদারের খামারে গোলামের মত খাটে, তার বাড়িতে চাকর-বাকরের কাজ করে। অভাবের দিনে ভাগ-চাষীর মতই জোতদারের মহাজনের কাছে বর্বর জুলুমকারী শর্তে কর্জা নেয়। জোতদার মহাজনের সামন্ত জুলুমই এদের উপর সবচাইতে বড় শোষণ। তাই সামন্ত শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে এরা অগ্রণী। অতীতের তে-ভাগা আন্দোলনের ইতিহাসেও তাই দেখা গেছে।

সুতরাং তে-ভাগা আন্দোলনের সময় এই দিকটিতে বিশেষ নজর রেখে ক্ষেতমজুরের দাবি তুলতে হবে এবং তাদের সংগ্রামকে তে-ভাগা আন্দোলনের সংগ্রামের সাথে এক খাতে নিয়ে আসতে হবে। শুধু "মজুরি বৃদ্ধির জন্য" সংগ্রাম করার কথা বললে ঐক্যের দিকটা বাদ পড়ে যাবে, ধনি কৃষক ও কোন কোন ক্ষেত্রে মাঝারী কৃষকের সাথে ক্ষেতমজুরের সংঘর্ষটাই বড় হয়ে উঠবে।

আন্দোলনের পটভূমি ও দৃষ্টি

"পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে ব্যাপক তে-ভাগা আন্দোলন শুরু করতে হবে", পি.ও.সি'র সার্কুলারে শুধু এই নির্দেশটুকুই দেওয়া হয়েছে। বাংলার বাস্তব অবস্থার কোন বিচার করা হয়নি। ফলে আন্দোলনের গতি ও পরিণতি সম্বন্ধে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সুবিধাবাদ ও চরম সংস্কারবাদ প্রকাশ পেয়েছে।

বাংলায় সংকট কত গভীর, কৃষক সাধারণ ও অন্যান্য শ্রেণির ভিতর তার কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, শত্রুপক্ষ কি অবস্থায় আছে পার্টি ও গণসংগঠনের অবস্থা কি, বিভিন্ন দলের অবস্থাটা কি—ইহার কিছুই আলোচনা করা পি.ও.সি. প্রয়োজন মনে করেন নি। অথচ "ব্যাপক তে-ভাগা আন্দোলন শুরু করার" নির্দেশ তাঁরা দিয়েছেন। বাস্তব অবস্থা বাদ দিয়ে নিজেদের মনমত আন্দোলনের হুকুমজারি সংস্কারবাদী যোশিবাদী আমলেও ছিল, আগেকার পি.বি. এবং পি.সি'র আমলেও ছিল। বর্তমান পি.ও.সি'ও সেই পথই ধরেছেন। যোশিবাদী আমলে বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ না করে আন্দোলনকে সংস্কারবাদের পথে টানা হয়েছে। পুরোনো পি.বি., পি.সি'র আমলে টানা হয়েছে বাম হঠকারী পথে। পি.ও.সি. কোন পথে যাচ্ছেন দেখা দরকার।

তে-ভাগা আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও দৃষ্টি (পারসপেকটিভ) সম্বন্ধে সার্কুলারের গোড়াতেই বলা হয়েছে। "সারা পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য সংকট আজ দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ আকারে দেখা দিয়েছে। অসংখ্য কৃষক এবং গরীব শ্রমিক ও মধ্যবিত্তকে উপবাসী থাকতে হচ্ছে। কৃষকদের মধ্যে অনাহারে মৃত্যুর সংবাদও পাওয়া যাচ্ছে। এই খাদ্য সংকটকে কিছু পরিমাণে লাঘব করা যায় লক্ষ লক্ষ ভাগচাষী বা আধিয়ারের তে-ভাগার দাবি আদায় করে"। তাই, "পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে ব্যাপক তে-ভাগা আন্দোলন শুরু করতে হবে"।

বাংলার বর্তমান অবস্থায় পি.ও.সি. শুধু দেখছেন, দুর্ভিক্ষ, উপবাস, অনাহারে মৃত্যু। এবং এই "খাদ্যসংকট কিছু পরিমাণে লাঘব" করার জন্যই তে-ভাগা।

কেন দুর্ভিক্ষ, উপবাস, অনাহারে মৃত্যু, কেন খাদ্যসংকট, সে কথা আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করেন নি পি.ও.সি.। তাই মানুষের দুঃখ দুর্দশা "লাঘব করা"ই হয়েছে তাঁদের উদ্দেশ্য। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিছক বুর্জোয়া লিবারেল দষ্টিভঙ্গি। গান্ধীবাদী মানবতার দৃষ্টিভঙ্গি। মানুষের দুঃখ লাঘব করতে হবে নিশ্চয়ই। খাদ্যসংকট দূর করতেই তো হবে। কিন্তু সে জন্য অর্থনীতিক-সামাজিক কারণটা স্পষ্ট করে দেখাতে হবে। এবং সেই ঔপনিবেশিক অর্থনীতিক-সামাজিক কাঠামোর গোড়ায় আঘাত করতে হবে। এবং সে কথাটা এড়িয়ে কোন আন্দোলনের চেষ্টা করা গান্ধীবাদী সংস্কারবাদকেই প্রশ্রয় দেওয়া। এই সামাজিক অর্থনীতিক কাঠামো বজায় রেখে আজকের দিনে "খাদ্যসংকট কিছু পরিমাণেও লাঘব" করা যায় না। তে-ভাগা আন্দোলন সেই কাঠামোর উপরই আঘাত হানবে। সে কথা খুব স্পষ্ট হওয়া দরকার। এবং সামন্ত কাঠামোতে আঘাত হানতে গেলে শত্রুপক্ষও মরিয়া হয়ে উঠবে প্রত্যাঘাত করবার জন্য। সুতরাং তে-ভাগা আন্দোলন দু'মুঠো ভাতের জন্য ভিক্ষার আন্দোলন নয়। এ আন্দোলন কৃষি বিপ্লবেরই একটি অংশ। এই কথা সুস্পষ্ট হওয়া দরকার। বাম হঠকারিতাকে লড়তে গিয়ে আন্দোলনকে সংস্কারবাদের পাঁকে টেনে নেওয়া চলবে না।

যোশির আমলেও আমরা অনেক কৃষক আন্দোলন করেছি। কৃষকদের কিছু পাইয়ে দেবার ভরসা দিয়েছি আমরা। এবং সেই ভরসা দিয়ে মিছিল অভিযান করেছি। লীগ মন্ত্রিত্বের আমলে আইন সভায় অভিযান ও কিঞ্চিৎ চাল বিতরণ—সেই আমলের আন্দোলনের পরিচয়। গ্রামেও অনুরূপ অবস্থাই দেখা গেছে। যখন অভিযানের ফলে একদানা ধানও জোটেনি, কৃষকরা বিক্ষুব্ধ হয়েছে। আমরা বলেছি আরও বড় মিছিল চাই, আরও জোর সমাবেশ চাই, তবেই ধান মিলবে। সামন্ত প্রথা চুরমার করার পথেই যে পেটের ভাত মিলবে, সুতরাং প্রবল সংগ্রাম ও আপাতঃ আত্মত্যাগের ভিতর দিয়েই যে অগ্রসর হতে হবে, সে কথা সন্তর্পণে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

তেমনি আবার হঠকারী আমলে কৃষকের দাবি উপেক্ষা করে, দাবির পিছনে ব্যাপক জনতাকে জমায়েত না করে শুধু সংগ্রামের কায়দাকেই—সশস্ত্র সংগ্রামকেই বড় করে দেখা হয়েছে। ফলে আন্দোলন কোণঠাসা হয়ে ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং এবার এ দুটো বিচ্যুতি থেকেই হুঁশিয়ার থাকতে হবে।

গত দু-দুটো তে-ভাগা আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, দু'বারই আন্দোলন অর্থনীতিবাদের সীমায় আবদ্ধ ছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালের তে-ভাগা আন্দোলন ব্যাপক প্রসারলাভ করেছিল, সংগ্রাম সংঘর্ষের রূপ নিয়েছিল, কৃষকরা অপূর্ব বীরত্ব দেখিয়েছিলেন, কিন্তু সংগ্রামকে অর্থনীতির স্তর থেকে রাজনীতির স্তরে তোলবার চেষ্টা হয়নি। অর্থাৎ তে-ভাগার আন্দোলনের ভিতর দিয়ে কৃষকরা যে সামন্ত ঔপনিবেশিক কাঠামো ও রাজশক্তির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের যে বিপুল অভিজ্ঞতা হচ্ছিল, তাকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক চেতনায় রূপান্তরিত করার চেষ্টা হয়নি। স্বাধীনতার আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে চেতনা জাগাবার চেষ্টা হয়নি। অর্থনীতিক দাবির গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্দোলনকে উচ্চতর স্তরে তোলবার চেষ্টা হয়নি। ফলে কৃষক সাধারণের চেতনাকে যেমন রাজনীতিক চেতনায় উঠিয়ে আনা হয়নি, তেমনি অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও গণতান্ত্রিক শ্রেণিগুলিকে আন্দোলনের পিছনে টানা হয়নি। এবং এই সংস্কারবাদী অর্থনীতিবাদী দৃষ্টি থাকার ফলে তে-

ভাগা আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও হয়নি (সে কথা পরে আলোচনা করছি।)

বাম হঠকারী আমলের তে-ভাগা আন্দোলনে সশস্ত্র সংঘর্ষের রূপ গ্রহণ করলেও তাকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সামন্ত বিরোধী স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের অংশ হিসাবে তুলবার চেষ্টা হয়নি। সে আন্দোলনও থেকে গেছে জঙ্গী অর্থনীতিবাদী আন্দোলন।

এবার পি.ও.সি. আন্দোলনের যে দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন তাও সেই অর্থনীতিবাদী সংস্কারবাদী আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি। এ কথা সত্য, সার্কুলারে "কৌশলে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে" এবং "শত্রুকে প্রতি আক্রমণ করতে বলা হয়েছে"। "কোন জায়গায় গেরিলা কায়দায় সশস্ত্র সংগ্রাম চালান উচিত কিনা" সে কথা ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতেও বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি অর্থনীতি সংস্কারবাদকে ছাপিয়ে উঠতে পারেনি।

৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "মোট কথা, তে-ভাগা ও মজুরি বৃদ্ধি আন্দোলনের ভিতর দিয়ে পার্টির কাজ হবে গ্রামের গরীবদের জন্য কিছু কিছু অর্থনীতিক সুবিধা আদায় করার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গণতন্ত্রী জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করা, গণতন্ত্রী ফ্রন্ট গঠনের কাজ শুরু, সাম্রাজ্য ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে পার্টি নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলের আন্দোলনকে আবার চাঙ্গা করে তোলা..."।

সুতরাং এবারকার তে-ভাগা আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে "কিছু কিছু অর্থনীতিক সুবিধা আদায় করা" এবং এইভাবে "খাদ্যসংকট কিছু পরিমাণে লাঘব করা"। এবং "সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে" আন্দোলনকে "আবার চাঙ্গা করা"। অর্থাৎ তে-ভাগা আন্দোলন "কিছু সুবিধা আদায়ের আন্দোলন"। এবং সেই সুবিধা আদায়ের ফলে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন "আবার চাঙ্গা" হবে। অর্থাৎ তে-ভাগা আন্দোলনকেই সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ বিরোধী আন্দোলনে পরিণত করার প্রশ্ন নয়। আগে তে-ভাগা পরে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ বিরোধী আন্দোলন। এই দৃষ্টিভঙ্গি, সেই পুরাণ যোশিবাদী আমলের সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরই নগ্নরূপ।

বর্তমানে সামন্ত ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সংকট যে কত গভীর সে বিষয়ে পি.ও.সি'র দৃষ্টি অন্ধ। আজ যে এই কাঠামোর ভিতরে থেকে আর "কিছু কিছু অর্থনীতিক সুবিধাও আদায়" করা যায় না, "খাদ্যসংকট কিছু পরিমাণেও লাঘব করা যায় না", সে কথা বাস্তব অবস্থা থেকেও পি.ও.সি. বুঝতে পারছেন না। অথচ জনতা কিন্তু ক্রমেই বেশি করে বুঝছে যে কংগ্রেসী রামরাজত্বে খাদ্যসংকট লাঘবের কোন আশা নেই।

আজকাল আর বছরে ৩/৪ মাস কৃষকের খাদ্যসংকট নয়, ফসল ওঠার পর থেকেই খাদ্যসংকট শুরু হয়। এ বছরের সংকট শুরু হয়েছে গত ফাল্গুন-চৈত্র থেকেই। সে সংকট প্রায় অব্যাহত গতিতে চলে আসছে। বর্তমানে, এই কার্তিক মাসে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় ৫০/৬০ টাকা চালের মণ। হাওড়া, নদীয়া, পশ্চিম দিনাজপুরে পর্যন্ত ৪০ টাকা মণ।

খাদ্যসংকট দূর হওয়া তো দূরের কথা কৃষকের ঘরে যে ধান ছিল তাও গভর্নমেণ্ট সীজ করে নিয়েছে। গরীব ও মাঝারী কৃষকের ঘরে ধান তো নেই-ই। ধনি কৃষকের ধান সীজ হওয়ায় তারও বিক্ষোভ বেড়েছে। অথচ জোতদারের গোলায় হাত পড়ছে না। সমস্ত কৃষক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সরকারি খাদ্য নীতির চেহারাটা কি। তারা দেখতে পাচ্ছে খাদ্যের দাবি

করলে বহরমপুরে মিলেছে লাঠি, টিয়ার গ্যাস ও জেল। মুখের গ্রাস ছেড়ে দিতে না চাইলে কুলপীতে গুলির মুখে কৃষককে প্রাণ দিতে হয়েছে। তাই কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, নদীয়া, বহরমপুর, পশ্চিম দিনাজপুরে বুভুক্ষু কৃষকদের বিক্ষোভ অভিযান শুরু হয়েছে।

শহরের মধ্যবিত্ত দেখছে খাদ্যসংকট দূর করা তো দূরের কথা, আধপেটা রেশনও কেটে নিয়ে প্রতি বেলায় এক ছটাক করে মুষ্টি ভিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। অথচ চোরাবাজারে চালের অভাব নেই। এবং সেই চাল ৫০ টাকা মণ।

আজ আর কেউ বিশ্বাস করে না এই সরকারের আমলে, এই কাঠামোতে "খাদ্যসংকট কিছু পরিমাণে লাঘব করা" যাবে বা "কিছু কিছু অর্থনীতিক সুবিধা আদায় করা" যাবে।

এমনি করেই আজ কৃষকদের সামান্য দাবির আন্দোলনকেও (তে-ভাগার তো কথাই নেই), বর্তমান সরকার ও সামন্ত-ঔপনিবেশিক কাঠামোর বিরুদ্ধে এনে দাঁড় করিয়েছে। কৃষকদের প্রতিটি দাবির আন্দোলন আজ কৃষি বিপ্লবের অংশ হয়ে উঠেছে।

গত ৮/৯ মাসের খাদ্যসংকট, অর্ধাহার, অনাহার ও মৃত্যু কৃষক জনতাকে মরিয়া করে তুলছে। বুবুক্ষু কৃষকের চোখ জ্বলে উঠছে আমনের পাকা ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে। এই ধানের কতখানি সে পাবে নিজের ক্ষুধা মেটাবার জন্য, আজ আশু প্রশ্ন এইটাই সমস্ত কৃষকের সামনে। তেমনি অন্যদিকে জোতদার মহাজনেরও লোলুপ দৃষ্টি এই ধানের দিকে, কতখানি সে লুঠ করে নিতে পারবে। ধানকে উপলক্ষ্য করে উভয় পক্ষ তার মিত্র নিয়ে মাঠে এসে দাঁড়াবে। এটাই হল তে-ভাগা আন্দোলনের পটভূমি।

অতীতের শিক্ষা ও সংগ্রামের রূপ

চার বছর আগে এমনিভাবেই তে-ভাগার দাবিতে কৃষকরা ময়দানে এসে দাঁড়িয়েছিল। দু'বছর আগেও তারা আবার এসে দাঁড়িয়েছে।

আজকের দিনে আবার তে-ভাগা আন্দোলন শুরু করতে হলে কৃষকরা সমস্ত প্রশ্নই বাজিয়ে দেখবে অতীতের দু'বারের অভিজ্ঞতা দিয়ে। সেটাই তাদের সবচেয়ে বড় চেতনা। সেই অভিজ্ঞতা দিয়ে কর্মীরাও শিখবে, নতুন পথে অগ্রসর হবার দিশা পাবে।

অথচ পি.ও.সি'র সার্কুলারে সেই অতীত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। কিন্তু তা থেকে কি শিক্ষা গ্রহণ করা গেছে তার কোন বিশ্লেষণ করা হয়নি। শুধু সংস্কারবাদী বা হঠকারী বলে সাধারণ কথা বলেই শেষ করা হয়েছে। পি.ও.সি. অবশ্য ৫টি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, যার উপর "বিশেষ খেয়াল" রাখবার কথা বলা হয়েছে। তা হচ্ছে (২ পৃঃ) : (১) কৃষক সাধারণের ব্যাপক ঐক্য ও অকৃষক গণতন্ত্রী জনতার সাথে ব্যাপক ঐক্য, (২) জনতার ব্যাপক যোগদান, (৩) জনতার অগ্রগামী অংশ উদ্যোগ নেবে কিন্তু জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে না এবং বাকি দুটি হচ্ছে গেরিলা কৌশল সম্বন্ধে।

অর্থাৎ মোটা কথায় বলা যায়, কৃষক ঐক্য, কৃষকের সাথে অকৃষক গণতন্ত্রী জনতার ঐক্য এবং গেরিলা কৌশল—এই হল অতীতের তে-ভাগা আন্দোলনের মূল্যবান অভিজ্ঞতা থেকে পি.ও.সি'র "বিশেষ খেয়াল" রাখবার মত শিক্ষা। কৃষক ঐক্য এবং অকৃষক গণতন্ত্রী জনতার সাথে কৃষকের ঐক্যের উপর জোর দিয়ে পি.ও.সি. ঠিকই করেছেন। কিন্তু মনে হয় পি.ও.সি. বিষয়টি যান্ত্রিকভাবে দেখেছেন। অতীতের অভিজ্ঞতায় পটভূমিতে না দেখার ফলে বর্তমানের

কর্তব্য কি, সে বিষয়টা আর সার্কুলারে খুঁজে পাওয়া যায় না। সবকিছুই করতে হবে। কৃষক ঐক্য, গণতান্ত্রিক ঐক্য, পার্টি, গণসংগঠন, "যেমন যেমন সংগ্রাম অগ্রসর হতে থাকবে, তেমনি তাকে উচ্চতর স্তরে তোলা", "গেরিলা কায়দায় সশস্ত্র সংগ্রাম"—সবকিছুই করতে হবে। এটাই হল সার্কুলারের কথা। এই সার্কুলারটি স্মরণ করিয়ে দেয় ভূতপূর্ব পি.সি'র ২৬শে জানুয়ারির সার্কুলারের কথা। থানা আক্রমণ, লাইন তোলা, সাধারণ ধর্মঘট থেকে, গেট মিটিং পর্যন্ত সবকিছুই ছিল তাতে। অবশ্য প্রধান সুর ছিল আক্রমণ আর শুধু আক্রমণ। বর্তমান পি.ও.সি. সার্কুলারে অবশ্য প্রধান সুর "কিছু অর্থনীতিক সুবিধা আদায় করা"। এই হচ্ছে তফাৎ। আজকের দিনের প্রধান সমস্যা কি, কর্তব্যই বা কি, সে কথা সুস্পষ্ট বেব হয়ে আসেনি সার্কুলারে।

অতীতের তে-ভাগা আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে কি দেখা গেছে? ১৯৪৬-৪৭ সালের আন্দোলনের বিশেষত্ব ছিল ঃ

—গ্রামাঞ্চলের সমস্ত কৃষক (ধনি কৃষকসহ) ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল তে-ভাগার পিছনে।

—আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি।

—পার্টি ইউনিট ও কর্মীরা আন্দোলনে নেতৃত্ব করেছিল সত্য, কিন্তু শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পার্টি শ্রমিক শ্রেণিকে কৃষকের দাবি সম্বন্ধে সচেতন করেনি। দাবির পিছনে শ্রমিক সভা, মিছিল, ফাণ্ড তোলা, গ্রামে শ্রমিক ডেলিগেশন পাঠানো, শ্রমিক কর্মী পাঠানো এবং শ্রমিক ধর্মঘট, কিছুরই চেষ্টা করা হয়নি।

—গ্রামের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলেও, শহরের ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, কর্মচারী, মধ্যবিত্ত জনতাকে দাবির সমর্থনে টানবার চেষ্টা হয়নি।

—ব্যাপক কৃষক সমিতি গড়ে ওঠেনি।

—সমস্ত আন্দোলনকে অর্থনীতিক গণ্ডীর ভিতরই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

—সমগ্র কৃষক জনতা সংঘর্ষে নামা সত্বেও সংগ্রামকে উচ্চতর স্তরে তোলার চেষ্টা না করে সংগ্রাম ত্যাগ করে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে।

১৯৪৮-৪৯-৫০ সালের আন্দোলনের বিশেষত্ব হল ঃ

—সমস্ত কৃষকের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না করেই সংগ্রামে নামা হয়েছে।

—শেষ দিকে ধনি কৃষককে শত্রুর দলে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

—শ্রমিক নেতৃত্ব এবারও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়নি।

—অন্যান্য গণতান্ত্রিক শ্রেণিরও সমর্থন পাবার চেষ্টা হয়নি।

—প্রথমে তে-ভাগার দাবি থাকলেও, পরে সে দাবির বদলে "দালালকে হালাল করা"ই বড় হয়ে উঠেছে। জনতাকে বাদ দিয়ে, দাবি বাদ দিয়ে, শুধু সশস্ত্র সংগ্রামটাকেই বড় করে দেখা হয়েছে। এবং সে সংগ্রাম গেরিলা কায়দায় চালানো হয়নি।

—কৃষক সমিতি গড়ে তোলা হয়নি।

—তে-ভাগাকেই ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম মনে করা হয়েছে অথচ ক্ষমতা দখলের জন্য যে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ বিরোধী চেতনার স্তরে কৃষকদের তুলে নিয়ে আসা এবং সেইদিকে লক্ষ্য রেখে সর্ব শ্রেণির ব্যাপক স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তোলা—সে চেষ্টা হয়নি। ফলে এবারের আন্দোলনও অর্থনীতিক গণ্ডীতেই থেকে গেছে। অবশ্য জঙ্গী অর্থনীতিবাদ বলা যেতে পারে।

সুতরাং অতীতের মোট শিক্ষা হল ঃ

—সমস্ত কৃষককে (ধনি কৃষকসহ) তে-ভাগার পিছনে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

—শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

—গ্রাম ও শহরের গণতান্ত্রিক জনতার ও পার্টির ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে তে-ভাগার পিছনে।

—পার্টি সংগঠন ও গণ সংগঠন জোরদার করতে হবে।

—আন্দোলনকে অর্থনীতির গণ্ডী পার করে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ বিরোধী স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের অংশ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

এটাই হল আন্দোলনের সামনে কর্তব্য। সংগ্রামের রূপ সম্বন্ধে আলোচনা করছি পরে।

পি.ও.সি. সার্কুলারে একটা বড় শিক্ষাই গ্রহণ করা হয়নি। তা হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কথা। আগেকার ট্রটস্কীবাদী আমলে যেমন শ্রমিক শ্রেণির নামে গালভরা বুলি কপচিয়ে আসলে শ্রমিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাও হয়নি, জনতাকেও টানা হয়নি। এবার আবার পি.ও.সি. ট্রটস্কীবাদকে লড়বার নামে শ্রমিক নেতৃত্বই বিসর্জন দিতে চাচ্ছেন।

দ্বিতীয়ত যেহেতু সমস্ত আন্দোলনকে অর্থনীতিক-সংস্কারবাদী দৃষ্টি দিয়ে দেখা হয়েছে। ফলে আন্দোলনকে শুধু গ্রামাঞ্চলের আন্দোলন বলেই মনে করা হয়েছে, শহরের ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনতাকে টানবার কথা তোলা হয়নি।

"গ্রাম এলাকার বাকি সমস্ত কৃষক ও অকৃষক জনতাকে" (১ পৃঃ), "গ্রামাঞ্চলের কৃষক ও অকৃষক ব্যাপক গণতন্ত্রী জনতাকে", "তে-ভাগার দাবির সমর্থনে" (৩ পৃঃ) টানবার কথাই শুধু বলা হয়েছে।

পার্টির ভিতর আজ প্রবল বিতর্ক উঠেছে আন্দোলনের রূপ নিয়ে। কেউ বলছেন সশস্ত্র সংগ্রাম সুদূরের প্রশ্ন (পারসপেকটিভ)। কেউ বলছেন সশস্ত্র সংগ্রামের ভিতর দিয়েই যুক্তফ্রন্ট—মোহমুক্তি সবকিছু হবে। ৩য় পার্টি কংগ্রেস সার্কুলারে বর্তমান পি.বি. বলেছেন, "যুক্ত গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, তথা সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য যুক্ত গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়া যায় না, যদিনা পার্টি তার স্বতন্ত্র শক্তি নিয়ে কার্যত সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠিত ও পরিচালিত করে"। পি.বি. আরও বলেছেন, "সশস্ত্র প্রতিরোধ করেই পার্টি আত্মরক্ষা করতে পারে, অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে এবং পার্টি ও তার গণভিত্তি বাড়াতে পারে"। অর্থাৎ পি.বি'র মতে বাংলার তে-ভাগা আন্দোলন শুরু করতে হবে সশস্ত্র সংগ্রাম দিয়ে। তবেই গড়ে উঠবে পার্টি, গণ সংগঠন ও যুক্তফ্রন্ট।

প্রথমেই একটা কথা স্পষ্ট হওয়া দরকার। আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও রূপকে একসাথে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। আন্দোলনের উদ্দেশ্য তে-ভাগা। ঔপনিবেশিক সামন্তবাদী কাঠামোকে আঘাত করা। সশস্ত্র সংগ্রাম বা অন্য কিছু, আন্দোলনের উদ্দেশ্য নয়, সেটি আন্দোলন চলাবার কায়দা। ট্রটস্কীবাদী আমলে আন্দোলনের উদ্দেশ্য বাদ দিয়ে কায়দাটাকেই বড় করে দেখা হয়েছে। পি.বি. সেই ভুলেরই জের টানছেন। আন্দোলনের উদ্দেশ্য হিসাবে তে-ভাগার দাবিকে সমস্ত কৃষক জনতার দাবি করে তোলা ও সেই দাবির সমর্থনে গ্রাম ও শহরের সমস্ত গণতন্ত্রী জনতার সমর্থন, শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্ব। সমস্ত গণতন্ত্রী দলের যুক্তফ্রন্ট, পার্টি ও গণ সংগঠন—এটাই হচ্ছে কর্তব্য। ট্রটস্কীবাদী আমলের জের নিঃশেষ করতে হবে এই

উদ্দেশ্যগুলি সম্বন্ধে কড়া নজর দিয়ে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আন্দোলনের কায়দা বা রূপের কথা ভাবতে হবে।

আন্দোলনের কায়দা বিচার করতে হবে দুটো দিক থেকে। প্রথমত ঐতিহাসিক দিক থেকে, দ্বিতীয়ত জনতা কোন্ পথ নিতে যাচ্ছে সেই দিক থেকে। প্রথমেই বলেছি সংকট আজ এত গভীর যে বর্তমান সরকারের পক্ষে সামান্য দাবি মেটানও সম্ভব নয়। যে আন্দোলন আজ ঔপনিবেশিক সামন্ত কাঠামোকে আঘাত করবে সে আন্দোলন দমনে সরকার ও শত্রুপক্ষ সমস্ত শক্তি নিয়ে নেমে পড়বে ময়দানে। অতীতের দু-দুটো তে-ভাগার আন্দোলনের অভিজ্ঞতাও সেই কথা বলে। দ্বিতীয়ত একথা সত্যি আজও বুর্জোয়া প্রভাব থেকে জনতার পরিপূর্ণ মোহমুক্তি ঘটেনি। কিন্তু সে মোহ অতি দ্রুতবেগে কেটে যাচ্ছে। জনতা আন্দোলনে নেমে পড়ছে। মিছিল, অভিযান প্রভৃতি শুরু হয়েছে। শুধু বুর্জোযা সংস্কারবাদী কায়দাই নয়, সংঘর্ষেব মাঝেও জনতা নামতে শুরু করেছে। এটাই হচ্ছে অবস্থার নতুনত্ব ও বিশেষত্ব। সুতরাং তে-ভাগা আন্দোলনে যে সংঘর্ষ অনিবার্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। শান্তিপূর্ণ তে-ভাগা আন্দোলনের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

তখনি প্রশ্ন উঠবে, বর্তমানে পার্টি ও গণ সংগঠনের অবস্থা নিতান্তই কাহিল। পার্টি সংগঠন শিথিল, রাজনৈতিক ঐক্য নেই, চূড়ান্ত বিভ্রান্তি। তেমনি গণ সংগঠন, কৃষক সভার অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। এই অবস্থায় কি সশস্ত্র সংগ্রাম বা সংঘর্ষের কথা বলা ট্রটস্কীবাদী হঠকারিতা নয়? ঠিক। আন্দোলনের উদ্দেশ্য বাদ দিয়ে সংঘর্ষ বা সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলা ট্রটস্কীবাদী হঠকারিতা। কিন্তু প্রশ্ন তা নয়। প্রশ্নটা শুধু সংগ্রামের কায়দায় নয়, প্রশ্নটা আন্দোলন সম্বন্ধেই। আজ দেখতে হবে পার্টি ও গণ সংগঠনের যে অবস্থা তা নিয়ে তে-ভাগা আন্দোলনে নামা সম্ভব কিনা। একথা ঠিক বাংলার কয়েকটি জেলায় (মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা প্রভৃতি স্থানে) গতবারের তে-ভাগা আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ ঘাঁটিগুলিতে প্রবল দমননীতি চলছে, সশস্ত্র পুলিশের ঘাঁটি বসেছে এবং পার্টি সংগঠন ও গণ সংগঠন খুবই দুর্বল। জনতা আপাতত কোন ভরসা পাচ্ছে না।

কিন্তু এটাই বাংলার একমাত্র চিত্র নয়। সেই সাথে এটাও দেখতে হবে বিভিন্ন জেলায় জনতা নানাভাবে বিক্ষোভ প্রকাশ করছে, খাদ্য আন্দোলন করছে। আর একটি অনুকূল অবস্থা হচ্ছে বামপন্থী দলগুলি এবার খাদ্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছে এবং যুক্তফ্রন্টের একটা সম্ভাবনাও গড়ে উঠছে।

একথা ঠিক আমাদের পার্টি দুর্বল, ঐক্যবদ্ধ নয়। কিন্তু পার্টিকে সামান্য ঐক্যবদ্ধ করতে পারলেও তে-ভাগা আন্দোলন পরিচালনা করা সম্ভব। ঐক্য ও ব্যাপকতার দিক থেকে এবারকার আন্দোলনের সম্ভাবনা আগের চেয়ে অনেক বেশি।

সুতরাং সবচাইতে প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে তে-ভাগার দাবিতে জেলার পার্টি ইউনিটগুলিকে যথাসম্ভব ঐক্যবদ্ধ করা। পার্টির সমগ্র রাজনীতি, কর্মপন্থা, রণনীতি ও কৌশল ঠিক না হওয়া পর্যন্ত কোন আন্দোলন করা যাবে না মনে করা জনতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। প্রতিটি সমস্যা, প্রতিটি আন্দোলনের ভিতর দিয়েই আমাদের ঐক্যবদ্ধ হবার চেষ্টা করতে হবে। আলোচনা ও আন্দোলন, এই দুইয়ের ভিতর দিয়েই সঠিক পার্টি নীতি নির্ধারিত হবে।

একথা ঠিক যেখানে প্রবল দমননীতি এখনও বর্তমান, অথচ জনতা ভরসা পাচ্ছে না,

সেখানে প্রথমেই তে-ভাগা আন্দোলন শুরু করা যাবে না। সেখানে শুরু করতে হবে অন্যভাবে। ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনই হবে সেখানকার আশু কাজ। সেই আন্দোলনের পিছনে সারা বাংলার জনমত গড়ে তুলতে হবে। ঐসব এলাকায় কলকাতা থেকে বিভিন্ন দলের, সাংবাদিকের ডেলিগেশন পাঠাতে হবে। এমনি নানাভাবে সাড়া তুলতে হবে।

মোট কথা তে-ভাগা আন্দোলন শুরু করা সম্ভব। এবং পি.ও.সি. তে-ভাগা আন্দোলনকে সামনে তুলে ধরে ঠিকই করেছেন।

কিন্তু সেই সাথে একথাও খুব পরিষ্কার মনে রাখতে হবে তে-ভাগা আন্দোলনে সংঘর্ষ অনিবার্য। সরকার প্রচণ্ড দমননীতি চালাবে। বেয়নেটকে তারা ময়দানে নামাবে।

কিন্তু বেয়নেটেই সরকারের একমাত্র ভরসা নয়। সমগ্র আন্দোলনে বিভ্রান্তি ও বিভেদ সৃষ্টির অন্য পন্থাও তারা গ্রহণ করবে। সেদিন বালুরঘাটে একজন খ্যাতনামা কংগ্রেসী নেতা কৃষকদের নিয়ে ধানের দাবিতে অনশন সত্যাগ্রহ করেছিলেন। বিপ্লবের পথ থেকে কৃষকদের সরিয়ে গান্ধীবাদী পথে চালিত করবার এমনি নানা পথই তারা নেবে। কোন কোন বামপন্থী দলের নেতারাও আন্দোলনকে সংস্কারবাদী পথ থেকে বিপ্লবী পথে নিয়ে যেতে চাইবেন না। এমনিভাবে সংস্কারবাদী মোহ আন্দোলনের গতিরোধ করতে চাইবে।

সুতরাং আন্দোলনের পথ সম্বন্ধে কোন সংস্কারবাদী মোহ রাখা চলবে না, সংঘর্ষ যে অনিবার্য, সে কথা যেমন কর্মীদের বুঝতে হবে, তেমনি জনতাকেও বোঝাতে হবে শান্তিপূর্ণ পথে দাবি আদায় করা যাবে না। আন্দোলনের প্রতি পদক্ষেপে জনতা নিজ অভিজ্ঞতা দিয়ে সে কথা বুঝবে। সেই সাথে তার চেতনাকে তুলতে হবে রাজনীতির স্তরে।

কিন্তু সংঘর্ষ অনিবার্য, এই কথাটা শুধু কর্মীরা বুঝলেই চলবে না এবং জনতাকে বোঝাবার জন্য শুধু প্রচার করলেই চলবে না। তার জন্য সাংগঠনিক প্রস্তুতিও করতে হবে।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে সংঘর্ষ বা সশস্ত্র সংগ্রাম আজই আন্দোলনের প্রধান রূপ হয়ে ওঠেনি (অবশ্য পি.বি. মনে করেন হয়েছে)। সুতরাং সংঘর্ষই প্রধান কথা নয়। প্রথমদিকে আন্দোলন নানা আকারই নেবে। কিন্তু তে-ভাগা আন্দোলন যত ব্যাপক হবে, যত প্রসারতা লাভ করবে, সরকার যতই বেয়নেটকেই প্রধান অবলম্বন করে তুলবে, আন্দোলন ততই প্রধানত সংঘর্ষ ও সশস্ত্র প্রতিরোধের রূপ নেবে। সেটা শুধু সুদূরের প্রশ্ন নয় (পারসপেকটিভ নয়)।

আর একটি কথা। বর্তমান বিপ্লবী পরিস্থিতিতে সরকার ভীত সন্ত্রস্ত। তাই তারা সমগ্র বিপ্লবী জনতার দৃষ্টি সরিয়ে নেবার জন্য নির্বাচনের চাল চেলেছে। তে-ভাগা আন্দোলনের সময় নির্বাচনী প্রচার একটা বড় ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে। কংগ্রেসী নেতারা আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড় করাবে নির্বাচনকে। কোন কোন বামপন্থী নেতৃত্ব আন্দোলনকে শুধু নির্বাচনের জন্যই ব্যবহার করতে চাইবে এবং পিছু টানবে। পার্টির ভিতর এই নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দেবে। ট্রটস্কীবাদী দৃষ্টি নিয়ে কেউ কেউ কংগ্রেসীদের মতই (অবশ্য উল্টোদিক থেকে) নির্বাচনের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে চাইবে আন্দোলনকে। আমাদের কাজ হবে নির্বাচনের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে আন্দোলনকে ব্যাপকতর করে তোলা।

পি.ও.সি. সার্কুলারে এই বিষয়টি একেবারেই আলোচিত হয়নি। অথচ আজ আর নির্বাক থাকার সময় নেই।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। যুদ্ধ আজ আর কোরিয়াতেই নয়।

মার্কিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তিব্বতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘাঁটি করছে নেপালে, যুক্তপ্রদেশে, সিকিম, ভূটান, দার্জিলিং, আসামে। শান্তি আন্দোলনকে শুধু শহরেই নয়, গ্রামেও ব্যাপকতম করে তুলতে হবে। তে-ভাগা আন্দোলনের সাথেই চালাতে হবে প্রবল শান্তি আন্দোলন। শান্তি আন্দোলন তে-ভাগা আন্দোলনকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করবে, আন্দোলনকে রাজনীতিক স্তরে টেনে তুলতে সাহায্য করবে।

এ বিষয়টিও সার্কুলারে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন ছিল। আমার শেষ কথা হচ্ছে, পি.ও.সি'র সার্কুলারটি বিচ্যুতিপূর্ণ ও নিতান্তই অসন্তোষজনক। সুতরাং নতুন করে আর একটি সার্কুলার দেওয়া প্রয়োজন।

তার আগে, বিভিন্ন জিলা থেকে তে-ভাগা আন্দোলন সম্বন্ধে জিলা কমিটির মতামতপূর্ণ রিপোর্ট গ্রহণ করতে হবে, এবং সমস্ত জিলার সম্ভব না হলেও কয়েকটি বড় জিলার বিশিষ্ট কর্মীদের নিয়ে (যত অল্প কর্মী নিয়েই হোক না কেন) একটি তে-ভাগা বৈঠক ডেকে প্রাথমিক আলোচনা করতে হবে।

এই আলোচনার ভিত্তিতেই একটি নতুন তে-ভাগা সার্কুলার বের করতে হবে।

৩০শে নভেম্বর, ১৯৫০ — সওয়াল-জবাব

টিকা ·(১) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিব পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি, 'সওয়াল-জবাব' নামে একটি পত্রিকা বের করত, যাতে থাকত বিভিন্ন বিষয়েব ওপর বিতর্কমূলক মতামত। এমনি একটি লেখা হল বর্তমান এই প্রবন্ধ। এটি পি-ও-সি পার্টি সভ্যদের মধ্যে আলোচনার জন্য 'সওয়াল-জবাব' পত্রিকায় ছাপিয়ে ছিল।

(২) এই প্রবন্ধের লেখক 'বীরেন' একটি ছদ্মনাম। আসল নামটি সঠিকভাবে বলা না গেলেও, একটা সূত্র এ বিষয়ে চিন্তার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে।

ভবানী সেন মার্ক্সীয় সাহিত্য-বিতর্ক ক্ষেত্রে দুটি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন। একটা হল রবীন্দ্র গুপ্ত। ভবানী সেন বে-আইনি যুগে 'রবি' হিসাবে পবিচিত ছিলেন। দ্বিতীয়টি হল বীরেন পাল। রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে লিখেছিলেন—'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা'। আর বীরেন পাল ছদ্মনামে লিখেছিলেন—'বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা'। প্রশ্ন হল—বর্তমান প্রবন্ধের লেখক বীরেন কী সেই বীরেন পাল অর্থাৎ ভবানী সেন? বর্তমান প্রবন্ধটির শিরোনাম হল 'আগামী তে-ভাগার লড়াই'। আর ভবানী সেন ছিলেন এই বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ। (—সম্পাদক)

সহায়ক তথ্য - ৪

শান্তি আন্দোলনের নূতন পর্যায়

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিঃ
[illegible], বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম মুদ্রণ
এপ্রিল, ১৯৫১

দাম : আট আনা

সুরেন দত্ত কর্তৃক ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিঃ, ১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক শ্রী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা—৯ হইতে মুদ্রিত।

(ক) বিশ্ব শান্তি সংগ্রামের জঙ্গী কর্মসূচি

১৬ই থেকে ২২শে নভেম্বর ওয়ারস নগরীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বিশ্বশান্তি কংগ্রেস একটি বিরাট ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, ইহা বিশ্বশান্তি আন্দোলনের রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও নৈতিক সাফল্যের একটি নিদর্শন। শান্তি আন্দোলনের সম্ভাবনা, তার সংগঠন, শান্তি সংগ্রামে তার কর্মসূচির স্বচ্ছতা, এই আন্দোলনের লক্ষ্যের সাথে সমগ্র জনসাধারণের মহান স্বার্থের সংযোগ সবকিছুই প্রকাশিত হয়েছে শান্তি কংগ্রেসের পূর্বাহ্নে এবং সাতদিনব্যাপী কংগ্রেসের কার্যক্রমের মধ্যে। দ্বিতীয় বিশ্বশান্তি কংগ্রেস শান্তিকামী জনগণের মহান আশাকে রূপ দিয়েছে এবং যোগ্যভাবে তার দায়িত্ব পালন করেছে। ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে শান্তি সংগ্রামের কর্মসূচি প্রসারিত এবং সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে, এবং শান্তিরক্ষার সংগ্রামে নতুন প্রকার ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বশান্তি কংগ্রেসে শান্তি আন্দোলনের অভূতপূর্ব গণ প্রকৃতি প্রকাশিত হয়েছে। পাঁচটি মহাদেশের মধ্যে ৮০টিরও বেশি দেশ থেকে দ্বি-সহস্রাধিক প্রতিনিধি ওয়ারসতে মিলিত হয়েছিলেন। কংগ্রেস সমগ্র শান্তি যোদ্ধাদের এক সত্যিকারের দুনিয়াব্যাপী সমাবেশে পরিণত হয়েছিল। পরিণত হয়েছিল তা "জনসাধারণের এক ব্যাপক আন্তর্জাতিক মন্ত্রণা সমাবেশে" (জোলিও কুরী)।

শান্তি কংগ্রেসে খুব স্পষ্টত প্রমাণ হয়ে গেছে যে, যাঁরাই মানব সমাজকে একটা নতুন যুদ্ধের আতঙ্ক থেকে রক্ষা করার লক্ষ্য বরণ করেছেন, নানাবিধ সামাজিক স্তরের সেই লক্ষ কোটি সাধারণ মানুষ, সর্বপ্রকার ধর্ম ও মতাদর্শগত মনোভাবাপন্ন মানুষ শান্তি আন্দোলনের মধ্যে একত্র হয়েছেন। বেলজিয়ামের একজন খনি শ্রমিক আর একজন ফরাসী ক্যাথলিক পুরোহিত, আন্তর্জাতিক আইনের একজন অস্ট্রীয় অধ্যাপক আর বুলগেরিয়ার এক তন্তুবায়, একজন চীনা কমিউনিস্ট আর ব্রিটেনের একজন রক্ষণশীল ব্যক্তি, মেক্সিকোর একডন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা আর একজন সুইডেনবাসী ধর্মযাজক—সবাই শান্তির সমর্থনে মিলিত হয়ে এক প্রবল উদাত্ত আওয়াজ তুলেছেন, ক্রোধভরে উন্মত্ত সাম্রাজ্যবাদী সমর-লিপ্সুদের, নতুন যুদ্ধের সংগঠকদের তাঁরা সকলে অভিশপ্ত করেছেন। নিজ নিজ ধর্ম ও রাজনৈতিক বিশ্বাস পরিত্যাগ না করেও মানব জাতির হৃদপিণ্ডের লক্ষ্য থেকে হত্যাকারীর বন্দুক সরিয়ে দেবার সাধারাণ প্রচেষ্টায় তাঁরা একযোগে নিজেদের হাত প্রসারিত করে দিয়েছেন।

দুনিয়াব্যাপী শান্তি আন্দোলনের চমৎকার সংগঠনের উজ্জ্বল রূপ প্রতিফলিত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বশান্তি কংগ্রেসে। উদাহরণ হিসাবে, এইটুকু উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে যে বর্তমানে ৭৫টি দেশে জাতীয় শান্তি কমিটি এবং কাউন্সিল রয়েছে; প্রায় সব দেশেরই শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে, কলকারখানায় এবং অফিসে ১৫০,০০০-এরও বেশি শান্তি কমিটি কাজ করছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপক জনসাধারণের সাথে এই গভীর সাংগঠনিক যোগাযোগই বিশ্ব শান্ত আন্দোলনের নমনীয় ও জঙ্গী কার্যকলাপের উৎস—যার ফলে শান্তি আন্দোলন যে ব্রিটিশ লেবার পার্টির শাসক শ্রেণি তাদের ওয়াশিংটনের মুরুব্বিদের হুকুমে শান্তি কংগ্রেসের অনুষ্ঠান ব্যর্থ করে দিতে চেয়েছিল, তাদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র অকেজো করে দিতে পেরেছে।

পিয়েত্রো নেনি তাঁর রিপোর্টের উপসংহারে ঠিকই ঘোষণা করেছেন যে "খুব সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট রূপেই আমরা ষষ্ঠ বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়েছি, আমরা এই শক্তি শান্তির সেবায় প্রয়োগ করছি, এই শক্তিই সমগ্র মানব জাতির আশা"।

ওয়ারসতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস দেখিয়েছে যে, যে সমস্ত ঘটনাবলীতে প্রমাণ হচ্ছে ইতিমধ্যেই একটি নতুন বিশ্ব যুদ্ধ ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছে সেই সব ঘটনাবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে সমগ্র মানবজাতির প্রতি আজ যে বিরাট ঐতিহাসিক দায়িত্ব রয়েছে তার সম্পর্কে বিশ্বশান্তি আন্দোলন সম্পূর্ণ সচেতন।

কোরিয়াতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের রক্তাক্ত আক্রমণ, চীনা গণতান্ত্রিক রিপাবলিক সম্পর্কে তাদের নির্লজ্জ প্ররোচনা, পশ্চিম জার্মানী ও জাপানকে দ্রুতগতিতে অস্ত্রসজ্জিত করা, জাতিসংঘকে ক্রমান্বয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র দপ্তরের গাধাবোট হিসাবে পরিণত করা এবং উন্মত্ত সমরসজ্জা প্রভৃতিকে শান্তি কংগ্রেসেব প্রতিনিধিবর্গ ক্রোধ ও ঘৃণায় নিন্দিত করেছেন।

ব্যাপক মত বিনিময় এবং শান্তির জন্য সংগ্রামে জরুরি কর্তব্য সমূহের গভীর আলোচনার ফলে কংগ্রেস শান্তি আন্দোলনের জন্য এক সামগ্রিক কর্মসূচি নিরূপিত করতে পেরেছে।

কংগ্রেস ঘোষণা করেছে যে, বিশ্বশান্তি আন্দোলনকে ব্যাপক উদ্যোগ কার্যকরী করতে হবে, উদ্যোগ আনতে হবে নীচু থেকে, জনসাধারণের মধ্যে, আবার উঁচুতেও, পার্লামেণ্ট, গভর্নমেণ্ট এবং জাতিসংঘের মধ্যেও। শান্তি আন্দোলন সমস্ত প্রগতিশীল মানুষের শান্তির দৃঢ় ইচ্ছাকে যথাযথ রূপ দেয় এবং যেসব রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংঘ যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্ন নিয়ে বিবেচনা করে তাদের সকলের নিকট শান্তিকামী মানুষের দৃঢ় ইচ্ছাকে প্রকাশ করার অধিকার বিশ্বশান্তি আন্দোলনের আছে—গর্বভরে এই চেতনা নিয়ে বিশ্বশান্তি আন্দোলন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে। শান্তি যোদ্ধাদের এই সুস্পষ্ট অবস্থানের ফলে তাঁরা প্রকাশ্যে যুদ্ধলিপ্সুদের নিশ্চিত করতে পারেন—যে যুদ্ধলিপ্সুরা উদ্ধতভাবে শান্তি প্রস্তাবসমূহকে অগ্রাহ্য করে এবং যারা মানবজাতির জন্য একটা নতুন রক্তাক্ত দুর্দৈব সৃষ্টির জন্য প্রস্তুতি চালাচ্ছে।

জাতিসংঘের নিকট শান্তি কংগ্রেসের আবেদনে শান্তি যোদ্ধাদের কর্মসূচি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সমস্ত জাতি ও দেশের জনসাধারণের পক্ষ থেকে কংগ্রেস ঘোষণা করেছে যে এখনো পর্যন্ত জনসাধারণ জাতিসংঘের উপর যে আশা ভরসা রাখছে তা পূর্ণ করতে হলে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে জনতা তার জন্য যে পথ নির্দেশিত করে দিয়েছিল সেই পথে তাকে ফিরে যেতে হবে। শান্তিকামী সাধারণ মানুষের আশাকে ভাষা দিয়ে কংগ্রেস দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছে যে, যে কোরিয়া যুদ্ধ থেকে একটা নতুন বিশ্বযুদ্ধ পরিণত হবার আশংকা দেখা দিয়েছে জাতিসংঘকে অবিলম্বে তার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার প্রশ্ন গভীরভাবে বিবেচনা করতে হবে, এবং একটি কর্তৃত্ব সম্পন্ন আন্তর্জাতিক কমিশনকে কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত বর্বরোচিত অত্যাচারের অনুসন্ধান করতে হবে। পশ্চিম জার্মানী ও জাপানকেও পুনরস্ত্রসজ্জিত করা থেকে শান্তিভঙ্গের যে গুরুতর আশংকা দেখা দিয়েছে তার প্রতি লক্ষ্য রেখে কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধ নিরস্ত্রীকৃত জার্মানী ও জাপানের সঙ্গে শান্তিচুক্তির দাবি করেছে এবং এইসব দেশ থেকে দখলকারী সৈন্যদলের অপসারণ দাবি করেছে।

জনসাধারণকে পরাধীনতার স্তরে এবং ঔপনিবেশিক দাসত্বের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখবার

জন্য যে হিংসানীতি প্রয়োগ করা হয় কংগ্রেস তাকে শান্তির বিরুদ্ধে আঘাত বলে বর্ণনা করেছে এবং এই সমস্ত জনসাধারণের স্বরাজ ও স্বাধীনতার অধিকার ঘোষণা করেছে। কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত বিরাট ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, কেননা এতে প্রকাশ হয়েছে যে পৃথিবীব্যাপী প্রবল শান্তি আন্দোলন ন্যায্য জাতীয় মুক্তির সংগ্রামকে সমর্থন করে।

সমগ্র শান্তিকামী মানুষের প্রতিনিধিরা পরদেশ আক্রমণের একটি বিস্তৃত সংজ্ঞা প্রচার করেছেন, তাতে বলা হয়েছে ঃ "যে রাষ্ট্র যেকোন অজুহাতে অপর একটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রবল প্রয়োগ করে, সে রাষ্ট্রের ঐ পাপ কাজকে বলা হয় পরদেশ আক্রমণ (aggression)"। শান্তিরক্ষার জন্য আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দাবি করে এবং যেকোন আকারে প্রকারে যুদ্ধ প্রচারকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য করার দাবি করে সমস্ত দেশের পার্লামেন্টের নিকট আহ্বান প্রচারের সাথে সাথে কংগ্রেস প্রদত্ত পররাজ্য আক্রমণের (aggression) এই সংজ্ঞা বিরাট এবং অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ একটি ঘটনা।

সমস্ত ধরনের আণবিক, জীবাণু ও রাসায়নিক অস্ত্র, বিষাক্ত গ্যাস, রেডিও-ক্রিয় ও গণহত্যার অন্যান্য হাতিয়ার বিনাশর্তে নিষিদ্ধকরণ দাবি করে এবং যে গভর্নমেন্ট এইসব ধ্বংসাত্মক অস্ত্র প্রথমে ব্যবহার করে তাকে যুদ্ধাপরাধী বলে ঘোষণা করার দাবি করে কংগ্রেস জাতিসংঘ এবং সমস্ত জাতি ও দেশের পার্লামেন্টের নিকট যে আহ্বান প্রচার করেছে তার প্রতি সমগ্র জনসাধারণ সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানিয়েছে।

বিরাট যুদ্ধ বাজেটের ভারি বোঝা যারা কাঁধে বহন করে সেই জনসাধারণের প্রধান প্রয়োজনীয় দাবিসমূহ প্রচার করে এবং সমগ্র মানব জাতির জন্য নিশ্চিত ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা নিয়ে বৃহৎ শক্তিগুলির নিকটে আবেদনে কংগ্রেস ১৯৫১-৫২ সালের মধ্যে ক্রমান্বয়ে, সংখ্যানুপাতে ও একসাথে স্থল, নৌ ও বিমান প্রভৃতি সকল সামরিক অস্ত্রকে এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেকে নামিয়ে আনবার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে। সামরিক অস্ত্র হ্রাসের এই প্রস্তাব শান্তি যোদ্ধাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য সাধারণ এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের পথের প্রথম পর্যায় সূচিত করে।

শান্তির জন্য সংগ্রামের নেতৃত্বের প্রয়োজনে বিশ্বশান্তি কংগ্রেস সমস্ত জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে কংগ্রেসে আগত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে একটি বিশ্বশান্তি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করেছে।

এই কাউন্সিল সমস্ত মানুষের প্রধান স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পূর্ণ এক স্থায়ী ও নিশ্চিত শান্তি প্রতিষ্ঠার মহান দায়িত্ব বরণ করেছে। কংগ্রেস ঘোষিত এই বিশ্বশান্তি কাউন্সিল মানব জাতির মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস এনে দেবে যে, যাকে কোন প্রকারেই ছোট করে দেখা চলবে না এমন সব বিরাট বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও কাউন্সিল যে মহান কর্তব্যভার গ্রহণ করেছে তা নিশ্চয়ই সে পূরণ করবে।

পৃথিবীর জনসাধারণের নিকট ইস্তাহার মারফৎ আবেদনে কংগ্রেস ঘোষণা করেছে ঃ "শান্তি আমাদের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকে না, তাকে জয় করতে হবে। আসুন আমরা সকলে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা মিলিত করি এবং দাবি করি কোরিয়া ধ্বংস করে দিচ্ছে যে যুদ্ধ, যে যুদ্ধের ফল আগামীকাল সারা পৃথিবী জ্বলে উঠতে পারে, সে যুদ্ধ এখনই বন্ধ হোক"।

দ্বিতীয় বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি শান্তির সক্রিয় যোদ্ধাদের হাতে এক প্রবল হাতিয়ার এনে দিয়েছে, যুদ্ধলিপ্সুদের সর্বনাশা চক্রান্ত ব্যর্থ করার জন্য ব্যাপক জনসাধারণের জঙ্গী সমাবেশের এক বিরাট কর্মসূচী স্থির করেছে। এই সিদ্ধান্তসমূহ শান্তির সমর্থকদের দুনিয়াব্যাপী আন্দোলনকে এই নতুন, উচ্চতর স্তরে উন্নীত করছে; সাম্রাজ্যবাদীদের বর্বর পুলিশী বিভীষিকা প্রতিরোধ করার শক্তি বৃদ্ধি করেছে; শান্তির স্বার্থে আন্দোলনের আক্রমণাত্মক ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। এই সিদ্ধান্তগুলি শান্তিযোদ্ধাদের মধ্যে শান্তিরক্ষার মহান আদর্শের বিজয়লাভে বিশ্বাস দৃঢ়তর করেছে।

বিশ্বশান্তি আন্দোলনের আওতায় যে বিপুল শক্তি সমাবেশ হয়েছে যুদ্ধলিপ্সুদের নিকট তার খানিকটা আভাস দিয়েছে ওয়ারসতে অনুষ্ঠিত শান্তি কংগ্রেস। শান্তি সমর্থকদের দৃঢ় শান্ত আত্মবিশ্বাস সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যে সৃষ্টি করেছে জ্বলন্ত ঘৃণা ও আক্রোশের এক নতুন উন্মত্ততা। বহু ধনতান্ত্রিক দেশে শান্তি সমর্থকদের বিরুদ্ধে পুলিশী দমননীতি তীব্রতর করা হচ্ছে, অসাধু সংবাদপত্রগুলি মিথ্যা ও নিন্দার প্রবাহ সৃষ্টি করছে। এই সমস্ত কিছুর উদ্দেশ্য মাত্র একটিই—তা হল জনসাধারণের নিকট থেকে দ্বিতীয় বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি গোপন রাখা, লক্ষ কোটি সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা। কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের, সমস্ত সৎ গণতন্ত্রকামীদের দায়িত্ব হল কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহ যাতে সমস্ত মানুষের নিকট প্রচারিত হয় তা নিশ্চিত করা।

আজকের পরিস্থিতিতে শান্তির জন্য সংগ্রাম সব থেকে বেশি মহান এবং সব থেকে বেশি গৌরবময় কর্তব্য। শান্তির আদর্শ বহনকারী শক্তিসমূহ ঐক্যবদ্ধ থাকবে এই শর্তের উপর ক্রমবর্ধমান শান্তি সংগ্রামের মধ্যে তাঁদের কার্যকলাপের উপর নির্ভর করেই আজ শান্তি রক্ষিত হতে পারে। শান্তিযোদ্ধাদের চাইতে যুদ্ধবাজরা অনেক বেশি দুর্বল, সংখ্যায় অনেক কম। লক্ষ কোটি সংখ্যায় মানুষ চায় শান্তি। এবং কিছুমাত্র সন্দেহ আর নেই যে নতুন যুদ্ধের অগ্নি প্রসারকারীদের রক্তাক্ত হাত নিশ্চয়ই সংযত হবে।

['ফর এ লাষ্টিং পীস, ফর এ পিপলস ডেমোক্রেসী' পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ—সংখ্যা ঃ ৪৭ (১০৭), ২৪শে নভেম্বর, ১৯৫০]

(খ) শান্তির সংগ্রামে জয়ী হও
এবং
ইহাকে বিস্তৃত কর!

মরিস তোরে—সাধারণ সম্পাদক, ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি

আমাদের পার্টির দ্বাদশ অধিবেশনে বলা হয়েছিল—"বিশ্বশান্তি একটা সুতোর উপরে ঝুলছে"। গত ছয় মাসের ঘটনাবলী এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক চিন্তা এই উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে।

আমেরিকার কোরিয়া এবং তাইওয়ানের বিরুদ্ধে লড়াই প্রমাণ করছে যে যুদ্ধলিপ্সুর দল

যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতির স্তর পেরিয়ে খোলাখুলিভাবে জনসাধারণকে আক্রমণ করা শুরু করে দিয়েছে। গত তিনমাস যাবৎ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ কোরিয়ায় লুটের লড়াই চালিয়ে আসছে। এই কোরিয়াই আজ ঐক্য, স্বাধীনতা ও জাতীয়তার জন্য সাহসের সঙ্গে লড়ছে।

সাংঘাতিক ধরনের মিথ্যা প্রচার ও কুৎসার মারফৎ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা পৃথিবীর লোককে বোঝাতে চেয়েছিল যে তারা ন্যায় এবং সভ্যতা রক্ষার জন্যই সংগ্রাম করছে! এ যেন মানুষকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা যে কোরিয়াবাসীরা কোরিয়াতে আছে, বসবাস করছে! আমেরিকা থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে প্রশান্ত মহাসাগরের অপর পারে অবস্থিত ছোট্ট কোরিয়াকে আমেরিকার আক্রমণকারীরা রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিচ্ছে। দুনিয়ার লোকের মন ঘৃণায় ছেয়ে গেল যখন তারা জানল কেমন করে আমেরিকান বিমান বোমা ফেলে ফেলে শহরগুলিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করছে—গ্রামে গ্রামে লাগাচ্ছে আগুন আর চিহ্ন মুছে ফেলছে আবাল বৃদ্ধ বনিতার!

আমেরিকান গভর্নমেণ্ট চীনের কাছ থেকে তাইওয়ান কেড়ে নেওয়ার জন্য খোলাখুলিভাবে চীনের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে দিয়েছে। যে চিয়াং কাই-শেককে চীনের জনতা তাড়িয়ে দিয়েছে তার জন্য একটু দাঁড়াবার জায়গা করে দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল এদের। নিজেদের দাঁড়াবার জায়গা হিসাবেও এরা তাইওয়ানকে চেয়েছিল প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অবস্থিত বলে। আমেরিকান বিমান মাঞ্চুরিয়ার গ্রামে গ্রামে বোমা ফেলেছে—কিন্তু তা সত্ত্বেও জাতিসংঘ চীনের জনগণের রিপাবলিক এর সব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে।

ভিয়েতনামের জনসাধারণের বিরুদ্ধে আমেরিকার সৈন্য পাঠানো গত চার বছরের নোংরা যুদ্ধের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছে।

এশিয়ার যেসব জাতি ঔপনিবেশিক দাসত্ব ও শোষণের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং স্বাধীনতার জন্য লড়ছে তার বিরুদ্ধে যাচ্ছে আমেরিকার ধনিক শ্রেণি, তারা যোগ দিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষের শিবিরে। সাম্রাজ্যবাদীরা মেনে নিতে পারে না যে এশিয়ার জনগণ মুক্তিলাভ করুক। তারা এশিয়াকে অধীনই রাখতে চায় অথবা নতুন করে দাসত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কোরিয়া এবং চীনকে আমেরিকা আক্রমণ করল আর সেই আমেরিকার পিছনেই ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম আর অন্যান্য উপনিবেশের মালিকরা এসে দাঁড়াল। এতেও কি একথা স্পষ্ট বোঝা যায় না যে, দাসত্বের শৃঙ্খলই তারা পরিয়ে রাখতে চায়? আমেরিকার হুকুমমাফিক এই সমস্ত জাতিগুলি জাতিসংঘকে নীতির দিক থেকে দেউলিয়া করে দিয়ে অসম্মানের পথে ঠেলে দেয় নাকি?

কোরিয়া এবং ভিয়েতনামের যুদ্ধ ঔপনিবেশিক সংকটকে গভীরতর করে তুলেছে। সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিকে এই যুদ্ধ আরও সংকীর্ণ করে দেবে। এশিয়া এবং আফ্রিকার জনতার স্বাধীনতার লড়াই শান্তির জন্য সংগ্রামের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলে। মরক্কো এবং টিউনিসে জাতীয়তাবাদী দলের বিবৃতিতে একথা আছে। সেই বিবৃতিতে তাঁরা বলেছেন যে, সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধচক্রান্ত আঁটছে তার মধ্যে তারা থাকবে না। এইভাবে শান্তির লড়াই ঔপনিবেশিক আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলিকে একতার দিকে নিচ্ছে তাদের সবারই স্বার্থ স্বাধীনতা ও শান্তি ঐক্যের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে।

চীন এবং সোভিয়েতের বিরুদ্ধে আক্রমণের পরিকল্পনার একটি অংশ হল কোরিয়া

আক্রমণ। আমেরিকা নতুন নতুন বিমান পথ, জলপথ এবং ঘাঁটি বৃদ্ধি করার দিকে নজর দিচ্ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন এবং নয়া গণতন্ত্রের দেশগুলিকে আক্রমণ করার জন্য—যদিও যথেষ্ট জলপথ ও বিমান পথ এখনো তার আয়ত্তাধীনে আছে। আক্রমণাত্মক অতলান্তিক চুক্তি, তিনজন বৈদেশিক মন্ত্রীর বৈঠক (আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স), জার্মানীর হাতে অস্ত্র দেওয়া, আমেরিকার দেশরক্ষা সচিব পদে জেনারেল মার্শালকে নিয়োগ করা—এইসবের অর্থ বোঝা খুব কঠিন নয়।

আমরা বার বার বলেছি যে, মার্শাল প্ল্যান যুদ্ধের জন্য। আজ আর কেউ এতে সন্দেহ প্রকাশ করে না। সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে এর ফল অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে দেখতে গেলে মার্শাল পরিকল্পনা উৎপাদন কমিয়ে দিয়েছে, অনেক জাতীয় সম্পদ ধ্বংস করে দিয়েছে বিশেষ করে বিমান শিল্প, কৃষি ব্যবস্থায় অবনতি ঘটিয়েছে, শিল্পে পচন ধরিয়েছে, উপবাসের সীমানায় নিয়ে পৌঁছিয়েছে বেতন ব্যবস্থাকে, বেকারি বাড়িয়েছে তিনগুণ, নিত্যব্যবহার্য জিনিসের দাম বাড়িয়েছে, করভার চাপিয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি, রাষ্ট্রের খরচ বাড়ানো এবং ফ্রাঁ প্রথাকে স্থিতিশীল করায় নানারকম অসুবিধা ঘটিয়েছে।

আমেরিকার ধনিক শ্রেণি আমাদের দেশকে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেছে। জনসাধারণ বাধা দেওয়া সত্ত্বেও ফ্রান্স যুদ্ধ এবং সন্ত্রাসবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। আমেরিকার ধনিকরা এবং তার দালালরা ফ্রান্সের জনতাকে তার বন্ধু সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে চেষ্টা করছে। জার্মানীর কাছ থেকে যা আমরা দাবি করতে পারতাম তা আমাদের দাবি করতে দেওয়া হয়নি, উপরন্তু আমাদের দেশকে নিরাপত্তাহীন অবস্থার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। যদিও ফ্রান্স এখনো যুদ্ধের ধাক্কা সামলে উঠতে পারেনি তবুও ফ্রান্সকে তারা পশ্চিম জার্মানীকে সশস্ত্র করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বাধ্য করাচ্ছে। অতলান্তিক চুক্তির আক্রমণাত্মক প্রচেষ্টার মধ্যে এইরকম কথাই ছিল।

আজ যখন রূঢ় সত্য মিথ্যা এবং মোহের আবরণকে ছিঁড়ে ফেলছে তখন মার্শাল পরিকল্পনা তার সত্যিকারের চেহারা নিয়ে দেখা দিচ্ছে : প্রতিক্রিয়া, যুদ্ধ এবং দারিদ্র্যই তার আসল রূপ। আগেই বোঝা গিয়েছিল যে এই চুক্তিই অতলান্তিক চুক্তিতে রূপান্তরিত হবে। এই চুক্তি ফ্রান্স এবং জার্মানীকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নারকীয় যুদ্ধের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে মার্কিন প্রভুরা মার্শাল পরিকল্পনাধীন দেশগুলিতে সৈন্যবাহিনী বাড়িয়ে দেওয়ার হুকুম দিয়েছে। ফ্রান্সে আরও ১৮ মাসের জন্য সৈন্যবাহিনী রাখার মেয়াদ বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়েছে। নতুন সৈন্যদের আরও তিনমাস সেনাবিভাগে থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে। আরও ১৮ মাস সৈন্যবাহিনীর মেয়াদ বৃদ্ধি করার অর্থ যুদ্ধ আরম্ভ করার চেষ্টা করা। জনসাধারণের উপর লুঠতরাজের রাজত্ব চালানোর জন্য উপনিবেশে নতুন সৈন্যদের পাঠানো হবে। আমেরিকার প্রভুরা মার্শাল পরিকল্পনাধীন দেশগুলি থেকে কামানের খোরাক যোগাড় করতে পারবে বলে আশা করছে।

সৈন্যবাহিনীর মেয়াদ আরও ১৮ মাস বাড়ানোর পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে জনসাধারণের এই শত্রুর দল বলে যে, সোভিয়েতের খুব শক্তিশালী সেনাবাহিনী আছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের আয়তন ও সীমানার তুলনায় এই সেনাবাহিনী কিছুই নয়। আমাদের সৌভাগ্য যে, ফ্রান্স এবং ইউরোপকে দাসত্বের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সোভিয়েতের এই বীর সেনারা

হিটলারের দস্যুবাহিনীকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিল। এই শক্তিকে তাদের অক্ষুণ্ণ রাখতেই হবে যাতে ধনিক দেশগুলির আক্রমণকে প্রয়োজন উপস্থিত হলে হটিয়ে দেওয়া যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন তার প্রখর দৃষ্টি কমাতে পারে না; সারা দুনিয়া যখন সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধোদ্যমের আয়োজনে মুখর হয়ে উঠেছে, সাম্রাজ্যবাদীরা যখন সমাজতন্ত্র ও শান্তির দেশ সোভিয়েতের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য তৈরি হচ্ছে তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সংগ্রাম ক্ষমতা বাড়ানো সম্পর্কে নিয়ত নজর না রেখে পারে না।

মার্কিন পক্ষের দালালরা জনসাধারণকে বিশ্বাস করাতে চায় যে সোভিয়েত শান্তিভঙ্গ করছে এবং আমাদের দেশকে ভয় দেখাচ্ছে। কিন্তু ফ্রান্সের লোকেরা প্রতারিত হবে না। তারা ভোলে নাই এবং ভুলবে না যে তারা সোভিয়েতের কাছ থেকে আর ষ্ট্যালিনগ্রাডের বীর সৈনিকদের কাছ থেকে পেয়েছে তাদের শ্রদ্ধেয় এবং প্রিয় নেতা ষ্ট্যালিনকে। ফ্রান্সের জনতা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে লড়তে কোনদিনই চায় নি এবং চাইবেও না।

সমস্ত সংব্যক্তিই জানেন যে সোভিয়েতের জনসাধারণ বিরাট ঐতিহাসিক দায়িত্ব নিয়েছে; সে দায়িত্ব হল সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের সম্পূর্ণতা সাধন এবং ক্রমশ সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় রূপান্তর। "প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ আর প্রয়োজন অনুযায়ী জিনিস"—মার্ক্সের এই নীতিকে কাজে পরিণত করাই সাম্যবাদী সমাজের লক্ষ্য। হিটলারের সৈন্যরা যে সব অঞ্চল ধ্বংস করেছিল সে সব অঞ্চলের পুনর্গঠন সম্পূর্ণ করা হয়েছে। ফ্রান্সের চারগুণ বড় হবে সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত অঞ্চলের আয়তন। এই কাজ শেষ করে তারা প্রকৃতিকে পরিবর্তন করার কাজে নেমেছে—এসব জায়গায় জনসাধারণের জন্য ভাল থাকার এবং কাজ করার অবস্থা সৃষ্টি করা হবে। কোটি কোটি বিঘা জমির উপর অরণ্য বলাকা তৈরি করা হচ্ছে। বিরাটকার বাঁধ এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে। খাল কাটা হচ্ছে, অনুর্বর জমিকে—মরুভূমিকে উর্বর করা হচ্ছে।

জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ভিশিনস্কি বলেছিলেন—তা সবারই স্মরণ আছে—সোভিয়েত ইউনিয়নে আমরা আণবিক শক্তিকে বোমা হিসাবে ব্যবহার করি না, যদিও এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে দুর্ভাগ্যক্রমে যদি এরা বোমা হিসাবে ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় তবে প্রয়োজন মত আণবিক বোমা আমরা তৈরি করতে পারব। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের স্বার্থে আণবিক শক্তিকে আমরা ব্যবহার করছি। পাহাড় ধসিয়ে দেওয়া, নদীর গতি পরিবর্তন করা, মরুভূমিতে খাল কাটা, মানুষ যেখানে কখনো যায়নি সেখানটাকে ব্যবহারপযোগী করা ইত্যাদি কাজের জন্য—অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ গঠনমূলক কাজের জন্য আমরা আণবিক শক্তিকে ব্যবহার করব।

ফরাসীদেশের যে সব লোক সোভিয়েতের প্রতি ঘৃণায় অন্ধ নন তাঁরা জানেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন অত্যন্ত ধীর পদবিক্ষেপে শান্তির নীতি মেনে চলেছে এবং চলবে। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র পাশাপাশি অনেকদিন চলতে পারে—এই সম্ভাবনার ভিত্তির উপরেই শান্তির নীতি প্রতিষ্ঠিত।

সোভিয়েত ইউনিয়ন অন্যজাতির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কখনো হস্তক্ষেপ করে না। অন্যকে ভয় কখনো সে দেখায়নি—দেখাবেও না। সোভিয়েত রাষ্ট্রের স্বার্থ এবং ফরাসী রাষ্ট্রের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী নয় এটা সত্য কথা। একথাও সত্য জার্মান সাম্রাজ্যবাদের হুমকিকে অসম্ভব

করে তুলতে দুজনেই চায়। একথাও সত্য যে সোভিয়েত ইউনিয়ন কোনদিন আমাদের কাছ থেকে কোন এলাকা, নৌ-ঘাঁটি বা বিমান ঘাঁটি অথবা কোনরকম রাজনৈতিক বা সামরিক, অর্থনৈতিক দাবি জানায়নি।

সোভিয়েতের বিরুদ্ধে বলে বলে তারা মুখে ফেনা উঠিয়ে ফেলেছে তার কারণ সোভিয়েতের অস্তিত্ব অত্যাচারিত জনগণকে উৎসাহ জোগায়—জনগণের মনে এই আত্মবিশ্বাস এনে দেয় যে তার মুক্তি অনিবার্য। সোভিয়েত ইউনিয়ন গণতন্ত্র ও শান্তির জীবন্ত প্রতীক—জনসাধারণের অগ্রগতির জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

দক্ষিণপন্থী সমাজতান্ত্রিক নেতারা ধনিক শ্রেণির দালাল—তারা প্রতিক্রিয়ার ও দারিদ্র্যের যে নীতি চালু করেছে তার স্বরূপ খুলে গেছে। তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য তৈরি হচ্ছে—শ্রমিকদের মুক্তিকে ধ্বংস করার চেষ্টা কবছে—ইতিহাসের চাকাটা ঘুরিয়ে দিয়ে ঔপনিবেশিক দেশের জনসাধারণকে দাসত্বে ফিরিয়ে নিতে চাইছে। তারা উপলব্ধি করে যে তারা ধ্বংসের দিকে এগোচ্ছে। যে শক্তি জাগ্রত হচ্ছে তাকে তারা ভয় পায়—কারণ ভবিষ্যতে এই শক্তিই তাদের স্থান অধিকার করবে।

কিন্তু শাসক গোষ্ঠী তাদের অবস্থা অপরিবর্তিত রাখার জন্য যত চেষ্টাই করুক না কেন তাতে ভিতরটার দ্বন্দ্বটাকে কেবল বাড়িয়েই দেওয়া হবে। মৃত্যুপথযাত্রী ধনতন্ত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব সমাজকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে। শ্রমিক শ্রেণির উপর অত্যাচার, শান্তির কর্মীদের প্রতি দমননীতির প্রয়োগ, পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের প্রতি মোহ—সবই হচ্ছে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি; ধনিকচক্রের নেতাদের মাথা খারাপ হওয়ার লক্ষণ।

যুদ্ধবাদের বিরুদ্ধে যাঁরা প্রাণপণে লড়ছেন তাঁদের দমন করার জন্য হত্যা সন্ত্রাস ইত্যাদির আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে অতীতের হিটলার-মুসোলিনীর মত আর বর্তমানে ফ্রাঙ্কো-টিটোর মত। ইতালির শ্রমিক শ্রেণির নেতা তোগলিয়াত্তিকে তারা মারতে চেষ্টা করেছে, জাপানের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা তোকুদাকে হত্যা করতে চেয়েছে; বেলজিয়াম কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি আন্তর্জাতিক শ্রমিক নেতা হিসাবে খ্যাতনামা লোহোকে তারা হত্যা করেছে।

উদাহরণস্বরূপ আমেরিকাকে ধরা যেতে পারে। বে-আইনিভাবে শহর থেকে নির্বাসিত হওয়ার হুকুম পাওয়া মাত্র তামিল না করার অপরাধে কিছুদিন আগে একজন কমিউনিস্টকে তাঁর বাড়িতেই খুন করা হয়। আরও কত কমিউনিস্ট সৈন্যকেই না সেখানে খুন করা হয়েছে। কত নিগ্রোকে কত ছলে কৌশলে 'লিঞ্চ' (হত্যা—অনুবাদক) করা হয়েছে তাদের সংখ্যাতো গণনার বাইরেই।

নেতৃস্থানীয় শ্রমিকদের উপর আইনবহির্ভূত অত্যাচারের উদাহরণ স্থাপন করে গেছে আমেরিকা। আমাদের সহযোগী আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা শুধুমাত্র সাম্যবাদী চিন্তাধারা প্রচার করার অপরাধে পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। হাওয়ার্ড ফাস্ট ও এলবার্ট মলট-এর মত প্রগতিশীল লেখক এবং সিনেমা শিল্পে খ্যাতনামা প্রগতিবাদীদের জেলে পোরা হয়েছে। মার্কিন মুলুকে আন্-আমেরিকান কমিটি নামে একটি সংগঠন চালু করা হয়েছে। এদের কাজ হচ্ছে গুপ্তচরবৃত্তি করে বেড়ানো। এই কমিটির ভাল মানুষ সভাপতি জোচ্চুরী করার অপরাধে হেয় প্রতিপন্ন হন। আমেরিকায় নতুন একটি আইন জারি করে তাতে বলা হয়েছে যে কমিউনিস্ট পার্টির লোকেদের নাম পুলিশের খাতায় রাখা হল। যুদ্ধ ইত্যাদি বিপজ্জনক

পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া মাত্র তাদের আটক করে রাখা হবে বন্দীশিবিরে।

আমেরিকা মার্শাল পরিকল্পনাধীন দেশগুলিকে হুকুম দিয়েছে কমিউনিস্টদের সম্পর্কে অসাধারণ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে। সোস্যালিস্ট মন্ত্রী জুলে মশের নেতৃত্বে দেশকে সৈন্যবাহিনী দিয়ে আচ্ছন্ন করে রাখার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রমিক শ্রেণির প্রতি অনুরক্ত এবং শান্তিবাদী কমিউনিস্টদের জন্য আইন জারি করা হচ্ছে। মশের দল অসাধারণ ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য ওকালতি করছে।

বেশিদিন হয়নি—আমাদের বন্ধু, ফ্রান্সের গৌরব বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জোলিও কুরীকে আণবিক শক্তি কমিশনের সভ্যপদ থেকে অপসারিত করা হয়েছে। আবার একটি নতুন অস্ত্র শানানো হচ্ছে—সমস্ত গভর্নমেন্টের চাকুরি থেকে কমিউনিস্টদের অপসারণ করা হবে।

ফরাসী পার্টিকে বে-আইনি করার জন্য এরা বলাবলি করছে। দালদিয়েরের যার নির্দোষীদের খুনে লালে সে আজ সাহস করে পার্টিকে বে-আইনি করার কথা বলছে? হিটলারের আক্রমণের মত সাংঘাতিক বিপদ ফ্রান্সের ওপর চাপিয়ে দিয়েও তার তৃপ্তি হয়নি, নাজীদের সবরকমের স্বাধীনতা দিয়ে, কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট বে-আইনি শাস্তি চালু করেও তার আশা মেটেনি।

রিপাবলিকের অধিবাসীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে জানেন যে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে নানাধরনে শাস্তির ব্যবস্থা সকলকেই ভয় দেখানোর একটা কৌশল মাত্র। কমিউনিস্টদের পরে এরা সোস্যালিস্টদের শাস্তি দিতে থাকে। গণতন্ত্রের পক্ষে যাঁরা কথা বলেন তাঁরা এই ধরনের ফ্যাসিবাদকে মাথা পেতে নেন না—শাস্তি তাঁদের উপরেও আসে।

ফ্রান্সে এখন ভাল শ্রমিক কর্মী এবং শান্তিবাদীরা পৈশাচিক অত্যাচার ভোগ করছেন আর সাম্রাজ্যবাদের লেজুড় ও দালালদের মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। গ্নোভেন দেশপ্রেমিকদের ভয় দেখাচ্ছে আর বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে ভাব করছে। ফ্রান্সের বর্তমান শাসকরা বে-আইনিভাবে শ্রমিকদের আটক করে নির্বাসন দেয়—এদের মধ্যে স্পেনের ফ্যাসিবিরোধী দলও থাকে। এইভাবে শাসকরা ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে দৃঢ় করে কারণ সোভিয়েতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একমাত্র ফ্রাঙ্কোকে পাওয়াই সম্ভব। আলজিয়ার্সের যে সব শ্রমিক ফ্রান্সে আছে তাদের ফাঁসিতে লটকানো হয় তাদের কাগজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। অথচ টিটোর চরেরা আর আঁদারের দল সবরকম সুবিধাই পায়।

কর্মীদের ওপর আক্রমণ এবং শ্রমিকদের বাড়িতে ও গণসংগঠনের ওপর হামলা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। গুপ্তচর পুলিশ আর প্ররোচকের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। জুলে মস ফ্যাসিস্ট ধরনে প্রহরী বাহিনী তৈরি করছে। স্বাভাবিক সময়ে যে সংখ্যক পুলিশ বাহিনী ছিল শ্রমিকের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাকে বাড়িয়ে চারগুণ করা হয়েছে। এইসব নতুন নতুন শিক্ষার্থী পুলিশরা যে কি হবে তা তো বোঝাই যায়। ধনি কৃষক, শিল্পের মালিক, উপনিবেশের প্রাক্তন জমিদার এবং বদমায়েস লোকেদের ছেলেদের নিয়ে এই বাহিনী তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ নতুন ফরাসী ফ্যাসিস্ট বাহিনী, নতুন ধরনের স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা হচ্ছে। এই ধরনের কাজের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণি ও প্রতিটি রিপাবলিকপন্থীকে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে হবে। আইনসঙ্গত উপায়ে ফ্যাসিস্ট বাহিনী সৃষ্টি করার বিরুদ্ধে তাদের লড়তে হবে। ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা এই শিক্ষা লাভ করেছি যে শ্রমিক শ্রেণির ঐক্যবদ্ধ

আন্দোলনই একমাত্র ঐ ধরনের কাজে বাধা দিতে পারে।

ইতালিতে দ্য গ্যাসপেরী এই রকম ফ্যাসিস্ট সংগঠন গড়তে চলেছে। বেলজিয়ামেও এই ধরনের প্রস্তুতি চলেছে। শ্রমিক শ্রেণির বিরুদ্ধে একই ধরনের পন্থা সর্বত্র অবলম্বন করা হচ্ছে—ইতালিতে, বেলজিয়ামে, ফ্রান্সে।

সর্বশেষে তৈরি করা হচ্ছে আগামী নির্বাচনের জন্য ভুয়া আইন। আমাদের পার্টির পক্ষে যে পাঁচলক্ষ স্ত্রী পুরুষ ভোট দিয়েছিল আমাদের প্রতিনিধি হিসাবে জাতীয় পরিষদে পাঠানোর জন্য, তাদের এবার ভোট দেওয়া থেকে বিরত করার চেষ্টা হচ্ছে।

ফ্যাসিবাদের দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়ার সময় হচ্ছে খুন করা, খুন করতে চেষ্টা করা, সন্ত্রাস সৃষ্টি করা, পুলিশ জুলুম চালানো, জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাওয়া। সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধের পশ্চাদ্ভাগ মজবুত রাখছে এইসব জনবিরোধী দল। কমরেড ষ্ট্যালিন ১৯৩৪ সালে বলশেভিক পার্টির সপ্তদশ কংগ্রেসে বলেন যে ফ্যাসিবাদকে শত্রুর শক্তি হিসাবে দেখলে ভুল করা হবে, ফ্যাসিবাদ হচ্ছে ধনতন্ত্রের দুর্বলতার চিহ্ন। শ্রমিক শ্রেণি এবং শান্তির অগ্রদূতরা যাঁরা রোনের কমরেডদের মুক্ত করেছেন অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁরা জয়লাভ করবেন—তারা তাঁদের কর্মী ও সংগঠনকে শক্ত হাতে রক্ষা করবেন, ফ্যাসিবাদকে রুখবেন।

পৃথিবীর সব জায়গার তথা ফ্রান্সের পরিস্থিতি হচ্ছে এই যে শান্তির শক্তি বেড়ে যাচ্ছে, জনসাধারণ স্পষ্ট বুঝতে পারছেন কি বিপদের সম্মুখীন তাঁরা হয়েছেন। এই বিপদকে এড়িয়ে যেতে জোর চেষ্টা করছেন দুনিয়ার যুদ্ধলিপ্সুদের বিরুদ্ধে সমগ্র জনতাকে একত্র করে লড়াই চালিয়ে সমস্ত দেশের ও জাতির শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য। স্টকহমের আবেদনে সহি সংগ্রহ তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য লাভ করছে। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা কোরিয়ার জনসাধারণের বিরুদ্ধে এটম বোমা ব্যবহার করতে সাহস পেল না যদিও তাদের ইচ্ছা তাই ছিল ও যদিও ঘৃণ্য বর্বরাও তাদের তা করতে বলেছিল। আশানুযায়ী স্টকহমের শান্তি আবেদন শান্তির লড়াইকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গেছে। ডক শ্রমিকদের নেতৃত্বে শ্রমিকরা যুদ্ধের জিনিস চালান দেওয়ার বিরুদ্ধে লড়ছে।

নিজস্ব জরুরি দাবি আদায়ের জন্য লড়াইও দ্রুত গতিতে বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৪৭ সালের তুলনায় জীবনযাত্রার মান তিনগুণ বেড়ে গেছে বলে শ্রমিকরা প্রেভেঁ ও গ্যে মোলের উপর সন্তুষ্ট থাকতে পারছে না।

আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীর দালাল 'ফোর্স ওভ্রিয়ারের' নেতারা বেতন বৃদ্ধির দাবিকে বাধা দিচ্ছে। সাধারণ শ্রমিক সংঘ, ক্রিশ্চিয়ান শ্রমিক সংঘ ও ফোর্স ওভ্রিয়ারের সাধারণ শ্রমিকরা একত্রিত হয়ে লড়াইকে জোরদার করছেন। কারখানাগুলির বিভাগে সাধারণ কর্মীরা যে কিভাবে এই লড়াই চালিয়েছেন তার ভুরি ভুরি নিদর্শন রয়ে গেছে। বেতন বৃদ্ধির দাবির লড়াই যে সাফল্য লাভ করবে তা এ থেকেই বোঝা যায়। রুটির লড়াই যখন একই সঙ্গে শান্তির লড়াই তখন তার তাৎপর্য সম্পর্কে একটু বেশি করে ভাবা অন্যায় হবে না। সামরিক মেয়াদ আরও একমাস বাড়ানোর বিরুদ্ধের আওয়াজ আর শান্তির আওয়াজ শ্রমিকদের মত নিয়ে সাধারণের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। পারীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর সাফল্য দেখা গেছে। কেবলমাত্র বেতন বৃদ্ধি নিয়েই যদি সাধারণ লড়াই করা হয় তবে তাই শান্তির লড়াইয়ের ক্ষেত্রে মস্ত দান হবে। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে শ্রমিক শ্রেণি তাদের বেতনের কোন অংশ যুদ্ধের জন্যে খরচ

হতে দিতে নারাজ। ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ প্রস্তুতি শাসকরা চালিয়েছে তাকে শ্রমিক শ্রেণি কোনভাবেই চলতে দেবে না বা তারজন্য কোনরকম স্বার্থত্যাগ করবে না যদিও এই জিনিসটাই শাসকরা তাদের কাছ থেকে দাবি করছে।

কমিউনিস্টদের কর্তব্য হল অবস্থাটা ভাল করে পর্যালোচনা করা—শ্রমিক শ্রেণির মনোভাব বুঝে চলা, শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি নিয়ে লড়াইয়ের সম্মুখবর্তী হওয়া। আশু দাবি আদায়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের শ্রমিকরা চেষ্টা চালাচ্ছে—এতে স্বভাবতই জনসাধারণের শত্রু যুদ্ধলিপ্সুর দলকে রোখা যাবে। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গভর্নমেণ্ট অফিসার, নীচুদরের চাকুরিয়া, যুদ্ধফেরৎ লোকেরা—কারুরই বেতন বৃদ্ধি হয়নি। বৃদ্ধদের মাত্র ৪০০০ ফ্রাঁ দেওয়া হয়। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় গৃহিণীরা, মায়েরা অসুবিধা ভোগ করছেন। কৃষকরা, ছোট দোকানদাররা, ভাড়াটেরা, কৃষিজাত এবং শিল্পজাত জিনিসের দাম উত্তরোত্তর বেড়ে যাওয়ায় বিব্রত হচ্ছেন। আয় কমে যাচ্ছে, খরচ বেড়ে যাচ্ছে ছোট ছোট শিল্পী এবং ব্যবসায়ীদের। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত লোকেদের দাবিও এদের সঙ্গে একরকম, কারণ লক্ষ লক্ষ টাকা যুদ্ধের জন্য খরচ হচ্ছে অথচ এঁরা কষ্ট করছেন।

বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির যে অধিবেশন গত মাসে প্রাগে অনুষ্ঠিত হয় তাতে দ্বিতীয় শান্তি কংগ্রেসের অধিবেশন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। স্থায়ী কমিটি যে আবেদন বের করেছেন তাতে শান্তি আন্দোলন বাড়িয়ে নেওয়ার এবং সংগঠিত করার বেশি সুযোগ পাওয়া যাবে। শান্তি যোদ্ধারা আক্রমণের মুখোশ খুলে দিচ্ছে সর্বত্র। অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সশস্ত্র হস্তক্ষেপকে তারা বাধা দিচ্ছে। তারা কোরিয়ার যুদ্ধের শান্তিপূর্ণ অবসান চায়। তারা জনসাধারণের উপর বোমা বর্ষণের তীব্র প্রতিবাদ করে। শান্তি যোদ্ধারা দাবি করে যেন জাতিসংঘ বিভিন্ন পাঁচটি শক্তির প্রতিনিধি নিয়ে কোরিয়ার দ্বন্দ্বের অবসান ঘটায়—দুইপক্ষের বক্তব্যই শোনে। শান্তি যোদ্ধার দল যুদ্ধের পক্ষের সমস্ত প্রচারকে বে-আইনি করার দাবি জানায়। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই সমস্ত শান্তি যোদ্ধারা জনসাধারণের কাছে পৌঁছাবেন। অপরদিকে আমরা দ্বিতীয় বিশ্বশান্তি কংগ্রেসকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সমস্ত কারখানায়, বাসস্থানে, প্রতিটি শাখায় প্রস্তুতির জন্য সভা করব।

বিশেষভাবে আমাদের জন্য স্থায়ী কমিটির অধিবেশনে একটা কথা বলা হয়েছে। ঐক্যের প্রয়োজন সম্পর্কে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে—পরস্পরকে বোঝার মারফৎ ঐক্যের দিকে অগ্রসর হোয়ার কথা ভাবা হয়েছে। ১৯৪৯ সালে কমিউনিস্ট ফেডারেশনের সীন বিভাগের বক্তৃতায় যা বলা হয়েছিল দ্বাদশ পার্টি অধিবেশনে তার পুনরাবৃত্তি করা হয়— "আমরা পুনর্বার একটা ঘোষণা করার প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস করি। আমরা আমাদের মতামত বলার অধিকার সর্বক্ষেত্রে সর্বসময় রাখি। অকপট শান্তিবাদীদের মতামত বিভিন্ন সময়ে আমরা গুরুত্ব দিয়ে থাকি। তাঁরা আগামী যুদ্ধের বিরুদ্ধে কি কি উপায়ে লড়বেন, কি করে শান্তিরক্ষা করবেন তা ভাবছেন। অকপট শান্তিবাদীদের সঙ্গে এই বিষয়ে আমরা আলাপ করতে পারি। আমাদের প্রয়োজন আজ শান্তিরক্ষার জন্য সকলে একত্রিত হওয়া"।

আমরা সব সময়ই সক্রিয়ভাবে একতার জন্য লড়ে এসেছি। কিন্তু আমরা জানি যে ঐক্য গড়া এবং তাকে রক্ষার জন্য, ধীরভাবে বাড়ানোর জন্য চেষ্টা চালাতে হয়। শুধু যে শ্রমিকদের, রিপাবলিকপন্থীদের বা দেশপ্রেমিকদের ধীরভাবে বোঝাতে হয় তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে একতা ধ্বংস

করতে যারা চেষ্টা করছে তাদের মুখোশ খুলে ধরতে হয়। তাছাড়া ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক বজায় রাখতে হয় সমাজবাদী শ্রমিকদের সঙ্গে, যাতে শ্রমিকরা বিভ্রান্ত না হয়ে পড়ে তাদের নেতাদের কথায়।

দক্ষিণপন্থী সমাজবাদী নেতাদের ও তাদের নীতির স্বরূপ তুলে ধরার মধ্য দিয়ে তাদের প্রভাবান্বিত শ্রমিকদের সঙ্গে ভ্রাতৃমূলক সম্বন্ধের সৃষ্টি করা সম্ভব—যদিও তারা সোস্যালিস্ট পার্টিরই অন্তর্ভুক্ত।

বিশেষ করে একথা মনে রাখতে হবে যে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের অর্থই লড়াই করা। সমস্ত চুক্তিরই এমনকি নির্বাচনের চুক্তিরও একটা অর্থ থাকে যদি সকলে মিলে দাবির জন্য লড়াই করে—আশু কর্তব্য সম্পর্কে একত্রিত হয়ে পরিকল্পনা পেশ করে।

সংগঠন ছাড়া কোন বাস্তব আন্দোলনই সম্ভব নয়। এই সবরকমের কমিটিগুলিরই বিশেষ প্রয়োজন আছে—গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত লোক নিয়ে বাস্তব কর্মপন্থা সামনে রেখে অগ্রসর হতে হবে। শান্তিযোদ্ধা এবং অন্যান্য সংগঠনগুলিকে আমরা স্বাগত করতে পারি এবং শান্তিযোদ্ধা ও মুক্তি যোদ্ধাদের উৎসাহ দিতে পারি। দ্বিতীয় শান্তি কংগ্রেসের প্রস্তুতির জন্য বিভিন্ন বিভাগে সভা করতে পারি—ট্রেড ইউনিয়ন, ফরাসী নারী সংঘ এবং অন্যান্যদের এজন্য তৈরি করতে পারি।

দ্বাদশ কংগ্রেসের আগে আমরা প্রথমত লড়ি যুদ্ধ সম্পর্কে অন্ধতা এবং আত্মসন্তুষ্টির বিরুদ্ধে। ঐ সঙ্গেই যুদ্ধ অনিবার্য এই ক্ষতিজনক ও ভুল প্রচারের বিরুদ্ধে আমরা লড়তে থাকি। আজ যুদ্ধের বিপদের কথা কেউই অস্বীকার করে না। এখন যুদ্ধ অনিবার্য—এই ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে সমস্ত জোর দিতে হবে। যুদ্ধের সম্ভাবনাকে ছোট করে দেখার মতই এতেও সুবিধাবাদী নিষ্ক্রিয়তা প্রশ্রয় পায়।

না, যুদ্ধ অনিবার্য নয়। না, যুদ্ধ এমন জিনিস নয় যাকে ভাগ্যই নির্ধারণ করবে। এ নির্ভর করে জনসাধারণের উপর, শ্রমিকদের উপর, শান্তির সমর্থকদের উপর, তথা আমাদের কমিউনিস্টদের উপর, আমরা কতটা সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনাকে পর্যুদস্ত করতে পারলাম না পারলাম তার উপর।

আমাদের রাজনৈতিক আদর্শগত সংগ্রামও চালিয়ে যেতে হবে আমাদের সংকীর্ণ ভাবধারাকে দূর করার জন্য। বিশেষ করে আজকের দিনে যখন একতার প্রশ্ন এভাবে এসেছে।

আজ লক্ষ লক্ষ নরনারীর উদ্দেশ্য কি? শান্তিরক্ষা করা। শান্তিরক্ষা করার ইচ্ছাকে আমাদের শক্তিশালী করতে হবে জাতীয় মুক্তির জন্য। এর জন্য কোন চেষ্টাকেই আমরা বাকি রাখব না।

আমাদের শান্তির জন্য লড়াইয়ের একটা প্রয়োজনীয় অংশ হল সামরিক মেয়াদ ১৮ মাস বাড়িয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করা। জেনারেল কনফেডারেশন অব লেবার তার ঐতিহ্য অনুযায়ী একটি "কমিটি অফ একশন" তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছে যাতে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ছাড়া আমাদের পার্টিও রয়েছে, ইউনিটারিয়ান সোস্যালিস্ট পার্টি রয়েছে, ইউনিয়ন অব রিপাবলিকান ইউথ কনফারেন্স এবং প্রাক্তন সৈনিক সংঘ আছে।

সারা দেশ জুড়ে যে শক্তিশালী বিক্ষোভ হয়ে গেল তার শুরু হল বাফালো স্টেডিয়ামে বিরাট সভার মধ্য দিয়ে। সৈনিকরা তাদের অসন্তোষ ধ্বনিত করে তুলল, বাধ্যতামূলক সেনারা

১৮ মাস মেয়াদ বাড়ানোর বিরুদ্ধে বলল। প্রতিবাদ সভা জোর পেল গ্রামের মধ্যে সবচাইতে বেশি। শুধু "কমিটি অফ একশন"ই যে এইজন্য লড়ছে তা নয়। বহু জায়গায় সোস্যালিস্ট ফোর্স ওভ্রিয়ারের ট্রেড ইউনিয়ন সভ্য, ক্যাথলিক সংগঠনের সভ্যরা আবেদনে সই করছেন—মিছিলে যোগ দিচ্ছেন। লয়ের ডিপার্টমেন্টের অন্তর্ভুক্ত ক্যাথলিক ওয়ার্কিং ইয়ুথ লীগ এবং পারী জেলার ক্যাথলিক ইয়ুথ লীগ এতে অংশগ্রহণ করছে। একদল ক্যাথলিক যুবক রিপাবলিকান ইয়ুথ অফ ফ্রান্সের সঙ্গে একত্রিত হয়ে একশন কমিটির সভা ডাকছে বিভিন্ন কারখানায়। গভর্নমেন্টের যুদ্ধ পরিকল্পনাকে বানচাল করার চেষ্টা চলছে।

সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা বাড়ানো, আবার নতুন করে অস্ত্র শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদির ফলে শ্রমিকদের উপর ক্রমাগতই বেশি বোঝা চাপানো হচ্ছে। রাষ্ট্র পরিচালনা করার খরচের শতকরা ত্রিশ ভাগ অর্থাৎ সাত শত বিলিয়ন ফ্রাঁ এবছর সামরিক খাতে খরচ হল। তিন বছরের পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০০০ বিলিয়ন ফ্রাঁ যোগ দেওয়া হবে।

গভর্নমেন্ট এই খরচটা মুদ্রাস্ফীতি করে বা ট্যাক্স চাপিয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে আদায় করবে। মুদ্রাস্ফীতির অর্থ হচ্ছে মূল্যমান বেড়ে যাওয়া, কারণ আমেরিকার লোকেরা কাঁচামাল হস্তগত করে ফেলছে। দাম বাড়ানো সত্ত্বেও মুদ্রাস্ফীতিতে জীবনযাত্রার মান নেমে যাবে। জেনারেল কনফেডারেশন অফ লেবার দাবি তুলবে দাম কমানোর জন্য।

আমাদের জাতীয় অর্থনীতি এখন যুদ্ধের উপর ভিত্তি করে থাকার দরুন উৎপাদন কমে যাচ্ছে, যুদ্ধের জন্য লাগবে না এমন নতুন শিল্প গড়ে উঠছে না। বেকার সমস্যা এখনি বহু শ্রমিককে বিপন্ন করছে—পুনর্বাসনের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার দরুন বহু শ্রমিককে বিশেষ করে মিস্ত্রী শ্রেণির শ্রমিককে তার ফল ভুগতে হচ্ছে।

রুরের শিল্পপতি এবং আমেরিকার মহাজনরা মার্শাল প্ল্যানের খারাপ দিকটা আরও চালু করবে। এই অবস্থায় শ্রমিকদের দাবি আদায়ের লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যাবে। কমিউনিস্ট-দের কর্তব্য হবে জনসাধারণকে বোঝানো যে তাদের দারিদ্র্যের মূলে রয়েছে গভর্নমেন্টের যুদ্ধনীতি। শান্তি এবং মুক্তির আন্দোলনের সঙ্গে আশু দাবির লড়াই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

১১ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার টাইমস পত্রিকা লিখেছিল, ফ্রান্সে সাম্যবাদ দুই বৎসর আগে যেমন শক্তিশালী ছিল আজও তেমনি রয়েছে। এইজন্য আমেরিকার সামরিক বিভাগের শীর্ষস্থানীয়দের কাছে ফ্রান্স এখনো অজানা ভয়ের রাজ্যই রয়ে গেছে।

এই স্বীকৃতিটা লক্ষ্য করবার মত। কমিউনিস্ট পার্টির সম্মান এবং প্রভাব জনসাধারণের উপর কমছে না। ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব এবং কাজ আমেরিকার সামরিক শীর্ষস্থানীয়দের হিসাবের পরিপন্থী—অর্থাৎ সোভিয়েত বিরোধী অভিযান করার সঙ্গে তার মূল বিরোধ আছে।

এটা আমাদের গৌরবের বিষয় যে আমরা জনসাধারণের ভিতরে শত্রুর বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগাতে পেরেছি। যুদ্ধলিপ্সুদের প্রতি ঘৃণা জনসাধারণের মধ্যেকার আত্মবিশ্বাসকে দৃঢ়তর করে। শ্রমিকরা উপলব্ধি করেন যে যুদ্ধলিপ্সুরা কমিউনিস্ট পার্টির উপরে আঘাত হানতে চায়। যারা শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করতে চায়, যারা প্রতিরোধ করতে চায় তাদের আঘাত হানে এইজন্য যাতে বেশি বেশি করে শোষণ চালানো যায়—শ্রমিকদের নতুনভাবে যুদ্ধে নামানো যায় এরা চেষ্টা করে তারই।

আমেরিকার ও পাশ্চাত্যের নাম-কা-ওয়াস্তে গণতন্ত্র যেভাবে ফ্যাসিবাদে পরিণত হচ্ছে জনসাধারণ তাকে রুখবেই, এই প্রচণ্ড ধরনের দমননীতির বিরুদ্ধে যাবেই। প্রচারের দিকে আমাদের আরও বেশি মনোযোগ দিতে হবে। যুদ্ধবাদীদের মিথ্যার মুখোশ খুলে ধরতে হবে। সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে অনেক সুবিধা রয়েছে। সংবাদ বিকৃত করার জন্য তারা টাকা খরচ করে লক্ষ লক্ষ, হিটলারের যুগে যে ধরনের মিথ্যা প্রচার করা হত সেই ধরনের মিথ্যা প্রচার চলে রেডিয়োর মারফৎ। ক্ষয়িষ্ণুসাহিত্য আর যেসব অশ্লীল ও দুর্নীতিমূলক মার্কিন ছায়াছবি ভাল ছায়াছবিকে গ্রাস করে ফেলছে তাতে প্ররোচনা জোগানো হয় গুণ্ডামি, গুপ্তচরবৃত্তি আর যুদ্ধের। এইসবের বিরুদ্ধে শক্ত হাতে লড়তে হবে—আমাদের সম্ভাবনাগুলোর পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে, আমাদের দৈনিক, সাপ্তাহিক কাগজের প্রচার বাড়াতে হবে। 'লুমানিতে' ও 'ফ্রান্স নুভেল'-এর প্রচার লোকেদের বাড়িতে ও কারখানায় বাড়াতে হবে। সমস্ত ছোট ছোট নীচেকার সংগঠনকে ইস্তাহার বিলা করার দায়িত্ব দিতে হবে। মৌখিক প্রচার চালানোর কায়দাটাকে পাল্টাতে হবে। কয়েকটা সাধারণ সভায় নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। কারখানায় কারখানায়, গ্রামে গ্রামে প্রচার করার জন্য আমাদের রীতিমত বাহিনী গড়ে তুলতে হবে।

পার্টিকে তার সাংগঠনিক কাজ সর্বক্ষেত্রে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিতে হবে। নীচেকার পার্টি কমিটিগুলির দিকে নজর দিতে হবে, বিশেষভাবে তাদের উৎসাহ দিতে হবে। আশু দাবির ভিত্তিতে এবং শান্তির জন্য নতুন নতুন শক্তি এসে সমবেত হচ্ছে। পার্টির প্রতি অনুরক্ত নতুন যুবক এবং মহিলা কমরেডদের তৈরি করতে হবে যাতে তারা উৎসাহিত হয়, তাদের দায়িত্বশীল পদে বসাতে হবে, সাহস দিতে হবে।

সমালোচনা এবং আত্মসমালোচনা চালাতে হবে। দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেসে এই উদাহরণ স্থাপন করা হয়। পার্টি কর্মীদের এবং সভ্যদের আদর্শগত শিক্ষার মান দ্বিগুণ উঁচু করতে হবে। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের নীতিকে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণির নেতা আমাদের প্রিয় মহান ষ্ট্যালিন যে রকম গভীরভাবে বুঝিয়েছেন এবং সম্প্রসারণ করেছেন তা শিখতে হবে।

সর্বশেষে আমাদের মধ্যে গুপ্তচর ঢোকানোর জন্য যে চেষ্টা শত্রুরা করছে তার প্রতি কঠোর বিপ্লবী দৃষ্টি প্রত্যেকটি পার্টি সভ্যের ও কর্মীর আরো তীক্ষ্ণ করতে হবে এবং প্ররোচক ও গুপ্তচরদের মুখোশ খুলে ধরতে হবে। কমরেড লোহোট-এর জীবনের ওপর যে আক্রমণ এসেছিল সেই ধরনের ঘৃণ্য আক্রমণ থেকে সক্রিয় কর্মীদের রক্ষা করতে হবে। এই সমস্ত ফ্যাসিস্ট গুণ্ডাদের আক্রমণের হাত থেকে পার্টি, ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমিতিগুলোকে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোকে এবং শ্রমিক শ্রেণিকে রক্ষা করতে হবে।

আমরা যে বিরাট লড়াইয়ের পুরোভাগে রয়েছি তা আমাদের সন্তানদের, আমাদের দেশ এবং সমগ্র মানবতার ভাগ্য নির্ধারণ করবে। আসুন প্রত্যেকে জোর কদমে উৎসাহ নিয়ে এগোই। জনসাধারণের বর্তমান অগণিত শক্তি, গণতন্ত্রের ও শান্তির শক্তি ফ্যাসিবাদকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করবে। জীবন জয় করবে মৃত্যুকে। আমরা দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে শান্তি ও জাতীয় মুক্তির লড়াইয়ে নামব।

[ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ তারিখের বর্ধিত সভায় প্রদত্ত রিপোর্ট হইতে।—'ফর এ লাস্টিং পীস, ফর এ পিপলস ডেমোক্রেসী' পত্রিকার ৪০ (১০০) সংখ্যা, ৬ই অক্টোবর, ১৯৫০।]

(গ) জনগণের শান্তি স্বাধীনতা ও মঙ্গলের জন্য

পালমিরো তোগলিয়াত্তি

ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক

ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক এবং নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট প্রস্তাব করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, ১৯৫১ সালের জানুয়ারি মাসে পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে।

ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবার পর থেকে, জনগণের গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সাহায্যে কমিউনিস্ট এবং তাদের সমর্থকগণ অগ্রগতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। এই অগ্রগতিকে রোধ করা শত্রুদের পক্ষে খুবই কষ্টকর এমন কি অসম্ভব হয়ে পড়ে।

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হামলার বিরুদ্ধে সংগ্রামের এই জটিল পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টি এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলি যোগ্য প্রতিপন্ন হয়। অত্যাচার, বিভেদের প্রচেষ্টা এবং কতগুলো জায়গায় এই প্রচেষ্টা সফল হলেও, রাজনৈতিক এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রামের নেতৃবৃন্দ বা সমগ্র শ্রমিক শ্রেণির ভিতরেও কোন জঙ্গী সাহসের অভাব দেখা যায়নি।

বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শাসক শ্রেণি এবং তাদের তাঁবেদারদের প্রাধান্য ধীর কিন্তু নিশ্চিন্তভাবে ভেঙে পড়ছে, তার ফলে তাদের দলের ভিতর সংশয় এবং প্রবল অনিশ্চয়তা দেখা যাচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে, ঘটনার স্রোত জনতার এক বিরাট অংশের ভিতর সরকারি নীতির নির্ভুলতা সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি করছে। ১৯৪৮ সালের ১৮ই এপ্রিলের নির্বাচনের সময় থেকে শাসক শ্রেণি ইতালির শান্তি, সামাজিক স্থৈর্য, শৃঙ্খলা এবং পুনর্গঠন সম্পর্কে যে নিশ্চয়তা দিয়েছিল সে সম্পর্কে জনগণের সন্দেহ জাগছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে, ইতালিতে আজ তিনটি প্রধান প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, শান্তির সমস্যা, অর্থাৎ ইতালিয় জাতির বৈদেশিক নীতি; জনতার মঙ্গল, সে সম্পর্কে স্থিরতা, অগ্রগতি ও নিশ্চয়তা এবং গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা।

এক

শান্তির সমস্যা সম্পর্কে, কোরিয়ার সংঘর্ষের উপরেই সাধারণ দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছে। এই সমস্যার দরুনই দুটি জরুরি এবং সংশয়জনক প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। জনতার ভিতর যে দল সরকারি নীতির বিরোধী শুধু তারাই নয়, সকলেই আজ প্রশ্ন তুলছে কোন্ পথে ইতালির নেতৃবৃন্দ তাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে। প্রথম থেকেই আমরা বলে আসছি যে, কোরিয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এশিয়ার জনগণের স্বাধীনতা ও মুক্তির বিরুদ্ধে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের প্রকাশ্য আক্রমণ। আমরা আরও বলেছিলাম, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে 'শীতল যুদ্ধের' নীতির স্তর থেকে এখন 'গরম যুদ্ধের' স্তরে চলে যাচ্ছে। কোরিয়ার সংঘর্ষের ভিতর আমেরিকার এই নীতির প্রবর্তকদের উপরোক্ত উদ্দেশ্য লুক্কায়িত রয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো এবং জনগণের বিরুদ্ধে যথাশক্তি নিয়োগ করে সমগ্র প্রতিক্রিয়াশীল ফ্রন্ট সংগঠন করা। তথাকথিত পশ্চিমী জগৎ—এবং সারা বিশ্বকেই তারা গুরুতরভাবে বিভক্ত করার পথে

নিয়ে যাচ্ছে, তারই ফলে নতুন যুদ্ধের গহ্বরের ভিতর টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—কোরিয়া সংঘর্ষের ভিতর নেতৃবৃন্দের এই প্রচেষ্টা গোপন রয়ে গেছে।

ঘটনাবলী প্রমাণ করছে—দিনের পর দিন আমাদের নীতির যাথার্থ্য আরও বেশি প্রমাণিত হচ্ছে। কোরিয়াতে মনে হচ্ছে যেন, সামরিক কাজের ধারা পরিবর্তিত হচ্ছে। সামরিক কার্যকলাপের ভিতর থেকে ঘটনার সূত্রপাত হয়, কোরিয়ার জনগণ জয়লাভ করে, আমেরিকান আক্রমণকারীদের অবস্থা বিপর্যয় ঘটে। তখন আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের অধিকতর শক্তিশালী সৈন্যদল অংশগ্রহণ করে। তার ফলে, কোরিয়াবাসীদের সাম্রাজ্যবাদী সেনাদলের শোচনীয় চাপ সহ্য করতে হচ্ছে। কিন্তু কোরিয়ার জনগণ বীরত্বের সঙ্গে এখনও প্রতিরোধ চালাচ্ছে। আমাদের দলিল পত্রাদি এবং আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে কোরিয়ার জনগণ বিশেষত কোরিয়ার গণতান্ত্রিক রিপাবলিক যুদ্ধ চায় নি, এবং সে সম্পর্কে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই। প্রতিক্রিয়াশীল আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের তাঁবেদারদের হাত থেকে ঐক্য, স্বাধীনতা এবং মুক্তির সমস্যায় কোরিয়াবাসী শান্তিপূর্ণ সমাধান চেয়েছিল। ইতালির জনগণের সবচাইতে ভাল অংশের ভিতর এইসব দলিল পত্রাদির সাহায্যে গভীর ধারণা এবং স্থির মত জন্মেছিল যার ফলে তারা সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করেছে।

এর উপর আবার কোরিয়ার সংঘর্ষ বৃদ্ধি পাবার ফলে, বিশ্বের জনগণের মতামত চূড়ান্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। কে আজ শান্তির প্রয়াসী, কারা এই শান্তিরক্ষার জন্য চেষ্টা করছে? কারা আজ যুদ্ধ চায়, যুদ্ধের উস্কানি দিচ্ছে এবং বিশ্বকে যুদ্ধের গহ্বরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে? কোরিয়ার সংঘর্ষ শুরু হবার সাথে সাথে, আমরা দেখেছি কিভাবে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি, দালাল এবং তাঁবেদারগণ যুদ্ধের উম্মাদনা সৃষ্টি করেছিল, যার ফলে মনে হয়েছে যেন আমরা একটা আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছেছি। আমরা তখন সতর্ক করেছিলাম যে এটা এত সহজ নয়। কারণ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ, যারা নির্লজ্জভাবে এবং নিয়মিতভাবে যুদ্ধের উপর বাজি ধরেছে, তারা আজ বাধা পাচ্ছে তাদের কাছ থেকে যারা জানে যে শেষ পর্যন্ত শান্তিরক্ষা করা প্রয়োজন। আমি মনে করি কোরিয়ার ঘটনাবলী থেকে এই শিক্ষাই আমাদের দেশ এবং পৃথিবীর জনগণের গ্রহণ করা উচিত।

এক কথায়, কোরিয়া সংঘর্ষের সময়ে কারা সমাধানের প্রস্তাব দিয়েছিল? সে প্রস্তাব গ্রহণ করলে বহু আগে কোরিয়ার যুদ্ধ শেষ হয়ে যেতো। কারা যুক্তিপূর্ণভাবে কথা বলেছিল? যাকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দল বলা যায় না সেই ভারত সরকারের প্রস্তাব কারা গ্রহণ করেছিল? কারা শান্তির নীতি অনুসরণ করেছিল? তারা হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনের গণতান্ত্রিক রিপাবলিক। এই নীতির দ্বারা বিশ্বের জনগণের সামনে যে পথ খুলে দেওয়া হয়েছে, সেই পথ ধরে চললে ভয়াবহ সংকটজনক পরিস্থিতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভবপর হবে। কিন্তু আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের তাঁবেদারগণ এই পথ পরিত্যাগ করেছে, এই পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। সকলেই এ জিনিস চিনতে পেরেছে, বুঝতেও পেরেছে। এর অনিবার্য ও বহুদূরগামী ফল ফলবেই।

এ ছাড়াও, কোরিয়া সংঘর্ষের সময়ে শান্তির শক্তিগুলো দেখতে পেয়েছে যে তারা যতটুকু ভেবেছিলো তার চাইতে তারা অনেক বেশি শক্তিশালী। কোরিয়ায় সংঘর্ষ বাধবার

পরে, আমাদের দেশে পৃথিবীর সর্বত্র এটম বোমা নিষিদ্ধকরণের ভিত্তিতে স্টকহোম আবেদনে সই সংগ্রহের আশাতীত ফলাফলের কথাই শুধু উল্লেখ করছি না। আমি জাতিসংঘের সাম্প্রতিক দল গঠনের কথাও বলছি। সেখানে আমরা দেখেছি, বিশ্বের অধিকাংশ জনগণের যাঁরা প্রতিনিধিত্ব করেন, তাঁরা কোরিয়া সংঘর্ষের শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্পর্কিত ভারত সরকারের প্রস্তাব সমর্থন করেছেন।

ভারত সরকারের এই ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব দেওয়া সত্ত্বেও এবং সোভিয়েত ও সমস্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো সে প্রস্তাব গ্রহণ করলেও এবং যার ফলে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সর্বোচ্চ বাধাগুলো অতিক্রম করবার পথ পরিষ্কার হত, তা সত্ত্বেও কোরিয়ার সংঘর্ষ রোধ করা সম্ভবপর হয়নি। কারণ হচ্ছে, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদারগণ তাদের সঙ্গে বহু তাৎপর্যহীন ক্ষুদ্র দেশগুলোকে জুড়ে দিয়েছিল, যারা খুব কম সংখ্যক লোকেরই প্রতিনিধিত্ব করে।

আমাদের শান্তির নীতির সফলতা সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং গণতান্ত্রিক দেশগুলোর শান্তির নীতির ধারাবাহিক চরিত্র সম্পর্কে আমাদের বিশেষ জোর দেওয়া উচিত ঃ সোভিয়েত ইউনিয়ন সমস্ত জনগণের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম চালাচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজদের মুখোশ খুলবার জন্য সংগ্রাম করছে এবং প্রত্যেকটি ঘটনার ভিত্তিতে শান্তিরক্ষার জন্য সবিশেষ পন্থা অবলম্বন করছে।

ইতালির জনগণ এই ঘটনা সম্পর্কে চিন্তা করছেন এবং যতদূর কল্পনা করা সম্ভব, তার চাইতে বেশিই ভাবছেন। সবচাইতে বেশি এই কারণেই যে, আমাদের সঙ্গে যাদের খুব কমই সামঞ্জস্য আছে তারাও ভাবছেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন সত্যসত্যই শান্তির নীতি অনুসরণ করছেন এবং বিশ্বশান্তির জন্য প্রচেষ্টা করছেন। কাজেই আমরা দেখছি শান্তির শক্তি বৃদ্ধি লাভ করছে। অপরদিকে, আবার, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ, তাদের দাস এবং তাঁবেদারগণ পরিষ্কারভাবে তাদের আক্রমণ বাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের পরিকল্পনার ভিতর বৃহত্তর উদ্দেশ্য আছে। যুদ্ধের ক্ষেত্র বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া এবং নতুন সংঘর্ষ সৃষ্টি করা, অন্য জনগণের বিশেষত ইউরোপের জনগণের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের নিছক এবং প্রকাশ্য হস্তক্ষেপ এবং তাদের আরও বিপজ্জনক নীতির দিকে তাদের ঠেলে দেবার একটা নতুন অবস্থার সম্মুখীন আমরা হয়েছি।

সারা পৃথিবীব্যাপী "সুরক্ষিত এলাকা" প্রতিষ্ঠিত করবার কথা আজ আমেরিকার কর্তৃপক্ষ বলছেন। তার অর্থ হচ্ছে, মুক্ত দেশগুলি যেমন সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন এবং জনগণের গণতান্ত্রিক দেশগুলি ঘিরে তারা তাদের সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন। সামরিক দিক দিয়ে বিশ্ব প্রভুত্ব বজায় রাখবার জন্য, আক্রমণাত্মক সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা তথাকথিত অতলান্তিক সৈন্যদল গঠনের কথা হচ্ছে। সমগ্র পশ্চিম ইউরোপকে যুদ্ধবাদী অর্থনীতির দিকে পরিচালনা করা হচ্ছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, পশ্চিম ইউরোপের জনগণকে আন্তর্জাতিক সংগঠনের দিকে টেনে নেবার প্রত্যক্ষ প্রস্তুতি চলছে।

এটা অবশ্য খুবই নিশ্চিত যে, এই ক্রমবর্ধমান আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ এবং পশ্চিম ইউরোপের জনগণের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রকাশ্য হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সেখানকার জনগণ এবং কিছু কিছু নেতৃবর্গও নতুনভাবে প্রতিরোধ করবার জন্য জেগে উঠবেন।

দুই

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, জার্মানীকে সশস্ত্রকরণ। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ নিতান্ত মূর্খের মত, কোন বাধা না মেনে চলছে। তারা ফরাসী, ব্রিটিশ এবং ইতালির জনগণের শোচনীয় অভিজ্ঞতার কথা ভুলে গেছে। সুতরাং, আমেরিকায় ইতালির বৈদেশিক মন্ত্রী নিতান্ত হাস্যাস্পদ উৎসাহ নিয়ে জার্মানীর ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ শাসিত এলাকাকে সশস্ত্রকরণের প্রস্তাব বিনা শর্তে সমর্থন করছেন, এবং সর্বোপরি এর ফলে ইতালির জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে এবং তাকে চেপে মারা হচ্ছে। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের নতুন আক্রমণাত্মক নীতি ইতালিতে প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছে তার প্রধান কারণ হচ্ছে, ইতালিতে মার্শাল প্ল্যানের নেতা আমেরিকাবাসী ডেটন্, আমাদের দেশের অর্থনৈতিক জীবন এবং নীতিতে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের সুযোগ পাচ্ছে। আমাদের সামনে আজ আবার সেই আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপ, যেটা আমাদের জাতীয় জীবনে যখন ফ্যাসিবাদী বৈদেশিক শক্তির সাহায্যের জন্য আমাদের দেশে খোলাখুলি ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল ঠিক সেই ধরনেরই হস্তক্ষেপ। এই হস্তক্ষেপের দ্বারা আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের বর্তমান সরকার ঔপনিবেশিক সরকার এবং যখন এটা বলি তখন আমরা এটাকে আমাদের জাতীয় সম্মান গভীরভাবে ক্ষুণ্ণ করা হয় বলে মনে করি।

আমরা এমন একটা হস্তক্ষেপের সম্মুখীন হয়েছি, যেটার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সম্পদের বেশ একটা বড় অংশ নিয়ে, দেশটাকে সশস্ত্রকরণের পথে নিয়ে যেতে বাধ্য করা, বিরাটভাবে সশস্ত্রকরণ, যার ফলে দেশের ব্যয়ভার এত বেড়ে যাবে, অথচ সেটা দেশের কোন শিল্পোন্নতির কাজে লাগবে না। এ সবকিছুরই উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের আরও বেশি পরাধীন করে তোলা, দেশের অর্থনীতিকে নতুন করে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়া এবং যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের যুদ্ধের পথে পরিচালিত করা।

সরকারের অর্থনৈতিক নীতির প্রশ্ন কেবল যে শান্তিপূর্ণ বৈদেশিক নীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তাই নয়, এটা আবার গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার উপর আক্রমণের সঙ্গেও যুক্ত। কোরিয়ার যুদ্ধ শুরু হবার পর এই আক্রমণ তীব্র হয়ে উঠেছে। এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে একযোগে আক্রমণ শুরু হবার সাথে সাথে কতগুলো বিশেষ আইন চালু করারও প্রস্তাব হয়েছে। আমাদের দেশের সমস্ত জেলাগুলোতে, গ্রামেই শুধু নয় শহরেও, এমন শাসনব্যবস্থার সম্মুখীন আমরা হয়েছি, যেটাকে গণতান্ত্রিক আইন বলা চলে না। এটাকে অবাধ পুলিশী স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থাই বলা চলে। এই সমস্ত ঘটনা একযোগে দেখলে বোঝা যায় যে, সরকার বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের নিকট আমাদের পদানত করবার ব্যবস্থা গ্রহণ করছে এবং এই ব্যবস্থা সমগ্র বিশ্বের শান্তির বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের ভিতর বিদেশীদের হস্তক্ষেপ, নিয়মিতভাবে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার উপর আক্রমণ ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ায় সরকার এবং শাসক শ্রেণির মুখোশ খুলে যাচ্ছে। দেশের ভিতর সাধারণ জনগণের মনে অনিশ্চয়তা, আশংকা এবং সংশয় সৃষ্টি হচ্ছে।

কাজেই যেকোন ইতালিবাসীর মনে আজ বিন্দুমাত্রও জাতীয় সম্মানের রেশ অক্ষুণ্ণ যাছে, সে আজ ডেটনের হস্তক্ষেপে বিস্ময় প্রকাশ না করে পারবে না। উদাহরণস্বরূপ নিরপেক্ষ প্রস্তাবের ভিত্তিতে কোরিয়া সংঘর্ষ সমাধানের প্রচেষ্টায়, আমেরিকান নীতির অস্বীকৃতি দেখিয়ে

দিয়েছে, কারা পরিষ্কারভাবে যুদ্ধ চায় এবং পৃথিবীকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। এরই ফলে জাতিসংঘের অবনতি ঘটেছে এবং এটা আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের হাতে যন্ত্রস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চীনের নেতৃবৃন্দ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের দালাল হতে রাজি নয় বলে, চীনের জনগণের রিপাবলিককে এই সংঘ থেকে বাদ দেওয়া, সাধারণ মানুষের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করতে বাধ্য যে জাতিসংঘের অবনতি ঘটেছে।

বিশেষভাবে ইতালির প্রশ্নে, এটা ভুললে চলবে না যে, আমাদের একটা গঠনতন্ত্র আছে; এবং বেশির ভাগ জনগণ বিশ্বাস করেন যে, গঠনতন্ত্রে যা লেখা আছে তার অন্তত কিছু অংশ কার্যে পরিণত হবে। ইতালির আইনবিদ্গণ তাঁদের বিবৃতিতে এই প্রশ্নই তুলে ধরেছেন এবং এর সমাধানের জন্যই আমরা সংগ্রাম চালাচ্ছি। এই সব ঘটনার দ্বারাই, বিরাট সংখ্যক জনগণের ক্রমবর্ধমান অবস্থা বিশ্লেষণ করা যায়। এর জন্য এবং আরও অন্যান্য কারণে পূর্বের ন্যায় কমিউনিস্ট বিরোধী আন্দোলনের আর সুযোগ হচ্ছে না এবং ক্রমশই এর তীক্ষ্ণতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

প্রধান এবং জরুরি বিষয়গুলো, যেমন শান্তি, শ্রমিক জনগণের মঙ্গল, স্বাধীনতা রক্ষা, ফ্যাসিবাদের মূলচ্ছেদ করা—এই সমস্ত বিষয়গুলোই আজ এত বেশি উদ্বেগের সৃষ্টি করছে, যার জন্য কমিউনিস্ট বিরোধী আন্দোলন দ্বারা এই সমস্ত প্রশ্নকে আর এড়িয়ে যাওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না।

তিন

এই পরিস্থিতিতে, সরকারি নীতির আমূল পরিবর্তনের দাবি আজ পূর্বের চাইতে অনেক বেশি জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। গতি ধীর হলেও স্থিরভাবে বিরাট জনগণের মনোভাব যেভাবে বাড়ছে, তার ফলে পরিবর্তন সফল হবার উপযোগী সন্তোষজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই বিরাট জনগণের ভিতর কাজ করে, সরকারি নীতির প্রতি তাদের বিরোধিতার মনোভাবকে উৎসাহ দিয়ে এবং বাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারলে, আমরা সফলতার সঙ্গে সরকারি নীতির বিরুদ্ধে প্রবল বাধা সৃষ্টি করতে পারব।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও কি আমরা এইভাবে সুফল লাভ করবার কাজে নিয়োজিত হতে পারব? আমি মনে করি, এটা আমাদের সাধ্যের অতিরিক্ত নয়, কারণ সরকারের নীতি একান্তভাবেই দেউলিয়া এবং তাদের নীতি যে জাতীয় স্বার্থের উপর ভিত্তি করে নয় এটার প্রমাণ এত সুস্পষ্ট, যার জন্য আমরা জনগণের বিভিন্ন অংশকে টেনে নিয়ে আসতে পারব। যারা ভিন্ন ধরনের বৈদেশিক নীতি চাচ্ছে, তাদের মতকে আমরা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে দিতে পারব।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং গণতান্ত্রিক দেশগুলো ইতালির জনগণকে আক্রমণ করতে চায় না। জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি পরস্পরের শ্রদ্ধা বজায় রেখে, তারা ইতালিতে অর্থনৈতিক সহযোগিতার নীতি চালু করা ছাড়া অন্য কোন নীতি চালু করতে চায় না।

বিশ্ব প্রভুত্বের জন্য আমেরিকার সংগ্রামের সঙ্গে, ইতালির জনগণের বিন্দুমাত্র স্বার্থও জড়িত নেই। বরং তারা দেখছে, যে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ অস্ত্র নিয়ে আজ তাদের শাসন কায়েম করতে যাচ্ছে তাদের সেই সংগ্রামের সঙ্গে তারা যেন জড়িত হয়ে না পড়ে। কারণ এই ধরনের সংগ্রামের ফলে আমাদের ভাগ্যে আসবে ধ্বংস এবং ক্ষতি। সর্বশেষে, সোভিয়েত

ইউনিয়ন আমাদের সীমান্ত আক্রমণ করবে এখনও এই মিথ্যা আশংকার উপর সরকারি নীতির ভিত্তি করাকে ইতালির জনগণ বাধা না দিয়েই পারবে না। এই নীতির দ্বারা আমেরিকার প্রসার লাভ করবার হীন উদ্দেশ্যকেই সাহায্য করা হচ্ছে। আমাদের জাতীয় অঞ্চলগুলো এবং সশস্ত্র সৈন্যদলকে আমেরিকার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করবার উদ্দেশ্যেই এই মিথ্যা নীতি চালু হচ্ছে। সরকার এই পন্থা অবলম্বন করার দরুন জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নতুন রক্তাক্ত, আন্তর্জাতিক সংকটে ইতালির জনগণকে টেনে নেবার একমাত্র বিপদের সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে।

এই তিনটি বিবৃতিই এমন অলঙ্ঘনীয় তথ্যের উপর রচিত, যার জন্য কমিউনিজম বা সোস্যালিজমের সঙ্গে সাধারণ মিল না থাকলেও এগুলো জনগণের সহানুভূতি এবং অনুমতি লাভ করবেই, কাজেই এই সহানুভূতির ক্ষেত্র বাড়িয়ে নিয়ে আমরা ইতালির বৈদেশিক নীতি পরিবর্তনের কাজে এগোতে পারি না কি? যে সমস্ত বন্ধু কমরেডগণ শান্তি আন্দোলন পরিচালনা করছেন, তাঁরা এই প্রশ্নের উপর বিশদভাবে বলতে পারবেন।

ইতালির যে সমস্ত জনগণ শান্তি চান এবং দেশকে ভালবাসেন তাঁদের আমি উপদেশ দিতে চাই, আপনারা শান্তি যোদ্ধাদের আন্দোলনে আরও বেশি বিশ্বাস রাখুন এবং এই আন্দোলনকে সাহায্য করবার জন্য ফিরে তাকান।

জনগণের ভিতর দৃঢ় সম্পর্কের নতুন ভিত্তির উপরেই শান্তি আন্দোলন আজ উন্নতি লাভ করবে। সাহসের সঙ্গে এই ভিত্তিকে আঁকড়ে ধরলেই শান্তি আন্দোলন আজ ইতালির জনগণ এবং অন্যান্য জনগণ যাদের বিরুদ্ধে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ আমাদের সমবেত করতে চায় এবং যুদ্ধে জড়াতে চায় এই উভয়ের সম্পর্কের ভিতর নতুন অবস্থার সৃষ্টি করবে। এইদিকে আমরা যে সফলতা লাভ করব, তার দ্বারাই নতুন বৈদেশিক নীতির ভিত্তি আমরা রচনা করতে পারব।

ইতালির শ্রমিক জনগণের অর্থনৈতিক অবনতি এবং ক্রমবর্ধমান বেকারি জীবনের দিকে লক্ষ্য করে, তোগলিয়াত্তি ঘোষণা করেন যে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে গঠনমূলক প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে। টাকা পয়সা, মূলধন খাটানো, রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা বিধান সংক্রান্ত প্ল্যান তৈরি করতে হবে। দেখতে হবে যাতে এলাকা অনুযায়ী নির্দিষ্ট শ্রেণির ন্যূনতম মজুরির পাকা ব্যবস্থা হয় এবং শ্রমিক জনতা যাতে অবস্থার উন্নতির দিকে যায় এবং আস্তে আস্তে সমগ্র দেশেরই যাতে উন্নতি হয়।

ইতালিয় রিপাবলিককে পুলিশী রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম সেরূপ শক্তিশালী হয়নি। গঠনতন্ত্রকে বিলোপ করবার জন্য যেকোন আপস প্রচেষ্টার মনোভাবকে আমাদের বাধা দিতে হবে। সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে বিরাট প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার সম্ভাবনা আমাদের দেশে বর্তমান রয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জনসমাবেশ সম্ভব এবং 'গঠনতন্ত্রকে কার্যকরী করা হোক' এই দাবিতেও সংগ্রাম চালান সম্ভব। নিঃসন্দেহে সফলতা লাভ করবার জন্য, সরকারি নীতির আমূল পরিবর্তন সাধন করবার জন্য, আমরা যে প্রশ্ন তুলে ধরেছি সেটা পুনরায় দৃঢ়ভাবে তুলে ধরা দরকার। যতদিন পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণি এবং এর অগ্রগামী পার্টিগুলো, জাতীয় জীবনে নেতৃত্বের ভিতর অংশগ্রহণ না করছেন, ততদিন পর্যন্ত একটি গণতান্ত্রিক শান্তি নীতি প্রতিষ্ঠা করা, সরকারের পক্ষে জনগণের মঙ্গলের জন্য উদ্বিগ্ন হওয়া বা জনগণের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা রক্ষা

হওয়া অসম্ভব। এটাই মূল প্রশ্ন, এবং সকল প্রশ্নের ভিতর প্রধান প্রশ্ন। বস্তুত, এই প্রশ্নের চারিধারেই এতদিনের সংগ্রাম পরিচালনা করা হয়েছে এবং এই সংগ্রাম চলতেই থাকবে। কারণ এই প্রশ্নের সমাধান হলেই মূল নীতির পরিবর্তন করা সম্ভব এবং তার ফলেই আমাদের দেশ বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

চার

কমিউনিস্ট পার্টি একটা বিরাট সংগঠিত, সক্রিয় এবং সৈন্যবাহিনীর মত সুশৃঙ্খল শক্তি। আমাদের সংখ্যার অনুপাত কিভাবে বেড়েছে, কর্মীর সংখ্যানুপাত কিভাবে করা হয়েছে, দেশ-ব্যাপী জনমত গঠনে আমাদের পার্টির আন্দোলন কিরূপ বেড়েছে তার দ্বারাই এই শক্তির পরিমাণ করা সম্ভব, শ্রমিক কৃষকের অস্তিত্ব বজায় রাখার সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টি কিরূপ উল্লেখযোগ্য সংগঠন এবং নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার দ্বারাই পার্টির শক্তি বোঝা যায়।

এই শক্তির চেতনা নিয়েই আমাদের কংগ্রেসের প্রস্তুতির দিকে অগ্রসর হওয়া দরকার, সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করব, কেন এই শক্তি থাকা সত্ত্বেও, এখনও আমরা দেশের রাজনৈতিক জীবন চূড়ান্তভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারিনি। এর কারণ আমাদের দুর্বলতা এবং সেই দুর্বলতার প্রতি আমাদের নজর দেওয়া দরকার।

সমস্ত নেতৃবর্গ পার্টির রাজনৈতিক কর্মপন্থা কিভাবে বুঝতে পারেন, তারা কিভাবে এই লাইন প্রকাশ করেন এবং এর প্রতি সমর্থন জোগাড় করেন তার দ্বারাই কেবল পার্টির রাজনৈতিক ঐক্য গঠন হয় না। বাস্তব কাজে তারা সেই কর্মপন্থা চালু করে, কিভাবে সমস্ত শক্তিগুলোকে কাজে লাগাতে পারেন তার দ্বারাই পার্টি ঐক্য গঠিত হয়। শ্রমিক শ্রেণির আশু দাবির ভিত্তিতে ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রাম এবং কেন্দ্র থেকে যখন কোন আন্দোলনের উদ্যোগ আসে তখন যদি আমরা পার্টির কার্যকলাপ পরীক্ষা করে দেখি, পার্টি কাজের ধারাবাহিকতা এবং সক্রিয় কর্মীর সংখ্যার দিকে নজর রাখি তাহলে এই সিদ্ধান্ত টানা যায় যে সক্রিয় কর্মী বাড়ানোর দিকে ঝোঁক এসেছে এবং সমগ্র পার্টিরই কাজের দিকে ঝোঁক বেড়েছে। কিন্তু যখন নিম্ন পার্টি সংগঠনগুলো—গ্রুপ, দল এবং ব্যক্তিগত কমিউনিস্টগণ দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ধরনের বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন কিছু নিষ্ক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ হচ্ছে, পার্টির নিম্ন কমিটিগুলোর রাজনৈতিক চেতনা দুর্ভাগ্যক্রমে নিতান্তই কম উন্নত ধরনের। স্থানীয় নেতৃস্থানীয় পার্টি মুখপত্রগুলো সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। সেখানকার রাজনৈতিক কাজের পরিবর্তে কখনও কখনও আমলাতান্ত্রিক ধরনের সম্মেলনের অনুষ্ঠান করা হয়। এবং তার ভিতর অবধি আলোচনা চলতে থাকে, কোন বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছায় না।

এই সমস্ত কারণ এবং অন্যান্য দুর্বলতার দরুন জনতার ভিতর আমাদের গতি খুবই দুর্বল। অনেকগুলো বিষয় যা আমরা পরিচালনা করতে পারতাম, সেগুলো আমাদের অলক্ষ্যেতে চলে গেছে অথবা হয়ত আমরা অবহেলা করেছি। বহু কমিউনিস্ট সক্রিয় নন। অনেক গণসংগঠন আছে, যার ভিতর কমিউনিস্ট নেই। গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর উন্নতি করবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, কিন্তু তার প্রতি নজর দেওয়া হয়না অথবা তাকে অবহেলা করা হয়।

সুতরাং, কমিউনিস্ট এবং সহানুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে প্রকাশ্য আলোচনা করা দরকার। তারা এখনও আমাদের নীতির ধারাগুলো বোঝেন না,

সেগুলোর সঙ্গে একমত নন, কিভাবে এই নীতি কার্যকরী করতে হবে সেটাও জানেন না। সেটা হচ্ছে, প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া, গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর সাহায্যে একটা ফ্রন্ট গঠন করা এবং শ্রমিক শ্রেণি ও তার অগ্রদূতকে এর পুরোভাগে স্থান দেওয়া। সুতরাং, আজ পার্টির ভিতর রাজনৈতিক এবং তাত্ত্বিক কাজের উন্নতি কবা প্রয়োজন এবং আমাদের কাজের জন্য বিশদভাবে নেতৃত্ব গড়ে তোলার কাজে যথাসাধ্য চেষ্টা করা প্রয়োজন।

ইতালির সমস্ত জনগণকে আমাদের দেখান দরকার যে, জাতীয় মুক্তির কর্মসূচি কার্যকরী করার জন্য শক্তিগুলো ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব। শ্রমিক শ্রেণি হচ্ছে এর প্রধান শক্তি এবং নেতৃত্বের কাজ সফল করবার জন্য সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর সামনে শ্রমিক শ্রেণিকে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে।

নিঃসন্দেহে, ইতালিতে শ্রমিক শ্রেণিব ঐক্য গঠনের কাজ অন্য দেশের তুলনায় ভালভাবেই চলছে। কারণ সোস্যালিস্ট পার্টি, যাদের সঙ্গে আমাদের ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতা আছে, তারা এবং আমাদের মধ্যে যুক্ত কাজ করার জন্য স্থায়ী চুক্তি আছে। বর্তমানে শ্রমিক শ্রেণি, গণতন্ত্র এবং শান্তির উপর যে বিপদের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, তারজন্য অনেক বেশি সংখ্যক ইতালিয় শ্রমিক এই ঐক্য রক্ষা করবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে, যার দ্বারা তারা এই উলঙ্গ প্রতিক্রিয়া এবং যুদ্ধের রাস্তা বন্ধ করতে পারবে।

পার্টির সপ্তম কংগ্রেসের জন্য প্রস্তুতির আন্দোলন কেবলমাত্র পার্টির অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। এর সারবস্তু হবে কিভাবে পার্টি বিভিন্ন অঞ্চল, প্রদেশ, শহর, গ্রাম, ফ্যাক্টরি এবং কারখানাতে শ্রমিক শ্রেণি, মেহনতী জনগণ এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর ব্যাপক ফ্রন্ট গঠন করার কাজে সফল হতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনা। কতগুলো বিষয়ে আমাদের ব্যর্থতার কারণ, যে বাধাগুলোর সম্মুখীন আমবা হয়েছি সেই বাধাগুলি অতিক্রম করবার কাজগুলো সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা করতে হবে।

এইভাবে প্রস্তুতির কাজ চালিয়ে গেলে, সপ্তম পার্টি কংগ্রেস আমাদের পক্ষে বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হবে। আমরা অভ্যন্তরীণ ত্রুটিবিচ্যুতি অতিক্রম করে নতুন ধাপে এগিয়ে যাব, আমরা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের তাত্ত্বিক জ্ঞানলাভ করতে পারব, সংগ্রাম পরিচালনা করবার কাজে আমাদের সংগঠন এবং ব্যক্তিগত কমিউনিস্টদের শক্তি বাড়বে, শ্রমিক শ্রেণি এবং জনতার সঙ্গে আমাদের বন্ধন শক্তিশালী হবে—শুধু তাই নয়, আমরা গণতন্ত্র এবং শান্তিরক্ষার কাজেও এক ধাপ এগিয়ে যাব।

[ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় প্রদত্ত রিপোর্ট হইতে। "লাস্টিং পীস" পত্রিকার ৪২ (১০২) সংখ্যা, ২০শে অক্টোবর, ১৯৫০।]

(ঘ) মহান বিশ্ব জনসভার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত

বিশ্ব জনগণের ঐকান্তিক ইচ্ছা ঘোষণা করে বিশ্বশান্তি পরিষদ যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন সেই সব সিদ্ধান্ত বিশ্বের শান্তিরক্ষা ও সেই শান্তিকে সংহত করে তোলার জন্য দুনিয়ার প্রগতিশীল নরনারীর সংগ্রামের এক নতুন ও সবচেয়ে দায়িত্বপূর্ণ স্তরের সূচনা করেছে। এই

অধিবেশনে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য বিশ্বশান্তি পরিষদের আবেদন; তাছাড়া জাতিসংঘ সম্পর্কে, জার্মান, জাপানী ও কোরিয়ার সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্পর্কে, অন্যায়ভাবে চীনা গণরাষ্ট্রকে কোরিয়ার উপরে "আক্রমণকারী" বলে চিহ্নিত করে জাতিসংঘ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সেই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে, উপনিবেশ ও পরাধীন দেশসমূহে শান্তি সংগ্রাম সম্পর্কে, মাসিক পত্র "শান্তি" সম্পর্কে ও আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার সম্পর্কে, বিশ্বশান্তি পরিষদের পূর্বের প্রস্তাবসমূহ অনুমোদিত হয়েছে।

এইসব প্রস্তাব বাস্তব অবস্থার বিশেষ উপযোগী, তাছাড়া যখন আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে পরিচালিত বিভিন্ন ধনিক দেশের জনস্বার্থ বিরোধী গভর্নমেন্টগুলো তাদের আক্রমণাত্মক নীতির মারফৎ নতুন নতুন সামরিক সংঘর্ষ বাধার সম্ভাবনা পূর্ণ এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করতে চায় যে অবস্থার ফলে গোটা দুনিয়াটা আর একটা মহাযুদ্ধের অতল গহ্বরে ডুবে যাবার আশংকা আছে, তখন এইসব সিদ্ধান্ত সত্যিই একটা বিশ্ব জোড়া তাৎপর্য গ্রহণ করেছে। কোরিয়ার উপরে আমেরিকার ক্রমাগত বর্বর আক্রমণ, জার্মানী ও জাপানে নতুন সামরিক প্রস্তুতির উস্কানি; জাতিসংঘকে একটা সমানাধিকার ভোগী জাতিসমূহের সংগঠন থেকে একটা আক্রমণাত্মক যুদ্ধ প্রস্তুতির যন্ত্রে, আমেরিকানদের স্বার্থরক্ষার একটা সংগঠনে পরিণত করে ফেলা—এইসব ঘটনাবলী একই শৃঙ্খলের বিভিন্ন যোগসূত্র, যুদ্ধবাজদের আর একটা বিশ্বযুদ্ধ বাধাবার ষড়যন্ত্রের বিভিন্ন পদক্ষেপ। এই পরিস্থিতি শান্তি যোদ্ধাদের কাছে আরও গভীর কর্মৎপরতা দাবি করে।

বিশ্বশান্তি পরিষদের এইসব সিদ্ধান্তের অসীম তাৎপর্য শুধু এইটুকুই নয় যে এইসব সিদ্ধান্ত নির্মমভাবে জাতিসমূহের নিরাপত্তার পক্ষে আশংকাজনক সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণাত্মক নীতির মুখোশ খুলে দিচ্ছে; দুনিয়ার সমগ্র জনসাধারণ, অথবা কতগুলো দেশের জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে গৃহীত এইসব সিদ্ধান্তের প্রত্যেকটির ভিতরে যে কর্মসূচি রয়েছে সেই বাস্তব কর্মসূচির মারফৎ জনসাধারণ নিঃসন্দেহে নতুন যুদ্ধের উস্কানিদাতাদের দমন করতে সক্ষম হবে। এখানেই নিহিত রয়েছে বিশ্বশান্তি পরিষদের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সমাবেশ ও সংগঠন শক্তি।

বিশ্বশান্তি পরিষদ যে প্রধান ও সর্বোচ্চ কর্তব্য নির্দেশ করেছেন তা হল, বৃহৎ পঞ্চশক্তির ভিতরে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্য গণ-আন্দোলনকে সংগঠিত করে তোলা।

বিশ্বশান্তি পরিষদের আবেদনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

"বিশ্বযুদ্ধের আশংকা দেখা দেবার কারণ সম্পর্কে মতামত যাই হোক না কেন, সারা দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ মনে যে আশা পোষণ করে সেই আশা সফল করে তোলবার জন্য।"

"শান্তিকে শক্তিশালী করার জন্য ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষার জন্য।"

"আমরা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীনা গণরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স—এই বৃহৎ পঞ্চশক্তির ভিতরে একটা শান্তি চুক্তি সম্পাদনের দাবি করছি।"

"শান্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্য কোন বৃহৎ শক্তি যদি আলোচনা বৈঠকে সম্মিলিত হতে অস্বীকার করে তবে আমরা ঐ বৃহৎ শক্তির অস্বীকৃতিকে তার আক্রমণাত্মক মতলব বলে গণ্য করব।"

"শান্তি চুক্তির এই দাবি সমর্থন করবার জন্য আমরা দুনিয়ার সকল শান্তিকামী জাতিকে আহ্বান করছি আর এই শান্তি চুক্তি সম্পাদনের পথ সকল জাতির কাছেই খোলা রাখতে হবে।"

এই বিষয়টা হল জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যাপক একটা আন্তর্জাতিক জনমত সংগঠন করে তোলার সমস্যা। আজ দুনিয়ার যেসব শক্তি প্রধান দায়িত্ব বহন করে তাদের ভিতরে সকল দেশের কাছে উন্মুক্ত একটা শান্তি চুক্তি যাতে সম্পাদিত হয় তাই হল এর উদ্দেশ্য। সুতরাং এই সমস্যাটা হবে জনসাধারণের স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং আক্রমণ থেকে শান্তিকে বাঁচাবার জন্য নতুন একটা বিরাট অভিযানের পথে দ্রুত এগিয়ে যাবার পক্ষে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

কোন দেশে এমন কোন লোক নেই, কোন আদর্শ সম্পন্ন এমন কোন সংগঠনও নেই যে শান্তিরক্ষা করতে ব্যগ্র অথচ বিভিন্ন বৃহৎ শক্তির গভর্নমেন্টের শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য এই আবেদনে একমত নয়। প্রত্যেকটি লোক নতুন আর একটা যুদ্ধের আশংকা দেখা দেবার কারণ সম্পর্কে তার মতামত যাই হোক না কেন, এই আবেদনে স্বাক্ষর করে সে বিশ্বশান্তিকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে তার নিজ কর্তব্যই পালন করে।

বিভিন্ন বৃহৎ শক্তির ভিতরে একটা শান্তি চুক্তি করার এই দাবি যেকোন গভর্নমেণ্টই সমর্থন করতে অস্বীকার করুক না কেন, তার অর্থ হবে একটাই—আর একটা যুদ্ধ বাধাবার আকাঙ্ক্ষা এবং আক্রমণ ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতিতে বাধা পাবার ভয়। যেকোন গভর্নমেণ্টই একটা শান্তি চুক্তি সম্পাদনের আলোচনায় যোগদান করতে অস্বীকার করবে, সেই আলোচনাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করবে অথবা একটা মিথ্যা প্রচারের ব্যূহ রচনা করে তার পিছনে আশ্রয় গ্রহণ করবে, সেই গভর্নমেণ্টই দুনিয়ার সামনে নিজেকে একটা আক্রমণলিপ্সু গভর্নমেণ্টরূপে, একটা নতুন যুদ্ধের ঝুঁকি গ্রহণের জন্য উন্মুখ রক্তপিপাসু ও ধ্বংসকামী গভর্নমেণ্টরূপে নিজেই নিজের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে দেবে।

স্টকহোম আবেদনে স্বাক্ষর সংগ্রহের অভিযানের সফলতার ফলে শান্তি যোদ্ধারা তাদের সংগঠিত আন্দোলনের পক্ষে সমর্থক-সংখ্যা বহু গুণ বৃদ্ধি করতে, জনগণের ভিতরে ঘাঁটি বিস্তার করতে, শান্তি কমিটির একটা ব্যাপক ও শক্তিশালী জাল বিস্তার করতে ও এই আন্দোলনকে জনগণের শান্তির জন্য সংগ্রামে একটা চূড়ান্ত শক্তি হিসাবে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বশান্তি পরিষদের প্রথম অধিবেশন আরও বিকাশ লাভ করার জন্য শান্তি আন্দোলনের সামনে একটা নতুন ও বিরাট সম্ভাবনার পথ খুলে দিয়েছে।

শান্তি চুক্তি সম্পাদনের আবেদনে স্বাক্ষর সংগ্রহের আসন্ন অভিযান হবে পূর্বের স্টকহোম আবেদনে সহি সংগ্রহের অভিযানের গুরুত্ব থেকে কল্পনাতীত রূপে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শান্তি চুক্তির আবেদনের ভিতর দিয়ে জনসাধারণের অন্তর্নিহিত ও বিশেষ গভীর স্বার্থ এবং আশা আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে। আবেদনের উল্লেখযোগ্য সরলতা, সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা, সকল ধরনের ও সকল আকারের সংকীর্ণতার অভাব হেতু এই আবেদন প্রত্যেকটি সৎলোকের কাছে সহজবোধ্য ও গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। সকল দেশ ও সকল মহাদেশের কোটি কোটি মানুষ বিনা দ্বিধায় শান্তির জন্য সংগ্রামশীল জনসাধারণের বিশ্ব সভার এই ঐতিহাসিক আবেদনকে অভিনন্দিত করবে, এতে সানন্দে স্বাক্ষর দান করবে এবং তার মারফৎ যুদ্ধের উস্কানিদাতাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। বিশ্বশান্তি পরিষদ দুনিয়ার শান্তি আন্দোলন ও সকল দেশের শান্তি

কমিটি সমূহের সম্মুখে এই জরুরি কর্তব্যটি উপস্থিত করছে—এই আবেদনকে দুনিয়ার সকল মানুষের কাছে, প্রত্যেকটি ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দিতে হবে; যেসব মিথ্যা প্রচার এখনও জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে সেই মিথ্যার বেড়াজাল ছিন্নভিন্ন করে জনসাধারণকে তা থেকে মুক্ত করতে হবে; যুদ্ধবাজেরা যেসব বাধার প্রাচীর খাড়া করেছে, সেই সব প্রাচীর অতিক্রম করতে হবে। বিশ্বশান্তি পরিষদের এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত অস্ত্র সজ্জার বিরুদ্ধে, অবিলম্বে কোরিয়ার যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য, শান্তিপূর্ণ আলোচনার মারফৎ সকল বিরোধমূলক সমস্যার সমাধানের জন্য, বিভিন্ন বৃহৎ শক্তির ভিতরে একটা শান্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্য প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আহ্বান করছে। প্রত্যেকটি শ্রমিক, কৃষক, প্রত্যেকটি চিকিৎসক, শিক্ষক, কলা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের প্রত্যেকটি কর্মী, প্রত্যেকটি ইঞ্জিনীয়ার, যন্ত্রবিদ্, প্রত্যেকটি কারিগর, ব্যবসায়ী, সৈনিক, প্রত্যেকটি পদস্থ কর্মচারী, যেকোন ধর্মের প্রত্যেকটি প্রতিনিধি, যাদের কাছে তাদের সন্তানের জীবন বিশেষ মূল্যবান সেই মায়েরা, যারা শান্তির কামনা করে আর যুদ্ধকে এবং সভ্যতা ও মানবসংস্কৃতির অপমৃত্যু ও ধ্বংসকে ঘৃণা করে এই আহ্বান তাদের সবার অন্তরে সাড়া জাগিয়ে তুলবে।

সকল দেশের কমিউনিস্ট ও শ্রমিকের পার্টিসমূহ আজ যেমন শান্তি সমর্থকদের বিরাট বাহিনীর সম্মুখ সারিতে দাঁড়িয়ে লড়ছে, ঠিক তেমনি ভবিষ্যতেও তারা শান্তি সমর্থকদের সম্মুখ সারিতে দাঁড়িয়েই লড়বে; তারাই হবে এই বাহিনীর সবচেয়ে সক্রিয় অংশ, আজকের এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে, শান্তি অক্ষত রাখা ও তাকে সংহত করে তোলাই হবে তাদের প্রধান কাজ। কারণ, জনসাধারণের গভীর স্বার্থরক্ষা করাই তাদের একমাত্র কর্তব্য।

[বিশ্বশান্তি পরিষদের বার্লিন সম্মেলন সম্পর্কে "ফর এ লাষ্টিং পীস, ফর এ পিপলস্ ডেমোক্রেসী"-র সম্পাদকীয়, সংখ্যা নং ৯, ১৯৫১ সালের ২রা মার্চ]

(ঙ) শান্তি চুক্তি সম্পাদন সম্পর্কে বিশ্বশান্তি পরিষদের আবেদন

বিশ্বযুদ্ধের আশংকা দেখা দেবার কারণ সম্পর্কে মতামত যাই হোক না কেন, সারা দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ মনে যে আশা পোষণ করে, সেই আশা সফল করে তোলবার জন্য—

শান্তিকে শক্তিশালী ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষার জন্য—

আমরা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীনা গণরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন ও ফরাসী দেশ—এই বৃহৎ পঞ্চশক্তির ভিতরে একটা শান্তিচুক্তি সম্পাদনের দাবি করছি।

কোন বৃহৎ শক্তি যদি শান্তি চুক্তি সম্পাদনের আলোচনা বৈঠকে সম্মিলিত হইতে অস্বীকার করে তবে আমরা ঐ বৃহৎ শক্তির অস্বীকৃতিকে তার আক্রমণাত্মক মতলব বলে গণ্য করব।

শান্তি চুক্তির এই দাবি সমর্থন করবার জন্য আমরা দুনিয়ার সকল শান্তিকামী জাতিকে আহ্বান করছি আর এই শান্তি চুক্তি সম্পাদনের পথ সকল জাতির কাছেই খোলা রাখতে হবে।

আমরা এই আবেদনে আমাদের নাম যোগ করছি, আর শান্তিকে শক্তিশালী করতে চায় এ রকম সকল সৎ নরনারী ও সংগঠনকে এই আবেদনে স্বাক্ষর দেবার জন্য আহ্বান করছি।

(চ) বিভিন্ন প্রস্তাব

জাতিসংঘ সম্পর্কে প্রস্তাব

বিশ্বশান্তি পরিষদ লক্ষ্য করেছে যে জাতিসংঘ দ্বিতীয় বিশ্ব কংগ্রেসের আবেদনের কোন জবাবই দেয়নি, মনে হয় যেন, শান্তির সমর্থক কোটি কোটি মানুষের প্রতিনিধিদের দ্বারা পেশ করা প্রস্তাবসমূহের সঙ্গে জাতিসংঘের কোনই সম্পর্ক নেই।

এই আবেদন গৃহীত হবার পর থেকে জাতিসংঘের উপর জনসাধারণ যে আশা-ভরসা স্থাপন করেছিল তা জাতিসংঘ বরাবর বিফল করে দিয়েছে এবং জাতিসংঘ চীনকে "আক্রমণকারী" বলে দোষী সাব্যস্ত করে প্রস্তাব গ্রহণের মারফৎ এই বিফলতাকে চরম সীমায় পৌঁছে দিয়েছে।

জাতিসংঘ আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর দ্বারা ধারাবাহিকভাবে কোরিয়ায় বৃদ্ধ, নারী ও শিশু সহ প্রায় ১০ লক্ষ মানুষের হত্যা অনুমোদন করেছে, এই পৈশাচিক কাজকে জাতিসংঘের বিধিসঙ্গত ক্ষমতা দ্বারা আড়াল করে রেখেছে। কোরিয়ায় এই ১০ লক্ষ মানুষের প্রায় সবাই তাদের শহর ও গ্রামের ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে, না হয় পুড়ে মরেছে।

বিশ্বশান্তি পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে যে এইসব নেতাদের নিয়ে গঠিত একটা প্রতিনিধি দলকে জাতিসংঘের কাছে পাঠান হবে ঃ

মঁসিয়ে নেনি (ইতালি), মাদাম ইসাবেল ব্লুঁ (বেলজিয়াম), মাদাম ডেভিস (গ্রেট ব্রিটেন), মাদাম জেসি স্ট্রিট (অস্ট্রেলিয়া), মঁসিয়ে ডি' অ্যাসটিয়েব দ্য লা ভিগেরী (ফ্রান্স), মঁসিয়ে টিখোনভ (ইউ, এস, এস, আর), মঁসিয়ে উ ইয়াও-সুন (চীনা গণরাষ্ট্র), মঁসিয়ে হ্রোমাদ্‌কা (চেকোস্লোভাকিয়া), মঁসিয়ে ডি' আরবোসিয়ের (কালো আফ্রিকা), মঁসিয়ে নেরুদা (চিলি), মঁসিয়ে হারা (মেক্সিকো), পল রবসন ও আপহাউস (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র) ডাঃ অটল (ভারত)।

এই প্রতিনিধি দলকে জাতিসংঘের কাছে এই দাবি তোলবার ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে ঃ

(১) জাতিসংঘ বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের আবেদনের বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্পর্কে এবং বিশ্বশান্তি পরিষদের গত অধিবেশনের বিভিন্ন প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনা করুক ও প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর এর সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করুক।

(২) জাতিসংঘের সনদে (মূল দলিলে) এর যে ভূমিকার কথা বলা হয়ে ছিল, যেমন, জাতিসংঘ বিভিন্ন গভর্নমেন্টের ভিতরে একটা আপসের কেন্দ্র রূপে কাজ করবে, কোন প্রভুত্বকামী দলের যন্ত্ররূপে নয়—এই মূল ভূমিকাতেই জাতিসংঘ ফিরে যাক।

কোন উচ্চ আন্তর্জাতিক সংগঠন যাতে তাদের শান্তি অক্ষত রাখার পবিত্র কর্তব্যের প্রতি বিশ্বাসগাতকতা না করে তার নিশ্চয়তা সৃষ্টি করবার জন্য দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষের সতর্ক দৃষ্টি রাখার অধিকার আছে। বিশ্বশান্তি পরিষদের এই প্রচেষ্টা সেই কোটি কোটি নরনারীর সমর্থন নিঃসন্দেহে লাভ করবে।

জাপান সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্পর্কে প্রস্তাব

জাপানী জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জাপানের দখলকারী শক্তি এখন সেখানে যে যুদ্ধসজ্জা গড়ে তুলছে দ্বিতীয় বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে বিশ্বশান্তি পরিষদ তার তীব্র

নিন্দা করছে।

বিশ্বশান্তি পরিষদ মনে করে যে জাপানের অস্ত্র সজ্জা এবং নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ জাপানের সঙ্গে একটা শান্তি চুক্তি সম্পাদন সম্পর্কে জাপান এবং এশিয়া, আমেরিকা ও ওসিয়ানিয়ার (অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ) স্বার্থসংশ্লিষ্ট দেশসমূহে অবিলম্বে জনমত গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বিশ্বশান্তি পরিষদ জাপানের সঙ্গে পৃথক চুক্তি সম্পাদনের প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা করছে। পরিষদের মতে জাপানের সঙ্গে শান্তি চুক্তি এই দেশগুলোর ভিতরে একটা আলোচ্য বিষয় হওয়া চাই—চীন গণরাষ্ট্র, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট ব্রিটেন; এবং এইসব দেশের ভিতরে আলোচনার পরে সেই আলোচনার সিদ্ধান্ত অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট দেশসমূহের দ্বারা গৃহীত হওয়া চাই। শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করার পর অবিলম্বে দখলকারী সৈন্যবাহিনীকে সরিয়ে নিতে হবে। জাপানী জনসাধারণ যাতে গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে তার নিশ্চয়তা দিতে হবে।

গোপন অথবা প্রকাশ্য, সকল সামরিক প্রতিষ্ঠানকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করতে হবে এবং সকল শিল্পকে শান্তির ভিত্তিতে রূপান্তরিত করতে হবে।

বিশ্বশান্তি পরিষদ জাপানের শান্তির সমর্থকদের সহ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সকল শান্তির সমর্থকদের নিকট ভবিষ্যতের কোন তারিখে বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ায় শান্তিরক্ষার জন্য একটা আঞ্চলিক সম্মেলনে সম্মিলিত হবার জন্য আহ্বান করছে। সেই সম্মেলনে তারা জাপানী সমস্যার একটা নিশ্চিত সমাধান ও সেই সমাধানের মারফৎ দূর প্রাচ্যের যুদ্ধের গভীর আশংকা দূরীভূত করবার চেষ্টা করবে।

কোরিয়ার সমস্যাব শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্পর্কে প্রস্তাব

কোরিয়ার সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য বিশ্বশান্তি পরিষদ দাবি করছে যে অবিলম্বে সকল স্বার্থসংশ্লিষ্ট দেশসমূহের একটা সম্মেলন আহ্বান করা হোক।

আমরা সকল দেশের সকল শান্তিকামী জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে বলছি যে তারা যেন উক্ত সম্মেলন আহ্বানের প্রতি তাদের নিজ নিজ গভর্নমেণ্টের সমর্থনের জন্য দাবি করে।

বিশ্বশান্তি পরিষদ বিশেষ জোরের সঙ্গে এই দাবি উপস্থিত করছে যে অবিলম্বে কোরিয়া থেকে সকল বিদেশী সৈন্য অপসারিত হোক এবং এইভাবে কোরিয়ার জনসাধারণ যাতে নিজেরাই নিজেদের দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হোক।

জার্মান সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্পর্কে প্রস্তাব

যে জনসাধারণের পক্ষ থেকে চূড়ান্তভাবে জার্মানীর নিরস্ত্রীকরণের উপর জোর দিয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, আজ সেই জনসাধারণের নির্দেশ লঙ্ঘন করে আবার যুদ্ধলিপ্সুদের ও নাৎসী শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলা হচ্ছে। জার্মানীতে আবার সশস্ত্র শক্তি ও যুদ্ধ শিল্প গড়ে তোলার ভিতরেই রয়েছে নতুন একটা বিশ্বযুদ্ধের গভীর আশংকা।

বিশ্বশান্তি পরিষদ বিশেষ আনন্দের সঙ্গে জার্মানীর শান্তিকামীদের শক্তিবৃদ্ধি ও এসেন (Essen)-এর শান্তি কংগ্রেসের সফলতা লক্ষ্য করেছে। জার্মানীতে যে শান্তি সমর্থকগণ অন্যান্য শান্তিকামী ভাবধারার সঙ্গে মিলে জার্মানীর পুনঃসামরিক প্রস্তুতি ও শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর

সম্পর্কে জার্মান জনসাধারণের ইচ্ছার অভিব্যক্তি স্বরূপ জনমত সংগ্রহের আয়োজন করছে, বিশ্বশান্তি পরিষদ সেই শান্তি-সমর্থকগণের প্রতি অভিনন্দন জানাচ্ছে। উক্ত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের মারফতই জার্মানীর বর্তমানে আশংকাজনক অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটবে।

যে সকল জাতি জার্মানীর পুনঃসামরিক প্রস্তুতির ফলে সরাসরি বিপদের সম্মুখীন হয়েছে বিশ্বশান্তি পরিষদ সেই সব জাতিকে একটা প্রচণ্ড প্রতিবাদ আন্দোলনের ভিতরে সংঘবদ্ধ হতে আহ্বান করছে। বিভিন্ন দেশের কোটি কোটি নরনারী এই প্রতিবাদ আন্দোলনের ভিতর দিয়ে তাদের নিজ নিজ গভর্নমেণ্টকে এই বছরের ভিতরেই শান্তিকামী ও ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর সঙ্গে একটা শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করবে। আন্তর্জাতিক চুক্তির দ্বারা স্বীকৃত জার্মানীর নিরস্ত্রীকরণই ইউরোপের শান্তিরক্ষার সবচেয়ে ভাল গ্যারাণ্টি।

চীনা গণরাষ্ট্রকে অন্যায়ভাবে কোরিয়ায় "আক্রমণকারী" বলে দোষী সাব্যস্ত করে জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে প্রস্তাব

বিশ্বশান্তি পরিষদ দ্বিতীয় বিশ্বশান্তি কংগ্রেস দ্বারা গৃহীত আক্রমণের সংজ্ঞাটি আবার স্মরণ করছে ঃ "যে রাষ্ট্র প্রথমে, যেকোন কারণেই হোক না কেন, অন্য একটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগ করবে সেই রাষ্ট্রের পক্ষে আক্রমণ একটা বর্বর অপরাধ বলে গণ্য হবে", এবং জাতিসংঘের সাধারণ সভা চীনা গণরাষ্ট্রকে কোরিয়ার উপরে "আক্রমণকারী" বলে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সেই সিদ্ধান্তকে বিশ্বশান্তি পরিষদ অন্যায় ও আইন বিরুদ্ধ কাজ বলে ঘোষণা করছে।

এই সিদ্ধান্ত কোরিয়ার সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষে একটা বিশেষ গুরুতর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাছাড়া দূর প্রাচ্যে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বার ও তার মারফৎ একটা বিশ্বযুদ্ধ দেখা দেবার আশংকাও এই সিদ্ধান্তের ভিতরে নিহিত রয়েছে।

বিশ্বশান্তি পরিষদ দাবি করে যে অবিলম্বে জাতিসংঘ এই সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিক।

উপনিবেশ ও পরাধীন দেশসমূহে শান্তির সংগ্রাম সম্পর্কে প্রস্তাব

জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের উপর ভিত্তি করে রচিত জাতিসংঘের সনদে ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশসমূহে বহু উচ্চ আশা তুলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু এক্ষেত্রেও, অন্যান্য বিষয়ের মতই, উপদ্রব সৃষ্টি ও দমননীতি চালানোর একটা পর্দা হিসাবে কাজ করে এবং জনগণকে ঔপনিবেশিক দাসত্বের অবস্থায় ফেলে রাখবার ও তাদের উপর উৎপীড়ন চালাবার উদ্দেশ্য অনুসরণ করে জাতিসংঘ তার উপরে ন্যস্ত আশা ভরসা বিফল করে দিয়েছে।

এই অবস্থা নতুন একটা বিশ্বযুদ্ধের আশংকা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। যে প্রচারকার্য আর একটা বিশ্বযুদ্ধকেই ঔপনিবেশিক ও পরাধীন জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আদায় করবার পথ হিসাবে বর্ণনা করবার চেষ্টা করে বিশ্বশান্তি পরিষদ সেই প্রচারকার্যের তীব্র নিন্দা করে। বিশ্ব-শান্তি পরিষদ ঘোষণা করছে যে শান্তির জন্য সমগ্র জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই ঔপনিবেশিক ও পরাধীন জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আদায় করার সংগ্রামের চূড়ান্ত উপায়।

কোরিয়ার সংঘর্ষ, এশিয়ার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা (যেমন তাইওয়ান, ভিয়েতনাম,

মালয়) এবং জার্মান ও জাপানী সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব ও এশিয়া, আরবের কয়েকটি দেশ ও অন্যান্য শান্তিকামী দেশের শান্তির উদ্যোগ একদিকে যেমন শান্তিরক্ষা করতে সাহায্য করছে, তেমনি অন্যদিকে জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতেও সাহায্য করছে।

আক্রমণ, উৎপীড়ন ও তাদের স্বাধীনতা পিষে মারবার চেষ্টার বিরুদ্ধে; তাদের দেশগুলোকে আক্রমণাত্মক চুক্তির ভিতরে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টার বিরুদ্ধে; তাদের দেশ থেকে সামরিক উদ্দেশ্যে লোক সংগ্রহ করা, সেইসব লোকদের অন্য দেশের জনগণের উপরে আক্রমণের জন্য ব্যবহার করা ও তাদের দেশে বিদেশী সৈন্য বসিয়ে রাখার বিরুদ্ধে; তাদের দেশে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন ও তাদের দেশের কাঁচামাল আত্মসাৎ করার বিরুদ্ধে; তাদের দেশের সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যকে পদদলিত করার বিরুদ্ধে; বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতরে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশসমূহের জনগণের ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধই শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্য সাধনে তাদের স্বাভাবিক দান।

যে যুদ্ধ আজ সমগ্র মানবজাতিকে শংকান্বিত করে তুলেছে সেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে কাউকে বাদ না দিয়ে সকল জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রতি বিশ্বশান্তি পরিষদ অভিনন্দন জানাচ্ছে।

সাংগঠনিক প্রশ্ন ও শান্তি আন্দোলনের প্রসার সম্পর্কিত প্রস্তাব

বিশ্বশান্তি পরিষদের প্রথম অধিবেশন সাংগঠনিক প্রশ্ন ও শান্তি আন্দোলনের প্রসার সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। উহাতে বলা হয়—১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বার্লিনে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে বিশ্বশান্তি পরিষদ সন্তোষের সহিত দ্বিতীয় শান্তি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিতে গিয়া যে কাজ করা হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করে এবং ঐ সমস্ত প্রচেষ্টাকে আরো প্রসারিত করার প্রয়োজন অনুভব করে।

বিশ্বশান্তি পরিষদ সমস্ত জাতীয় কমিটিগুলিকে 'জাতিসংঘের প্রতি আবেদন' আরও তৎপরতার সহিত, আরও ব্যাপকভাবে প্রচার করিতে অনুরোধ করিতেছে। ঐ আবেদন প্রত্যেকটি জায়গায় পৌঁছানো উচিত, প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে জানানো উচিত। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে এই ব্যাপারে উদ্যোগ দেখাইতে বিশ্বশান্তি পরিষদ সকলকেই ডাক দিতেছে।

যুদ্ধ প্রচারের বিরুদ্ধে কয়েকটি দেশে যে আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে বিশ্বশান্তি পরিষদ ইহা সানন্দে লক্ষ্য করিতেছে।

জাতীয় কমিটিগুলিকে এই সম্পর্কে জনমত গঠিত করিতে হইবে যাহাতে এই ব্যবস্থাগুলির পিছনে জনসাধারণের ব্যাপক সমর্থন নিশ্চিতভাবে থাকে।

যে সমস্ত পুস্তক, লিখিত বিবৃতি, বক্তৃতা, ছায়াচিত্র, রেডিও বক্তৃতা প্রভৃতি মারফত যুদ্ধের আহ্বান দেওয়া হয় তাহাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করা ও বর্জন করার জন্য জনমত গঠন করিতে পরিষদ জাতীয় কমিটিগুলিকে ডাক দিতেছে।

জাতীয় কমিটিগুলিকে হাজার হাজার শুভবুদ্ধিপরায়ণ ব্যক্তির অংশগ্রহণ মারফত ব্যাপক ভিত্তিতে ব্যাখ্যামূলক আন্দোলন চালাইতে অনুরোধ করিতেছে। প্রত্যেক দেশে উহারাই যে মিথ্যাচার যুদ্ধপ্রস্তুতি করিতেছে অবিশ্রাম তাহার মুখোশ খুলিয়া ধরিবেন।

পরিষদ সেক্রেটারিয়েটের স্বত্বাধীনে ব্যুরোকে একটি সংবাদ সরবরাহ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিবার ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করিতেছে। ঐ বিভাগ যুদ্ধের উন্মত্ততা প্ররোচিত করার জন্য যে মিথ্যা ও বিকৃত সংবাদ সৃষ্টি করা হয় তাহার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিবার উপযোগী বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ ও তথ্য সরবরাহ করিবে।

দ্বিতীয় বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করিতে গিয়া অসংখ্য প্রতিষ্ঠান ও দলের সহিত যে সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে তাহা যে শান্তিরক্ষার আন্দোলনকে আরও বেশি সংগঠিত ও ব্যাপক করার পথ সুগম করিয়াছে বিশ্বশান্তি পরিষদ সানন্দে তাহা লক্ষ্য করিতেছে।

পরিষদ এই সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করিতেছে ঃ

(১) যে যে প্রশ্নে সম্ভব একমত হওয়ার জন্য একত্র কাজ চালানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের মঁদিয়ালিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালানো—পরস্পর পরস্পরের সম্মেলন ও কংগ্রেসে অংশগ্রহণে উৎসাহদান।

(২) যুক্ত কাজকর্মের অবস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'সোসাইটি অফ ফ্রেণ্ডস' যে সভার প্রস্তাব করিয়াছে, সমান সমান সংখ্যা অনুপাতে এবং দলিল ও প্রস্তাবের ভিত্তিতে উহা সংগঠিত করা বাঞ্ছনীয়।

(৩) ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিষদের বর্তমান অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব জানানো ও উহাদের ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। ব্যুরোর পক্ষ হইতে সভাপতি জোলিও কুরী দ্বিতীয় বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত প্রস্তাব জানাইয়া উচ্চতর ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিকে একটি পত্র দিয়েছেন। এই পত্রের অনেকগুলির উত্তরে এই সংবাদ জ্ঞাপনে যে আগ্রহের সঞ্চার হইয়াছে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

(৪) বিভিন্ন দেশে নিরপেক্ষতার পোষক ধারাগুলি যাহাতে কার্যত শান্তিরক্ষার জন্য সচেষ্ট হয় তাহার জন্য উহাদের সহিত যোগাযোগন স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন।

(৫) প্যাসিফিস্ট আন্দোলন ও অন্যান্য দলগুলির সহিত সহযোগিতার পথ ও উপায় অনুসন্ধান। উহার ফলে শান্তির আদর্শই পরিপুষ্ট হয়।

বিভিন্ন দেশের জনমতের সত্যকার প্রতিনিধিগণ যাহাতে মতামত লেনদেন ও একযোগে বিশ্বশান্তির স্বার্থে কোন কোন সমস্যা সমাধান করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন করিবার উদ্যোগ ও প্রস্তাব বিশ্বশান্তি পরিষদ সাগ্রহে লক্ষ্য করিতেছে। ঐ সম্মেলনগুলি নতুন সংযোগ স্থাপন ও শান্তি সমর্থকদের আন্দোলনকে আরো প্রসারিত করার সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করিয়া তুলিবে।

এই ব্যাপারে শান্তি পরিষদ

(১) যেসব ইউরোপীয় দেশের সরকার অতলান্তিক চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে "জার্মান পুনরস্ত্রীকরণের বিরুদ্ধে ফ্রান্স বেলজিয়াম কমিটি" কর্তৃক অদূর ভবিষ্যতে প্যারিসে বা ব্রুসেল্‌সে তাহাদের জনগণের একটি সম্মেলন আহ্বান অনুমোদন করিতেছে। ঐ সম্মেলনের উদ্দেশ্য থাকিবে জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও জার্মান সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রশ্ন পর্যালোচনা।

(২) এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের দেশগুলির এক সম্মেলনের প্রস্তাব অনুমোদন করিতেছে। ঐ সম্মেলনের উদ্দেশ্য হইবে প্রধানত জাপানের পুনরস্ত্রীকরণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম,

বর্তমান সংগ্রামের শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রশ্ন আলোচনা এবং জাপানের পুনরস্ত্রীকরণ ও এই বৎসর জাপানের সহিত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে গণভোট গ্রহণ।

(৩) প্রস্তাব করিতেছে যে ব্যুরোর উচিত এই আঞ্চলিক সম্মেলনগুলিকে সমর্থন জানানোঃ (ক) নিকট প্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার দেশগুলি। (খ) স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলি।

(৪) সেক্রেটারিয়েটকে এইসব জায়গায় ঐ ধরনের সম্মেলন আহ্বানের প্রশ্ন বিবেচনা করিতে অনুরোধ জানাইতেছে (ক) কৃষ্ণ আফ্রিকার দেশগুলি, (খ) উত্তর ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি (এই সম্মেলন অগস্ট মাসে মেক্সিকোতে ডাকা চলিতে পারে)।

সংশ্লিষ্ট দেশগুলির জাতীয় কমিটিগুলিকে বিশ্বশান্তি পরিষদ ঐ সম্মেলনগুলির সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য যতদূর সম্ভব সচেষ্ট হইতে আহ্বান জানাইতেছে।

১৯৫১ সালের গ্রীষ্মকালে বিশ্বশান্তি পরিষদ সোভিয়েত ইউনিয়নে একটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলন আহ্বান করিবে। উহাতে অর্থনৈতিক সংযোগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতির উদ্দেশ্যে মিলিত হইবেন সব দেশের অর্থনীতিবিদ, যন্ত্রবিশেষজ্ঞ, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও ট্রেড ইউনিয়নপন্থী।

সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় হইবে এইরূপ ঃ

(ক) বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সম্ভাবনা।

(খ) দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের উন্নতি সাধনের সম্ভাবনা।

সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে দ্বিতীয় বিশ্ব কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্বশান্তি পরিষদ প্রস্তাব করিতেছে যে, ফ্রান্স ও ইতালির খ্যাতনামা চিকিৎসকদের প্রস্তাব অনুযায়ী চিকিৎসক সম্মেলন সংগঠিত করিতে ব্যুরোর সর্বতোভাবে সাহায্য করা উচিত। এই বছরে ইতালিতে ঐ সম্মেলন ডাকা নির্দিষ্ট হইয়াছে। জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থার উপর যুদ্ধ প্রস্তুতির মারাত্মক ফলাফলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সমস্যাই উহার বিচার্য বিষয় হইবে।

সেক্রেটারিয়েটকে লেখক, অভিনেতা, বৈজ্ঞানিক ও ছায়াচিত্র কর্মীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন সংগঠিত করার ব্যাপারে বিচার করিয়া দেখিবার ও উহাতে সাহায্য করিবার অধিকার দেওয়া যাইতেছে। ঐ সম্মেলনগুলি শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ ও আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সম্পর্কিত প্রশ্ন আলোচনা করিবে।

লেখক ও শিল্পীদের ১৯৫১ সালেই এক সম্মেলন করিতে হইবে।

বিশ্বশান্তি পরিষদ প্রস্তাব করিতেছে যে, ভবিষ্যতে সেক্রেটারিয়েটের উচিত শিক্ষক, সাংবাদিক, খেলোয়াড় ও অন্যান্যদের সম্মেলন আহ্বানের ব্যাপারে সাহায্য করা।

পরিষদ প্রস্তাব করিতেছে যে, বার্লিনে ১৯৫১ সালের ৫ই হইতে ১৯শে অগস্টের মধ্যে যুব ও ছাত্র সংগঠনগুলির উদ্যোগে শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে যে "বিরাট বিশ্বব্যাপী উৎসব" হইবে তাহাতে কিভাবে সাহায্য করা যাইতে পারে সে বিষয়ে চিন্তা করা হউক।

বিশ্বশান্তি পরিষদ আপন আয়ত্তাধীনে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য একটি আন্তর্জাতিক কমিশন নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতেছে। ঐ কমিশন মাঝে মাঝে ডাকা হইবে। শান্তির আদর্শ শক্তিশালী করা এবং পরস্পরের মধ্যে পুস্তকাদি ও সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীর বিনিময় করার

উদ্দেশ্যে যতদুর সম্ভব পারস্পরিক ভাবে দেশ ভ্রমণের জন্য পরিষদ প্রত্যেকটি জাতীয় কমিটিকে অবিলম্বে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের কমিশন গঠন করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।

শান্তির স্বপক্ষের ছায়াচিত্রগুলিকে উৎসাহ দান উহাদের উৎপাদন ও প্রচারের যথাযথ ব্যবস্থা এবং যে ছায়াচিত্র যুদ্ধের প্রচার চালায় সর্বতোভাবে তাহার ব্যবহারের স্বরূপ প্রকাশ করা—এই কাজের জন্য পরিষদ ব্যুরোরে একটি ছায়াচিত্র কেন্দ্র গঠনের প্রশ্নটি বিচার করিয়া দেখিতে নির্দেশ দিতেছে।

পরিষদ অনুরোধ জানাইতেছে যে সেক্রেটারিয়েট সম্ভাব্য সকল উপায়ে চেষ্টা করুক যাহাতে নিশ্চিতভাবে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলির সভ্য সমস্ত শান্তিকামী বৈজ্ঞানিকেরা ঐ প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এই অনুরোধ জানান যে তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা হউক।

সমস্ত জাতীয় কমিটিগুলির প্রতি পরিষদ আবেদন জানাইতেছে যেন উহারা বিশ্বশান্তি তহবিলের জন্য অর্থসংগ্রহের সম্পর্কে সর্বাধিক নজর দেন। এই অর্থসংগ্রহ আন্দোলনের সাফল্য শান্তির আদর্শের প্রতি জনসাধারণের আনুগত্যের আরও একটি নিদর্শন হইবে।

আরো বেশি কার্যকরীভাবে আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করিতে ইহা আমাদের সহায়তা করিবে।

এইসব ব্যবস্থাগুলি আমাদের আন্দোলনের প্রসারকে আরো কার্যকরিভাবে সাহায্য করিবে। ইহা করতে হইবে ঃ

যে সিদ্ধান্তগুলি শান্তিসমস্যা সম্পর্কে আমাদের মনোভাব নির্দিষ্ট করে তাহার ভিত্তিতে;

প্রত্যেক জেলার জনসাধারণের সমস্ত অংশের মধ্যে ব্যাপক প্রচার আন্দোলন মারফত এই আন্দোলন অবাধ ও আন্তরিক আন্দোলন এবং শান্তিরক্ষার জন্য একত্র কাজকর্ম করার ভিত্তি জোগাইবে।

(ছ) শান্তি চুক্তির স্বপক্ষে

বিগত কয়েক দশকে দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের যে দুঃখ, কষ্ট ও বিভীষিকার অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার ফলে সকল দেশের ব্যাপক জনতার মধ্যে শান্তির জন্য অক্ষয় আগ্রহ উদ্দীপিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও পরিষ্কার যে সময়মত এই নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের যদি রোধ করা না যায়, তাদের জঘন্য চক্রান্তকে যদি ব্যর্থ করা না যায়, তাহলে তা নতুন যুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে আসার সামিলই হবে।

জনসাধারণের শান্তি ও নিরাপত্তার এক গভীর বিবাদের মুখোমুখি আজ মানবসমাজ দাঁড়িয়ে আছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা কোরিয়ার জনসাধারণের বিরুদ্ধে এক অন্যায় যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে এবং চীনের ভূখণ্ড তাইওয়ান দ্বীপ দখল করেছে। তারা নিজেরা এবং তাদের আদেশে চালিত 'মার্শালী' সাহায্যপুষ্ট দেশের ধনতান্ত্রিক সরকারগুলি উন্মত্ততার সাথে খোলাখুলি দ্রুতগতিতে অস্ত্রসজ্জা করছে এবং জঘন্য যুদ্ধপ্রচার চালাচ্ছে। পুঁজিবাদী সংবাদপত্র, রেডিও এবং সিনেমা, যাকে মার্কিন আক্রমণকারীরা যুদ্ধোন্মত্ততা সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করে, এক সোরগোল তুলেছে দুনিয়ায় 'শক্তির অবস্থা' তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ঘোষণা

করছে, "একমাত্র শক্তিই বৈদেশিক নীতির উদ্দেশ্য সফল করতে পারে"।

আন্তর্জাতিক আইনের সমস্ত বিধিকে পদদলিত করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা নির্লজ্জের মত বহু জাতির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে, যে সমস্ত ধনতান্ত্রিক রাজনীতিবিদরা নিজের দেশের জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তার উপর নির্ভর করে অন্য দেশ সম্পর্কে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা "প্রভাব", "নিয়ন্ত্রণ", "হাত-পা বাঁধা" প্রভৃতি আদেশের ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা বলে না। তথাকথিত শান্তিপূর্ণ শক্তি বণ্টনের ধোঁকায় তারা তাদের আক্রমণাত্মক কার্যাবলী ও উদ্দেশ্যকে ঢাকতে চায়। তর্ক তোলে যে পৃথিবীর প্রতিটি দেশে লক্ষ লক্ষ লোককে অস্ত্রসজ্জিত করাই শান্তিরক্ষার শ্রেষ্ঠতম উপায়; এর অসত্যতা অত্যন্ত সাধারণ বুদ্ধিতে ও ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় নিঃসন্দেহে এই প্রমাণ হয় যে, অস্ত্রসজ্জা, রিজার্ভ বাহিনী ডেকে আনা, অর্থনীতিকে সামরিক পর্যায়ে নিয়ে আসা, একমাত্র যুদ্ধের শক্তিকেই বাড়িয়ে তোলে। মার্কিন আক্রমণকারী চক্রের নীতিই হল যুদ্ধ প্রস্তুতির নীতি।

শান্তিরক্ষায় জনসাধারণের সংকল্প বর্তমান দিনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্যে অন্যতম। বিশ্বশান্তি পরিষদ শান্তিরক্ষার প্রধান দায়িত্ব হিসাবে বৃহৎ পঞ্চ শক্তির মধ্যে শান্তি চুক্তির জন্য যে আবেদন করেছে, তা থেকে মানব সমাজ শান্তিরক্ষার বাস্তব কাজের কার্যক্রম এই যুগে পেয়েছে, এমন একটা দাবি যার চারদিকে শান্তিরক্ষার জন্য এক ব্যাপক, অভুতপূর্ব আন্দোলন ইতিমধ্যেই গড়ে উঠছে।

বিশ্বশান্তি পরিষদের আবেদন প্রকাশিত হওয়ার ছয় সপ্তাহের মধ্যেই আবেদনকে জনপ্রিয় করা ও আবেদনে ব্যাপক সই সংগ্রহের প্রস্তুতির দিক থেকে যথেষ্ট বল পাওয়া যাচ্ছে। আফ্রিকা, নরওয়ে, স্পেন, ভারতবর্ষ, ইরান ও মেক্সিকোতে সই সংগ্রহ শুরু হয়ে গেছে। অস্ট্রিয়ার দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যায় যে, দুই সপ্তাহে স্টকহোম শান্তি আবেদনে যা সই সংগৃহীত হয়েছিল তার চেয়ে বেশি সই সংগৃহীত হয়েছে মাত্র দুই দিনে বর্তমানে আবেদনে। জনগণের গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে এপ্রিলে দেশব্যাপী গণভোট শুরু হবে, মহান সোভিয়েত জনগণ, চীনা গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র কোরিয়া ও ভিয়েতনামের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দল ও সংগঠনগুলি বিশ্বশান্তি পরিষদের আবেদনে সর্বান্তকরণে সাহায্য জানিয়েছেন, ফ্রান্স, ইতালি, গ্রেট ব্রিটেন, নেদারল্যাণ্ডস, ডেনমার্ক, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ল্যাটিন আরিকা ও অন্যান্য বহু দেশে শান্তি সমর্থকরা শান্তি চুক্তির আবেদনে ব্যাপক সই সংগ্রহের বিরাট প্রস্তুতি চালাচ্ছে।

অনেক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় গণতান্ত্রিক গণসংগঠন শান্তি চুক্তির দাবির সমর্থনে দাঁড়িয়েছেন, বিশ্বশান্তি পরিষদের আবেদনে প্রত্যেকটি সৎমানুষের সই সংগ্রহের সুবিধার জন্য প্রতিটি উপায়ে সাহায্য করার সংকল্প ব্যক্ত করেছেন। আবেদনের সমর্থনে ইউরোপের শ্রমিক শ্রেণির শক্তিশালী আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বার্লিনে ইউরোপের শ্রমিক সম্মেলনে তাদের প্রতিনিধিরা সর্বসম্মতিক্রমে এই ঘোষণায় সই করেছেন, "আমরা ইউরোপের শ্রমিক সম্মেলনের প্রতিনিধিরা, জার্মানীকে পুনরস্ত্রীকরণের বিরোধিতা করছি, বৃহৎ পঞ্চ শক্তির শান্তি চুক্তির জন্য বিশ্বশান্তি পরিষদের আবেদন আমরা সমর্থন করি"।

জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরাই তাদের মৌলিক স্বার্থের আসল বিপদ, তাই জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, বন্ধু ও সাথীদের জীবন রক্ষার জন্য, শান্তি রক্ষার জন্য, শ্রমজীবি ও অশ্রমজীবি, ধনি ও নির্ধন, ভগবানে

বিশ্বাসী ও নাস্তিক, বিভিন্ন মতাবলম্বীদের নিকট দেশের জাতীয় শান্তি কমিটি, কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টি ও গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলির জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান ক্রমবর্ধমান উৎসাহ ও সমর্থন লাভ করছে।

জনসাধারণ শান্তির সংগ্রামে এক নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে উপনীত হচ্ছে। দুনিয়াব্যাপী গণভোট শুরু হয়েছে। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে বৃহৎ শক্তিগুলির সরকারসমূহকে শান্তিরক্ষার মহান শপথ গ্রহণ করতে বাধ্য করা, প্রত্যেকটি দেশের সরকারগুলিকে বাধ্য করা, এই শপথে তাদের সমর্থন জানাতে এবং তারা শান্তি চুক্তির গঠনতন্ত্রের মধ্যে থেকে শান্তিরক্ষার আনুগত্য গ্রহণ করবে, না আক্রমণাত্মক মতলব পালন করবে, এ সম্পর্কে পরিষ্কার ও দ্বিধাহীনভাবে তাদের মতামত ঘোষণা করতে বাধ্য করা।

পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের প্রতি শান্তি চুক্তির আবেদন এসেছে। এই আবেদনে প্রত্যেক দেশের প্রতিটি নাগরিক সই দেবে এবং সই আদায় করা নিশ্চয় সম্ভব।

দুনিয়াব্যাপী গণভোটের প্রস্তুতি ও পরিচালনার পক্ষে ব্যাখ্যামূলক প্রচারকার্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেকটি দেশের প্রতিটি নাগরিককে আবেদনের মূল বক্তব্য জানাতে হবে, শান্তির আদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হিসাবে আবেদনে সই করার প্রয়োজনীয়তা প্রতিটি নরনারীকে বোঝাতে হবে।

স্টকহোম শান্তি আবেদনে সই সংগ্রহের সময় শান্তির যোদ্ধারা, শান্তির সক্রিয় সমর্থকদের সংখ্যা বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছিল, জনসাধারণের মধ্যে গিয়ে মূল্যবান অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছিল। সমস্ত ভুল, ত্রুটি ও দুর্বলতা দূর করার জন্য, আন্দোলনের গণভিত্তি আরও ব্যাপকতর করার জন্য, ব্যাখ্যামূলক প্রচারকার্যের নতুন ও আরও কার্যকরী পন্থা আবিষ্কার করার জন্য, এখন তারা সেই অমূল্য অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার প্রয়াস পাচ্ছে। জনসাধারণের প্রত্যেকটি অংশের সাথে, ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপনের উপায় ও পথ বের করতে হবে, বিশেষ করে পুঁজিবাদী দেশে, যেখানে যুদ্ধবাজদের ক্রমবর্ধমান দমননীতির ফলে শান্তির সমর্থকরা গভীর বিপদের সম্মুখীন হতে পারেন।

শান্তি চুক্তি আন্দোলনকে সফলভাবে পরিচালনার জন্য সাংগঠনিক প্রস্তুতির ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শান্তির জন্য সংগ্রামে লক্ষ লক্ষ নিঃস্বার্থ কর্মীরা শান্তি আন্দোলনের এক বিরাট শক্তি। কিন্তু ভাল সংগঠন, নির্ভুল নেতৃত্ব ও নিয়মিত অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান তাদের কার্যকারিতাকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলতে পারে।

বিভিন্ন দল, সংগঠন ও সমিতির প্রতিনিধিদের নতুন সভ্য হিসাবে নির্বাচিত করে, শ্রমিক, চাকুরিজীবি, স্থানীয় ধর্মযাজক ও ছোটখাট কারবারের মালিকদের কমিটিতে যুক্ত করে, স্থানীয় কমিটির সংগঠনকে ব্যাপকতর করার যে প্রচেষ্টা অনেক দেশে শুরু হয়েছে, তাতে নিঃসন্দেহে শান্তি কমিটিগুলি শক্তিশালী হবে, তাদের গণভিত্তি ব্যাপকতর হবে, কাজ শক্তিশালী হবে, তার ফলে সই সংগ্রহের আন্দোলন সফলভাবে গড়ে উঠতে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলি শান্তির সংগ্রামে সবচেয়ে সক্রিয় ও অগ্রগামী শক্তি। তাদের পক্ষে, তাদের দেশের জনসাধারণের সুন্দর ভবিষ্যতের সাথে দুনিয়াব্যাপী শান্তিরক্ষা ও শক্তিশালী করা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই তারা নিঃস্বার্থভাবে ও নির্ভীকচিত্তে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তিরক্ষার মহান আদর্শের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। জনসাধারণের সঙ্গে

অত্যন্ত নিবিড়ভাবে যুক্ত থেকে তারা নিরলসভাবে ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধবাজ চক্রান্তের মুখোশ খুলে দিচ্ছে এবং শান্তিরক্ষার সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণির ঐক্য এবং সমস্ত শ্রেণির সহযোগিতা গড়ে তুলছে এবং এই সংগ্রামে জনসাধারণের সমস্ত সংগঠনগুলিও নিজেদের দেশের সমস্ত নাগরিককে টেনে এনেছে, শান্তি চুক্তি আন্দোলনের জন্য টেনে এনেছে সমস্ত পার্টি সভ্যদের।

শান্তির সংগ্রামে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের সৎমানুষ জনসাধারণের শান্তি ও নিরাপত্তার দুর্গ সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃষ্টান্ত থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছে। একটানা ও অপরিবর্তনীয় শান্তি নীতি শান্তির অগ্রদূত কমরেড ষ্ট্যালিনের কথায় রূপ পেয়েছে ঃ "সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে বলা যায় যে সে শান্তিরক্ষা ও যুদ্ধবিরোধী নীতি দৃঢ়তার সাথে অনুসরণ করবে"। কোটি কোটি মানুষ শান্তি কামনা করছে, শান্তির জন্য সংগ্রাম করছে। বৃহৎ পঞ্চশক্তির মধ্যে শান্তি চুক্তির জন্য তাদের দাবিকে এক শক্তিশালী আওয়াজে পরিণত করতে পারলে, যুদ্ধের পথ বন্ধ করা এবং শান্তিরক্ষার কাজে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে।

শান্তি চুক্তির স্বপক্ষে! বিশ্বশান্তি দীর্ঘজীবী হোক!

['ফব এ লাষ্টিং পীস, ফব এ পিপলস্ ডেমোক্রেসী' পত্রিকাব ১৪নং সংখ্যার (৬ই এপ্রিল, ১৯৫১) সম্পাদকীয়]

ব্যক্তিনাম নির্দেশিকা

ড

ত

দ

ধ

ন

প

য

র

ল

শ

ষ

স

হ